বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

পঞ্চম পত্র

নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক তাপস বসু - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস - অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায় - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

চতুর্থ ষাণ্মাসিক বা চতুর্থ সেমেস্টার

পঞ্চম পত্র

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. ভামহ

একক ২. দণ্ডী

একক ৩. বামন

একক ৪. কুন্তক

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. বঙ্কিমচন্দ্র

একক ৬. রবীন্দ্রনাথ

একক ৭. অবনীন্দ্রনাথ

একক ৮. শ্রীঅরবিন্দ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. প্লেটো

একক ১০. অ্যারিস্টটল

একক ১১. শিলার

একক ১২. হোরেস

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. টলস্টয়

একক ১৪. জাঁ-পল সার্ত্র

একক ১৫. কডওয়েল

একক ১৬. ক্রোচে

সূচিপত্র

পঞ্চম পত্র

পঞ্চম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	ভামহ	ড. শ্রাবন্তী পান	১-৬
	২.	দণ্ডী	ড. শ্রাবন্তী পান	৬-৭
	৩.	বামন	ড. শ্রাবন্তী পান	৭-১০
	৪.	কুন্তক	ড. রাজশেখর নন্দী	১০-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	বঙ্কিমচন্দ্র	ড. রাজশেখর নন্দী	৩১-৩৪
	৬.	রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক তাপস বসু	৩৪-৩৫
	৭.	অবনীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৫-৩৮
	৮.	শ্রীঅরবিন্দ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৮-৫২
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	প্লেটো	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৫৩-৫৮
	১০	অ্যারিস্টটল	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৫৮-৬০
	১১	শিলার	ড. শ্রাবন্তী পান	৬০-৬৪
	১২	হোরেস	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৬৪-৯৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩	টলস্টয়	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৯৬-১০১
	১৪.	জাঁ-পল সার্ত্র	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১০১-১০৩
	১৫.	কডওয়েল	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১০৩-১০৬
	১৬.	ক্রোচে	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১০৬-১২৫

পঞ্চম পত্র

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ১

ভামহ

বিন্যাসক্রম

৫.১.১.১ নন্দনতত্ত্ব কী?১
৫.১.১.২ ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব
৫.১.১.৩ ভারতীয় আলংকারিকগণ
৫.১.১.৪ ভামহ
৫.১.১.৪.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'
৫.১.১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৫.১.১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.১.১ নন্দনতত্ত্ব কী?

নন্দনতত্ত্ব এক সুগভীর চেতনা। অনন্য উপলব্ধি নন্দনতত্ত্বের অন্তরাত্মায় সুন্দরের রূপময় উপস্থিতি, ভাবের সুগভীর পরিপূর্ণতা। আবার প্রকাশের তীব্র আকুতি। নন্দনতত্ত্ব কোন কোন পন্ডিতের মতে, অনির্বচনীয় হলেও তার স্বরূপ অনাস্বাদিত নয়। কেউ কেউ বলেন 'Aesthetics' কেউ বলেন সৌন্দর্য শাস্ত্র কেউ বলেন ভিক্ষা শাস্ত্র নন্দনতত্ত্ব। কিন্তু নামের সীমার বাইরে' নন্দনতত্ত্ব 'বৃহত্তর এক উপলব্ধি। পশুর মধ্যে অনুভূতির এই সূক্ষ্মতা নেই - "The live animal does not have to project emotions into the objects experienced...but those who are intellectually specialized, a moral and emotional connotation. The dictionary will inform any one who consults it that the early use of words like sweet and bitter not to denote qualites of scense as such but to discriminate was and hostile. How could it be otherwise? Direct experience come from nature and man interacting with each other. in this interaction human energy gathers, is released dammed up, frustrated and victorious. Rhythmic beats of want and fulfillment, pulses of doing and being withheld from doing'

এই চেতনা কাব্য শিল্পের জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। এর উৎপত্তি শিল্প সৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক।শিল্প মানব-মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তার নাম নন্দনতত্ত্ব। আনন্দিত উপলব্ধি? আমাদের মনে প্রশ্ন আসে নন্দনতত্ত্বের যাত্রা কি কেবল সুন্দরের পথে। সুন্দর কি ভালো সমার্থক! যা আমাদের পক্ষে হিতকর ,তাই কি সুন্দর। দয়া করুণা শ্রদ্ধা এগুলি কেবল সুন্দর হলে সুন্দরের অব্যাপ্তি হয় নন্দনতত্ত্ব নীতিগ্রন্থে পরিণত হয়। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়েও তো সুন্দর সম্ভব নয়।সৌন্দর্যের সাথে মঙ্গল ভাবনা সম্পৃক্ত না হলে মানবীয় গুণগুলি না থাকলে সুন্দর পরম পরমসুন্দর হয়ে ওঠে না কোন কোন পণ্ডিত

বলেন, প্রকৃতি সুন্দর।কোন কোন পন্ডিত মানব প্রকৃতির ভেতর মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অপূর্ব রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন(Imagery)। আবার অনেকে জড়জগতের ঊর্ধ্বে এক পরম সত্তাকে অনুভব করেছেন। কেউ সৌন্দর্য বিচারে ভাববাদী, কেউবা বস্তুবাদী। কোন পন্ডিত প্রকাশনা উপলক্ষে সৌন্দর্য বলেছেন। কখনো আবার ছন্দ অলংকার ধনী ব্যক্তি তাদের ব্যবহারে সৌন্দর্যময় হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখব, আনন্দ মৃত রস আস্বাদনে সকল বিরোধের অবসান।

আর তার বহু যুগ আগে উপনিষদের ঋষি বললেন "আনন্দরুপম অমৃতং যত বিভাত"

কবি কি জানতেন না পৃথিবীর সর্বত্র কেবল আনন্দ নেই,আছে খুদার হাহাকার ,মৃত্যু, লোভ, স্বার্থপরতা সবই আছে এখানে। তব চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবী সুন্দর। সেই সুন্দরের প্রকাশ এর দুঃখ উপভোগ্য। আসলে বেদনা থেকে কি শিল্পের জন্ম নেয় না ?নেয়। কিন্তু সে বেদনার প্রকাশ এক ধরনের আনন্দ থাকে।যন্ত্রণা থেকে এক ধরনের মুক্তি নন্দনতত্ত্বের তত্ত্ব শব্দটিতে প্রচলিত অর্থে তার আভাস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একজন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পকে কোন বাঁধাধরা নিয়মের যাচাই করতে পারেন না শিল্পের প্রধান পরিচয় একটি সৃষ্টি এবং শিল্প মাত্রই এক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত । নিয়ম শৃংখলার নিগড়ে আবদ্ধ করলে শিল্পের চরিত্র ক্ষুন্ন হয়। নন্দনতত্ত্বের ও সূত্রসমূহ শিল্পসৃষ্টির পথনির্দেশক নয়। এসব সূত্রের সাহায্যে শিল্পকে ও তার অন্তর্গত সৌন্দর্য চেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় । তলিয়ে দেখা যায়। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় যেহেতু দুরূহ ব্যাপার, সেজন্য নন্দনতত্ত্বের পরিধি ও ব্যাপক ও বিস্তৃত।প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে জয়নাল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি, আদিম দেবতার পূজা উৎসবের নৃত্য অর্ঘ্য থেকে আধুনিক কোন নৃত্য দলের পরিবেশিত বেলে, অর্ফিউস এর মোহন বাঁশি থেকে পাঙ্খ -রক, সবই শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। এখানেই শেষ নয়। জীবন বাদী ও সমাজাশ্রয়ী শিল্প সমালোচনা অনুযায়ী শ্রমিকের রক্তে ঘামে তৈরি একটি রাস্তাও শিল্প, গুন টানা মাঝিরা ও শিল্পী। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে এসব শিল্প হলে এখানে আনন্দের স্থান কোথায়? উত্তর: শিল্পের আনন্দ প্রয়োজন সিদ্ধ নয়, এবং এর কোনো নির্দিষ্ট রোগ নেই। গুনটানা মাঝির বিষন্ন শরীরে বা ক্লান্ত শ্রমিকের পরিশ্রমই অবয়বে বাহ্যিক সৌন্দর্য নেই; চোখ কে বা মনকে তা তৃপ্ত করে না। কিন্তু এদের উপস্থিতি এক ধরনের মহত্ত্বের দাবিদার, পরিপার্শ্ব কে তারা সহজেই ক্ষুদ্র করে ফেলে, শ্রমের সম সমোন্নতি তে নিজেদের অস্তিত্বকে করে বিশাল। এই মহত্বের অনুভবি সৌন্দর্য। শিল্পের অন্বিষ্ট হল জীবন। তাই এই মতবাদে বিশ্বাসী রা মনে করে যে, জীবনধারণের গরুর তাগিদই শিল্প। যে তাগিদ জীবনকে পরিচালিত করে তাই সৃষ্টি করে শিল্প।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত না হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিল্প মানবিক সৃষ্টি বলে কোন না কোন ভাবে এতে জীবনের প্রসঙ্গ থাকবেই। এবং জীবন জটিল ও বহু বিচিত্র। এজন্য নন্দনতত্ত্বের বিষয়বস্তুর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। নন্দনতত্ত্বের সীমানায় শিল্পকলার বিভিন্ন অনুষঙ্গ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সূত্র ও সমস্যা, নীতিশাস্ত্র, মূল্য বিচার এবং সামগ্রিকভাবে দর্শনের নানান উপাদান অন্তর্ভুক্ত। এবং যেহেতু শিল্পের একটি বড় অংশ সচেতন বা অবচেতন মনের সৃষ্টি, নন্দনতত্ত্বের প্রধান বিচার তর্ক ভিত্তিক নয়, অনুভব এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

যদিও আমাদের দেশে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য শাস্ত্র বা এস্থেটিকস বলে পৃথক কোন শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দময়তার অভিসারী আমাদের সাহিত্যের এই যাত্রা বহু প্রাচীন। যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্যতায় তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কাটে নি। তখন ভারতের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রভাতী ঊষার গান। এক অপূর্ব ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল হৃদয়পুর-' ধ্বনিল রে', সেই জ্ঞান রূপ পেল বিশ্বজনীন শান্তি সঙ্গীতে। (সং জ্ঞান সুক্ত ঋগ্বেদ সংহিতা১০/১৯১)।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি সামগ্রিকভাবে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত – পাশ্চাত্য, আধুনিক প্রাচ্য নন্দনতত্ত্ব এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব। যদিও আমাদের দেশে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যশাস্ত্র বা Aesthetics বলে পৃথক কোনো শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দময়তার অভিসারে আমাদের সাহিত্যের এই যাত্রা বহুপ্রাচীন। যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্যতার তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কাটেনি। তখন ভারতের ঋষির হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রভাতী ঊষার গান। এক অপূর্ব ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়েছিলো হৃদয়পুরে – 'ধ্বনিল রে', সেই জ্ঞান রূপ পেলো বিশ্বজনীন শান্তি সঙ্গীতে।

৫.১.১.২ ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য সৌন্দর্যশাস্ত্র বলে পৃথক কোনো শাস্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আর 'নন্দনতত্ত্ব' তো আধুনিক যুগের শব্দ। সাহিত্যকলার পীঠস্থান এই দেশে সৌন্দর্যবোধ ভারতাত্মার অন্তঃস্থলে একাত্ম হয়েছিলো। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র রমণীয়তা, সৌন্দর্যময়তার কথা বলে। ভারতীয় সাহিত্যে কবিকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উপমিত করা হয়েছে। এই উপমায় কাব্যের দৈবী উৎপত্তির সাথে সাথে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় –

" অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
তথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে।"

কবির এই দৈব অনুপ্রেরণা আলংকারিক ভামহের রচনায় স্বীকৃতি লাভ করেছে এভাবে –'কাব্যং জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'।যাকে দণ্ডী বলেছেন – 'নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহু নির্মলম্'।

পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) এর মতে প্রকাশতত্ত্ব। অনুভূতি তো হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে যায় কিন্তু তাকে প্রকাশ করার জন্য চাই 'নৈসর্গিক প্রতিভা'। তবেই অনাদিনিধনা বাক্ উদ্ভাসিত হবে কাব্যে। আর ঋকবেদ সংহিতায় উচ্চারিত হয়েছে –

" ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমনস্মিদেবাঅধি।"

বাণীরূপে ব্রহ্ম মহাশূন্যে নিষন্ন। তাকে কেবল রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারেন।

আচার্য মম্মটভট্ট 'শক্তিনিপুণতা'র কথা বলেছেন, কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাসে তিনি বলেছেন –

" শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাত্।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে।"

কাব্য রচনায় যেমন শক্তি বা কবি প্রতিভা থাকতে হবে তেমনি শাস্ত্রাদি পাঠ, অভ্যাস প্রভৃতিও কাব্যরচনার হেতু। পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক হোরেস (Horace) বলেছেন –

"The question has been asked whether a fine poem is the product of art or of nature. I myself cannot see the value of application without a strong natural aptitude, or on the other hand, of native genious unless it is cultivated – so true is it that each requires the help of the other, and that they enter into a friendly compact with each other"

রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন – " যা শব্দগ্রামমর্থসার্থমলংকারতন্ত্রমুক্তিমার্গমন্যদপি তথাবিধি হৃদয়ং প্রতিভাসয়তি সা প্রতিভা।" যার দ্বারা শব্দ, অর্থ, অলংকার প্রভৃতি হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়। তাকে ঋকবেদে ঋষি বলেছেন যে কাব্যের দেবী সবার কাছে প্রকাশিত নন। আলংকারিক রাজশেখর অবশ্য অনেক পর্যালোচনার পর বলেছেন প্রতিভা

ও ব্যুৎপত্তি উভয়ের মিলনেই স্বার্থক কাব্যের জন্ম। লাবণ্যহীনভাবে যেমন দেহসৌষ্ঠব শোভা বর্ধন করে না তেমনি আবার দেহের সৌষ্ঠব ছাড়া লাবণ্য সৌন্দর্যহীন।

পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে কাব্য লক্ষণ নিরূপণ করেছেন –'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।" অর্থাৎ কাব্যের লক্ষণে যে রমণীয়তার প্রকাশ তা যেন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রাণ। রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দ হলো কাব্য। রমণীয়তার অর্থ করেছেন – " লোকত্তরহলাদজনকজ্ঞানগোচরতা" যে জ্ঞানের দ্বারা লোকত্তর আনন্দ জাত হয়, তাই 'রমণীয়তা'। এই রমণীয়তার সাথে অ্যারিস্টটলের ' Pure and elevated pleasure' এর প্রভেদ নেই। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' যে আনন্দের বিশ্বসাহিত্যের হৃদয়ে, সেই একই প্লাবনে আমাদের ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যেও নিষ্ণাত।

আলংকারিক কুন্তক তাঁর বক্রোক্তিজীবিতে বলেছেন –

" অর্থঃ সহৃদয়াহলাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ।' কাব্যের অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ের আহ্লাদ জন্মায় এবং স্বভাবত সুন্দর হয়ে থাকে। আলংকারিক আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক' এ বলেন –

" সহৃদয়হৃদয়াহলাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্"

শব্দের সাথে অর্থের এই সম্বন্ধিত সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যে –

" বাগর্থবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতপরমেশ্বরৌ।।"

ভামহ বলেন – 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' – এই সহিতই উত্তরকালে সাহিত্য শব্দে রূপায়িত হয়। শব্দ ও অর্থের সুহৃদ্ভাবেই সাহিত্যদেহ শোভন হয়ে ওঠে।

আলংকারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কাব্যপুরুষের রূপ বর্ণনা করেছেন –

"শব্দ ও অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার বাহুদ্বয়, অপভ্রংশ জঘনদেশ, পৈশাচী চরণযুগল এবং মিশ্রভাষা বক্ষঃস্থল হবে। তুমি নিরপেক্ষ, প্রসন্ন মধুর, উদার ও ওজস্বী হবে। ভাবপ্রকাশক সার্থক বাক্য তোমার বাণী রূপ আত্মা, ছন্দঃসমূহ তোমার রোমরাজি, অনুপ্রাস উপমাদি তোমার অলঙ্কার।"

তারপর সাহিত্যবিদ্যাবধূর নির্মাণেও আলংকারিক রাজশেখর যথেষ্ট চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

ভারতীয় কাব্যের এই শব্দার্থময় শরীর রূপায়িত হলেও তাঁর রূপময় আত্মা কে। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সহৃদয়হৃদয়হারী। কারো মতে এই সৌন্দর্যের উপাদান হলো অলংকার, কারো মতে ধ্বনি, কেউ আবার রসকেই কাব্যের আত্মা রূপে নির্বাচন করেছেন। এই নিয়েই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নানা প্রস্থান (school) গড়ে উঠেছে। যেমন –'অলঙ্কৃতি অলঙ্কারঃ'। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অলংকার স্বয়ং সৌন্দর্য। অন্যদিকে 'অলংক্রিয়তে শোভা সাধ্যতেহনেন'। এইরূপ করণবাচ্যে ব্যুতপত্তি নিষ্পন্ন অলংকার শব্দের অর্থ যা শোভা সম্পাদন করে। প্রথম অর্থে স্বয়ং সৌন্দর্য। দ্বিতীয় অর্থে তা কাব্য শোভাসাধক। 'কাব্যংগ্রাহ্যমলনঙ্কারাৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ।' ভামহের উত্তরকালে আচার্য বামন অলঙ্কারকে কেবলমাত্র শোভাজনক না বলে অতিশয় শোভা উৎপাদক বলে বর্ণনা করেছেন –

" কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। তদতিশয়- হেতবস্ত্বলংঙ্কারাঃ'। আবার ধ্বনিবাদীরা বলেছেন-

'কাব্যসাত্মা ধ্বনিরিতিবুধৈর্যঃ সমাম্মতপূর্ব্ব।' কেউ বা রীতিকে কাব্যের প্রাণ বলে বর্ণনা করেছেন –"রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টপদরচনারীতিঃ'। আবার বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা কুন্তকের মতে, বৈদগ্ধপূর্ণ উক্তিই বক্রোক্তি। এই বক্রোক্তি কাব্যের প্রাণ–"বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী ভণিতিরুচ্যতে।'

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সামগ্রিক পরিসর আলোচনা করে দেখব বিভিন্ন প্রস্থানের প্রবক্তাদের মধ্যে মতবাদগত প্রভেদ থাকলেও এদের যাত্রাপথের মূল গন্তব্য সৌন্দর্য। তেমনি সহিষ্ণুরূপে পারস্পরিক মতাদর্শগুলিকে উল্লেখও

করেছেন। সেদিক থেকে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র একটি গৌরবময় অধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্যের এই গৌরবময় অধ্যায়ের সাথে পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক ধারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ড: সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এ বিষয়ে 'কাব্যালোক' গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন – " ভারতীয় গ্রন্থেও যেমন গ্রন্থবিচার দেখা যায়, গ্রীক গ্রন্থেও সেই প্রকার আমরা যাহাকে ভাব ও রস বলিয়া বুঝি, তাহার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। সেই আলোচনা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব আচার্য অভিনব গুপ্ত নাট্যরস বা কাব্যরস বুঝাইতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রায় সকল অংশই অ্যারিস্টটলের কাব্যসূত্রে অথবা বুচারকৃত তাহার বাখ্যানে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান কেবলমাত্র ভাবের রস-নিষ্পত্তি ব্যাপারটির যথাস্বরূপ তাঁহার অংশতঃ মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন দেখা যায়। সত্যদর্শী মনীষিগণ দেশ ও কাল নির্বিচারে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ইহাই আর একবার এই ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল।"

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রস অ্যারিস্টটলের 'produce an emotional delight, a pure elevated pleasure' একই পথের অভসারী। ভরত বললেন –

"যথা বীজাদ্ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বেততোভাবা ব্যবস্থিতাঃ।"

তিনিও আরও বলেছেন –

" শৃঙ্গার হাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়নকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ।।"

অর্থাৎ ভরত নাটকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আটটি রসকে স্বীকার করেছেন। যদিও পরে শান্ত রসকে, নবরস বলে উল্লেখ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রসঙ্গান্তর।

আমাদের কাব্যে করুণ আদিরস। কারুণ্যের বশে রামায়ণের জন্ম। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তো শোক থেকে শ্লোকের সৃষ্টি একথা বলেছেন। নিবিড় দুঃখেও কাব্যে আস্বাদ্যমান হয়ে আনন্দে পর্যবসিত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে উল্লেখ করেছেন –

" করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্ সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।
কিঞ্চ তেষু সদা দুঃখং ন কেপিস্যাৎ তদুন্মুখঃ তথা রামায়ণদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।।"

করুণাদি রসে যে সুখ বা আনন্দ সঞ্জাত হয়, তা সহৃদয়ের অনুভবই তার প্রমাণ। তাতে দুঃখ থাকলে তা সবাই লাভ করার জন্য উন্মুখ হত না। রামায়ণাদি কাব্য দুঃখের হেতু আর শেলী (Shelley) বলেছেন – আমাদের ভাবনাগুলি আমাদের কাছে সবচেয়ে মধুর সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক অ্যারিস্টটলও (Aristotle) 'Catharsis' মাধ্যমে ভাবমোক্ষণের কথা বলেছেন তাই 'pity' ও 'fear' কাব্যে আনন্দে রূপায়িত হয়, ট্রাজেডিও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সেই আস্বাদ্যমান রসকে সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'।

ভারতীয় সাহিত্য এই গভীরতার অনুসারী। 'কাব্যালোক' গ্রন্থে বলা হয়েছে –'এই বিচিত্র বস্তুরাশিই কাব্যজগতে শব্দে সমর্পিত হইয়া যায়, অলৌকিক বিভাব এবং ক্রমে তাহারা চিত্তে জাগায় ভাব ও রস। 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ' এইভাব স্থায়ী হইয়া পরিণত হয় শুদ্ধ রসে; তাহা শ্রান্ত, স্ববিশ্রান্ত, প্রসন্ন প্রকাশময়, দেশকালহীন এক অখণ্ড আনন্দদ্যুতি।'

এই আনন্দের ধারাটি ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিটি পর্বেই নিষন্ন হয়ে আছে। অলঙ্কারবিচারেও সংস্কৃত আলংকারিকের এই ধারাটি লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের অর্থ ভূষণ। ভামহ বলেছেন – 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাসুখম্' অর্থাৎ অলংকারবিহীন রমণীর মুখ শোভনীয় হয় না।আবার বামন কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে লিখেছেন – কাব্য

অলঙ্কারযুক্ত হয়ায় উপাদেয়, তাই সৌন্দর্যই অলঙ্কার। আবার বৃত্তিতে লিখেছেন 'অলঙ্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ। আবার অলঙ্কার অর্থে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারাদিকেও বোঝায়। অর্থাৎ একদিকে অলঙ্কার স্বয়ং সৌন্দর্য, অন্যদিকে তা সৌন্দর্যের কারণ।

কাব্য শোভাকর ধর্ম হলো গুণ আর অলংকার হলো সেই শোভার অতিশয় হেতু। অলঙ্কারই হোক রসই হোক, গুণাদির প্রসঙ্গই হোক ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকরা কাব্য শোভার কথাটি কখনও বিস্মৃত হননি। কাব্যের সূচনায় যে সৌন্দর্যের পথ কবির যাত্রা পরিশেষে সেই সৌন্দর্যেই কাব্যের পরিপূর্ণতা।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে কাব্যহেতু বা কাব্য রচনার কারণ আলোচনা করতে গেলেও সেই আনন্দের কথাই প্রকাশিত হয়। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে কাব্য রচনার কারণ রূপে কারিকা নির্ণয় করেছেন –

" কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃত্তয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।"

অর্থাৎ কাব্য রচনার কারণ যেরূপ অর্থলাভ, যশলাভ তেমনি কাব্যরচনার কারণরূপে মঙ্গল প্রভৃতিও বর্তমান। তিনি সদঃপরিনিবৃত্তয়ে পদে অর্থ করেছেন সকল প্রয়োজন মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্‌ভৃত্যং বিগলিতবেদ্যান্ত্রমানন্দংম'। অর্থাত কাব্য রসাস্বদনের ফলে যে দিব্য আনন্দ লাভ হয় সে সম্পর্কে মম্মটভট্টের কারিকাটিতে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই অনিবর্চনীয় আনন্দই ভারতীয় কাব্যের উদ্দেশ্য। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে শুভকাব্য সম্পর্কে লিখেছেন – যার মধ্যে দুর্বোধ্য অর্থ নেই, সহজবোধ্য বুদ্ধিদীপ্ত সর্বসাধারণের হৃদয়ে যা সুখ উৎপাদন করে। অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্রে কাব্যে কবির সাথে সাথে সহৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে প্রতিভা দ্বিবিধ রূপে স্বীকৃত। কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। কবি যখন রচনা করেন তখন তাঁর থাকে কারয়িত্রী প্রতিভা এবং দর্শক বা শ্রোতার মনোমুকুরে বিম্বিত হলে তা ভাবয়িত্রী প্রতিভা। এই দুই এর সম্মিলন না হলে কাব্য সুন্দর হয় না। ভামহ বলেন – 'প্রীতিং করোতি কীর্তিং চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্' আলংকারিক বামনও কীর্তি ও প্রীতিকে কাব্য হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন।

মম্মটভট্ট তাই কবির সৃষ্টিকে নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ করতে চাননি। কবির সৃষ্টি মুক্ত ও চির আনন্দময় -

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদেকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।।

এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে এই সৌন্দর্যময়তার উপাখ্যান বহুপ্রাচীন। ঋকবেদে সংহিতার ঊষা সূক্তগুলি সৌন্দর্যময়তার প্রতিরূপে। সূক্তগুলি পাঠ করলে মনে হয় তা যেন সরল অনাড়ম্বর কবিতা, সুমধুর সঙ্গীতের সুর। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইণ্টারনিটস্ (M. Winternitz) এই সূক্তগুলিকে গীতিকাব্য বলতে দ্বিধা করেননি। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার এবং অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের শোভায় এই সংহিতা সুশোভিত। উপনিষদ সাহিত্যে যে আনন্দময়তার চরম প্রকাশ ঘটেছে সেই আনন্দরসের উৎস ঋকবেদ সংহিতা। এখানে মানবজীবন এবং প্রকৃতির সম্মিলনে এক অপূর্ব নান্দনিক চেতনা নির্মিত হয়েছে। তাই ধ্রুপদী ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব এবং কাব্য অনেক বেশি সুবিন্যস্ত হলেও ঋগ্বেদ সংহিতা তথা বৈদিক সাহিত্যকে দূরে রেখে ভারতের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা অন্বেষণ করা প্রায় অসম্ভব।

৫.১.১.৩ ভারতীয় আলংকারিকগণ

রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকির মনে অলংকার শাস্তের প্রথম জিজ্ঞাসা – সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে সমাধান অন্বেষণ। অলংকার শাস্ত্রের জন্ম সেই থেকেই। মানুষের মনে নিয়ত যে ভাবসমূহের সঞ্চার দেখা যায়, তারই অনুভূতি স্বরূপের বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে শ্লোকের ছন্দে – সাহিত্যের ভাষায়। এই ভাবের স্বরূপ কী, অনুভূতির লক্ষণ কীরূপ, ভাষার স্বরূপ কী-তার অবলম্বন কী, কোথায় তার সার্থকতা – এই সকল প্রশ্নের উত্তরে অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা। এঁদের আলোচনাই ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মৌল কাঠামোটি প্রস্তুত করেছে। ভারতীয় অলংকার শাস্তের মূল প্রবক্তাগণ হলেন, যেমন –

ভরত (নাট্যশাস্ত্র), আচার্য দণ্ডী (কাব্যাদর্শ), ভামহ (কাব্যালংকার), বামন (কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি), আনন্দবর্ধন (ধ্বন্যালোক), রাজশেখর (কাব্যমীমাংসা),ধনঞ্জয় (দশরূপক), রুদ্রট (কাব্যালংকার), কুন্তক (বক্রোক্তিজীবিত), ক্ষেমেন্দ্র (ঔচিত্যবিচারচর্চা), মম্মটভট্ট (কাব্যপ্রকাশ), রুদ্রভট্ট (শৃঙ্গারতিলক), বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ), শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু), জীব গোস্বামী (প্রীতিসন্দর্ভ, ষটসন্দর্ভ), কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈতন্যচরিতামৃত), জগন্নাথ (রসগঙ্গাধর), একালের কয়েকজন তাত্ত্বিক হলেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য), অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কাব্যজিজ্ঞাসা), শ্যামাপদ চক্রবর্তী (অলংকার চন্দ্রিকা), প্রবোধচন্দ্র সেন (বাংলা ছন্দ) প্রভৃতি।

৫.১.১.৪ ভামহ

কাব্যালংকার রচয়িতা ভামহ সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। 'কাব্যালংকার' গ্রন্থটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'বস্তুপঞ্চকম্' (কাব্যশরীর, অলঙ্কৃতি, দোষ, ন্যায়-নির্ণয়, শব্দশুদ্ধি)। ভামহ ৩২টি অর্থালংকা ও ৩টি শব্দালংকার এর কথা বলেছেন। ভামহ ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) এর ধারণার সঙ্গে 'মোক্ষ'র ধারণাটি যুক্ত করেছেন এবং মোক্ষ বিধায়ক 'শান্ত' রসও স্বীকৃত হয়েছে তাঁর কাব্যতত্ত্বে। ভরত বর্ণিত অষ্ট্রস র সঙ্গে এই শান্ত রস যোগ করার ফলে একটা বিতর্ক এসময় শুরু হয়। ভামহের দুটি বিখ্যাত উক্তি :

ক) ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্

খ) শব্দার্থৌ সহিতম্ কাব্যম্।

মূলত অলংকার প্রস্থানের আচার্য হিসাবে ভামহ খ্যাতিমান হলেও, তাঁর মতাদর্শ উত্তরকালে রাজশেখর, ভোজরাজ এবং বক্রোক্তি প্রস্থানের প্রবক্তা কুন্তকের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল।

আচার্য ভরতের মতে রসই কাব্যের মূলীভূত তত্ত্ব। কিন্তু কালক্রমে ভরতের এই মতবাদ যেন আলংকারিক সমাজে বিস্মৃতপ্রায় হতে লাগল। ভরত এবং ভামহের মধ্যবর্তী আমাদের সেরকম কোনো আলংকারিক গ্রন্থ চোখে পড়ে না।তবে নিঃসন্দেহে এইসময় কোনো মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল্ল কিন্তু প্রসার লাভ করেনি। সেখানে আমরা দেখব ভরতমুনি যেখানে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে একটি শব্দালংকার (যমক) এবং তিনটি অর্থালংকার (উপমা, রূপক, দীপক) উল্লেখ করেছেন, সেখানে অলংকারবাদী ভামহ তিনটি শব্দালংকার ও বত্রিশটি অর্থালংকারের নির্দেশ করেছেন। এইভাবে অলংকারসমূহ কাব্য ক্রমে প্রাধান্য লাভ করল এবং অলংকারনিবেশই কবিগণের কাব্যক্রিয়ার চরম লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হলো। ভামহ বিরচিত 'কাব্যালংকার' এই অলংকার প্রাধান্যের নিদর্শনস্থানীয় গ্রন্থ। ভামহ তাঁর গ্রন্থের ১ম পরিছেদে বলেছেন –

'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্' – কাব্যালংকার

অর্থাৎ বনিতার মুখ মনোহর হলেও অলংকারহীন হয়ে কখনও শোভা পায় না। ভামহ অলংকারকে সুন্দরী রমণী দেহের সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ বলে মনে করেন; অলংকার ব্যতিরেকে কাব্যের দেহ আস্বাদযোগ্য রমণীয়তা লাভ করতে পারে না। ভামহের মতে প্রত্যেক অলংকারই 'বক্রোক্তি' (Crooked speech) থেকে উদ্ভূত। 'বক্রোক্তি' এবং 'অতিশয়োক্তি' (hyperbolic statement) ভামহের মতে তুল্যরূপ। সেই জন্যই যে সকল অলংকারে অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির কোনো লেশ্মাত্র নাই সেগুলি ভামহের মতে প্রকৃতপক্ষে অলংকার নয়। অতএব 'হেতু', 'সূক্ষ্ম', এবং 'লেশ' ভামহের মতে অলংকারই নয় –যেহেতু এরা 'বক্রোক্তিশূন্য'।

'স্বভাবোক্তি'ও ভামহের মতে অলংকারগোষ্ঠীর বর্হিভূত – যেহেতু এটি বক্রোক্তিগন্ধশূন্য – " স্বভাবোক্তিরলংকার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে' – কাব্যালংকার

ভামহ প্রমুখ রস, ভাব প্রভৃতিকে স্বীকার করেছেন, তবে সেগুলিকে অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতির মতো কাব্যের অলংকারমাত্র বলে মনে করেছেন, আলংকার্য্য নয়। তাঁর মতে অলংকার সর্বদাই গৌণ বা অপ্রধান, আলংকার্য্যই প্রধান। আলংকার্য্য যদি কোনো বস্তুতে না থাকে, তবে অলংকারের কোনো সার্থকতা নেই। এখন প্রশ্ন 'আলংকার্য্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'রসপ্রস্থানে'র আচার্যগণের মতে রসই আলংকার্য্য, রসই কাব্যের আত্মা, কেন না রস থেকেই কাব্যের উৎপত্তি এবং রসেই কাব্যের পরিণতি। অলংকারবাদীগণ কাব্যের বীজস্থানীয় 'রসে' পৌঁছাতে না পেরে রসবীজের প্রকাশস্বরূপ কাব্যমহীরূহ হলো কাব্যের দেহ বা শরীর। দেহ ব্যতিরেকে যেহেতু প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই কাব্যের দেহকেই তারা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫.১.১.৪.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

মানুষের দেহ বা শরীর প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই প্রত্যক্ষবাদীগণ আত্মা অপেক্ষা শরীরের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আলংকারিকগণ কাব্যের আত্মা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধ্বনি, রস প্রভৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা কাব্যের দেহ বা শরীরকে উপেক্ষা করতে পারেননি। 'ধ্বন্যালোক' এর একটি কারিকায় সুন্দরভাবে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। 'লোকে আলো চায়, তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথাবস্তু'। আলংকারিকরা তাই বলেছেন 'তস্য শব্দার্থৌ শরীর' অর্থাৎ শব্দার্থটি তাহার শরীর। আলোচনাসূত্রে আলংকারিকগণ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন এবং কাব্যের কাব্যত্ব বিচারে ও কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণে অগ্রসর হয়েছেন। রাজশেখরের একটি সূত্র অবলম্বনে এই বিষয়ের আলোচনার উৎপত্তি – 'শব্দার্থয়োর্ঘথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্য বিদ্যা' –অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের যথাযথ সহভাবে যে বিদ্যা তাহাই সাহিত্যবিদ্যা। 'সহভাব' কথাটির অর্থই সাহিত্য অর্থাৎ সহিতত্ত্ব। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকেই সাহিত্য বলে অভিহিত করতে চান কোনো কোনো বিজ্ঞ আলংকারিক।

আলংকারিক আচার্য ভামহ তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ সহিতত্ত্ব বা মিলনসাধনে কাব্য হয়। শব্দ বলতে ধ্বনি বা Sound বোঝায় প্রতিটি শব্দে এক একটি ধ্বনি প্রকাশিত হয়। আবার এই ধ্বনি একটি অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থ ব্যতীত ধ্বনির তাৎপর্য হয় না। আলংকারিকগণ 'শব্দ' বলতে কী বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করা যায়। আলংকারিক কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বলেছেন –

'শব্দো বিক্ষিপ্তার্থৈকবাচকোহ্যেষু সৎস্বপি।
অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি স্বস্পন্দ সুন্দরঃ।

অর্থাৎ অন্য কয়েকটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাত অভিপ্রেত অর্থের বাচক হয়, তাকেই 'শব্দ' বলা যায়। আবার সহৃদয় হৃদয়বান ব্যক্তির মনে আনন্দ সৃষ্টি করে স্বভাবে যা সুন্দর হয়, তাকেই 'অর্থ' বলা যায়। কবির অভিপ্রেত অর্থকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার জন্য শব্দের প্রয়োজন হয় এবং ভাবের দ্বারা অভিপ্রায়কে প্রকাশ করার জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয়। শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধের কথা আলংকারিকগণ সকল সময়েই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই নিত্য সম্বন্ধ পার্বতী-পরমেশ্বরের নিত্যসম্বন্ধ।

পার্বতীর এক নাম 'বাণী'; আবার পরমেশ্বর শিবের আর এক নাম 'অর্থ'। পার্বতী-পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ বাগর্থ। পার্বতী শব্দ রূপে ব্যক্ত; মহেশ্বর অর্থ রূপে অব্যক্ত। বাক্যে শব্দ ও অর্থ থাকেই; কাব্য হতে গেলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট রূপ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে। "যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের সঙ্গে বিচিত্র বিন্যাসে বিন্যস্ত হয় তখন বর্ণের সইত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে স্বর ও ধ্বনি লহরীর রমণীয় মাধুর্য সৃষ্টি করিবে, অপরদিকে তেমনি তদ্‌গর্ভিত অর্থ ও তাহার সহিত তুল্যযোগিতা করিয়া পরস্পরের

অর্থের দিক দিয়া নতুন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে। এমনি করিয়া ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরস্পর স্পর্ধী চারুতাদ্বয় উৎপন্ন হইবে; তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যই 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ।

শব্দ ও অর্থের সহিতত্ত্ব ও মিলনের ফলেই সাহিত্যের উদ্ভব – এ বিষয় বা চিন্তাকে অবলম্বন ক্রে অলংকার শাস্ত্রে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যের আত্মা যাইহোক কাব্যের দেহ হলো তার শব্দার্থ। শব্দ ও অর্থকে সাজিয়ে চারুত্ব সম্পাদন করলেই তা কাব্য ওঠে। কোনো বিষয়কএ প্রকাশ করার জন্য আমরা যখন কোনো শব্দের কথা চিন্তা করি, তখন সেই শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্কের কথাটিও প্রধান হয়ে ওঠে। আবার যখন কোনো অর্থের কথা চিন্তা করা যায়, তখন অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেই কবি কালিদাস শ্লোক রচনা করে লিখেছেন –

বাগর্থমিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।

অর্থাৎ বাগর্থের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত জগতের মাতাপিতা পার্বতী পরমেশ্বরকে বাগর্থলাভের জন্য বন্দনা করি।

৫.১.১.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব কী?

২. নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

৩. নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় অলংকারতত্ত্বের সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।

৪. নন্দনতত্ত্বের মধ্যে ভারতীয় আলংকারিক ভামহের মতামতগুলি আলোচনা করো।

৫. ভামহের মতে কাব্য কী?

৫.১.১.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. কাব্যালংকার – ভামহ

২. সাহিত্যদর্পণ – বিস্বনাথ কবিরাজ

৩. কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৪. অয়ারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব – সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৫. সৌন্দর্যতত্ত্ব –সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পঞ্চম পত্র

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২

দণ্ডী

বিন্যাসক্রম

৫.১.২.১ উপক্রমণিকা

৫.১.২.২ গুণপ্রস্থান

৫.১.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.২.১ উপক্রমণিকা

আলংকারিক দণ্ডীর গ্রন্থটির নাম 'কাব্যাদর্শ'। এটিতে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ, ৩৬৮টি কারিকায় ৩৬টি অর্থালংকারের আলোচনা আছে। দণ্ডী ভামহের অব্যবহিত পরব্রতী নাকি পূর্ববর্তী এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মনে করেছেন দণ্ডী বাণভট্টের (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্বর্তী লেখক। দণ্ডী মনে করতেন 'ইষ্টার্থ সংবলিত পদাবলীই কাব্য'। তাঁর মতে অলঙ্কার দুই প্রকার –স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। নিরলঙ্কার রচনা, রসশূন্য বা বক্রোক্তিশূন্য নিছক বর্ণনা যে কাব্য হতে পারে, একথা সাধারণ আলংকারিকেরা মানতেন না। কিন্তু নিজে কবি হওয়ায় অনুভব করেছিলেন স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠ ত্নময় বর্ণনার মধ্যেও চমৎকারিত্ব আছে। তাই স্বভাবোক্তি তাঁর কাছে আদি অলংকার। অলংকারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বাক্য অনলংকৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের 'অকালবসন্ত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন –

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।।

এখানে অনুপ্রাসের একটু আধটু ঝোঁক থাকলেও এর অর্থ একেবারে নিরলঙ্কার। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনো অলংকার সাজানো হয়নি। অথচ এর মনোমুগ্ধ বর্ণনা আমাদের আনন্দ দেয়। যারা অলংকারবাদী তাঁরা বলবেন এখানে অলংকার আছে তা হলো স্বভাবোক্তি অলংকার। এরকম নিরলংকৃত অপর একজন কবির রমণীয় অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হলো –

হে অচল, তব আঁখিতে আমার

আঁখি কারে পায় খুঁজি

যুগান্তরের চেনা চাহনিটি

আঁধারে লুকানো বুঝি।

(লেখন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোনো অলংকারের সাজসজ্জা নেই, অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাবের বন্যা। এই ভাবের জন্যই অনুভূতির বিশিষ্টতার জন্যই এগুলির কাব্যত্বগুণ যে মনকে আকর্ষণ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অলংকারবাদীদের এইসব উদাহরণগুলিতে খুঁজে ফেরেন স্বভাবোক্তি ও সমাসোক্তি অলংকার। ‘স্বভাবোক্তি’ এই নামটি অবশ্য প্রমাণ করে কাব্যত্বের জন্য বাইরের প্রসাধন না হলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন –

‘আমার গান ছেড়েছে আজ

সকল অলংকার।’

‘A coat’ শিরোনামে লেখা w.B.Yeats এর একটি কবিতাও প্রায় একই কথা বলে –

I MADE my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies

Form heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As through they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.

অর্থাৎ যে অলংকার কেবল বাইরের আভরণ হয়ে থাকে তা কখনোই কাব্যের প্রাণভ্রমরা হয় না। বৈষ্ণব কবি যখন লেখেন –

দুখিনীর দিন দুখেতে গেলো।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো।।

বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টি নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের কবি যখন লেখেন –

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু'

যুগের বন্ধ্যাভূমির উপর দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের কবি যখন লেখেন –

'We are the hollow men
We are the stuffed men'

আর একালের কবি যখন লেখেন –

'ভারী ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।'

তখন বাইরের অলংকার না থাকার সত্ত্বেও শসেগুলির কাব্যত্বের মুকুট পেতে অসুবিধা হয় না। আনন্দবর্ধন তাই 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে বলেছেন –

'রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্যঃ সোহলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ।।

এই 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্যঃ' বুঝিয়ে দেয় যে অলংকারকে কাব্যরসের প্রেরণা উৎস হয়ে উঠতে হবে। ভারতীয় আলংকারিকরা তাই 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' বলেই থেমে যেতে পারলএন না। কাব্যের আত্মার অন্বেষায় তাঁরা যাত্রা করলেন আরও গভীরে।

৫.১.২.২ গুণপ্রস্থান

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের মতে শব্দ, অর্থ, রস, ধ্বনি অলংকার প্রভৃতির মতো গুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যোপকরণ। গুণ হলো কাব্যের উৎকর্ষবিধায়ক ধর্ম – 'রসস্যউৎকর্ষকাগুণাঃ'। রসের উপকারক হয়ে রস ধর্ম রূপে কাব্যগুণগুলি কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। ভরত্মুনি তাঙর নাট্যশাস্ত্রে গুণগুলিকে দোষের বিপর্যয়রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু দোষের বিপর্যয়ই গুণ, তাই দোষ দশ প্রকার হওয়ায় গুণও দশ প্রকার – শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজঃ, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা ও কান্তি। তিনি কোনো গুণকেই স্পষ্টতঃ শব্দ, অর্থ অথবা রসাদির সাথে সংযুক্ত করেননি। অগ্নিপুরাণের মতে কাব্যে যা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই গুণ। আচার্য ভামহ 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে গুণ শব্দটির স্পষ্টতঃ উল্লেখমাত্র একবারই পাওয়া যায় – ভাবিক অলংকার প্রসঙ্গে। মাধুর্য, প্রসাদ ও ওজঃ এই তিনটি গুণই সম্ভবতঃ ভামহ স্বীকার করেছেন। ভামহের পর কাব্যাদর্শকার আচার্য দণ্ডী দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন –

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সকুমারতা।

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ।।

যদিও তিনি গুণের কোনো লক্ষণ দেননি, তবু ভরতের মতোই দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন। এই দশটি গুণকে বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ বলেছেন – 'ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।' আচার্য বামন কিন্তু 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ' গ্রন্থে গুণের লক্ষণ নির্ধারণ করে বলেছেন 'কাব্য শোভার জনক ধর্মগুলি হচ্ছে গুণ।' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে ধর্মগুলি কাব্যের শোভা সৃষ্টি করে সেগুলিই গুণ। তিনি দশটি শব্দগুণ ও দশটি অর্থগুণের আলোচনা করেছেন। বামন বৈদর্ভী, গৌড়ীয় ও পাঞ্চালী এই তিনটি রীতির উল্লেখ করেছেন এবং বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ বলেছেন 'সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী'। তিনি ভরত ও দণ্ডী স্বীকৃত গুনগুলিকেই স্বীকার করেছেন। ধ্বনিবাদীরাও বামনের মতো গুণকে নিত্য ধর্ম বলেছেন, তবে রসের নিত্যধর্ম বা রসের অব্যভিচারী ধর্মরূপেই তাঁরা গুণকে দেখেছেন। বস্তুতঃ ধ্বনিবাদীরা মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই গুণত্রয়কেই স্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে, কাব্যাত্মভূত রসেরই প্রকৃতপক্ষে মাধুর্যাদি গুণ থাকে। আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্ত উভয় আচার্যই বলেছেন যে, শৌর্যাদি যেমন আত্মার ধর্ম, শরীরের বা দেহের ধর্ম নয়, ঠিক তেমনই এই মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ নামক তিনটি কাব্যগুণও কাব্যাত্মরূপ রসেরই ধর্ম, শব্দ ও অর্থের ধর্ম নয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে দ্বিতীয় উদ্যতে বলা হয়েছে –

তমর্থমবলম্বন্তে সেহঙ্গিনং তে গুণা স্মৃতাঃ'

আচার্য মম্মট বলেছেন –

'যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।

উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুৎরচনাস্থিতয়ো গুণাঃ।।

মানুষের শৌর্যাদি গুণ যেমন আত্মার উৎক্রষের হেতু মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণ তেমনি অঙ্গীরসের ধর্ম এবং উৎকর্ষের কারণ। তিনি নিজেই এখানে আত্মার সঙ্গে রসের উপমা দিয়েছেন। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন –

'রসস্যঙ্গিত্বথাপ্তস্য ধর্মাঃ শৌর্যাদয়ো যথা গুণাঃ।'

জীবদেহের শৌর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি দেহীরূপে আত্মার গৌরব সাধন করে বলে তাকে গুণ

বলা হয়। কাব্যের শব্দার্থ হলো শরীর এবং রস হলো আত্মা। সুতরাং গুঙুলি যখন রসের উৎকর্ষ সাধন করে তখন শব্দার্থগুলির বইয়বহার কাব্যের সহায় হয়ে থাকে। গুণ দিয়ে যদি রসের ধর্ম হয়, তাহলে গুণ থাকলে রস অবশ্যই থাকবে, কারণ রসযুক্ত বাক্যই কাব্য। প্রাকৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের বিষয়ে প্রেম কবিতা প্রথম হালের 'গাথাসপ্তশতী' কাব্যেই পাওয়া যায়। এগুলিতে শৃঙার রস ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে এবং গুণের মাধ্যমেই স্পষ্ট রস প্রতীতি ঘটেছে এবং তা পাঠকবর্গের সহজবোধ্য হয়েছে।

৫.১.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। দণ্ডীর রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী?

২। প্রাচ্য আলংকারিক হিসাবে দণ্ডীর নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার পরিচয় দাও।

৩। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'গুণপ্রস্থান' বিষয়ে দণ্ডীর মতামত আলোচনা করো।

৪। দণ্ডীর মতে 'গুণ' কয়প্রকার?

৫। গুণপ্রস্থান কী? অলংকারশাস্ত্রে 'গুণ প্রস্থান' এর ভূমিকা কতটা বলে তুমি মনে করো।

৫.১.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কাব্যাদর্শ – দণ্ডী

২। সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত – গৌরীনাথ শাস্ত্রী

৩। কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা – অচিন্ত্য বিশ্বাস

৪। রসসমীক্ষা – রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম পত্র

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ৩

বামন

বিন্যাসক্রম

৫.১.৩.১ প্রস্তাবনা

৫.১.৩.২ সূত্রব্যাখ্যা : 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'

৫.১.৩.২.১ বামনের সূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা

৫.১.৩.৩ সূত্রব্যাখ্যা : 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'

৫.১.৩.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১.৩.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.৩.১ প্রস্তাবনা

'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ', 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' এবং'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' – এই তিন প্রবাদপ্রতিম উক্তির জনক আচার্য বামন। সম্ভবত নবম শতক তাঁর আবির্ভাবকাল এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কাব্যালঙ্কার সূত্র ও তার বৃত্তি। দণ্ডী, ভামহ, কুন্তক রীতি নিয়ে আলোচনা করলেও বামনের মতো গুরুত্ব আরোপ করেননি বলেই রীতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই বামন স্মরণীয় হয়েছেন। তিনি রসকে কাব্যের আত্মা হিসেবে মানতে চাননি। অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী বামনের রীতিপ্রস্থানকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন –'কাব্যের আত্মা রীতি, রীতির আত্মা গুণ, অতএব প্রকারান্তরে কাব্যের আত্মা গুণ... উপমাদি পারিভাষিক অলংকার তার শোভা বাড়িয়ে দেয় মাত্র।'

বামনের গ্রন্থটি সূত্রাকারে লেখা – এর মধ্যে পাঁচটি অধিকরণ আছে (শরীর, দোষ-দর্শন, গুণবিচার, আলঙ্কারিক, প্রয়োগিকা); শেষ পরিচ্ছেদে কাব্যশুদ্ধি বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৩৬টি অলঙ্কার ব্যাখ্যাত হয়েছে।প্রসঙ্গত বলা যেতে

পারে বামনের 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' সূত্রটির 'কামধেনু' নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর ভূপাল বলেছেন এই সৌন্দর্যার্থক অলংকার কাব্যকে উপাদেয় করে তোলে এবং কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় ও বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলেই কাব্যশাস্ত্রের অপর নাম অলংকারশাস্ত্র।

বামনকে উদ্ভটের সমসাময়িক বলে মনে হয় এবং রাজতরঙ্গিণী অনুসরণে জানা যায় তিনি কাশ্মীর রাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। আলংকারিক উদ্ভট ছিলেন ঐ রাজসভার সভাপতি। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৭৯-৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। উদ্ভটের প্রাত্যহিক বেতন ছিল নাকি একলক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ)। বামন, উদ্ভট ঐ প্রমুখ মন্ত্রিগণ আপন মনোরথের দ্বারা ঐ রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

৫.১.৩.২ সূত্রব্যাখ্যা : 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'

আচার্য বামনই প্রথম সূত্রাকারে অলংকারশাস্ত্র রচনা করেন এবং নিজের সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (বৃত্তি) করে সূত্রার্থ পরিস্ফুট করেন। এইকারণে তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'। এই গ্রন্থের দুটি মূল্যবান সূত্র হল- 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'।

অলংকারের জন্য কাব্য উপাদেয় হয় (কাব্যং খলু গ্রাহ্যম্ উপাদেয়ং ভবতি অলংকারাৎ) এবং সৌন্দর্যই অলংকার। অর্থাৎ কিনা সৌন্দর্যই কাব্যের শব্দার্থশরীরকে রমণীয় করে তোলে। অলংকার ছাড়া শব্দার্থ নিয়াতান্ত কেজো কথার ফিরিস্তি বৈ নয়।

প্রসঙ্গত কাব্য শব্দটির একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বামনের টীকাকার গোপেন্দ্রত্রিপুরহর ভূপাল তাঁর কাব্যালঙ্কারকামধেনু টীকায়(১/১) এ প্রসঙ্গে প্রচলিত নানা মত সংকলন করেছেন। ক) কবনীয়ং কাব্যম্ ইতি লোচনকারঃ। খ) কবয়তীতি কবিঃ, তস্য কর্ম কাব্যম্ ইতি বিদ্যাধরঃ। গ) কৌতি শব্দায়তে বিমৃশয়তি রসভাবান্ ইতি কবিঃ। তস্য কর্ম কাব্যম্ ইতি ভট্টগোপালঃ। লোকোত্তরবর্ণনানিপুণ কবিকর্ম কাব্যম ইতি কাব্যপ্রকাশকারঃ। ভামহোপি –প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা। তদনুপ্রাণনাজীবদ্ বর্ণনানিপুণঃ কবিঃ।। তস্য কর্ম স্মৃতং কাব্যম্ ইতি। 'কু' ধাতু (শব্দ করা অর্থে) –নিষ্পন্ন কাব্যশব্দের যৌগিক (etymological) অর্থ নিশ্চয় শব্দ দিয়ে ভাবপ্রকাশ। ভামহ কাব্যপ্রকাশকার মম্মট প্রমুখ আচার্যেরা তাই কবিপ্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত শব্দময় ভাবপ্রকাশকে কাব্য বলেছেন। বামনো বলেছেন সুশোভন শব্দার্থযুগলই তাঁর মতে কাব্যপদবাচ্য।

অলঙ্কার শব্দটির মূলে দুটি শব্দ অলম্ এবং কার। অলম্ - কৃ + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে) এবং অলম্ - কৃ + ঘঞ্ (করণবাচ্যে) এই ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে অলংকার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'অলংকৃতিরলংকারঃ সৌন্দর্যম্' (ভাববাচ্যে –আলংকারিক বান্ন তাঁর কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে সৌন্দর্য অর্থেই অলংকার শব্দটিকে প্রথমে ব্যবহার করেছেন। 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'আবার করণ বাচ্যে বলা হয় 'অলংক্রিয়তে অনেনেতি লংকারঃ' অর্থাৎ যার দ্বারা অলংকৃত করা হয়। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন সৌন্দর্য রূপ অর্থটি হলো অলংকার শব্দের ব্যাপক অর্থ বা সাধারণ অর্থ। এর দ্বারা কাব্যের যে কোনো প্রকার শোভাকর ধর্মকে বোঝায়। কিন্তু করণবাচ্যে নিষ্পন্ন অর্থ বা সাধারণ অর্থ। এর দ্বারা কাব্যের যে কোনো প্রকার শোভাকর ধর্মকে বোঝায়। কিন্তু করণবাচ্যে নিষ্পন্ন অর্থটি প্রথম অর্থের তুলনায় সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থ। এর দ্বারা উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অলংকারগুলিকে বোঝায়। অবশ্য এগুলি দ্বারাও কাব্যশোভা প্রাপ্তি হয় বলে এগুলিও কাব্যশোভাকর ধর্মের মধ্যে পরিগণিত

হয়। দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকগণ গুণাদি কাব্যোপাদানকেও কাব্যশোভাকর ধর্ম রূপে পরিগণিত করেছেন। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন – 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকরান্ প্রচক্ষতে' – এখানে অলংকার শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে। অনুপ্রাস উপমাদির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থেই অলংকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গুণ ও অলংকারের পার্থক্য করতএ গিয়ে আচার্য বামন বলেছেন –

'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ।' আবার 'তদতিশয়হেত বস্ত্বলংকারাঃ।' অর্থাৎ গুণসমূহ কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বিশেষ অলংকারগুলি অর্থাৎ উপমা রূপকাদি অলংকারসমূহ সৃষ্ট কাব্যশোভাকে বর্ধিত করতে পারে মাত্র। আচার্য দণ্ডী তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্লেষাদি দশ প্রকার গুণকে সাধারণ অলংকার বলেছেন, উপমাদি অলংকারগুলিকে সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে কাব্যশোভাবর্ধক রূপে স্বীকার করেছেন। আচার্য বামন কিন্তু পরিষ্কারভাবেই সাধারণ অলংকার ও বিশেষ অলংকারের পার্থক্য বুঝিয়েছেন। গুণ বা কর্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন অলংকার হলো – নিত্য, এটি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু উপমাদি অলংকার হলো অনিত্য অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে থাকে।

অলংকারশাস্ত্রকে ভূষণ শাস্ত্রও বলা হয়। অলংকারের সংজ্ঞায় আচার্য ভরত বলেছেন –

অলংকারৈর্গুনৈশ্চৈব বহুভিং সমলংকৃতম্।

ভূষনৈরিব চিত্রার্থৈস্তদ্ভূষণসিতি স্মৃতম্।।

ভরতের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে অলংকারও গুণ উভয়ই ভূষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, যমক, দীপক প্রভৃতি অলংকার এবং প্রসাদ, ওজঃ ও মাধুর্য গুণের মিলনেই কাব্য ভূষিত হয়। এই জন্যই অলংকারশাস্ত্রের অপর নাম ভূষণশাস্ত্র।

স্বর্ণাদি অলংকারের দ্বরা সজ্জিত হলে যেমন মানুষের দৈহিক শোভা বৃদ্ধি পায় তেমনি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, যমক প্রভৃতি অর্থালংকারও শব্দালংকার যুক্ত কাব্যদেহও শোভাযুক্ত হয়। শব্দ বা র্থের মধ্যে বিদ্যমান থেকে অলংকার কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসের উৎকর্ষ সাধন করে ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং অলম্ বা বিভূষণ করা হয় যার দ্বারা তাকে অলংকার বলে। অলংকারের সাধারণ অর্থ হলো সৌন্দর্য।

অলংকার কবিদের অজ্ঞাতসারেই কাব্য বা সাহিত্যে আপনি আত্মপ্রকাশ করে। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেন – 'অপৃথগ্ যত্ননির্বত্য সোহ্লংকারঃ ধ্বনৌমতঃ'। হাল বিরচিত গাথাসপ্তশতীতে হয়তও বা কবির অজান্তেই বিভিন্ন অলংকারের প্রকাশ ঘটেছে।

অলম্ শব্দটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো – 'সৌন্দর্য', আরেকটি অর্থ হলো গহনাদি অলংকার। বেদে অলম্ শব্দের মত একটি শব্দ পাওয়া গেছে সেটি হলো অরম্। এর অর্থও অলংকার। বেদের এই 'অরম,' শব্দের সাথে লাতিন'aurum' শব্দের মিল আছে। লাতিনে এই শব্দের অর্থ হলো সোনা। সোনা থেকেই আসে সৌন্দর্য।

সৌন্দর্য অর্থে অরম্ শব্দটি বেদে যেমন পাওয়া যায় তেমননি বৈদিক সাহিত্যে অলংকারের উপাদানও লক্ষিত হয়। কিন্তু অলংকারশাস্ত্র তখন রচিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্য হতে অলংকারের উপাদান সংগ্রহ করে পরবর্তী সংস্কৃত

অলংকারশাস্ত্রে অলংকারের অনেক আলোচনা ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। আলংকারিক ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃত অলংকারের আলোচনা লক্ষিত হয়। ভরতের পর আচার্য ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকগণ তাঁদের রচিত অলংকার শাস্ত্র সমূহে অলংকারাদির বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাকৃতভাষায় রচিত এখনো পর্যন্ত একটি অলংকারগ্রন্থ পাওয়া যায়, যদিও লেখকের নাম জানা যায়নি, গ্রন্থটি হলো 'অলংকারদপ্পণ'।

কাব্যশাস্ত্রে ব্ররতমানকালে রসতত্ত্বের পরই অলংকারতত্ত্বের স্থান। পূর্বাচার্যগণের নিকট অলংকারতত্ত্বই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়, কাব্যশাস্ত্র বা 'Poetics' ও তাই অলংকারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। কাব্যমীমাংসাকার আচার্য রাজশেখর লংকার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গ বলেছেন। এই শাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া বেদার্থেরও সম্যকজ্ঞান হয় না একথাও তিনি বলেছেন –

উপকারকত্বাদ্ অলংকারঃ সপ্তমম্ অঙ্গম ইতি যাযাবরীয়ঃ।

ঋতে চ তৎস্বরূপবিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ।।

অর্থাৎ অলংকারশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সৌন্দর্যশাস্ত্র বা কাব্যসৌন্দর্য বিজ্ঞান, ইংরাজিতে বলা যেতে পারে 'Aesthetic of Poetry' প্রাচীন আচার্যগণ অলংকার শব্দটি সৌন্দর্য অর্থে গ্রহণ করে কাব্যশাস্ত্র বা Poetics এর তদ্রূপ সার্থক নামকরণ করেছিলেন।

পরবর্তীরা অলংকারকে সৌন্দর্য শব্দ না বলে রস বলেছেন এবং পরে জগন্নাথ আবার সৌন্দর্যবাচক 'রমণীয়তা' শব্দই ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রসের যে মূল্য ও স্থান হচ্ছে সৌন্দর্যের। অলংকারশাস্ত্র এক সময়ে যথার্থই 'a treatise on beauty' বুঝাবো বামনের আলোচনা থেকে এ তথ্যই প্রমাণিত।

৫.১.৩.২.১ বামনের সূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা

'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' সূত্রটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে অতুল গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে এরূপ মত পোষণ করেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী। অতুলবাবু কাব্যজিজ্ঞাসায় বলেছেন ' শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলংকারের জন্য 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' – (বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে 'অলংকারশাস্ত্র'। কিন্তু একটু বিশেষভাবেব প্ররযালোচনা করলে দেখব উক্ত মতটি সম্পূর্ণ সত্যের বিপরীত। আসলে 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' –এর লংকারকে অনুপ্রাস উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা বলে পাছে কেউ ভুল করে এই আশঙ্কায় বামন স্বয়ংই পরবর্তী সূত্রে জানিয়ে দিয়েছেন 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' (১/১/২)। এ সোউন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য কবিকে চলতে হয় দোষ –পরিহার, গুণ-গ্রহণ এবং (অনুপ্রাস উপমাদি) অলংকার গ্রহণ এই ত্রয়ীর পথ ধরে ('স খলু অলঙ্কারঃ দোষহানাৎ গুণালঙ্কারাদানাৎ চ সম্পাদ্যঃ কবেঃ' – ১/১/৩ বামন বৃত্তি)। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম: অলঙ্কার (সৌন্দর্য্য) = অশ্লীলতাদি দোষ বর্জ্জন + মাধুর্য্যাদি গুণ যোগ + অনুপ্রাস উপমাদি যোগ। অন্যভাবে বলা যায়, 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' এর অলঙ্কার Beauty এবং উপমাদি হলো অন্যতম Beautifying Instrument ('করণব্যুৎপত্ত্যা' –বামন)। যতটুকু দেখলাম তাতে মনে হতে পারে যে বামনের মতে উপমাদি অলঙ্কার কাব্যে থাকতেই হবে। কিন্তু এরূপ মনে হওয়ার

কোনো কারণ নেই। কারণ বামন বলেছেন কাব্যের নিত্যধর্ম হচ্ছে ‘গুণ’ (৩/১/৩), অলঙ্কার অনিত্য। ‘রীতিরাত্মা কাব্যস্য’ (১/২/৬) – কাব্যের আত্মা রীতি। রীতি মানে ‘বিশিষ্টা পদরচনা’ (১/২/৭)। পদ রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? মাধুর্যাদি গুণে। যার নাম রীতি, সেই পদরচনার আত্মা হলো গুণ –‘বিশেষোগুণাত্মা’ (১/২/৮)। সহজ কথায় কাব্যের আত্মা রীতি, রীতির আত্মা গুণ; অতএব প্রকারান্তরে কাব্যের আত্মা গুণ অর্থাৎ রীত্যত্মক কাব্যগুণময় গুণেই তার শোভা। উপমাদি পারিভাষিক তথাকথিত লঙ্কার এই শোভা বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এইকারণে কাব্যে গুণ নিত্য, উপমাদি অনিত্য। যেখানে গুণ নাই, উপমাদি অলঙ্কার আছে, সেখানে কাব্যই নাই। একা পারিভাষিক অনুপ্রাস উপমাদির অলঙ্কারের কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতসও নাই অধিকারও নাই। এই চমৎকার কবিতার সাহায্যে বামন এই তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন। তার সারার্থ এই যুবতীর রূপলাবণ্যই আস্বাদন করেন রসিক; বাছাই করা দুচারখানা অলঙ্কারের রচনায় সে রূপ আরও উপাদেয় হয়। কিন্তু রূপলাবণ্য যখন খসে পড়ে, তখন লোকের লোচনরোচন নানা অলঙ্কার অঙ্গে চড়ালেও অঙ্গনাটির পান কেউ ফিরেও চায় না। বলাবাহুল্য তরুণীর রূপলাবণ্য কাব্যের প্রসাদ-মাধুর্য্যাদি গুণ; তার অলঙ্কার কাব্যের অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি। মোটামুটি এইভাবেই বামনের ‘কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ’ সূত্রের সত্যলোক দর্শন করিয়েছেন শ্যামাপদ বাবু।

এছাড়া আরও একটা বিষয় তিনি যোগ করেছেন, তা হলো অনুপ্রাস উপমা রূপক ইত্যাদির আলোচনা থাকার জন্য ‘কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র’ হয় নাই। সাধারণভাবে সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের অর্থাৎ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অলঙ্কারের তত্ত্বকথা আলচিত হওয়ায় কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারসাস্ত্র’। বামনের ‘সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ’ সূত্রটির কামধেনু নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর ভূপাল বলেছেন, এই যে সৌন্দর্যার্থক অলঙ্কার, যা কাব্যকে গ্রাহ্য অর্থাত উপাদেয় করে তোলে , এরই স্বরূপনির্ণয় আর বৈচিত্র্যব্যাখ্যান কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলে কাব্যশাস্ত্রও অলঙ্কারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৫.১.৩.৩ সূত্রব্যাখ্যা : ‘রীতিরাত্মা কাব্যস্য’

অলংকারবাদীগণ কাব্যের প্রধান ভূষণ হিসেবে অলংকারকে নির্দিষ্ট করলেও অলংকারকেই কাব্যের আত্মা বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে অলংকার যুক্ত করলেই তা কাব্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আবার এও দেখিয়েছেন যে অলংকার নেই তথাপি তা কাব্য ধর্মী হয়ে উঠেছে। আলংকারিক বামন প্রথম স্পষ্টভাবে জানালেন যে রীতি বা বিশিষ্ট পদ রচনাভঙ্গির জন্যই বাক্য অলংকৃত না হয়েও কাব্য পদবাচ্য হতে পারে। তাঁর মতে কাব্যের আত্মা হলো ‘রীতি’ -‘রীতিরাত্মা কাব্যস্য’ ‘রীতি’ বলতে বামন ‘বিশিষ্টা পদরচনা’ অর্থে বুঝেছেন। বামন তাঁর ‘কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি’ গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি যদিও ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদেরই মতকে অনুসরণ করেছেন, তথাপি তা৬র চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

বামনের মতে ‘বিশিষ্টা পদরচনারীতি’ অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনাই হচ্ছে রীতির প্রধান প্রতিপাদ্য। তিনি গুণ সমন্বিত পদ রচনাকেই ‘বিশিষ্টা’ শব্দের দ্বারা বিশেষিত করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি দশটি শব্দগুণ ও অর্থগুণ স্বীকার করেছেন এবং সেগুলিরর উপর ভিত্তি করেই তিনি রীতিবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শব্দার্থের সহায়তা ব্যতিরেকে কোনো রচনার আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয় কারণ শব্দ ও অর্থ রচনার দেহ ও সৌন্দর্য। তেমনি গুণাশ্রিত বিশেষ কোনো রীতিকে অবলম্বন করে রচনার শব্দার্থের মধ্যে সৌন্দর্য বিধান বিষয়টিকে বামন ‘বিশিষ্টা পদরচনারীতি’ বলে উল্লেখ করেছেন।

বামন তিন প্রকার রীতির কথা বলেছেন – বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী এবং ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতি কুড়ি প্রকার গুণের কথা বলেছেন। তিনি ওজঃ ও কান্তিগুণ সমৃদ্ধ রচনাকে গৌড়ী; মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণসমৃদ্ধ রচনাকে 'পাঞ্চালী' এবং সর্বগুণসমৃদ্ধ রচনাকে 'বৈদর্ভী' রীতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, তিনিএই তিন প্রকার রীতির মধ্যে বৈদর্ভী রীতিকেই সবথেকে মর্যাদা দিয়েছেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থে আলোচনা সূত্রে রীতিবাদের যুক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন – কাব্যের আত্মা হলো 'স্টাইল'। স্টাইল গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়। আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের স্মতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ 'রীতি'র বিষয়টিকে 'Style' কথাটির দ্বারা বুঝতে চেয়েছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে – Style is the man'। এক একজন কবি ও শিল্পীর রচনার নিজস্ব একটি ভঙ্গী থাকে; সেই ভঙ্গীর জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে মর হয়ে থাকবেন। ভঙ্গী বা form বিষয়টিই মুখ্য উপজীব্য বস্তু হয়ে দা৬ড়ায় সেখানে। তবে বামন যাকে 'রীতি' বলে উল্লেখ করেছেন, তা কেবল form নয় form এর অতিরিক্ত কিছু। এই অতিরিক্ত বিষয় বুঝাতে গুণের প্রসঙ তিনি আলোচনা করেছেন। গুণ ব্যতিরেকে রীতির কথা বামন চিন্তা করেননি। 'রীতিই কাব্যের আত্মা' বলতে গিয়ে তিনি আরও গভীরে প্রবেশ করে বলতে চেয়েছেন 'বিশেষ গুণ রীতিরই আত্মা'।

৫.১.৩.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বামন আনুমানিক কোন শতকের আলংকারিক ছিলেন?

২। বামন কোথাকার মন্ত্রী ছিলেন?

৩। বামনের রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থটির নাম কী?

৪। বামনের মতানুসারে কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

৫। সূত্র ব্যাখ্যা করো: 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'

৬। সূত্র ব্যাখ্যা করো: 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'

৫.১.৩.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি – বামন

২। সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত – গৌরীনাথ শাস্ত্রী

৩। কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা – অচিন্ত্য বিশ্বাস

৪। রসসমীক্ষা – রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাংলা (এম.এ) চতুর্থ সেমেস্টার

পঞ্চম পত্র

নন্দনতত্ত্ব ঃ প্রাচ্য

পর্যায় গ্রন্থ ঃ১

একক ঃ ৪ - কুন্তক

বিন্যাসক্রমঃ

৫.১.৪.১ ঃ প্রস্তাবনা

৫.১.৪.২ ঃ কুন্তক

৫.১.৪.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.১.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.১.৪.১ ঃ প্রস্তাবনা

বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা ছিলেন আচার্য কুন্তক। তিনি কাশ্মীরীয় আলংকারিক ছিলেন। আনুমানিক ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজানক কুন্তক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আচার্য কুন্তকের প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থটি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। তিনি বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন। বক্রোক্তি হচ্ছে বক্তার কথা সঠিক অর্থে গ্রহণ না করে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা। শ্রোতা অন্য অর্থ মনে করে সে অনুযায়ী উত্তর দেয়। কুন্তকের মতে, শব্দার্থের এ বক্রতার ফলেই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয় এবং তা পাঠককে আনন্দ দেয়। এখন আমরা ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কয়েকজন আলঙ্কারিকের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র'। অনুমান করা হয় গ্রন্থটি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের রচনা। তিনি প্রধানত নাট্যশাস্ত্রকার হলেও বাক্য, বাক্যবিন্যাস, বাক্যের দোষ, গুণ, অলঙ্কার, লক্ষণ ইত্যাদি এবং শৃঙ্গারাদি আট প্রকার রসের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এর পরবর্তীকালে আলঙ্কারিক কাব্যদর্শন প্রণেতা দণ্ডী (৬ষ্ঠ শতক)। তিনি মনে করেন - ''অলঙ্কারই হচ্ছে কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম।'' তাঁর মতে - ''কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।'' কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর পর কাব্যালঙ্কার প্রণেতা ভামহ (৭ম - ৮ম শতক) কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন -''শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম''। কেননা শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই কাব্য লেখা হয়। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবম শতাব্দীর প্রথম দিকের আচার্য্য বামন সূত্রাকারে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন। তিনি নিজেই এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা (বৃত্তি) দেন। এজন্য তাঁর গ্রন্থের নাম হয় - ''কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি''। আচার্য্য বামনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূত্র - ''কাব্যং গ্রাহ্যম্

অলঙ্কারাৎ'' (কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্য) আর ''রীতিরাত্মা কাব্যস্য'' (কাব্যের আত্মা রীতি)।

অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে এরপর আচার্য্য উদ্ভট এর নাম স্মরণীয়। তিনি 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে, অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেছেন - ''তাঁর যে গ্রন্থখানি (১৮৭৩-৭৪) খ্রিষ্টাব্দে জার্মান মনীষী ডক্টর বুহ্লার (Dr. G. Buhler) কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়, তার নাম 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ'। এখানি ভামহ রচিত কাব্যালঙ্কারের অলঙ্কার অংশ; উদ্ভট এতে নূতন অনেক তত্ত্ব (স্বকৃত) যোগ দিয়েছেন, সংশোধনও করেছেন অনেক। বইখানিতে উদাহরণ আছে পঁচানব্বইটি; তার মধ্যে চুরানব্বইটি উদ্ভট নিয়েছেন স্বরচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে। বলা বাহুল্য, কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুকরণ।'' (পৃ. ৩০১)

আচার্য্য উদ্ভট এর পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক হিসেবে ধ্বন্যালোক ছন্দে রচিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন। তিনি নবম শতাব্দীর শেষের দিকেই 'ধ্বনিকারিকার' বৃত্তি রচনা করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়। অভিনবগুপ্ত লিখেছেন - 'ধ্বনিকারিকার' 'বৃত্তি'র ব্যাখ্যা। তিনি নাম দিয়েছিলেন -'লোচন'। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী, তাঁর 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলেছেন - ''মনে হয় মূল বইখানির নাম 'ধ্বনিকারিকা', বৃত্তির নাম 'আলোক', টীকার নাম 'লোচন'।'' (পৃ. ৩০১) ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে, এরপর আলঙ্কারিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন - 'রুদ্রট'। ইনিও কাশ্মীরী ছিলেন। অনুমান করা হয়, নবম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'কাব্যালঙ্কার'। তিনি কাব্যসংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - ''শব্দার্থৌ কাব্যম্''।

রুদ্রট এর পরবর্তীকালে সে সময়ের বিখ্যাত আলঙ্কারিক হচ্ছেন রাজশেখর। গুর্জর- প্রতীহার বংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৯০-৯০৮ খ্রিঃ) তিনি ছিলেন আচার্য্য এবং সভাকবি। রাজশেখরের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'কাব্যমীমাংসা', গ্রন্থটি ৯৩০ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে রচিত বলে ধরে নেওয়া হয়। গ্রন্থটি আঠেরটি অধিকরণে বিভক্ত ছিল। তাঁর মতে রীতি ছিল তিনটি -বৈদর্ভী, গৌড়ী আর পাঞ্চালী। রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থটি - ''কতকটা বায়ু পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির অনুসরণে এবং অনেকখানি স্বকীয় কল্পনার যোগে রাজশেখর কাব্যের জন্ম, বিকাশ প্রভৃতির এক সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন।'' কাব্যমীমাংসা গ্রন্থটি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত গ্রন্থ। রাজশেখর কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন - ''গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যন্''।

৫.১.৪.২ ঃ কুন্তক

রাজানক কুন্তক বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা। প্রাচীন ভারতীয় তথা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বক্রোক্তিবাদ নন্দন তত্ত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বক্রোক্তি হলো বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গির সঙ্গে উক্তি। কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থের প্রথম উন্মেষের দশম কারিকায় বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন -

"উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী ভণিতি রুচ্যতে।"

অর্থাৎ বক্রোক্তি হলো বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গির সঙ্গে উক্তি। সর্বোপরি শব্দ ও অর্থ উভয়েই অলঙ্করণযোগ্য। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে রয়েছে অলঙ্কৃতি। আর অলঙ্কৃতি হল বক্রোতি যা বিদগ্ধ কবির প্রতিভা থেকে উৎপন্ন বক্রতা বা ভণিতি বৈচিত্র্য বা কবিকর্ম কৌশল। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় আলংকারিক আচার্য্য ভামহ "সকল অলঙ্কারকেই এক কথায় বক্রোক্তি বলেছেন এবং অতিশয়োক্তিকে বলেছেন একমাত্র বক্রোক্তি।" কাব্যের ক্ষেত্রে কবির বলার ভঙ্গি বৈচিত্র্যই হল 'বক্রোক্তি'। 'বক্র' শব্দের লক্ষিত অর্থ হল বঙ্কিমবাণী; যা ইঙ্গিতে ব্যক্ত, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর। আনুমানিক নবম শতাব্দীর আলংকারিক বামন 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে বক্রোক্তিকে বলেছেন - "সাদৃশ্য লক্ষণা বক্রোক্তি।" আবার আলংকারিক ভামহের মতোই আনন্দবর্ধনও বক্রোক্তিকে বলেছেন - 'অতিশয়োক্তি'।

কুন্তকের মতে কাব্য শাস্ত্রের মূল কথা হল বক্রোক্তি । ভাষার যে বৈচিত্র্য বা চারুতা, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব কাব্যের প্রাণ, তাই হল কুন্তক কথিত বক্রোক্তির ফল। কুন্তকের মতে - "সবরকম অলঙ্কার বক্রোক্তি অর্ন্তভূত; রস কাব্যের আত্মা নয়, কাব্যাত্মা বক্রোক্তিকেই অধিকতর উপভোগ্য করে তোলে রস; কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ ধ্বন্যালোকের 'ধ্বনি', কাব্যের আত্মা হতে পারে না, আত্মা বক্রোক্তি এবং প্রতীয়মান অর্থ বহুবিচিত্র বক্রোক্তিরই একটি বিচিত্র অঙ্গমাত্র।" অলংঙ্কার কেন সুন্দর, ধ্বনি কেন আনন্দ দেয়, রস কেন সহৃদয় সামাজিকের চিত্তকে তৃপ্ত করে এইসব প্রশ্নের উত্তরে কুন্তক বলেছেন - তিনেরই মূল বস্তু হল বক্রোক্তি। সুতরাং ধ্বনি বা রস বক্রতারই প্রকারভেদ বা প্রসারণ মাত্র।

রাজানক কুন্তকের মতাদর্শ অনুযায়ী বৈদগ্ধপূর্ণভঙ্গী সহ - ভণিতি বা উক্তি। কুন্তক স্বরচিত বৃত্তিতে এই সংজ্ঞার্থকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বৃত্তিতে লিখেছেন - 'বৈদগ্ধ' মানে হল 'বিদগ্ধভাবঃ কবি কর্ম কৌশল' অর্থাৎ বিদগ্ধের ভাব বা কবির রচনা কৌশল। কুন্তক 'ভঙ্গী' শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন - "বিচ্ছিত্তিঃ'। যাকে চারুত্ব বা রমনীয়ত্ব বা সৌন্দর্য বলা যায়। 'বক্রোতিজীবিতম্' গ্রন্থের ১৯ সংখ্যক কারিকায় কুন্তক বক্রোক্তির আরও পরিচয় দিয়ে তার বৃত্তিতে (টীকায়) বলেছেন -

" বক্রত্বং বক্রভাবঃ প্রসিদ্ধ প্রস্থান - ব্যতিরেকিনা বৈচিত্র্যেন উপনিবদ্ধঃ।"

আমরাজানি, শাস্ত্রে যেমন শব্দের প্রাধান্য। আর ইতিহাসে তেমন অর্থের বা বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে উক্তির বৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়। সেইজন্য বক্রোতা বা উক্তি বৈচিত্রের জন্যই কবিরবাণী যথার্থ কাব্য হয়ে ওঠে। আবার প্রসিদ্ধ প্রস্থান থেকে সরে আসলে, তা কখনই বক্রোতা নয়; কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা তদবিদ্ আহ্লাদকারী হওয়া চায়। কুন্তক বলেছেন অতিপরিচিত কথনভঙ্গী থেকে যা সম্পূর্ণ পৃথক তাই হল বক্রোতা। কেননা বক্তার কথা সঠিক অর্থে গ্রহণ না করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে, এবং পরবর্তীকালে সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া। শব্দার্থের এই কথনভঙ্গী থেকেই বা বক্রোতার জন্যেই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয়।

কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থে ছয় ধরনের বক্রোতার কথা বলেছেন। সেগুলি হল -

(ক) বর্ণবিন্যাস বক্রোতা

(খ) পদপূর্বার্ধ বক্রোতা

(গ) প্রত্যয় বক্রোতা

(ঘ) বাক্য বক্রোতা - যার বৈচিত্র্য অনন্ত।

(ঙ) প্রকরণ বক্রোতা (নাটকের একটা অঙ্কে)

(চ) প্রবন্ধ বক্রোতা - (সমগ্র কাব্যের বক্রতা)

বর্ণবিন্যাস বক্রোতা নির্ভর করে বর্ণের বিন্যাসের ওপর। বর্ণবিন্যাস বক্রোতার দ্বারা শব্দালংকার অনুপ্রাস ও যমক সৃষ্টি হয়। পদ পূর্বার্ধ বক্রোতার দ্বারা ভাব, লিঙ্গ, ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর প্রত্যয় বক্রোতার সাহায্যে কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, বাচ্য ও অব্যয় গঠিত হয়। এই ছয় ধরনের বক্রোতার মধ্যে বাক্য বক্রোতার মধ্যে আছে অপূর্ব চারুত্ব। প্রকরণ বক্রোতার মধ্যে দেখা যায় - কথোপকথন, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণন, ঘটনার পরিবর্তন, সন্ধি ইত্যাদি। কিন্তু প্রবন্ধ বক্রোতায় আছে সামগ্রিক সৌন্দর্য।

বাক্য বক্রোতার সঙ্গে প্রবন্ধ বক্রোতার যোগ দেখাতে গিয়ে কুন্তক, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের ৫ম সর্গ থেকে বক্রোতির উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন -

'' দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাম্
সমাগম প্রার্থনয়া কপালিনঃ।
কলা চ সা কান্তি মতী কলাবত
স্ত্বমস্য লোকস্যচ নেত্র কৌমুদী।।''

অর্থাৎ দুটি বস্তু কপালী বা মহাদেবের মিলন কামনা করে অতি সত্বর শোচনীয় অবস্থা লাভ করেছে। একটি হল কলাযুক্ত চাঁদের এই কান্তিমতি কলা, আর একটি জগতের নয়ন জ্যোৎস্না স্বরূপিনী উমা। কথাগুলি বলেছেন বটু

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী মহাদেব। তপস্যারতা উমা বা পার্বতীর প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার জন্য তারই আরাধ্য দেবতা মহেশ্বরের উক্তি। এখানে ভোলানাথের অনেক নাম থাকা সত্ত্বেও 'কপালী' শব্দটি প্রয়োগ করা হল কেন? এই প্রসঙ্গে আচার্য্য কুন্তক বলেছেন - এই কপালী শব্দটিতে রয়েছে বক্রোতা। কারণ এই শব্দটি বীভৎস রসের আলম্বন বিভাবের জুগুপ্সার সূচক হয়ে একটি সুন্দর বাচক বক্রোতার সৃষ্টি করেছে। কুন্তক আরো বলেছেন, জগতের যত বস্তু আছে তাদের ধর্ম বিবিধ। কিন্তু কবি চিত্তে তাদের সব ধর্মের মধ্যে সেই ধর্মটি প্রধান হয়ে ওঠে, যার দ্বারা তারা সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দ দান করতে পারে। সেই জন্যই সেই আনন্দের পরিপোষক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ বা দ্যোতনা দান করতে হয় শব্দার্থকে যা বক্রোতায় মণ্ডিত। সর্বোপরি ভাষার বৈচিত্র্য বা চারুতাই কাব্যের প্রাণ এবং কবির ভাষা সাধারণের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য এই ভাষা সাধারণ কথার অতীত; তাই অনির্বচনীয়।

কুন্তক বলেছেন - ''কবির স্বভাব নিবন্ধত্বেন কাব্য প্রস্থানভেদঃ অর্থাৎ কবির স্বভাব অনুযায়ী কাব্যের প্রস্থানভেদ বা রচনাগত পার্থক্য হয়। 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন - ''রীতিকে কুন্তক নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন - কবির স্বভাবে রীতির জন্ম, তাই নামরূপের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে একে বাঁধা যায় না।'' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের গুরুত্বটি তাই বিশিষ্ট। এবং এই বিশিষ্টতা আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্য সমালোচকদের আলোচনাতেও স্বীকৃত।

৫.১.৪.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের সংজ্ঞা দাও এবং একটি যথাযথ উদাহরণ দাও।

২। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আচার্য কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করো।

৫.১.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। অলঙ্কার চন্দ্রিকা – শ্যামাপদ চক্রবর্তী

২। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা – অধ্যাপক তরুণ মুখোপ্যাধ্যায় সম্পাদিত

৩। নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস

৪। কাব্যজিজ্ঞাসা পর্যালোচনা – অধ্যাপক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা (এম.এ) চতুর্থ সেমেস্টার

পঞ্চম পত্র

নন্দনতত্ত্ব ঃ প্রাচ্য

পর্যায় গ্রন্থ ঃ২

একক ঃ ৫ - বঙ্কিমচন্দ্র

বিন্যাসক্রমঃ

৫.২.৫.১ ঃ প্রস্তাবনা

৫.২.৫.২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র

৫.২.৫.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৫.১ ঃ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই সুনাম সর্বজনবিদিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা প্রবন্ধের কলা সৌষ্ঠব দান করেছেন। তাঁর লেখনীর গুণে বাংলা ভাষারও উন্নতি হয়েছে। আমরা জানি যুগানুগত্য সাহিত্যের পক্ষে জরুরি বিষয়। কেননা সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘনিষ্ঠ। যুগজিজ্ঞাসার সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার মেলবন্ধন অত্যাবশ্যক। সেইজন্য সময় এবং সমকালীন পটভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সাহিত্য। এখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে বাংলাসাহিত্যের অবস্থানটি নিয়ে আলোকপাত করবো। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুধর্ম আর সমাজ ছিল নানারকম কুসংস্কারে ভরা। এই রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ছিল সেই আবদ্ধ জলাশয়ের মতো। যে জলাশয়ের জলে স্রোত থাকে না, সেখানেই জমে পলি, পাঁক আর পোঁকা। রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ছিল ঐরকম। এই যখন অবস্থা তখন পাশ্চাত্যের প্রভাব এদেশে এসে পৌঁছাল। আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন - "একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল , কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।" (পৃ. ১৮.)

সেই সঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস অথবা ভাস ভবভূতি প্রমুখ প্রতিভাধর কবিরা সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য অমর বলেই অমৃত ফল স্বরূপ। "দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি

ঋষিগণ অমৃতফল বেঁচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন - বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য।'' কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মান কি ধরনের ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। সৎ সাহিত্য যেখানে দেশ আর দশকে অনুপ্রাণিত করে, ঠিক পথের সন্ধান দেয়। সেখানে সৎগুনে বঞ্চিত এই সাহিত্য মানুষকে দেহে-মনে দুর্বল করে দেয়। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল সত্যিই ঐ রকম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'বড়বাজার' প্রবন্ধে কমলাকান্ত দেখেছে যে সাহিত্যের বাজারের মুখটাতেই বড় বড় সব ঝলমলে সাজানো দোকান। ''এ কিসের দোকান, বালকেরা বলিল -'বাঙ্গালা সাহিত্য'। বেঁচিতেছে কে? আমরাই বেঁচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছে। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন। কিনতেছে কে? আমরাই। বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।'' বাংলা সাহিত্য নিজেই কাঁচকলা আর অপরকে দেখায় ঐ কাঁচকলায়। আর যাঁরা প্রাক্ বঙ্কিমযুগে লিখতেন তাঁরা বোধহয় লিখতেন শুয়ে শুয়ে কেননা কাঁচকলার ঝোল খাওয়া লেখকদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে বিরাজ করতেন কেবল মা ভবানী। আর তাঁদের মূলধন বলতে তো সংবাদপত্রের সংবাদ। যে সংবাদ বাদ দেয় মনুষ্যত্বকে, যে সংবাদ সৎ সাজায় মানুষকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে যাঁরা সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন একথা সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই সমগ্রভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতর রূপের সার্থক স্রষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সাহিত্য রচনা করেছেন, তখন গোড়াতেই ভেবেছেন দেশ এবং দশের কথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - ''নবীনা প্রতিভার অধিকারী''। এমনকি বিশ্বকবি আরো বলেছিলেন - 'নির্মল শুভ্র সংযত হাসি' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলা সাহিত্যে আনেন। উনিশ শতকের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিচার এবং মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি এবং ভারতীয় সাহিত্যের বিচার ও সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী প্রচলন করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাস রচনা করেন। সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য রচনায় তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

৫.২.৫.২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-১৮৯৪) বলা হয় সাহিত্যসম্রাট। তিনি ছিলেন মূলত রোমান্টিক শিল্পী। 'নবীনা প্রতিভার অধিকারী' বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক

ঔপন্যাসিক তিনি। প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয়। আবার 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকার সম্পাদক রূপেও তিনি পাঠকের কাছে সমাদৃত। এই মাসিক পত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ও রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই সময় এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাময়িক পত্রিকার প্রতিটি শাখাকে তিনি পরিপূর্ণতা দান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করেছেন, আর বাংলা পাঠকের হৃদপদ্ম সেই প্রভাতের কিরণে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ''পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি। কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক ভুলানো কথা - কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত। এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনি': এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গ ভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।''

আমরা এখন আলোচনা করবো তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মতামত গ্রহণে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নের দিকেও আলোকপাত করার প্রচেষ্টা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন চিন্তা-চর্চার ফলে তাঁর চিন্তন পদ্ধতির বিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যতাত্ত্বিক বক্তব্যেও ধারাবাহিকভাবে তিনি সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতি পেয়েছে বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধগুলিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের দিক থেকে বঙ্কিম সাহিত্যতত্ত্বের উন্মেষ- বিকাশ-পরিণতি পর্বের পরিবর্তনে ও পরিমার্জনায় কতখানি মননশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা দেখার বিষয়। আমরাজানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। অবশ্য বঙ্কিম পূর্ব যুগে তার পরিচয় পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে তা বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে ঈশ্বরগুপ্ত, 'সংবাদপ্রভাকর (১৮৩১), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৮৬০) কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃত্রসংহার' (১ম খন্ড-১৮৭৫) কাব্যের ক্ষেত্রে কেউই সাহিত্যিক সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিকে অতিক্রম করে যাননি। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি আধুনিক জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের কাব্য, নাটক রচনা করেছিলেন। সমালোচক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রসঙ্গে বলেছেন - ‘‘ সাহিত্য ও সাহিত্যের নানা বিষয় স্পষ্ট করতে গিয়ে সমালোচক হিসেবে তাকে অনেক সাহিত্যতত্ত্বের সূত্র দিতে হয়েছে। মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় তার পরিমান কিন্তু অনেক বেশী। মূলত সাহিত্যতত্ত্ব চিন্তায় তিনি ছিলেন ক্লাসিকপন্থী, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে পরিবর্তনও ঘটেছে। অনুকরণতত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন - কবিদের স্বাধীনতার কথাও বলেছেন, অনুকরণতত্ত্বকে বোঝাতে গিয়ে রোমান্টিক Wordsworth এর light that never was on sea or land এর কথা মনে রেখেছেন।’’ পৃ. ৩৫৫ (নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা - তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত ‘গীতিকাব্য’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন - ‘‘যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, - স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য- প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।’’ সংস্কৃত নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য এবং পঞ্চমবেদ। নাটককে সাধারণভাবে মিশ্র শিল্প বলা হয়। প্রাচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকরা দেখা ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাটক আবার উক্তি- প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপ ধর্মী রচনা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যতত্ত্বভাবনায় দেখিয়েছেন - মানুষের কোন কোন হৃদয়ভাবেরই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে, কথা এবং ক্রিয়াদ্বারা তা প্রকাশ করা সম্ভব, এবং নাট্যকার সেই ধরনের ভাবই নাটকের জন্য গ্রহণ করেন। যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, যা কথার দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নয়, তা যদি বিষয় হিসেবে নাট্যকার গ্রহণ করেন তাহলে কী অনর্থ ঘটে তাও বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন ভবভূতির ‘উত্তরচরিত’ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবিধ প্রবন্ধের ‘গীতিকাব্য’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন - ‘‘গীতের পরিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। .... দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটেনা। যিনি সুকবি, তিনি সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপ গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূর রহিল, আগের গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।’’ গীতিকবিতার আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের

উদ্ধৃত সাহিত্যতাত্ত্বিক মতাদর্শটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরাজানি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যথার্থ সাহিত্য বিচারের সূত্রপাত হয়েছে। সাহিত্য সম্রাটের সাহিত্যভাবনা ছড়িয়ে আছে নানা সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথমভাগ (১৮৮৭ খ্রিঃ), 'উত্তররচিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শককুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনো', বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে (১৮৯২ খ্রিঃ) 'ধর্ম ও সাহিত্য', 'বাঙ্গাঁলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', 'বাঙ্গালারভাষা' - এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মতাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮ খ্রিঃ) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অনুশীলন অংশে মনুষ্যধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় - ''সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। ..... আমাদের সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।'' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা কত ব্যাপক ও বৈচিত্রপূর্ণ, তাঁর সাহিত্য পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তা কখনই নীতি বর্জিত ছিল না। তাঁর জীবনাদর্শ গোঁড়া ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল জীবনমুখী, সমাজমুখী। আবার সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম জীবন বিমুখ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। যদিও তাঁর লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বলেছেন - ''চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে, সেটি কি ? .... উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন চিত্ত শুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা - কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না; কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তসুদ্ধি বিধান করেন।'' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মকে শুধু আনন্দ বলে মনে করেননি। এমনকী আনন্দদানের সচেতন উদ্দেশ্য আছে কিনা তাও গ্রহণ করেননি। সর্বোপরি তিনি মনে করেন কাব্য সার্থক হলে তা চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে বাধ্য। ''কাব্য মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং এই কাব্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।'' আসলে তিনি কল্যাণ ও সুন্দর দুইকে একাত্ম করে পেতে চান। 'উত্তরচরিত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন - ''কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। সেই সৃষ্টি প্রতিকৃতিমাত্র নয়।'' 'সাহিত্য তত্ত্ব' এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতির প্রয়োগ করে নতুন পথ দেখিয়েছেন। কাব্যবিচারে ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতি বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নীতিশিক্ষা যে গৌণ এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। ''যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু কল্যাণসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'' (বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যভাবনার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সাহিত্য সমালোচনায় পাশ্চাত্য

রীতিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি লিখেছেন - ''যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। কাব্য নাটক সমালোচনা ও সেইরূপ।'' (উত্তরচরিত- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুরু করেছেন। 'প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন - ''কবিত্ব ধরিতে গেলে Paradise Lost হইতে কুমার সম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমার সম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষায়, কোন মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ।'' আবার 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধ তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার একটি সুন্দর উদাহরণ। কবি কালিদাসকে বলা হয় প্রাচ্যের শেক্সপীয়র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় - ''শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা।'' সাহিত্যমান বিচারে কালিদাসের শকুন্তলা পাশ্চাত্যের কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়রের দুই বিখ্যাত নারী চরিত্র মিরন্দা ও দেসদিমোনা সম্পূরক। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা প্রত্যেকেই তাদের আপন গুণাবলীতে পরিপূর্ণ - ''দেশভেদ বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য হৃদয়ই থাকে।'' বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের এক বিশেষ অধ্যায়কে সমকাল ও উত্তরকালের পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। প্রকৃত অর্থে সমাজের প্রচলিত প্রথা, পদ্ধতি ও সংস্কার সম্পর্কে শকুন্তলা যতটা অভিজ্ঞ মিরন্দা ঠিক ততটাই অজ্ঞ এ সত্যটিই লেখক প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কালিদাসের শকুন্তলা ও কবি-নাট্যকার শেক্সপীয়রের দুই বিখ্যাত নারী চরিত্র মিরন্দা ও দেসদিমোনার সমপর্যায়ভুক্ত।

বাঙলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। বরঞ্চ গীতিকবিতার প্রাধান্য বেশি। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - '' বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চন্ডীদাসই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্তত চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি কবি।'' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সমালোচনা শক্তির স্বাক্ষর বর্তমান। লেখক বাঙালি কবি স্বভাবটিকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমন কবি জয়দেব বিদ্যাপতি সহ বাংলার গীতিকাব্যে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন - ''সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।'' অতএব সাহিত্য সমালোচনার মূখ্য কর্তব্য যে রসসম্মত ভাষ্য দান এবং ব্যাখ্যা প্রদান এই প্রবন্ধে অনুসৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনার অন্যতম সাহিত্যিক প্রয়াস হিসেবে বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। অভিনব প্রচেষ্টা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দান করেছেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির

কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমন্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীর বহুলোচন, অলসনিমেষ এই সকলের চিত্র বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে - বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়। তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।''

'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) প্রবন্ধের 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন- ''যে খুব সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ শরীরে যিনি আত্মা, তাঁকেই ডাকি।'' আসলে রূপের আরতি, সুন্দরের আরাধনা শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলার একমাত্র লক্ষ্য। তেমনি মানুষের জাগতিক সুখ-দুঃখ, উপভোগ, দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়, তা কেবলমাত্র আনন্দ আর সৌন্দর্যের উৎস। যে সৌন্দর্য ''প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন।'' (কণিকা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আমাদের সমাজে যারা প্রকৃত মহৎ এবং উদারমনা মানবতার আলোকে আলোকিত। সূর্য্যের মতোই তারা মহৎ এবং বৃহৎ। ফলে তারা কাউকে ছোট মনে করে না। তাদের চোখে ছোট বড় বলে কোন ভেদাভেদ নেই। এতে করে তাদের আধিপত্য এবং সম্মান দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ছোট্ট ফুলটি থেকে পর্বতমালা সিন্ধু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাকেই মানুষ ডেকে ডেকে ফিরেছে। যা অনাদী অনন্ত এবং অব্যয়- মানুষ তার কথায় কাব্যাদির মধ্যে জানতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তরের কমলাকান্ত ও দিতে চেয়েছে শিল্প, সাহিত্য, জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর। তা হল ললিত কলার অমোঘ আহ্বান আর আমন্ত্রণ। আর যাকে ঘিরে সে হল - 'সত্যম -শিবম-সুন্দরম্'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন গোড়াতেই ভেবেছেন দেশ ও দশের কথা। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' লেখার সময় তিনি যে গুরু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন তা তো বলাবাহুল্য। কিন্তু লেখক জানতেন যে রচনা সরস না হলে তা-

''না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল,
অতএব কহিভাষা যাবনী মিশাল।'' (অন্নদামঙ্গল-ভারতচন্দ্র রায়)

ফলে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি লঘু বর্ণনাভঙ্গি আর গুরুতর বিষয়ের এক সার্থক যুগলবন্দী। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে লঘু বর্ণনা গুরু বিষয়কে কতটা চিত্রাকর্ষ করতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে অধ্যাপক ব্রাহ্মণরা ধুতরা ফুল আর লেখকরা তেঁতুলের সঙ্গে যেখানে উপনীত। সস্তা বাংলা সাহিত্যকে পদী পিসির রান্নার সঙ্গে আর উন্নত

বিদেশী সাহিত্যকে মুসলমান খানসামার স্বাদু রান্নার সঙ্গে তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র রসবোধ আর সত্যভাষণের চরম করেছেন। আবার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি। এই লেখকেরা অপরের বই থেকে নকল করে চড়া দামে পাঠ্য বই প্রকাশ করেন। সেই পাঠ্য বই অপাঠ্য। আর ঐসব লেখক ঢেঁকির তৈরী করা চাল অর্থাৎ 'স্কুলবুক' গিলে আজকের পড়ুয়ারা চিররুগ্ন - বদহজমের রোগী-রোগিনী। 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে দেখা যায় - ''দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল।'' বঙ্কিমচন্দ্রর মতে সাহিত্য সৃজন হয় দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে। লেখককে তাই সবুজ মন নিয়ে সদা সতর্ক হয়ে পাঠকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সাহিত্য রচনা করতে হয়। এমনকী লেখকের রুচির উপরও নির্ভর করে সাহিত্যের গুণগত মান। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - ''সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।''

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন - ''সাহিত্য ও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। কিন্তু সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশমাত্র।'' ধর্মতত্ত্বের (১৮৮৮) ২৭নং অধ্যায়ে উদ্ধৃত মন্তব্যটি পুনরায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - ''কাব্যই এ বিষয়ে (চিররঞ্জিনী বৃত্তিসমূহের অনুশীলনে) মনুষ্যের প্রধান সহায়, তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃ প্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়।'' ঈশ্বরভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'জঘন্য কোঁতপন্থী' বলে চিহ্নিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র কোঁতের মানবতার দিকটি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের বিমূর্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে সমগ্র জগৎ সংসারে পরিব্যাপ্ত এক ব্যক্তিসত্তারূপেই গ্রহণ করেছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন-

> ''কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।
> তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।''

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে কয়টি বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখকের ভাষায় এইরকম।

'' (ক) মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

(খ) তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

(গ) সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

(ঘ) তাহাই সুখ।''

সর্বোপরি বলা যায়, মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করে স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - ''সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।''

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে রয়েছে লেখকের নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় দক্ষ শিল্পীর মতো রং তুলির আঁচড় দিয়ে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্র চিত্রণে উপন্যাসিকের সাফল্য নির্ভর করে চরিত্রগুলিকে কতখানি রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে অঙ্কন করতে পেরেছেন। তেমনি কোনও রচনাকে কাব্যের উপযোগী করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হলে, সেখানে রস থাকতেই হবে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে - ''শাস্ত্রমতে কাব্যরস হলো অমৃত।'' সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রস অপরিহার্য বিষয়। রস ছাড়া কোন কাব্য রচনা করা অসম্ভব। রস ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে ''আস্বাদন করা' অর্থাৎ যা আস্বাদ্য তাই রস। সহৃদয় সামাজিক হয়ে কাব্য পাঠককে সেই রস উপলব্ধি করতে হয়। রসকে লাভ করেই মানবজীবন আনন্দিত হয়। তাই সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হয় অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় - ''প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধহয় এইরূপ প্রভেদ ছিল এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।'' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে ভারতবাসী উজ্জীবিত হয়েছে। তিনি সবসময়ই নিজের কলমকে সৃজনের উৎসবে ব্যস্ত রেখেছেন। মানুষকে ভালোবেসে, মনুষ্য সমাজের উন্নতির কথা ভেবে সাহিত্য রচনা করেছেন। সর্বোপরি কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য হল আনন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রকাশকেই বলেছেন রসসৃষ্টি। সেইজন্য সব শিল্পের উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ''সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য''। তাই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে চিত্র, স্থাপত্য, নৃত্য, সঙ্গীত ও কাব্যের আগমন। মানুষের সৌন্দর্যবোধ সুন্দরকে অনুভব করতে পারে, সুতরাং কোনো সত্তাকে সুন্দর কি অসুন্দর হবে তা নির্ভর করবে কোনো ব্যক্তির সৌন্দর্য বোধের উপর। সর্বোপরি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সৌন্দর্য সৃষ্টিকে' সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য বলে মনে করলেও সাহিত্য যে 'সত্যমূলক' সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন।

৫.২.৫.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ম্পকে আলোকপাত করো।

২। সাহিত্য ও সাহিত্যের নানা বিষয় সর্ম্পকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত ব্যক্ত করো।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতাত্ত্বিক ভাবনায় ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজম এর মধ্যে স্পষ্টত একটি দ্বন্দ্ব আছে, মন্তব্যটি আলোচনা করো।

৫.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি বিবিধ প্রসঙ্গ - ড. রামেশ্বর শ

২। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা - অধ্যাপক তরুণ মুখোপ্যাধ্যায় সম্পাদিত

৩। সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

৪। নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য - অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস

৫। প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ - সম্পাদনা ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার

পর্যায় গ্রন্থ- ২

একক-১ ৬

রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাসক্রম :

৫.২.৬.১ প্রসঙ্গত

৫.২.৬.২ সাহিত্যের সত্য

৫.২.৬.৩ সাহিত্যে নবত্ব

৫.২.৬.৪ বাস্তব

৫.২.৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.২.৬.১ : প্রসঙ্গত

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে 'সাহিত্য' রচনার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কিভাবে তা রচিত হয়, তার ভিতরে-বাইরের নানা জিজ্ঞাসার উত্তরও খুঁজেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন ; গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাগুলি আসলে সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব-এর সার্বিক অন্বেষণ।

এই বিষয়ে আলোচনা চলেছে বিভিন্ন দেশে বহু যুগ ধরে। সূত্রপাত সুদূর অতীতে। পাশ্চাত্যে সক্রেটিস প্লেটো-অ্যারিস্টটল-তলস্টয়-হেগেল-মার্কস-গোর্কি-ক্রোচে-ব্রেখট-সার্ত্রে-কামু থেকে ভারতবর্ষে আচার্য ভরত-ভামহ-দণ্ডী-বামন-আনন্দবর্ধন-কুশুক-অভিনব গুপ্ত প্রমুখ তাত্ত্বিক-আলংকারিকেরা নানা কথা বলেছেন। তবে এইসব অভিমত-ভাবনায় যে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর মতো করে ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন। সেই ভাবনা-আলোচনা প্রধানত 'সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনী প্রতিভা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার বিকাশে সাবলীলভাবে জটিলতাকে সরিয়ে 'তত্ত্ব'-এর তালাস করেছেন। আলোচ্য 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সৌন্দর্য-নন্দনতত্ত্বকে যেভাবে আনন্দানুভবের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন তা নিয়েই এবার আমাদের বিশ্লেষণ পাঠ্য প্রবন্ধের অনুসরণে।

৫.২.৬.২ : সাহিত্যের সত্য

শিল্পে-সাহিত্যে স্রষ্টা প্রকৃতিকে অনুসরণ করেন, প্রাকৃত জগতের উপাদান এমনকী প্রকৃতির সৃজন প্রক্রিয়াকেও শিল্পী তাঁর সৃষ্টি কর্মে অনুসরণ করেন—প্রকৃতি থেকে বাস্তবজগৎ ও জীবন থেকে যে উপকরণ শিল্পী আহরণ করেন শিল্পসৃষ্টির সময় তার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর মনের মাধুরী, তাঁর কল্পনা। তাই প্রকৃতিকে অনুসরণ করেও শিল্পরূপ তাকে অতিক্রম করে যায় অনায়াসেই। শিল্প-সাহিত্য এই কারণে প্রাকৃত তথ্যের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। কবি আলোচ্য 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বলছেন "রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।" এখানেই শিল্পের স্বাধীনতা—শিল্পীর স্বাধীনতা। যে-কোনো শিল্পরূপ সৃজনের ক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পনাশক্তি বিশেষ সহায় হয় বলেই তা প্রাকৃত জগৎ থেকে গৃহীত উপাদান বা তথ্যাদিকে অতিক্রম করে যায়।

শিল্পে শিল্পী প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বিশুদ্ধ আনন্দরূপের সন্ধান দেন রসভোক্তাকে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় বা গতানুগতিক কোনো জীবনরূপকে শিল্পী তাঁর সৃজনকর্মে অবলম্বন করেন—কিন্তু, সীমা সংহত প্রয়োজনের জগতে বিষয়কে তিনি অসীম-অনন্তের অভিমুখী করে তোলেন। কবি কীট্‌স গ্রীসীয় ভস্মাধারকে অবলম্বন করে যে কবিতা রচনা করেছেন—সেই ভস্মাধার প্রয়োজন সাধনেরই বিষয়, কিন্তু কবি সেই ভস্মাধারে যে শিল্পমূর্তি খোদিত দেখেছিলেন, সেই মূর্তিই যেন তাঁর মনে অসীমের দ্যোতনা

এনে দিয়েছে। শিল্পীর এই যে, রূপসৃষ্টির প্রবণতা এতে প্রাত্যহিকতার স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তু, সেই প্রাত্যহিক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াও ওই অনুপম শিল্পরূপটি মানুষের মনকে অনন্তের, অসীমের অভিমুখী করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় শিল্প হল 'Expression of Personality' শিল্পীর Individuality জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও তাঁর যে স্রষ্টা সত্তা বা personality তা শিল্পসৃষ্টির সময় এই পার্থিব সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই সৃজন মুহূর্তে : 'We forget the claims of necessity' এবং "the spires of our temples try to kiss the stars and notes of our music to fathom the depth of the ineffable."

॥ তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ॥

মানুষের মন প্রতিনিয়তই যে প্রাকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে বিচরণ করে তার দু'টি দিক—একটি দিক হচ্ছে 'তথ্য' আর একটি দিক হচ্ছে 'সত্য'। কবি বলেছেন : "যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হল সত্য।" শিল্প-সাহিত্যের সত্য প্রাকৃত জীবনের সত্য এক নয়। ইতিহাস সত্য কারণ, ইতিহাস যা ঘটে গেছে অর্থাৎ পুরাঘটিত তার বিবরণ দেয়। দর্শনের (Philosophy) বিষয়াদিও সত্য—কেননা চিরন্তনের উপস্থাপনা থাকে দর্শনে। কিন্তু ইতিহাসের যে সত্য তা ঘটনানির্ভর এবং ব্যক্তিক, দর্শনের যে সত্য তা ঘটনানিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক। শিল্প-সাহিত্যের সত্যতা তার মধ্যেই নিহিত। এই সত্যকেই গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর poetics গ্রন্থে বলেছেন probability বা সম্ভাব্য। যা অতীতে ঘটেছে—এবং যা বর্তমানে ঘটে চলেছে। একজন শিল্পী তাকেই গ্রহণ করেন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কিন্তু যা ঘটেনি, অথচ ঘটলেও ঘটতে পারে (what may happen), ঘটা খুবই স্বাভাবিক—সেই সম্ভাব্যতাকেই গুরুত্ব দেন শিল্পী। আর তখনই শিল্পসৃষ্টির বিষয়টি প্রাকৃত হয়েও শিল্পীর মনোলোকে প্রবিষ্ট হয়ে নূতন মাত্রা লাভ করে। প্রকৃতি থেকে পাওয়া, জীবন থেকে সংগ্রহ করা শিল্পসৃষ্টির উপাদানগুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকে শিল্পী তাকে পূর্ণ করে দেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। যে শিল্পরূপ তিনি সৃষ্টি করেন তা প্রকৃতি জগতের হয়েও শুধুই সেটুকুকেই অঙ্গীকার করেন না; কারণ বহির্বিশ্ব থেকে সংগৃহীত শিল্পসৃষ্টির উপকরণগুলির অপূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছেন শিল্পী নিজের দক্ষতায়। শিল্পে কোনো বস্তু যে সত্য তা নির্ণীত হয় রসের ভূমিকায়। শিল্পীর হৃদয়লোকের স্পর্শেই কোনো বস্তু 'সত্য' হয়ে ওঠে। সে বস্তু এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে, যাতে মানুষের মন আনন্দের মূল্যে তাকে 'সত্য' রূপে বরণ করে নেয়—এখানেই সেই শিল্পরূপটি সৃজনের সার্থকতা, 'তথ্য' রূপে সেই বস্তু বা বিষয়টি যদি একেবারে 'যথাযথ' হয়—তাহলে অরসিকের প্রশংসা লাভ করলেও প্রকৃত রসভোক্তা তাকে একেবারে বর্জন করেন। 'তথ্য' মূর্ত করে তোলে 'বিশেষকে'। আর 'সত্য' অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের 'সত্য' তথ্যকে অবলম্বন করে নিশ্চিতভাবেই কিন্তু, অবলম্বন করেও তাকে অতিক্রম করে যায় অনায়াস দক্ষতায় 'বিশেষ'এর মাধ্যমে 'নির্বিশেষ'-কে রূপঋদ্ধ করেন। কবি বলেছেন— "ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরী লাগে না। ....ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তাহলে পুরোপুরি হিসেব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ হয়, আর ছবিই যদি সত্য হয় তাহলে হিসেবের খাতা বন্ধ করতে হয়।"

।। রসবস্তু ও তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এক মূল্য নয়।।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পের রূপ সার্থক হয় রসে। রসই হল আনন্দ। যে রূপ কেবলমাত্র বহিরঙ্গ বিষয়কেই আশ্রয় করে, যথাযথের হুবহু উপস্থাপন করে যদি সেই 'রূপ'টি 'শিল্প' রূপে পরিগণিত হয় না। শিল্প হুবহু-র উপস্থাপনা নয়। কোনো কিছু তৈরি করা হয় বাস্তব প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে-কিন্তু, 'সৃষ্টি'-র মাধ্যমে শিল্পী নিজেকেই প্রকাশ করেন কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদ এতে থাকে না। শিল্পসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ তাই নির্মাণ (Constructive) বলেননি, বলেছেন-'নির্মিতি' (Creative)। যে রূপ রসসৃজনে সমর্থ নয়, তা যথার্থ শিল্পরূপ নয়—রবীন্দ্রনাথ এই রূপকারকে শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করেননি, তিনি নিতান্তই craftsman। Artist-এর মতো স্বরাজ্যের অধিপতি নন তিনি। প্রাকৃত জগতের সত্য শিল্পীর কাছে প্রথমে 'মানসিক' হয়ে ওঠে, সেই মানসিক সত্যই পরে হয়ে ওঠে বিশ্বমনের। বাস্তব জগৎ ও জীবন তাই অবিকৃত রূপে শিল্পসৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে না। 'রূপদক্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'প্রয়োজন এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ ছাড়াও মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অন্য সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধেই রূপসৃষ্টি।... এইখানেই আর্টের মূলতত্ত্ব। আর্ট মানে কেবল চিত্রকলা নয়—মানুষের বিচিত্র রসসৃষ্টির কাজ।' আর এটি সম্ভব তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি পেলেই। 'রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের মতে, জগতের উপর বসে মনের কারখানা, মনের কারখানার উপরেও আছে বিশ্বমনের কারখানা। সাহিত্যের-শিল্পের সৃজন সেই উপরতলা থেকে। যে তথ্য মাত্র ছিল 'বিশেষ' তাই হয়ে ওঠে 'নির্বিশেষ'। শিল্পরূপের অভিযাত্রা তাই রসলোকে। এই যে রূপকে আশ্রয় করে রসে নিমজ্জনে শিল্পরূপের সার্থকতা, সত্যে উপনীত হওয়া। এ থেকে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সত্য বলতে তথ্যের সত্য থেকে উন্নীত বিষয়কে বুঝিয়েছেন—তথ্যের উপর সত্যের প্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন;—

"তথ্য জগতের যে আলোকরশ্মি দেওয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতের সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না।"

শিল্প-সাহিত্য উপলব্ধির জন্য চাই সহৃদয় 'হৃদয়সংবাদী'কে। যিনি বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে যে পার্থক্য তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারেন। বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয় জুড়ন ন গেল'—এ পংক্তিতে যে লাখ লাখ যুগ ধরে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগের কথা বলা হয়েছে তা তথ্যের বিচারে অসম্ভব। 'রূপের পাথারে' সত্যি সত্যি 'আঁখি' ডুবিয়ে দেওয়া যায় কী না বা 'যৌবনের বনে'র মধ্যে মন হারানো প্রকৃতই সম্ভব কী না, এ বিচার যাদের দৃষ্টি কেবল তথ্যপুঞ্জের মধ্যে সীমাসংহত তাদের। আভিধানিক অর্থ বা তথ্যসীমা অতিক্রান্ত হলেই প্রকৃত রসলোকে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে-বলে-কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।' শিল্পরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাই ব্যঞ্জনা বা suggestion খুবই জরুরি। স্রষ্টা তার রূপসৃজনে যতটা বলেন তার থেকেও বেশি বলিয়ে নেন রসিককে দিয়ে। শিল্পের ভাষাতো সংবাদ পরিবেশনের ভাষা নয়—'যে কোনো শিল্পরূপের যা বক্তব্য তা শুধু দর্শক-পাঠককে জানিয়েই সার্থক হতে পারে না—একইসঙ্গে তাদের হৃদয়কে বহির্বিশ্বের তুচ্ছতা থেকে ঊর্ধ্বে উন্নীত করে—রসগ্রহীতাকে প্রাণিত করে। তাই, শিল্পের ভাষাকে হতে হয় ভাবগর্ভ-ব্যঞ্জনাবাহী-ইঙ্গিতধর্মী। তখনই

তথ্যের অপলাপ ঘটলেও সত্যের দাবি প্রধান হয়ে ওঠে। তাই তথাকথিত অবাস্তব বিষয়গুলি যেমন—'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু' বা 'Ten thousand daffodils saw I at a glance' বা 'যব গোধূলিসময় বেলি / ধনি মন্দিরবাহির ভেলি, / নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্বপসারি গেলি' ইত্যাদি ছন্দবন্ধে, বাক্য বিন্যাসে, উপমা - সংযোগে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে এমন একটি সমগ্রতার রূপ পরিগ্রহ করে যা মূল বিষয়ের অতীত এবং অনির্বচনীয় শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বমানবমন থেকে। পার্থিব বিষয়কেই 'মন'-শিল্পীর মন গ্রহণ করে রূপসৃষ্টির অনন্য উপকরণ রূপে—আর সেই মানসসত্যকেই এমন একটি 'বিশেষ' রূপে উপস্থাপিত করেন যখন তাকে আর বহির্বিশ্বের কোনো বিশেষ উপকরণ বা ব্যক্তিক কোনো বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায় না—তা হয়ে ওঠে সমগ্র মানবের। সাহিত্যের সত্য তাই প্রামাণ্য নয়—"সার্ভে বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে" গেঁথে সাহিত্যের সত্য, truth (fact নয়)-কে নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই জানিয়েছেন অসাধারণ রূপে:

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

৫.২.৬.৩ : সাহিত্যে নবত্ব

'সাহিত্যের পথে'-র অন্তর্গত 'সাহিত্যে নবত্ব' (জাভা থেকে বালি যাবার পথে ৬ ভাদ্র, ১৩৩৪-এ রচিত) প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল, 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)। আধুনিক সাহিত্যিকদের গণসমর্থন লাভের মানসিকতাকে তিরস্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। যশোপ্রার্থী সাহিত্যকারদের কারণেই যে সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমে ঊষর হয়ে উঠছে, প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি থেকে শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তুলছে সেই কথাও ব্যক্ত হয়েছে এই প্রবন্ধে। নব্যযুগের সাহিত্য-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অভিমত-দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধে।

সাহিত্য বা শিল্পকলার সৃষ্টি এবং উপভোগের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যিনি দিচ্ছেন অর্থাৎ সৃজন যিনি করছেন তাঁর লক্ষ্য কিন্তু রসজ্ঞ উপভোক্তা—সাহিত্য রচনায় পাঠকের যে বিশেষ একটি ভূমিকা আছে সেই চিরন্তন সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রাবন্ধিক 'সাহিত্যে নবত্ব'—শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনাতেই—

'যে লোকের অন্তরেই বিশ্বস্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তাহলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তাহলে বাইরের নিত্যমুখরতাকে তিনি দূর থেকে নমস্কার করে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।'

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম দেশকালের ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে চিরন্তন মানবমন তার মুখাপেক্ষী। কবি বলছেন যে, সমাজে এই শ্রেণির পাঠক রসগ্রহীতা বা সমালোচকের সংখ্যা বেশি সেই সমাজে সাহিত্যকারের শক্তিও অনেক—এবং সেই শক্তি কোনো নেতিবাচক নয়। পাশ্চাত্যের যে শিল্প-সাহিত্যের বোধ তাতেও এই বিশ্বমানব হৃদয়ের চিরায়ত দাবিই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে শিল্পকলায় সমসাময়িকের সরাসরি প্রকাশকে গ্রহণ করতে পারেননি, তাই কবির মতে, লেখকের মনে যদি বিশ্বমানবমন-যে মানবমন দেশকালের অতীত-তার প্রবেশাধিকার থাকে তাহলে তিনি বাইরের শ্রোতাদের-পাঠকদের অনুরোধ উপরোধে 'নগদ-বিদায়ের লোভ' সম্বরণ করতে সক্ষম হবেন। কবির মতে, বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ। শিল্প-সাহিত্যের বাহ্য উপযোগিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'গরজের ফরমাশ' বলেছেন। আর, কবির মতে, তখনই "ইকনমিক্সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিওলজির গোল্ড মেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে ধর্না দিয়ে বসেন।" সাহিত্যে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বা দেহতত্ত্বের প্রবেশাধিকার থাকবে না,—এমনটা ঠিক বলা চলে না। কারণ, কোনো সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সেই সমাজের মানবিক সম্পর্কের দিকগুলিকেও প্রভাবিত করে। কবির মতে, সাহিত্যের বিষয়ই হল মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র। এই মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র সন্দেহাতীত ভাবেই দেশ-কাল অর্থাৎ সাম্প্রতিকের দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই, সাহিত্যে জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক বিশেষ কোনো পরিমণ্ডল, বা জৈবিক-শারীরবৃত্তিয় বিষয়াবলীর প্রসঙ্গ আসতেই পারে, কিন্তু তা যেন যথার্থ শিল্পিত হয়েই আসে। কারণ, কোনো একটি ভালো কবিতা বা ছোটগল্পে সরাসরি 'ইকনমিক্স', 'সোসিওলজি' বা 'বায়োলজি'-র অধ্যাপকের জ্ঞানগর্ভ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়াদি আশা করবেন না পাঠক। সাহিত্যিক প্রবহমান জীবনের যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করতে পারেন এবং সাহিত্যে যখন তাকে রূপায়িত করেন তখন তা আর বর্তমানকালে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোনো এক বিশেষ মুহূর্ত বা খণ্ডকাল থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে শাশ্বত কালের জন্য গড়ে তুলতে হলে সুবিশাল নিরবধি কালসীমার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যই প্রয়োজন। ক্ষণকালের কিংবা বর্তমানের মাপকাঠিতে তাই কাজ চলে না। অর্থনীতি, শারীরবিদ্যা বা সমাজতত্ত্বের যে-কোনো বিষয়ই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাকে শাশ্বত কালের উপযুক্ত করে গড়ে নিয়ে আসা হয়। তা না হলে সোসিওলজি, বায়োলজির পাঠ্যবই-এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো বিশেষ রূপের তফাত করা যাবে না। লেখকের বা শিল্পীর 'মানবত্ব' বা সৃজনী প্রতিভা এ সবকিছুকে আপনার করে নিয়ে ক্ষণকালের বস্তুকে চিরন্তন করে তোলে।

সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃতজগতের সঙ্গে সাহিত্যজগতের সম্বন্ধ বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতজগতের উপরে আছে মনের কারখানা—প্রকৃতি থেকে সেখানে বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদান গৃহীত হচ্ছে। সাহিত্যিকের মন যাকে বলা হচ্ছে 'নিজত্ব' তা কেবলই সংগ্রহ করছে। পার্থিব যে-কোনো বিষয়ই এখানে প্রবেশ করতে পারে। বিশ্বমানবমন তথা 'মানবত্ব' অংশে চলে ঝাড়াই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন, সম্পূরণ-সংশোধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া। সাহিত্যের বিষয় যেহেতু মানবহৃদয়-মানবচরিত্র সেইহেতু মানুষের জীবনের মূল সমস্যা যে যে বিষয়ে কেন্দ্রীভূত—সাহিত্যকার উপেক্ষা করতে পারেন না সেই বিষয়াবলীকে। তাই, সোসিওলজি বা বায়োলজির বিষয় সাহিত্য-শিল্পের অঙ্গীভূত হতেই পারে, তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, জীবনের সমস্যা বা তার সমাধানের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলির ভূমিকা কীভাবে উপস্থাপিত হতে পারে সেই দিকগুলিকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত করলে তাও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কারণ, পরিবেশ-

পরিপার্শ্ব পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে মানবমন ও মানবচরিত্র। যা সাহিত্যিকের অন্যতম বিচার্য-বিষয়, বিশেষভাবে অবলম্বনের বিষয়। মানবিক স্তরের যে-কোনো বিষয়ই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তার বিচার তখন হওয়া উচিত শিল্পের নিরিখেই।

॥ চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশ করাই সাহিত্যের 'ওরিজিন্যালিটি' ॥

পাশ্চাত্যে যে শিল্প আন্দোলনের প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে তার প্রভাব দেশীয় সাহিত্য-শিল্পকলায় পড়ছে বা সহজেই পড়তে পারে বলে তিনি সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অর্থনীতি - সমাজনীতি বা শারীরবিদ্যার পণ্ডিতদের অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন। 'সাহিত্যধর্ম' নামক প্রবন্ধেও তিনি গণসমর্থন লাভের জন্য যেসব সাহিত্য স্রষ্টার বাসনা তাদের তিরস্কার করেছেন, অতিরিক্ত গণসমর্থনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 'হাটের হট্টগোল' সৃষ্টি হবে তা-ও জানান।

জ্ঞানের বিষয়ও সত্যবস্তু, তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, দেশকালে তার রূপ এক-হৃদয়ের রঙেও তাকে রক্ষিত করে তোলার সুযোগ নেই। যেসব বিষয় অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর-রঙ-ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হয়ে উঠলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাই সাহিত্যের সামগ্রী সাহিত্যের বিষয়। এ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশের কথা বলেছেন। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বজগৎ আমাদের মনোলোকে যে ছায়া ফেলে, তার সঙ্গে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা মনের মধ্যেই এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করি। সেই জগতে তাই যেমন থাকে বহির্জগতের তথা প্রাকৃত জগতের প্রতিচ্ছায়া, তেমনই থাকে আমাদের অনুভূতি দ্বারা অধিগত অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস। ফলে, অনিবার্যভাবেই, বহির্বিশ্ব আমাদের মনের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নানা রসে, বহু বর্ণ বিভায় নব নব রূপে রূপায়িত হচ্ছে প্রতিভাত হচ্ছে। যিনি শিল্পী তিনি মনের এই নব সৃষ্ট, নবলব্ধ জগৎটিকে যুগে যুগে বিশ্বমানবহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন বলেই চিরপুরাতন হয়েও তা নিত্য নবীন রূপে প্রতিভাত। চিরন্তন যে মানবিক আবেগ-প্রবৃত্তি তাকে নিত্য নূতন করে উপস্থাপিত করাই সাহিত্যকারের-শিল্পীর কাজ। নব নব রূপে নিত্যকালের রসজ্ঞের হৃদয়ে একে প্রবাহিত করে, সঞ্চারিত করে দেওয়াতেই সাহিত্যের-শিল্পের সার্থকতা। এই চিরন্তন ভাবকে নিজের মনের জারক রসে জারিত করে, রূপের মধ্যে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা এনে, বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা এনে, ভাব-ভাষা-ছন্দে অভিনবত্ব সঞ্চারিত করে, তাকে সর্বসাধারণের করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে এই বিষয়েই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, দিঘি বলতে জল এবং খনন করা-উভয়ই বোঝায়। যদিও এর মধ্যে প্রয়োজনের বিষয়টি হল জল ; জলের জন্যই দিঘিটি খনন করা হয়েছে। কিন্তু, এই জলের জন্য দিঘির খননকর্তার কোনো কৃতিত্বই নেই। জল মানুষের সৃষ্টি নয়-তা চিরন্তন, কিন্তু কোনো কীর্তিমান মানুষ সর্বসাধারণের উপভোগের জন্যই দিঘিতে খনন করে, তাকে সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে দিয়ে সেই জলকে, অন্যের সহজলভ্য করে দিলেন, অর্থাৎ যে জল আগেও ছিল, খননকর্তা তাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা হল,—বিষয় (Subject), ভাব (Idea) বা তত্ত্ব (Theory)। এটি বরাবরের—চিরন্তন, সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত। লেখক তাকে নূতনভাবে আবিষ্কার করে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।" এবং এখানেই এর অপূর্বতা বা Originality। ভাষাকে 'বেঁকিয়ে-চুরিয়ে', অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবকে মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে 'ডিগবাজি খেলিয়ে', পাঠকের মনকে 'ঠেলা মেরে', চমকে দেওয়াতে কোনো সাহিত্যিক উৎকর্ষ যে নেই, সেই ধারণাতে স্থিতধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমসাময়িক কালে যে সেই ঘটনাই ঘটছে এ কথাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

মহৎ ও তুচ্ছ, 'ভালো' ও 'মন্দ'-র ভেদ অস্বীকার করে কোনো কিছু না-মানাকেই, যারা বিশেষ করে মানে, তারা পৌরুষের নামে প্রশ্রয় দেয় কাপুরুষতাকে।

এই প্রসঙ্গেই 'সাহিত্যে নবত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে এসেছে ডাডাইজম্-এর কথা, পাঠকের মনকে চমকে দিতেই এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যে। জুরিখে ট্রিসট্রানৎসারা, মার্সেল ডুকাম্প, ফ্রান্সিস পিকরিয়া-রা উনিশ শতকের শেষ দশকে এই সাহিত্য ভাব-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ডাডাবাদ মানুষের মনের অবচেতনের স্তরটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল। পূর্বানুসরণ-পূর্বানুবর্তন থেকে সরে এসেছিল তারা—প্রত্ন ঐতিহ্য-মূল্যবোধকে নির্বাসিত করে। মানুষের সব চিন্তা, ভাবনা যেহেতু সরলরৈখিক নয়—মানুষের মন যেহেতু অজস্র বিপরীতমুখী আবেগের সমাহাব—সব চিন্তা ভাবনা স্বচ্ছ-স্পষ্ট-দ্বন্দ্বোতীর্ণ-সুসংলগ্ন নয় তাই কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে যে সমস্ত ভাব (Idea)-ভাবনা (Thought)-কে সুস্পষ্ট করে তুলবে, চিন্তার জগতে পারম্পর্য থাকবে, কোনো উল্লম্ফন থাকবে না, ছন্দোবদ্ধ পদে চিন্তা করে চলবে—এমনটি তো হতে পারে না। সেই মানুষের সৃষ্ট চরিত্রেরাও তাদের স্রষ্টার একাধিপত্য স্বীকার করে নেবেন, এমনটি হতে পারে না—তাই, তাদের মতে, সাহিত্যের আঙিনায় যা ঘটে চলেছে তা মিথ্যাচার। রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় আলোচ্য প্রবন্ধে এই আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে—'জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে-অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।' পাশ্চাত্যের এই সাহিত্যান্দোলন তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'চৈতন্যের বিকার' এবং এদের সাহিত্য সৃষ্টিতে 'আলাপের চেয়ে প্রলাপই অধিক'।

পাশ্চাত্য সাহিত্য যে তাদের এই বিকার থেকে উত্তরণের শক্তি খুঁজে পাবে—সেই বিশ্বাস ছিল কবির। কিন্তু, পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী বাংলা সাহিত্যে এর যে প্রভাব দেখা দেবে তা কাটিয়ে ওঠা খুব সহজসাধ্য নয়—'বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল আমলের নূতনত্বের ও কতকগুলো বাঁধি বুলি' সংগ্রহ করে রাখে। শক্তির এক নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা দুঃসহ বলে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। শক্তিহীন 'বাঁধি বুলি' আর 'বাঁধা গত'-কে অবলম্বন করেই তাই প্রবহমান সাহিত্য এগোতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে তার এই এগোনোর মধ্যে বীরত্বের বীর্য প্রকাশ প্রায় থাকে না বললেই চলে-কারণ—বাহাদুরি আর সাহসের মধ্যে ভেদ অনেক।

'ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।'

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি যে সময় লিখিত হচ্ছে সেই সময় বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লোকেরা নিজস্ব চিন্তা ও মতাদর্শ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তার অনুজ রবীন্দ্রপ্রভাবিত লেখক-কবিদের ভাব ও ভাবনার বলয় থেকে সরে এসে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই নব্য আন্দোলন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাব আন্দোলনকে অঙ্গীকার করেছিলেন তারা। বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কার ও তত্ত্ব-তথ্যাদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। এ সব কিছু রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেনি কখনো। কারণ তিনি সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন নবীনকে। তাই সহজ ভাবেই বলতে পেরেছিলেন—'তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে ; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।.....বোঝা যায় যে বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।' এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, রবীন্দ্রনাথ নূতনকে স্বাগত জানিয়েছেন অকুণ্ঠভাবেই। কিন্তু, যে কবি বা লেখক প্রকৃতপক্ষেই শক্তিহীন তাদের পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, কৃত্রিম ভাব-ভাষার-আবেগের যথেচ্ছ প্রকাশ তাকে পীড়িত করেছিল। গভীর কল্পনা, বলিষ্ঠ ভাব-চেতনাই তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকদের এই পথে ঠেলে দেয় বলে কবির বিশ্বাস। বিলিতি পাকশালায় তৈরি রিয়্যালিটির কারি পাউডার দিয়ে তারা তাদের সৃষ্টির অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইছে। 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'-র কাছে উপভোগ্য-আস্বাদ্য করে তুলতে চাইছে। এই মনোভাব-এই দৃষ্টিভঙ্গীই কবির কাছে 'নির্লজ্জ' বলে মনে হয়েছে। 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম' এই দুটিই এখন সংস্থিত হচ্ছে সাহিত্যের-কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে। কাজেই কাব্য-সাহিত্যকে স্বাভাবিক গতি প্রদান করতে গিয়ে এই শ্রেণীর লেখকেরা তাদের স্বাভাবিকত্বকেই হরণ করে নিচ্ছেন। লেখক বা শিল্পী সাহিত্যে রিয়্যালিটি বা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটাতে সমসাময়িক সময়পর্বের অর্থনৈতিক দারিদ্রের ছবি আঁকেন। যে জীবনের ছবি তিনি আঁকলেন সেই জীবনের অথবা পরিবারের সঙ্গে কাজে কথায় তার সত্য আত্মীয়তা না থাকলে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনরূপ বর্ণনা করা অনেকটাই পরিণত হবে-'শৌখিন মজদুরিতে'। তা না হলে এ হয়ে উঠবে ভাবের ঘরে চুরির নামান্তর। 'লালসা'-বিষয়টিকে সাহিত্যের-শিল্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। খুব সহজেই মানুষের আদিমতম এই প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টায় অনেকে অধনী কিন্তু, এও কৃত্রিম সস্তা প্রয়াস বলেই তাঁর অভিমত। বাহ্যেন্দ্রিয়ে যা নেহাতই শরীরকেন্দ্রিক এবং যেখানে 'মন' নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি নেই সেখানে লালসাব্যঞ্জক সাহিত্য অনায়াসে ইন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়। কিন্তু এ হেন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে আপাতদৃষ্টিতে যে পৌরুষ, যে সাহসের প্রকাশ তাকে রবীন্দ্রনাথ 'নির্লজ্জতা বলেছেন।

তাই রিয়্যালিটির কারি পাউডার দিয়ে সাহিত্যকে উপভোগ্য-স্বাদু করে তোলার চেষ্টা কেউ কেউ করলেও তাকে 'সস্তা বীরত্ব' বলেই অভিহিত করেছেন লেখক। 'যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে, সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।' একেই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যিক কাপুরুষতা বলেছেন, কারণ, 'দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয়

করতে যদি না বাধে তাহলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়।' নূতন যুগের সাহিত্যকারদের শক্তিশালী-বলিষ্ঠ-দৃপ্ত কল্পনাকে-প্রতিভাকে-সামর্থ্যকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু 'তাল ঠোকা পাঁয়তাড়া মারা পালোয়ানি' বা 'বাঁধি গতের' 'বাঁধা বুলি'-র পৌনঃপুনিকতা বা 'নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রাপালা'-র সাহিত্যিক প্রকাশের প্রতি কবির বিরাগ ছিল। নব্যতন্ত্রীদের প্রতি তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

"যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য।"

৫.২.৬.৪ : বাস্তব

শিল্প-সাহিত্যের সার্থকতা রসের জগতে। রসই নিত্যবস্তু—'বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সত্যের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কল্লোলের কালের লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-সাহিত্যে অন্তঃসারশূন্য ভাবলোক, রসলোক এবং জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-পঙ্কিলতার দিকটির অনুধাবনে সাহিত্যে উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের অনীহা, অক্ষমতা, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোক, আনন্দবাদকেই ধ্রুব বলে গ্রহণ করার মানসিকতাকে আক্রমণ করেছিলেন তীব্রভাবে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকায় তার উত্তরেই কবি সবুজপত্রে লিখেছিলেন—'বাস্তব', 'কবির কৈফিয়ৎ', 'সাহিত্যধর্ম' ইত্যাদি প্রবন্ধ। 'বাস্তব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর শ্রাবণে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিষয়রূপে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিলেন 'ভাবের বিষয়'-কে। 'ভাব'-কে তিনি হৃদয়ধর্মী অনুভূতি জাতীয় বৃত্তি তথা প্রজ্ঞাবৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য আনন্দ—এই ছিল তাঁর অভিমত। যা আনন্দকর-রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটিই সুন্দর। জীবনের অপরাপর মূল্য থেকে যে সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন,—রবীন্দ্রনাথ তাকে তিরস্কার করেছেন। তাঁর কাছে 'আনন্দ' ও 'সত্য' যেমন অভিন্ন, তেমনি 'সত্য' ও 'সামঞ্জস্য'ও তেমনি অভিন্ন। সৌজন্য-সামঞ্জস্য—একেই তিনি বলেছেন 'সুন্দর'। আবার তাঁর কাছে এটা কল্যাণও। "সাহিত্যের মধ্যে কোনো বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু।" রবীন্দ্রনাথ 'রসবস্তু'-এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করলেন যেভাবে বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ 'বাস্তব'-শব্দটির উদ্ভব বস্তু থেকেই আর সেই 'বস্তু' যাকে সাহিত্যের মধ্যে খোঁজা হয় সেটি হল রসবস্তু—কবির অভিমত এটিই। রবীন্দ্রনাথ সেই 'বস্তু'-তাকেই সাহিত্যে গ্রহণ করার কথা বলেছেন যে, বস্তুর রস সৃজনের রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট প্রাকৃত জগৎ বা বাস্তব জগৎকেই কবি সাহিত্যিক-শিল্পী তাঁর মনে গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের মনের রসে জারিত করেন, তখন সৃষ্টি হয় এক নূতন জগতের যা বাস্তব জগতের হয়েও কবির-শিল্পীর কলাকৃতিতে অনেকটাই রূপান্তরিত। পাঠক-দর্শকের কাছে তখন তা অপ্রত্যক্ষ জগতের চিত্র বলেই প্রতিভাত হয়। বাস্তব জগতের যা কিছু অপূর্ণতা-খণ্ডতা কিংবা শূন্যতা থাকে যা পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হতে পারে, তাকেই কবি অতিশয়োজিত মধ্য দিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে, অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে, তার পূর্ণতা সাধন করে, পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। বস্তুতপক্ষে, মনই প্রাকৃতিক

জিনিসকে মানসিক করে নেয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করে তোলে। সেই বস্তুকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'গ্রাহ্য' বলে মনে করেছেন যা পাঠকের রসানুভূতির জাগরণ ঘটায়।

'নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে, সেটা মাপকাঠির আয়ত্বাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়!' 'বস্তু' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ একটু স্বতন্ত্র অর্থমাত্রা দিয়েছিলেন যার ফলে কল্লোলের রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর চিন্তা চেতনা ছিল বিপরীতশায়ী। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই অভিমতে প্রত্যয়ী ছিলেন যে, দেশের সমাজ-যুগধর্মকে অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে। আর এই, বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস বৃথা। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সাহিত্যের যে সাধনা এবং সৌন্দর্যের যে প্রকাশ দেশে দেশে, যুগে যুগে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়ে সে সাধনা বিভিন্ন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এই মতটিকেই খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'বস্তুর দর-বাজার-অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে।' আর, দেশে দেশে যুগে যুগে 'বাস্তব' বিভিন্ন হলে সাহিত্যের মূল্য বস্তুর বাজারদরের মতো এবেলা ওবেলা ওঠা নামা করত। উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণসভা এবং কায়স্থদের পৈতে গ্রহণের মতো একটি বাস্তব বিষয়কে উপস্থিত করে 'পৈতাসংহার' কাব্য নামে একটি কাল্পনিক কাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করে বলেছেন—'তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে।' যা খাঁটি বস্তুতন্ত্র তা কখনোই সানন্দে গৃহীত হয়নি মানুষের মনে—যা মানুষকে আনন্দ দেয়, মুক্তির আস্বাদনে উদ্বোধিত করে রসলোকে, তাকেই আমরা মনের ভিতর থেকে গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকলায়, রসকলায় তাকেই একান্তভাবে কামনা করেছিলেন যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা অসমর্থ—যাকে কেবল অনুভব করা যায়, সেই অনুভববেদ্য বিষয়টির প্রকাশ সার্থক হলেই রসলোকে নিজেকে উন্নীত করে সে। 'কল্লোল' পত্রিকা-কে কেন্দ্র করে যে রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তারা 'বউঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'—এই সব উপন্যাসে বস্তুতন্ত্রের অভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রূপ-রসনিরপেক্ষ নগ্নতাই যে সাহিত্যের বাস্তব এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তথাকথিত বাস্তববাদীরা। তাই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলির কোনো বস্তুমূল্য ছিল না। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন-'আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমরা সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল গোরা উপন্যাসে।' যারা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দিকটিকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তারা এর মধ্যে সমসাময়িককালের ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছিলেন বলে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। অথচ, সমসাময়িক বিষয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসকে অতিক্রম করে এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র যে উপলব্ধি, যে আনন্দের স্তরে পৌঁছেছে সেই দিকটিকে সেভাবে তারা গুরুত্বই দেননি। 'ডাকঘর' এবং 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট আর্ট' - এর নিদর্শন উপস্থাপিত করলেও, তাতে যে তিনি শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এ কথা জানিয়েছেন তথাকথিত বাস্তববাদীরা।

'উপরন্তু লোকশিক্ষার কী হইবে। সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।'

জীবনে বস্তুবাদী সাহিত্যের ভূমিকা বা সাহিত্যে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গটি এখানে আসে। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'লোকহিত'-নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করছেন

এইভাবে—'সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরকালই সাধারণ মানুষ আপন অন্তরের তাগিদে সাহিত্যসৃষ্টি করছে, সুতরাং আপনার উচ্চতার অভিমানে লোকের জন্য লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলে পদে পদে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না'। বাস্তব প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, সমাজহিতৈষণার দায়িত্ব লেখকের নয়। প্রাকৃত জগতে যা বস্তুঘটিত, তার সত্যাসত্য নিরূপণে কোনো অসুবিধা নেই—যা কালো তা সকলের দৃষ্টিতেই কালো। কিন্তু, যা ব্যক্তিঘটিত সেখানে ঐকমত্য লাভ সুকঠিন—ভালো বা মন্দ-বিষয়টি অনেকটাই আপেক্ষিক হয়ে ধরা দেয়। এই 'ভালো' বা 'মন্দ'-এর বিচারে সর্বাধিক মানুষের সাক্ষ্য আবশ্যক। কিন্তু, এটাও সত্য যে, যুগের নিরিখে, কালের বিচারে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারবুদ্ধি, নৈতিকতা ন্যায়-অন্যায়বোধ, যুক্তি বুদ্ধিও বিবর্তিত হতে থাকে। তাই, কোনো যুগে যে বিষয়টি ভালো অন্যযুগের নৈতিক আদর্শ তাকেই ঘৃণ্য বলে মনে করতে পারে। তাই, লেখক শিল্পীকে চিরকালের মনুষ্যসমাজের মুখাপেক্ষী হতে হয়। 'পৃথ্বী বিপুলা' ও 'কাল নিরবধি'—এই বোধই লেখককে চালিত করবে সর্বকালের ভাবকে সাহিত্যে শিল্পকলায় অঙ্গীকার করতে। কাজেই লোকশিক্ষার কী হবে সে কথার জবাব দেবার দায় সাহিত্যের নয়। তাই, শিল্প-সাহিত্য থেকে যে আনন্দ লাভ করা যায় তা 'অহেতুক আনন্দ'; সাহিত্যের আনন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের লাভ বা ক্ষতির কোনো সংযোগ নেই। বস্তুবাদীরা সাহিত্যের যে সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্ন এনেছিলেন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন দৃঢ়ভাবেই। সাহিত্য জীবনের প্রকাশ তা ঠিক প্রয়োজনের প্রকাশ নয়। সাহিত্যরূপকে আগে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে তারপর তার সামাজিক উপযোগিতার প্রসঙ্গ—এ কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কলাকৈবল্যবাদীদের বিপরীত মেরুতে সংস্থিত যারা ছিলেন তারাও। সেটা অবশ্য অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ।

সাহিত্য সৃজনে স্রষ্টা লাভ করেন আত্মপ্রসাদ ও পাঠক লাভ করেন আত্মতৃপ্তি। মানবমনের যে অংশকে বলা হয় 'নিজত্ব' তা, নিজের জন্য প্রাকৃতজগৎ থেকে বিভিন্ন উপাদান আহরণ করে, লেখকের 'মানবত্ব' বা সৃজনী প্রতিভা তাকে আপনার করে নিয়ে, তার খণ্ডতাকে পূর্ণায়ত করে তোলে; ক্ষণকালের বস্তুকে চিরকালীন করে তোলে। তাই শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃতজগতের সঙ্গে সাহিত্য জগতের সম্বন্ধ বিচারে দেখা যায় যে, প্রাকৃতজগতের উপরে বসেছে মনের কারখানা—যা প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে। সাহিত্যিকের মন তাই নিরন্তর প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে। এবার চলে ঝাড়াই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন পরিশোধনের পালা—এটি বিশ্বমানবমন তথা লেখকের 'মানবত্ব'। এটি মানব মনের সর্বোচ্চ তল—সাহিত্যকার এই তলের উপাদানেই মিলিয়ে দেন, সম্পৃক্ত করেন নিজের কল্পনা। এমন এক জগৎ তিনি সৃজন করেন যেখানে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক অনন্য সূত্রে ধরা পড়ে-প্রয়োজনের দৈন্য-মলিনতা সেই জগৎকে স্পর্শ করে না। শিল্প-সাহিত্য থেকে এই যে আনন্দ আমরা লাভ করি তা আত্মচেতনার অনুভূতিসঞ্জাত। সব কলাকৃতিই তাই সত্যের পথে, আনন্দের পথে প্রধাবিত। যা আগে আমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানের বাইরে ছিল, শিল্পসাহিত্য তাকেই আমার সামনে উপস্থিত করছে।

আমরা এই আনন্দকে এক্ষেত্রে হৃদয়ে নিচ্ছি। এইভাবেই স্রষ্টা এবং রসজ্ঞ উভয়েই মেতে ওঠেন সৃষ্টির আনন্দেই, একজনের দিয়ে আনন্দ, আর অন্যজনের গ্রহণ করে আনন্দ। কারণ, রসের জগতে একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা।

৫.২.৬.৫: সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। সাহিত্য বিবেক—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জিজ্ঞাসা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। নন্দনতত্ত্ব—সুধীরকুমার নন্দী (রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গ)।

৫। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৫.২.৬.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে সাহিত্যের সত্য বিষয়ে প্রাবন্ধিক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

২। 'রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়'—'রসের সত্য' এবং 'তথ্যের দাসখত' সম্পর্কে তোমার অভিমত জানাও।

৩। প্রাকৃত সত্য ও সাহিত্যের সত্যের যে পার্থক্য 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে অভিব্যক্ত, লেখককে অনুসরণ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

৪। 'চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশ করাই সাহিত্যের ওরিজিন্যালিটি' সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃত জগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার উপরের উদ্ধৃতির আলোকে আলোচনা করো।

৫। 'বাঁধি গত' ও 'বাঁধা বুলি' বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন তা 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ অনুসরণে আলোচনা করো। সাহিত্য সৃজনে এদের ভূমিকাকে লেখক কীভাবে দেখিয়েছেন?

৬। "ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম"—"ওর মধ্যে" বলতে কার মধ্যে বোঝানো হয়েছে? দারিদ্রের আস্ফালন ও লালসার অসংযম বিষয়ে প্রাবন্ধিকের অভিমত ব্যক্ত করো।

৭। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 'বাস্তব' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো। সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়ে তোমার নিজস্ব অভিমত সংক্ষেপে লেখো।

৮। 'বস্তুর দর বাজার অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে'—বাস্তব প্রবন্ধ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করো।

৯। 'রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই।' —রসের মধ্যে যে নিত্যতা আছে তা এই প্রবন্ধে অনুসরনে ব্যক্ত করো।

একক- ৭

অবনীন্দ্রনাথ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

বিন্যাস ক্রম :

৫.২.৭.১ : অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন।

৫.২.৭.২ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী অনুসারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনা।

৫.২.৭.৩ : 'সৌন্দর্যের সন্ধান'-প্রবন্ধের মূল সুর।

৫.২.৭.৪ : 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৫.২.৭.৫ : 'অসুন্দর' প্রবন্ধের মূল সুর।

৫.২.৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.২.৭.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.২.৭.১ : অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি

"দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন; তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।"

তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই শিল্প সাধনার দীক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন আর্ট স্কুলের একজন কৃতি ছাত্র এবং পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ সে সময়ের চিত্রশিল্পে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ১২৭৮ সালে ২৩ শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের পিতৃব্য। স্কুল ছেড়ে বাড়িতেই তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষাচর্চা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা করেন। তাঁর শিল্পসাধনা বাড়িতেই শুরু হয়। এই সময় যেহেতু তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়েছে। শিল্পসাধনার প্রথম পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ গিলাডি ও পামারের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ের পর থেকেই তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। পরে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এবং তাঁরই প্রভাবে ভারতীয় শিল্পকলা নতুনভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই অবনীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে পা রাখেন। তাঁর চেষ্টার সাহায্যেই আমরা পেয়েছি "ছবি লিখিয়ে অবনী ঠাকুরকে।" ফলে অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে চিত্রকলা ও সাহিত্য প্রতিভার সমন্বয় সাধিত হল। অদ্ভুতভাবেই তাঁর মধ্যে ছিল মুখে মুখে গল্প বলার ক্ষমতা ; তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তুমি শেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।"

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশ্ব সাহিত্যের অদ্বিতীয় সৃষ্টি শিল্পকলা বিষয়ক নানা বিষয় সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার প্রভৃতি প্রবন্ধে রয়েছে। তিনি দুরূহ ও সূক্ষ্ম বিষয়কে সাধারণের কাছে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে তিনি শুধু আমাদের শিক্ষা দান করেননি, ঋষি ও গুরুর মতোই শিল্পশাস্ত্রের দীক্ষা দিয়ে গেছেন।

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁর চিত্তের প্রসারতা, তাঁর শিল্প আদর্শের সহজ সরল ব্যাখ্যার পরিচয় পাই। প্রথম দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধু একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু পরবর্তীকালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্মদক্ষতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ে ওঠে স্নাতকোত্তর বিভাগ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। পরাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের সূচনা করেন তিনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যাপকদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। এমনকি ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, পারস্য, তিব্বত, সিংহল, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞানী, গুণী অধ্যাপকদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, স্বদেশি, বিদেশি নির্বিশেষে সকলেই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবাইকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিদেশি শাসকদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, স্বদেশবাসী অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। উল্লেখ্য খয়রার রাজা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিপুল সম্পত্তির অংশ দান করেন। কিন্তু সেখানেও সমস্যা তৈরি হয়। কারণ খয়রার রানি বাগীশ্বরীদেবী ও কুমার গুরুপ্রসাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলে। অবশেষে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দানলব্ধ টাকার কিভাবে ব্যয় হবে তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নির্ধারণ করবেন—

"Under the direction of and according to a scheme to the framed by Sir Asutosh Mookerjee".

এইভাবেই ১৯২১ সালে খয়রার রাজার অর্থসাহায্যে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদ তৈরি হয়। তার মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' অন্যতম।

সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বলেন—

"এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে ছত্রে আর্ট-এর ব্যাখ্যা করে চলেছে—সেটা কোনো পণ্ডিতকে তো এ পর্যন্ত বলতে শুনলাম না।"

কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যে ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত সহজ সরল ব্যাখ্যা এবং দরদী মন নিয়ে তার পর্যালোচনা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েই সম্ভব। এবং তিনিই তাঁকে রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক-এর পদে প্রথম অধ্যাপকরূপে বরণ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সালে পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। আর সেইসব বক্তৃতা 'বঙ্গবাণী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতাগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। অনুমান করা যায় অধ্যাপক পদটির নামানুসারে গ্রন্থের ওইরূপ নামকরণ হয়েছিল।

গ্রন্থের ভূমিকায় নন্দলাল বসু বলেছিলেন এই—

"শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং

এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষ সাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যে এটি এক অমূল্য সম্পদ।"

৫.২.৭.২: বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী অনুসারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের নবজাগরণের প্রভাবে আমাদের দেশেও নবজাগরণ ঘটে। এই নবজাগরণের দুটি দিক ছিল। তা হল যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ। এর সঙ্গেই শুরু হল নতুন যুগের মানদণ্ডে পুনর্জাগরণ। এসবের মধ্যেই পড়ে বেদ-বেদান্ত মহাকাব্য উপনিষদ প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন বিদ্যার চর্চা হিসেবে রামমোহনের বেদান্তদর্শন সাহিত্য ও ধর্ম ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি ধারা ছিল—তা হল শিল্পকলা। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ধারার পুনর্জাগরণ ঘটালেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, একজন বড় মাপের শিল্পতত্ত্ববিদও ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে। যেমন—শিল্পের অধিকার, শিল্পের অনধিকার, সৌন্দর্যের সন্ধান, সুন্দর ও অসুন্দর প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনার সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'শিল্পের অনধিকার' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেন—মানুষের জৈবিক চাহিদা মিটে যাবার পর মনের খিদে বেড়েই চলে। এই অবস্থায় মানুষ বেঁচে থাকত কিভাবে যদি না 'শিল্প' নামক মাধ্যমটি থাকত। এই শিল্প মানুষের অন্তহীন খিদে নিবারণের জন্যই নির্মিত। শিল্পচর্চার গোড়ার কথা হল 'শিল্পবোধ'। সকলের এই শিল্পবোধ থাকে না। এই শিল্প যিনি সত্যিকারের রসিক তার কাছে পরিপূর্ণতা পায়।

অলস জীবন শিল্পীর নয়। আর সেটি নয় বলেই শিল্পের অধিকার জন্মগত নয়। শিল্প বিধাতার নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। নিজের নিয়মে সে চলে।

শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণার বিষয়টিকেও প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রেরণা বহিরাগত নয়, শিল্পীর অন্তরের আবেগ থেকেই শিল্প সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রবাহমানতায় যে ছন্দ স্পন্দনে যে নিত্য উৎসবের আয়োজন রয়েছে শিল্পী তাঁর সজাগ অনুভূতির দ্বারা তার থেকে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন এবং ভাবুক দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করেন।

এই প্রবন্ধে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশেল সম্পর্কেও তিনি শিল্পীর সতর্কতার কথা বলেন। কেননা কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রণেই তৈরি হতে পারে সার্থক শিল্প। আর বাস্তবের সার্বিক গ্রহণ-বর্জনের ওপরে নির্ভর করে শিল্পীর টেকনিক যার দ্বারা এক শিল্পী অন্যের চেয়ে পৃথক হয়ে যান।

শিল্পীর কাজ হল নির্মিতি। আর কারিগরের নির্মাণের মতো হুবহু আর একটি তৈরি করা সম্ভব নয়।

হলেও রসের দিক দিয়ে পার্থক্য হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ রসসঞ্চারে শিল্পের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলেও, ভৌগোলিক সীমানার কারণকে মানেননি। শিল্পের পরম সৃষ্টিগুলি আমরা ভারতীয় বলেই আমাদের নয়। শিল্পের আস্বাদ দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বজনীন।

'শিল্পের অধিকার' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃত আর্ট বলতে বুঝিয়েছেন শিল্পীর অন্তর্নিহিত অপরিমিত এবং তার স্বাতন্ত্র্যতাকে। এদের নির্মিতি নিয়েই প্রস্তুত হয় প্রকৃত শিল্প। শিল্পের প্রধান লক্ষণ হিসাবে তিনি প্রবন্ধে আড়ম্বরশূন্যতাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু রসের তৃষ্ণা যার মধ্যে আছে সে কোনোও আয়োজন, আড়ম্বরের অপেক্ষায় থাকে না। রসের প্রেরণাই তাকে চালিত করে নিয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সাধারণ কাজ এবং শিল্প সৃষ্টিকে একাত্ম করে দেখেছেন। তিনি বলেন—

"জীবিকার প্রয়োজনে কাজ সকলকেই করতে হয় এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ কাজের বাইরে নন। কর্মের মধ্যেই সন্ধান করে নিতে হবে আনন্দের ঝর্ণা ধারাকে।"

শিল্পের অধিকার নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মুক্ত জীবন চেতনার কথা বলেছেন। শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পই শেষ কথা, সেটাই তাঁর পরিচয়।

'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—সুন্দরকে কোনো বাঁধনে বাঁধা যায় না। সুন্দর সেটাই যেটি আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, আমাদের প্রাণে চঞ্চলতার সৃষ্টি করে।

"সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবের মনের ধারার সম্পর্ক,
অসুন্দরের সঙ্গে মনে না ধরার ঝগড়া।"

তাই সুন্দরের বিচারক হল ব্যক্তিমানুষের মন। শিল্পীকে কোনোও প্রথাগত নিয়মে বেধে রাখা সম্ভব নয়। এই সত্যতা তিনি বিশ্বাস করেন। এই স্ববিরোধিতাই তাঁর সৌন্দর্য বিষয়ক প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

আবার তিনি বলেন সৌন্দর্য হল ব্যক্তি-রুচি নির্ভর। তাই রুচিভেদে দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণাও পাল্টে যায়। যেমন—ভারত ও গ্রীসের মধ্যে। কেননা এই পরিবর্তনশীল জগতে সুন্দর কখনও আদর্শভাবে থাকে না। রুচি ভেদে সুন্দরের আদর্শ বদলে যায়। ফলে সৌন্দর্য হয়ে ওঠে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। সুন্দরের আদর্শ 'Artist'-দের মনেই আছে। Art-এ আমরা সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু পূর্ণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কোনোওদিন সম্ভব নয়। যেখানে স্বার্থ জড়িত সেখানে সুন্দরকে দেখা যায় না। যেখানে লোকসানের প্রসঙ্গ জড়িত সেখানে সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

"সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণ আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব।"

স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ব্যক্তিভেদে পরিবেশ ভেদে পরিস্থিতি ভেদে সুন্দর কখনও কখনও অসুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌন্দর্য রসিকের কাছে সৌন্দর্য সৌন্দর্য রূপেই ধরা দেয়। দূরত্বের উপর আবার সৌন্দর্য নির্ভর করে। দূরত্ব ঘুচে গেলেই ব্যতিক্রম ঘটে। সুন্দর আমাদের হৃদয়ের বিকাশ ঘটায়। অবনীন্দ্রনাথ পাঠক ও লেখকের হৃদয়ের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটায় তাকে বললেন রস। আর এই রস থাকে শিল্পের মধ্যে যা দুটি হৃদয়কে একটি হৃদয়ে পরিণত করতে পারে। সুন্দর নিজের আলোয় আলোকিত। যার মধ্যে সুন্দরের জ্ঞান আছে তার কাছে সহজেই সুন্দর ধরা দেয়।

কল্পনা-প্রবণতা এবং রসসঞ্চার হল শিল্প সৃষ্টির মূল কথা। কিন্তু এর বাইরের আকার আকৃতি প্রসঙ্গে সুন্দর ও অসুন্দরের একটি সমস্যা চিরকালের। কিন্তু যা চিরসুন্দর তার একদিন প্রকাশ ঘটবেই। তা সুন্দর মায়াজাল বিস্তার করলেও একদিন তার মুখোশ খুলে যাবে।

এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ জানান-নিছক সুন্দর বা নিছক অসুন্দর বলে কিছু নেই। ব্যক্তি অনুসারে সৌন্দর্যের ধারণা পরিবর্তনশীল। একজনের কাছে যা সুন্দর বলে মনে হতে পারে অন্যজনের কাছে তা আবার অসুন্দর।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা। আজ যাঁরা শিল্পতত্ত্ববিদ শিল্প আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা শিল্পের আঙ্গিক গঠন, উপাদান প্রভৃতিকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার।

৫.২.৭.৩ : 'সৌন্দর্যের সন্ধান'—প্রবন্ধের মূল সুর

'নন্দনতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্য তত্ত্ব' দুটি আলাদা বিষয় হলেও, অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বলতে আমরা তাঁর সৌন্দর্য তত্ত্বই বুঝি। সৌন্দর্য তত্ত্ব বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধটি সবচেয়ে বিশদ এবং বৈচিত্র্যময় আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। (ক) সৌন্দর্য বিষয়ে কোনো তত্ত্ব থাকা উচিত কিনা। (খ) ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর সৌন্দর্য নির্ভরশীল হওয়া উচিত কিনা। আর এ দুটি বিষয়ই অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য নির্ণয়ের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্যণীয় তিনি সাধারণত ব্যক্তিগত অভিরুচিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকেও তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়, কেননা সৌন্দর্যেরও একটা মানদণ্ড থাকা উচিত।

এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত অনুভবের মাধ্যম বলেই মনে করেছেন। কারণ সৌন্দর্য একান্তভাবেই ব্যক্তিমানুষের মনের ব্যাপার। মানুষের মন যাকে গ্রহণ করে সেটি হল সুন্দর। আবার

বিপরীতভাবে মন যাকে গ্রহণ করে না সেটি অসুন্দর। অনেকে কাজকে সুন্দর মনে করেন, অনেকে আবার অকাজকে সুন্দর মনে করেন। সুতরাং ব্যক্তি মানুষের ধারণার উপরেই সৌন্দর্যবোধ নির্ভরশীল।

অবনীন্দ্রনাথ বস্তুগত সৌন্দর্য (Objective beauty)-কে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর ধারণা এই Objective beauty-র অস্তিত্ব বর্তমান। সেই কারণেই বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে সৌন্দর্যের বিভিন্ন আদর্শ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের লোকেরা বলে—"সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভাল।" কিন্তু গ্রীসের লোকের সুন্দর আলাদা, তারা বলে—"নব মানুষকে করে তোল সুন্দর দেবতার প্রায়।"

আবার ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন শিল্পীর মনও আলাদা। অবনীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ সেখানেই যেখানে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও বস্তুগত সৌন্দর্য মিশে একাকার হয়ে যায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়া কঠিন কাজ। কারণ—নীতিজ্ঞানী মানুষ নৈতিকতাকেই সুন্দর বলে মনে করেন। ভক্তমানুষ আবার আধ্যাত্মিক বিষকেই শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলে মনে করেন। আবার যারা সমাজসচেতন মানুষ তারা যেটি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকারী তাকেই সুন্দর বলে মনে করেন। ফলে মানুষের কাছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সন্ধান করা শক্ত হয়ে পড়ে।

প্রকৃত সুন্দরকে কখনও সুন্দর বলে প্রচার করতে হয় না। সেই নিজেই নিজের প্রকাশ মাধ্যম। সৌন্দর্য-রসিকরা তাকে চিনে নিতে ভুল করে না। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যাকে সুন্দর বলে মনে করি না, অনেক সময় মন তাকেই সুন্দর বলে গ্রহণ করে। যাকে অসুন্দর বলে মনে হয় শিল্পীরা তারও ছবি আঁকেন। প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ তাঁর মন ও অনুভূতি দিয়েই প্রকৃত সৌন্দর্য চিনে নেয়।

অবনীন্দ্রনাথ সাতটি প্রধান মতবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার সেই তত্ত্বগুলির পরিচয় বিস্তারিতভাবে দেননি।

১। যা সুখদ তাই সুন্দর

২। কাজের বলেই তা সুন্দর।

৩। অপরিমিত বলেই তা সুন্দর।

৪। সুশৃঙ্খল বলেই তা সুন্দর।

৫। উদ্দেশ্যও উপায় এই দুয়ের সঙ্গতি আছে বলেই তা সুন্দর।

৬। সুসংহত বলেই তা সুন্দর।

৭। বিচিত্র-অবিচিত্র সম বিষম দুই দিক দিয়েই তা সুন্দর।

উপরিউক্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনোটি গ্রহণযোগ্য তার বিস্তারিত আলোচনা অবনীন্দ্রনাথ করেননি। তার কারণ হয়তো এর কোনোওটিই গ্রহণযোগ্য বলে তাঁর কাছে মনে হয়নি। যদি এই তত্ত্বগুলিই

সৌন্দর্যবোধের মানদণ্ড হয় তাহলে সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে মানুষের মনে এত দ্বিধা কেন। কেনই বা ব্যক্তি অনুযায়ী অসুন্দর হয়ে ওঠে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের মত হল বিশেষ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বা বিশেষ দেশ কালে এগুলি আংশিকভাবে সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের সন্ধান করতে গেলে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরেই নির্ভর করতে হয়।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা দেবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সত্যের কথা বলেছেন। সেটি হল যা নিত্য প্রবহমান তাই সৌন্দর্যের বিষয়। যা অনিত্য তা সৌন্দর্যের বিষয় নয়। অবনীন্দ্রনাথ নিত্যকে বুঝিয়েছেন ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। আর অনিত্য বলতে বুঝিয়েছেন যা পার্থিববস্তু। এবং সৌন্দর্য একটি ধারণামাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এ ধরনের আলোচনা খুব একটা সহায়ক নয়। তাই তিনি বলেছিলেন পার্থিব বস্তুমাত্রই যদি অনিত্য হয়। এবং সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্র থেকে যদি তাদের বাদ দিতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠবে। তাই তিনি বলেন প্রত্যেকের মধ্যেই চিরসুন্দর বলে একটি ধারণা আছে। একে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'Universality'। এই চিরসুন্দরের ধারণা নিয়েই তিনি সৌন্দর্যবিচারে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে Universality-র প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত অভিরুচি। যাকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'individuality'। ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে চিরসুন্দরের বিরোধ দেখা দিলে, সৌন্দর্যবিচারে কাকে গ্রহণ করা উচিত তার সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল—

"যেখানে individuality-কে Universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই টান মারতে থাকলে ... যে কাণ্ডটা ঘটে, আর্টের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছার উপস্থিত হয়।"

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে চিরসুন্দরের (Universality) কাছে ব্যক্তিগত রুচি পরাজিত হওয়াই শ্রেয়। তিনি ব্যক্তিগত রুচির থেকে চিরসুন্দরের আদর্শকেই জয়ী করতে চেয়েছেন।

৫.২.৭.৪ : 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে দক্ষ শিল্পী এবং সেইসঙ্গে কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা। সুতরাং, সুন্দরের সাধনা করেন যে শিল্পী, তাঁর অনুভূতিতে সৌন্দর্য-দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটি অসুবিধাও আছে। সাধারণভাবে যাঁরা তাত্ত্বিক বলে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুভূতিগ্রাহ্য এই ব্যাখ্যার একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁর কাছে যতই পরিস্ফুট হোক, আমাদের কাছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি ততটা স্পষ্ট হতে পারেন না। যদিও তার বক্তব্য আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু অসুবিধা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক নন্দনতত্ত্ব না হওয়ার জন্য তার সৌন্দর্যবিষয়ক মতামতকে আমরা

বিশেষ একটি মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। তবে তিনি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'তে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর মতামত অতি সরল ও মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

তাত্ত্বিক আলোচনায় সৌন্দর্য দর্শনের মোটামুটি দুটি ধারা প্রত্যক্ষ করি। তন্ময় সৌন্দর্য দর্শন (subjective) অর্থাৎ যথাক্রমে সৌন্দর্য বস্তুধর্মী এবং সৌন্দর্য ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর নির্ভর করে যথাক্রমে এই মতবাদ। অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থেরই একটি দীর্ঘতম প্রবন্ধে 'সৌন্দর্যের সন্ধান'-এ সৌন্দর্যকে পুরোপুরি মন্ময় বলেও উপসংহারে চিরসুন্দরের কথা বলেছেন। শাশ্বত সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত বোধের দ্বন্দ্ব হলে শাশ্বত সৌন্দর্যকেই গ্রহণ করতে বলেছেন। কাজেই, সৌন্দর্য বিচারে তাঁকে সামঞ্জস্যবাদী বলাই ভালো।

'সুন্দর' প্রবন্ধের সূচনায় কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মন্ময় আদর্শের প্রশংসা করেননি। বরং, এই কাজেই বলেছেন যে, সৌন্দর্যের ব্যক্তিগত ধারণা সৌন্দর্য বিচার করতে গিয়ে কিছু ভ্রান্তিকে লালন করে। তিনি বলেছেন :

"সবারই মনে একটা করে সুন্দর-অসুন্দরের হিসেব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিসেবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনার সৌন্দর্যের হিসেবে সে নানা ভুল দেখে।"

সেই কারণেই সৌন্দর্য-বিচারের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। বলেছেন—স্থান-কাল-পাত্রেই সৌন্দর্য সৃষ্টি নির্ভর করে। প্রথমে বলেছেন পাত্রের কথা। যে যে কাজের উপযুক্ত নয়, তাকে সেই কাজ করতে দিলে অসুবিধা হবেই—

"গান শুনে মনে হয় বুঝি আমিও গাইতে পারি, মন মেতে ওঠে এমন যে ভুল হয়ে যায় সুরের পাখি বুকের খাঁচায় ধরা দেয়নি একেবারেই।"

এ কথা যিনি সৌন্দর্য উপভোগ করেন তার সম্বন্ধেও সত্য:

"হরিণ সে বাঁশী শুনে ভোলে, সাপ সে বাঁশী শুনে ফণা তুলে তেড়ে আসে।"

এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সব জিনিস সব জায়গায় ভালো লাগে না। লেখক বলেছেন—

"গড়ের বাদ্যি, গড়ের মাঠে সুন্দর লাগে, মন্দিরের শাঁখ-ঘণ্টা দূরে থেকেই ভালো লাগে। সভাস্থলে বীণা-বেণু মন্দিরা ঘরের মধ্যে সোনার চুড়ির ঝিন্‌ঝিন্ স্থান-কাল-পাত্রের হিসেবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে। মাঠ ছেড়ে গড়ের বাদ্যি যদি ঘরের মধ্যে ধুমধাম লাগায়, তবে সে স্থান কাল-পাত্রের হিসেব ডিঙিয়ে চলে ও সেই কারণেই ভারি বিশ্রী ঠেকে কানে।"

কানের কথাটাও এভাবে সত্য। সন্ধ্যাবেলা শাঁখের শব্দ ভালো লাগে, কাঁসর ঘণ্টাও মন্দ লাগে না। কিন্তু দ্বিপ্রহরে এগুলোকেই মনে কাছে উৎপাত বলে মনে হয়।

আসলে সুন্দর যে আছেই, মানুষ যে কথা বোঝে। কিন্তু সৌন্দর্যের মূল ব্যাপারটি কী? তার উত্তর তার নিজের মনও দিতে পারে না। আবার পণ্ডিতদের সৌন্দর্যতত্ত্ব সঠিক উত্তরও দিতে পারে না। মানুষের সৌন্দর্য-

জিজ্ঞাসার এটাই প্রধান সমস্যা। তা সত্ত্বেও মানুষ যে তত্ত্বের সন্ধান করে, তার কারণ ব্যক্তিগত বিতর্ক ও মতভেদ থেকে সে উদ্ধার পেতে চায়। তাছাড়া সৌন্দর্য বিচারের ক্ষেত্রের এমন কোনোও বস্তুগত মানদণ্ড থাকা দরকার—যা স্থান-কাল-পাত্রের অতীত অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটি তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সেই জন্যই রচিত হবে সঙ্গীতশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, বর্ণশাস্ত্র। কিন্তু দেখা গেছে এতে বিশেষ কোনোও লাভ হয়নি। কারণ তত্ত্বের সাহায্যে সৌন্দর্যকে ধরা যায়নি। মানুষ সৌন্দর্যের তত্ত্ব রচনা করে—অথচ সেই তত্ত্বগত বিদ্যাকে অতিক্রম করাই সৌন্দর্যের ধর্ম। সেই কারণেই সঙ্গীত কোনোও নিয়ম না মেনেই সুন্দর হতে পারে। আবার সব রকমের নিয়ম মানা সত্ত্বেও তাকে আমাদের অসুন্দর মনে হতে পারে। ছন্দশাস্ত্র পড়ে কেউ কবিতা লিখতে শেখে না। নিয়মের ব্যতিক্রমও যে অপূর্ণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রমাণস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—কোনোও কোনোও শিল্পীর আঁকা কালো-রঙের চাঁদ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বলেছেন—যতদিন তিনি পাহাড়ে বাস করেছিলেন প্রকৃতি তাকে কালো এবং নীলবর্ণের তুষারশৃঙ্গ দেখিয়েছিল; সেই চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতে সৌন্দর্যের কোনোওরকম হানি হয়নি। সুতরাং তত্ত্ব যাই হোক, সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে করতে পারে, তার জন্য কোনোও নিয়মের প্রয়োজন হয় না। এ কথা প্রমাণের জন্য অবনীন্দ্রনাথ জাপান ও চীনের 'হাতপাখা'র কথা উল্লেখ করেছেন। জাপান সেটি আঁকে সাদার উপর বিভিন্ন রং ব্যবহার করে এবং চীন আঁকে একেবারে রাত্রির মত কালো রঙে। —পাখা দুটি ভারী সুন্দর।

সুন্দরকে তত্ত্বের আলো জ্বেলে দেখতে হয় না। প্রকৃত সৌন্দর্য রসিক সুন্দরের আলোতেই তাকে দেখে নেয়। লেখক মনে করেন সুন্দরের নিজেরই এমন এক দ্যুতি আছে যাতে তাকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়। সেই কারণেই সৌন্দর্যের এত বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য বোঝার জন্য লেখক যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাতে যেন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে কথাশিল্পী এসে যোগ দিয়েছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

"মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোনো একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারা ফুলে গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর।"

সুন্দরকে তাই খুঁজতে হয় না, যে দেখতে জানে সে সবকিছুর মধ্যেই সুন্দরের সন্ধান পায়। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্য অপ্রয়োজনের সৃষ্টি অর্থাৎ সৌন্দর্য কোনো প্রয়োজন সাধনা করে না। কেবল সৌন্দর্যের জন্যই সুন্দর আমাদের ভালো লাগে। কথাটা বোঝার জন্য পিঁপড়ের ছোটাছুটি এবং মৌমাছির মধু আহরণের সাথে সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন। পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন,—"পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার প্রয়োজনের যোগ—চিনি না পেলেই সে যে-কোনো জিনিসেই কাজ মিটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মৌমাছির কাছে মধুর বিকল্প আর কিছুই নেই।" লেখক Artistদের সম্বন্ধে বলেছেন—

"তাঁরা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে
জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না, ফুল ফোটে
ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে।
চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে, সন্ধানে নয়।"

এই প্রসঙ্গটি অবনীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিশদ করে বলেছেন এবং এরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কোনোওরকম প্রয়োজনের বন্ধনে বাধা থাকলে প্রকৃত সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তিনি বলেছেন—

"তারের সর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে
রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন, সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন।
মানুষের কাজে কতটা লাগবে, কি না লাগবে—এ ভাবনা তাদের নেই।"

শিল্পী যেমন নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবে না, তেমনি অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যও তাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না।

প্রবন্ধের শেষের দিকে, বিষয় ও আঙ্গিকের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সত্যকার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে আঙ্গিকের কলাকৌশল আমাদের নজরে পড়ে না। তাঁর মতে—

"যে রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা থাকে না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে।"

একথা বোঝাতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি অর্গান ও ছাপার কালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যার সমগ্র সৃষ্টি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশ সুন্দর নয়। সেই কারণেই তাঁর সিদ্ধান্ত—

"সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব।"

আধুনিক যুগেও একথার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে—

"Among the moderns we find that more, emphasis is laid on the idea of significance, expressiveness, the utterance of all that life contains, ingeneral, that is to say on the conception of in characteristic."

সমগ্র প্রবন্ধ থেকে অবনীন্দ্রনাথ এই রকম ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, সৌন্দর্য দর্শনের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কোনোও প্রয়োজন নেই। স্থানান্তরে ভ্রমণের কোনোও প্রয়োজন নেই, তত্ত্বদৃষ্টি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কারণ সুন্দর সর্বত্র আছে, তাঁকে খুঁজে নিতে হয় না। কেবল সৌন্দর্য দর্শন করবার মতো উপযুক্ত চোখ তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত তিনি সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

৫.২.৭.৫ : 'অসুন্দর' প্রবন্ধের মূল সুর

ঊনবিংশ শতক বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। এই সময়কার দার্শনিকরা সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা, ইত্যাদিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করেছেন। সাহিত্যের মতোই শিল্পতত্ত্বেরও নতুন করে চর্চার অভ্যাস শুরু হয়। যার প্রতিভূ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন নন্দনতত্ত্ববিদ্ শিল্পতত্ত্ববিদ ও একজন শিল্পী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি শিল্প সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তাই পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বর্তমান। অনেকে আবার বলেন এটি সৌন্দর্য সম্পর্কিত দার্শনিকতার কথা। এই গ্রন্থে 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র 'অসুন্দর' প্রবন্ধে সুন্দর এবং অসুন্দরের তুলনামূলক আলোচনা করে সুন্দর ও অসুন্দরের স্বরূপকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে তুলে ধরেছেন।

শিল্প হল জড় ধর্মের বিপরীত ধর্ম। তাঁর মতে শিল্প হল কোনোও মানুষের আত্মিক ধর্ম বা আত্মিক বোধ। শিল্পকে সৃষ্টি করতে হলে তাকে অর্জন করতে হয়। তিনি জগতের সমস্ত শিল্পের মধ্যে ভাবের মাধ্যমকে লক্ষ করেছেন। তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'অসুন্দর'-এ অনবদ্য ভঙ্গীতে 'অসুন্দর' সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা অনেক স্বতন্ত্র। আমাদের মন যাকে বারবার চায় তাকেই আমরা সাধারণত সুন্দর বলে মনে করি। আর তাকে আমরা সবসময় কাছে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখার ভুলেও আমরা সুন্দরকে অসুন্দর বলে মনে করতে পারি। আবার ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার পার্থক্য শক্তি মানুষের মানসিক ব্যাপার। তবুও বলা যায় যা মনে ধরে, যে বস্তুটি অন্তরে স্থান করে নেয় তাই সুন্দর। আর যা বাইরের বিষয় থেকে যায় তা অসুন্দর। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মতে আত্মিক ধর্মের উপরে সুন্দর অসুন্দর নির্ভর করে।

অসুন্দরের মধ্যে মিথ্যা আবরণের জাল থাকে। তার মধ্যে একটা ভান থাকে। তাই ভান যা তা অসুন্দর। অন্যদিকে আর্ট যা তাই সুন্দর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে অবনীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন,—সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা কঠিন।

সুন্দর এবং অসুন্দরের ধারণা সাধারণভাবে ব্যক্তিমানুষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ব্যক্তিভেদে এই সুন্দরের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। একজনের কাছে যা অসুন্দর অন্যজনের কাছে আবার তা সুন্দর বলে মনে হয়।

বাস্তব জীবনের সৌন্দর্যবোধ এবং অসুন্দর, সাহিত্য ও শিল্পের সুন্দর ও অসুন্দরের থেকে আলাদা। সেখানে অসত্য ও সত্য, অসুন্দরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

শিল্পসাহিত্যের মূলকথাই হল সবকিছুতেই সুন্দর করে দেখা ও দেখানো। সেখানে সমস্ত উপকরণ প্রকরণ দিয়ে অসুন্দরকেও সুন্দর করার সাধনা অনবরত চলছে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"সুন্দর ও মঙ্গলের পক্ষে যেগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
বাধা তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার।"

যার ছোঁয়ায় অসুন্দর সুন্দর হয়ে ওঠে তার নাম রস। যে ছোট ছেলেটি কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলে, সেটি কোনো দিক দিয়ে ঘোড়ার মতো না হলেও তবু সবাই জিনিসটাকে সুন্দর দেখে। উষার সহজ বর্ণনা যুগ যুগ ধরে কবিরা দিয়ে এসেছেন, এর মধ্যে কতটা সত্য, কতটা মঙ্গল তা মাপতে গেলে এর রসভঙ্গ ঘটবে। আগুন যখন কারও বাড়িতে আগুন লাগায় তখন তা অসুন্দর আবার সেই আগুনই যখন অন্ধকারে গৃহকোণে দীপশিখার মতো জ্বলে তখন তা সুন্দর। এসব ঘটে রসের কারণে। এই রসের রহস্যময় সংস্পর্শে যে-কোনো বস্তুরই রূপান্তর ঘটে। অবনীন্দ্রনাথের মতে—

"যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর।"

চরিত্র বলতে তিনি শ্রী, স্বাদ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। পরিষ্কারভাবে অসুন্দরকে দেখানো শক্ত। সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে যে সত্য, শুভ, মঙ্গল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলিও ব্যক্তিগত রুচিবোধ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

সব সুন্দর রচয়িতা নিজেকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজে থেকে এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না সে কত সুন্দর :

"যে কাজে রচয়িতা কেমন বানিয়েছি, এইটুকুই
প্রকাশ করে গেলো সে কাজ অসুন্দর হল।"

রসসৃষ্টির দ্বারাই ভাবের পরিপূর্ণতা। গোপনীয়তা রক্ষা করাই শিল্পীর সত্তা। সূর্য যখন আপনাকে খুব অনেকখানি সরিয়ে রেখে জলে স্থলে আলোকিত করে তখন একটা অপরূপ সৌন্দর্য ও সুষমা নিয়ে চোখে পড়ে, কিন্তু নদীর জলে সূর্য যখন নিজেকেই প্রখরতর করে ফোটাচ্ছে তখন চোখের পীড়া উৎপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করে সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

সুতরাং অসুন্দর হল যার সত্য নেই, যার গোপনীয়তা নেই, যার বৈচিত্র্য নেই, যার চরিত্র নেই। আর সুন্দর হল যা গোপন, যা মহীয়ান, যা রহস্যময়, যা বৈচিত্র্যময়। কিন্তু শিল্পতত্ত্ববিদ শুধু সুন্দরের পূজারী নন, তিনি অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে সন্ধান করে চলেন। তাই বিশিষ্ট রচয়িতা বা শুধু চোখ দিয়ে নির্মল জলময়, পানাপুকুরের মধ্যেও সুন্দরকে খোঁজ করেন। এবং সুন্দর ও অসুন্দরকে পাশাপাশি স্থান দেন।

৫.২.৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আনন্দ পাবলিশার্স)

২। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দেজ পাবলিশিং)

৩। সাহিত্য বিবেক : ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দেজ পাবলিশিং)

৪। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব সূত্র : ড. সুবীর কুমার নন্দী (পি. এম. বাক্‌চি)

৫। সৌন্দর্যতত্ত্ব : ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (চিরায়ত প্রকাশন)

৬। আধুনিক বাংলা উপন্যাস পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ : অধ্যাপক রামেশ্বর শ অনূদিত (পুস্তক বিপণি)

৫.২.৭.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল ভাব নিজের ভাষার বিবৃত করো।

২। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনার মূল সুর কী ?

৩। 'অসুন্দর' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ অসুন্দর বলতে কী বুঝিয়েছেন, প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধের মূল ভাব নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করো।

৫। 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর' প্রবন্ধের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করো।

———

শ্রী অরবিন্দ

বিন্যাস ক্রম :

৫.২.৮.১ : শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা

৫.২.৮.২ : কাব্যের আত্মা

৫.২.৮.৩ : রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু

৫.২.৮.৪ : ছন্দস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ

৫.২.৮.৫ : কাব্যের সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র

৫.২.৮.৬ : কাব্যের জাতীয় বিবর্তন

৫.২.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৫.২.৮.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.২.৮.১ : শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা

কোনোও সাহিত্যিকের সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনের যোগ সাধনা, বিশ্বসাহিত্য অনুশীলন এবং ব্যাপক অধ্যয়নের সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন তার উপর।

সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন—

> "তাতে সম্যক প্রবেশের প্রস্তুতি আমাদের নেই, উপযুক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার অভাবে তাতে প্রবেশের চাবিকাঠির সন্ধানও আমাদের জানা নেই, কাজেই এই দূরহ চিন্তাসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বিমূঢ় বোধ করা আশ্চর্য নয়। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির অভাবকে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে পূরণের চেষ্টা করতে পারি। শ্রদ্ধার অভিসিঞ্চনে অনেক সময় জটিল জিনিষও সহজ হয়ে যায়।" (নারায়ণ চৌধুরী : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ)

দেখতে পাই—প্রকৃত জনের কাছে অরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগে চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা। ভক্তজনের কাছে মহাযোগী। বিদগ্ধ জনের কাছে একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেন তিনি যোগী হওয়ার আগে থেকেই কবি ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাব্যসাধনা করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কাব্যতত্ত্ববিদও। কাব্যসাহিত্য হল শিল্পেরই অন্যতম শাখা। তাই কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তিনি শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের কথাও ভেবেছেন। তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায়, তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে—

1. The Life devine
2. The Future Poetry
3. The essays on the Gita
4. The Ideal of human unity
5. The Human Cycle
6. The Secrets of the Veda

আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অবদান সবচেয়ে মৌলিক। রবীন্দ্রনাথ ও ক্রোচের নন্দনতত্ত্ববিদদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আবার এদের মধ্যে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন, দার্শনিকও ছিলেন। অপর দিকে ক্রোচের মধ্যে দার্শনিকসুলভ মনোভাব থাকলেও কবিত্বের দিক দিয়ে ততটা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে

কবি ও দার্শনিক উভয় মনোভাবের মেলবন্ধন ঘটেছে। ফলে তাঁর নন্দনতত্ত্বে ক্রোচের মতো দার্শনিকসুলভ যুক্তির সঙ্গতি যেমন প্রত্যক্ষমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতো কবি হৃদয়ের সৃষ্টি সত্যের প্রত্যক্ষ উষ্ণতাও লক্ষ করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনও আবার পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন বা আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের যুক্তিতর্ক লব্ধ দর্শনের মতো নয়। তাঁর দর্শন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফল—

> *"What I wrote was the work of intuition and aspiration working on the basis of my spritual experience" (A. B. Purarni : Evening Talks with Sri Aurobindo-p. 127)*

এই কারণে তাঁর দর্শনের বিভিন্ন দিকও নন্দনতত্ত্ব তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এককথায় শ্রীঅরবিন্দ জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি বলেন, প্রকৃতির মধ্যেই একটি প্রগতির প্রবণতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এই প্রগতি যান্ত্রিক প্রগতি (Mechanical Evolution) নয়। এই প্রগতি উদ্দেশ্যমুখী (Teleological Evolution)। তাঁর মতে প্রগতির বিবর্তন একটি পরিপূর্ণতা লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণতা সুন্দর জীবনের পরিপূর্ণতা।

বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা আমরা দেখতে পাই—এই পৃথিবীর প্রথমে জড়ের বিকাশ হয়েছিল। জড়ের পরে এল গাছপালা—পশুপাখী—প্রাণের বিকাশ হল—এল প্রাণময় স্তরের (Vital) সত্তা। তার পর এল মননশীল মানুষ। মনোময় (Mental) স্তরের বিকাশ হল। চার্লস ডারউইন এ পর্যন্ত এসে থেমে যান। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, আমরা যদি প্রগতিতে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা একথা মানতে বাধ্য যে, জগতের বিকাশ এ স্তরে এসে থেমে থাকতে পারে না। মনময় স্তরের পর উন্নততর একটি স্তরের বিকাশ হবেই। শ্রীঅরবিন্দ মনের চেয়ে ঊর্ধ্বতর এই নতুন স্তরের নাম দেন 'অতিমানস' (Super mind) জগতে মনোময় স্তরের বিকাশের ফলে যেমন পশুপাখীর চেয়ে উন্নততর জীব মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি এই অতিমানস স্তরের বিকাশের ফলে মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব 'অতিমানবের' (Superman) আবির্ভাব হবে।

শ্রীঅরবিন্দ বিষয়টি এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে—

Existance	–	সৎ
Consciousness	–	চিৎ
Bliss	–	আনন্দ
Super mind	–	অতিমানস
Mind	–	মন

Psyche	–	চৈতন্যপুরুষ
Life	–	প্রাণ
Matter	–	জড়

উপরের চেতনা নিম্নের স্তর প্রেক্ষেপনের নাম নিবর্তন এবং নীচের স্তর থেকে ক্রমশ উপরের স্তরে যে বিকাশ তার নাম দিয়েছেন বিবর্তন।

সুতরাং বলা যায় প্রগতিবাদী মানুষের প্রগতি মনোময় স্তর থেকে ঊর্ধ্বতর অতিমানব স্তরের দিকে আমাদের বর্তমান জীবনের রূপান্তর হয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে শিল্পসাহিত্যও রূপান্তর হয়ে চলেছে। মনোময় স্তর ছেড়ে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বতর স্তরে আমাদের চেতনা উত্তীর্ণ হবে এই ঊর্ধ্বায়নের সূত্রপাত হয়েই গেছে। শ্রীঅরবিন্দ তার নিদর্শন লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস প্রমুখ কবির মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তার যোগজীবনে যতই এগিয়ে গেছেন ততই ঊর্ধ্বতর চেতনা থেকে বারবার তাঁর প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'কে পুনর্লিখিত ও সংশোধিত করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলেছেন—একটি মানসোত্তর ভূমি থেকে ভবিষ্যতের কবিতা রচিত হবে এবং তাতে কাব্য সাহিত্যের আরও পূর্ণতা আসবে—

"If we can get a continuous inspiration from the overmind,
that would mean a greater height of perfection"

('Letters'-p. 95-96)

আবার তিনি নিম্নতর চেতনা থেকে সৃষ্ট শিল্পগুলিকেও নিকৃষ্ট বলেননি। যাঁরা প্রাচীন কবি তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। যেমন—শেক্সপীয়র, বাল্মীকি, ব্যাসকে পৃথিবীর প্রথম সারির কবি বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় শিল্পের বিবর্তনের ধারায় ঊর্ধ্বতর চেতনার কথা বললেও ঊর্ধ্বতর চেতনাকেই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি স্বরূপ গ্রহণ করেননি, জীবনের সঙ্গে গভীর যোগ, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গভীরে উপলব্ধি ও শিল্পরূপের উৎকর্ষকেই তিনি শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করেছেন।

নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমেই বিবেচ্য শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা প্রশ্ন একথা বলাই বাহুল্য যে, প্লেটো, শেলী, রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রীঅরবিন্দ দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটো এই দিব্যপ্রেরণার নাম দেন 'Enthusias mas'। একদিকে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাস করেছেন অন্যদিকে তিনি কাব্য তথা শিল্পকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে নীরবে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাব্যে আধ্যাত্মিকতা না থাকলেও চলবে কিন্তু জীবনকে শিল্পসৃষ্টি থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। জীবনাদি সৃষ্টিতে স্বতোৎসারিত প্রেরণা আনতে পারে তবে সেই সৃষ্টির আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে শ্রীঅরবিন্দ

এ কথা স্বীকার করেছেন যে সাহিত্য জীবনের স্থূল উপাদান গ্রহণ করলেও তার আসল ক্ষেত্র হল কল্পনার সূক্ষ্মলোক।

প্রকৃতির জড় বিধান থেকে মানুষের মন যেমন মুক্ত হয়ে চলেছে, শিল্প সৃষ্টি বাহ্য প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি মানুষের চেতনা মনের স্তর পেড়িয়ে ক্রমশ ঊর্ধ্বে অতিমানস চেতনার দিকে উঠে চলেছে। মন থেকে এই যে অতিমানসের দিকে চেতনার গতি এর মধ্যবর্তী অনেক স্তর আছে। এই স্তরগুলি প্রধানত নিচে থেকে ক্রমশ উপর দিকে—

অতিমানস Super mind

↑

অধিমানস Over mind

↑

বোধিমানস Intuitive mind

↑

জ্যোতির্মানস Illuminded mind

↑

ঊর্ধ্ব মানস Higher mind

↑

মন Mind

মন থেকে উঠে এসে মস্তিষ্কের এলাকা পেরিয়ে আমাদের চেতনা ক্রমশ এই স্তরগুলিতে ধাপে-ধাপে উত্তরণ লাভ করেছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাব্য এবং শিল্প মানব চেতনাস্তর থেকেই রচিত বা সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতের কাব্য এবং শিল্প ক্রমশ এই সব ঊর্ধ্বতর স্তরের যে-কোনোটি থেকে সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> "কয়েকজন কবির মধ্যে ঊর্ধ্বতন চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, এবং A.E." শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এ পর্যন্ত মানুষের চেতনা মত ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ হয়েছে তার শীর্ষবিন্দুতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।"

মানুষের চেতনার যেমন ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ ঘটেছে তেমনি তার চারিপাশে সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং তার

অন্তর্মুখী গভীরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের চেতনার বিস্তার ঘটছে তিনভাবে (১) ঊর্ধ্বায়ন (২) প্রসারণ (৩) গভীরতামুখী অবগাহন। শিল্পী এবং গভীরতর তত্ত্ব উদঘাটন। 'ফ্রয়েড' ইতিপূর্বেই মানুষের মনের উপরের স্তর বের করে অনেক গভীরতর অবচেতন ও অচেতন স্তর আবিষ্কার করেছেন। কাব্য এবং শিল্পের 'পরাবাস্তববাদ' (Surealism) বা 'চেতনা প্রবাহ' (Stream of consciousness) প্রভৃতি মতবাদে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যকে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের ঊর্ধ্বতর তথা গভীরতর চেতনার সৃষ্টি রূপে দেখেছেন এবং এই গভীরতর ঊর্ধ্বতর চেতনার সৃষ্টি হলে কাব্য মানুষের অন্তরতম সত্যকে প্রকাশ করবে। তখন কাব্য হয়ে উঠবে ভাবঘন, সংহত, গভীরতর সত্যের ছন্দিত প্রকাশ। বৈদিক ঋষিরা যাকে বলেছেন মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের মতে ভবিষ্যতের কবিতা যতই গভীরতর জীবনসত্যের দিকে এগিয়ে যাবে ততই তা মন্ত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল হবে যে কাব্য হবে দার্শনিক তত্ত্বের পদ্যরূপ। শ্রীঅরবিন্দ তা বলতে চাননি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন—দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বন করে পদ্য রচনা করলেই তা কাব্য হয় না। কাব্যকে তিনি মূলত কাব্যই রেখেছেন। কাব্যকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখতে চাননি।

৫.২.৮.২ : কাব্যের আত্মা

কাব্যের অন্তরে যথাযথ প্রবেশ না করে তাকে বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে প্রকৃত মনের কাছে প্রতিভাত হয়—কাব্য যেন কল্পনা, বুদ্ধি ও শ্রুতির এক রকমের উন্নত মানের চিত্ত নিবেদন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কাব্যের আত্মা, তার অন্তরের উদ্দেশ্য, গভীরতা বিধানের প্রয়োজন ছিল না। কাব্যের কাছে দুই রকম আনন্দ উপলব্ধি করা যায়—(১) বাহ্য-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আনন্দ (২) আত্মার কল্পনালব্ধ আনন্দ। আর এই আনন্দ আমাদের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনা বা শ্রুতি কোনোটাই কাব্যের উচ্চতম স্রষ্টা নয়। আসল স্রষ্টা হল অন্তরাত্মা। কাব্য বাণী যত সহজতরভাবে অন্তরাত্মায় গভীরে পৌঁছতে পারে, কাব্য তত মহৎ হয়ে উঠে। আনন্দ যেমন ব্যাখ্যাতা, সৃষ্টি কর্তা, তেমনি উদ্‌ঘাটিয়তা এবং রূপ-নির্মাতা। সেই আনন্দকেই কবির আত্মা অনুভব করে থাকে। একরকম বলা যায়—আধ্যাত্মিক সত্য, মহাচেতনা এবং সর্বভূতের যে জীবন, কবির আনন্দ হল তারই প্রতিচ্ছবি। এ হল এক মহাশক্তির বিস্তার।

এক ধরনের সমালোচকরা বলে থাকেন কাব্য হল আপেক্ষিকমাত্র। আঙ্গিক যতই অপরিহার্য হোক না কেন, অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কাব্যে বোধ হয় তার স্থান অনেক কম। কারণ প্রথমত—কাব্যের প্রকরণ অর্থাৎ ছন্দবদ্ধ বাক্, তা সূক্ষ্ম ও অমৃত উপাদানে পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শিল্প স্রষ্টায় মধ্যে কাব্য হল সবচেয়ে জটিল, নমনীয় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই তার বিস্তার অসীম। কাব্যের দুটি সস্তা অনুভূতিময় উপাদান রয়েছে। তা হল—(১) ধ্বনি (২) অর্থ বা চিন্তা। আর এই দুইয়ে রয়েছে আত্মিক মূল্য। এই উপাদানগুলি যদিও কাব্যের আঙ্গিকদের আশ্রয় করে গড়ে উঠে। কিন্তু কাব্য আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদান তা নির্দিষ্ট গণ্ডিকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় কাব্য তার নিজের অবসর নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। তা কোনোও বাহ্যিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কবি কাব্য সৃষ্টিতে আঙ্গিককে আয়ত্ত করে মাত্র। কবি-আত্মাও একটি প্রেরণা লব্ধ ছন্দ, একটি অন্তর্জাত ধ্যানলব্ধ আত্ম-জাগরণ গড়ে উঠে। এই ধ্যানলব্ধ বাক্‌ই হল শ্রেষ্ঠতম কাব্য বাণী।

মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তির উন্মেষ ঘটে ষড়ভঙ্গিমার সাহায্যে। বিশেষ বিশেষ ধ্বনি যে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করেও বুদ্ধিগত দিক থেকে যে-কোনো ধ্বনি যে-কোনো অর্থই প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, মানুষের প্রাণে অনুভূতি, আবেগ ও স্থূল মানসিকতা স্পন্দন সৃষ্টি করার ক্ষমতা ধ্বনির রয়েছে। কাব্যে ধ্বনি ব্যঞ্জনাশক্তির প্রতীক। তার প্রাণের ও বীর্যের প্রতি আবেগ, অনুভূতি ও প্রাণের ব্যঞ্জনাকেই আবিষ্কার করে না, তার আত্মাকেও সে সামনে তুলে ধরে। সুতরাং শাস্ত্রে যে অর্থ বহনকারী কাব্য তাকে সীমাহীন অর্থ ব্যঞ্জনায় উপনীত করে। তাইতো কাব্য শুধু প্রাণের ব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করে না, শব্দের আত্মিক, অভিব্যঞ্জনাকে, আত্মাকে তুলে ধরে, এবং সূক্ষ্ম দর্শন ও ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের ছন্দ: স্পন্দনের প্রকাশ ও গতি আসে আমাদের অন্তরাত্মায় সূক্ষ্ম দর্শনজনিত আত্মিক সংবেদন থেকে। এই সূক্ষ্ম দর্শন প্রকৃতি, ঈশ্বর, মানুষ, প্রাণীজীবন ও বস্তুজীবনে এবং যে-কোনো কিছু হতে পারে। হতে পারে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য, চিন্তাজাত সত্যে, সুখ-দুঃখে, কিংবা জীবন দর্শনে। এর ফলেই পাওয়া যায় প্রকৃত খাঁটি কবিতা, মহৎ কাব্য।

ভাষা যেসব জিনিসকে প্রকাশ করে, তার মধ্যে দুটি উপাদান থাকে। বাহ্য উপাদান এবং আত্মিকভাব। তাই তো কবি আবেগের ক্ষেত্রে শুধু আবেগকেই চায় না, আত্মাকেও চায়। কাব্যে কবির প্রয়াস হল তার বাণীতে জীবনের সত্য বা প্রকৃতির সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। এই মহত্তর সত্য, আনন্দ ও সৌন্দর্যই কবি অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি খুঁজে চলেছেন সেই সত্য, এবং সেই সত্যকে যা সুন্দর। তাইতো কবির নিজের ভিতরকার সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের কাছে উপহার দেন অন্তরাত্মায় আনন্দ। গদ্যে আবৃত করে দেয় কাব্যশৈলীর ও কাব্যিক আত্মা। এই তীব্রতা ও গভীরতার উৎস ভাষা। বাণীর অন্তরে অন্তরাত্মার সূক্ষ্মতার তীব্রতা থেকে এর রক্ষা।

৫.২.৮.৩:রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু

কাব্যের ছন্দস্পন্দনের মতো রচনাশৈলীরও একটি উদ্দেশ্য আছে। রচনা শৈলীর প্রসঙ্গটি আমাদের লক্ষণীয় বিষয়। যে-কোনোও রচনাশৈলীর মধ্যে কিছু শক্তি আছে যাকে ছন্দরূপ দেওয়া হয়েছে। তাকে

কাব্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আমাদের কাজ এই শক্তির প্রয়োজন এবং এর গভীরতা কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা। অনেক কাব্যকে আমরা সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিই না। কারণ সেই কাব্যের প্রকাশরীতি, গদ্যশৈলী লক্ষণীয়। কিন্তু ভুললে হবে না, কাব্যশৈলীর মুখ্য বিষয় হল উপস্থাপিত বিষয়কে কল্পনার দৃষ্টিতে অন্তরের আবেগে অনুভূতিগুলিকে জীবন্ত করে তোলা, যা গদ্যশৈলীর উপাদান থেকে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবুও কাব্যে একটি নির্দিষ্ট চিন্তাশক্তি, বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও মূল্যবোধ প্রকট হয়ে উঠে।

কাব্যের মধ্যে চিত্রকল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের মতো মানুষের মনের কাছে মূর্তিমান চিত্র ভাস্বর হয়ে উঠে। কাব্যবাণীর মূল কথা হল পাঠকের চিন্তা ও অনুভব করা নয়, বরং বহু বিষয়কে আমাদের কাছে এনে দৃশ্যপট তৈরি করা। কাব্য ভাষার প্রাথমিক ফলশ্রুতি এবং শক্তি হল এই দৃশ্য রচনা করা। কারণ প্রকৃতি জগতে আমরা যাকে নিয়ে থাকি, আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় রাজ্যে, কবি আমাদের শেখান তাকে নিয়ে অন্তরাত্মার মধ্যে, তাকে মানসে মনে ও হৃদয়ে অবস্থান করতে। আর তার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মা দিয়ে অন্তরাত্মারই আলোতে অন্তরের দিব্য চক্ষু দিয়ে আমরা দেখে থাকি। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যেমন বলেন কবি হলেন ঋষি স্রষ্টা। তিনি শুধু ছন্দের যাদুকর নন, কবিশাস্ত্র রচয়িতার কলাকুশলী নন, তিনি পংক্তিতে ও স্তবকে স্তবকে চিন্তাশক্তির প্রতিফলন ঘটান না। তিনি সীমার গণ্ডি অতিক্রম করে লাভ করেন দিব্যবাণীশক্তি। যে বাণী আমাদের জ্যোতির্ময়ী দর্শন থেকে বেরিয়ে আসে। আর সেই বাণীকে লাভ করার জন্যই কাব্যশৈলীর সাধনা।

আধুনিক মতানুযায়ী কাব্যের আবেদন হল বুদ্ধির কাছে নয়, কল্পনায় কাছে। কল্পনাও আবার অনেক রকমের। যেমন—বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা, যা জীবন ও জগতের বাহ্য চাপের সঙ্গে দৃশ্যমান। ভাবনিষ্ঠ কল্পনা যা মনের ও আবেগের সাঙ্গে জড়িত। এই সব ছবি মনের রাজ্যে কল্পনার জন্ম দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে খেয়ালী কল্পনা যা মনকে অস্থির করে না। আছে নান্দনিক কল্পনা যা বিলাস বাণী ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্য নিয়ে গঠিত। কাব্য সৃষ্টিতে এই সবেরই নিজস্ব স্থান আছে। কাব্যশৈলীর ক্ষেত্রে এগুলি প্রণয়ন মাত্র। আসলে কবি-কল্পনা বাস্তব অবাস্তব কারোর স্রষ্টা নয়, সে শুধু সত্যের স্রষ্টা। শিল্পের মতো কাব্যেও প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি অনুকরণও হয় না। কিংবা কল্পনার রহস্য ব্যাখ্যা করেন মাত্র। যা আমাদের কাছে গোপন থাকে, কিন্তু সঠিক সময়ে তার দ্বারস্থ হলে আমাদের কাছে রহস্যকে মেলে ধরে।

আরেক ধরনের রচনাশৈলী যা বিষয়বস্তু অনুযায়ী হয়ে থাকে। কারণ কবির দৃষ্টি ও তার ভাষার মধ্যে মিল একাত্ম হয়ে যায়। তবে এই মিল বা একাত্ম সর্বদাই নির্ভুল নয়। কাব্যে প্রাণময় শৈলীর একটি নিজস্বতা আছে। তেমনি আবেগময় শৈলীরও নিজস্ব শক্তি আছে। আবার সুনির্দিষ্ট শৈলীরও মৌলিকতা লক্ষ করা যায়। তবে এই সব শৈলীরও নিজস্ব শক্তি থাকলেও উচ্চতর কল্পনায় ভাষা থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ চিন্তা ও আবেগের একনিষ্ঠ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

There’s not a joy the world can give like that it takes away.

এই পংক্তিতে বায়রন সস্তা আবেগের স্ফুটন ঘটিয়েছেন মাত্র। কারণ এখানে বিশ্বব্যাপী বেদনাকে ব্যক্ত করায় পক্ষে যথেষ্ট নয়।

Gods in his heaven

Alls right with the world.

এখানে ব্রাউনিং উচ্চশক্তিসম্পন্ন ভঙ্গিতে বিশ্বের আনন্দকে ধ্বনিত করেছেন মাত্র।

কাব্যশৈলীর যেখানে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন, এর থেকে ঊর্ধ্বতর এক শৈলী আছে, যা বুদ্ধি, প্রাণ শক্তি, আবেগ শক্তি কাব্য ভাষা কিছুই নয়—তা হল কবির সূক্ষ্ম দর্শনের মহৎ এক সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য বস্তুনিষ্ঠ বা ভাবনিষ্ট উভয়ই হতে পারে। সে সৌন্দর্য কখনও অল্প কখনও বেশি হতে পারে। যাতে থাকে অন্তরাত্মার অপরিসীম শক্তি, যা কাব্যের ভাষা ছন্দের প্রবাহকে বয়ে নিয়ে যায়। যদিও তার তীব্রতার তারতম্য লক্ষণীয়। কখনও সৌন্দর্যের জন্য কাব্যিক প্রয়াস, কখনও কবিমনের সচেতন অভিপ্রায়, অন্তরাত্মায় গভীরতম বিন্দুকে গড়ে তুলেছে বাহ্য সৌন্দর্য দিয়ে, সেখানে চিত্রকল্প সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। আর এই সৌন্দর্যই আমাদের মধ্যে উঠে আসবে চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কাব্যের এই চিত্রকল্প ও আধ্যাত্মিক আনন্দ হল সৃষ্টিশীল কাব্যিক উল্লাস।

কাব্যের আনন্দ, চিত্র, তীব্রতা কোনোও একটি বিশেষ রচনাশৈলীতে আছে তা নয়, কাব্য ভাষার কোনোও বিষয়ের উপর নির্ভর করে না একে অলংকিত চিত্রসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশেরই মধ্যেই পেতে পারে। যেমন পেয়েছি কালিদাস ও Shakespeare-এ। তাঁদের রচনায় প্রত্যেকটি শব্দকে যথাসম্ভব সর্বাধিক ছন্দস্পন্দন ও ভাব ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করে তুলেছেন তীব্রতার কোনোও মাধ্যম নয়। এই তীব্রতা ও কাব্য শৈলী হল অভিন্ন বস্তু। 'বাক্' নিজেই অধিষ্ঠাতা। নিজের উপাদান নিজেই সৃষ্টি করে চলে। বাইরের সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, অন্তরের মন্ত্রই কাব্যে একমাত্র উপযোগী শৈলী।

৫.২.৮.৪: ছন্দস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন বা আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের যুক্তিতর্কলব্ধ দর্শনের মতো নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—তাঁর দর্শন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। এই দার্শনিক চিন্তা তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। তিনি মনে করেন, কাব্য হল আমাদের গভীরতম সত্তার—আমাদের অন্তরাত্মার জীবন্ত অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত উপলব্ধির প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দের মতে 'ভবিষ্যতের কবিতা যতই গভীরতর জীবনসত্যের দিকে এগিয়ে যাবে ততই তা মন্ত্র হয়ে উঠবে। এই মন্ত্রের সৃষ্টি হবে একমাত্র তখনই যখন কাব্যে ত্রিবিধ তীব্রতা সাধিত হবে। এই ত্রিবিধ তীব্রতা হল, প্রথমত, ছন্দোময়

গতিপ্রবাহের সর্বাধিক তীব্রতা, দ্বিতীয়ত, বাণীরূপ ও চিন্তাবস্তুর পরস্পর পিনদ্ধতা অর্থাৎ রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা এবং তৃতীয়ত, অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা। সমস্ত মহৎ কাব্যের জন্ম এই তিন উপাদানের ঐক্যতান থেকে। এই তিন উপাদানের মধ্যে যে-কোনো একটির ঘাটতি হলে কাব্য মহৎ কাব্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

উল্লেখিত তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রাথমিক গুরুত্ব হল কাব্যের ছন্দস্পন্দন। এই ছন্দস্পন্দন শুধু ছন্দের বহিরঙ্গ কারুকার্য নয়। অর্থাৎ ছন্দের মিল বা মাত্রাবিধানের খুঁটিনাটি পরিমাপ হলে তা সার্থক হবে না। ছন্দের আসল স্পন্দন কবি হৃদয়ের গভীরতম স্পন্দন থেকে আসে। তার মানে ছন্দ শুধু কাব্যের বাইরের পোষাক নয়। ছন্দ হল কবির স্পন্দিত আবেগের অভিব্যক্তি। এই জন্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"যখন আমরা কাব্যের গতিপ্রবাহের কথা বলি, তখন শুধু পদ্যবন্ধের যান্ত্রিক ছন্দস্পন্দনকেই বোঝাতে চাই না, এমনকি তার নিখুঁত আঙ্গিকগত চমৎকারিত্ব থাকলেও না। সেই পারিপাট্য হল শুধু প্রথম ধাপ, শুধু স্থূল ভিত্তি। এই উপরে থাকা চাই এক গভীরতর সূক্ষ্মতর সঙ্গীত, এক ছন্দিত আত্মিক গতি, যা ছন্দের যান্ত্রিক কাঠামোয় প্রবেশ করে এবং তাকে ছাপিয়ে যায়।"

শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য হল আমাদের অন্তরতম সত্তাতেই নিত্য ছন্দস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। কবির কাব্যে খাঁটি ছন্দ হল এই অন্তরের স্পন্দনেরই বাহ্য অভিব্যক্তি। সুতরাং ছন্দের উৎস কবির গভীরতম সত্তার কাছে। এই আবেদন শ্রোতা বা পাঠকের গভীরতম সত্তার কাছে। এই আবেদন কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে—"আমাদের ভিতরের একটি কান আছে, যার দাবি আরও অনেক বড়। সেই ভিতরের কানের কাছে পৌঁছান এবং তাকে তৃপ্ত করাই হল সুরমাধুর্য ও সুরসুষমার স্রষ্টার সত্যকার উদ্দেশ্য।"

শ্রীঅরবিন্দ মহৎ কাব্যের সঙ্গে ছন্দ গভীরভাবে অন্বিত বলে মনে করেন। সাম্প্রতিক কালের একটি প্রবণতা হল ছন্দস্পন্দন ত্যাগ করে গদ্যকবিতা রচনা। হুইটম্যান ও কার্পেন্টারের কবিতাই এই প্রবণতার বাহন। ফ্রান্স ও ইতালিতে এই ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। গদ্যকাব্যের সমর্থক কবিরা মনে করেন যে, পদ্য ছন্দের বন্ধন কাব্যের পায়ে একটা শিকলের বেড়ি এঁটে দেয়। পদ্যছন্দ স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এই সীমা ভেঙে গদ্যকাব্যের রচয়িতা কাব্যের ভাবকে মুক্তি দিতে চান। শ্রীঅরবিন্দের মতে কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে একথা সত্য হলেও সর্বক্ষেত্রে সত্যি নয়। অনেক মহাকবি ছন্দবন্ধনকে মেনে নিয়েই অনেক মহৎ কাব্যের মহৎ ভাবকে প্রকাশ করেছেন। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে ছন্দবদ্ধতা প্রতিবন্ধক নয় এবং যারা গদ্যকাব্য রচনা করেছেন তারা এই মহাকবিদের চেয়ে বড় সৃষ্টি রেখে যেতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন গদ্যকাব্যের রচয়িতারা যতদিন না তাঁদের নতুন গদ্যকাব্য নিয়ে এমন সৃষ্টি রেখে যেতে পারছেন, যার পাশে অতীতের মহান স্রষ্টাদের সৃষ্টিগুলি ম্লান হয়ে যায়, ততদিন তাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও একসময় গদ্যকবিতা রচনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও গদ্যছন্দ ছেড়ে পদ্যছন্দে ফিরে আসতে

হয়েছে। এবং গদ্যছন্দে রচিত তাঁর কবিতাগুলি পদ্যছন্দে রচিত কবিতাগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট এমন কথা আমরা বলতে পারি না।

মিলটন প্রথম জীবনে একসময় মিত্রাক্ষরে কবিতা রচনা করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই মিত্রাক্ষর ত্যাগ করে অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু প্রথম জীবনের কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত বলে লিরিক কবিতা হিসাবে কোনোওক্রমে নিকৃষ্ট নয়। আর পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরে তিনি মহাকাব্য রচনা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে অমিত্রাক্ষরও এক রকমের পদ্যছন্দ, এটা গদ্যছন্দ নয়। তিনি একথাও বলেছেন—"শুধু ভাষার শক্তির সঙ্গে ছন্দোযন্ত্রের টুংটাং ধ্বনির যাদু এসে মিলিত হলেই তা কাব্যের মহত্তর পরিচয় বহন করে না। কাব্যের রূপ বা ছায়া তার থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যের আত্মা তার নেই।"

অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেছেন বাঁধাধরা সুরসুষমা বা সুরমাধুর্যে কান তৃপ্ত হলেও নান্দনিক চেতনা নিম্নগামী হয়। সবসময় এ কথা স্মরণে রাখতে হবে শিল্পীত রূপ ও শ্রুতিমধুরতা নয়, বরং তা হয়ে উঠবে—"অন্তরের এমন একটা কিছু যা ভিতরের সংগুপ্ত সুষমার একটা প্রতিধ্বনি এনে ধরতে চাইছে, আমাদের অন্তর্লোকের ছন্দিত অসীমতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছে।" উচ্চতর সুরসুষমা ও সুরমাধুর্য পূর্ণ ছন্দস্পন্দন অন্তরাত্মাকে স্পন্দিত করে। আর তখন "এর আধারে কানায় কানায় ভরে ওঠে সঙ্গীত; কখনো বা মনে হয়, এ কাব্যে গড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল সেই সঙ্গীতেরই মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যে সঙ্গীতের গতিপ্রবাহের ভিন্নতর একটি অধরা আধ্যাত্মিক রহস্য রয়েছে।" আর সেই কাব্যই মহৎ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

৫.২.৮.৫ : কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র

কাব্যের তীব্রতা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যখন এর গভীরতা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আধার হয়ে উঠে, তখনই জীবনবোধ, চিন্তাশক্তি, আবেগ এবং বস্তুর সৌন্দর্যের দর্শনজনিত তীব্রতায় পরিণত হয়। সেই সাথে কাব্যের উদ্‌ঘাটন বস্তুসৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। মহৎ কাব্য-বাণী হল বস্তুর উদ্‌ঘাটন। কাব্যের ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহৎ কবিদের ক্ষেত্রে তীব্রতা লক্ষ করা যায় জোয়ারের জলের ন্যায়, কারণ কবির এইসব সূক্ষ্ম মুহূর্তের আবির্ভাব হয় কবির সূক্ষ্মদর্শন ও কাব্যবাণীর অটুট শক্তি থেকে।

সূক্ষ্মদর্শন হল কবির নিজস্ব শক্তি। সমস্ত মহৎ কাব্যই তার নিজস্ব আদর্শ ও তাৎপর্যের সেই মহত্তর সত্যকে সংরক্ষিত রাখে। তাই কাব্যের আবেদন আমাদের ভিতরের কানের কাছে। আর কানের ভিতর দিয়েই কাব্যকে মরণে পৌঁছতে হবে। ফলে কবি আমাদের বহির্দৃষ্টি নয়—অন্তর্দৃষ্টির মুক্তি ঘটান। যারা মহৎ কবি হয়ে উঠতে পেরেছেন, তাঁরা প্রকৃতি মানুষও জীবনকে ব্যাপক ও বলিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী এবং বোধিলব্ধ সূক্ষ্ম দর্শনের অধিকারী, সেই সূক্ষ্মদর্শনের সর্বোত্তম প্রকাশেই কাব্যের জন্ম। হোমার, শেক্সপীয়ার, দান্তে, বাল্মীকি, কালিদাস সকলেরই সূক্ষ্মদর্শনই মহত্তের মৌলিক লক্ষণ। যদিও চিন্তাশক্তি চিত্রসম্ভার ও কাব্যিক প্রকাশ ভঙ্গির ছিল মাত্র, এগুলি কাব্যের উৎস বা আত্মা ছিল না। বিশেষ দৃষ্টি হল কবিপ্রতিভার মূল শক্তি। আসলে কবিরা হলেন কাব্য-সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা।

আধুনিক গতিসৌন্দর্য ও সৃষ্টিশীল কবিদৃষ্টির ব্যাপকতা আমরা চাই না, সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়ে উঠুক কবিরা। বরং আমাদের কাছে কবিরা দার্শনিক নবী, আচার্য এবং একটি ধর্ম বা নীতির প্রচারক হয়ে উঠুক, কারণ আমরা যখন সত্য একই ঋষির ভূমিকা দাবি করি কিংবা ঈশ্বর, দেব-দেবী কিংবা মানুষ প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টির মহৎ কাব্য খুঁজে পাই। কারণ মানব জাতি ও জীবনদর্শনের উপদেশ বাণী কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে।

ঈশ্বর বাণী কিংবা বিধান দেন আদেশ হিসাবে। কিংবা কবি সত্যকে ফুটিয়ে তোলেন সৌন্দর্য শক্তির মধ্যে এবং প্রতীকী ও চিত্রকল্পের মধ্যে। অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে লীলার মধ্যে। দার্শনিক ও কবির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দার্শনিকের কাজ মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করা এবং সত্যের বিভিন্ন দিক বিন্যস্ত করা। কবির কাজ সত্যের বিভিন্ন দিককে ধারণ করা এবং একটি জীবন্ত সম্পর্ককে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ কবি সত্যের রূপকাষ্ঠে সংবেদনের বশে সত্যের আদর্শকে সৌন্দর্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করা।

আবার একজন নবীর সাথে একজন কবির সঙ্গে চিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি লক্ষ করা যায় তখন নবীর মধ্য কবির অবস্থান হতে পারে। তিনি তাঁর অনুভূতি ভাষা ও বাণীকে প্রাণের ভেতরে ঘিরে রাখেন। ভবিষ্যতের চিন্তা করো না।—নবী এই নির্দেশকে খুঁজে পান সত্যে, সৌন্দর্যবাণী প্রকাশ বাণী, চিত্রকল্পে। দার্শনিক তেমনি তাঁর নিরস মুক্তিজাল থেকে মুক্তি দেবার জন্য এবং মুক্তির ঘন আবরণে রং ও রেখার ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এসবই অভ্যন্তরীণ স্তর নয়—বাইরের অলংকার মাত্র। দার্শনিক যদি তাঁর চিন্তাকে কাব্যের বিষয় করে তোলেন তবে তিনি দার্শনিক ভাবুক থাকেন না, তিনি ঋষি কবি হয়ে উঠেন। তাই কট্টর পুরাতত্ত্ববিদরা অনেককেই দার্শনিক বলতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি চিন্তা করেন না, ভাবুক নয়। তিনি স্রষ্টা। তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। কিন্তু এ দৃষ্টি দার্শনিক মস্তিষ্ক দিয়ে নয়—ঋষির চোখ দিয়ে। দার্শনিক কবিতাও দার্শনিক মনের দেখবার রীতি, পদ্ধতি ও প্রকাশ ভঙ্গিমা—তা যত দূরে যাবে ততই কাব্য নামে প্রতিফলিত হবে। এবং কাব্যরূপেই বেঁচে থাকবে। তার সূক্ষ্মদর্শন নিজেকে চিন্তা সমৃদ্ধ চিত্রকল্পের মাধ্যমে ঢেলে দেবে।

যদিও পূর্বে এই পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেনি। সেজন্য আমরা বেশ শক্তিশালী কবির দার্শনিক মতবাদকে, দার্শনিক মতবাদের চেয়েও বেশি গদ্যময় বিষয়কে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হ্যাসিয়দ ও ভার্জিলের কথা।

ভার্জিলের ‘Geogrgies’ (কৃষিবিদ্যা) কাব্যটি সুন্দর সুন্দর অনুচ্ছেদে নিসর্গ চিত্রে, ছন্দ ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে আজও বেঁচে আছে। ভারতবর্ষই এই দার্শনিক প্রয়াসকে কাব্যিক সাফল্যে রূপান্তর করতে পেরেছে। যেমন গীতা ও উপনিষদে আদর্শের পরিকল্পিত কয়েকটি অপ্রধান রচনা। গীতায় কাব্যিক সাফল্য হল—জীবনের এক মহান সংকটময় পরিস্থিতি, দ্বিতীয়ত গীতায় যে আধ্যাত্মিক রীতির অনুভূতিকে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে প্রকাশ করে। এমনকি কখনও কখনও পদ্যে রচিত কিন্তু গদ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আসলে উপনিষদগুলি দার্শনিক মনন থেকেও আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎ দর্শন বেশি।

আসলে বর্তমানে আমাদের নান্দনিকবোধ রোমের কবিদের ভ্রান্তিকে সরিয়ে যেতে পেরেছি। আজও কাব্যে একটি সূক্ষ্মতর রূপে বুদ্ধির প্রবণতাকে অনধিক প্রবেশের মনোভাব লক্ষ করা যায়। আসলে সমালোচনা দার্শনিক ভাবকে কাব্যে প্রকাশ করাই আমাদের মূল লক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরন্ডলের মতানুযায়ী "কাব্য হল জীবনের সমালোচনা।"

শিল্প রূপের দিক থেকেও কোনো দার্শনিক সত্যের প্রকাশ কাব্যের মূল সূত্র নয়। বরং মূল মন্ত্র হল অন্তরাত্মা আত্মদর্শন এবং ঈশ্বর প্রকৃতি জগৎ এবং অন্তর্সত্যের সদ্‌গত দর্শন ছন্দময় প্রকাশই হল কাব্য।

জীবন সম্পর্কে শিল্পীর সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত, সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে এরকম পার্থক্য রচনা করা হয়ে থাকে। যেমন জীবন ভাবনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ পার্থক্য, ভাববাদী ও জড়বাদী দৃষ্টিভক্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন কবি বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা দেখতে পারেন। কিন্তু যখন ভাবগত বিষয় তুলে ধরতে যান তখনই তাঁর হাত কাঁপে। দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারেন না। আবার একজন কবি ভাবগত জগতে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। কিন্তু তারা উভয়ই উঁচুস্তরের কবি হতে পারেন। পরিষ্কারভাবে কাব্যকে জীবন্ত করে তুলতে কবির নির্দিষ্ট বস্তুনিষ্ঠতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবগত দৃষ্টি রূপায়ণও দরকার। কবির সৃষ্টি বাইরের জীবন থেকেও ভেতরের জীবনের প্রভাবই বেশি তাই বাইরের দৃষ্টি কাজে লাগায় মাত্র, অন্তর্দৃষ্টিকেই শিল্পসৃষ্টির কাঠামো করে তুলতে হয়।

বস্তুমুখী শিল্প থেকে আমাদের ফোটোগ্রাফিতে নিয়ে আসি। আর ভাবমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে কমানোর প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের পক্ষেই উপযুক্ত—কাব্যের পক্ষে নয়। এর দ্বারা মহত্তর সত্যকে বা অধিক বাস্তবকে পাওয়া যায় না। বরং হারানোর সম্ভাবনাই বেশি। বৈজ্ঞানিক উপস্থাপন নির্ভুল হলেও আত্মার কাছে খাঁটি বস্তু ও পূর্ণ সত্য নয়—তা বস্তুর প্রক্রিয়ামাত্র। বস্তুবাদী শিল্পকলা আদৌ শিল্পনামের যোগ্য হলেও জীবনের যথাযথ উপস্থাপন নয়। বিজ্ঞানের উপস্থাপন হতে পারে। কারণ কোনো শিল্পই বিজ্ঞান নয়, শিল্প-বিজ্ঞান হতে পারে না। ভাববাদী শিল্পকলা সৃষ্টি করে শক্তিশালী রচনা, সৌন্দর্য ও কাল্পনিক ইন্দ্রজাল। যদিও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কবির জন্যে এই আইন করা যায় না। কারণ কবি বলেন নিজের দেখা যায় অনুযায়ী। এতটুকু বলা যায় কাব্যে কবির অন্তরের জাগ্রত শিল্পেরই সৃষ্টি করবেন—কোনো কৃত্রিমতা নয়।

আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাব্যের মূল বিষয় ছাড়া অন্য সব উপাদান কবির নিজের মতানুযায়ী চলবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই একটি জিনিস দরকার—তা হল যে সব শব্দ, চিত্রকল্প ব্যবহার করবেন, এর দ্বারা কবি সেই মূল সত্যের আলোকে পৌঁছবেন। কবির স্বতন্ত্র সত্তা সেই সত্যের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। কবিও নিজেকে তার সৃষ্টির মধ্যেই লীন করে দেব। স্রষ্টার নিজস্ব ও সূক্ষ্মদর্শন অসীময়তা হারিয়ে যায়। তখন সর্বভূতের যিনি আত্মা তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য করেন।

অন্যসব জিনিসের কবির সূক্ষ্মদর্শনও মানব মনের বিবর্তনের সাথে যুগ ও পরিবেশ অনুযায়ী উত্থান-পতন ঘটে। যেমন প্রথম যুগে মানুষের দৃষ্টি ছিল চারি পাশের বস্তুজগতের দিকেই জীবনের গল্পে ও তার ধ্যান-ধারণা আবদ্ধ। তারপর আসে পরিচিত বাস্তব জগতের পরিকল্পিত চিত্র। সেই পর্বে লক্ষ করা যায় মানুষের প্রাণশক্তির আনন্দ ও উৎসুক্য, তার অস্তিত্বের জীবন কামনা ও রোমাঞ্চকর অনুভব। এর দ্বারা

মানুষ প্রত্যাশা করল কাব্য ও শিল্পে উপস্থাপিত কল্পনা ও আবেগের মাধ্যমে। তারপর সে শুরু করল বিষয়বস্তু নিয়ে বুদ্ধির কারসাজি। ক্রমানুযায়ী উন্নত নান্দনিক চেতনার জাগ্রত আনন্দের রূপ নিল। ফলে মানুষের মন ও আবেগের মাধ্যমে কল্পনার কাছে আবেদন সৃষ্টি কাব্য এক ধরনের কবিতা। এবং বুদ্ধির কাছে মানসিক স্তরের কবিতাই হল প্রাচীন ও আধুনিক যুগের দুই অবদান। পরবর্তী কাব্য আরও সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে এক শিল্প রূপ গড়ে উঠেছে, এখানেই কাব্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা। এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কাব্য এক মহৎ কাজ করতে পারে। কবিকে এই সত্য নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। মানুষের মন জীবনের ক্রিয়াশীল, অন্তসত্তার মন এবং অন্তসত্তার শক্তিগুলিকে নিবিড়ভাবে গড়ে তোলে। তখন কাব্য সৃষ্টির উর্ধ্বতর স্তরে আবির্ভূত হয়। আরও গভীরতায় ও বিস্তারতর দিকেই পৌঁছয়। কবির দৃষ্টি যে সত্য দর্শন করে এবং কাব্য শক্তি সেই মহত্তর কাজটি সম্পূর্ণ করে। এজন্যেই কাব্য দৃষ্টি ও কাব্য শক্তির পূর্ণতা আসে।

ভাষা ও ছন্দের শ্রেষ্ঠতাই কাব্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভাষা ছন্দের সার্থকতা আগে, যখন কাব্যে সূক্ষ্মদর্শনের তীব্রতা থাকে। কবির দৃষ্টি শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে না; দেশ-কালে মানসিকতার উপরেও নির্ভর করে। একটি মহান যুগের একজন ছোট্ট কবিও মহৎ কবিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। একজন কবির মুহূর্তের সূক্ষ্মদর্শন শেক্সপীয়ার, দান্তে-এর থেকে আমাদের মনে বেশি দাগ কাটতে পারে। যদি মানব জাতি তার নিজের বিকাশগুলোকে সেইযুগের সাথে মিলিয়ে নেয় তবে তার আগে অনেক দৃঢ় জায়গায় পৌঁছাতে পারে। যার সার্থক রূপ ও প্রতীক সূক্ষ্মদর্শনের সাথে মিলিয়ে দিতে পারে।

৫.২.৮.৬ : কাব্যের জাতীয় বিবর্তন

জাতীয় জীবনের বিবর্তনের সাথে কাব্যের সম্পর্ক আমরা পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছি। কারণ কাব্যের সাথে জাতীয় জীবনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'ভবিষ্যতের কবিতা গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কবির সৃষ্টি যে শুধু নিজের উপর ও তাঁর দেশের উপর নির্ভর করে না, তার জাতির মানসিকতার উপর নির্ভর করে। সেই জাতির আধ্যাত্মিক, বৈদিক ও নান্দনিক পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল, তা বলে তিনি নিজেকে সে শুধু জাতির প্রতিধ্বনি ও জাতির অতীত জীবনের ঐতিহ্যের উপর আবদ্ধ থাকবেন না। বাইরের জীবন থেকেও মৌলিক ও নিজস্ব পথ খুঁজে বের করবেন। যেমন বর্তমান কালে আইরিশ ও ভারতীয়রা অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও বলিষ্ঠ আত্মচেতনাকে ফিরিয়ে এনেছেন। এবং তাদের সাহিত্যে-সচেতন জাতীয়তাবাদ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীঅরবিন্দ কাব্যের সাথে জীবনের সম্পর্কের কথাও স্বীকার করেছেন। কবির সাথে কবিতার তীব্রতাকেও তুলে ধরেছেন। কবির সংস্কৃতি ঐতিহ্য চেতনাই প্রতিফলিত হয় কবিতায়। যদিও কবির সৃষ্টি নিজে থেকেই নিজের ভেতর থেকেই তবুও তাঁর চারপাশের জীবন-অভিজ্ঞতা উপলব্ধি, ভাল-মন্দ, জীবন-দর্শন এ ছাড়া কবির সামগ্রিক পরিবেশ কবিতায় প্রতিফলিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন যুগে যুগপ্রবণতা মানুষের জীবন, সংকট, যুগগত সমস্যা কাব্যে উঠে আসে। আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক ভাবনা-চিন্তাও কবির মননকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি কাব্যেও প্রতিফলিত হয়।

কবির সৃষ্টি জাতির মানসিকতার উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ধর্মীয় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই কবির নিজস্ব ধর্মীয় প্রবণতাই কাব্যে উঠে আসে। কারণ কবিতায় নিজস্ব সংস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না। আমরা যদি কবি জগতের দিকে দৃষ্টি দই, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল কবির মধ্যে নিজস্ব জাতীয় মানসিকতায় ও জাতীয় মহাকাব্যের ভাব-প্রবণতা লক্ষ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা কবির দ্বারস্থ হতে পারি এবং তাঁর দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি সেই জাতির সত্যকার নান্দনিক অভিব্যক্তি।

একইরকমভাবে কবির সৃষ্টি জাতীয় জীবনের সাথে যুক্ত। অপরদিকে কবি জাতীয় জীবন থেকে যুক্তও বটে। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের অবগত করে গেছেন কবির কাব্য সর্বদাই যে নিজস্ব জাতি ও পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তা সত্য নয়। কখনো কখনো কাব্যের প্রয়োজনে তিনি স্বজাতিত্ববোধ থেকে বেরিয়ে যান, জাতীয় জীবনে দাঁড়িয়ে কবির এমন কিছু সৃষ্টি করেন, যা তাঁর নিজস্ব জাতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এবং নিজস্ব জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। যেমন—গোর্কির 'Mother' রচনায় রাশিয়ার উত্থান-পতনকে তুলে ধরেছে। এখানে কবি জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, জাতির উত্তীর্ণের পথ খুঁজেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জাতির স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করেছেন, যা ভারতীয় জাতির মধ্যে নতুন ধারার সূচনা করেছেন। এই স্বদেশীচেতনা বা আন্তর্জাতিক ভাবনা বাঙালি জাতির মধ্যে ছিল না বললেই চলে। এভাবেই শিল্পী তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে জাতির মুক্তি ঘটান। এরূপ উপাদানগুলি কবির চিত্তে সচেতনভাবেই প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষের সাথে পরিবেশের দারুণভাবে মিল লক্ষ করা যায়। পরিবেশের উপাদান মানব-জাতিকে প্রতিনিয়তই পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। স্বভাবতই কবি বা শিল্পীরা নিজস্ব পরিবেশের উপাদানকে অতিক্রম করতে পারেন না। মানুষ তার পরিবেশের সাথে একটা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমালোচনার রীতিতে আবদ্ধ থাকেন। ঐতিহাসিক সমালোচনা বাহ্য এবং অবাস্তব পদ্ধতির কখন বাদ দিলেও ঐতিহাসিক সমালোচনাতত্ত্বের মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে। সেটা কোনো মূল বিষয়কে সত্য-সত্যই সহায়ক হতে পারে, যা আমাদের কাব্য আস্বাদনের ব্যাপার না হলেও কাব্যের বুদ্ধিগত বিচারে সত্যিই সাহায্য করতে পারে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলেন—

"কাব্যাস্বাদনের খাঁটি ঋষি—কবি এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা আমাদের জানা একান্তই প্রয়োজন, তার জন্য সোজাসুজি কবিরাই দ্বারস্থ হতে হবে, তাঁর কাব্যের কাছেই চলে আসতে হবে; সত্যকার নান্দনিক বা কাব্যিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সত্যিই আমাদের যা দরকার তা সেখানেই আমরা পাব।"

প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির দুটি উপাদান রয়েছে—(১) কালোত্তীর্ণ শাশ্বত সত্য বস্তু (২) কালগত উপাদান নশ্বর বস্তুরাজি। যার দ্বারা আমাদের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা যা আমাদের মূল নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত। কবি ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্য ও সুন্দর নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে। এবং কবির ব্যক্তিগত বুদ্ধি নয়, বরং নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ আত্মপ্রকাশের বাণীকে খুঁজে বের করে সৃষ্টি করে চলেছেন।

তা সত্ত্বেও কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। এবং শ্রোতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। এই দুইয়ের মিলনের

দ্বারা বুদ্ধিগত নান্দনিক বিচারবোধের কাছে কাব্যের আবেদন গিয়ে পৌঁছায়। এই ব্যক্তিগত ও কালগত উপাদান সর্বদাই কাব্যকে আকর্ষণ করে। কাব্যে সে জিনিস আমরা আস্বাদন করি, তার চেয়ে বড় কথা, যেভাবে আমরা আস্বাদন করি সেটাই হল কাব্যের ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সেজন্যেই কাব্যসৃষ্টির প্রকাশ ভাব উদ্দেশ্য এবং ব্যঞ্জনা শিল্পরসের বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত সৌন্দর্যে একাত্ব স্থাপন করে।

প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি মূলভাব থাকে। এই মূলভাবটি হল মানুষের আত্মার একটি বিশেষ রূপ, এই রূপেই বিবর্তনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ যা কিছু আরোহণ করে, সবকিছুই তার মূলভাবের মধ্যে মিশিয়ে নেয়। তাঁর কাব্য শিল্প ও দর্শন হল আত্মারই অভিব্যক্তি। কবির আত্মা জাতির চিত্ত মেলে বা জ্বলজ্বল করতে পারে। তার সৃষ্টি জাতির চিত্ত থেকে পৃথক নয়। তবু কবির ব্যক্তিত্বে জাতির মূলভাবের মধ্যেই উদ্‌ঘাটন ঘটে। সুতরাং কাব্যে জাতীয় বিবর্তন এবং তার সঙ্গে কবির সৃষ্টি সম্পর্কে একাত্ম করাই আমাদের চেষ্টা, তা সফল হতে বাধ্য। কাব্যের নিজস্ব আত্মজভাবও রূপের দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পর্ক থেকেই উঠে আসে।

৫.২.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতা : অধ্যাপক রামেশ্বর শ্ অনূদিত (পুস্তক বিপণি)

২। আধুনিক বাংলা উপন্যাস পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ (পুস্তক বিপণি) : অধ্যাপক রামেশ্বর শ্

৩। ক. বি. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ষষ্ঠ সংখ্যা) (Aesthetic and Literary Theory of Sri Aurobindo : Rameswar Shaw)

৪। সাহিত্য বিবেক : ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দে'জ পাবলিশিং)

৫। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দে'জ পাবলিশিং)

৫.২.৮.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'ভবিষ্যতের কবিতা অবলম্বনে শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা লিপিবদ্ধ করো।

২। কাব্যের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক বলতে শ্রীঅরবিন্দের মতামত আলোচনা করো।

৩। 'ভবিষ্যতের কবিতা অবলম্বনে কাব্যের আত্মার পরিচয় দাও।

৪। জাতীয় জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কতটা? শ্রীঅরবিন্দর 'ভবিষ্যতের কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।

৫। কাব্যের শৈলী কীরকম হওয়া উচিত তা শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতা অনুসরণে লিপিবদ্ধ করো।

———————

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক : ৯ : প্লেটো

বিন্যাসক্রম :

৫.৩.৯.১ ভূমিকা

৫.৩.৯.২ প্লেটোর শিল্পতত্ত্ব

৫.৩.৯.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৩.৯.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৩.৯.১ : ভূমিকা

প্লেটোকে বলা হয় পাশ্চাত্য দর্শনের জনক। এ ছাড়াও নাটক রচনা, কাব্যিকতা ইত্যাদি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম দিক। সবচেয়ে আশ্চর্যের খ্রিস্টপূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেও প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার আদর্শ সোপান গড়েছিলেন তিনি। অসাধারণ মননশক্তির অধিকারী প্লেটো ছিলেন সকল দার্শনিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আজ সারা পৃথিবীতে নান্দনিক ভাবনার যে সুর দার্শনিকদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, তার উৎস বা সৃষ্টিপথ সেই প্রাচীন গ্রিসে। সেই প্লেটোর মননে। মার্কিন দার্শনিক যথার্থই বলেছেন, 'প্লেটোই দর্শন, আর দর্শন মানেই প্লেটো।'

তাঁর জন্ম প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স শহরে। খ্রিস্ট পূর্ব ৪২৭ থেকে ৩৪৮ অবধি তিনি জীবিত ছিলেন বলেই জানা গেছে। তিনি ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। অভিজাত পরিবারের এই সন্তান সেসময় অনায়াসে রাজনীতিতে ভালো পদ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু সে সব না নিয়ে মেতে উঠেছিলেন দর্শনচিন্তায়। ৩৮৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি এথেন্সে আকাদেমি খুলেছিলেন। বলা বহুল্য সেই আকাদেমির ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। প্লেটো কথোপকথন বা সংলাপের ভঙ্গিতে, মূলত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর কাঙ্খিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন বইয়ের পাতায়। প্লেটোর ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপকতার সুর লক্ষ করা যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। যেমন 'এপলোজি' (Apology), 'ক্রাইটো' (Crito), 'প্রোটাগোরাস' (Protagoras), 'গর্জিয়াস' (Gorgias), 'সফিস্ট' (Sophist), 'সিমপোসিয়াম' (Symposium), 'ফিডো' (Phaedo), 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic), 'ক্রিটিয়াস' (Critias), 'ল'য (Laws) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না এর মধ্যে 'দ্য রিপাবলিক' বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

৫.৩.৯.২ : প্লেটোর শিল্পতত্ত্ব

তাঁর দর্শন ভাবনায় সক্রেটিসের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংলাপের আকারে নিজেদের দার্শনিক ভাবনা উপস্থাপন করার পদ্ধতিও সক্রেটিসজাত। তাঁর গ্রন্থ উৎকৃষ্ট সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। বেশির ভাগ সংলাপের ক্ষেত্রেই ডায়ালেক্টিক বা যুক্তি খণ্ডন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — করুণা কী? সাহস কী? ন্যায় ধর্ম কী? প্রথমে এইরকম প্রশ্ন পদ্ধতি,

পরে উত্তরদাতারা যে উত্তর দিতেন গ্রন্থের চরিত্র হিসাবে সক্রেটিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যুত্তর বুঝিয়ে দিতেন আগের উত্তরগুলি যথার্থ নয়। ফলে প্রশ্নোত্তরের পর্বটি দীর্ঘায়িত হয়ে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হত। আসলে সক্রেটীয় পদ্ধতিটি ছিল তুলনা, প্রতি তুলনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কোনও বিষয় বা ভাবনাকে পুনর্নির্মাণের প্রবণতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানান্বেষণের চাহিদা গড়ে তোলাই ছিল প্লেটোর লক্ষ্য। সক্রেটীয় পদ্ধতির মূল কথা ছিল কোনও ধারণাকে যাচাই বা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা। অন্ধভাবে অনুসরণ করাকে তিনি বিশ্বাস করেননি।

প্লেটো দর্শনের আর এক উৎস সফিস্টরা। এঁরা ছিলেন মূলত বাইরে থেকে আসা প্রাচীন গ্রিসের একদল পণ্ডিত। খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে এঁরা এথেন্স এসেছিলেন। অতঃপর অর্থের বিনিময়ে এথেন্সবাসীকে ব্যাকরণ, ছন্দ, রাজনীতি, শব্দতত্ত্ব, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। সফিস্টদের আরও বড় অবদান ছিল মানুষকে বড় করে দেখার প্রবণতা। মূলত সফিস্টদের জন্যেই গ্রিক দর্শনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে মানুষের নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিক ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছিল।

সুতরাং বলা যায় প্লেটোর দার্শনিক জীবনের ভিত্তি যেমন ছিলেন সক্রেটিস তেমনি সফিস্টরাও। তবে এটা ঠিক কোনও দার্শনিকের ভাবনাকেই প্লেটো হুবহু গ্রহণ করেননি। এর মধ্যে যেগুলি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্যি বলে মনে হয়েছিল, সেগুলিকে সামঞ্জস্য করেই তিনি তৈরি করেছিলেন নতুন দার্শনিক তত্ত্ব। আর সেই দর্শন ভাবনা আজও সারা পৃথিবীতে গভীরভাবে প্রসারিত।

আমরা শিল্পতত্ত্বের বিচার করি যে অর্থে সেই অর্থে প্লেটোকে বিচার করা যায় না। কারণ শিল্প বা কাব্য সম্পর্কে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তা কখনও দর্শনের আলোকে, কখনও বা রাষ্ট্রনীতির আলোকে উদ্ভাসিত। তবুও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারি। যদিও সেগুলি কাব্যতত্ত্ব হিসাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। এই হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্য রিপাবলিক'।

একজন কবি কাব্য রচনা করেন। বাস্তব জগৎ থেকে তাঁকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়, আবার তিনি অনেক কিছু বর্জনও করেন। 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এইসব মতামত বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এই অংশটাকে 'Education : The First Stage' বলে উল্লেখ করেছেন অনুবাদক ডেসমন্ড লি। কবি ও কাব্যের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী ছিলেন প্লেটো। তখনকার যুগে যেহেতু হোমারসহ বিভিন্ন কবির কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করার চল ছিল, তাই তিনি সমাজ গঠনে কবিতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের দশম পুস্তকের নাম ডেসমন্ডলি-র মতে 'Theory of Art' বা 'শিল্পতত্ত্ব'। এখানকার এই অংশটুকু আবার তিনটি উপপর্বে বিভাজিত। সেগুলি এইরকম —

১. শিল্প এবং মায়া (Art and Illusion)

২. শিল্প ও কাব্যের আবেদন (The Appel of Art and Poetry)

৩. কাব্য ও নাটকের কার্যকারিতা (The Effects of Poetry and Drama)

বিষয়গুলি আলোচনা করলে বোঝা যাবে প্লেটো শিল্প এবং মায়া পর্বে জীবনের উপর থেকে কাব্যের প্রভাবকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, এর জন্যেই কাব্য বা কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা। কাব্য যে যুক্তিহীন, অসাড় বিষয় তা প্রমাণ করতেই তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এখানে তিনি মানব জীবনে বা আদর্শ রাষ্ট্রে কাব্যের কুপ্রভাবকেই লক্ষ করেছেন। কাব্য যেহেতু কল্পনা ও আবেগের উপর নির্ভরশীল, তাই এখানে যুক্তিনির্ভরতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির জায়গা খুবই কম। তাঁর মনে হয়েছে যুক্তিহীন কোনও বিষয় মানবজীবন বা আদর্শ রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি হতে পারে না। তিনি

এখানে কোনও শৈল্পিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাননি। বরঞ্চ দর্শনের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই কাব্য ভাবনার নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বিষয়, রচনারীতি, কলাকৌশল, তাল ছন্দ ইত্যাদিকে। উপস্থাপনের কৌশল বিষয়ে তিনি প্রথম থেকেই নতুন কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে কী বলা হবে আর কীভাবেই বা তা বলা হবে এ বিষয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন অনেক কথা। তাঁর মনে হয়েছে উত্তম বা তৃতীয় পুরুষে কোনও কাব্যিক বিষয়কে উপস্থাপন করলে তাতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে। কাব্যকে যেহেতু তিনি অনুকরণের অনুকরণ বলেছেন, তাই সেটি পরিহারের যোগ্য।

কাব্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তত্ত্ব না দিলেও তিনি অনেক নতুন কথা বলেছিলেন সেই সময়। এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য 'দ্য রিপাবলিক', 'ফিদ্‌রাস', 'ফিলেবাস' প্রভৃতি গ্রন্থে। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল যে অনুকরণ রীতির (Mode of Imitation) কথা বলেছিলেন, তার সূত্রপাত হয়েছিল প্লেটো কথিত 'উপস্থাপনের ধরন' (Manner of Presentation) অনুসারে। তিনি 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থে অনুকরণের ভঙ্গি অনুসারেই মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক ইত্যাদির শ্রেণি বিভাজনের কথা বলেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, ট্রাজেডিই পাঠক বা শ্রোতার মনে 'Pity and Fear' (করুণা ও ভয়)-এর সৃষ্টি করে। একই কথা তিনি 'ফিদ্‌রাস' গ্রন্থেও বলেছিলেন। এ ছাড়াও এখানে তিনি শিল্পের ধারণায় সমগ্রতার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন। ভালো ট্রাজেডি দেখে মানুষের মনে যে 'ট্রাজিক আনন্দ' (Tragic Pleasure) সৃষ্টি হয়, সেকথা তিনি অবশ্য বলেছেন 'ফিলেবাস' গ্রন্থে। এখানে একটি কথা জোনে রাখা ভালো শিল্পতত্ত্বের অনেক সূত্রের সূচনা করেছিলেন প্লেটো স্বয়ং। কিন্তু সবগুলি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যেগুলি পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছিল তাঁরই শিষ্য অ্যারিস্টটলের হাতে।

'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের তৃতীয় পুস্তকে আছে সুর ও ছন্দের কথা। তিনি বলেছেন —

> ''সঙ্গীত শিক্ষা অপর যে কোনও শিক্ষার চেয়ে শক্তিশালী। কারণ সুরের ছন্দ এবং সঙ্গীত আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তার চেয়ে সুদৃঢ় প্রভাবে যে সুশিক্ষিত তাকে সুন্দর এবং যে কুশিক্ষিত তাকে অসুন্দর করে তোলে।''

এর থেকে বোঝা যায় প্লেটো সঙ্গীতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন —

> ''যে মানুষের মধ্যে সঙ্গীতবোধ আছে সে মনোহরের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরাগ বোধ করবে।''

উল্লেখ্য এই মনোহারিত্বই হল তাঁর শিল্পভাবনার মূলকথা। কাব্য নয়, প্লেটো সঙ্গীতের আলোকে সৌন্দর্যকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মতামত যা সুন্দরতাকে ভালোবাসতে শেখা উচিত।

এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, তা হল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষাদ বা হতাশার সুরকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা। এই জন্যেই তিনি একথা বলেছেন। কারণ এখানে কোমলতা ও আলস্যের উপাদান খুব বেশি করে থাকে। মানুষের মনকে বাস্তবজগৎ বহির্ভূত করে তোলে এই সুর। তাই জন্যে তিনি প্রাচীন গ্রিসের দুঃখ সৃষ্টিকারী সুর 'অয়োনীয়' ও 'নীডিয়'কে পরিত্যাগের কথা বলেছিলেন। পরিবর্তে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন যুদ্ধের সুরকে —

> ''আমাদের প্রয়োজন যুদ্ধের সুরের; এমন সুরের যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে সেই ধ্বনি, যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় বীরের কণ্ঠে তার আসন্ন বিপদ কিংবা দৃঢ় সংকল্পের মুহূর্তে। কিংবা যখন তার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয় কিংবা বীর যখন কোনও আঘাত পায় বা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এইরকম মুহূর্তে। জীবনের সঙ্কটে ভাগ্যের এমন আঘাত সহ্য করার দৃঢ়তায় বীর যে ধ্বনি উচ্চারণ করে আমাদের

প্রয়োজন সেই সুরের।''

প্লেটোই প্রথম শিল্পের স্বরূপ প্রসঙ্গে মাইমেসিসের (Mimesis) কথা বলেছেন। অর্থাৎ 'Art is Imitation Mimesis' বা শিল্প হল অনুকরণের অনুকরণ। 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই শব্দটির প্রথম পরিচয় পেলেও তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দশম খণ্ডে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে মাইমেসিসের সমার্থক হিসেব 'Impersonation'কেই বুঝিয়েছেন। এখন প্রশ্ন 'Impersonation' বলতে সাধারণ পাঠক কি বুঝবেন? উত্তরে বলা যায় একজন মানুষ যখন অন্যের ব্যক্তিত্ব, কথাবার্তা, আচার-আচরণ হুবহু অনুকরণ করে অন্যকে দেখায় সেটাই তো 'Impersonation' হিসেবে খ্যাত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যক্তিক কবিতায় কবি সাধারণত নিজের অনুভূতির কথাই বলেন। কিন্তু নাটক অভিনয় কালে একজন অভিনেতা নিজের কথা না বলে অন্যের কথা বলে থাকেন। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে 'Impersonation' আর 'Mimesis' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহারের একটা গোলযোগ দেখা গেছে।

ফলে 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের দশম খণ্ডে প্লেটোকে ভাবতে হল শিল্পের অনুকরণ নিয়ে। তাই এখানে 'মাইমেসিস' শব্দটিকে 'Imitation' ও 'Representation'-এর সমার্থক করেছিলেন। প্লেটোর মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোনও অনুকরণই সত্য নয়। প্লেটোর মতে অনুকরণ মাত্রেই অন্যের নকল। সাহিত্যে যা দেখা যায় সেটি আসলে চোখের সামনে দেখা জীবন ও জগৎকে নকল করা। সাহিত্য বা শিল্পে 'Creativity' বা কোনও সৃজনকে লক্ষ করেননি তিনি। এই ভাবনা তার মনে এসেছিল 'ধারণাতত্ত্ব' (Theory of Idea) থেকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটা আইডিয়ার জগৎ আছে যার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কোনও মিল নেই। বাস্তব পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ওই আইডিয়ার জগৎ থেকে নকলিকৃত হয়ে এসেছে। আর কবিরা ওই বস্তুজগতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কাব্য রচনা করছেন। ফলে তাঁদের কাব্য আসলে নকলের নকল।

প্লেটোর এই ধারণার সঙ্গে ভারতীয় ধারণার যথেষ্ট মিল আছে। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। প্লেটোর ব্রহ্ম আসলে তাঁর কল্পিত আইডিয়ার জগৎ। আর বাস্তব পৃথিবীর জগৎ উভয়ের কাছেই এক। ভারতীয় দর্শনের মতো প্লেটোর দর্শনেও এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে। তবে শঙ্করাচার্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ছিলেন। তিনিই বলেছেন, 'জীব ব্রহ্মৈব না পর।' অর্থাৎ জীব আর ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের মতো সম্পৃক্ত। এখানেই প্লেটো ও শঙ্করাচার্য ভিন্ন। বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না থাক সেটাই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন প্লেটো। কবিরা আইডিয়ার জগৎ নয়, বস্তুজগৎকে সামনে রেখেই কাব্য রচনা করে থাকেন। অনুকৃত বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য সম্পর্কে প্লেটোর বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যা যা সুন্দর, যা সৎ তাদেরকে অনুকরণ করাই কবিদের কাজ। কখনওই অসুন্দরকে অনুকরণ করা ঠিক হবে না। তাহলে তার প্রভাব পড়তে পারে রাষ্ট্রের উপর। এইদিক থেকে প্লেটো কাব্যের মূল্য খুঁজেছেন আনন্দ দানের শক্তিতে নয়, সত্যকে জানার আহ্বানে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্লেটো ছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণের বিরোধী,। তাই শিল্প বা সাহিত্যকে তিনি সাদা মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ অনুকরণ প্রক্রিয়া। তিনি মনে করেছিলেন যে, অনুকরণ আসলে কোনও কবির ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ কাজ। অনুকরণ কখনও আসল হতে পারে না। কখনওই সত্যের স্বাদ দেয় না। কখনওই সুসামঞ্জস্য রূপে প্রতীয়মান হয় না। তাই জন্যেই অনুকৃত শিল্প প্লেটোর অপছন্দের।

প্লেটোর আলোচনায় নিজের কথাতেই কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ট্রাজেডি প্রসঙ্গে তিনি সত্য থেকে তিন ধাপ সরে যাওয়ার কথা বলেছেন। আবার কখনও বলেছেন দুই ধাপ সরার কথা। কবি বা শিল্পীর অনুকরণের বিষয় কখনও প্রকৃতি হতে পারে, কখনও হতে পারে মানব সৃষ্টি কৃত্রিম জগৎ। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আসলে ঈশ্বরের নিজ হাতে গড়া

'Idea'-র অনুকরণ। এক্ষেত্রে কবিরা সত্যি থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে। অর্থাৎ 'Idea'-এর সত্য, আর সেখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অনুকরণ। কিন্তু যেখানে মানুষ নিজে থেকে এই বাস্তব পৃথিবীতে কিছু তৈরি করেছে, তখন তাকে দেখে কবি বা শিল্পী যখন কাব্য বা চিত্র আঁকছেন, তখন সেটা সত্যি থেকে তিন ধাপ সরে এসেছে। কারণ ঈশ্বরের মনের 'Idea' থেকে কোনও কিছু তৈরি, তা দেখে মনুষ্যসমাজ কিছু তৈরি করলে কবিরা যখন সেটা দেখে কিছু অনুকরণ করে, সেটা হয় সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে। আবার বলা যায় নাটকের ক্ষেত্রে কবি বা শিল্পীকৃত মানবীয় আচরণের অনুকরণ করলে সেটা হয়ে যায় সত্যি থেকে তিন ধাপ দূরের অবস্থান।

আসলে প্লেটো ছিলেন ভাবলোকে বিশ্বাসী। অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁর দর্শনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কাব্যিক দৃষ্টিতে শিল্পকে তিনি বিশ্লেষণ করেননি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর কাব্য বিচারের মূল সুর। তবুও বলা যায় কোনও নমুনা সামনে না পেয়েও তিনি যেভাবে কাব্য বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিলেন তা আজও বিস্ময়কর। প্লেটোর অনুকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি দুটি দিকের মাঝামাঝিতে অবস্থান করেছেন। একদিকে তাঁকে টেনে রেখেছে শিল্পের অধিবিদ্যক সংজ্ঞা, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তামূলক চিন্তা। কোনও দিককে সঠিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে তিনি কাব্যকে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। তাই আধুনিক জীবনে প্রায় সকলেই প্লেটোর শিল্প ব্যাখ্যা মেনে নিতে অসম্মত হয়েছেন।

৫.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্লেটোর শিল্পভাবনা তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থকে সামনে রেখে বুঝিয়ে দাও।

২। শিল্প হল অনুকরণের অনুকরণ (Art is Imitation Mimesis) বলতে প্লেটো ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন?

৫.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। নন্দনতত্ত্ব - ড. সুধীর কুমার নন্দী

২। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা - নবেন্দু সেন সম্পাদিত

৩। সাহিত্য বিবেক - বিমল মুখোপাধ্যায়

৪। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা - তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৫। নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য - সুখেন বিশ্বাস

৬। ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব - প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

একক ১০

অ্যারিস্টটল

বিন্যাসক্রম :

৫.৩.১০.১ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স

৫.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৩.১০.১ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুকরণ তত্ত্ব। অনুকরণ তত্ত্ব কথাটি গ্রিক সাহিত্যে তাঁর আগেও অবশ্য প্রচলিত ছিল, তাঁর গুরু প্লেটোও অনুকরণ অর্থেই mimesis শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Art is imitation mimesis'। কিন্তু mimesis শব্দটিকে প্লেটো যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অ্যারিস্টটল সে অর্থে প্রয়োগ করেননি। প্লেটোর কাছে এই 'অনুকরণ' ছিল একটা ভাববাদী ধারণা মাত্র, অ্যারিস্টটল তাকে বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তুলনা না করলে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য বোঝা যাবে না, তাই সেটাই আগে করা যাক।

প্লেটো মনে করতেন আমরা চোখের সামনে যে পৃথিবী দেখছি সেটা একটা অনুকরণ মাত্র, আসল বা 'আইডিয়াল' পৃথিবীর ধারণা রয়েছে ঈশ্বরের মনে। কবিরা সেই 'আইডিয়ালের' যে অনুকরণ চোখে দেখতে পান, তার আবার একটা অনুকরণ করেন। সেইজন্যই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের তিনি নির্বাসিত করতে চেয়েছেন—কবিরা নকলের আবার নকল করে সত্য থেকে অনেকটা দূরে চলে যান।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর সেই 'আইডিয়াল'কে স্বীকার করেননি, দৃশ্যমান জগৎকেই তিনি আসল মনে করেছেন। কবিরা এই সৃষ্টির অনুকরণ করতে গিয়ে আর একটা নতুন সৃষ্টি করে ফেলেন, যা আমাদের আনন্দ দেয়। সুতরাং কবিদের তিনি কোনো মতেই নিন্দার যোগ্য মনে করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো মনে করতেন কেবলমাত্র সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই কবির কর্তব্য, অসুন্দর বস্তুর অনুকরণ করলে তাঁরা নিজেদের মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ধারণাকেও

সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন যা আপাত-অসুন্দর তাও কবির হাতে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই কারণে কেবল সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই শিল্পীর কাজ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভাববাদী ধারণা বর্জন করে শিল্পকলার আলোচনাকে অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর আগে শিল্প সম্বন্ধে অনেক ভাববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি করার জন্য আলাদা রকমের প্রতিভার দরকার হয় ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল এই সমস্ত ভাববাদকে নস্যাৎ করে, বলতে চাইলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই অনুকরণ করবার একটা প্রবণতা আছে, মানুষের এই ক্ষমতা সর্বাধিক—সে অনুকরণ করতে চায় এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে ভালো অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই সাহিত্য-শিল্পাদির জন্ম, কোনো বিশেষ প্রতিভা বা প্রেরণা থেকে নয়। একেই বলা হয় অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব বা mimesis theory। এই তত্ত্বটিকেই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝা যায় এই একই অনুকরণ প্রবণতা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্ম দেয় এবং বড় শিল্পী ও মাঝারি শিল্পীর তফাত করে দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, অনুকরণ প্রবণতা শিল্পের জন্মদাতা হলেও এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পের তফাত হয়ে যায় তিনটি ব্যাপারে—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। অনুকরণের বিষয় প্রকৃতি হলে তা চিত্রশিল্পের জন্ম দেয়, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিষয় মানুষের মনোভাব বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলে তা নৃত্যের জন্ম দেয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানুষ প্রধান বিষয় হলে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। মাধ্যমের পার্থক্য গুলিও লক্ষ করবার মতো—চিত্রশিল্পের মাধ্যম রঙ ও তুলি, নৃত্যের মাধ্যম দেহভঙ্গিমা, ভাস্কর্যের মাধ্যম ও উপাদান পাথর, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, উপাদান কাগজ, কলম। রীতি পাল্টালেও শিল্পের প্রকৃতি পাল্টে যায়। সাহিত্য শিল্পেও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয়।

এবার অনুকরণ তত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্লেটো যে অনুকরণের কথা বলেছেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবে imitate করা, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—যেমন দেখছ তেমন নকল করো। সত্যের অনুকরণকে বলেছেন eikastike, তা গ্রহণীয় ; মিথ্যার অনুকরণকে বলেছেন phantastike, তা বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু mimesis-এর দ্বারা বিশুদ্ধ নকলকে বোঝাতে চাননি। 'মিটিওরলজি' গ্রন্থে বলেছেন, অনুকরণ ঠিক নয়—শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, 'পলিটিক্সে' বললেন, প্রকৃতির অপূর্ণতা শিল্প পূর্ণ করে, 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প আর প্রকৃতি হচ্ছে দুই উদ্দীপক শক্তি—প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের তাগিদ, শিল্পের প্রবর্তনা রয়েছে শিল্পীর হৃদয়ে। 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে তিনি বললেন, কাব্য মানুষ ও মানবিক আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তা যান্ত্রিক অনুকরণ মোটেই নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। বাইওয়াটারের অনুবাদে তা এইভাবে বলা হয়েছে—'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight.' আদর্শায়িত অনুকরণ কী, তা জানতে গেলে universal element বা জীবনের সামগ্রিক সত্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে।

মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে সেই সমগ্র ঘটনা তুলে ধরলেই তা সামগ্রিক ঘটনা হয় না, এবং তা তুলে ধরা সম্ভবও নয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সব যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই বলেননি, অথচ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কেমন করে হল এটা ! তাহলে universal বলতে কী বোঝান অ্যারিস্টটল, সেটা বাইওয়াটারের অনুবাদ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদে পাই—'By the universal I mean how a person of certain type on occation speak or act according to the law of probability or necessity.' অর্থাৎ কিনা এক বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভাব্যতার বিষয় ভেবে যে আচরণ করে, তাই হল universal । সম্ভাব্যতার নিয়ম অবশ্য পদার্থশাস্ত্রের বিষয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি চরিত্রের বিশেষ পরিস্থিতির আচরণ যদি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাহলেই তার মধ্যে থাকে একটা শাশ্বত সত্য যাকে আমরা বলি universal বা সার্বজনীন বা সামগ্রিক সত্য। এটাকেই অ্যারিস্টটল যখন বড় করে দেখছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি অনুকরণকে তিনি নিছক 'নকল' হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন এক শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে। কবি কেবল অনুকরণ করেন না, জীবনের শাশ্বত সত্যে পৌঁছবার জন্য তাকে একটি পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেন মাত্র।

কবি যে অসুন্দর ও কুৎসিত ঘটনাকেও অবলম্বন ও অনুকরণ করতে পারেন—মানে প্লেটো 'phantastike' বলে যে অনুকরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তকেও যে মোটেই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল, তার কারণও ওই সম্ভাব্যতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলবার কাজে যদি তা সহায়তা করে তবে জীবনের অসুন্দর বৃত্তিগুলির অনুকরণও কবি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

বস্তুত প্লেটোর mimesis এবং অ্যারিস্টটলের mimesis-এর মধ্যে মিল শুধু কাজে, দুজনের ধারণায় আছে বিরাট তফাত। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে তিনি গুরুর সংজ্ঞা থেকেই শুরু করেছেন এবং সে কারণে অনুকরণ দিয়েই তাকে আলোচনা আরম্ভ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুকরণের মধ্যে গ্রহণ, বর্জন, পরিশোধন ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়াগুলি আছে—কবি কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের নকল করেন, এ কথা তিনি বলেননি। জীবনের এক সামগ্রিক রূপ নির্মাণের অবলম্বন হচ্ছে অনুকরণ, এই হল তাঁর অভিমত এবং তাঁর অনুকরণ তত্ত্বে আমরা পাই একই সঙ্গে শিল্পীর প্রচুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা।

৫.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। অ্যারিস্টটলের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করো।

৫.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সৌন্দর্যতত্ত্ব –সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২। রসসমীক্ষা – রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৩। নন্দনতত্ত্বের সূত্র – অরুণ ভট্টাচার্য

৪। Illusion and Reality – Christopher Caudwell

৫। Asthetics - Benedetto Croce

একক ১১
শিলার

বিন্যাসক্রম

৫.৩.১১.১ নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ

৫.৩.১১.২ নন্দনতাত্ত্বিক শিলার
৫.৩.১১.২.১ ব্যক্তি পরিচয়
৫.৩.১১.২.২ সাহিত্য জীবন
৫.৩.১১.২.৩ নান্দনিকতার অধ্যয়ন
৫.৩.১১.২.৪ শিলারের রচনাসমূহ
৫.৩.১১.৩ শিলারের প্রতিভার বিশ্লেষণ
৫.৩.১১.৪ উপসংহার
৫.৩.১১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৫.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৩.১১.১ নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যাপক। এ কারণে এর বিষয়বস্তুর সীমা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পকলার বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য প্রভৃতি সমস্যাকে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভূমিকা আলোচিত হয়।

সাধারণভাবে সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদিম অনুভূতি বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির মোকাবিলায় আদিমকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এরুপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো কোনোটি মানুষের মনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া। এই আবেগময় প্রতিক্রিয়ার মূলে মানুষের জীবন রক্ষার অচেতন জৈবিক প্রয়োজনই আদিকালে সমধিক কাজ করেছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তির প্রকাশকে আপন জীবন রক্ষার সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করেছে। এ সমস্ত শক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মনে জাগরুক রাখার সে চেষ্টা করেছে। এই আদিম বোধ থেকেই আদি শিল্পকার্যের সৃষ্টি। এই উৎস থেকে সামাজিক ভালোমন্দ বোধেরও উৎপত্তি।

মানুষের নিজের জীবনের মতোই সৌন্দর্যানুভূতির ইতিহাস দীর্ঘ। সভ্যতার জটিল বিকাশের ধারায় সৌন্দর্যতত্ত্বকেও প্রাথমিক যুগে সহজ এবং আধুনিককালে জটিল এবং অবাস্তবের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়।

কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের আবেগময় অনুভূতি এবং তার ভাষাগত প্রকাশ ব্যতীত শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য মানবিক সৃষ্টিকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর এবং ভালো কিংবা মন্দ হিসাবে বিচারের প্রয়াসকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব বলতে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তত্ত্বকে বুঝায় না। এর দ্বারা উপরোক্ত বিষয়গুলির উপরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ভাবধারার কথা বুঝায়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সামগ্রকি আলোচনায় সুন্দর এবং অসুন্দরের অথবা ভাল এবং মন্দের কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ কিংবা মানদণ্ড আছে কিনা সে প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস-প্রধান সমাজে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রিসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিসস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিকের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে সেণ্ট অগাস্টিন এবং টমাস একুইনাস প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিকগণ সৌন্দর্যতত্ত্বে রহস্যবাদের আমদানি করেন। তাদের মতে, জগতাতীত এক ঐশ্বরিক সুন্দরের অস্তিত্ব রয়েছে। সেই ঐশ্বরিক সুন্দরের মানদণ্ডেই জাগতিক বস্তুনিচয়ের সৌন্দর্য পরিমাপ করতে হবে। মধ্যযুগের এই রহস্যবাদের প্রতিক্রিয়া ঘটে পরবর্তীকালে নব-জাগরণের চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণের মধ্যে। এঁদের মধ্যে পেতরার্ক, আলবার্ট, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, দুরার,ব্রুনো এবং মণ্টেনের নাম বিখ্যাত। পাশ্চাত্যের নব-জাগরণের পরবর্তী জ্ঞানান্বেষণের যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বার্ক, হোগার্ত, ডিডেরক, রুশো, লেসিং প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। মানবতাবাদের এই ঐতিহ্যকে বহন করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিলার এবং গ্যেটে ঘোষণা করেন যে, সৌন্দর্য এবং শিল্পের উৎস হলো মানুষ এবং তার বাস্তব জীবন।

সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ সব যুগেই পাওয়া যায়। এদের একটি হচ্ছে সৌন্দর্য সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা; অপরটি ভাববাদী। ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব সৌন্দর্যকে অতি-প্রাকৃতিক একটি সত্তা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অতি-প্রাকৃতিক এই সত্তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অতীত। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই মাত্র এই নিকষ সুন্দরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এরূপ ব্যাখ্যায় ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং সুন্দরের ধর্মীয় রহস্যবাদী কল্পনায় কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার মোহ আবদ্ধ রাখার প্রয়াস সমাজের শক্তিমান শ্রেণিগুলো সব যুগেই করে এসেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে দর্শনের অন্যান্য মৌলিক প্রশ্নের ন্যায় ভাববাদের বিরোধী ব্যাখ্যা হচ্ছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের বাস্তব পরিবেশ এবং জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি এবং বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের বিরোধ সমাজের শোষক এবং শোষিতের বাস্তব বিরোধের ভাবগত প্রতিফলন।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনটি প্রশ্ন মূল (১) বস্তুজগতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং বিকাশ; (২) মনোজগতে সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাখ্যা, এবং (৩) শিল্পকর্মের মূল্যায়ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রবহমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ধারাতে ক্রমাধিক পরিমাণে আনন্দজনক জীবনযাপনের তাগিদে সুন্দর, অসুন্দর, মহৎ, হীন, হর্ষ এবং বিষাদ প্রভৃতি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাপকতার দিক থেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবল শিল্পকলার সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করে না। শিল্পকলার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি প্রয়োগগত দিক মাত্র। ব্যাপকভাবে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য হচ্ছে মানুষ। তার সৃজনশীল ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশে, মহতের জন্য জীবন উৎসর্গে, দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে যে আনন্দানুভূতি সে বোধ করে কিংবা বর্বরতার আঘাতে যে ঘৃণা তার মনে উদ্ভূত হয়, তার বিকাশ-প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ব্যুৎপত্তি

দর্শনের একটি বিশেষ শাখা হলো নন্দনতত্ত্ব। এর বিষয় সৌন্দর্য। বাংলা ভাষায় এই শব্দটি গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ থেকে (নন্দন বিষয়ক তত্ত্ব/কর্মধারয় সমাস)। সংস্কৃত ক্রিয়ামূল √নন্দ এর ভাবগত অর্থ হলো— আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা। এর সাথে অন্ (ল্যুট) প্রত্যয় যুক্ত হয় নন্দন শব্দ তৈরি হয়েছে। √নন্দ্ (আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা) +অন্ (ল্যুট)= নন্দন

নন্দন শব্দের আরও একটি রূপতাত্ত্বিক রূপ রয়েছে। এই শব্দটি উৎপন্ন হয় ণিজন্ত √নন্দি ক্রিয়ামূল থেকে। এর সাথে ইন (ইনি) প্রত্যয় যুক্ত হয়েও নন্দন শব্দ তৈরি হয়। √নন্দি +ইন (ইনি)=নন্দন

এই বিচারে নন্দন শব্দের অর্থ দাঁড়ায়— যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যার দ্বারা আনন্দ দেওয়া যায়, তাই নন্দন। যেহেতু আনন্দের উৎস সৌন্দর্য তাই নন্দন শব্দের অন্য অর্থ হলো—সৌন্দর্য প্রদায়ক। এই বিচারে নন্দনতত্ত্বের আভিধানিক অর্থ হলো- সৌন্দর্যপ্রদায়ক তত্ত্ব। কিন্তু দর্শনবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে নন্দনতত্ত্ব ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। যতদূর জানা যায়, নন্দনতত্ত্ব শব্দটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি একটি বাক্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এই ভাবে- নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে।'

রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্ব এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব দুটো শব্দই ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে Aesthetics-এর বাংলা শব্দ 'নন্দনতত্ত্ব'-ই প্রচলিত। এই শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য। সত্তাতত্ত্ব অনুসারে এই শব্দের শ্রেণিকরণ করা হয় নিচের বিধি অনুসারে। ঊর্ধ্বক্রমবাচকতা { নন্দনতত্ত্ব | দর্শন | মানবিক বিজ্ঞান | জ্ঞান-শাখা | জ্ঞানস্বক্ষেত্র | প্রজ্ঞা | জ্ঞান | মনস্তাত্ত্বিক বিষয় | বিমূর্তন | বিমূর্ত সত্তা | সত্তা |}

ইংরেজি ব্যুৎপত্তি

এর ইংরেজি Aesthetics, esthetics। এই শব্দটির উৎস গ্রিক। গ্রিক αἰσθητικός (aisthetikos, আইসথেটিকস), এর অর্থ হলো আমি অনুভব করি। এই শব্দটি প্রথম জার্মান ভাষায় গৃহীত হয়েছিল Æsthetik বানানে। ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জার্মান দার্শনিক আলেকজান্ডার গটলীব বমগার্টন (Alexander Gottlieb Baumgarten) সৌন্দর্যবিদ্যার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেন। আধুনিক জার্মান বানান Ästhetik। একইভাবে ফরাসি শব্দ esthétique গৃহীত হয়েছিল গ্রিক থেকে। ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ থেকে।

৫.৩.১১.২ নন্দনতাত্ত্বিক শিলার

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ফন শিলার (জার্মান: জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার; নভেম্বর ১০, ১৭৫৯, মারবাচ এম নেকার - ৯ ই মে, ১৮০৫, ওয়েমির) - জার্মান কবি, দার্শনিক, শিল্প তাত্ত্বিক এবং নাট্যকার, ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সামরিক ডাক্তার, ঝড় আন্দোলনের প্রতিনিধি। এবং সাহিত্যে হামলা এবং রোমান্টিকতা, ওডেস টু জয়ের লেখক, এটির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ, যার একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগীতের পাঠ্য হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মানুষের ব্যক্তির এক প্রবল রক্ষক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের শেষ সতের বছর ধরে (১৭৮৮-১৮০৫) জোহান গোথির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাকে তিনি তাঁর কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যা খসড়া আকারে থেকে যায়। এই দুই কবিদের মধ্যে বন্ধুত্বের এই সময়কালে এবং তাদের সাহিত্যের বিতর্কটি ওয়েমার ক্ল্যাসিকিজমের নামে জার্মান সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল।

৫.৩.১১.২.১ ব্যক্তি পরিচয়

জন্ম ১০ই নভেম্বর, ১৭৫৯ মারবাচে। জার্মান বার্গেরেস্টভোর স্থানীয়: তার মা প্রাদেশিক বেকারের পরিবার থেকে, সহকর্মী এবং তাঁর বাবা একজন রেজিমেন্টাল প্যারামেডিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পরে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট যাজকের সাথে অধ্যয়নের পরে শিলার ডুউক অফ ওয়ার্টেমবার্গের নির্দেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সামরিক একাডেমিতে প্রবেশ করেন এবং আইন অধ্যয়ন শুরু করেন, যদিও তিনি শৈশব থেকেই পুরোহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন; ১৭৭৫ সালে একাডেমি স্টুটগার্টে স্থানান্তরিত হয়, পড়াশোনার পাঠ্যক্রম বাড়ানো হয় এবং শিলার আইন ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পথ গ্রহণ করেন। ১৭৮০ সালে কোর্স থেকে স্নাতক করার পরে, তিনি স্টুটগার্টে রেজিমেন্টাল ডাক্তারের পদ পেয়েছিলেন।

এমনকি একাডেমিতে শিলার তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য পরীক্ষাগুলির ধর্মীয় ও সংবেদনশীল উচ্চারণ থেকে বিদায় নিয়ে নাটকীয়তার দিকে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ১৭৮১ সালে দ্য রবার্স শেষ করে প্রকাশ করেছিলেন। পরের বছরের শুরুতে নাটকটি ম্যানহাইমে মঞ্চস্থ হয়েছিল; ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব করতে রেজিমেন্ট থেকে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মেডিকেল লেখাগুলি ব্যতীত অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল, যার ফলে শিলার ওয়ার্টেমবার্গের ডুচি থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। ম্যানহিম থিয়েটারের কোয়ার্টারমাস্টার ডাল্লোর্গ শিলারকে একটি "থিয়েটার কবি" হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন এবং ম্যানহাইম থিয়েটারে মঞ্চে প্রযোজনার জন্য নাটক লেখার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং "নাটক এবং প্রেম" - দুটি নাটক ম্যানহিম থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে একটি দুর্দান্ত সাফল্য হয়েছিল।

অপ্রত্যাশিত প্রেমের যন্ত্রণায় শোকিত হয়ে শিলার স্বেচ্ছায় তাঁর অন্যতম উৎসাহী প্রশংসক, প্রাইভেট-ডসেন্ট জি। কর্নারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং দু'বারেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সাথে লিপজিগ এবং ড্রেসডেনে অবস্থান করেছিলেন।

১৭৮৯ সালে, তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে একটি পদ পেয়েছিলেন এবং শার্লোট ফন লেঙ্গফিল্ডের সাথে তাঁর বিবাহের জন্য তিনি পারিবারিক সুখ পেয়েছিলেন।

ক্রাউন প্রিন্স ভন শ্লেসভিগ-হলস্টেইন-সন্ডারবার্গ-অগাস্টেনবার্গ এবং কাউন্ট ই। ভন শিম্মেলম্যান তিন বছর (১৭৯১-১৭৯৪) তাকে বৃত্তি প্রদান করেছিলেন, তখন শিলার প্রকাশক আই ফ্রিয়ার সমর্থন করেছিলেন। কোট্টা, যিনি তাকে ১৭৯৪ সালে মাসিক ম্যাগাজিন ওরি প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শিলার দর্শনের, বিশেষত নান্দনিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ফলস্বরূপ, দার্শনিক চিঠিগুলি এবং প্রবন্ধগুলির একটি সম্পূর্ণ সিরিজ (১৭৯২-১৭৯৬) প্রকাশিত হয়েছিল - অন ট্র্যাজিক ইন আর্ট, অন গ্রেস অ্যান্ড ডিগিনিটি, অন সাব্লাইম, এবং অন নাইভ এবং সেন্টিমেন্টাল কবিতা। শিলারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আই কান্ট দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

দার্শনিক কবিতা ছাড়াও, তিনি খাঁটি লিরিক্যাল কবিতাও তৈরি করেছেন - সংক্ষিপ্ত, গানের মতো চরিত্র যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। শিলার আরেকটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করেন, ইয়ার বুক আলমানাক অফ মিউজ, যেখানে তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

উপকরণগুলির সন্ধানে, শিলার জেভি গোথির দিকে ফিরেছিলেন, গোয়েটি ইতালি থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল, কিন্তু তখন বিষয়টি কোনও উচ্চতর পরিচিতির বাইরে যায় নি; কবিরা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। তথাকথিত "বল্ড ইয়ার" (১৭৯৭) শিলার এবং গিথে সহ দুর্দান্ত ব্যালড সহ চিহ্নিত করেছিলেন শিলারের - "কাপ", "গ্লোভ", "পলিক্রাটোভ রিং", যা ভি.এ.-এর দুর্দান্ত অনুবাদগুলিতে রাশিয়ান পাঠকের কাছে এসেছিল Zhukovsky।

১৭৯৯ সালে, ডিউক শিলারের রক্ষণাবেক্ষণ দ্বিগুণ করেন যা মূলত পেনশনে পরিণত হয়েছিল, কারণ কবি আর পড়াতে ব্যস্ত ছিলেন না এবং জেনা থেকে ওয়েমারের দিকে চলে গেলেন। ১৮০২ সালে, জার্মান দেশ ফ্রান্সিস দ্বিতীয়ের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট শিলারকে আভিজাত্য দিয়েছিলেন।

শিলার কখনই সুস্থ ছিল না, প্রায়শই অসুস্থ ছিল; তিনি যক্ষ্মার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। শিলার ৯ মে ১৮০৫ সালে ওয়েমারে মারা যান।

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার। জার্মান কবি, দার্শনিক, শিল্প তাত্ত্বিক এবং নাট্যকার, ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সামরিক ডাক্তার, সাহিত্যে ঝড় ও আক্রমণাত্মক ও রোমান্টিকতার ধারার প্রতিনিধি, ওড টু জয় রচয়িতা, যার একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগীতের পাঠ্য হয়ে ওঠে। তিনি মানবসমাজের রক্ষাকর্তা হয়ে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ করেছিলেন।

জীবনের শেষ সতের বছর ধরে (১৭৮৮-১৮০৫) জোহান গোথির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাকে তিনি তাঁর কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যা খসড়া আকারে থেকে যায়। এই দুই কবিদের মধ্যে বন্ধুত্বের এই সময়কালে এবং তাদের সাহিত্যের বিতর্কটি "ওয়েমার ক্লাসিকিজম" নামে জার্মান সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল।

৫.৩.১১.২.২ সাহিত্য জীবন

১৭৭৫ এর দিকে শিলার আইন ছেড়ে মেডিকেল অনুষদে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি প্রতিভাবান শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলিতে অংশ নেন, বিশেষত, একাডেমিক যুবকের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক আবেলের দর্শনের উপর একটি বক্তৃতা কোর্স। এই সময়কালে, শিলার অবশেষে নিজেকে কাব্যকলাতে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন ।

একাডেমিতে প্রশিক্ষণের প্রথম বছর থেকে, ফ্রেডরিচ ফ্রেড্রিচ ক্লোপস্টক এবং কবিদের কাব্য রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন **"ঝড় ও হামলা"**ছোট ছোট কাব্য রচনা লিখতে শুরু করলেন। ডিউক এবং তাঁর উপপত্নী কাউন্টারেস

ফ্রান্সিসকো ফন হোহেনগেইয়ের সম্মানে বেশ কয়েকবার তাকে অভিনন্দনমূলক ওড লেখারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

১৭৭৯ সালে, শিলারের প্রবন্ধ "ফিজিওলজির দর্শন" একাডেমি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে দ্বিতীয় বছরে থাকতে বাধ্য করা হয়। ডিউক কার্ল ইউজিন তার রেজোলিউশন চাপিয়ে দিয়েছেন: *"আমি অবশ্যই একমত হই যে শিলারের শিষ্যের গবেষণামূলক পুণ্য নেই, তার মধ্যে প্রচুর আগুন রয়েছে। তবে ঠিক এই পরবর্তী ঘটনাটিই আমাকে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে এবং একাডেমিতে তাকে আরও এক বছর ধরে রাখতে বাধ্য করেছিল, যাতে তার উত্তাপ শীতল হয়ে যায়। যদি তিনিও পরিশ্রমী হন, তবে এই সময়ের মধ্যেই সম্ভবত একজন মহান ব্যক্তি তাঁর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবেন ".*

একাডেমিতে অধ্যয়নকালে শিলার তাঁর প্রথম রচনা লেখেন। "জুলিয়াস অফ টেরেন্টস" (১৭৭৬) নাটকের প্রভাবে জোহান আন্তন লেইসউইজ ফ্রেড্রিচ লিখেছেন **কসমস ভন মেডিসি** - একটি নাটক যেখানে তিনি সাহিত্য আন্দোলন "ঝড় এবং আক্রমণ" এর একটি প্রিয় থিম বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন: ভাইদের মধ্যে ঘৃণা এবং তার পিতার প্রেম। একই সময়ে, ফ্রিডরিচ ক্লোপস্টকের রচনা ও রচনাশৈলীর প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ শিলারকে ১৭৭৭ সালের মার্চ মাসে দাস স্কেবিবিজ ম্যাগাজিনে জার্নালে প্রকাশিত ওড "কনকারার" লেখার জন্য উৎসাহিত করেছিল, যা একটি প্রতিমার অনুকরণ ছিল।

অবশেষে, ১৭৮০ সালে তিনি একাডেমী থেকে স্নাতক হন এবং স্টুটগার্টে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পদ লাভ করেন, তাকে অফিসার পদে বরাদ্দ না দিয়ে এবং বেসামরিক পোশাক পরার অধিকার ছাড়াই - ডুকালের স্বভাবের প্রমাণ। ১৭৮১ সালে তিনি নাটকটি সম্পূর্ণ করেছেন **ডাকাতরা** (ডাই রবার), একাডেমিতে থাকার সময় তাঁর দ্বারা রচিত। ডাকাতি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করার পরে, দেখা গেল যে স্টটগার্টের কোনও প্রকাশকই এটি মুদ্রণ করতে চাননি এবং শিলারকে তার নিজের ব্যয়ে একটি নাটক প্রকাশ করতে হয়েছিল।

ম্যানহিমের বইয়ের ব্যবসায়ী শোয়ান, যাকে শিলারও পান্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন, তাকে ম্যানহিম থিয়েটারের পরিচালক ব্যারন ভন ডাহলবার্গের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি নাটকটি দেখে আনন্দিত হয়ে তাঁর থিয়েটারে মঞ্চ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে ডালবার্গ কিছু সমন্বয় করতে বলেছেন - কিছু দৃশ্য এবং সর্বাধিক বিপ্লবী বাক্যাংশ সরিয়ে ফেলতে, কর্মের সময়টি বর্তমান থেকে সপ্ত বছরের যুদ্ধের দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থানান্তরিত হয়।

শিলার এই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন; ১২ ডিসেম্বর, ১৭৮১-এর ডাহলবার্গের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "অনেক তিরাদ, বৈশিষ্ট্য, বড় এবং ছোট উভয়ই এমনকি চরিত্রগুলি আমাদের সময় থেকে নেওয়া হয়েছে; ম্যাক্সিমিলিয়ানের যুগে স্থানান্তরিত, তাদের কোনও দামই হবে না ... ফ্রেডরিকের দ্বিতীয় যুগের বিরুদ্ধে একটি ভুল সংশোধন করার জন্য, আমাকে ম্যাক্সিমিলিয়ানের যুগের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে হয়েছিল, "তবে তবুও ছাড় দেওয়া হয়েছিল, এবং" ডাকাত "প্রথমে ম্যানহিমে রাখা হয়েছিল ১৩ জানুয়ারী, ১৭৮২। এই উৎপাদন জনসাধারণের সাথে একটি বিশাল সাফল্য ছিল।

১৩ জানুয়ারী, ১৭৮২ সালে ম্যানহিমের প্রিমিয়ারের পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একজন প্রতিভাবান নাট্যকার সাহিত্যে এসেছিলেন। ডাকাতদের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হ'ল দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ: বড় কার্ল মুর, যিনি ডাকাতদের

একটি দলের প্রধান ছিলেন, অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বোহেমিয়ার বনাঞ্চলে গিয়েছিলেন, এবং ছোট ফ্রাঞ্জ মুর, যিনি এই সময়ে তার বাবার সম্পত্তির মালিক হতে চেষ্টা করেছিলেন।

কার্ল মুর সেরা, সাহসী, নিখরচায় সূচনা ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে ফ্রাঞ্জ মুর বুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ। রববার্সে, জার্মান আলোকিতকরণের অন্য কোনও কাজ হিসাবে, রুসো দ্বারা উদযাপিত প্রজাতন্ত্রবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ দেখানো হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের বছরগুলিতে শিলারকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নাগরিকের সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করা এই নাটকটির জন্য স্পষ্টতই কোনও ঘটনা নয়।

ডাকাতদের পাশাপাশি শিলার কবিতা সংকলন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যা ১৭৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল **"১৭৮২ সালের জন্য নৃতত্ত্ব"** (অ্যানথলজি আউফ দাস জহর 1782)। এই নীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি শিলারের তরুণ স্টুটগার্ট কবি গথহাল্ড স্টিডলিনের সাথে বিরোধের ভিত্তিতে তৈরি, যিনি স্বাবিয়ান বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে দাবি করেছেন, প্রকাশ করেছেন **"1782 মিউজিকের স্বাবিয়ান নৃতত্ত্ব"**।

শিলার স্টিডলিনকে এই প্রকাশনার জন্য বেশ কয়েকটি কবিতা প্রেরণ করেছিলেন, তবে তিনি সেগুলির মধ্যে একটি মুদ্রণ এবং পরে সংক্ষেপে সম্মত হন। তারপরে শিলার গথহাল্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পদগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, বেশ কয়েকটি নতুন রচনা লিখেছিলেন এবং এভাবে তাঁর সাহিত্যের প্রতিপক্ষের "মিউজিকের পাটামাটির" সাথে পৃথক হয়ে "১৭৮২ এর জন্য নীতিবিজ্ঞান" তৈরি করেছিলেন। বৃহত্তর রহস্য এবং সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর স্বার্থে সাইবেরিয়ার টোবলস্ক শহরকে নৃবিজ্ঞানের প্রকাশের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

দ্য রবার্সের অভিনয়ের জন্য রেজিমেন্ট থেকে ম্যানহাইমে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য, শিলারকে ১৪ দিনের জন্য গার্ডহাউসে রাখা হয়েছিল এবং তাকে মেডিকেল রচনা ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল, যার ফলে তিনি তার বন্ধু, সংগীতশিল্পী স্ট্রিচারকে সাথে নিয়ে ডিউকের সম্পত্তি পালাতে বাধ্য হন ২২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮২ মারগ্রাভ প্যালেটিনেটে বছর।

ওয়ার্টেমবার্গের সীমানা পেরিয়ে শিলার তার নাটকের প্রস্তুত পান্ডুলিপি নিয়ে ম্যানহাইম থিয়েটারে গিয়েছিলেন। **জেনোয়াতে ফিৎসকো ষড়যন্ত্র** (জার্মান ডাই ভার্স্চুর্গং ডেস ফিয়েস্কো জু জেনুয়া), যা তিনি একাডেমির দর্শনের অধ্যাপক জ্যাকব আবেলকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ওয়ার্টেমবার্গ ডিউকের অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় থিয়েটার পরিচালনা, নাটকটির প্রযোজনার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার কোন তাড়াহুড়া হয়নি। শিলারকে ম্যানহাইমে না থাকার জন্য, তবে নিকটতম ওগগারহেমের গ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর বন্ধু স্ট্রেচারের সাথে নাট্যকার লেখক শ্লিঙ্ট নামে গ্রামের বাড়িতে "দ্য হান্টিং কোর্টইয়ার্ড" নামে বাস করতেন। এখানেই ১৭৮২ সালের শরৎকালে ফ্রেডরিচ শিলার ট্র্যাজেডির প্রথম খসড়া তৈরি করেছিলেন **"চালাকি এবং ভালবাসা"** (জার্মান: কাবালে আন্ড লাইব), যা এখনও "লুইস মিলার" নামে পরিচিত।

শিলার এই মুহূর্তে মুদ্রণ করছেন। **জেনোয়াতে ফিৎসকো ষড়যন্ত্র** তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় করেছেন এমন স্বল্প পরিমাণের জন্য। হতাশ পরিস্থিতিতে, নাট্যকার তাঁর পুরানো পরিচয় হেনরিটা ফন ওয়ালজোগেনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যিনি শীঘ্রই বাউরবাচে লেখককে তার খালি সম্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ।

বাবারবাচে, "ডাঃ রিটার" নামে তিনি ৮ ই ডিসেম্বর, ১৭৮২-তে থাকতেন। এখানে, শিলার "কৌতুক এবং প্রেম" নাটকের শেষের দিকে এগিয়ে যায়, যা তিনি ১৭৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরে তিনি একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটকের চিত্র আঁকেন **ডন কার্লোস** (জার্মান: ডন কার্লোস)। তিনি ম্যানহাইম ডুকাল

কোর্টের পাঠাগার থেকে বইগুলি থেকে স্প্যানিশ ইনফান্তার ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন, যা তিনি একজন পরিচিত গ্রন্থাগারিক সরবরাহ করেছিলেন। ডন কার্লোসের গল্পের পাশাপাশি শিলার স্কটিশ রানী মেরি স্টুয়ার্টের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি দ্বিধা করেছিলেন যে তাদের মধ্যে কোনটি বন্ধ করা উচিত, তবে ডন কার্লোসের পক্ষে এই পছন্দটি করা হয়েছিল।

ফ্রিডরিচ শিলারের ব্যক্তিগত জীবনে জানুয়ারি ১৭৮৩ একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ ছিল। বাউরবাচে, এই দাসীর সাথে দেখা করতে, এস্টেটের উপপত্নী তার ষোল বছর বয়সী মেয়ে শার্লোটের সাথে উপস্থিত হয়েছিল। ফ্রেডরিচ প্রথম দর্শনেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং তার মাকে বিয়ের অনুমতি চেয়েছিলেন, তবে তিনি সম্মতি দেননি, যেহেতু প্রথম লেখকের পকেটে একটি পয়সাও ছিল না।

এই সময়ে, তাঁর বন্ধু আন্দ্রে স্ট্রেইচার শিলারের পক্ষে ম্যানহাইম থিয়েটার প্রশাসনের পক্ষে জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। থিয়েটারের পরিচালক ব্যারন ফন ডাহলবার্গ, জেনে যে ডিউক কার্ল ইউজিন ইতিমধ্যে তার নিখোঁজ রেজিমেন্টাল চিকিৎসকের সন্ধান ত্যাগ করেছিলেন, শিলারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে নাট্যকারের সাহিত্যকর্মের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন।

শিলার বরং ঠান্ডা উত্তর দিয়েছিল এবং কেবলমাত্র "লুইস মিলার" নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলেছিল। ডাহলবার্গ জেনোয়া এবং লুইস মিলার ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র উভয় নাটক নির্মাণের সাথে একমত হয়েছিলেন, এরপরে ফ্রিডরিচ জুলাই মাসে ম্যানহাইমে ফিরে আসেন প্রযোজনার নাটকগুলির প্রস্তুতিতে অংশ নিতে।

অভিনেতাদের দুর্দান্ত নাটক সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে "জেনোয়াতে ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র" তেমন সাফল্য পায়নি। ম্যানহাইম থিয়েটারের শ্রোতারা এই নাটকটি খুব গর্হিত বলে মনে করেছেন। শিলার তার তৃতীয় নাটক - "লুইস মিলার" এর রিমেক গ্রহণ করেছিলেন। একটি মহড়া চলাকালীন নাট্য অভিনেতা অগস্ট আইফল্যান্ড নাটকের নাম পরিবর্তন করে "চালনা এবং প্রেম" করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই নামে, নাটকটি ১৫ এপ্রিল, ১৭৮৪ এ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং একটি বিশাল সাফল্য ছিল। "চালাকি" এবং "ছিনতাইকারী" এর চেয়ে কম নয়, জার্মানির প্রথম নাট্যকার হিসাবে লেখকের নামকে মহিমান্বিত করেছিল।

১৭৮৪ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রবেশ করেছিলেন **কুর্ফাল্টজ জার্মান সোসাইটি**যা ম্যানহিম থিয়েটারের পরিচালক ডিরেক্টর ওল্ফগ্যাং ভন ডালবার্গ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা তাকে প্যালিটিনেট বিষয়ের অধিকার দিয়েছিল এবং ম্যানহাইমে তার অবস্থানকে বৈধ করেছে। ২০ জুলাই, ১৭৮৪ সালে কবিকে সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সময় তিনি "একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে থিয়েটার" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন পড়েছিলেন। থিয়েটারের নৈতিক গুরুত্ব, দুর্নীতি প্রকাশ এবং পুণ্যকে অনুমোদনের জন্য ডিজাইন করা, শিলার তার প্রতিষ্ঠিত জার্নালে উদ্যোগী হয়ে প্রচার করেছিলেন **রাইন কোমর** (জার্মান: রাইনিশে থালিয়া), এর প্রথম সংখ্যাটি ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ম্যানহিমে ফ্রিডরিচ শিলার শার্লট ভন কালব নামে এক যুবতী মহিলার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যাঁর প্রশংসা লেখককে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। তিনি যখন শর্মারকে ডেইমস্ট্যাডে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন ওয়েমারের ডিউক কার্ল অগাস্টাসের সাথে পরিচয় করেছিলেন। নাট্যকার নির্বাচিত চেনাশোনাতে পড়েছিলেন, ডিউকের উপস্থিতিতে তাঁর নতুন নাটক ডন কার্লোসের প্রথম অভিনয় নাটকটি উপস্থিতদের উপর দুর্দান্ত ছাপ ফেলে।

কার্ল অগাস্টাস লেখককে ওয়েমির উপদেষ্টার পদ মঞ্জুর করেছিলেন, তবে শিলারের দুর্দশা কমেনি। লেখকের দু'শ গিল্ডারের ঋণ শোধ করার কথা ছিল, যা তিনি "ডাকাত" প্রকাশের জন্য বন্ধুর কাছ থেকে ধার করেছিলেন, কিন্তু

তার কাছে টাকা ছিল না। এছাড়াও ম্যানহিম থিয়েটারের পরিচালকের সাথে তার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়, ফলস্বরূপ শিলার তার চুক্তি ভেঙে দেয়।

একই সময়ে, শিলার আদালতের বই বিক্রয়কারী মার্গারিটা শোয়ান-এর ১৭-বছরের কন্যার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তবে, তরুণ কোকোয়েটি প্রথম কবিটির পক্ষে একটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেন নি, এবং তার বাবা সমাজে অর্থ ও প্রভাব ছাড়াই কোনও মেয়েকে তার মেয়েকে বিবাহিতভাবে দেখার ইচ্ছা করেছিলেন। ১৭৮৪ সালের শুরুর দিকে, কবি গেটফ্রাইড কার্নারের নেতৃত্বে তাঁর কাজের অনুরাগীদের লাইপজিগ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ছয় মাস আগে প্রাপ্ত চিঠিটি স্মরণ করেছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৫এ শিলার তাদের একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কঠিন পরিস্থিতিটি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছিলেন এবং লাইপজিগের কাছে আসতে বললেন। ইতিমধ্যে ৩০ শে মার্চ, কার্নারের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ জবাব এসেছে। একই সাথে তিনি কবিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের বিনিময়ের বিল পাঠিয়েছিলেন যাতে নাট্যকার তার ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। এভাবে গটফ্রাইড কার্নার এবং ফ্রেডরিচ শিলারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব শুরু হয়, যা কবির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শিলার ১৭ এপ্রিল, ১৭৮৫-এ যখন লাইপজিগ পৌঁছেছিলেন তখন তার সাথে ফারডিনান্ড হুবার এবং বোনেরা দোরা এবং মিনা স্টকের সাথে দেখা হয়েছিল। কার্নার এই সময়ে ড্রেসডেনে অফিসিয়াল ব্যবসায় ছিলেন। লিপজিগের প্রথম দিন থেকেই শিলার ম্যানহিমে থেকে যাওয়া মার্গারিটা শোয়ানকে খুব আকুল করে তুলল। তিনি একটি চিঠি দিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের দিকে ফিরেছিলেন যাতে তিনি তাঁর মেয়ের হাতের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রকাশক শোয়ান মার্জারিটাকে নিজেই এই সমস্যাটি সমাধান করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তবে তিনি শিলারকে অস্বীকার করেছিলেন, যিনি এই নতুন ক্ষতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শীঘ্রই গটফ্রিড কার্নার ড্রেসডেন থেকে এসেছিলেন, যিনি মাইন স্টকের সাথে তার বিবাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কার্নার, হুবার এবং তাদের বন্ধুদের বন্ধুত্ব দেখে উষ্ণ হয়ে শিলার সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়েই তিনি তাঁর সংগীত তৈরি করেছিলেন **ওড টু জয় (ওড অ্যান ডাই ফ্রয়েড)**.

১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫ সালে গটফ্রাইড কার্নারের আমন্ত্রণে শিলার ড্রেসডেনের কাছে লসউইট্জ গ্রামে চলে আসেন। এখানে ডন কার্লোস পুরোপুরি পুনর্নির্মাণ এবং সমাপ্ত হয়েছিল, একটি নতুন নাটক, মিসানথ্রোপ চালু হয়েছিল, একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল এবং দ্য আধ্যাত্মিক মানুষ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়গুলি রচনা করা হয়েছিল। এখানে এটি শেষ হয়েছিল এবং তার **দার্শনিক চিঠিগুলি** (জার্মান দর্শনশাস্ত্র ব্রিফি) - তরুণ শিলারের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দার্শনিক রচনা, যা এপিস্টোলারি আকারে রচিত।

১৭৮৭ সালে গটফ্রাইড কার্নারের মাধ্যমে ফ্রেডরিচ শিলারকে ড্রেসডেন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। একই সময়ে, তিনি হ্যামবার্গের জাতীয় থিয়েটারে ডন কার্লোসের মঞ্চায়নের জন্য একজন বিখ্যাত জার্মান অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক ফ্রিডরিচ শ্রয়েডারের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব পেয়েছিলেন।

শ্রোয়েডারের প্রস্তাবটি বেশ ভাল ছিল, তবে শিলার ম্যানহাইম থিয়েটারের সাথে অতীতের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এই আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করে এবং জার্মান সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ওয়েমারের কাছে যায়, যেখানে তাকে ক্রিস্টোফ মার্টিন উইল্যান্ড তাঁর সাহিত্য জার্নাল জার্মান বুধে সহযোগিতা করার জন্য অধীর আগ্রহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল (জার্মান ডের ডয়চে মেরকুর)।

শিলার আগস্ট ২১, ১৭৮৭ এ ওয়েমারে এসেছিলেন। শার্লোট ভন কালব একাধিক সরকারী সফরে নাট্যকারের সঙ্গী হয়েছিলেন, যার সহায়তায় শিলার দ্রুত তৎকালীন বৃহত্তম লেখক - মার্টিন উইল্যান্ড এবং জোহান গটফ্রাইড হার্ডারের সাথে দেখা করেছিলেন। উইল্যান্ড শিলারের প্রতিভার তীব্র প্রশংসা করেছিল এবং বিশেষত তাঁর সর্বশেষ নাটক ডন কার্লোসের প্রশংসা করেছিলেন। প্রথম বৈঠকের দুজন কবিই বহু বছরের দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছিলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে ফ্রেডরিচ শিলার জেনার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভ্রমণ করেছিলেন, সেখানে সেখানকার সাহিত্যিক মহলে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।

১৭৮৮ সালে শিলার থালিয়া (জার্মান: থালিয়া) ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছিলেন এবং একই সাথে উইল্যান্ডের জার্মান বুধে সহযোগিতা করেছিলেন। এই বছরের কয়েকটি কাজ আবার লাইপজিগ এবং ড্রেসডেনে শুরু হয়েছিল। কোমরের চতুর্থ সংখ্যায় তাঁর উপন্যাসটি অধ্যায়গুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল- **"স্বপ্নদর্শী"**।

৫.৩.১১.২.৩ নান্দনিকতার অধ্যয়ন

ওয়েমারে চলে যাওয়ার পরে এবং প্রধান কবি ও বিজ্ঞানীদের সাথে দেখা করার পরে শিলার তার ক্ষমতা নিয়ে আরও সমালোচিত হয়ে ওঠেন। জ্ঞানের অভাব বুঝতে পেরে নাট্যকার প্রায় এক দশক ধরে ইতিহাস, দর্শন এবং নান্দনিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করতে শিল্প থেকে দূরে সরে এসেছিলেন।

কাজের প্রথম খণ্ড প্রকাশ **"নেদারল্যান্ডসের প্রস্থান ইতিহাস"** 1788 সালের গ্রীষ্মে ইতিহাসের অসামান্য পণ্ডিত হিসাবে শিলার খ্যাতি এনেছিলেন। জেনা এবং ওয়েইমের কবিগুরুর বন্ধুরা (আই.ভি. গ্যোথ সহ, যাকে শিলার ১৭৮৮ সালে সাক্ষাত করেছিলেন) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শনের অসাধারণ অধ্যাপকের পদ পেতে সহায়তা করার জন্য তাদের সমস্ত সংযোগ ব্যবহার করেছিলেন, যারা এই শহরে কবির থাকার সময় অভিজ্ঞ ছিলেন সমৃদ্ধির সময়।

ফ্রেডরিচ শিলার ১১ মে, ১৭৮৯-এ জেনায় চলে এসেছিলেন। তিনি যখন বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী ছিল। "বিশ্বের ইতিহাস কী এবং এটি কীসের জন্য পড়াশোনা করা হয়" শিরোনামের প্রবর্তনামূলক বক্তৃতাটি (জার্মান ছিলেন হিস্ট অ্যান্ড জু ওয়েলচেম এন্ডে স্টুডিয়ার্ট ইউনিভার্সালজেসিচ্টে?) দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছিল। শিলারের ছাত্ররা তাকে স্থায়ীভাবে উৎসাহ দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ তাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ সরবরাহ করেনি তা সত্ত্বেও শিলার তাঁর একক জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরে, ডিউক কার্ল অগাস্টাস তাকে ডিসেম্বর 1789 সালে এক বছরে দু'শ থ্যালারের সামান্য বেতনের নিয়োগ দেন, তার পরে শিলার শার্লট ফন লেঙ্গফেল্ডের কাছে অফিসিয়াল অফার করেছিলেন এবং ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ সালে রুডলস্টাডটের কাছে একটি গ্রামে গির্জায় একটি বিয়ে হয়েছিল।

বাগদানের পরে শিলার তার নতুন বইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। **“তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস”**, বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন নিবন্ধের কাজ শুরু করে এবং আবার "রাইন কোমর" ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে শুরু করে, যেখানে তিনি ভার্জিলের "আনেইডস" এর তৃতীয় এবং চতুর্থ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। পরে এই জার্নালে তাঁর ইতিহাস ও নান্দনিকতা সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৭৯০ সালের মে মাসে শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতাগুলি অব্যাহত রেখেছিলেন: এই শিক্ষাবর্ষে তিনি প্রকাশ্যে ট্র্যাজিক কবিতা এবং বিশেষত বিশ্ব ইতিহাসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৭৯১ এর শুরুতে, শিলার পালমোনারি যক্ষ্মায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁর মাঝে মাঝে মাঝে কয়েক মাস বা সপ্তাহের অন্তর ছিল, যখন কবি শান্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হতেন। ১৭৯২ সালের শীতে এই রোগের প্রথম দিকটি ছিল বিশেষত শক্তিশালী, যার কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা স্থগিত করতে বাধ্য হন। এই বাধ্যতামূলক বিশ্রামটি শিলার দার্শনিক কাজের সাথে আরও গভীর পরিচিতির জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

কাজ করতে অক্ষম হওয়ায় নাট্যকার অত্যন্ত চরম আর্থিক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন - এমনকি সস্তার দুপুরের খাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্যও কোনও অর্থ ছিল না। এই কঠিন মুহূর্তে ডেনিশ লেখক জেনস ব্যাগসেনের উদ্যোগে ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেড্রিখ ক্রিশ্চান শ্লেসভিগ-হলস্টেইন এবং কাউন্ট আর্নস্ট ভন শিম্মেলম্যান শিলারকে এক হাজার ট্যালারের বার্ষিক ভর্তুকি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন যাতে কবি তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন। ডেনিশ ভর্তুকি ১৭৯২-৯৪ বছরে অব্যাহত ছিল। এরপরে শিলারকে প্রকাশক জোহান ফ্রেড্রিখ কোট সমর্থন করেছিলেন, যিনি তাকে ১৭৯৪ সালে মাসিক পত্রিকা ওরি প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

১৭৯৩ এর গ্রীষ্মে, শিলার লুডভিসবার্গে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে একটি চিঠি পেলেন এবং তাকে তাঁর বাবার অসুস্থতার কথা জানালেন। শিলার তাঁর মৃত্যুর আগে তার বাবার সাথে দেখা করতে, তার মা এবং তিন বোনকে দেখার জন্য তাঁর স্ত্রীর সাথে বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাদের এগারো বছর আগে তিনি ভেঙেছিলেন। ওয়ার্টেমবার্গের ডিউকের করণীয় অনুমতি নিয়ে কার্ল ইউজিন শিলার লুডভিসবার্গে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তার বাবা-মা ডুকালের বাসভবনের কাছেই বাস করতেন। এখানে, ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩ এ, কবির প্রথম পুত্রের জন্ম হয়েছিল। লুডভিসবার্গ এবং স্টুটগার্টে শিলার একাডেমিতে পুরানো শিক্ষক এবং অতীতের বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলেন। কার্লের ডিউকের মৃত্যুর পরে, ইউজিন শিলার মৃতের সামরিক একাডেমি পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তিনি তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎসাহের সাথে তাকে গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৯৩-৯৪ সালে স্বদেশে অবস্থানকালে শিলার তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও নান্দনিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন **"মানুষের নান্দনিক শিক্ষার উপর চিঠি"** (জার্মান: Über die ästhetische Erziehung des Menschen)।

জেনার কাছে ফিরে আসার পরপরই কবি শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং তৎকালীন জার্মানির সমস্ত বিশিষ্ট লেখক এবং চিন্তাবিদদের নতুন ওরা ম্যাগাজিনে (জার্মান ডাই হোরেন) সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শিলার একটি সাহিত্যিক সমাজের সেরা জার্মান লেখকদের একত্রিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে শিলার নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর নিবন্ধগুলির সাথে মিল রেখে দার্শনিক বিষয়গুলিতে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন: "জীবনের কবিতা", "নৃত্য", "পৃথিবীর বিচ্ছেদ", "জেনিয়াস", "আশা" এবং অন্যান্য। নোংরা, প্রসেসিক বিশ্বে যা কিছু সুন্দর এবং সত্যবাদী তার মৃত্যু। কবির মতে, পুণ্য আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা কেবল একটি আদর্শ বিশ্বে সম্ভব। দার্শনিক কবিতার চক্রটি প্রায় এক দশক সৃজনশীল বিরতির পরে শিলারের প্রথম কাব্যিক অভিজ্ঞতা ছিল।

ফরাসি বিপ্লব এবং জার্মানির আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শিলার তাঁর viewsক্যের দ্বারা দুই কবির মধ্যে পরস্পর পরস্পর প্রচারিত হয়েছিল। শিলার যখন তাঁর স্বদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১৭৯৪ সালে ওরি

পত্রিকাটিতে জেনার কাছে ফিরে আসেন, তখন তিনি তার রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপরেখা দিয়েছিলেন এবং গোয়েতকে একটি সাহিত্য সমাজে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি চুক্তির সাথে জবাব দেন।

লেখকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে জুলাই ১৭৯৪ সালে জেনায়। প্রকৃতিবিদদের সভা শেষে রাস্তায় বেরিয়ে কবিরা রিপোর্টের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন এবং কথোপকথন করে শিলারের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেছিলেন reached গোয়েতে বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে তিনি উদ্ভিদ রূপান্তর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত উৎসাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন। এই কথোপকথনের পরে, শিলার এবং গিথের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যা শিলারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত হয় নি এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক স্মৃতিচিহ্ন ছিল।

গিথে এবং শিলারের যৌথ সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপগুলি প্রথমত, একটি নতুন, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের আগে উত্থিত সমস্যার তাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং ব্যবহারিক সমাধান হিসাবে তাদের লক্ষ্য ছিল। একটি আদর্শ রুপের সন্ধানে কবিরা প্রাচীন শিল্পকলায় পরিণত হয়েছিল। এতে তারা মানবসৌন্দর্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ দেখেছিল।

যখন গ্যোথ এবং শিলার নতুন কাজগুলি ওরা ও মিউজসের আলমানাকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের প্রাচীনত্ব, উচ্চ নাগরিক এবং নৈতিক পথ এবং ধর্মীয় উদাসীনতার প্রতিচ্ছবিকে প্রতিফলিত করে, তখন বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রচারণা চালিয়েছিল। সমালোচকরা ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, নান্দনিকতার বিষয়গুলির ব্যাখ্যার নিন্দা করেছেন।

মার্চালের "জেনিয়া" এর মতো দম্পতি রুপে - শৈলর গয়েথকে ফর্ম হিসাবে আধুনিক জার্মান সাহিত্যের সমস্ত অবাধ্যতা এবং মধ্যযুগীয়তার নির্মমভাবে মারাত্মক শিকার করে গোটে এবং শিলার বিরোধীদের তীব্র তিরস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ডিসেম্বর ১৭৯৫ সালে, আট মাস ধরে, উভয় কবি এপিগ্রাম তৈরিতে প্রতিযোগিতা করেছিলেন: জেনা এবং ওয়েমারের প্রতিটি উত্তর অন্তর্ভুক্ত **"Xenia স্বাগতম"** দেখার, পর্যালোচনা এবং পরিপূরক। সুতরাং, ডিসেম্বর ১৭৯৫ থেকে আগস্ট ১৭৯৬ পর্যন্ত যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় আট শতাধিক এপিগ্রগ্রাম তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে চারশো চৌদ্দটি সবচেয়ে সফল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং ১৭৯৭ এর জন্য "মিউজস অফ মিউজ" এ প্রকাশিত হয়েছিল। "জেনিয়া" বিষয়টি খুব বহুমুখী ছিল। এর মধ্যে রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য এবং শিল্পের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারা প্রায় দুই শতাধিক লেখক এবং সাহিত্যকর্মকে স্পর্শ করেছে। "জেনিয়া" হ'ল উভয় ক্লাসিক দ্বারা নির্মিত রচনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক যুদ্ধের মতো।

১৭৯৯ সালে তিনি ওয়েমারে ফিরে আসেন, সেখানে পৃষ্ঠপোষকদের অর্থ দিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। গোথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার পরে শিলার তাঁর সাথে একসাথে ওয়েমার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা জার্মানির শীর্ষস্থানীয় থিয়েটারে পরিণত হয়েছিল। কবি তাঁর মৃত্যু অবধি ওয়েমারে রয়েছেন।

১৭৯৯-১৮০০ বছরগুলিতে। শিলার অবশেষে একটি নাটক লেখেন **"মেরি স্টুয়ার্ট"**, এর প্লট প্রায় দুই দশক ধরে তাকে দখল করেছে। তিনি সবচেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি দিয়েছিলেন, সহিংস রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এক যুগের চিত্র ধারণ করেছিলেন। নাটকটি সমসাময়িকদের মধ্যে দুর্দান্ত সাফল্য ছিল। শিলার এই অনুভূতি দিয়ে এটি শেষ করেছেন যে এখন তিনি "একজন নাট্যকারের কারুকাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন।"

১৮০২ সালে, পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সজ শিলারকে আভিজাত্য দিয়েছিলেন। তবে তিনি নিজেই সংশয়ী ছিলেন, ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮০৩-এর একটি চিঠিতে হাম্বল্টকে লিখেছিলেন: "আপনি যখন আমাদের উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার কথা শুনেছেন তখন আপনি সম্ভবত হেসেছিলেন। এটি ছিল আমাদের ডিউকের উদ্যোগ, এবং যেহেতু সবকিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে, আমি ললো এবং বাচ্চাদের কারণে এই উপাধিটি মানতে রাজি আছি। আদালতে ট্রেনটি ঘোরানোর সময় লোলো এখন তার উপাদানটিতে রয়েছে।

শিলারের জীবনের শেষ বছরগুলি মারাত্মক দীর্ঘায়িত অসুস্থতার দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল। তীব্র শীতের পরে, সমস্ত পুরানো অসুস্থতা আরও খারাপ হয়ে গেল। কবি দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়াতে ভুগছিলেন। যক্ষ্মা রোগ থেকে আক্রান্ত হয়ে ৪৫ বছর বয়সে তিনি ৯ মে ১৮০৫ সালে মারা যান।

৫.৩.১১.২.৪ শিলারের রচনাসমূহ:

শিলারের নাটক :

১৭৮১ – দস্যুরা

১৭৮২ - জেনোয়াতে ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র

১৭৮৪ - "চালনা এবং প্রেম"

১৭৮৭ - ডন কার্লোস, স্পেনের শিশু

১৭৯৯ - নাটকীয় ট্রেলজি "ওয়ালেনস্টেইন"

১৮০০ - মেরি স্টুয়ার্ট

১৮০১ - অরলিন্স মেডেন

১৮০৩ - মেসিনা কনে

১৮০৪ - উইলিয়াম বলুন

ডিমেট্রিয়াস (নাট্যকারের মৃত্যুর কারণে শেষ হয়নি)

শিলারের গদ্য :

নিবন্ধ "হারানো সম্মানের অপরাধী" (১৭৮৬)\

আধ্যাত্মিক মানুষ (অসম্পূর্ণ উপন্যাস)

Eine großmütige হ্যান্ডলং

শিলারের দার্শনিক রচনা:

দার্শনিক দের ফিজিওলজি (১৭৭৬)

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সাথে মানুষের প্রাণী প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়ে / denber den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen Mit seiner geistigen (১৭৮০)

ডাই স্কাউউহনে আলস ইইন নৈতিকতা অ্যানস্টাল্ট বেচারচেট (১৭৮৪)

ওবার ড্যান গ্রানড ডেস ভার্জেনজেন একটি ট্রাজিসেন জেজেনস্ট্যান্ডেন (১৭৯২)

অগস্টেনবার্গার ব্রিফি (১৭৯৩)

গ্রেস এবং গৌরব সম্পর্কে / Anber আনমুট আন ওয়ার্ড (১৭৯৩)

ক্যালিয়াস-ব্রিফ (১৭৯৩)

ম্যান / Über ডাই স্টেস্টিচে এরজিয়েহং ডেস মেনচেন (১৭৯৫) এর নান্দনিক শিক্ষার উপর চিঠিগুলি

নিরীহ এবং সংবেদনশীল কবিতা / Über নিখুঁত এবং সংবেদনশীলতা Dichtung (১৭৯৫) সম্পর্কে

শৌখিনতা সম্পর্কে / Über den Dilettantismus (১৭৯৯; গোথের সহ-রচনা)

উৎসাহ / Über das এরহাবিন সম্পর্কে (১৮০১)

শিলারের ঐতিহাসিক রচনা:

স্পেনীয় শাসন থেকে ইউনাইটেড নেদারল্যান্ডসের পতনের গল্প (১৭৮৮)

তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস (১৭৯৯)

৫.৩.১১.৩ শিলারের প্রতিভার বিশ্লেষণ

প্রারম্ভিকভাবে শিলারের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যিনি মূলত থিয়েটার এবং নাটকের সমস্যাগুলির প্রতি আগ্রহী ছিলেন, এটি "আধুনিক জার্মান থিয়েটার" (ওবার জেনগেরওয়ারটিজ ডয়চে থিয়েটার, ১৭৮২), "থিয়েটারকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়" এর মতো সমালোচনামূলক সাহিত্যকর্মগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল (ডাই স্কাউউউহনে আলস ইইন নৈতিকতা অ্যানস্টাল বেরচেট,১৭৮৫)। এই দু'টিই শুরুর শিলার দ্বারা ভাগ করা ধারণা এবং শুদ্ধতার মুডে নিমগ্ন। তাদের লেখক সামন্ত বিশ্বের কুফলগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই সময়ের মার্শাল আর্টের পক্ষে ছিলেন। এই লক্ষ্যটির সফল প্রয়োগের জন্য, সমালোচককে সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং সত্যের নাট্যকারের প্রয়োজন ছিল। তিনি ফ্রান্সের উদাহরণ অনুসরণ করে জার্মানিতে রোপণ করা ধ্রুপদীতার বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "প্যারিসে, তারা চটজলদি সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলিতে পছন্দ করে যার মধ্যে কৃত্রিমতা সমস্ত সাহসী স্বাভাবিকতা সংহত করে।"

লেখক সমস্ত নিয়ম এবং সম্মেলনের বিরোধিতা করে শৈল্পিক সৃষ্টির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এর জাতীয় পরিচয়ের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। "নিষ্ক্রিয় প্রেমীদের" লেখক সামন্ত আভিজাত্যের দিকে অভিহিত, খালি বিনোদনমূলক নাটকের একটি সিদ্ধান্তক প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি থিয়েটারকে মানুষের জন্য স্কুল হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং "অবজ্ঞাপূর্ণ লোভী লোকদের" অভিনেত্রীর স্থান নয়।

শিলার এমন একটি থিয়েটারের সমর্থক যা লোককে আলোকিতকরণের আদর্শের চেতনায় শিক্ষিত করে। তিনি থিয়েটারকে এমন একটি চ্যানেল বলেছেন যার মাধ্যমে সত্যের আলো প্রবাহিত হয়। লেখকের মতে থিয়েটারটি সামাজিক ক্ষতিগুলিকে ঘৃণা করে। "বিনা শাস্তিবিহীন কয়েক হাজার কুফলকে থিয়েটার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়, হাজার হাজার পুণ্য, যার সম্পর্কে ন্যায়বিচার নীরব থাকে, মঞ্চে মহিমান্বিত হয়।" খ্রাপোভিটস্কায়া টি.এন., কোরোভিন এ.ভি. বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাস।

তরুণ লেখকের উভয় নিবন্ধ হ্যামবার্গ নাটকের লেখক লেসিংয়ের উপর তার উল্লেখযোগ্য প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়।

গ্রেপ্তারকালে শিলার ট্র্যাজেডি "কুনিং অ্যান্ড লাভ" নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, যা তাঁর "ঝড় ও হামলা" সময়কালের সেরা কাজ হয়ে ওঠে। লেখক তাঁর চরিত্রের মূল প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করেছেন ডুচি অফ ওয়ার্টেমবার্গে, যেখানে কবি যুবকটি কাটিয়েছিলেন, তিনি দ্বৈত স্বৈরাচারের ঘৃণ্য ঘটনা সম্পর্কে জানতেন। কার্ল ইউজিন তার প্রজাদের বাণিজ্য করা লজ্জাজনক বিবেচনা করেন নি, সেগুলি বিদেশী সেনাবাহিনীর কাছে তোপের

পশুর মতো বিক্রি করেছিলেন। তিনি শুবার্টের কারাগারে দশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তরুণ নাট্যকারও নিজের উপর ডিউকের স্বৈরাচার অনুভব করেছিলেন। শিলারের ট্র্যাজেডির পৃষ্ঠা থেকে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ বিদ্বেষ। কারণ ছাড়াই এঙ্গেলস এটিকে "প্রথম জার্মান রাজনৈতিকভাবে প্রবণতাপূর্ণ নাটক" বলেছিলেন "কৌতুক ও প্রেম" নাটক "ঝড় ও হামলা" নাটকের বাস্তবতার চূড়ায় পরিণত হয়েছিল। এটিতে, প্রথমবারের মতো, জার্মান জীবনকে এ জাতীয় গভীরতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। "ডাকাত" শৈল্পিক দক্ষতা, নাটকীয় কৌশল শিলার বৃদ্ধি সঙ্গে তুলনা। ফ্র্যাঞ্জ মুর এবং প্রথম নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির একতরফা ও সরলতা কাটিয়ে লেখক আরও জটিল চরিত্র তৈরি করেছিলেন। আরও জটিল সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা কেবল সংগীতশিল্পী মিলার, লুইস নয়, অন্যান্য চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এমনকি রাষ্ট্রপতি ওয়াল্টারকে কেবল একজন আদালতের কেরিয়ারিস্ট এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে দেখানো হয়নি, তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি প্রেমময় পিতাও তার ছেলের মৃত্যুতে হতবাক হয়েছিলেন, যার কাছ থেকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। লেডি মিলফোর্ড কেবল একজন নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত মহিলা নন, তিনি কোনও নির্দিষ্ট দয়া ও অহংকার ছাড়াই নন।

দ্য রবারস এবং দ্য কুনিং অ্যান্ড লাভ নাটকগুলি শিলারকে কেবল জার্মানিই নয় খ্যাতনামা নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। শীঘ্রই এগুলি ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। নাটকগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ট্র্যাজেডি "কুনিং অ্যান্ড লাভ" শিলারের কাজের প্রথম দিকে স্টান শেষ হয়। তার কাজের পরিবর্তনটি ছিল ডোন কার্লোসের ট্রানডিজ (ডন কার্লোস, ১৭৮৭), যা তিনি ১৭৮৩ সালে ঝড় ও হামলার সময়কালে শুরু করেছিলেন। তিনি যখন নাটকটিতে কাজ করেছিলেন, কবির মতামত পাল্টে গেছে, তিনি স্টর্মার আদর্শ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মূল পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। তবুও, প্রাথমিক নাটকগুলির সাথে কার্লোসের ধারাবাহিকতা সহজেই উপলব্ধিযোগ্য।

"ডন কার্লোস" ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত। ফিলিপ দ্বিতীয়-এর রাজত্ব, যখন ট্রাজেডি হয়েছিল, স্পেনের সামন্ত-ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল, যেখানে অনুসন্ধান তদন্তকারী হয়ে পড়েছিল।

লেখকের মতামতের ধারক, শিলারের নতুন নায়ক, মার্কের পোজ হন, মূল সংস্করণ অনুসারে, একটি গৌণ ভূমিকা অর্পণ করা হয়েছিল। ভঙ্গি স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের একজন উকিল। তিনি দ্বিতীয় ফিলিপের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন এমন স্বাধীনতা-প্রেমী ডাচদের সহায়তার জন্য স্পেনে পৌঁছেছেন। তিনি স্পেনীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, ডন কার্লোসকে রাজি করান, যার আত্মায় তিনি একবার "মানবতা এবং বীরত্বের বীজ" বপন করেছিলেন, নেদারল্যান্ডসকে সাহায্য করার জন্য যান। কার্লোস তার যৌবনের এক বন্ধুর প্রস্তাবের সাথে একমত হন এবং তার বাবার কাছে তাকে নেদারল্যান্ডসে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তবে ফিলিপ অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেন: তিনি তার ছেলের উপর আস্থা রাখেন না এবং এই মিশনটি আলবার নিষ্ঠুর ডিউকের হাতে অর্পণ করেন, তাকে অবশ্যই নির্মমভাবে বিদ্রোহকে চূর্ণ করতে হবে।

স্টিলার আদর্শ থেকে শিলারের বিদায়ের সাথে ছিল নান্দনিক নীতিগুলির সংশোধন। শিলার চোর, ফিলিস্তিন নায়কদের জগতে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যারা এখন তাকে ফ্ল্যাট এবং খারাপ বলে মনে করছেন। তিনি ডন কার্লোস, পোজের মতো উঁচু, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের আকর্ষণ করতে শুরু করেন, যার উপরে তিনি দেশের সম্ভাব্য ত্রাণকর্তা,

জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে তাঁর প্রত্যাশা রেখেছেন। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। নাটকের স্টাইলও বদলে যাচ্ছে। তিনি গদ্যকে অস্বীকার করেছেন, যা "ডন কার্লোস" এর মূল সংস্করণে লেখা হয়েছিল। প্রারম্ভিক নাটকগুলির গদ্য, তাদের চালচলন কথাবার্তা শ্লোগানগুলির সাথে অশ্লীলতা এবং দ্বান্দ্বিকতা দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, পাঁচ পাটের আইম্বিক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

ডন কার্লোসের পরে, শিলার প্রায় ১০ বছর ধরে নাটকীয় শিল্প থেকে দূরে সরে গেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে "টু জাই" (অ ডাই ফ্রয়েড,১৭৮৫), যা বন্ধুত্ব, আনন্দ এবং প্রেমের এক অনুরাগী সংগীত। কবি বৈরিতা, কুৎসা, নিষ্ঠুরতা এবং যুদ্ধের নিন্দা করেছেন, মানবজাতিকে শান্তিতে ও বন্ধুত্বের সাথে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

১৭৮৯-১৭৯৪ সালের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ঘটনার প্রতি শিলারের মনোভাব জটিল এবং বিপরীত ছিল। প্রথমদিকে, তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং গর্বিত ছিলেন যে ১৭৯২ সালে ফ্রান্সের আইনসভা তাকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সম্মানসূচক নাগরিক উপাধিকার হিসাবে, স্বাধীনতার উকিল হিসাবে ভূষিত করে। ভবিষ্যতে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে শিলার বিপ্লবের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তবে দুর্দান্ত ঘটনাগুলি তাকে বিশ্বদর্শন এবং সৃজনশীলতার বেশ কয়েকটি মূল সমস্যাগুলির পুনরায় মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জনগণের ভূমিকা, ইতিহাসের উপর তাদের প্রভাব, স্বদেশের ভাগ্য নিয়ে প্রশ্ন। শিলারের নাটক থেকে একাকী বিদ্রোহীর চিত্র অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এতে মানুষের থিম প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলার এখনও একটি স্বাধীনতা-প্রেমী কবি, তবে স্বাধীনতার কৃতিত্ব তিনি বিপ্লবী উপায়ে কল্পনা করেননি। জনসাধারণের অনিষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি নতুন অহিংস পদ্ধতির সন্ধান করছেন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। শিলার মূলত দার্শনিক এবং নান্দনিক। তিনি কান্তের দর্শনের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন, যা লেখকের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। শিলার কান্তের দর্শনের প্রাথমিক নীতিগুলি মেনে নিয়েছিলেন, তবে আরও অনুসন্ধানের সময়, তিনি তাঁর সাথে তার তাৎপর্য আরও এবং আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এই পার্থক্যগুলি এই কারণে হয়েছিল যে জার্মান দার্শনিক স্বাধীনতার সম্ভাবনা, বাস্তবে মানবতাবাদী আদর্শকে বিশ্বাস করেনি এবং তাদের বাস্তবায়নকে অন্য বিশ্বে স্থানান্তরিত করে। সমস্ত শিলারের অনুসন্ধানের অর্থটি এই সত্যে নেমে আসে যে তিনি স্বাধীনতা অর্জনের উপায়গুলি, সত্যিকারের বিশ্বে ব্যক্তিত্বের ব্যাপক বিকাশের শর্ত তৈরি করার উপায় অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য মতবিরোধের দ্বারাও এই ইস্যুতে পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছিল।

শিলারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রচনা হ'ল লেটারস অন দ্য এ্যাসেথিক এডুকেশন অফ ম্যান (উবার ডাই অ্যাথেটিচে আর্জিহুং ডেস মেনচেন, ১৭৯৫)। এই কর্মসূচী রচনায় লেখক কেবল নান্দনিক প্রশ্নগুলিকেই সম্বোধন করেননি, তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার উত্তর দেওয়ার এবং সমাজকে পুনর্গঠনের উপায়গুলিও সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের সহিংস উপায়গুলি অস্বীকার করে শিলার নান্দনিক শিক্ষায় প্রাথমিক সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করার মূল চাবিকাঠিটি দেখেন। অপরিশোধিত প্রাণী প্রবৃত্তি আধুনিক মানুষকে স্বাধীনতায় বাঁচতে দেয় না। মানবতাকে পুনরায় শিক্ষিত করা দরকার। সমাজকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায়, লেখক নান্দনিক শিক্ষা, সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা বিবেচনা করে। "... স্বাধীনতার পথ কেবল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে যায়" এই কাজের মূল ধারণা।

শিল্পকর্মের ফর্ম, সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহ দ্বারা নান্দনিক শিক্ষায় একটি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করা হয়। এখন থেকে কবি তাঁর রচনাগুলি সাজানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। গদ্য যুবক নাটকগুলি পরিপক্ক শিলারের কাব্য ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। শিলারের নান্দনিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল তাঁর কাজ "অন নাইভ অ্যান্ড সেন্টিমেন্টাল কবিতায়" (ওবার সাদাসিধা ও সংবেদনশীলতা ডিচটং, ১৭৯৫-১৭৯৬)। এটি সমাজের বিকাশের সাথে নান্দনিক সমস্যার সংযোগটি ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রচেষ্টা। শিলার নান্দনিক আদর্শের অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে অতিরিক্ত ঐতিহাসিক ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণ ছিল।

তিনি দুটি ধরণের কবিতা - "নিষ্পাপ" এবং "সংবেদনশীল", যা মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে উত্থিত হয় তার মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথমটি প্রাচীন বিশ্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, দ্বিতীয় - আধুনিকের জন্য। "নিষ্পাপ" কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তাদের কাজের নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি। আধুনিক কবিরা ব্যক্তিগত, "সংবেদনশীল"। তারা তাদের কাজগুলিতে চিত্রিত বিশ্বের প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাব বিনিয়োগ করে। মানবসমাজের অনন্য শৈশবকালে এন্টিক কবিতাটির উদ্ভব হয়েছিল, যখন কোনও ব্যক্তি সুরেলাভাবে বিকাশ লাভ করেছিলেন এবং তার চারপাশের বিশ্বের সাথে বিভেদ বোধ করেন না। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে আধুনিক বা "সংবেদনশীল" কবিতার বিকাশ ঘটে। নতুন সময়ের কবি তাঁর চারপাশের জগতের সাথে মতবিরোধ করে বেঁচে থাকেন এবং সুন্দরীর সন্ধানে তিনি প্রায়শই আধুনিকতা থেকে দূরে চলে যান যা তার আদর্শগুলির সাথে মেলে না।

শিলারের সহানুভূতিগুলি প্রাচীন "কবিতা" কবিতার পাশে ছিল।

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল শিলারের অনেক রচনায়, বিশেষত তাঁর বিখ্যাত কবিতা "গডসের ঈশ্বর" (ডাই গটার গ্রিচেনল্যান্ড,১৭৮৮) - এ, যা কবির পুনরুত্থানের দ্বারা আদর্শিত প্রাচীন বিশ্বের মৃত্যু সম্পর্কে শোকের ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে। একের পর এক, শিলারের উজ্জ্বল বল্লাদগুলি উপস্থিত হয়েছিল - "দ্য কাপ" (নামটি ভি.এ. ঝুকভস্কি, শিলারের পক্ষে - "ডাইভার" - ডার টাউচার), "দস্তানা" (ডায়ার হ্যান্ডসচুহ), "আইভিকোভে ক্রেনস" (ডাই ক্রানচি দেস) আইবিকাস), "পোরুক" (ডাই বার্গশেইট), "নাইট অফ টোগেনবার্গ" (রিটার টোগেনবার্গ), প্রতিভা দিয়ে ভি.এ. এর অনুবাদ করেছেন রাশিয়ান ভাষায় Zhukovsky।

বল্লাদগুলিতে, কবি বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সম্মান, বীরত্ব, ত্যাগ, মানব চেতনার মহানুভবতার মহৎ ধারণা গেয়েছেন। সুতরাং, "পোরুক" এর গানে তিনি বন্ধুত্বকে মহিমান্বিত করেছেন, যার জন্য পাই কোনও ক্ষতিগ্রস্থ লোকের সামনে থামেন না; সাহস ও সাহসের বিবরণ ‘‘গ্লোভ’’, ‘‘কাপ’’-এ বর্ণিত হয়েছে।

শিলারের বল্লগুলি একটি তীক্ষ্ণ নাটকীয় প্লট দ্বারা পৃথক করা হয়। দুর্দান্ত প্রকাশ এবং প্রাণবন্ততার সাথে তারা পরিস্থিতি এবং মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি জানায়। বিমূর্ততার চেতনা পটভূমিতে ফিরে আসে। আমাদের দেশের জার্মান কবি হিসাবে একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে, ফ্রাঞ্জ পেট্রোভিচ শিলার যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন, "বুদ্ধিমান নাট্যকারের হাতটি সমস্ত লোকের মধ্যে অনুভূত হয়" এমনটা অনুভব করা সহজ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। শিলার তার আদর্শগত বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীতমুখী, "বেলজ অফ বেল" (দাস লাইড ভন ডের গ্লোকে, ১৭৯৯) বিখ্যাত কবিতা তৈরি করেছেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু হ'ল কবিতাটির কাজের প্রতি ধ্যান, মানুষের সুখ, জীবন পুনর্গঠনের পথে।

ওয়ালেনস্টেইন ট্রিলজি (ওয়ালেনস্টাইন, ১৭৯৭ - ১৭৯৯) শিলারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি তাঁর অন্যান্য কাজের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এতে কাজ করেছিলেন। একটি পরিকল্পনা বহন এবং চিন্তা করার প্রক্রিয়াটি খুব দীর্ঘ ছিল। যাইহোক, এটি আশ্চর্যজনক নয় যে ওয়ালেনস্টাইন নাট্যকারের রচনায় একটি নতুন মঞ্চ খোলেন, যে ট্রিলজিটি মূলত একটি নতুন শৈল্পিক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল।

তিরিশ বছর যোদ্ধার ইভেন্টের সাথে যুক্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক পরিকল্পনার জন্য চরিত্রগুলি এবং সেটিংয়ের একটি উদ্দেশ্যমূলক চিত্র অঙ্কন প্রয়োজন। ব্যবসায়ের একটি বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পরিকল্পনার ক্ষতি করতে পারে। শিলারের দীর্ঘ ইতিহাস, তাঁর দুর্দান্ত ঐতিহাসিক রচনাগুলি দি নেদারল্যান্ডের প্রস্থানের ইতিহাস (ডাই গেসিচটি দেস অ্যাফেলস ডের ভেরিনিগটেন নিডারল্যান্ডে,১৭৮৮), তিরিশ বছর যুদ্ধের ইতিহাস (ডাই গেসিচটি দেস ড্রেসিগজাহারিজেন ক্রিজেস,১৭৯২) ভাল তৈরির জন্য একটি ভাল প্রস্তুতিমূলক স্কুল ছিল । ইতিহাসের ক্লাসগুলি ঘটনাকে সত্যিকারের অনুপ্রেরণা দিয়ে কংক্রিটের সত্যগুলিতে লেগে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলে। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। "মেরি স্টুয়ার্ট" (মারিয়া স্টুয়ার্ট,১৮০০) - একটি আর্থ-মানসিক ট্র্যাজেডি। এতে কোনও বিস্তৃত সামাজিক চিত্রকর্ম নেই; শিলারের চিত্রিত বিশ্ব প্রধানত আদালতের চেনাশোনাতেই সীমাবদ্ধ।

মরিয়মের ভাগ্য ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই মুহূর্তে ট্রাজেডি শুরু হয়। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মেরির বেঁচে থাকার জন্য মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি ছিল।

শিলার ট্র্যাজেডির পরিধি ছাড়িয়ে স্কটিশ রানির পুরো ব্যাকস্টোরি বিচার করেছিলেন কেবল তার চরিত্রের কথা থেকেই আমরা তার উজ্জ্বল, তবে দুর্নামময় অতীত সম্পর্কে শিখি, যখন তিনি তার স্বামীর হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন, যার জন্য তিনি স্কটিশদের সিংহাসন হারিয়েছিলেন।

শিলারের ছবিতে মারিয়া কোনওভাবেই নিরীহ নয়। তার বিবেক নিয়ে অপরাধ আছে। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ধরে একটি ইংরেজী কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন, যেভাবে তিনি বহুভাবে তার অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তিনি অনেক কিছুই সম্পর্কে তার মন পরিবর্তন, সমালোচনা করে তার অতীত ফিরে তাকান। মেরি উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয়েছে, ভোগ করে তাঁকে নাম দিয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ছাড়া না। তার আন্তরিকতা, আন্তরিকতা রয়েছে, যা এলিজাবেথের এত অভাব রয়েছে।

অরলিন্স মেইডেনের রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি (ডাই জং-ফ্রেউ ফন অরলিন্স, ১৮০১) হান্ড্রেড ইয়ারস যুদ্ধের সময় বিদেশি হানাদার, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দেখায়। কৃষক মেয়ে জ্যানি ডিআর্ক এই যুদ্ধের জাতীয় নায়িকা হয়ে ওঠেন।শিলার দেখিয়েছিলেন যে ফ্রান্সের উদ্ধার রাজা ও আভিজাত্যদের দ্বারা নয়, সাধারণ মানুষ নিয়ে এসেছিল।

জিনে ডিআরকের চিত্রটি বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিল।চর্চামানরা প্রথমে তাকে ঝুঁকির কবলে পরিণত করেছিল এবং পরে সাধু হিসাবে ঘোষণা করেছিল ভোল্টায়ার, চর্চাকারীদের অশ্লীলতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে অন্য চরম এবং চিত্রিত কেইনকে জোর দিয়েছিল বেহাল বর্ণে।

শিলার জিনকে পুনর্বাসিত করতে, তার কীর্তির সমস্ত মহত্ত্ব, তার দেশপ্রেম দেখানোর জন্য যাত্রা করেছিলেন।

"উইলিয়াম টেল" (উইলহেলম টেল, ১৮০৪) - শেষ সমাপ্ত নাটক, শিলারের ক্যারিয়ার শেষ করার যোগ্য। এতে লেখক তার বহু বছরের প্রতিচ্ছবি সংক্ষিপ্তসার করেছেন মানুষের ভাগ্য, স্বদেশের প্রতিফলন। রচনাটি নাট্যকারের কাছে এক ধরণের কাব্যিক টেস্টামেন্ট ছিল।

“উইলিয়াম টেল” প্রথম থেকেই লোকনাট্য হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। ১৮৩৩ সালের ১৮ ই আগস্টের একটি চিঠিতে কবি তার পরিকল্পনার স্বরূপ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন: "উইলিয়াম টেল" এখন আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ... বিষয়টি সাধারণত থিয়েটারের কাছে খুব আকর্ষণীয় এবং খুব জনপ্রিয়। নাটকের বিষয়বস্তু জনপ্রিয় ছিল, টেল-এর সুদৃঢ় তীরের কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে, যা কিছু ইউরোপীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তিগুলি প্রায়শই সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সে পাওয়া যেত।

জীবনের শেষ মাসগুলিতে শিলার রাশিয়ান ইতিহাস "দেমেট্রিয়াস" (ডেমেট্রিয়াস,১৮০৫) থেকে একটি ট্র্যাজেডি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি প্রথম দুটি আইন লিখতে এবং প্লটের আরও বিকাশের জন্য একটি সাধারণ পরিকল্পনার রূপরেখা পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ট্র্যাজেডিটি মিথ্যা দিমিত্রির সংক্ষিপ্ত উত্থান ও পতনের ইতিহাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। তাঁর ট্র্যাজেডিটি হ'ল তিনি একটি অনৈচ্ছিক প্রতারক হিসাবে কাজ করেন, যিনি প্রথমে আন্তরিকভাবে তাঁর রাজ উৎসকে বিশ্বাস করেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে তিনি ভুল করে অন্যকে প্রতারিত করেছিলেন, আক্রমণকারী হিসাবে রাশিয়ায় আগত বিদেশীদের হাতে একটি উপকরণ হয়েছিলেন।

৫.৩.১১.৪ উপসংহার

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার একজন অসামান্য জার্মান কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, জার্মানির আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম নির্মাতা শিল্পকর্ম নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রচনার লেখক। তিনি ট্র্যাজেডি দ্য আউটলাউস (১৭৮১-৮২), ওয়ালেনস্টেইন (১৮০০), কুনিং অ্যান্ড লাভ (১৭৮৪), ডন কার্লোস, উইলহেলম টেল (১৮০৪) এবং রোমান্টিক ট্র্যাজেডির মতো বিখ্যাত রচনাগুলি রচনা করেছিলেন। অরলিন্স মেডেন "(১৮০১)।

শিলারের জীবন সেনাবাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ফ্রিডরিচ ক্রিস্টোফের পিতা ছিলেন জোহান ক্যাস্পার শিলার, তিনি ছিলেন একজন প্যারামেডিক, তিনি ওয়ার্কটেমবার্গের ডিউকের অফিসে কর্মরত ছিলেন; লুডভিগসবার্গের একটি লাতিন স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, শিলার একটি সামরিক স্কুলে ভর্তি হন (যেখানে লেখক চিকিৎসা এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন), যা পরে একাডেমির মর্যাদা লাভ করে; ১৭৮০-এর শেষের দিকে, শিলারকে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পদে স্টটগার্টে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

শিলারকে লিখতে নিষেধ করেছিলেন। একটি রেজিমেন্ট থেকে ম্যানহাইমে রওনা হয়ে তাঁর প্রথম ট্র্যাজেডি "ডাকাতদের" উপস্থাপনের জন্য শিলারকে মেডিকেল বিষয়ে রচনা ছাড়া অন্য কিছু লেখার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে অনুরূপ আক্রমণ শিলারকে সেই জার্মানির অন্যান্য দেশগুলিতে ডিউকের সম্পত্তি পছন্দ করতে বাধ্য করেছিল।

শিলার বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহগুলির জন্য নাটক রচনা করেছিলেন। ১৭৮৩ সালের গ্রীষ্মে, ম্যানহাইম থিয়েটারের কোয়ার্টার মাস্টার শিলারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, যার মতে নাট্যকারকে ম্যানহিম মঞ্চে মঞ্চায়নের জন্য বিশেষভাবে নাটক রচনা করতে হবে। এই নাট্য চুক্তির সমাপ্তির আগে মঞ্চস্থ হয়েছিল নাটক "কুনিং অ্যান্ড লাভ" এবং "জেনোয়াতে ফিয়েসকো ষড়যন্ত্র"। তাদের পরে, শিলারের সাথে চুক্তি, "কৌতুক এবং প্রেম" এর দুর্দান্ত সাফল্য সত্ত্বেও, পুনর্নবীকরণ হয়নি।

শিলার ইতিহাসের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৭৮৭ সালে শিলার ওয়েমারে চলে আসেন এবং ১৭৮৮ সালে তিনি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সম্পাদনা করেন, যা সমাজের বিভিন্ন ঐতিহাসিক অশান্তির জন্য উৎসর্গীকৃত কয়েকটি বই ছিল। তাঁর কাজের অংশ হিসাবে শিলার স্পেনীয় শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী

নেদারল্যান্ডসের স্ব-সংকল্পের বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে, লেখক তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও, তাঁর সমস্ত বিচিত্র নাটক ঐতিহাসিক থিমগুলি সহ পুনরায় পূরণ করে। শিলার জোয়ান অফ আর্ক এবং মেরি স্টুয়ার্ট উভয়ের সম্পর্কে লিখেছেন; তিনি কিংবদন্তি সুইস নায়ক উইলিয়াম টেল এবং আরও অনেককে উপেক্ষা করেন না।

শিলার গোথের সাথে পরিচিত ছিল। জার্মান সাহিত্যের দুটি ক্লাসিকের মিলন ১৭৮৮ সালে হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সালে গ্যোথ শিলারের সহায়তায় তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হন। পরবর্তীকালে, লেখকরা একে অপরকে সাহিত্য ও নান্দনিক প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং জেনিয়া উপাখ্যানগুলির সিরিজটিতে সহ-রচনা করেছিলেন। গোথের সাথে বন্ধুত্ব শিলারকে দ্য গ্লোভ, পলিক্রাটোভ রিং, আইভিকোভে ক্রেনসের মতো বিখ্যাত লিরিক রচনা তৈরি করতে উৎসাহিত করেছিল।

শিলার উৎসাহের সাথে মহান ফরাসি বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের বিষয়ে লেখকের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও শিলার ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন: লুই দ্বাদশকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা এবং জ্যাকবিন স্বৈরশাসনের মাথা উঁচু করে তোলা পছন্দ করেন না তিনি।

শিলারকে মুকুট রাজকুমার অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও শিলারের আয় অত্যন্ত সামান্য, এমনকি প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য পর্যাপ্ত অর্থও ছিল না। ক্রাউন প্রিন্স ভন শ্লেসভিগ-হলস্টাইন-সন্ডারবার্গ-অগাস্টেনবুর্গ কবিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিন বছর ধরে (১৭৯১থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত) তাঁকে বৃত্তি প্রদান করেছিলেন। ১৭৯৯ সাল থেকে এটি দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

জীবনের জন্য, শিলার অনেকবার প্রেমে পড়েছিলেন। তার যৌবনে, কবিটির আদর্শ ছিলেন লরা পেটারারচ এবং ফ্রান্সিস ফন হোহেনগেই, উইথেমবার্গ ডিউকের মেট্রেস, পরে কার্লের স্ত্রী এবং নতুন দুচেসে। সতেরো বছর বয়সী শিলার মনোমুগ্ধকর এবং মহৎ ফ্রান্সিসকে নিয়ে আনন্দিত হয়েছিল, এতে তিনি সমস্ত গুণাবলীর ঘনত্ব দেখেছিলেন এবং তিনিই তাঁর লেডি মিলফোর্ড নামে তাঁর বিখ্যাত নাটক "কুনিং অ্যান্ড লাভ" প্রকাশ করেছিলেন। পরে, শিলার আরও প্রকৃত মহিলাদের প্রতি অনুভূতি বয়ে যেতে শুরু করেছিলেন, যাদের সাথে তিনি বিবাহের মাধ্যমে নিজেকে ভালভাবে বেঁধে রাখতে পারেন, তবে বেশ কয়েকটি কারণে তিনি তা করেননি। হেনরিটা ভলজোজেনের এস্টেটে, যেখানে কবি ডিউকের অত্যাচার থেকে লুকিয়ে ছিলেন, তিনি যে মহিলার আশ্রয় করেছিলেন তার মেয়েটির সাথে তার প্রেমে পড়েছিল - শার্লোট, কিন্তু মেয়ে বা তার মা দুজনেই শিলারের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়নি: মেয়েটি অন্য একজনকে ভালবাসত, এবং তার মা সমাজে কাব্যিক অবস্থান পছন্দ করতেন না। । শিলারের জীবন ও সাহিত্যের ক্রিয়াকলাপের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল অন্য শার্লোট - তার স্বামী কাল্বের পরে মার্শাল্ক ভন ওস্টিম নামে এক বিবাহিত মহিলা তবে শার্লোটের ভালবাসা শিলারকে অন্য নারীদের সাথে জড়িত হতে বাধা দেয়নি যেমন তার নাটকগুলিতে রচিত নাটকগুলিতে অভিনয় করা অভিনেত্রীরা, বা সাহিত্যের এবং শিল্পকে ভালবাসেন এমন সুন্দরী মেয়েরা। শেষের একজন - মার্গারিটা শোয়ান, শিলার প্রায় বিয়ে করেছিলেন। কবিকে এই বিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি শার্লোটকেও বিয়ে করতে চান, এবং মার্গারিটার বাবা তার বিয়েতে সম্মতি দেননি। শার্লোটের সাথে সম্পর্কগুলি খুব প্রাসঙ্গিকভাবে শেষ হয়েছিল - কবি এমন কোনও মহিলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন যে তার স্বামীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দেওয়ার সাহস করেনি। শিলারের স্ত্রী ছিলেন শার্লোট ভন

ল্যাংফেল্ড, যাকে কবি ম্যানহাইমে ১৭৮৮ সালে সাক্ষাত করেছিলেন, কিন্তু তিন বছর পরেই সত্যই তাঁর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। মজার বিষয় হল, শার্লটের ভালবাসা কিছু সময়ের জন্য শিলারের আত্মার সাথে তার বড় বোন ক্যারোলিনার প্রেমের সাথে সীমানা ফেলেছিল, যিনি, তার বোন এবং প্রিয় ফ্রেডেরিকের সুখের জন্য একজন প্রেমহীন ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের পথ ছেড়ে চলে গেছেন। শিলারের বিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৭৯০সালে হয়েছিল।

শিলারের পরিপক্ক কাজের মধ্যে শিক্ষাগত আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্ঘাটিত হ'ল ১৭৯৫ সালের "আদর্শ ও জীবন" কবিতা, পাশাপাশি জার্মান নাট্যকারের দেরী ট্র্যাজেডিস, যেখানে একটি মুক্ত বিশ্বব্যবস্থার সমস্যাটি জনজীবনের কঠোরতার ক্ষেত্রে ভয়াবহতার পটভূমির বিপরীতে দাঁড়িয়েছে।

শিলার ছিলেন আভিজাত্য। আভিজাত্যটি শিলারকে ১৮০২ সালে জার্মান রাষ্ট্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস দ্বিতীয়ের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ দেওয়া হয়েছিল।

শিলারের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। প্রায় তাঁর পুরো জীবন জুড়ে, কবি প্রায়শই অসুস্থ ছিলেন। জীবনের শেষদিকে শিলার যক্ষা রোগের বিকাশ করেছিলেন। এই লেখক ওয়েইমারে ৯ মে ১৮০৫ সালে মারা যান।

রাশিয়ায় শিলারের কাজের প্রশংসা হয়েছিল। রাশিয়ান সাহিত্যে শিলারের শাস্ত্রীয় অনুবাদগুলি ঝুকভস্কির অনুবাদ। এছাড়াও শিলারের রচনাগুলি ডারজাভিন, পুশকিন, লের্মোনটোভ, তিউতুচেভ এবং ফেট অনুবাদ করেছিলেন। জার্মান নাট্যকার তুরগেনেভ, লিও টলস্টয়, দস্তয়েভস্কির সৃজনশীলতা প্রশংসিত হয়েছিল।

৫.৩.১১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শিলার কে?

২। শিলারের পুরো নাম কী?

৩। শিলারের রচনাসমূহের উল্লেখ করে সাহিত্যে তাঁর অবদান বর্ণনা করো।

৪। নন্দনতাত্ত্বিক শিলারের দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করো।

৫.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সৌন্দর্যতত্ত্ব –সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২। রসসমীক্ষা – রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৩। নন্দনতত্ত্বের সূত্র – অরুণ ভট্টাচার্য

৪। Illusion and Reality – Christopher Caudwell

৫। Asthetics - Benedetto Croce

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক : ১২ : হোরেস

বিন্যাসক্রম :

৫.৩.১২.১ ভূমিকা

৫.৩.১২.২ কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেস

৫.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৩.১২.১ : ভূমিকা

রোমান কবি ছিলেন হোরেস। পুরো নাম কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস। তিনি গ্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতে তিনি হোরেস হিসেবেই পরিচিত। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের পরেই হোরেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মূলত নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে। অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন 'পোয়েটিকস' (Poetics)। আর হোরেস 'আর্স পোয়েটিকা' (Ars Poetica)। অ্যারিস্টটল কাব্যতাত্ত্বিক হলেও কখনও কবিতা লেখেননি। কিন্তু হোরেস কবিতা লিখেছেন, আবার কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন ধারণাও দিয়েছেন। তাই বলা যায় তাঁর 'কাব্যনির্মাণতত্ত্ব' নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র।

তাঁর জন্ম ইতালিতে। খ্রি: পূ: ৫৬ অব্দে। পারিবারিক অবস্থা একদমই ভালো ছিল না তাঁদের। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন মুক্ত ক্রীতদাস। তবুও পুত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্যে এথেন্সে পাঠিয়েছিলেন। লাতিন ও গ্রিক ভাষায় পারদর্শী এই কবি বহু কবিতা লিখেছেন। বলা যায় তিনি ছিলেন লাতিন ভাষার সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর যেসব গ্রন্থ পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'এপোডেস' ('Epodes'), 'স্যাটায়ার্স ('Satires, 1st & 2nd part), 'ওডস' ('Odes', 1st, 2nd, 3rd & 4th Part), 'এপিস্টলস ('Epistiles, 1st & 2nd Part), ' হাজার বছরের গান' ('Carmen Saeculare') । উল্লেখ্য 'এপিস্টলস'-এর শেষ অংশটি 'আর্স পোয়েটিকা' নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত।

তিনি ছিলেন ভার্জিলের বন্ধু। ভার্জিলের পর হোরেসই ছিলেন রোমের শ্রেষ্ঠ কবি। বলা যায় তিনিই রোমের প্রথম পেশাদার লেখক। তিনি মূলত তিরিশ বছর কাব্য সাধনা করেছেন। 'ওডস' কাব্যই ছিল তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলে। কিন্তু কাব্য সাধনার শেষ পর্বে তিনি যে 'আর্স পোয়েটিকা' লিখেছিলেন তাতেই তাঁর সৃজনী শক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছিল।

৫.৩.১২.২ : কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেস

হোরেসের লেখা 'আর্স পোয়েটিকা'কে অনেকে পত্রকাব্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ কাব্যটি পত্রের আকারে কাব্যিক ছন্দে লেখা। যদিও কাব্যটি ছোট, তবুও এখানেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের মূল সুর লিপিবদ্ধ। এই কাব্যের মোট চরণ

৪৬৭ (চারশো সাতষট্টি)। এর রচনাকাল খ্রি: পূ: ১২-০৮ অব্দ। 'আর্স পোয়েটিকা' এই নামটি কিন্তু হোরেস নিজে রাখেননি। রেখেছিলেন কয়েনতিলিয়াস। এই কাব্যের আসল নাম ছিল 'এপিসটুলা এড পিসোনেস' (Epistula ad Pisones) । প্রচলিত আছে পিসো ও তাঁর দুই পুত্রকে এক সময়ে নাকি হোরেস কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেটি ছিল ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। তাই গ্রন্থটির নামকরণের সঙ্গে পিসোনেস শব্দটি যুক্ত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেছেন। অনেকে আবার এই কাব্যটিকে 'লিবার ডি আর্টে পোয়েটিকা' (Liber de arte Poetica) নামেও জানে। একাধিক নামে গ্রন্থটি পরিচিত হলেও সারা বিশ্বে এটি কিন্তু 'আর্স পোয়েটিকা' নামেই বিখ্যাত। এই গ্রন্থের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব রচনা পদ্ধতির অনেকটাই মিল আছে। অ্যারিস্টটলের মতো হোরেসও শিক্ষার্থীদের পড়ানো বা উপদেশ দেওয়ার নিরিখেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতিও ছিল গ্রিক ভাবনাপ্রসূত। তিনি মনে করেছিলেন শুধু প্রতিভা থাকলেই হবে না, সাহিত্য ভাবনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিভার সঙ্গে শৈল্পিক সাধনার যোগ দরকার। আর শ্রেষ্ঠ রচনার ক্ষেত্রে তিনি একাধিকবার কোনও বিষয়কে লেখার কথা বলেছেন। এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার আগে তা যেন অবশ্যই সমালোচকের দৃষ্টিগোচর করানো হয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হোরেস শুধু কবিদের উদ্দেশ্যেই সাবধান বাণী করেননি, তিনি সমালোচকদের প্রসঙ্গও এনেছেন। তাঁদের কার্যকলাপ, পাঠপদ্ধতি সব কিছুই উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর মন্তব্যটি একবার যাচাই করা সঠিক কাজ হবে —

> "If, after two or three vain trials, you said you could not do better, he would bid you blot it out and return the ill shapped verses to the anvil. If you preferred defending your mistake to amending it, he would waste not a word more, would spend no fruitless toil, to prevent your loving yourself and your work alone without a rival."

তাঁর 'আর্স পোয়েটিকা' পড়লে কাব্য নির্মাণ বিষয়ক অনেক তথ্য চোখে পড়ে। কিন্তু পাশাপাশি চোখে পড়ে এই পত্রকাব্যের প্রাপকদের প্রসঙ্গও। হোরেসের 'আর্স পোয়েটিকা'র অনুবাদক হিসেবে বিখ্যাত ফেয়ারক্লক। তিনি লিখেছেন —

> "There are a father and two sons of the Piso family, but nobody knows with certainty what particular Pisos-and there are many on recor-they are."

যাই হোক পত্র প্রাপকদের পরিচয় জানানো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর কাব্যতত্ত্ব নির্মাণ সম্পর্কে কিছু জানা। ফেয়ারক্লফের বিশ্লেষণ অনুযায়ী হোরেসের ভাবনাকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্ব (দেড়শো চরণ) : এই পর্বের আলোচনা কাব্য বিষয় ও তার উপস্থাপনা বিষয়ক ঐক্যসাধন।

২. দ্বিতীয় পর্ব (পরের দেড়শো চরণ) : নাটকের চরিত্র নির্মাণ ও তার যথাযথ উপস্থাপনা।

৩. তৃতীয় পর্ব (পরের পৌনে দুশো চরণ) : কাব্য প্রতিভা ও জীবন জগৎ সম্পর্কে কবির পারঙ্গমতা বোধ।

৪. হোরেস তাঁর কাব্যতত্ত্বে মানব জীবনের রূপ-বৈচিত্রকেই অনুকরণ বা সৃজনের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঐতিহ্য প্রসঙ্গ। আর বারবারই কাব্য বিষয় উপস্থাপন প্রসঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে গতানুগতিকতার বাইরে লেখা ভাবানুবাদ ও মূল বিষয়ক অনুকরণ তথা সৃজনের প্রসঙ্গ।

'আর্স পোয়েটিকা'য় হোরেসের আলোচনা অভিনবত্বের দাবি রাখে। তিনি এখানে মূলত কবিতা সৃজন, ভালো

লেখার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রসঙ্গই বলেছেন। সাধারণভাবে 'আর্স পোয়েটিকা' গ্রন্থটিকে ধরে ধরে বিশ্লেষণ করলে সাতটি গুরুত্বের কথা মনে পড়ে। সেগুলি এইরকম :

এক. কাব্যের ঐক্য

দুই. কাব্যের বিষয়

তিন. কাব্য রচনারীতি ও শব্দসৃজন

চার. কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঁচ. কবির প্রতিভা ও তার চর্চা

ছয়. কাব্য নৈপুণ্য

সাত. কাব্য সমালোচনা

আট. অন্যান্য

প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো হোরেসের ভাবনাতেও এসেছে আদি, মধ্য, অন্ত্য যুক্ত কাহিনি ও তার ঐক্য প্রসঙ্গ। কাব্য-ঐক্য সাধন করাই কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং এটি তাঁকে করতে হবে খুবই দক্ষতার সঙ্গে। কোনও আনকোরা নতুন কাহিনি কাব্যে বিষয় হিসেবে আনলে তা যেন হয় আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সামঞ্জস্যতাই কাব্য ঐক্যের মূল সুর। বারবারই তিনি 'Unity of Plot'-এর কথা বলেছেন। তার অর্থ মূল কাহিনি বা ঘটনার কোনও কিছুই বাদ দেওয়ার বিপক্ষে তিনি। সৃজনী শক্তির মাধ্যমেই কবি সত্য ও কল্পনার মধ্যে ঐক্যসাধন করবেন দক্ষতার সঙ্গে।

অ্যারিস্টটলের কাব্য বিষয় ছিল মানবজীবনের রূপবৈচিত্র। অর্থাৎ মানুষ যেমন ঠিক তেমনভাবে না এঁকে উন্নত বা অনুন্নতরূপে আঁকারই পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। হোরেসের ভাবনা এই বিষয়ে ছিল আরও উন্নত। তিনি কাব্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের গভীর সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন। যে কাব্য জীবনভাবনার গভীরতর দিক স্পর্শ করে না তাকে তিনি একদমই গুরুত্ব দেননি। ফলে তাঁর ভাবনায় বিষয় হিসেবে এসেছে সমাজের দায়দায়িত্বের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ চরিত্র অঙ্কনে তিনি স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন সেইসব চরিত্র যাঁরা দেশ, মানুষ, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির প্রতি কতটা দায়িত্বশীল। অথবা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কতটা কর্তব্যপরায়ণ, সে সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। বলা যায়, চোখে দেখা বাস্তব জীবনটাকেই তিনি কাব্যের বিষয় হিসেবে সিদ্ধান্ত করেছেন। কবিদের বাহ্য-আড়ম্বর ও দেখনদারিকে তিনি সবসময় অপছন্দ করতেন। পরিবর্তে কবিদের আত্মমূল্যায়ন ও সাধারণ জ্ঞানের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যা বুঝবেন সেই অনুযায়ী কাব্যের বিষয় বা আঙ্গিককে নির্বাচন করতে বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ —

> "Take a subject, ye writers, equal to your strength; and ponder long what your shoulders refuse, and what they are able to bear, whoever shall choose a theme within his range, neither speech will fail him, nor clearness of order."

কাব্যের মূল কথা হল 'প্রকাশ' (Expression)। আধুনিক যুগে ইতালির আর এক দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে প্রকাশবাদের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকাশবাদের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে হোরেস। আর প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ভাষারীতি ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ । তিনি কাব্যের রচনারীতি প্রসঙ্গে ভাষা ও শব্দের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। যথার্থ কাব্যনির্মাণ তখনই সম্ভব হয় যখন শব্দ ব্যবহার, ছন্দ সৃজন ইত্যাদির যথার্থ প্রকাশ ঘটে। তাঁর মনে হচ্ছে কাব্য আসলে একটি গাছ। আর কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী

সেই গাছের পাতাসমূহ। গাছ ঠিকই থাকে কিন্তু পাতা বছরে বছরে নতুন হয়। যে কবি শব্দ ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখাতে পারবেন তাঁর কাব্যও দিনে দিনে নবরূপ পাবে। অর্থাৎ কাব্যের রচনারীতিতে শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানার কথা তিনি বারবার বলেছেন। সুতরাং তাঁর আলোচনায় বারবারই ফিরে এসেছে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্রের কথা। যেমন তিনি বলেছেন, 'তুমি যদি আমাকে কাঁদাতে চাও তাহলে তোমাকেই আগে দুঃখে ভারাক্রান্ত হতে হবে।' অর্থাৎ দুঃখ, আনন্দ, রাগ বা যে কোনও ধরনের ভাষাকেই কবি প্রকাশ করেন। আর ভাষার কাজ কবির জীবন সত্যকে পাঠকের মনে প্রবেশ করানো। এর মূলেই রয়েছে শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা। শব্দের মাধ্যমেই কবিরা তাঁদের কবিতায় কাব্যসুষমা সৃষ্টি করেন এবং সেই শব্দ ব্যবহার হবে বিষয়কেন্দ্রিক। শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানার উপরেই নির্ভর করে কবির শৈলী আর শৈলীই নির্দেশ দেয় রচনার উৎকর্ষতাকে। আলোচনায় দেখা গেছে এই যে শব্দ প্রকরণের বিষয়টি, কবিতায় এর যৌক্তিকতা বা ব্যবহারের গুরুত্ব প্রথম বুঝেছিলেন হোরেস। পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। আসলে এটি সম্ভব হয়েছিল হোরেস নিজেই কবি ছিলেন এই জন্যে। তিনি কবির মন নিয়ে কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল করেছিলেন পাঠকের দৃষ্টিতে। তাই বলা যায় কাব্যে রচনারীতি ও শব্দ সৃজনের বিষয়টি হোরেসের একদমই নিজস্ব।

কাব্যের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কেও হোরেস মন্তব্য করেছেন 'আর্স পোয়েটিকা' গ্রন্থে। তাঁর মতে কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল যথার্থ কাব্য সৃজন। এখানে তিনি কবিতার বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল স্বাভাবিকতা, স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মিতা ইত্যাদি। কাব্যে অস্বাভাবিক কিছু সৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন তিনি। যা যথাযথ, যা স্বাভাবিক তার কথাই তিনি বারবার বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য —

> "Be brief, so that what is quickly said the mind may rapidly grasp and faithfully hold : every word in excess flows away from the full mind. Fictions meant to please should be close to the real, so that your play must no ask for belief in anything it choses."

এই স্বাভাবিকতা বা যথাযথতার মধ্যে পড়ে বাক্‌বিস্তারের সংক্ষিপ্ততা ও সম্পূর্ণ কাব্য বিষয়ের বাস্তবতা। তবে এটা ঠিক কোনও বিষয়কে অহেতুক সংক্ষিপ্ত করে তাকে যেন অস্পষ্ট করা না হয়, এ কথাও তিনি বারবার বলেছেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টতাও তাঁর মতে একটি বড় কাব্য বৈশিষ্ট্য। তাতে কাব্য হয় দীপ্তিমান, ঔজ্জ্বল্যময়। কাব্য ভাবনাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি যেমন অতি সংক্ষিপ্ততার বিরোধী ছিলেন, তেমনই বিরোধী স্ফীতকায়তারও। আলাদা করে তাঁর আলোচনায় চলে আসে বাস্তবতার প্রসঙ্গ। তিনি বারবারই কাব্যে বাস্তব জীবন ভাবনার কথা বলেছেন। এর সঙ্গে কবির মাত্রাজ্ঞান ও ঔচিত্যবোধের যোগ লক্ষণীয়। যেসব কবির এই গুণ নেই তাঁরা কখনও বড় শিল্পী হতে পারেন না। সুতরাং কবিকে সার্থক কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঠিক পথে এগোতে হবে। প্রথম থেকেই তাঁদেরকে আধিদৈবিকতা মুক্ত হতে হবে। অনেক সময় হোরেস কথিত বাস্তবতার সঙ্গে আধুনিক রিয়ালিজমকে গুলিয়ে ফেলেন অনেকেই। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো হোরেসের বাস্তবতা আসলে কাব্যে উপস্থাপিত কোনও বিষয়কে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বাস্তবতা। অর্থাৎ বিষয়টি যদি ঠিকঠাক ভাবে পাঠকের মনে দাগ না কাটে তবে কাব্যে বিশ্বাসযোগ্যতা আসে না। অর্থাৎ বলা যায় হোরেস কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূলত সর্বগুণান্বিত সার্থক শিল্প সৃজনের কথাই বলেছেন।

এবারে কবির প্রতিভা ও তাঁর চর্চা সম্পর্কিত আলোচনা। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে হোরেস প্রতিভা ও তার চর্চার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিকে শুধু প্রতিভাবান হলেই হবে না, তাঁকে যথাযথভাবে কাব্যের চর্চাও করে যেতে হবে।

অর্থাৎ প্রতিভা ও চর্চার মিলনেই সৃষ্টি হয় উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন যেমন জরুরি তেমনই জরুরি সেই বিষয়ের ওপর নিরন্তর অনুশীলন। প্রতিভা যেমন কোনও বিষয়কে কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ করতে পারে, তেমনই কিন্তু প্রতিভাহীনতা গুরুত্বপূর্ণ ভাব বা বিষয়কে কাব্যহীন করতে পারে। সুতরাং প্রতিভার সঙ্গে চর্চার একটা গভীর যোগ তিনি লক্ষ করেছেন। চর্চা আছে, প্রতিভা নেই আবার প্রতিভা আছে, চর্চা নেই এই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। একে অন্যের পরিপূরক এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বলা যায় শুধু প্রতিভা বা শুধু চর্চা নয়, উভয়ের যথার্থ মিলনেই গড়ে ওঠে যথার্থ শিল্প। তাহলে বলা যায় প্রতিভাবান মাত্রই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পাবেন এইরকম ধারণা ঠিক নয়। হোরেস বলেছেন যে, প্রতিভাবানদের কাব্য মূলত যুগোত্তীর্ণ হতে পারে যদি সেটা মানুষের মনোরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তা জীবনকে আনন্দ দেয়। পাশাপাশি জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে হোরেসের মন্তব্য আরও এবকার মনে করা যেতে পারে —

> "Poets aim either to benefit, or to amuse or to utter words at once both pleasing and helpful to life."

কাব্য নৈপুণ্যের প্রসঙ্গে হোরেস বলতে চেয়েছেন কবির কাব্যপ্রতিভার কথা। ক্রীড়াবিদ বা সঙ্গীতজ্ঞরা যেমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে মাঠে বা আসরে নামেন, ঠিক সেইভাবেই সবদিক থেকে উপযুক্ত হয়ে কবিদের কবিতা রচনা করতে নামা উচিত। কবিতা লেখার পর একাধিকবার সংশোধন করা উচিত। তিনি 'কাব্যনির্মাণভাবনায়' নবীন কবিদের সম্পর্কে কিছু সতর্ক বাণী রেখেছেন। সেটার বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় এইরকম —

> ''তোমরা কখনও যদি কিছু লেখ, তাহলে তা সমালোচক মাইসিয়াসকে, তোমার বাবাকে এবং আমাকে শোনাবে। তারপর কাগজগুলোকে নয় বছরের জন্য দূরে সরিয়ে রাখ। যা প্রকাশ করনি তা নষ্ট করতে পারবে যে কোনো সময়, কিন্তু একবার প্রকাশিত হলে তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।''

কবির কাব্য নৈপুণ্য নির্ভর করে কবি প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা, বিষয় নির্বাচন, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদির উপর। কবিকে সবসময়েই ধীরস্থির হয়ে কাব্যচর্চার কথা বলেছেন হোরেস। একটা কবিতা যতক্ষণ না যথার্থ রূপ পাবে ততক্ষণ তা প্রকাশের বিরুদ্ধেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মননকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মননের গভীরতাই উন্নত রচনার মূল অবলম্বন। যথার্থ মনন ছাড়া কখনওই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা হতে পারে না। আর এই মনন ফুটিয়ে তুলতে কবির প্রয়োজন নিজস্ব স্টাইল। যে কাব্য যতটা শিল্পগুণ নির্ভর সেই কাব্য ততটাই অভিজাত, ততটাই সূক্ষ্ম, ততটাই বিখ্যাত।

এবারে কাব্য সমালোচনার প্রসঙ্গ। তাঁর মনে হয়েছে যথার্থ সমালোচকেরও একটা দায় আছে। যিনি প্রকৃত সমালোচক তিনি সবসময়েই নিরপেক্ষ থাকবেন। তাঁর কাজ কবিকে আক্রমণ করা নয়। তাঁর কাজ কবিকে অহেতুক স্তাবকতা করাও নয়। তাঁর একমাত্র কাজ কবির ভুল যথার্থ ভাবে ধরিয়ে দেওয়া। কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক সে সম্পর্কে কবিকে সচেতন করা। অর্থাৎ কবির সত্যনিষ্ঠায় সহমত পোষণ করা। কাব্য অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি বারবারই যথার্থ নিরপেক্ষ সমালোচকের কথা বলেছেন। সমালোচকের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যকে যদি বাংলায় লেখা হয় তবে তা এইরকম হবে —

> ''আমি শান পাথরের ভূমিকা পালন করবো, যা নিজে কাটতে পারে না, কিন্তু অস্ত্রকে ধারালো করতে পারে ঠিকই। যদিও আমি নিজে কিছু লিখি না, তবুও আমি কবিকে তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেবো। আমি তাকে বলবো, তার উপকরণ কোথায় পাওয়া যাবে, কি-ইবা তাঁর কবিত্ব শক্তিকে সমৃদ্ধ ও

নিয়ন্ত্রণ করবে; তাঁর করণীয় কাজে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, কোন্‌টি পাবে সঠিক পথ, সে পথ তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে পারবে, আর বেঠিক পথইবা নেবে কোথায় ইত্যাদি।''

হোরেসের বলা এই কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আদর্শ সমালোচকের কাজ সংশোধন করা। ছবিকে সামনে থেকে লক্ষ করলে বিভিন্ন রং, রেখা, তুলির টান ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু দূর থেকে দেখা যায় ছবির সমগ্রতা। সমালোচকরাও প্রথমে কাব্যের অংশবিশেষ, পরে অবশ্য সমগ্রতার বিচার করবেন। অনেকে মনে করতে পারেন, এসব বোধ হয় 'হোরেসীয় সমালোচনা ধারা', কিন্তু বলা যায় হোরেস কোনও ধারার সৃষ্টি করেননি। এ সবই তাঁর দৃষ্টিতে কাব্য আদর্শ কাব্য সমালোচনার বৈশিষ্ট্য।

হোরেসের কাব্য ভাবনার অন্যান্য দিকগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পঞ্চাঙ্ক নাটকে পরিমাপ, মঞ্চে কোরাসের ভূমিকা, তিনাধিক চরিত্র না রাখার নির্দেশ ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। পাঠক বা দর্শকের কাছে পৃথিবীর যে কোনও কবি বা শিল্পীর প্রতিষ্ঠা মূলত সমীচীনতার জোরে। 'আর্স পোয়েটিকা'র মূল সুর শৈল্পিক সমীচীনতার সূত্রে বহুরূপের উন্মোচন। এই প্রসঙ্গ 'আর্স পোয়েটিকা'-র অনুবাদক ফেয়ারক্লফের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় —

> "Both painter and poet are used to impress upon readers the lesson that in poetry as in other arts the main principle to be followed is propriety. The idea of literary propriety, which runs through the whole epistle, is illustrated in many ways, and may be said to give 'Ars Poetica' an artistic unity."

একটা কথা ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হবেন, হোরেসের 'আর্স পোয়েটিকা' পত্রকাব্য শেষ হবার আকস্মিকতায়। এর শেষটা কোনও এক কবির অদ্ভুত আচরণে সম্পূর্ণ। আসলে যারা উপর উপর কবি কবি ভাব প্রকাশ করে কিন্তু কবিত্বের অভাব যাদের মধ্যে, তাদের প্রতিই কবি হোরেসের এই ধিক্কার, এই প্রত্যাখ্যান। আর এর মধ্যেই রয়েছে তাঁর কাব্যনির্মাণভাবনায় মূল সুর।

৫.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেসের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

২। হোরেসের লেখা 'Ars Poetica' গ্রন্থের সঙ্গে অ্যারিস্টটল রচিত 'Poerics' গ্রন্থের সম্পর্ক নিরুপণ করো।

৫.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। নন্দনতত্ত্ব - ড. সুধীর কুমার নন্দী

২। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা - নবেন্দু সেন সম্পাদিত

৩। সাহিত্য বিবেক - বিমল মুখোপাধ্যায়

৪। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা - তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৫। নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য - সুখেন বিশ্বাস

৬। ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব - প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

নন্দনতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

পঞ্চম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক : ১৩ : টলস্টয়

বিন্যাসক্রম :

৫.৪.১৩.১ ভূমিকা

৫.৪.১৩.২ শিল্প ভাবনায় টলস্টয়

৫.৩.১৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৩.১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১৩.১ : ভূমিকা

লিও টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যে জীবনশিল্পী হিসাবে পরিচিত। কারণ তাঁর কাছে জীবন মানেই শিল্প, শিল্প মানেই জীবন। অর্থাৎ তিনি নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্পের কাজে লাগিয়েছেন। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের সামাজিক ও মানসিক অবস্থান, তাঁকে নব শিল্পবোধে উন্নীত করেছিল। তাঁর জীবন সাধনায় যেমন শান্তির বাণী ছিল, সেইরকম ভাবে শিল্পভাবনায়ও সেই বাণী ঝংকৃত। আসলে টলস্টয়ের শিল্পভাবনার মূলেই আছে বিচিত্র জীবনবোধ, জীবনপিপাসা ইত্যাদি। জার্মান দার্শনিক গ্যেটে একসময় বলেছিলেন, সত্যের শাশ্বত সন্ধানই মানুষকে করে তোলে মহান, সুন্দর। গ্যেটের মতো টলস্টয়ও সত্যকে দেখেছিলেন মুক্ত ভাবে। তাই তাঁর শিল্পচিন্তায় মোহমুক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁর জন্ম ১৮২৮ সালে। রাশিয়ার ইয়াসানায়া অঞ্চলে। তিনি অভিজাত কাউন্ট পরিবারের সদস্য ছিলেন। সত্যই ছিল তাঁর জীবনে জিজ্ঞাসার প্রধান শর্ত। তাঁর জীবন মূলত দুটি পর্বে বিভাজিত। প্রথম পর্বে সত্যের সন্ধানে তিনি নানা স্থানে ঘুরেছেন। কখনও জুয়োর আড্ডায়, কখনও পতিতালয়ে, কখনও ধর্মস্থানে, কখনও কৃষিক্ষেত্রে, কখনও অভিজাত সমাজে, কখনও শ্মশানে বা যুদ্ধক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পর্বে এইসব ছেড়ে তিনি চলে গেলেন খ্যাতি-প্রতিপত্তির শীর্ষে। এখানে সত্য ধরা দিয়েছিল অন্যভাবে। অর্থাৎ সব ছেড়ে এক আদর্শ রাজ্যে উত্তরণ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Kingdom of God'। প্রথম জীবনে যে নগ্ন সত্যের সন্ধানে তিনি বেরিয়েছিলেন, দ্বিতীয় জীবনে মহত্তর সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। এই পর্বেই লিখেছেন শিল্প সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ ও কিছু প্রবন্ধ। যেমন —

১. 'On Art' (1895-97)

২. 'What is Art' (1898)

মূলত এই দুটি গ্রন্থেই তাঁর শিল্প সম্পর্কিত ভাবনা নবরূপ পেয়েছে। তবে এটা ঠিক তাঁর চিন্তা-ভাবনা যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ছিল, একথা বলা যায় না। তবে শিল্পের সত্য, মঙ্গল, সুন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব ধারণা তিনি লিখে গেছেন, তা এখনও অনেকটাই প্রাসঙ্গিক। কারণ সব ধারণাই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাজাত।

৫.৪.১৩.২ : শিল্পভাবনায় টলস্টয়

টলস্টয় মনে করেছেন শিল্প কোনও মতেই মানবজীবন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। সমাজের শ্রমিক-কৃষক-মজুর প্রতিনিয়ত যে শ্রমের মাধ্যমে শিল্প গড়ে তুলছে তারাই রয়েছে অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে। ফলে শিল্প হয়ে উঠছে ধনিক শ্রেণির বিলাসিতার অবলম্বন। কিন্তু যারা নিজেদের শ্রম, সময় ব্যয় করছে তারা কী পাচ্ছে? শিল্পচিন্তায় টলস্টয়ের এই সুর গভীরভাবে ব্যঞ্জিত। এদের জন্যে তিনি সহমর্মিতাও প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ শিল্প সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-চিন্তা, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই তিনি মনে করেছেন বর্তমানে অর্থাৎ সমানাধিকারের যুগে শুধুমাত্র দরিদ্র শ্রেণির অনিচ্ছুক মানুষকে শিল্পের কাজে লাগানো ঠিক নয়। —

> "It is impossible to constrain people to labour unwillingly for art, without first deciding the question whether it is true that art is so good and so important an affair as to redeem this evil."

তিনি শিল্পের নামে বিলাসীদের অকারণ আনন্দ-উল্লাস, হই-হট্টগোল একদমই পছন্দ করেননি।

শিল্পের অকৃত্রিমতা ও শিল্প সৃজন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণীয়। কারণ তিনি চিন্তা-বিজ্ঞান-ধর্ম-শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রগুলি মানুষের অগ্রগতি ও সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে একত্রিত করেই দেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল এইরকম —

> ''যেহেতু চিন্তার ফসলকে একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বলা যায়, যখন তা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের অনুবৃত্তি না করে নতুন ধারণা ও চিন্তা সঞ্চারিত করে, তেমনি শিল্প সৃষ্টি একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বিবেচনার যোগ্য — যখন তা মানুষের জীবনপ্রবাহে নতুন অনুভূতি (তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন) আনয়ন করে।''

টলস্টয় শিল্প বা শিল্পতত্ত্ব বোঝাতে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে শিল্প যেহেতু সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী তাই বিজ্ঞানকেও তিনি এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। ফলে যে সমস্ত বিষয় সমাজে ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে, যেমন — শিশুমৃত্যু, বেশ্যাবৃত্তি, উপদংশরোগ সেগুলিকে নির্মূল করাই বিজ্ঞানের কাজ বলে তিনি মনে করেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, সমাজে নতুন জীবনরীতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করাই কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ নয়, এটি বিজ্ঞানের ভুল পথ। তাঁর মনে হয়েছিল বিজ্ঞান উদ্দেশ্যহীনভাবে যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যথার্থ নয়। এর থেকে সহজেই বলা যায় সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর শিল্পভাবনা এবং বিজ্ঞানভাবনা একাকার হয়ে গিয়েছিল। টলস্টয় বিজ্ঞান ও শিল্পকে বস্তুগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর শিল্পভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পের সংজ্ঞায় তাই তিনি বলেছেন যে, যুগে যুগে নতুন নতুন উন্মেষশালী আবেগ মানবজীবনকে সঞ্জীবিত করে আসছে। বাক্‌শক্তির মতোই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসারিত। এখানে যেহেতু বাক্‌শক্তির প্রসঙ্গ আছে, তাই উদাহরণ চলে আসে ভাষার। কারণ মানুষ কথা বলে ভাষার সাহায্যেই। এটাকেও তিনি সামাজিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে —

> ''মানবিক চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চারক ভাষাই মানুষের মধ্যে এই মিলন সূত্র রচনা করে। শিল্পও সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। শেষোক্ত মানব সম্পর্ক বিধায়ক উপায়টির বৈশিষ্ট্য শাব্দিক যোগসূত্রের উপায় থেকে পৃথক। সে বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ এই ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজের চিন্তাসম্পদকে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, অপর পক্ষে শিল্পের মাধ্যমে সে নিজ অনুভূতিকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে।''

টলস্টয় মনে করেছেন সমাজের সব জায়গায় অবিশ্রান্তভাবে যুগযুগ ধরে শিল্পধারা প্রবাহিত। কিন্তু অনেকেই সেটি মানতে চায় না। কেউ এই ধারাকে সমর্থন করে, আবার কেউ দমিয়ে রাখে। সুতরাং শিল্প যে সবসময় মানুষের গোচরে আসে, একথা তিনি কখনওই স্বীকার করেননি। গোচরেই থাকুক বা অগোচরেই থাকুক শিল্প যুগ যুগ ধরে চির প্রবাহিত। যা দেখতে সুন্দর তাকে অনেকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন, আর যা অসুন্দর তাকে দেননি, এই বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন তিনি। অর্থাৎ শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, প্রগতিশীল ও সম্প্রসারিত। এটা ঠিক, শোষক সমর্থিত কোনও শিল্পকেই তিনি সমর্থন করেননি। শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে কোনও শিল্পেই অনুভূতি বিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অকরুণ, অনাবশ্যক অনুভূতির জায়গায় অধিকতর দয়ার্দ্র ও আবশ্যক অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রূপান্তরের কারণ হিসাবে তিনি মানুষের মঙ্গল ভাবনারই জয়জয়কার করেছেন।

শিল্পে থাকে এক ধরনের চেতনা। যে চেতনা প্রগতিশীল সেটাই শিল্পে সমাদর পায়। আর যে চেতনা নিষ্প্রাণ, শিল্পে তার কোনও প্রয়োজন নেই। টলস্টয়ের বিশ্বাস সব যুগেই যে শিল্পের একটি নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণীয় হবে, তার কোনও মানে নেই। যুগে যুগে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। আর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শিল্প নবরূপ পায়। এই প্রসঙ্গেই তাঁর এই উদ্ধৃতিটি একেবারেই প্রাসঙ্গিক —

> ''যে তত্ত্বটি দু'হাজার বৎসর পূর্বের একটি ক্ষুদ্র, অর্ধবর্বর, দাস নিয়োগকারী জনগোষ্ঠীর জীবনাদর্শ থেকে গৃহীত যে গোষ্ঠীর মানুষ নগ্ন মানবদেহের চমৎকার অনুকরণ এবং নয়ন সুখকর হর্মা নির্মাণ করতে পারত। অর্থাৎ উনিশ শত বৎসর কালব্যাপী খ্রীষ্টবাণী প্রচারের পরেও য়ুরোপী জাতিসমূহের কাছে এর চাইতে উচ্চতর কোনও আদর্শ নেই।''

টলস্টয়ের শিল্পভাবনা তাঁর দীর্ঘ জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফসল। 'What is Art' গ্রন্থে তো তিনি জীবন ও শিল্পকে এক করে দেখেছেন। মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক, সেটা ভালোলাগা-ভালোবাসা-আন্তরিকতা যাই হোক না কেন, তার ওপরেই শিল্প নির্ভরশীল। এ কথা তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন। তিনি শিল্পের বিভিন্ন অনুকরণ ও উপায়কে এক করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতা যত বাড়বে, ততটাই ভবিষ্যতের সামাজিক অস্তিত্ব বৃদ্ধি পাবে। শিল্পকে এরই সঙ্গে যুক্ত করে তিনি দেখিয়েছেন। তাই মনে হয়েছে মানুষের হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে ভাবানুভূতির সঞ্চার ঘটানোই শিল্পের কাজ। একে তিনি বলেছেন সঞ্চারবাদ। উল্লেখ্য শিল্প সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থেই একই কথা বলেছেন তিনি। প্রথমে 'On Art' গ্রন্থের কথা। এখানে বলেছেন —

> "A work of art is then finished when it has been brought to such clearness that it communicates itself to others and evokes in them the same feeling that the artist experienced while creating it."

এবারে 'What is Art' গ্রন্থের কথা —

> "Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of certain external signs, hands on to other's feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them."

টলস্টয় মনে করতেন শিল্প হবে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। তার কারণ যে শিল্প যত সহজ-সরল হবে, সেই শিল্পের অনুভূতি ততটাই অন্যের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে। শিল্প যেহেতু একটি মানবিক ক্রিয়া, তাই একটি মানুষের মন

থেকে সহজেই অন্য একটি মানুষের মনে পাঠানো সম্ভব। একজন শিল্পী শিল্পের মাধ্যমেই নিজ মনের অনুভূতিকে শিল্পরসিকের মনে সঞ্চারিত করেন। একে সঞ্চারবাদ নামে ব্যাখ্যা করা যায়। শিল্প সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে টলস্টয়ের এই দিকটাই উঠে আসে। এটি অবশ্যই মানবজীবনকেন্দ্রিক। তিনি মনে করেছিলেন শিল্প মানবপ্রীতির বন্ধনকে ক্রমশ সুদৃঢ় করে। শিল্প মানুষের হৃদয়ের প্রসার ঘটায়। কোনও শিল্প বা সাহিত্য যদি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারে, তবে কোনও মূল্য নেই। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শিল্পানুভূতির সংক্রমণটাকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই আসলে সঞ্চারবাদ। এটাই তাঁর শিল্পভাবনার মানদণ্ড। তবে সব মানবিক ক্রিয়াকেই তিনি কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ফেলেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন —

> "We do not mean all human activity transmitting feelings but only that part which we, for some reason, select from if and to which attach special importance."

শিল্পের সহজতা, সরলতাকে গ্রহণ করার জন্যেই তিনি মনে করেছিলেন, যে সব শিল্প দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট সেগুলিকে শিল্পভাণ্ডার থেকে তাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি তিনি শিল্পের মহানুভবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মহানুভবতা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কখনওই সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। অর্থাৎ যে শিল্প ব্যক্তিসুখ দেয়, কিন্তু সমগ্র মানবজীবনে তা উপকারে লাগে না, তাকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। শিল্প সম্পর্কে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সংগ্রামী মানবজীবনের রূপবৈচিত্রকে তুলে ধরা। কিন্তু তা যেন বৃহত্তর মানুষের কাজে লাগে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাঁর মতে কৃষক-শ্রমিক-মজুর ইত্যাদি। এই শিল্প যদি তারাই বুঝতে না পারে, তবে সেই শিল্পের কোনও মূল্য নেই। তাই এখান থেকে তাঁর 'Universal Art' (সর্বজনীন শিল্প) ধারণাটি স্পষ্ট হয়েছে।

সমকালীন শিল্প সম্পর্কে টলস্টয়ের বক্তব্যটা খুবই বিরক্তিকর। কারণ বহুমূল্যে বিক্রীত শিল্পে কখনওই স্রষ্টা বা পরিবেশক আনন্দ পান না। কারণ হিসাবে তাঁর বক্তব্য, ধনিক বা অভিজাত শ্রেণির মানুষরা ওইসব শিল্পবস্তু কেনে বলে এগুলি হয়ে ওঠে শুধুমাত্র উপভোগের সমাগ্রী। ধনীরা যেহেতু বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যোগহীন, তাই সেখান থেকে কোনও সর্বজনীন আবেগ সঞ্চারিত হয় না। শিল্পবস্তুটাই ক্রমশ তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তাদের কাছে যৌনচর্চা, উত্তেজনা, অহংকার এগুলিই বড়, শিল্প বা শিল্পী নয়। এটা সমকালীন শিল্পের একটি সংকট বলে মনে করেছিলেন টলস্টয়। অনেকে ধনিক শ্রেণির জীবনযাত্রাকে বৈচিত্রপূর্ণ মনে করলেও টলস্টয়ের মতে তারা মাত্র তিনটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সরল ানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন — আত্মগরিমা, যৌন আকাউক্ষা ও জীবনাবসাদের অনুভূতি। শিক্ষিত বা নন্দনতাত্ত্বিকরা শ্রমিক কৃষকের জীবনকে বৈচিত্রহীন বললেও টলস্টয় বলেছেন জীবন অভিজ্ঞতায় এরাই বৈচিত্রপূর্ণ। কারণ শ্রমজীবী মানুষই সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাদের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা সমাজ সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর বিচিত্র কাজ এরা করে থাকে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ধনিক শ্রেণির মানুষ সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রম ছড়ায় শিল্পবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে। শিল্প যে ক্রমশ বিকৃতি লাভ করেছে, তার কারণ হিসাবে টলস্টয় মনে করেছেন এটি সম্ভব হয়েছে ধনিক সম্প্রদায়ের উপভোগের আগ্রহের ফলে। কারণ এরা সেই পুরাতন ও পুনরাবৃত্তিমূলক ধারণাকে এখনও আঁকড়ে আছে। যান্ত্রিক প্রবৃত্তি এদের জীবনে মুখ্য বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুভূতি এদেরকে স্পর্শ করেনি।

শিল্প শুধু ধনিক সম্প্রদায়ের হাতেই বিকৃতি লাভ করেনি। যারা বড় বড় মাধ্যমের পেশাদারী সমালোচক তাদের দ্বারাও শিল্প বর্তমানে বিকৃত। কুসংস্কার, যৌন প্রবৃত্তিকে সমর্থন করায় শিল্প ক্রমশ বিষয়গত দিক থেকে সরে গিয়ে বিষয়বস্তুতে বিকৃত হয়েছে, উপস্থাপন ও প্রকরণগত দিক থেকেও।

শিল্প ভাবনার সমকাল নিয়ে যেমন টলস্টয় আলোচনা করেছিলেন, তেমনি ভাবীকালের শিল্পের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে প্রগতিশীল শিল্প মানেই সেটি সর্বজনীন। সেটি ভবিষ্যতের হতে পারে, আবার বর্তমানেরও। এই ধরনের শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে টলস্টয় বলেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আত্মদান, আত্ম-অনুশোচনা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক শিল্পীই তো স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিয়ত শিল্প সৃজন করে চলেছেন, তার বেলায় তিনি কী বললেন? এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট কোনও বক্তব্য রাখেননি। তবে গতানুগতিক ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত শিল্পকে তিনি মোটেই চাননি। যে শিল্পের মধ্যে কদর্যতা, বিকৃতি ইত্যাদি আছে, তাকে তিনি শিল্প হিসাবে মানেননি। তিনি মনে করেছেন যেভাবে সমকালে শিল্পভাবনা চলছে, এইভাবেই যদি শিল্পীরা অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের ভাবনা চিন্তা, জীবনযাত্রা প্রণালীকে অনুসরণ করে, তবে তা হবে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

তবে কবি মাত্রেই তো আশাবাদী। টলস্টয়ও এখানে আশা ছাড়েননি। তিনি মনে করেছেন আগামী দিনের শিল্প ও শিল্পীরা বৈচিত্রময় প্রাণবন্ত হবেন। কৃষক-শ্রমিকের দাবি ফুটে উঠবে তাঁদের শিল্প ভাবনায়। শিল্পীরা সকলেই শ্রম ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হবেন আর শিল্পী নির্দিষ্ট শিল্পসমাজকে সুসংহত করে প্রগতিশীলতার দিকে নিয়ে যাবে।

টলস্টয়ের শিল্পভাবনায় জীবনবোধ ও বাস্তববোধ ও বাস্তবতার আধিক্যই লক্ষণীয়। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। কিন্তু শেষ দিকে শিল্প বিচারের বেলায় প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনবোধ ও বাস্তবতাকে। এখানেই তাঁর প্রশ্ন সুন্দর আসলে কী? তার স্বরূপই বা কিরকম? উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে সৌন্দর্য আসলে এক ধরনের প্রহেলিকা, যা মানুষের মনের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। রুশ ভাষায় একটা শব্দ আছে 'Krasota'। এই শব্দের মাধ্যমেই সৌন্দর্যের ধারণা কিছুটা হলেও অনুভব করেছিলেন রুশবাসীরা। অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয় দেখে চোখে লাগে তৃপ্তির স্পর্শ সেটাই সুন্দর। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের চোখে বিভিন্ন জিনিস তৃপ্তির স্পর্শ দেয়, সেই সবকিছুই নিশ্চয় সর্বজনীন রূপে সুন্দর হতে পারে না। তাই টলস্টয় দার্শনিকদের দেওয়া সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন শিল্প বা সৌন্দর্যের কি কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা হতে পারে? পৃথিবীর প্রায় সকল দার্শনিকই এর উত্তরে না বলেছেন। টলস্টয় সৌন্দর্য সম্পর্কে দুটি ধারণার কথা বলেছেন। প্রথমত সৌন্দর্য স্বতন্ত্র, এর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ঊর্ধ্বে সৌন্দর্যের অবস্থান, নিশ্চিতরূপেই এটি আনন্দদায়ক। টলস্টয় কথিত প্রথম ধারণাটি নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু রহস্যে মোড়া। এর সঙ্গে বিষয়ের যোগ লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মতটির মধ্যে কোনও রহস্যময়তা নেই। বিষয়টি সকলেরই বোধগম্য। এর সঙ্গে ব্যক্তির যোগ লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পতত্ত্ববিদ যেমন — শেলিং, হেগেল প্রমুখ শিল্প, ধর্ম, দর্শনের প্রতিটি স্তরেই সৌন্দর্যের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে টলস্টয়ের মতো পূর্বোক্তদের ধারণাও যথার্থ নয়। কারণ এইসব ধারণার মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। টলস্টয়ের প্রশ্ন সবকিছুই মধ্যেই যেহেতু সৌন্দর্যের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন নন্দনতাত্ত্বিকরা, তাহলে আর সৌন্দর্যের বিশেষত্ব থাকল কোথায়? ফলস্বরূপ তিনি নিজেই সৌন্দর্যের একটা ধারণা প্রস্তুত করেছেন। সেটা এইরকম —

ক. In its objective aspect we call beauty something absolutely perfect.

খ. In its subjective aspect, we call beauty that which supplies us with a particular kind of plea sure.

টলস্টয় কথিত প্রথম ধারণা থেকে বলা যায়, এখানে সৌন্দর্য নির্ভরশীল বস্তুগত দিক থেকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের

মাধ্যমে যে বস্তুকে বাইরের দিক থেকে নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় সেটাই আসলে সুন্দর। আবার ভিতরের দিক থেকে তিনি বলতে চেয়েছেন যা আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে, আনন্দ দেয় সেটাই সুন্দর।

অ্যারিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ দার্শনিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল, কল্যাণ ইত্যাদির একাত্মতা লক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ মঙ্গল-কল্যাণ সৌন্দর্য সমার্থক। কিন্তু টলস্টয় দার্শনিকদের এই ধারণার বিরুদ্ধতা করেছেন। শিল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা প্রেরণা যে সুন্দরের আরাধনা এ কথাও মানেননি তিনি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন ধর্মীয় চেতনার কথা। যা সমাজের মঙ্গলভাবনাকে নির্দেশ করে। দক্ষ শিল্পীদের জীবনভাবনা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় —

> "A really artistic producion can not be made to order, for a true work of art is the revelation (by laws beyond our grasp) of a new conception of life arising in the artist's soul, which, when expressed, lights up the path along which the humanity progress."

সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের কামনা-বাসনাকে এক করে দেখেছেন টলস্টয়। তাঁর মনে হয়েছে কাম ভাবনা ও বিলাসিতা থেকেই সৃষ্টি হয় সৌন্দর্য। তবে যদি কামবোধ জয় করে সৌন্দর্যকে খোঁজা যায়, তবেই মঙ্গলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এবারে টলস্টয়ের সৌন্দর্য ভাবনাকে এই ভাবে বিচার করা যেতে পারে —

প্রথমত : সৌন্দর্যের কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের ভোগ প্রবণতা, কামনা-বাসনা, চটুল স্বার্থপরতা, স্বৈরাচারিতার যোগ লক্ষণীয়। তিনি চান এসব থেকে শিল্পকে মুক্ত করতে। যেহেতু তিনি সমাজ জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ খুঁজেছেন, শিল্প যেহেতু মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত শিল্প একটি মানবিক ক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত : সৌন্দর্যের উৎস হিসাবে টলস্টয়ের ধারণা এইরকম, অন্যের শ্রমকে নিজের করে যাঁরা ভোগবিলাসিতায় জীবন কাটায়, তাঁরাই তো আত্মিক সংকট থেকে বাঁচতে একসময় শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।

তৃতীয়ত : শিল্প বিষয়ে তিনি দুটি ধারণার প্রবক্তা। তা হল সর্বজনীন শিল্প ও সঞ্চারবাদ। প্রথমটিকে তিনি সেই শিল্পই বলেছেন, যার আবেদন পৃথিবীর সকল কৃষক-শ্রমিক-মজুরের কাছে। দ্বিতীয়টিতে শিল্পের সার্থকতা বোঝাতে সঞ্চারবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য ভাবনাকে মানুষের মনে সঞ্চারিত করাই হল আসল শিল্প। যে শিল্পে সমাজ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাকে তিনি গুরুত্ব দেননি।

টলস্টয়ের শিল্প ভাবনা সম্পর্কে লেনিন তাঁর 'On Literature and Art' গ্রন্থে যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন —

> "Leo Tolstoy is dead. His universal significance as an artist and universal fame as a thinker and preacher reflect, each in its own way the universal significance of the Russian revolution."

৫.৪.১৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। টলস্টয়ের শিল্পভাবনা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'What is Art' গ্রন্থে টলস্টয় শিল্প ও জীবনকে এক করে দেখিয়েছেন, বিষয়টি লিপিবদ্ধ করো।

৩। 'On Art' গ্রন্থে টলস্টয় শিল্পের যে ধারণা দিয়েছেন তা বুঝিয়ে দাও।

৫.৪.১৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। নন্দনতত্ত্ব - ড. সুধীর কুমার নন্দী

২। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা - নবেন্দু সেন সম্পাদিত

৩। সাহিত্য বিবেক - বিমল মুখোপাধ্যায়

৪। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা - তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৫। নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য - সুখেন বিশ্বাস

৬। ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব - প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

একক-১০

অ্যারিস্টটল

বিন্যাসক্রম

৫.৩.১০.১ : অনুকরণ তত্ত্ব

৫.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৫.৩.১.০.১: অনুকরণ তত্ত্ব

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুকরণ তত্ত্ব। অনুকরণ তত্ত্ব কথাটি গ্রিক সাহিত্যে তাঁর আগেও অবশ্য প্রচলিত ছিল, তাঁর গুরু প্লেটোও অনুকরণ অর্থেই mimesis শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Art is imitation mimesis'। কিন্তু mimesis শব্দটিকে প্লেটো যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অ্যারিস্টটল সে অর্থে প্রয়োগ করেননি। প্লেটোর কাছে এই 'অনুকরণ' ছিল একটা ভাববাদী ধারণা মাত্র, অ্যারিস্টটল তাকে বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তুলনা না করলে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য বোঝা যাবে না, তাই সেটাই আগে করা যাক।

প্লেটো মনে করতেন আমরা চোখের সামনে যে পৃথিবী দেখছি সেটা একটা অনুকরণ মাত্র, আসল বা 'আইডিয়াল' পৃথিবীর ধারণা রয়েছে ঈশ্বরের মনে। কবিরা সেই 'আইডিয়ালের' যে অনুকরণ চোখে দেখতে পান, তার আবার একটা অনুকরণ করেন। সেইজন্যই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের তিনি নির্বাসিত করতে চেয়েছেন—কবিরা নকলের আবার নকল করে সত্য থেকে অনেকটা দূরে চলে যান।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর সেই 'আইডিয়াল'কে স্বীকার করেননি, দৃশ্যমান জগৎকেই তিনি আসল মনে করেছেন। কবিরা এই সৃষ্টির অনুকরণ করতে গিয়ে আর একটা নতুন সৃষ্টি করে ফেলেন, যা আমাদের আনন্দ দেয়। সুতরাং কবিদের তিনি কোনো মতেই নিন্দার যোগ্য মনে করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো মনে করতেন কেবলমাত্র সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই কবির কর্তব্য, অসুন্দর বস্তুর অনুকরণ করলে তাঁরা নিজেদের মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ধারণাকেও

সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন যা আপাত-অসুন্দর তাও কবির হাতে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই কারণে কেবল সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই শিল্পীর কাজ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভাববাদী ধারণা বর্জন করে শিল্পকলার আলোচনাকে অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর আগে শিল্প সম্বন্ধে অনেক ভাববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি করার জন্য আলাদা রকমের প্রতিভার দরকার হয় ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল এই সমস্ত ভাববাদকে নস্যাৎ করে, বলতে চাইলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই অনুকরণ করবার একটা প্রবণতা আছে, মানুষের এই ক্ষমতা সর্বাধিক—সে অনুকরণ করতে চায় এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে ভালো অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই সাহিত্য-শিল্পাদির জন্ম, কোনো বিশেষ প্রতিভা বা প্রেরণা থেকে নয়। একেই বলা হয় অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব বা mimesis theory। এই তত্ত্বটিকেই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝা যায় এই একই অনুকরণ প্রবণতা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্ম দেয় এবং বড় শিল্পী ও মাঝারি শিল্পীর তফাত করে দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, অনুকরণ প্রবণতা শিল্পের জন্মদাতা হলেও এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পের তফাত হয়ে যায় তিনটি ব্যাপারে—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। অনুকরণের বিষয় প্রকৃতি হলে তা চিত্রশিল্পের জন্ম দেয়, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিষয় মানুষের মনোভাব বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলে তা নৃত্যের জন্ম দেয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানুষ প্রধান বিষয় হলে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। মাধ্যমের পার্থক্য গুলিও লক্ষ করবার মতো—চিত্রশিল্পের মাধ্যম রঙ ও তুলি, নৃত্যের মাধ্যম দেহভঙ্গিমা, ভাস্কর্যের মাধ্যম ও উপাদান পাথর, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, উপাদান কাগজ, কলম। রীতি পাল্টালেও শিল্পের প্রকৃতি পাল্টে যায়। সাহিত্য শিল্পেও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয়।

এবার অনুকরণ তত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্লেটো যে অনুকরণের কথা বলেছেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবে imitate করা, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—যেমন দেখছ তেমন নকল করো। সত্যের অনুকরণকে বলেছেন eikastike, তা গ্রহণীয় ; মিথ্যার অনুকরণকে বলেছেন phantastike, তা বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু mimesis-এর দ্বারা বিশুদ্ধ নকলকে বোঝাতে চাননি। 'মিটিওরলজি' গ্রন্থে বলেছেন, অনুকরণ ঠিক নয়—শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, 'পলিটিক্সে' বললেন, প্রকৃতির অপূর্ণতা শিল্প পূর্ণ করে, 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প আর প্রকৃতি হচ্ছে দুই উদ্দীপক শক্তি—প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের তাগিদ, শিল্পের প্রবর্তনা রয়েছে শিল্পীর হৃদয়ে। 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে তিনি বললেন, কাব্য মানুষ ও মানবিক আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তা যান্ত্রিক অনুকরণ মোটেই নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। বাইওয়াটারের অনুবাদে তা এইভাবে বলা হয়েছে—'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight.' আদর্শায়িত অনুকরণ কী, তা জানতে গেলে universal element বা জীবনের সামগ্রিক সত্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে।

মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে সেই সমগ্র ঘটনা তুলে ধরলেই তা সামগ্রিক ঘটনা হয় না, এবং তা তুলে ধরা সম্ভবও নয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সব যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই বলেননি, অথচ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কেমন করে হল এটা ! তাহলে universal বলতে কী বোঝান অ্যারিস্টটল, সেটা বাইওয়াটারের অনুবাদ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদে পাই—'By the universal I mean how a person of certain type on occation speak or act according to the law of probability or necessity.' অর্থাৎ কিনা এক বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভাব্যতার বিষয় ভেবে যে আচরণ করে, তাই হল universal । সম্ভাব্যতার নিয়ম অবশ্য পদার্থশাস্ত্রের বিষয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি চরিত্রের বিশেষ পরিস্থিতির আচরণ যদি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাহলেই তার মধ্যে থাকে একটা শাশ্বত সত্য যাকে আমরা বলি universal বা সার্বজনীন বা সামগ্রিক সত্য। এটাকেই অ্যারিস্টটল যখন বড় করে দেখছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি অনুকরণকে তিনি নিছক 'নকল' হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন এক শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে। কবি কেবল অনুকরণ করেন না, জীবনের শাশ্বত সত্যে পৌঁছবার জন্য তাকে একটি পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেন মাত্র।

কবি যে অসুন্দর ও কুৎসিত ঘটনাকেও অবলম্বন ও অনুকরণ করতে পারেন—মানে প্লেটো 'phantastike' বলে যে অনুকরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তকেও যে মোটেই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল, তার কারণও ওই সম্ভাব্যতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলবার কাজে যদি তা সহায়তা করে তবে জীবনের অসুন্দর বৃত্তিগুলির অনুকরণও কবি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

বস্তুত প্লেটোর mimesis এবং অ্যারিস্টটলের mimesis-এর মধ্যে মিল শুধু কাজে, দুজনের ধারণায় আছে বিরাট তফাত। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে তিনি গুরুর সংজ্ঞা থেকেই শুরু করেছেন এবং সে কারণে অনুকরণ দিয়েই তাকে আলোচনা আরম্ভ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুকরণের মধ্যে গ্রহণ, বর্জন, পরিশোধন ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়াগুলি আছে—কবি কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের নকল করেন, এ কথা তিনি বলেননি। জীবনের এক সামগ্রিক রূপ নির্মাণের অবলম্বন হচ্ছে অনুকরণ, এই হল তাঁর অভিমত এবং তাঁর অনুকরণ তত্ত্বে আমরা পাই একই সঙ্গে শিল্পীর প্রচুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

কডওয়েল - ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি

বিন্যাসক্রম :

৫.৪.১৫.১ : ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম।

৫.৪.১৫.২ : কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

৫.৪.১৫.৩ : মানবজীবনে কবিতার প্রভাব।

৫.৪.১৫.৪ : আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য।

৫.৪.১৫.৫ : শিল্পকলা সংগঠন।

৫.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী।

৫.৪.১৫.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী।

৫.৪.১৫.১ ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

সাহিত্যের মরমী বোদ্ধা ও সমালোচক হিসাবে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের নাম পৃথিবী খ্যাত। বিশ শতকের চল্লিশ থেকে ষাটের দশকে কলকাতায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে কডওয়েল চর্চা হত ভীষণভাবে। মার্কসবাদী ভাবুক ও চিন্তাবিদ হিসাবে কডওয়েল সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির জগৎকে তুলে ধরেছিলেন সকলের সামনে।

লন্ডন শহরের কাছে এক মফঃস্বল শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে কডওয়েলের বড় হয়ে ওঠা। আসল নাম ছিল ক্রিস্টোফার সেন্ট জন স্ট্রিগ। স্কুলের পড়া শেষ না করেই মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি চাকরি নেন 'ইয়র্কশায়ার অবজার্ভার' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে। তারপর লন্ডনে ফিরে এসে প্রকাশনা সংস্থায় যোগ দেন। এরোনটিক্স সম্পর্কিত বই, গোয়েন্দা কাহিনি, ছোটগল্প, কবিতা—এমনকি একখানি উপন্যাসও লিখেছেন কডওয়েল। মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনা পড়ে তিনি সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পপুলার শাখায় যোগদান করেন। সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে ফ্রান্স থেকে গেছেন স্পেনে। Illusion and Reality, Studies in a Dying Culture, The Crisis of Physics, Further Studies in Dying Culture ইত্যাদি বই লিখে সাড়া ফেলেন বুদ্ধিজীবী মহলে। একসময় ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এবং শত্রুপক্ষের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

আমাদের দেশে সমালোচক মহলে কডওয়েল অত্যন্ত পরিচিত ও আলেচিত হলেও ইউরোপে তাকে নিয়ে এমন কিছু আলোচনা হয়নি। রেমন্ড উইলিয়াম ও আরও দু-এক জনের লেখায় কডওয়েল প্রসঙ্গ সামান্য উল্লিখিত।

কডওয়েল শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। সাম্যবাদ বিশ্বাস করতেন। সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা আছে। তাঁর মতে, আদর্শ সমাজ কখনওই ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরঞ্চ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে। বুর্জোয়া সমাজ যা ব্যক্তির আত্মোন্মচনে বাধার সৃষ্টি করে, কণ্ঠরোধ করে প্রতি পদে, সেই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আদর্শ সমাজের অবস্থান। এই আদর্শ সমাজ গঠনই সাম্যবাদের লক্ষ্য। এখানেই উল্লেখ্য, সমাজ বিবর্তনে ইতিহাসের ধারাটি। এই ইতিহাস সম্পর্কে কডওয়েলের ধারণা খুবই পরিষ্কার। ইতিহাস হল নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহ যা বুর্জোয়াতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিবিকাশের অন্তরায়গুলিকে বারবার উচ্ছেদ করতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে কডওয়েলের ভাবনাকে রক্ষণশীল মার্কসবাদ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সামাজিক বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে কডওয়েলের বোধ এবং বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ।

মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে বিচার করেছেন তিনি। সম্পূর্ণ গোঁড়ামিমুক্ত, স্পষ্টবাদী ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী কডওয়েলের বক্তব্যের সাথে সকলে একমত না হলেও কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে

পারেন না। কডওয়েল মনে করতেন বুর্জোয়া যুগের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার নিখুঁত চিত্রকর ছিলেন শেকস্‌পীয়র। পরবর্তী সময়ে অগাস্টান যুগের লেখকদের স্বকীয়তা এবং তারও পরে রোমান্টিক যুগের লেখকদের বাস্তব জীবন-বিমুখতা কোনও কিছুই কডওয়েলের দৃষ্টি এড়ায়নি। আধুনিক লেখকদের মধ্যে এক বিষণ্ণতাবোধ, বিপন্নতাবোধ, একাকিত্বের সুর লক্ষ করেছিলেন তিনি।

কডওয়েলের মতে, টি. ই. লরেন্স সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোনো ইতিবাচক ভাবনা ও আস্থা ছিল না। যদিও কডওয়েল লরেন্স-এর ব্যক্তিগত সাহসিকতাব্যঞ্জক শক্তিকে সমর্থন করে গেছেন। বুর্জোয়া সমাজের গরিমা ও গ্লানির বিরুদ্ধে ডি. এইচ. লরেন্স-এর বলিষ্ঠ বক্তব্যকে প্রশংসা করেছেন কডওয়েল। কিন্তু ডি. এইচ. লরেন্সের সব বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। লরেন্সের বিশ্বাস—'মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কের ভিতর দিয়ে নয়, তা থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে যায় ব্যক্তি মুক্তির পথে' ('That man is free not though but in spite of his social relation')। কিন্তু পাশাপাশি কডওয়েলের ধারণায় মানুষ ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগোয়। সে কারণে সামাজিক সম্পর্কগুলি অবশ্যই এমনভাবে বদলাতে হবে যার ফলে মানুষ কেবল বিজ্ঞতর হয়ে ওঠে না। সেই সঙ্গে আরও বেশি ইমোশনে পূর্ণ হয়ে ওঠে ('Social relation must be changed so that love returns to earth and man is not only wiser but more full of emotion.')। কডওয়েল মনে করেন মানবসভ্যতার ধারায় প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে এবং তার জন্য নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। বিবর্তনের ধারায় মানুষ আত্মবিকাশের জন্য তুলনায় বেশি সুযোগ পেয়েছে।

কডওয়েল সম্পর্কে ইওরোপীয়, বিশেষত ইংরেজ মার্কসবাদী আলোচক মহলে কিছু পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন—তিনি মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিমানুষের ইমোশনে পূর্ণ আস্থা রাখেন। এটা অনেকেই ঠিকমতো মিলিয়ে নিতে চান না। তবুও ব্যক্তিমানুষের সার্বিক উৎকর্ষকে তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং সর্বোত্তম বিকাশে বিশ্বাস করেন বলেই কডওয়েল তাঁর চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং মানবতাবাদী। আবার কেউ কেউ বলেন কডওয়েল নানা তত্ত্ব ও ভাবের আলোচনা যতটা করেছেন, ইংরেজি সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে ততটা বিস্তৃত কিছু লেখেননি। এ প্রসঙ্গে বলা চলে কডওয়েল যা ভেবেছেন, যা লিখেছেন তাতেই তাঁর ভাবনা রাজ্যের মৌলিকতা ধরা পড়েছে।

কডওয়েল মানুষের সমাজে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শিল্পীর মধ্যে শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শিল্প এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিরাট কোনও পার্থক্য তো নয়ই, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শিল্পী আর বিজ্ঞানী দুটি পৃথক জগতের অধিবাসী হলেও তাদের ব্রত কিন্তু একই। শিল্পী তার হৃদয়রাজ্যের গভীরে নিত্য অনুসন্ধান করেন অজ্ঞাত সৌন্দর্য আর ইমোশনকে। ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়ে তোলেন নব নব সৃষ্টি। বিজ্ঞানীও নতুন নতুন আবিষ্কারে ব্রতী হন বহিঃবাস্তবতার দাবি মেনে। শিল্পীর আবিষ্কার মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়। আর বিজ্ঞানীর আবিষ্কার মানুষের বাস্তব বেঁচে থাকাকে মসৃণ ও সুন্দর করে।

মার্কসবাদী চিন্তক হওয়া সত্ত্বেও কডওয়েল অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসীয় তত্ত্ব ও ধারণার পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই কডওয়েল ইওরোপে এবং আমাদের দেশেও অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। তিনি তাঁর 'Illution And Reality' গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ে আধুনিক কাব্যের নানা মনোজ্ঞ আলোচনার অবতারণা করেছেন—

১। The birth of Poetry.
২। The death of mythology.
৩। The development of modern Poetry.
৪। English Poets : (i) Primutive Accumulation.
৫। English Poets : (ii) The Industrial Revolution.
৬। English Poets : (iii) Decline of Capitalism.
৭। The Characteristics of Poetry.
৮। The World and the 'I'.
৯। The Psyche and Shantary.
১০। Poetry's Dream—Work.
১১। The Organisation of the Arts.
১২। The future of Poetry.

৫.৪.১৫.২: কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম দিকে কিছু ছোটগল্প, Detective উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর পরিচিতি নন্দনতত্ত্ববিদ হিসাবেই। তিনি মূলত মার্কসীয় চিন্তাভাবনায় নন্দনতত্ত্বকে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। পৃথিবীর যে কয়জন খ্যাতনামা মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য। মূলত যে দুটি বই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভীষণভাবে গ্রহণীয়, তা হল—১। Illution of Reality ২। Studies in a dying culture। এ দুটি বই থেকেই জানা যায় কবিতার উৎস ও মানব জীবনে তার প্রভাব।

কডওয়েল কবিতা বলতে আধুনিক কবিতাকেই বুঝিয়েছেন। কবিতার শরীরে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি লক্ষ করেছেন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছাপ। তিনি মনে করেন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গেই কবিতার জন্ম ও বিকাশ। কডওয়েলের মতে মানুষের আদিমতম নান্দনিক ক্রিয়াকর্মই হল কবিতা। সভ্যতার আদি লগ্নে সাহিত্য বলতে কবিতাকেই বুঝানো হত। উল্লেখ্য—সেই সময় কাব্য সাহিত্যে ইতিহাসে, ধর্ম, ইন্দ্রজাল, আইন সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু ভারতীয় সভ্যতাই নয়, পৃথিবীর যে-কোনও উন্নত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি রচিত হয়েছিল ছন্দ, কবিতায়।

কাব্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকেই। আদিম মানুষেরাও অনুন্নত কাব্য সাধনায় জীবনকে যুক্ত করেছিল। আদিম মানুষেরা নিজের অনুভূতিকে বোঝাতে গিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গি, লাফ-ঝাপ, শব্দ, ছবি এবং নানান উপকরণের আশ্রয় নিত। আর এ থেকেই শিল্প সৃষ্টি। শিল্প সৃষ্টির তিনটি মূল মাধ্যম হল—(১) নৃত্য (২) সংগীত (৩) কাব্য।

কডওয়েলের কবিতা ঊনবিংশ বিংশ শতকের আধুনিক কবিতা বলে পরিচিত, যার সূত্রপাত হয়েছিল পাশ্চাত্যে, উৎসধারায় কাব্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অর্থনীতি ও উৎপাদন (Economics and Production)। প্রতিদিনের জীবনের ক্রিয়াকর্ম চালাতে জীবিকার ভাবনা থেকে আসে অর্থনীতি, আর তার থেকেই আসে উৎপাদন ব্যবস্থা। প্রাচীন সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। তাই অর্থনীতির কাঠামো কৃষিনির্ভর করেই গড়ে উঠে। কৃষির উন্নতির সাথে সাথেই পাহাড়ের গায়ে গাছের পাতা ও শিলাফলকে শুরু হল পদ্য লেখা, যদিও কবিতা তখনও কবিতা শিল্পে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তারই হাত ধরে সমাজজীবনে রাজনীতি, ইতিহাস, যুদ্ধনীতি, আশা-ভালবাসার কথা লেখায় প্রতিফলিত হয়। আর এভাবেই আদিম যুগে কবিতার জন্ম। কডওয়েল পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর বিকাশ বোঝাতে গিয়ে জৈবিক বিবর্তনের কথা বলেছেন, কিন্তু মানবজীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন। আর এর ফলেই সমাজব্যবস্থা, যন্ত্র-প্রযুক্তি সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে। যদিও এর মধ্যে সংস্কৃতি তথা কবিতাকে অর্থনৈতিক সমাজ গঠন থেকে আলাদা করা যায় না। আমরা যদি শ্রম-বিভাজনের দিকে দৃষ্টি দেই, তবে দেখায়—পৃথিবীতে শ্রম-বিভাজন যত জটিল হয়েছে, কবিতাও ততবিকশিত হয়েছে। বিকশিত মান (Collective mind)। সমাজসচেতনতা (Social Consciousness), সামাজিক শ্রম (Social labour)-এর থেকেই শ্রম বিভাজন ও কবিতার জন্ম।

আগে আদিম মানুষের প্রবৃত্তি ছিল জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ বা বহিঃশত্রু থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এটাই ছিল তাদের সামাজিক কাজ যদিও এর থেকে কোনও কবিতার জন্ম হয়নি। পরবর্তীকালে এই প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয়ে অপ্রত্যক্ষ অথচ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। আর এই প্রয়োজন বোধ থেকেই জন্ম নেয় কবিতার। সুতরাং এই প্রবৃত্তিই রূপান্তর ঘটে কৃষিকাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থায়। এতদিন যা ছিল গোষ্ঠীর উৎস, এখন তা কবিতার উৎসে পরিণত হল। মানুষের উৎপাদনে আগ্রহ, তার থেকেই সুর, তাল, ছন্দ প্রভৃতির জন্ম। আর এই প্রবৃত্তি জাতীয় শক্তি রূপ নিল কবিতায়।

কডওয়েলের মতে আদি যুগের কবিতা বিশুদ্ধ কবিতা নয়। এই কবিতাকে তিনি বলেছেন সাধারণ ভাষার এক উন্নতর প্রকাশ ভঙ্গি। এতে ছন্দ-লয়, অনুপ্রাস, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার সাধারণ ভাষা ভঙ্গি থেকে আলাদা করেছে। আর পুনরুক্তি, রূপক, বিরোধাভাস, এই সব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এগুলি কবিতা নামে পরিচিত। এভাবেই ধর্ম সংক্রান্ত রচনা, দেবতাদের বংশ পরিচয়, আদিম প্রক্রিয়া প্রভৃতি ছন্দ রচনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, কমেডি, ট্র্যাজেডি ইত্যাদি। মানুষের সাহিত্য ক্রমবিবর্তনের ফলে এবং শিল্পান্দোলনের ফলে সচেতনতার সাথে সাথে কবিতা শাখা সাহিত্য থেকে আলাদা হয়েছে।

৫.৪.১৫.৩ : মানবজীবনে কবিতার প্রভাব

- মানুষের শ্রমেই কবিতার জন্ম শ্রমকেই সহজ, সরল আনন্দদায়ক করে তোলার পিছনে কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে কৃষিকাজ করার সময় আদিম মানুষেরা ছন্দোবদ্ধ সুরে কথা বলত, তার ফলে তার মনের মধ্যে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি হত তাতে শ্রম অনেক লাঘব হত। কবিতায় বাস্তব জগতের শ্রম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তাতে মানুষ আনন্দ পেয়েছে এবং কল্পনার জগত মানুষের কাছে অধিকতর বাস্তব বলে মনে হয়েছে।

- বর্তমানে শ্রমবিভাজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাব্য মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে কডওয়েল মনে করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কবিতা যেন অবকাশের সৃষ্টি। কবি যেন এক নিঃসঙ্গ একক ব্যক্তি। কডওয়েলের মতে শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত না হওয়া অবধি এই সমস্যার সমাধান নেই। এতে শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

  (ক) নিঃসঙ্গ কবি সমষ্টির মনে অনুভূতি আনার জন্যে এই কবিতা লেখেন।

  (খ) সমষ্টি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কবির কবিতা রচনা মূলত মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছানোর জন্যে।

- যুগ যুগ ধরে প্রেম, বসন্ত, সূর্যাস্ত, পাখির গান, গোলাপের মাধুর্য মানবজাতি দ্বারা অনুভূত, আস্বাদিত। উল্লেখ্য ওইগুলিই মানুষের মনে অনুভবের জগৎ তৈরি করেছে। তাই মানুষের কাছে কবিতার জগৎ সামাজিক অনুভবের জগৎ, মানুষের জীবন অভিজ্ঞতা ও হৃদয়ের জগৎ। তাই বলা যায় কবিতার শরীরের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সামাজিক জীবনের বিস্তৃতিকেই প্রতিফলিত করেছে।

- কবিতা মানুষকে এমন এক কাল্পনিক জগতে স্থাপন করে যা তার বাস্তব জগৎ (Present Reality) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই কাল্পনিক জগতের বাস্তবতা এখনও মানুষের বোধগম্য হয়নি। এই বোধগম্যতার জন্যে কেবল কবিতারই প্রয়োজন। কবিতাই সেই জগতের পূর্ণরূপকে আগাম দেখিয়ে দিতে পারে।

- কবিতা শুধু তার কথাই বলে আমরা এখনও যার গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ নিতে পারিনি। যদি কাব্যিক চিকিৎসা (Poetic treatment) না থাকত তবে কল্পনায়ককে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যেত না। কবিতা আছে বলেই আমরা মাঝেমধ্যে কল্পনার জগতে ভেসে গিয়ে ক্ষণিকের অবকাশ পাই।

  মানবসভ্যতার যত অগ্রগতি হচ্ছে ততই মানুষ জটিল হচ্ছে। এই জটিলতা কাব্যের উপরেও প্রভাব ফেলেছে। ফলে পাঁচালীর ঢঙে সহজ, সরল ছন্দের জায়গা নিয়েছে গদ্য ছন্দ। কাব্যে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কাব্য এক নতুন সত্যের জগতকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। তাই এখন কবিতার সত্য, আর বিমূর্ত সত্য নয়। কডওয়েলের মতে কবিতার সত্য দ্রুত পরিবর্তনশীল মানবমনের সামাজিক আবেগের মতো।

৫.৪.১৫.৪ : আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য

(ক) Poetry is Rhythmic (কাব্য-ছন্দময়) : কাব্য কবিতা যে ভাষায় লেখা হোক না কেন, তার একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। কবিতা লেখার সময় সে ভাষা থেকে একটা নতুন ছন্দ তৈরি করা হয়। কবিতা কলাবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি ছন্দে লেখা হয়ে থাকে। মানব জীবনের সাধারণ ভাষা থেকে কবিতার ছন্দ নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের কথ্য ভাষার যে ছন্দ, আর যে ভাষায় লেখা কবিতা ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা হলে বাংলা কবিতার ছন্দ আলাদা হয়। আমাদের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা সেহেতু এই ছন্দের প্রতি আকর্ষণও বেশি আর এটাই আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তি। এই জৈবিক প্রবৃত্তিই জন্মের পর থেকেই ছন্দের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। কডওয়েলের মতে এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কবিতার ছন্দের সঙ্গে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির সম্পর্ক আছে, কিন্তু জৈবিক প্রবৃত্তির সাথে ছন্দের শিক্ষাগত দিকে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মোটের উপর বলা যায় কাব্য-ছন্দের সাথে মানুষের জৈবিক ছন্দের একটা বিরোধ আছে। অর্থাৎ কবিতার ছন্দ সম্পূর্ণ আলাদা, তবুও মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি ও কবিতার ছন্দ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

(খ) Poetry is difficult to translate (কবিতা অনুবাদ করা কঠিন) : কডওয়েলের মতে কবিতা লেখার সময় একজন কবির মনে যে বোধ, অনুভূতি ও দার্শনিকতার জাগরণ ঘটে, তাকে সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন অনুবাদকের আগে কবির দেশ, কালকে অনুভব করতে হবে। বুঝতে হবে কবির মানসিক অবস্থার কথা। যদিও বাংলা ভাষায় অনেক কবিতা অনূদিত হচ্ছে, কিন্তু আসল ভাবটা কোনো কবি যথার্থ অনুবাদ করতে পারেন না। যেমন বলা যেতে পারে—'marvellous' বা 'অনুপম' কথাটি। এই শব্দটির গভীরতা অনেক। কেউ আকাশের দিকে, কেউ পাহাড়ের দিকে, কেউ সাগরের দিকে তাকিয়ে অনুপম কথাটি বলেন। কিন্তু অনুবাদক জানতে পারেন না কী দেখে কবি 'অনুপম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের ব্যাপারটা উপন্যাস, মহাকাব্য, গল্প, নাটকে লক্ষ করা যায়। কারণ তার বিস্তার অনেক বড়। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তা ঘটে না।

(গ) Poetry is Non-Symbolic (কাব্য অপ্রতীকধর্মী) : আমরা সাধারণত কবিতাকে প্রতীকধর্মী বলি। কিন্তু কডওয়েলের মতে কবিতা অপ্রতীকধর্মী। কারণ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে কবিতায়—আবেগ অনুভূতিকে বিচারবিশ্লেষণ করা যায় না। তাইতো কবিতা যুক্তিনিরপেক্ষ। তিনি মনে করেন চিন্তা দ্বারা গণিতের ভাষা বোঝানো যায় কিন্তু কবিতাকে নয়। কারণ গণিত আর কবিতা এক জিনিস নয়। গণিতের ভাষা Symbolic, Mathematics is Symbolic, But poetry is not symbolic, কবিতায় আবেগ অনুভূতি থাকে। তাইতো একজন আবেগ-অনুভূতিকে অনুবাদ করতে পারে না। একইভাবে আমরা ভাবের জিনিসকে প্রতীকে ধরতে পারি না। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ঘ্রাণ, শিশির, নক্ষত্রের যে অর্থ ব্যবহার করেছেন, অন্য কেউ তা অনুবাদ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বলা যায় অর্থগত অনুবাদ হলেও ভাবগত অনুবাদ সম্ভব নয়। প্রতীককেই একমাত্র সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করা যায়। কবিরা বাস্তব জগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। কবিতা হল কোনও কবির প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের আবেগজনিত প্রতিফলন।

(ঘ) Poetry is Concrete (কবিতা মূর্ত) : আমরা কবিতাকে মূর্ত শিল্পরূপে বিচার করব। কারণ কবির আমিত্ববোধ কবিতায় বিশেষের বাস্তব জগৎকে মিলিয়ে দেয়। Abstract-কে concrete করে। যেমন— "My love is like a red, red rose." এটাই কবির নিজস্ব অনুভূতি। অন্য কেউ এটা লিখতে পারে কি?

"My love is like a white, white rose".

ব্যক্তিবিশেষে আবেগ, অনুভূতি ভিন্ন হয়। তাই পাঠকের কাছেও তা ভিন্নভাবে ধরা দেয়। বিশেষ কালের মুহূর্তের অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেন বলে কবিতা মূর্ত। আর কবিতায় আমিত্বের প্রকাশ ঘটে বলে কবিতা সর্বজনীন।

(ঙ) Poetry is characterised by condensed affects (কবিতা ঘনীভূত আবেগ উদ্দীপক) : আবেগ অনুভূতি থাকলেই কবিতা সৃষ্ট হয় না। সাধারণ আবেগ কখনোই কবিতা সৃষ্টি করতে পারে না। কারও বন্ধুর বিয়োগ, ব্যথাবেদনা, সুখ-দুঃখ যেভাবে অনুভূত হয়, তা অন্য কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং তা কবিতা হতে পারে না। অর্থাৎ কবিতা পাঠ করার পর শ্রোতার মনে দাগ কাটলেই কবিতার আসল সার্থকতা, তখনই কবিতা পাঠককে সর্বজনীন-বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ করে। তাইতো আমরা এদেশে বসেই Shakespeare-এর কবিতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। কারণ তাঁর অনুভূতি আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে।

(চ) Poetry is composed of Words (কবিতা শব্দ দিয়ে গঠিত) : আমরা জানি আবেগকে প্রকাশ করতে হলে প্রকৃতি দরকার। নান্দনিকতা, সৌন্দর্য, আবেগ কখনও আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় না। ভাষা বা শব্দ দিয়েই গড়তে হয়। সেখানে শৈলী গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। কাব্যের ক্ষেত্রে কবিরা বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারাই মনের ভাবগভীরতা প্রকাশ করেন।

(ছ) Poetry is Irrational (কবিতা যুক্তি নিরপেক্ষ) : যুক্তি, বুদ্ধি দ্বারা কখনোই কবিতার ভাবকে বোঝানো যায় না। বৈজ্ঞানিক বা সমালোচকের মতো কবি কখনও যুক্তিবাদী হতে পারেন না। কডওয়েলের মতে যুক্তি দিয়ে কখনোই কবিতার সার্থকতা খোঁজা হয় না। সৌন্দর্য না থাকলে কবিতায় নান্দনিকতা ফুঠে ওঠে না, তার ফলে মানুষ বড় জগতে, মূলত উপলব্ধির জগতে পৌঁছয়।

পরিশেষে বলা যায় কডওয়েল বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'Illution And Reality'-তে আধুনিক কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কাব্য কবিতা হল ছন্দবদ্ধ, অনুবাদের অযোগ্য, যুক্তিনিরপেক্ষ, অপ্রতীকধর্মী এবং ঘনীভূত নান্দনিক আবেগ উদ্দীপক দ্বারা প্রাপ্ত।

৫.৪.১৫.৫শিল্পকলা সংগঠন

শব্দের সাহায্যে শিল্পসম্মত সংগঠন তৈরি করাকে বলে গল্প। গল্পে অপেক্ষাকৃত বাস্তবহীন চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, মূলত কৌশলগত পার্থক্যে। পাঠক কবির সঙ্গে একাসনে মিশে যান। উপন্যাসের বাস্তবের এক নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা দেখা যায়। ঔপন্যাসিক ও পাঠক তার বাইরে নয়। কাব্যের পাঠকের

মতো উপন্যাসের পাঠকরা তখনই নিজেকে একাত্ম করতে পারেন না। কবিতার পাঠক আবেগকে অনুভব করে। কিন্তু গল্পের পাঠক তার মধ্যে বাস করে না। কবিতা ও গল্পে আবেগ উদ্দীপকগত ধ্বনির ব্যবহার থাকে। সংগীতের কেন্দ্রে ধ্বনিগুলি উল্লেখ করে না। সেটা নিজেরই বোঝার বিষয়। কবিতায় আবেগ ভাষার গঠনের দ্বারা সংগঠিত হয়। এই গঠন নিজের অর্থের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বহির্বাস্তবের উপর নির্ভর করে। সংগীতের গঠন স্বয়ম্ভর। যেটা তর্কশাস্ত্রসম্মত বহির্বাস্তবের উল্লেখ করে না। বাইরে থেকে তর্কশাস্ত্র দেখা যায় স্বরাগম ও স্বরসংগতির কঠোরতা দেখা যায়। এই মানেই সংগীত কবিতা, উপন্যাস ও ধ্বনির তিন ধরনের ভূমিকা দেখা যায়। তর্কশাস্ত্রে সংগীতের নিয়মগুলি ছন্দযুক্তসম্মত হলেও সামাজিক স্বীকৃত ছন্দ বিষয়গত ও কাব্যের দ্বারা বিকৃত হয়। কিন্তু উপন্যাসে তা হয় না, উপন্যাসে বাস্তবের স্থানে কালকে বিবৃত করে। স্থান কালের সীমার মধ্যেই সংগীতের জগৎ অস্তিত্বশীল কাল হল গুণের উদ্ভব। অর্থাৎ কালকে স্থানের পরিভাষায় বর্ণনা করে।

মানুষ যখন ছন্দ উদ্ভাবন করেছিল, তখন সেটা ছিল তার নবজাত আত্মসচেতনার প্রকাশ। ছন্দ হল মানুষের অনুভূতি। Melody মানবের অনুভূতি। হারমোনি হল বস্তু মানুষের অনুভূতি। সংগীতে ছন্দ শরীর বৃত্তিগত এবং বিষয়কে নিজের ছক অনুযায়ী নিজে শরীরের দিকে টেনে আনে। সংগীতের জগৎ যেহেতু যুক্তিভিত্তিক গঠন। পর্যায় তেমনি বহিঃবাস্তব ও অভ্যন্তরীণ বাস্তব তথ্য ও অনুভূতি উভয়কেই প্রকাশ করে। ভাষা কাজ করে প্রতীকের সাহায্যে। সংগীতে যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডটি হল সংগীতের রূপ বা গঠনগত উপাদান। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন ব্যাকরণগত বা বাক্য গঠন রীতি উপাদানটির অন্তর্ভুক্ত হল স্বরে বস্তুত্ব। প্রথা, নিয়ম, স্বরগ্রাম, অনুমোদিত কর্ড ও সাংগীতিক তত্ত্বের উপকরণগত সীমাবদ্ধতা। এটি হল সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক উপাদান। যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডের মধ্যে মানুষকে বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ করতে পারে না। শিল্প সংগীত কার্য ও উপন্যাস সেটাকেই আবেগ উদ্দীপক ম্যানিফোল্ডের মধ্যে প্রকাশ পায়। মোটের উপর বলা যায়—

(ক) বিষয়গত উৎস থেকে আহরিত পর্যায়ভিত্তিক আবেগোদ্দীপক বিন্যাসকে সংগীতে ব্যবহার করে। অভ্যন্তরীণ বাস্তবের সঙ্গে যাতে মিল পাওয়া যায়, এমনভাবে বিবৃত করা হয়।

(খ) বিষয়ীগত উৎস থেকে পর্যায়ভিত্তিক স্থানিক বিন্যাসকে গণিত ব্যবহার করে। এই পর্যায়ভিত্তিক বৃত্তিগুলিকে বিবৃত করা হয়, যাতে বহিঃবাস্তবের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়।

(গ) কাব্যে আবেগোদ্দীপকগত ছন্দ হল যুক্তি—স্থানিক, আবেগোদ্দীপক কালিক নয়, গণিতের মূলগত ছন্দের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য পরিবেশের লয়ের বিপরীতে শরীরের লয়কে এটি প্রদান করে তোলে।

(ঘ) সংগীত ভাষা, গণিত এগুলি সবই ধ্বনি মাত্র। তা সত্ত্বেও তারা সমগ্র বিশ্বকে প্রতিফলিত করতে এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তব ও বহিঃবাস্তবের সক্রিয় সম্পর্কে প্রকাশ করতে সক্ষম।

ধ্বনি প্রতীক শিল্পগুলি ছাড়াও রয়েছে দৃশ্য বা নমনীয় শিল্পগুলি, যেমন চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। আমরা যখন বাইরের জগতের একটা দৃশ্য গড়ে তুলি, বা একটি অঙ্কিত নকশা বা অঙ্কন করি তখন গোটা বহিঃবাস্তব জগৎই প্রতীক নয়। সেগুলি কেবলমাত্র প্রতীক এবং সেই কারণেই তা প্রথাসম্মত।

অঙ্কন ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাইরের বাস্তব জগতের অংশগুলিকে একটি নকল জগতে গড়ে তোলা হল। যেমন একটা সুন্দর ছবির কথা বলা যায়। ছবিটি বাইরের জগতের থেকে আঁকা হয়। তার সঙ্গে চিত্রের একটা মিল থাকে। সেটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

চিত্রকল্প ভাস্কর্যের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা প্রয়োজন। কারণ সংগীত, কাব্য ও গল্পের মতো হয় না, শিল্পের ক্ষেত্রে মাত্রা, কালও অবর্তমান ভিন্ন নিকাশের, মিকেলাঞ্জেলোয় ও ক্রোনভাচ্ প্রমুখ শিল্পীর আঁকা ছবি বাইরের জগৎ থেকে বেশি বর্তমান। যেমন কোনো গল্পে তা কবিতা থেকে বেশি বর্তমান। বিশেষ করে বিষয়ভিত্তির উপর মহত্ত্ব নির্ভর করে। সংগীত বা কাব্যের ক্ষেত্রে চিত্রকলাতেও বাস্তবের সমাধান ও গভীরতা বোঝা যায়। যে নমনীয় শিল্পগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক, সেগুলি কাব্য ও গণিতের সগোত্র বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলিরও সর্বজনিক শিক্ষাগুলির সমগোত্র, এক সর্বজনীন তীব্র আবেগ ও অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করে উপজাতীয়-র মাধ্যম, কাব্য ও চিত্রকলা ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের মাধ্যম। চিত্রকল্প, কাব্য ও সুর কিছুই এর মধ্যে এইরূপ নাট্য করা যায়।

প্রথম আবির্ভাবের সময় চিত্রকলা ছিল প্রকৃতির মধ্যে আবেগের সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা। তাই প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিল্পে প্রথম আঁকা প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর চিত্রে জীবন সাদৃশ্য দেখতে পাই। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ ছিল—প্রকৃতি বঙ্গে গণ ও উপজাতি চিত্রশিল্পে প্রথম উত্তরণ ঘটান। আর সর্বাধিক প্রকৃতিবাদী চিত্রশিল্প হল বুর্জোয়া শিল্প। বুর্জোয়া সমাজে অধিকার ক্ষমতা ও উৎপাদন ঘটে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। তবে প্রকৃতিবাদকে বাস্তববাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আসলে বুর্জোয়া ফ্লেমিস চিত্রকলায় বাস্তববাদ চিত্রকলা কাব্যের উপন্যাসের মতো নয়। প্রকৃতিবাদ বাস্তব জগৎ চিহ্নিত করবে, প্রকৃতিবাদের বাস্তব জগতে ঘটে না। বুর্জোয়া সমাজ অহং থেকে এক স্বপ্নের জগতে মুক্ত হয়। তা একান্ত ব্যক্তিগত অচেতনতা। এটাই হল সুরিয়ালিজম। যেখানে বাস্তবের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়, এই বাস্তব যদিও কাল্পনিক, অর্থাৎ তা হল এক ব্যক্তিগত জগতে পদার্পণ।

নমনীয় শিল্পগুলি স্থির। সময়ের সাথে সাথে দৃশ্যগত শিল্প নৃত্যে, নাটকে এবং চলচ্চিত্রে দেখা যায়। নৃত্য হল প্রচীন শিল্প। কাব্যের মতো চিত্রকলার গুণও বর্তমান। দৃশ্যগত শিল্প সময়ের মধ্যে চলে। নৃত্যের মধ্যে প্রেম নিবেদন, মঞ্চের উপর হত্যা, চলচ্চিত্র দাঙ্গা সংগঠিত হয়। শিল্পের বাস্তব সংগঠনের মধ্যে বিশেষত অভিব্যক্তিধর্মী, দৃশ্যধর্মী, তত্ত্বের উদ্ভব করা যায়। ব্যক্তির জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হলে প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করে। মঞ্চে নাটকের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তির উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথ দেখা যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নাটক এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করে, সেই সমাজ যৌথ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থানে পৌঁছায়।

ভাষা ও সংগীতের সঙ্গে নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে পার্থক্য হল মিশ্র। সংগীতের ধ্বনিগুলি যেমন বাইরের বস্তু তেমনি নৃত্যরত বা অভিনয়রত মানুষের প্রকৃতি বস্তু। সুতরাং অভিনয় ও নৃত্যের একটা সংগীতগত, অপ্রতীকধর্মী উপাদান থাকে অভিনয় ও লেখকের মধ্যে। চলচ্চিত্রের ভাল প্রয়োজনের হাত ক্যামেরার যান্ত্রিক নমনীয়তা ভূমি কাল্পনিকে এমনি করে তোলা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি

কাজে লাগানো যায় না। নতর্ক বা অভিনেতা সামগ্রিক হিসাবে কাব্যের জগতের মতো স্থির, তা গতিশীল অবস্থায় থাকে। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কাব্যময় মুহূর্ত এবং আখ্যানমূলক গতির মধ্যেকার চাপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য।

মহাকাব্য ও নাটকের কিছু অংশ যা কোনো স্থান মুহূর্ত অনেকটাই সংগীতের মতো। শিল্প কখনও কখনও দ্বিত্বভাবে, প্রকাশ করে। যে বিষয়গুলি বর্ণিত হচ্ছে, তা নিজের একটা আবেগও থাকে। এই কারণে কাব্যধর্মী অভিনয় এত শক্ত। কাব্য এবং অভিনয় কবির অহং এবং 'অহং' পরস্পরকে অস্পষ্ট করে তোলে।

নৃত্য ও নাটকের মধ্যে প্রকৃতিও প্রতিফলিত বিষয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্নপ্রস্তর যুগে শিল্প ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মসচেতন এবং তখন তা বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে। ফলে যথাযথ বিচিত্র প্রকৃতি পদের উদ্ভব ঘটে। এবং প্রস্তর যুগে শিল্পে মৃগয়াজীবী বা ফল আরোহণকারী মাধুর্য থেকে যখন সে শস্য উৎপাদনকারী, পশুপালনকারী উপজাতি হয়ে উঠে। বিষয়কে সমাজ একটু সন্ধান করে না, তাকে পরিবর্তন করে। এইভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে উপজাতি টেনে নেয় আপন বুকের মধ্যে। শিল্প সমাজে নৃত্য পরিণত হয় কাহিনিতে, পরে নাটকে। কোরাসের জটিলতা ত্যাগ করে মঞ্চে উঠে আসে। শুরু হয় অভিনয় ও অ্যাকশান। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অবক্ষয় অনমনীয়তা অবশ্য যেন কোনও মুহূর্তে চরিত্রগুলি হয়ে উঠে। চিত্রকলার মতো নাটকও আরও বেশি করে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে থাকে। শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে শ্রেণী সমাজেও তার স্বাতন্ত্র্যের ফলে চারণ কবির উদ্ভব ঘটে। চারণ কবি নিয়ে এলেন মহাকাব্য, কেউ নিয়ে এলেন গীতিধর্মী, প্রেমধর্মী, পত্রধর্মী, ব্যক্তিগত কাব্য। কাব্যগত মুহূর্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের সঙ্গে আলোক পতিত করে, তার মধ্যে যৌথ অহং ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র হয়ে উঠে, বুর্জোয়া কাব্যের সুর করে গাওয়া গীতিকাব্য। পাঠকও কাব্যের সামাজিক অহং থেকে পলায়নে বা সুরিয়ালিজমে দেখা দেয়।

সোনার জগতের কাছে সংগীতের ভূমিকা যে ধরনের দেখা জগতের কাছে স্থাপত্য কলা ফলিত শিল্পের (বয়ন, আসবাব, যন্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদি) ভূমিকাও সেই ধরনের। সংগীতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপাদান যেমন একটি রূপগত আদর্শ গঠন এবং তার ছন্দ তর্কসম্মত শাস্ত্রে ক্রিয়া থাকবে, এক্ষেত্রে তা হয় না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আবির্ভাবের ফলে দেখা দিল শাসকশ্রেণীর পদমর্যাদা ও পবিত্রতা প্রকাশের জন্য আবরণধর্মিতা ও আবেগোদ্দীপক সংগঠিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে পরিচালিত করে। শিল্পগুলির শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য বিপুল বিষাদকরণ ও নান্দনিক উপদেশ দেখা যায়, এই ক্ষেত্রেও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সৃষ্টিগুলিতে সাধারণভাবে সেটাই দেখা যায়। বিভিন্ন শিল্পের সংগঠককে বিভিন্ন ছকে ফেলে দেখলে দেখা যাবে --

	শিল্প	**বহির্বাস্তব**
১।	ধ্বনিমূলক	সাংগীতিক গঠনের ছন্দযুক্তিভিত্তিক নিয়মাবলী
	সংগীত কাব্য	পর্যায় বাক্যগঠন রীতি গদ্য ও ব্যাকরণ গদ্যের নিয়মাবলী
	গল্প	বর্ণিত প্রকৃত বাহ্যিক জগৎ

২। দৃশ্যমূলক :

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নৃত্য-নাটক ও চলচ্চিত্র	গঠনগত প্রস্থাপনের প্রক্ষেপগত নিয়মাবলী প্রকৃত মানুষের দ্বারা অনুকৃত প্রকৃত অ্যাকশান
স্থাপত্য, মৃৎশিল্প বা সেরামিক্স, বয়ন শিল্প, আসবাব ইত্যাদি	ব্যবহারোপযোগিতা

৫.৪.১৫.৬: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি' : র. না. বি অনূদিত (পপুলার লাইব্রেরি)

২। সাহিত্য বিবেক : বিমল মুখোপাধ্যায় (দেজ পাবলিশিং)

৩। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দেজ পাবলিশিং)

৪। নন্দনতত্ত্ব ও মার্ক্সবাদ : জ্যোতি ভট্টাচার্য (অগ্রণী বুক ক্লাব)

৫.৪.১৫.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কবিতার জন্ম ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে যা বলেছেন বুঝিয়ে দাও।

২। কডওয়েলের মতে কবিতা কি? কবিতা কীভাবে মানব জীবনের উপর প্রভাব ফেলে আলোচনা করো।

৩। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে কডওয়েল কী বলেছেন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৪। 'শিল্পকলা সংগঠন' আসলে কী? কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন এন্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে কীভাবে শিল্পকলা সংগঠনের ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা করো।

———

একক - ১৬

ক্রোচে : এস্থেটিক্স্

বিন্যাসক্রম :

৫৪.১৬.১ : নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের প্রক্রিয়া ও শ্রেণীবিভাগ

৫.৪.১৬.২ : ক্রোচের প্রকাশবাদ ও শিল্প

৫.৪.১৬.৩ : ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতা

৫.৪.১৬.৪ : নান্দনিক ভাবনায় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা

৫.৪.১৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১৬.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.৪.১৬.১ : নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের প্রক্রিয়া ও শ্রেণীবিভাগ

ইংরেজী 'Art' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই হল 'শিল্প'। ল্যাটিন শব্দ 'Ars' থেকে গ্রিক ভাষায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ইংরেজীতে 'Art' শব্দটি এসেছে। সেই আদিমকালেই 'শিল্প' সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অজান্তে। কারণ মানুষ একদিন তার বুদ্ধির জোরে পশুর সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য সূচিত করেছে। ক্রমে ক্রমে তারা সভ্য হয়েছে। যেদিন থেকে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে, সেদিন থেকেই 'শিল্প' বিষয়টি রূপ লাভ করেছে। কারণ সভ্য হবার আগে মানুষ একমাত্র জীবিকার মধ্যেই নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল। যেদিন থেকে জীবনধারণের সমস্যা দূর হল সেদিন থেকেই মানুষ জীবন ও জগতের সৌন্দর্য বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। চিত্ত বিনোদনের জন্যে নাচ গান করা শুরু করল, বাস করবার জন্যে ঘরবাড়ি তৈরি করতে লাগল। এইভাবে জীবন ও জগতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রকাশ করতে গিয়েই সৃষ্টি হল—'শিল্পে'র।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ যেমন শিল্প সৃষ্টি করেছে ;তেমনি তার 'জিজ্ঞাসা'ও করছে। প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মনেই সর্বপ্রথম শিল্প জিজ্ঞাসার প্রশ্ন দেখা যায়। অ্যারিস্টটল শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন 'Art is imitation' অর্থাৎ শিল্পের সামান্য ধর্ম হল 'অনুকরণ'। অনুকরণের সামগ্রী হল men in action (জীবনের রূপ বৈচিত্র্য)। রাঙানো এই অনুকরণের মধ্যে থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সজ্ঞানপ্রক্রিয়া। তাই শিল্পীর শিল্পকর্ম বাস্তব এবং কল্পনার রঙে রঙানো। প্লেটোর মতে অনুকরণ হল ব্যক্তি বিশেষেরই উপস্থাপনা। অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন 'মাইসেমিস', কান্ট যেখানে বলেছেন 'জিনিয়াস' বা 'জাজমেন্ট'। জাজমেন্ট একধরনের চিন্তা। এই চিন্তার কাজ বস্তুকে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপকে দেখা। ক্রোচে মাইসেসিসবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'কলা' প্রকৃতির অনুকরণ। প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের বিচারে কল্পনাকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—শিল্প হল জড়ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম অর্থাৎ আত্মিক ধর্ম।

শিল্পের ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও গভীর যে, একটি সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। তবুও সাধারণভাবে শিল্প বলতে বোঝায় যার বিকাশ অথবা প্রকাশ মানুষের বুদ্ধি -বৃত্তির দ্বারাই শুধু চালিত নয়, বরং একটি সুকুমারবোধ ও কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে হার্বার্ট রিড তার 'The Meaning of Art' গ্রন্থ বলেছেন—

> "Art is most simple and most usually
> defined as an attempt to create pleasing forms". (Page - 16)

রিডের দেওয়া এই সংজ্ঞা থেকে শিল্পের তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল-শিল্পস্রষ্টা, শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসিক। যার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে আনন্দ। এই আনন্দই হল শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রেরণা। শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন রসিকসুজনকে এই আনন্দটুকু দেবার জন্যে। আনন্দই শিল্পের অত্যাবশ্যক ধর্ম। এলিয়টের ভাষায় "Superior amusement". যাই হোক, একটি শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্প পার্থক্য হয় তিনটি কারণে—

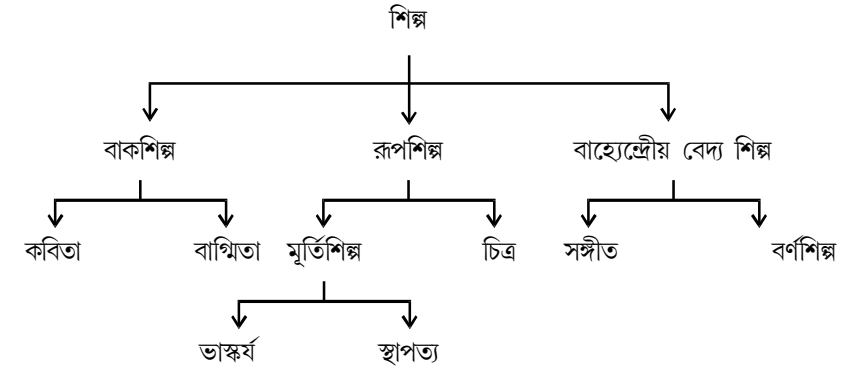
(ক) মাধ্যম (mediam)

(খ) বিষয়বস্তু (objects)

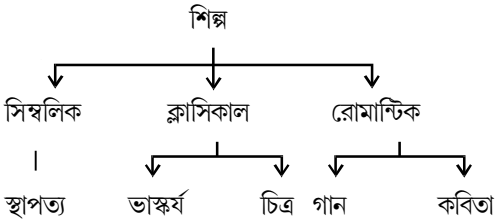
(গ) অনুকরণরীতি/ভঙ্গি বা রীতি (mode of imitation)

যেমন কাব্যসাহিত্যের প্রভাবের মাধ্যমে ভাষা, চিত্রশিল্পের মাধ্যম বর্ণ বা রেখা আবার সঙ্গীতের মাধ্যম সুর বা স্বর। অর্থাৎ ভিন্ন মাধ্যমে শিল্পগুলি পৃথক হয়ে যায়। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলা যায় শিল্প যদি জীবনের বিরাট দিক উপস্থাপিত করে তবে হয় মহাকাব্য আবার মুহূর্তের বিষয়কে প্রকাশ করলে হয় গীতিকাব্য। এখানে মাধ্যম একটাই—ভাষা। তবুও বিষয়বস্তুর পৃথকের জন্যে শিল্পগুলি পৃথক হয়ে যাচ্ছে। আরও বলা যায়, বিজ্ঞানেও ভাষা থাকে ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন আর কবি কল্পনার মাধ্যমে জীবনের রূপ প্রকাশ করেন। আবার ইতিহাসে শুধু বিশেষ ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় কিন্তু কবিরা বিশেষের মধ্যে থেকে সামান্যকে (universal) ব্যক্ত করেন। আবার বিষয় ও মাধ্যম এক হলেও ভঙ্গী পৃথক হলে শিল্প আলাদা হয়ে যায়। যেমন নিজের বিবৃতির দ্বারা বললে সেই শিল্প হয় বিবৃতিমূলক (Narrative) । যার দ্বারা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা রচনা হয়। চরিত্রে সংলাপের দ্বারা কথাগুলি উপস্থাপিত করলে হয় নাটকীয় ভঙ্গী (Dramatic)। এর দ্বারা শিল্প পৃথক হয়ে যায়। এই ভাবে তিনটি কারণের জন্যে শিল্প পৃথক হয়ে যায়।

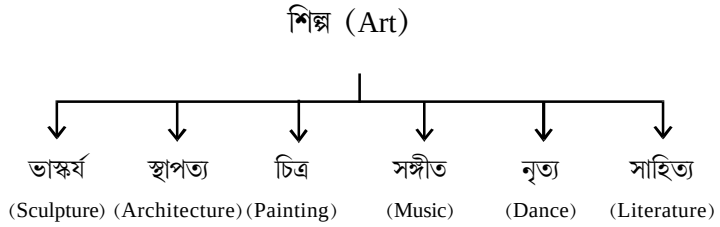
শিল্প উপাদান ও আবেদনগত পার্থক্যের দিক থেকে কান্ট শিল্পের শ্রেণীবিভাগ করেছেন—



হেগেল: —



কান্ট ও হেগেল কর্তৃক শিল্পের শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা একটি নতুন শ্রেণীবিভাগ করতে পারি—



ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের আবেদন মানুষের চোখের ও স্পর্শের কাছে। চিত্র শিল্প বর্ণ ও রেখার সাহায্যে বিবিধ বস্তু ও মানুষের রূপ অনুকরণ করে। সংগীত সামান্য লক্ষ্যে সুরকে মাধ্যম করে অনুকরণ বিশেষ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিত্র ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে। সাহিত্য হচ্ছে ভাষা শিল্প, কারণ ভাষার মাধ্যমে জীবনের রূপকল্পনা করা হয়। কান্ট ও হেগেলের মতে কাব্যই শ্রেষ্ঠ শিল্প। কারণ সাহিত্য সৃষ্টি বা রসগ্রহণে সকলেরই অবাধ প্রবেশ। সাহিত্য অন্য শিল্পকলার ধর্মকে সহজেই আত্মসাৎ করতে পারে। চিত্র সাহিত্যের ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। অর্থাৎ সাহিত্য হল চিত্র, দেহ সঙ্গীত প্রাণ। হ্যাজলিট শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন চিত্রকে। রোজারফ্রাই চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে কাব্যে সাহিত্যের ঊর্ধ্বে স্থাপন করছেন। কিন্তু শোপেনহাওয়ার, ওয়ালটার পেটার প্রাধান্য দিয়েছেন সঙ্গীতকে। কারণ সঙ্গীত ব্রহ্মবিদ্যা। তা অন্য শিল্পের ধর্মকে আত্মসাৎ করে এবং মানুষের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ যে-কোনও শিল্পকে অন্যশিল্পর আতিথ্যদানে অকুণ্ঠিত। কারণ সব শিল্পই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই একাধিক শিল্পগুণ একত্রিত হয়ে শিল্পের স্বাদ বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে শিল্পের শ্রেণীবিভাগ হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্বীকার্য নয়। লোর‍্যাঁর আঁকা ছবি থেকে প্রেরণা পেয়ে জন কিটস লেখেন "Ode on a Grecian urn"। সকল শিল্পীই অন্য শিল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের শিল্পকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারেন। পরিশেষে তাই বলা যায় শিল্পীর যেমন জাত নেই, শিল্পেরও শ্রেণীদ্বন্দ্ব নেই।

৫.৪.১৬.২: ক্রোচের প্রকাশবাদ ও শিল্প

ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ বেনিদেত্তো ক্রোচে একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। দার্শনিক বলে তাঁর আলোচনায় গভীরতা ও বিধিবদ্ধ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবেত্তা ছিলেন বলে তাঁর আলোচনা মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের পর্যবেক্ষণ জনিত গভীর জীবনবীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকদের মতো জীবনের শুধু আর্থসামাজিক পটভূমিকার

প্রতিক্রিয়ারূপে সাহিত্যকে দেখেননি; কিন্তু ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বানুসন্ধানীর জীবনদৃষ্টিতে যে গভীরতা আসে ক্রোচের আলোচনায় সেই গভীরতা দেখা যায়। আর সর্বোপরি তিনি সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি দর্শন বা ইতিহাস রূপে দেখেননি।

তিনি সৌন্দর্যের যে পূর্ণরূপ তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা ঈশ্বরের পূর্ণ-সৌন্দর্যেরই সমতুল্য। তবু তিনি নাস্তিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাস্তিকতা চার্চের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে সৌন্দর্য রয়েছে তাকে ঈশ্বরের নামটি বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় "a christian outside the church".

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বকে এক কথায় বোধি-প্রকাশবাদ বলা যায়। ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয়। শিল্প সৃষ্টি হল সহজ জ্ঞান বা বোধি বা স্বজ্ঞার প্রকাশ। এখানে বলা প্রয়োজন যে ক্রোচে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বোধিলব্ধ জ্ঞান (intuition knowledge) ও নৈয়ায়িক জ্ঞান (logical knowledge)। এই দ্বিবিধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বা পদ্ধতিও আলাদা। বোধিলব্ধ জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে অর্জিত হয়, আর নৈয়ায়িক জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা অর্জিত হয়। বোধিলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক, আর নৈয়ায়িক জ্ঞান বিশ্বসত্তা বিষয়ক। বোধিতে জ্ঞান হল এক একটা জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের সম্পর্ক বিষয়ে। যেমন বোধিলব্ধ জ্ঞান হবে রাম, শ্যাম প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে। নৈয়ায়িক জ্ঞান হবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যে সম্পর্কের সূত্রে এরা অন্বিত বা মানবতা সম্পর্কে। শিল্প হল (intuition) বা বোধি অর্থাৎ শিল্পে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তার কল্পনার মাধ্যমে লাভ করি। এবং যে জ্ঞান লাভ করি তা ব্যক্তিসত্তা বিষয়ে জ্ঞান। অন্যদিকে দর্শনশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা হল নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান আসে (intellect) বা বুদ্ধির মাধ্যমে। আর এতে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা সর্বজনীন সত্তা সম্পর্কে। যেমন মানবতা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান। শিল্পের সৃষ্টি হল ব্যক্তিরূপ সৃষ্টি। সাহিত্যের ও শিল্পের গভীরে অবশ্য বিশ্বসত্যের যে স্পর্শ পাই তার কারণ সমস্ত মহৎ সাহিত্যেই গভীর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ থাকে। বস্তুত ব্যক্তিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব সত্যের প্রকাশই মহৎ সাহিত্যের পরিচয়, এই বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা ও উদ্‌ঘাটনের কথা ক্রোচে বলেননি।

ক্রোচের মতে intuition বা বোধি যেমন প্রথমে মানবমনের অন্তর্লোকে আপন থেকেই ভেসে উঠে, তেমনি তার প্রকাশরূপও প্রথমে আমাদের মনোলোকেই ফুটে উঠে। অর্থাৎ কাব্য বা চিত্র বা ভাস্কর্য মূর্তিটি প্রথমে আমাদের মনের মধ্যেই রূপ নিয়ে গড়ে উঠে। ক্রোচের মতে সেইটাই শিল্পের আসল প্রকাশ। আর ভাষার সাহায্যে বা বর্ণরেখার সাহায্যে বা প্রস্তর মূর্তির সাহায্যে আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পরূপ গড়ে তুলি সেটা বাহ্য ব্যাপার। কিন্তু ক্রোচে এই বাহ্য প্রকাশকেও বোধির অপরিহার্য অঙ্গ বলেই স্বীকার করেছেন। বোধির বাহ্য প্রকাশ ছাড়া শিল্পও সম্ভব নয়।

ক্রোচের মতে শিল্পে বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ নেই। প্রতিটি শিল্প সৃষ্টি হল অতুলনীয় কারণ শিল্পের যেটা মূল সেই বোধিই হল অতুলনীয়। জীবনের কোনও অনুভূতি বা আবেগ একবার সংঘটিত হবার

পর তাকে পুনর্বার জাগানো যায় না। শিল্প কিন্তু বাস্তবে না হলেও ভাবলোকে সেটাকে পুনর্জাগরিত করে এবং ভাবলোকে এই যে পুনর্জাগরণ ঘটায় এটা স্থান-কালের সীমা ত্যাগ করে শাশ্বতের ও লোকোত্তর জগতের বস্তু হয়ে যায়। ক্রোচের মতে বোধি স্থান-কালের উপরে নির্ভরশীল নয়। এটা একটি স্বয়ং নির্ভর আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কারণ ক্রোচের মতে শুধু আত্মাই বোধি সৃষ্টি করে বা ধারণ করে "the spirit only intuites in making, forming, expressing."

ক্রোচের মতে বোধিলব্ধ জ্ঞান চিত্রকল্প সৃষ্টি করে আর নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ধারণা সৃষ্টি করে। ধারণা হল সাধারণ ধারণা। কোনও বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে এলে আমাদের প্রথমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছালে আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলির ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের কাছে সেই বস্তুটির জ্ঞান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ব্যাখ্যা মিলিত হয়ে ওই বিশেষ বস্তুটির যে জ্ঞান দেয় তা হল প্রতীতি। এরকম একই জাতীয় একাধিক বস্তুর প্রতীতির মধ্যে তুলনা করে শ্রেণীগতভাবে ওই জাতীয় বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হল Concept। তা গড়ে তোলার জন্যে এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার। কিন্তু চিত্রকল্প গড়ে তোলার জন্য এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার হয় না। এই কারণে ক্রোচে বলেছেন শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা নেই। শিল্পসৃষ্টি হল বোধি। বোধির সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন—আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা নিত্য বোধির দ্বারা অর্থাৎ সহজ সজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হই। "In ordinary life, constant appeal is made to intuitive knowledge".

ক্রোচে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে মানুষ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সহজ জ্ঞানের অধিকারী নয়, শুধু অবাস্তব যুক্তিতর্ক করে যায়—রাজনৈতিক নেতারা ঠিকই বলেন—সেই মানুষের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। অর্থাৎ সার্থক সফল রাজনৈতিক নেতারাও বাস্তববোধ দিয়ে সহজ জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হন, শুধু তার্কিক তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হলে কেউ সফল রাজনৈতিক নেতা হতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধ জ্ঞান বা সজ্ঞার ভূমিকা খুব বেশি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধ জ্ঞান বা সজ্ঞার স্বীকৃতি নেই। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যে একটি সমৃদ্ধ শাস্ত্রই প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে—তা হল ন্যায়শাস্ত্র বা Logic। কিন্তু বোধিলব্ধ জ্ঞান সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, এবং সে বিষয়ে কোনও শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি বলে ক্রোচে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বোধিলব্ধ জ্ঞান নিজে নিজেই ঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেও বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ বোধিলব্ধ জ্ঞানই অব্যর্থ সত্যদ্রষ্টা। যুক্তিবুদ্ধির তার্কিক কচকচিতে হারিয়ে যায় সত্যবস্তু। সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন যুক্তির তার্কিক পথে হতে পারে না।

আবার আর একটি দিক ভেবে দেখবার আছে। যুক্তিসিদ্ধ ধারণার মধ্যেও অনেক সময় বোধিলব্ধ সহজ জ্ঞান মিশে থাকে। এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, তখন সেটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণাই থাকে না, তখন সহজ জ্ঞান বা বোধির উপাদান হয়ে যায়—ক্রোচের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা সাহিত্য থেকে অনেক উদাহরণ

দিতে পারি। যেমন শঙ্করাচার্যের উক্তি—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এতে জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে যে ধারণা হয় তা দর্শনিকের নিত্যানিত্য বস্তুবিচার থেকে জাত যুক্তিসিদ্ধ ধারণা। ক্রোচের মতে একটি মুখের ছবিতে যে লাল রং থাকে সেটাকে বলে পদার্থ বিজ্ঞানীর লাল রং, সেটাকে ছবিটার একটি বিশিষ্ট উপাদান রূপে আমরা দেখি। এখানে ছবিটা বোধি আর লাল রং তার উপাদান। ওই লাল রংটা পদার্থবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে একটা ধারণা (Concept), কিন্তু শিল্পীর কাছে সেটা একটা শিল্পের উপাদান, শিল্পের উত্থাপিত একটা মুখচ্ছবির বৈশিষ্ট্য তাতে দ্যোতিত হচ্ছে, সেটা একটা বোধির অংশ উপাদান। সমগ্র শিল্পটা তার উপাদানের গুণকে নিয়ন্ত্রিত করে "The whole is that which determines the auality of the parts". এজন্য শিল্পকর্মকে অনেক দার্শনিক ধারণা থাকতে পারে। সেসব দার্শনিক ধারণায় অনেক গভীরতাও থাকতে পারে। আবার শৈল্পিক বর্ণনা উপচে পড়তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। যেমন-"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর," কিংবা "নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই" ইত্যাদি। কিন্তু সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনা দার্শনিক গ্রন্থ হয়ে উঠেনি। আবার ক্রোচে বলেছেন শোপানহাওয়ার তাঁর দার্শনিক গ্রন্থে অনেক গল্পকাহিনী উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেইসব গল্প ও কাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনাটি সাহিত্যিক গল্প হয়ে উঠেনি। কারণ লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে গল্পের রস সৃষ্টি করা নয় তত্ত্বকথা বোঝান। শিল্পীর মূল লক্ষ্যই হল শিল্প বিচারের প্রথম ও চূড়ান্ত মানদণ্ড। আর আবেদন সৃষ্টির সার্থকতাই হল শিল্পের সর্বার্থসিদ্ধি।

প্রকাশ কামনা রয়েছে মানুষের সমস্ত জীবনের কর্মের মধ্যে। প্রকাশই হল আনন্দ। জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে বিজ্ঞানে দর্শনের মধ্যে। কিন্তু ভাবের প্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্যে। ক্রোচে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন ধ্যানলোকে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, এবং তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, তখনই শিল্পের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ ছাড়া শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

ক্রোচে বলেন শিল্প হচ্ছে অভিজ্ঞতা বা মানব চৈতন্যের জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রকাশ। এই অভিজ্ঞতার দুটি রূপ—১. জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা ও ২. কর্মমূলক অভিজ্ঞতা। প্রথমটি Intuition, দ্বিতীয়টি Conception thought. তিনি জ্ঞানকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করেন— ১. নৈয়ায়িক জ্ঞান ও ২. প্রতিভাসিক জ্ঞান। এই Intuition শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রোচে প্রথমেই তাকে সংবেদন, উপলব্ধি, অনুষঙ্গ থেকে পৃথক করে নিয়েছেন। তিনি বললেন স্বজ্ঞা হল বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ প্রকাশধর্মী জ্ঞানের অবস্থা। প্রকাশ ছাড়া কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের মানসলোকে অখণ্ড মূর্তিতে যে ইমেজ বা স্বজ্ঞার আবির্ভাব তারই প্রকাশ শিল্প সাহিত্যে। সুতরাং স্বজ্ঞার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রকাশে। অর্থাৎ ক্রোচের কাছে স্বজ্ঞা ও প্রকাশ অভিন্ন। মোট কথা Intuition ও Expression-কে তিনি সমীকৃত করলেন।

ক্রোচে সজ্ঞাকে দেখেছেন বাস্তবের উপলব্ধি ও অন্তরের একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের

মূলকথাই হল প্রকাশ। শিল্পে বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশকে পছন্দ করেননি। তাঁর মতে আবেগের সঙ্গে ধ্যানের মিলন হলেই মহৎ কাব্যের জন্ম হয়। তিনি কল্পনা ও প্রকাশকে সমার্থক বলেছেন।

ক্রোচে 'প্রকাশকে' অবাচনিক অর্থেও দেখতে চেয়েছেন। রেখা, বর্ণ, শব্দ দ্বারা প্রকাশ, মানুষ বক্তারূপে চিত্রকররূপে যেভাবেই ব্যক্ত করুক সব কিছুই প্রকাশ। আর এই প্রকাশই প্রতিভাসের অপরিহার্য অংশ। প্রথমে আমাদের মনে চিত্রের সুস্পষ্ট রূপ মনে পাচ্ছি এবং তা দেখে তাকে বাইরের চিত্ররূপে প্রকাশ করছি। মানুষের আবেগ আত্মার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত প্রদেশে আসে।

ক্রোচে বলেন সজ্ঞা বা প্রকাশ হল বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ অবস্থা। আর শিল্প হল ইমেজের প্রকাশ। আর প্রকাশক্রিয়া কখনওই ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুভূতির থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আমাদের জ্ঞানলোক যদি ধ্যানলোক বা অন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেটাই প্রকাশ। অর্থাৎ অন্তরের প্রকারই প্রকাশ। যদি সেটি মনলোকেও অবস্থান করে সেটাই প্রকাশ। মনোলোকে অবস্থান করলেও সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এর বাচনিক বা সাংকেতিক প্রকাশ না হলেও চলবে। একজন শিল্পী মানুষের চৈতন্যের উৎসই হচ্ছে মূলকথা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার উর্ধ্বে মানসিক যে ভিত্তিভূমি আছে সেখান থেকে শিল্পের জন্ম হয়।

একজন শিল্পী হবেন মহাজাগতিক বাস্তবের চিত্রকর। কারণ শিল্পের মধ্য দিয়ে 'মহাজাগতিক বাস্তবের' প্রকাশ ঘটে। তাঁর মতে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার কোন বাহ্যিক রূপ নেই। বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার প্রকাশ মানুষের অন্তরে। এর থেকে ক্রোচের প্রকাশবাদের পরিবর্তিত রূপটি ধরতে পারি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হল। তাঁদের অভিযোগ হল সরাসরি না হলেও শিল্পীর কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যায়। আর সেটি না স্বীকার করলে তবে হৃদয়ানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটলে পাঠক বা দর্শক কিভাবে তা আস্বাদন করবে। আর এখানেই ক্রোচের সীমাবদ্ধতা। তাঁর Theory of Expression এখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি বলতে চাইলেন যিনি কবিতা বোঝেন তিনি নিজের হৃদয়ে লেখকের হৃদস্পন্দন অনুভব করবেন। পাহাড়ের মৌনতা, সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে ক্রোচের ধ্যানধারণা অনেকটাই মিলে যায়।

শিল্পী হিসেবে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পের বারবার পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেছেন। কিন্তু শিল্পতত্ত্ববিদ হিসাবে ক্রোচে প্রকাশের বাহ্যরূপের মর্যাদা বোঝেননি, এখানেই ক্রোচের ব্যর্থতা। তিনি ভাববাদী দার্শনিকদের মতো বলেছেন—একদৃষ্টি সম্ভূত অখণ্ড উৎসকেই বলেছেন প্রকাশ। ইন্দ্রিয় দিয়ে যার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি না তার মূল্য কোথায়? এ জন্যে ফরাসি দার্শনিক 'ইউজেন ভেঁরো' বললেন—"আবেগের বাহ্যরূপই শিল্প"।

৫.৪.১৬.৩: ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতা

মানুষের মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। পদ্মপাতায় পড়া একবিন্দু জলকণার মতো সর্বদা টলমল করে। মানুষ যত পথ হাঁটে, অনুভূতি অভিজ্ঞতা তাড়িত মানুষের মতের ততই পরিবর্তন ঘটে। ক্রোচের ক্ষেত্রেও সেটাই লক্ষ্যণীয়।

তিনি প্রথমে প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বয়সোচিত একটা অস্থিরতা কেটে যেতেই তাঁর মনে হল বাইরে রূপ না নিলেও কোনও কিছুর গভীর ধ্যান বা মননই প্রকাশ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ক্রোচে পাঠক বা রসিককে কি অস্বীকার করেছেন ? না, তা নয়। সমালোচকের অনুভূতি উদ্দীপিত করার মধ্যেই শিল্পের বাহ্যরূপ সীমাবদ্ধ। সমালোচক তখনই দান্তে বা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে পারবেন যখন নিজেকে সে সেই স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু একটা এক দুরূহ ব্যাপার। আসলে এটাই ছিল ক্রোচের কাম্য। আসলে একজন absolute idealist হিসাবে ক্রোচে তাঁর অভিব্যক্তি তত্ত্বকে পরিণতি দিয়েছিলেন এক রহস্যময় নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা সঙ্কুলতায়। আর সে কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশবাদ এক পরিবর্তিত চিন্তাধারায় গভীর মৌনতায় পৌঁছেছে।

এই অভিব্যক্তিতত্ত্বের বা প্রকাশতত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

১। বাস্তব জগতের সঙ্গে শিল্প বা শিল্পীর যোগ আছে বলে ক্রোচে মনে করতেন না, কেননা, শিল্পীকে বাহ্যরূপ নির্মাণের কোনও দায়িত্ব নিতে হয় না। তাহলে শিল্পীর দায়বদ্ধতা সকলের সামনে প্রকাশ পাবে কি করে? এর উত্তর ক্রোচে দিতে পারেননি। আবার তিনিই শিল্পীকে বলেছেন—"যথার্থ বাস্তবের রূপকার" কিন্তু এই অসঙ্গতির কারণ কি? আসলে ক্রোচে এখানে প্রাত্যহিক জীবনের পঙ্কিলতা মুক্ত 'মহাজাগতিক বাস্তব'-এর কথা বলেছেন। প্লেটোও শিল্পের মহাবাস্তবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই মহাজাগতিক বাস্তব আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যার দ্বারা কোনও শিল্প সৃষ্টি হয় না।

ক্রোচে মনে করেন জগতের সমস্ত কাজে ও ভাবনায় শিল্পীর সংযোগ থাকবে। সে যদি পাপীও হন, তা সত্ত্বেও সাধারণ পাপ পুণ্য সম্পর্কে তাঁর একটা বোধ থাকবে। তাই জীবন ও সাহিত্যকে একসঙ্গে মেলাতে ব্যর্থ হতে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।'

২। ক্রোচের শিল্পী অন্তর্নিহিত ভাবরূপ নির্মাণে দক্ষ। তথায় যা বাহ্য রূপ নয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে লেখকের আবেগ অনুভূতি কি করে সর্বজনবোধ্য হয়? তার উত্তরে ক্রোচে বলেন—

> "যিনি কবিতা বোঝেন তিনি সরাসরি লেখকের হৃদয়ে
> প্রবেশ করে নিজের অন্তরে লেখকের হৃদস্পন্দন অনুভব করেন।"

কিন্তু যিনি বাহ্যরূপকে গুরুত্ব দিলেন না বা বিশ্লেষণ করলেন না—কিভাবে পাঠক তার হৃদয়ে কাব্যপাঠের আনন্দ অনুভব করবেন? এখানেই ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের সীমারেখা।

সমালোচক জয়েস কেরি ক্রোচের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন—ক্রোচের মতের অনুসরণ করলে দেহ ও আত্মাকে একই বলে মনে হবে। কিন্তু দেহ ও আত্মার ভেদ যদি না থাকত তাহলে

ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কোনও পার্থক্য থাকত না। মানুষ যে আলাদা তার কারণ, দেহকে বাদ দিয়ে আত্মা অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব। তাই স্বজ্ঞা ও প্রকাশের মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে।

কবি-দার্শনিকদের প্রতি নজর দিলেই স্বজ্ঞা ও প্রকাশে পার্থক্য বোঝা যায় না। যেমন—'টলস্টয়' রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রকাশকে সুন্দর করতে বারবার নিজের লেখার সংশোধন এবং সংযোজন করেছেন। কিন্তু ক্রোচে তা স্বীকার করেননি। আসলে টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী। আর ক্রোচে ছিলেন শিল্পতত্ত্ববিদ। সেজন্যই ক্রোচের কাছে শিল্পের মূল রহস্যগুলি অবগত রয়ে গিয়েছে।

শিল্প হল বাহ্যরূপের আবেগের প্রকাশ মাধ্যম। যেমন আবেগ গতিকে নৃত্যে পরিণত করে, সুরকে সঙ্গীতে এবং শব্দকে কাব্যে পরিণত করে। অর্থাৎ শিল্পের উপাদান শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, শিল্পের রূপও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৩। ক্রোচের অভিব্যক্তির আর একটি সীমা সমালোচনা প্রসঙ্গ। যদি শিল্পকর্ম একটি মানসিক ব্যাপার হয় তাহলে সমালোচক কিভাবে এক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যতা নির্ণয় করবেন? কি করে বাছাই করবেন ভালো শিল্প বা শিল্পী।

৪। শিল্পের সার্থকতার প্রশ্নে, ক্রোচে সুন্দর বলতে বুঝিয়েছেন Perfect-কে, কিন্তু প্রকাশকে কিভাবে Perfect করা যায় তার উত্তর ক্রোচে দেননি।

৫। শিল্পের বাহ্য প্রকাশ না ঘটলে একজন শিল্পী মানুষের পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধির কোনও পরিচয় আমরা পাই না। সে যতই জ্ঞানের সাগর হোক না কেন।

৬। শিল্পের বাহ্যরূপ না থাকলে কি করে পাঠক অনুপ্রাণিত হবেন, তার নির্দেশ ক্রোচে দেননি। শিল্পের বাহ্যরূপ নাকি সমালোচকের অনুভূতি উদ্দীপিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এই সমালোচক যখন 'দান্তে' বা 'রবীন্দ্রনাথ' পড়বেন তখন তিনি নিজেকে তাঁদের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এটা এক দুরূহ ব্যাপার। আসলে ক্রোচে তাঁর অভিব্যক্তি তত্ত্বকে পরিণতি দিয়েছেন এক রহস্যময় নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা সঙ্কুলতায়।

৫.৪.১৬.৪ : নান্দনিক ভাবনায় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়জন নন্দনতত্ত্ববিদ সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ক্রোচে, এবং ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের জীবৎকাল ও মতাদর্শ বিচার করে বলা যায় এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। তবে নন্দনতত্ত্ব বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

১। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় স্বজ্ঞা বা জ্ঞান ও তার প্রকাশ। স্বজ্ঞাকে তিনি প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলেছেন। এ সংবেদন, উপলব্ধি ও অনুষঙ্গ থেকে স্বজ্ঞাকে তিনি পৃথক করেছেন। তিনি বলেছেন স্বজ্ঞা হল বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝখান থেকে উঠে আসা প্রকাশধর্মী জ্ঞান। এই স্বজ্ঞা যখন বাহ্যরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখন শিল্প সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রোচে আবার বলেন—মানসলোকে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার প্রভাবেই সৃষ্টি হয় শিল্প বা কাব্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—'প্রকাশই কবিত্ব', অর্থাৎ তিনি শিল্পের বাহ্য রূপকে স্বীকার করে নিলেন। এখানেই ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য। ক্রোচে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার উন্মেষে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার' বাহ্যিক প্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। ক্রোচে বিষয় ও আঙ্গিককে একই সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকিলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না।"

২। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 'টেকনিক'কে স্বীকার করে বলেছেন, সাহিত্যের মহামূল্যবান জিনিস প্রকাশের গুণেই সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রোচে টেকনিককে গুরুত্ব দেননি।

৩। ক্রোচে বাহ্যপ্রকাশকে স্বীকার না করায় পরোক্ষভাবে তিনি সাহিত্যের রূপভেদকেও অস্বীকার করলেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বাহ্যপ্রকাশ ও রূপভেদকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে স্বীকার করে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পকে মিলিয়ে দিলেন। ফলে শিল্পের সঙ্গে ক্রেতা, পাঠক, দর্শকদের মেলবন্ধন ঘটল। তিনি বললেন সাহিত্যের কাজ হল মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। যা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে আমরা পাই না। সত্য ও জ্ঞান দিয়ে কিছু সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু আনন্দ দিয়ে নতুন কিছু সৃজন হয়। আর সৃজন মানেই তার প্রকাশ।

উদ্বৃত্তহীন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গেই হারিয়ে যায়। যারা কালজয়ী শিল্পী, স্রষ্টা তারা বেঁচে থাকেন। কারণ তাদের মধ্যে আছে নিজত্ব ও বহুত্ব। বহুত্ব অর্থাৎ শিল্পীর সৃষ্টি তাকে অমরত্ব দান করে। তাই আনন্দই শিল্পের শেষ কথা। আনন্দই শিল্প সৃষ্টি করে। আনন্দ দু প্রকার—

ক. আনন্দ

খ. বিশুদ্ধ আনন্দ।

পার্থিব যে আনন্দ তা প্রয়োজনাত্মক। আর পার্থিব ভোগ, বিলাস থেকে মুক্তির আনন্দই বিশুদ্ধ আনন্দ। যা দেশ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যা সকল দেশের সকল মানবের।

৫। ক্রোচের মতে শিল্প, সত্য, আনন্দ feeling-এর সমার্থক। তিনি আরও বলেন Art : Intuition, Imagination, Expression, Fancy, Beauty সবই সমার্থক। এরপর বলেন যেহেতু Art হল অনুভূতির ফল, তাই তাও Non Cognative, কেননা জ্ঞান বা ধারণার দ্বারা বিচার করা যায় না। একথা ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তথ্যের দ্বারা সত্যের উন্মোচনই হল প্রকাশ। তথ্য বলতে ক্রোচের Cognative-কে বুঝিয়েছেন। আর সত্য বলতে বুঝিয়েছেন Non Cognative-কে। প্রকাশের সঙ্গে তথ্য থাকা দরকার।

সুতরাং বলা যেতে পারে যাতে তথ্য আছে। সত্য আছে সেটা তো জ্ঞান ও ধারণা সংক্রান্ত। তাহলে শিল্প, সাহিত্যকে Non Cognative বলা কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেন যাকে আমরা হৃদয় জ্ঞান মনীষা দিয়ে জানি তাই সত্য। তিনি দু রকম সত্যের কথা বলেছেন—1. Truth 2. Aesthetic Truth. অর্থাৎ নান্দনিক সত্য। এই সত্যই শিল্প বা সাহিত্যের সত্য, যা আমাদের আনন্দ দেয়।

৬। ক্রোচে কখনওই সাহিত্যের রূপরীতিকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সাহিত্য মানেই মানব মনের বোধের প্রকাশ। তাই কাব্য, নাটক, মহাকাব্য শিল্পের বাহ্যরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের মন বৈচিত্র্যময়। মানুষ পেতে চায় মহাজীবনের স্বাদ তাই তিনি সাহিত্যের রূপরীতিকে স্বীকার করেছেন।

ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনাগত সাদৃশ্যে বলা যায়—

ক. একজন শিল্পীর তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের প্রভাবের অনুসন্ধান ক্রোচে পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে।"

খ. ক্রোচে এবং রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিল্পীরা ঈশ্বরের কারুশালা থেকে রং-রস চুরি করে প্রতিমা গড়েন। সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব হয়েও রসোত্তীর্ণ। ক্রোচের কাছে শিল্প Super World-এর বস্তু।

গ. ক্রোচে সৌন্দর্যকে সত্য বা মিথ্যা বলেননি। তিনি মনের সক্রিয়তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তা স্বীকার করেছেন।

৫.৪.১৬.৬: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব : সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনূদিত (দে'জ পাবলিশিং)

২। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দে'জ পাবলিশিং)

৩। সাহিত্য বিবেক : ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দে'জ পাবলিশিং)

৪। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ : অধ্যাপক রামেশ্বর শ (পুস্তক বিপণি)

৫। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (পঞ্চম সংখ্যা) : (ক্রোচে ও তার নন্দনতত্ত্ব : অধ্যাপক রামেশ্বর শ)

৬। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (দ্বিতীয় সংখ্যা) : (সৃষ্টি চৈতন্য বনাম যুগ পরিবেশ: একটি নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা: ড. রামেশ্বর শ)

৫.৪.১৬.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনার পরিচয় দাও।

২। প্রকাশবাদ কী ? ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করো।

৩। 'আর্ট' বলতে ক্রোচে ঠিক কী বুঝিয়েছেন ? নন্দনতত্ত্বের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। নান্দনিক ভাবনার দৃষ্টিতে ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করো।

———

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

ষষ্ঠ পত্র

তুলনামূলক সাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক তাপস বসু - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায় - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

ষষ্ঠ পত্র

শিরোনাম : তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য

একক ২. মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস

একক ৩. মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

একক ৪. নিসর্গচেতনা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ মেঘদূত (উত্তরমেঘ) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. বিরহভাবনা

একক ৬. কাব্যের চরিত্র

একক ৭. ছন্দ-উপমা

একক ৮. পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৪ র্থ অঙ্ক) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. কবি-নাট্যকার কালিদাস

একক ১০. নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

একক ১১. নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

একক ১২. চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)

একক ১৪. অনুকরণ তত্ত্ব

একক ১৫. কমেডি

একক ১৬. ট্রাজেডি

সূচিপত্র

ষষ্ঠ পত্র

ষষ্ঠ পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১ ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস	১.	কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	১-৬
	২.	মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬-৭
	৩.	মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৭-১০
	৪.	নিসর্গচেতনা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	১০-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২ মেঘদূত (উত্তরমেঘ)	৫.	বিরহভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩১-৩৪
	৬.	কাব্যের চরিত্র	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৪-৩৫
	৭.	ছন্দ-উপমা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৫-৩৮
	৮.	পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৮-৫২
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্	৯	কবি-নাট্যকার কালিদাস	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৫৩-৫৮
	১০	নাটকের কুশীলব (চরিত্র)	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৫৮-৬০
	১১	নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬০-৬৪
	১২	চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬৪-৯৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স	১৩	অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৯৬-১০১
	১৪.	অনুকরণ তত্ত্ব	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০১-১০৩
	১৫.	কমেডি	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০৩-১০৬
	১৬.	ট্রাজেডি	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০৬-১২৫

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস)

একক ১. কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য

বিন্যাস ক্রম ঃ

৬.১.১.১ ঃ বিষয়সূচী (পূর্বমেঘ)

৬.১.১.২ ঃ কালিদাস প্রতিভা ঃ কবি ও কাব্য

৬.১.১.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.১.১ ঃ বিষয়সূচী (পূর্বমেঘ)

বিষয়	শ্লোক	বিষয়	শ্লোক
বিরহী যক্ষ		শিপ্রা	৩২
ও রামগিরি	১-৫,১২	ললিতবনিতা	৩৩
মেঘ	৬-৯,১৫	গন্ধবতী	৩৪
অলকা পরিচয়	৭	মহাকাল	৩৫-৩৭
পথিকবনিতা	৮	অভিসারিকা	৩৮
যক্ষবধূ	১০	ভবনবলভি	৩৯
মেঘসহচর রাজহংস	১১	কমলবন	৪০
শুভযাত্রা	১৩	**পুনর্যাত্রা**	
সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা	১৪-২২	গম্ভীরা (নদী)	৪১-৪২
ইন্দ্রধনু	১৫	দেবগিরি	৪৩-৪৫
জনপদবধূ	১৬	চর্মণ্বতী (নদী)	৪৬-৪৭
আম্রকূট	১৭-১৮	দশপুর	৪৮
রেবা	১৯-২০	**ব্রহ্মাবর্ত** (জনপদ)	
সারঙ্গ	২১	কুরুক্ষেত্র	৪৯
ময়ূর	২৩	সরস্বতী	৫০
দশার্ণ জনপদ	২৪	**কনখল থেকে আলকা**	
বেত্রবতী নদী	২৫	গঙ্গা	৫১-৫২
নীচৈঃ গিরি	২৬-২৭	হিমালয়	৫৩-৫৭
উজ্জয়িনী-পথে		ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম বা	
উজ্জয়িনীর সূচনা	২৮	হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র	৫৮

নির্বিন্ধ্যা	২৯	কৈলাস	৫৯-৬৩
সিন্ধু	৩০	অলকা	৬৪
শ্রীবিশালা (বিশালা) বা উজ্জয়িনী	৩১		

৬.১.১.২ ঃ কালিদাস-প্রতিভা ঃ কবি ও কাব্য

অনন্ত রত্নপ্রভব প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা নেই। কত রাজা-মহারাজা, রাজ্য-রাজধানী, প্রাকৃতিক, দার্শনিক, অধ্যাত্ম ও সারস্বত ঐশ্বর্যে পূর্ণ তার অন্তর। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণবন্ত নিদর্শনে ঋদ্ধ তার হৃদয়। সেই হৃদয়কে, তার আত্মাকে যিনি দিব্য ও অনন্ত সত্যে প্রসারিত করেছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাসক মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে তিনি বিশ্ববরেণ্য। আদি কবি বাল্মীকির পর সংস্কৃত সাহিত্যে এতবড় প্রতিভা তাঁর সমকালে কেবল ভারতে নয় সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশে আর জন্মায়নি। এই ধারার শেষ প্রতিভা, বোধকরি প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—শুদ্ধ সন্দর্ভ রচয়িতা—'কবিনৃপচক্রবর্তী', গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী।

প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণদীপ্ত এক সুমঙ্গল জীবনাদর্শের দ্রষ্টা-স্রষ্টা ও উপভোক্তা ছিলেন কালিদাস। সুনীতি-সুরুচিসমুজ্জ্বল এক সুনির্মল-প্রশান্ত জীবনবোধের ভাষ্যকারও ছিলেন তিনি। বস্তুত চিরায়ত কাব্যের (Classic Poetry) যা কিছু গুণৈশ্বর্য ও মহিমা তা তাঁর সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠক-পাঠিকার অন্তরে। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বজনীন কবি—বিশ্বকবি (The Poet of the Universe)।

কোনো কোনো সমালোচক কালিদাসকে যুগন্ধর কবিরূপে সম্মান দান করলেও সাহিত্যে তাঁর যুগাতিশায়িতার দিকটি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর মতো মহৎ ও বিরল প্রতিভাকে কোনো সংকীর্ণ সীমায় আটকে রাখা যায় না, রাখা চলেও না। এই জাতীয় একপেশে-সংকীর্ণ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সমঝদার সমালোচকদের কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্যের উল্লেখই যথেষ্ট। 'হরিহরাবলী'তে প্রাচীন কবির্মণীষীদের তালিকায় একমাত্র কালিদাসকেই প্রকৃত কবি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে—

"পুরা কবীনাং গণনা-প্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতঃ কালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্য কবেরভাবাৎ
অনামিকা সার্থবতী বভুব।।"

মহাকবি বাণভট্ট থেকে শুরু করে কবি জয়দেব, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ কালিদাস প্রশস্তিতে মুখর। জয়দেবের দৃষ্টিতে তিনি 'কবিকুলগুরু', মধুসূদনের কাছে তিনি 'পিককুলপতি' আর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বোধে তিনি ছিলেন চিরকালের কবি—'কবিপতি'। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে ভারতাত্মার প্রতিনিধি—'ভারত পথিক' রূপে গ্রহণ করেছেন।

কেবল প্রাচ্যদেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা রূপে স্বীকৃতিধন্য হয়েছেন কালিদাস। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব স্যার উইলিয়ম জোন্স-কর্তৃক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় আংশিক রূপান্তর (১৭৮৯) ও ১৮১৩ সালে হোরেস হে ম্যান উইলসন-কর্তৃক 'মেঘদূতম্'-এর ইংরেজী কাব্যানুবাদ মহাকবি কালিদাসকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলে। অতপর কালিদাসের সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ভারতীয় রসলোকের সন্ধানে বিস্ময়বিমূঢ় অনেক বিদগ্ধ কবি-দার্শনিক-সমালোচক প্রাচ্য সাহিত্যের অমৃতরসলোকে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, মুখর হয়েছেন কালিদাস প্রশস্তিতে। হ্যামবলডট্, গ্যায়টে, ডঃ রাইডার, ডঃ সিলভ্যাঁ লেভি, মনিয়ের উইলিয়মস্, ম্যাক্সমূলার, কীথ, উইনটার-নিৎসজ, অধ্যাপক ল্যাসেন প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রচনাবলী ঃ

কালিদাসের রচনাবলীরূপে চিহ্নিত ও সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা মূলত সাত। এদের মধ্যে কাব্য চারখানি এবং সেগুলি যথাক্রমে 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', ও 'রঘুবংশ' এবং নাটক তিনখানি যথাক্রমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়', ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'।

কালিদাসের কাল ঃ

কালিদাসের সাহিত্যরসমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

সকল বিচার-বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের রসেই আকণ্ঠ তৃপ্ত থাকার বাসনা প্রকাশ করে উত্তমর্ণ কবির ঐশ্বর্য-গৌরবময় ভাবজগতের রহস্যঘেরা কল্পলোকে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একালের আধুনিক গীতিকবির নবরত্নের মালায় 'দশম রত্ন' হয়ে ফুটে ওঠার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্তই বায়বীয় আবেগপ্রসূত, নাকি এক বিশেষ কালের বিশেষ কবির মানস-বিকাশের পরিপ্রেক্ষা-আশ্রিত? রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যাইহোক না কেন, মহাকবি কালিদাস কোন্ বিশেষ যুগের সৃষ্টি এবং কোন্ সাহিত্য অনুরাগী নরপতি ও রাজসভা তাঁর মতো অমূল্য রত্নকে ধারণ করে ধন্য হয়েছিল—এনিয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুতরাং, কালিদাস ও তাঁর আবির্ভাব কাল, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহে পণ্ডিতকুল বিচিত্রমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সেই সকল

পরস্পর বিরোধী মতবাদের সরল সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তাই পণ্ডিতবর্গের কূট-তর্কজালের নিবিড় অরণ্যে পথ না হারিয়ে কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।—

(১) পণ্ডিত হিপ্পোলিতে ফৌস (Hippolyte Fauche)—এঁর মতে কালিদাস খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কবি এবং রঘুবংশীয় নরপতি অগ্নিবর্ণের সমসাময়িক।

(২) ডঃ সি. কানহন্ (Dr. C. Kunhan), সারদারঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে শুঙ্গবংশীয় নরপতি অগ্নিমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের কবি বলে মনে করেন।

(৩) উইলিয়ম জোন্স, সি. এস. পাণ্ডে, বি. ডি. উপাধ্যায়, এম. আর. কালে, আর. এন. আপ্তে, আর. ডি. কর্মকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জি. এস. হীরাচাঁদ ওঝা, কে. পি. মিত্র, ডঃ রাজবলি পাণ্ডে প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে খ্রিঃপূঃ প্রথম শতকের কবি বলে মনে করেন। এঁরা সকলেই পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য সহযোগে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কালিদাস ছিলেন কিংবদন্তীখ্যাত উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নরপতি বিক্রমাদিত্যের রাজসভাকবি। বিক্রমাদিত্য খ্রিঃপূঃ ৫৭ অব্দে শকদের পরাজিত করেন এবং স্বনামে 'বিক্রমসংবৎসর' চালু করেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাসসম্মত নয়।

(৪) অধ্যাপক ল্যাসেন ও ডঃ ওয়েবারের বিশ্বাস, কালিদাস খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক।

(৫) ডঃ এ. বি. কীথ মনে করেন, কালিদাস খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কোনো সময়ে হূন-বিজেতা ইতিহাসখ্যাত উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্যে'র রাজত্বকালে (খ্রিঃ ৩৮০-৪১৩) আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। এই দুই নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। ডঃ ব্যুলার, স্মিথ, প্রিন্সেপ ম্যাকডোন্যাল, ডঃ ডি. সি. সরকার, উইনটারনিৎসজ্, স্টেনকনৌ, লাইবিস, টি. ব্লঁস, পণ্ডিত রামাবতার শর্মাচার্য প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণের অনেকেই এই মতের সমর্থক। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট এই মতই এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত।

(৬) ডঃ ফার্গুসন কালিদাসের জীবৎকালকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। ডঃ হোর্নলি, ভউ দাজী (Bhau Daji), কার্ন, ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর, ম্যাক্সমূলার, কে. বি. পাঠক প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল কালিদাসকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কবি বলে মনে করেন।

যাইহোক, কালিদসের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হল এই যে কালিদাস গুপ্তযুগের খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কবি এবং খুব সম্ভবত কিংবদন্তীর জনপ্রিয় মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (৩৮০-৪১৩ খ্রিঃ) ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়া ও হূণ বিজয়ের উল্লেখ, 'মালবিকাগ্নিমিত্রে',

পূর্বসূরী অথবা সমসাময়িক দার্শনিক মনীষী ধাবক, সৌমিল্লক, কবিপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ, বৎসভট্টির দশপুর প্রত্নলেখে (৪৭৩ খ্রিঃ) কলিদাসীয় রচনাশৈলীর অনুসরণ ও কুমারগুপ্তের জন্মোৎসবের ভাবছায়ায় 'কুমারসম্ভব' রচনা, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রস্তরলিপিতে (Aihole Inscription) যশস্বী প্রাচীন কবিদের নামের সঙ্গে কালিদাসের নামোল্লেখ এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে (খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দী) কালিদাস প্রবর্তিত বৈদর্ভী রীতির অনুসরণ প্রভৃতি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে কালিদাস গুপ্তযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

গুপ্ত যুগ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। জ্ঞানে-গরিমায়, ঐশ্বর্যে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসন-শৃঙ্খলায়, শৌর্যে-বীর্যে, সর্বোপরি দর্শন-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রদীপ্ত গুপ্তযুগ—ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট হিন্দু সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের পরিচয়ে ভাস্বর এই যুগ কালিদাসের রসচিকীর্ষার পথকে উজ্জীবিত ও প্রশস্ত করেছিল। একটা পরম ঐশ্বর্যময়, জীবনবাদী ও সম্পন্ন কালের পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে জীবনরসের নিবিড়তা আমাদের এমন করে টানে।

একক - ২

মেঘদূত কাব্যের ভাব উৎস

বিন্যাসক্রম

৬.১.২.১ মেঘদূত' কাব্যের ভাব উৎস

৬.১.২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৬.১.২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৬.১.২.১ঃ মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস

কালিদাসপূর্ব যুগে 'মেঘদূত' একখানি অশ্রুতপূর্ব কাব্য এবং সে কাব্যের অভিধা 'দূতকাব্য'। প্রাচ্য মহাদেশের তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের প্রথম অপূর্বসৃষ্ট দূতকাব্য মেঘদূত। এছাড়া আরও একদিক থেকে মেঘদূত বিরল সম্মানের অধিকারী, আর তা হল এই যে এই কাব্যটিই বিশ্বের প্রথম রোমান্স ও লিরিকধর্মে প্রজ্জ্বল গীতিকাব্য (Romantic-Lyric Poetry)।

বস্তুত 'মেঘদূত' দূতকাব্যরূপে অভিনব হলেও তা 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে ওঠেনি। কেননা তার একটা পূর্বৈতিহ্য আছে। বৈদিক সাহিত্যে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানবধর্ম আরোপ করার রীতি প্রচলিত ছিল। এই সূত্রে "মেঘ ও বর্ষার নিবিড় রসঘন অনুষঙ্গ ঋষিকবিকে মুগ্ধ করেছিল। বায়ুবাহিত জলভারনত মেঘের বিদ্যুৎবিলাস, ভৈরবগর্জন, বর্ষণসিক্ত বসুন্ধরার বুকে জলাশয়ে প্রমত্ত দাদুরীর উল্লম্ফন ও ঐকতান-সঙ্গীত কবিদৃষ্টিতে যে রসাপ্লুত করেছিল তার পরিচয় পাই অথর্ববেদে।" তবে "নিসর্গ প্রকৃতি ও মানবেতর প্রাণীদের এমনিভাবে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার মুহূর্ত বৈদিক সাহিত্যে সুলভ হলেও তাদের দিয়ে দৌত্যকার্য সাধনের পরিচয় সেখানে নেই।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', ২য় সং, কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

পুরো কাব্যরূপে না হলেও ভাবগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে মেঘদূতের বীজ রামায়ণে ও মহাভারতে পাওয়া যাবে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (সর্গ ২৮ /৭) ও সুন্দরকাণ্ডে (সর্গ ৩৩-৪০) বর্ষার অনুষঙ্গে সীতাবিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক সীতান্বেষণে হনুমানকে প্রেরণের ঘটনা এর দৃষ্টান্ত। রামায়ণের 'কপিদূত-সংবাদ'-এর পাশেই মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নল-প্রেমমুগ্ধ দময়ন্তী হংসদূতের মাধ্যমে তাঁর বিরহের বার্তা প্রেমিকপ্রবর নলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

মহাকাব্যের এই দুটি আখ্যান কালিদাসের মেঘদূতের ভাবপ্রেরণারূপে কাজ করেছিল বলে মনে হয়। তবে মেঘদূত কাব্যের প্রখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ, পূর্ণসরস্বতী, বল্লভদেব, দক্ষিণাবর্তনাথ প্রমুখ মেঘদূতের ভাব-উৎসরূপে মহাভারতের নলোপাখ্যান নয়, রামায়ণের কপিদূত প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে মৎপ্রণীত 'মেঘদূত-জিজ্ঞাসা' (২য় সং) থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে—

"স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মহাকবি বাল্মীকি কপিদূতের মাধ্যমে সীতান্বেষণ ও রাবণ-কবলিত সীতা উদ্ধারের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। মেঘদূতের উৎসমূলে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'হনুমৎসন্দেশ'-এর ভাবছায়া বর্তমান। বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যা ছিল ছায়াশরীর, কালিদাসের উদাত্ত-মহিমান্বিত কল্পনায় তা রঙে-রসে সমুজ্জ্বল মৃণ্ময় কায়াশরীর লাভ করেছে, জন্মলাভ করেছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিরহদীর্ণ রোমান্টিক প্রণয়গাথা মেঘদূত। পূর্বসূরির গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও বাল্মীকির ভাবনাকে একটু ভেঙেচুরে বৈচিত্র্য-বিস্তারে নিপুণভাবে সাজিয়ে নির্মাণ করেছেন মেঘদূত কাব্যের বাক্‌প্রতিমা। তাতে অনাবৃত হয়েছে নিসর্গ-প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যপ্রতিমা। এমনিভাবে চিরপুরাতন চিরনতুনের বাণীবহ হয়ে ওঠে শিল্পীর স্বতন্ত্র ব্যবহারিক প্রকরণে। ওই রসশাস্ত্রের কথাই প্রতিষ্ঠিত হল—'ব্যবহরয়তি সুকবি কাব্যেষু স্বতন্ত্রতয়া'। এমনি করেই একের ভাব অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে প্রতিভার প্রাণবত্তায় নবসৃষ্টিরূপে ভাস্বর হয়ে ওঠে। .... বাল্মীকির কপিদূত ভাবনার কালিদাসীয় মেঘদূত কল্পনায় উত্তরণ কবিপ্রতিভার মৌলিকতাই সূচিত করে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', ২য় সং, পৃঃ ১৬—-কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

কাব্যে মানবেতর প্রাণীদের দিয়ে দূতের কাজ করালে তা 'অযুক্তিমদ্‌দোষ' হয় বলেছেন কালিদাস-পূর্ব আলঙ্কারিক ভামহ। কালিদাস শিল্পীর স্বাধীনতার উপর এরূপ বিধিনিষেধকে মানেননি, 'মেঘদূত' রচনা করে তাঁর প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন। চিরায়ত এই যুগজয়ী কাব্যের অনুকরণে 'কপিদূত', 'পিকদূত', 'হংসদূত', 'ইন্দুদূত', 'চন্দ্রদূত', 'পদাঙ্কদূত', 'পবনদূত' প্রভৃতি অসংখ্য দূতকাব্য রচিত হয়েছে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মেঘদূত' কাব্যের উৎস-সন্ধান প্রসঙ্গে প্রাচীন চীনীয় কবিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব যুগের কবি Kiu Yuan (or Chu Yan–274 BC) ও কবি Hsii Kan-এর কাব্যে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা-কর্তৃক জায়মান মেঘকে সম্বোধন করে দূর প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে প্রেমের বার্তা-নিবেদন প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু বিদগ্ধ সমালোচক উল্লিখিত এই প্রসঙ্গের কোনো প্রভাব 'মেঘদূত'-এর উপর পড়েছিল এমন অনুমান ইতিহাসসম্মত ও যৌক্তিক নয়।

একক - ৩

মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

বিন্যাসক্রম

৬.১.৩.১ মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা
৬.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.৩.১ : মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

মানবিক অনুভূতির বিশেষ এক প্রকাশরূপ হল কাব্য। আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ'-এ ভাবপ্রকাশের বিচিত্র রূপ ও রীতিকে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজিত করে দেখিয়েছেন 'অস্ত্যন্যেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্' বলে। কবির আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ ও রীতিকে

আশ্রয় করে গড়ে ওঠে কাব্যের দেহরূপ ও আত্মরূপ। দেহরূপের বিচারে কাব্যের গঠনশৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলি এবং আত্মরূপের বিচারে রসবোধ সমাচ্ছন্ন কবিচিত্তের আনন্দময় প্রকাশরূপ প্রাধান্য পায়। কাব্য-বিশ্লেষণে প্রথমটিকে কাব্যের অভিধা এবং দ্বিতীয়টিকে কাব্যের ব্যঞ্জনা নামে চিহ্নিত করা চলে।

"কাব্যের দেহরূপের প্রকরণগত শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে প্রাচীনকালে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি প্রত্যক্ষগম্য বলে তা তৃপ্ত করে আদৌ দর্শক-শ্রোতার দর্শনেন্দ্রিয়কে, পরে তদতিক্রমী মননেন্দ্রিয়গুলিকে। অন্যদিকে শ্রব্যকাব্য পাঠ বা শ্রুতিনির্ভর বলে তার আবেদন স্বতন্ত্র। মেঘদূত দৃশ্যকাব্য নয়, শ্রব্যকাব্য। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী শ্রব্যকাব্যের মূল তিনটি শাখা যথাক্রমে মহাকাব্য, কোষকাব্য ও খণ্ডকাব্য। এছাড়াও রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও শ্রব্য মহাকাব্যের পাঁচটি শাখা যথাক্রমে মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক ও কুলক। অনুরূপভাবে দুই-তিন-চার ও পাঁচ শ্লোকের সমন্বয়ে রচিত কবিতাগুলি যথাক্রমে মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক ও কুলক নামে চিহ্নিত।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

যাইহোক, **'মেঘদূত'কে** মহাকাব্য বলা চলে না, কেননা মহাকাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তা মেলে না। ভারতের রামায়ণ-মহাভারত এবং ইউরোপের ইলিয়াড ও ওডিসি—-বিশ্বের চারটি মহৎকাব্য ঘটনার ঘনঘটায়, ভাব-ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্যে বৈচিত্র্যময় সর্গবন্ধ রচনায়, নীতি ও আদর্শের জয়গানে, রহস্যে-রোমাঞ্চে, জীবনমুখিতায় মুখর মহাকাব্য এক অতুলনীয় সম্পদ এবং ভাবীকালের জাতীয় জীবনধারা ও সাহিত্য ভাবনার নিয়ন্ত্রক। অবশ্য দণ্ডীর মতো রক্ষণশীল আলঙ্কারিকও মহাকাব্যের কঠোর নিয়মবন্ধন শিথিল করে রমণীয়তা ও রসনীয়তায় পূর্ণ আস্বাদনীয় কাব্য মেঘদুতকেও মহাকাব্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কোষকাব্য বলতে এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্যকে বোঝায় যা পরিসরে ক্ষুদ্র, রসসংবেদনশীল এবং মহাকাব্যের মতো বিষয়বস্তুর জটিলতা বর্জিত। কবি-নরপতি সাতবাহন হালের প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'গাহাসওসঈ' (গাথাসপ্তশতী), এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী', কুসুমদেবের 'দৃষ্টান্তশতক', কালিদাসের 'শৃঙ্গারশতক', সংকলনগ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি এই কাব্যের দৃষ্টান্ত।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিধৃত স্বল্পপরিসর, খণ্ডিত, অল্পবিস্তর মহাকাব্যের লক্ষণ-সমন্বিত, অনধিক আট সর্গে রচিত কাব্যকে বলে **'খণ্ড কাব্য'**। এই সূত্রে অনেকে মেঘদূতকে 'খণ্ডকাব্য' বলে মনে করেন। রসজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মেঘদূতকে খণ্ডকাব্য বলেই মনে করেছেন। তবে খণ্ডিতকাব্য বলে নয়, শর্করা বা মিছরি খণ্ডের মতো সুমিষ্ট, রসনীয় ও আস্বাদনীয় বলে।

প্রাচীন কাব্যের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলঙ্কারিক **'সংঘাত'** নামে একপ্রকার কাব্যের কথা বলেছেন। এই শ্রেণীর কাব্যের বিশেষত্ব হল, একটিমাত্র বিষয়ের একটিমাত্র ভাষা-ছন্দে বর্ণনা। কবি মানাঙ্ক-রচিত 'বৃন্দাবন-যমক' (মাত্র ৪৩ শ্লোকে সমাপ্ত) ও কালিদাসের 'মেঘদূত' (বাদে ১১৮ শ্লোকে সমাপ্ত) 'সংঘাত' কাব্যের কক্ষায় পড়ে। এঁদের বিচারে মেঘদূত "একটিমাত্র বিষয় ও ছন্দ-নির্ভর বর্ণনাত্মক রচনা। বিশেষত মেঘদূতের বিষয় একটাই—বিরহী যক্ষের বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা (নস্টালজিয়া), এর

ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত এবং ছন্দ আদ্যন্ত মন্দাক্রান্ত। সুতরাং মেঘদূতকে প্রাচীনের বিচারে নিঃসংশয়ে 'সংঘাত কাব্য বলা যেতে পারে।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

'মেঘদূত' কাব্যের জাতিনির্ণয় প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনা প্রাচীনের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কাব্যের বিচার। আধুনিক যুগে কাব্যবিচারের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে। তাই আধুনিক বিচারে মেঘদূত **গীতিকাব্য** (Lyric Poetry) ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রিক, সংবেদনশীল, ভাবঋদ্ধ কবিমানসের বাঙ্ময় প্রকাশরূপকে এক কথায় গীতিকবিতা বলতে পারি। গীতিকাব্যের ও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা—Ode, Elegy, Monody, Sonnet প্রভৃতি। মেঘদূতকে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না কেননা ভাব, বিষয়বস্তু ও রসাবেদনের দিক থেকে এগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

আধুনিক গীতিকাব্য মূলত তন্ময় (Objective) ও মন্ময় (Subjective)—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বস্তু আশ্রয়ী ও ব্যক্তি আশ্রয়ী যে ধরনের গীতিকবিতা / গীতিকাব্যই হোকনা কেন, তার মধ্যে ব্যক্তি কবির হৃদয়ের রঙ, হৃদয়ের স্পর্শ থাকা চাই। "কবির ব্যক্তি-অহং (Ego বা Self) থেকে উৎসারিত ভাবনা (Intense Personal Emotion) ব্যক্তিচিত্তের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনের রসবোধের অনুকূল হয়ে ওঠে; ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে ধ্বনিত হয় অব্যক্তের সুরমূর্ছনা। স্বল্পাবয়বে বিধৃত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস ও অন্তর্গূঢ় অনুভূতির প্রকাশে সমুজ্জ্বল কবিতামাত্রকেই বলতে পারি গীতিকবিতা।" (মেঘদূত জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) ব্যক্তিচেতনা নির্ভর গীতিকবিতা আবার কখনো কখনো আত্মচেতনাকে আড়ালে রেখে সমষ্টিচেতনার (Group Consciousness) দ্যোতক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "কবিহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবানুভূতির নিবিড়তায়, ভক্তহৃদয়ের আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় এই দুই সম্প্রদায়ের কাব্য সর্বজনীন সমাদর লাভ করেছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতিতে গীতিকবিতার কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ বৈকুণ্ঠের গানের আড়ালে কবিহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঠিক অনুরূপভাবে মেঘদূত কাব্যেও যক্ষের কামনা-বিলাসের অন্তরালে কালিদাসের কবিকণ্ঠই মুখর হয়ে উঠেছে; স্পন্দিত হয়েছে কবিরই হৃদয়। আপন সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মাধুরীমিশ্রিত সত্তার যোগে, মন্ময়তার স্পর্শে ব্যক্তি যক্ষের হৃদয়ার্তি বিশ্বের প্রবাসী প্রিয়জনের চিরন্তন বিচ্ছেদার্তির রূপক হয়ে মেঘদূতকে আধুনিক গীতিকাব্যের কক্ষায় উন্নীত করেছে। .... কবিহৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনাই যেন মেঘপক্ষ ভর করে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো উড়ে যেতে চায় কামনার মোক্ষধাম অলকার দিকে। তাই মেঘদূতে যক্ষের বিচ্ছেদ-ক্রন্দন ও মিলনার্তি আসলে কবির অন্তরাত্মারই আকুল ক্রন্দন, সীমাবদ্ধ জীবন থেকে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে মুক্তির জন্য ক্রন্দন। মেঘদূতে যক্ষের ভাবছায়ায় কবিচিত্তের 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন'-এ সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে এবং কবিভাবনার ব্যাপ্তি ও তন্ময়তার স্পর্শে মেঘদূত হয়ে উঠেছে খাঁটি গীতিকাব্য, ...সাধারণ গীতিকাব্য নয়, রোমান্টিক গীতিকাব্য।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

আর শেষ কথা হল এই যে, যে আদর্শায়িত, অবাস্তব ও মনোহর স্বপ্নকল্পনার ভাবজগৎ কবি সৃষ্টি করেছেন—সেও তো কবির আত্মকামনারই ছায়ারূপ। "সেই উন্মুখ কামনার ছায়াপাতে রেবা, নির্বিন্ধ্যা,

সিন্ধু, গম্ভীরা প্রভৃতি পরিকল্পিত হয়েছে। সেই অন্তরলালিত বাসনার আলোকে যে জীবন, তার স্বরূপ বস্তু জগতে নেই, তা অবাস্তব, মনোহর এবং আছে মানসলোকে—

"আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ।

নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ॥"

—এই মাটির পৃথিবীতে থাকে না, থাকে কবির কল্পলোকে, Idea বা ভাবের জগতে। মেঘদূত এখানে একটা ভাবের জগৎ সৃষ্টি করে সার্থক গীতিকাব্য হয়েছে।" (মেঘদূত পরিচয়—৩য় সং, পৃঃ ১৬—শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য)।

একক - ৪

মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

বিন্যাসক্রম

৬.১.৪.১ মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

৬.১.৪.২ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১.৪.১ মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

সকল দেশের সাহিত্যেই নিসর্গ বা প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রকৃতি সাহিত্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-এ প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল প্রকৃতি ও মানবাত্মার অভিন্নতার মন্ত্র—'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহং পৃথিব্যাঃ।'—এই মৃত্তিকা আমার মা, আমি এই ধরিত্রীর সন্তান। সাহিত্যে প্রকৃতি যেভাবে ধরা দিয়েছে মননশীলতার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন দেশ-কালে, তা থেকে নিসর্গ সন্দর্শনের পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের ধারাটি রয়েছে অব্যাহত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতিকে কখনো জড়সত্তা রূপে, আবার কখনো বা চৈতন্যময় সত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রকৃতি সেখানে কখনো নিছক ভাব-উদ্দীপনের সহায়ক বিভাব, আবার কখনো মানবিক গুণৈশ্বর্যমণ্ডিত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে উজ্জীবন্ত। একপ্রকার স্নিগ্ধ-প্রশান্ত-করুণার্দ্র অনুষঙ্গরূপে তার ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্যের বিশিষ্টতা। নিসর্গ-প্রকৃতি ভারতীয় চেতনায় হিংস্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে কখনো ফুটে ওঠেনি।

সাহিত্য সমালোচক Abercrombie সাহিত্যে প্রকৃতি-আশ্রিত ভাবনার উত্তরণের স্তরগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভাজিত করে বিষয়টি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'An outline of Modern Knowledge' গ্রন্থের 'Principles of Literary Criticism' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রকৃতি ভাবনার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। স্তরগুলি যথাক্রমে—

(১) Concrete representation of Nature—একে বলা যেতে পারে জড় প্রকৃতির Photographic representation অর্থাৎ জড়প্রকৃতির যথাযথ স্বরূপের চিত্রায়ণ। মহাকাব্যের প্রকৃতিবর্ণনা মুখ্যত এই স্তরের। এতে সাহিত্যিক কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করে এতটুকু এগোতে পারে না।

(২) Humanised representation of Nature—"প্রকৃতি এখানে মানবায়িত ও উজ্জীবন্ত—মানবীয় সুখ, দুঃখ, স্নেহ, প্রেম, করুণা ও পবিত্রতায় পূর্ণ। এই স্তরে প্রকৃতি মানবিক বোধের উদ্দীপনে

বিভাবরূপ কার্যকরী (Pragmatic) ভূমিকা পালন করে। কালিদাস-শেক্সপীয়র প্রভৃতির কাব্য-নাটকে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে।

(৩) Inter penetrative affinity between man and nature—এই স্তরে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবমন অভিন্নসূত্রে গ্রথিত হয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যেই এই ত্রিস্তর প্রকৃতি ভাবনার পরিচয় আছে।

"কিন্তু এছাড়াও প্রকৃতি দর্শনে আরো একধাপ উত্তরণ ঘটেছে ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যে, বিশেষত Wordsworth, Shelley, Keats প্রমুখের কাব্যে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রসাহিত্যে। এই স্তরকে বলা যেতে পারে Idealised representation of nature। এই স্তরে প্রকৃতির আনন্দে উদ্বেল সাহিত্যশিল্পী আপন সত্তার গভীরে একটি ধ্রুব, জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর রসলোক সৃজন করে বস্তুলোক থেকে আদর্শায়িত-সমুন্নত ভাবরসলোকে উত্তীর্ণ হন। প্রকৃতির আনন্দ-উল্লাস, বিস্ময় প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের হর্ষোল্লাস একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করে এক আনন্দ-অমৃতরসায়ন।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষের 'বসন্তবিলাপ' একটা ভাব বা Idea মাত্র। "সেই ভাবের একটানা প্লাবনে মন্থর অথচ গতিশীল মেঘের পশ্চাতে উধাও হয়েছে কবির নিসর্গ-সন্দর্শন। সেই দর্শনের দুর্নিবারতায় ঢাকা পড়েছে যক্ষ ও তার প্রিয়া, মুখ্য স্থান অধিকার করেছে সকল দৃষ্টিনন্দন, মনোমোহন নিসর্গ প্রকৃতি। যক্ষের অন্তঃপ্রকৃতি, তার কল্পনা, আর বাইরের নিসর্গ প্রকৃতি একই কামনাবৃন্তে কল্পবৃক্ষের ফুল হয় ফুটে উঠেছে। পূর্বমেঘের আদি স্তরে বাসনা-কামনার দুর্মর শক্তির বিচিত্র লীলা কবি দর্শন করেছেন। একটির পর একটি দেশ, জনপদ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে কল্পনার মেঘদূত। রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত নিসর্গ-প্রকৃতির কামনামদির রূপের বর্ণনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের কুশলতায় কবি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন বাসনারক্তিম প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন মহিমা। মনের গোপনে জমে থাকা কত অব্যক্ত সুখ-দুঃখের নিবিড় অনুভব, কত হাসি-কান্না, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অপরিম্লান, অনিঃশেষ রূপৈশ্বর্য কবি উজাড় করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। রঙে-রসে-উচ্ছলতায়-ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চারপাশের ভৌমগুলি জীবনচ্ছবিকে—চির জানা-অজানা অথবা চির চেনা-অচেনা, অস্পৃষ্ট জগতের মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। আমাদের অন্তরের সেই দেখাটাকেই কবি প্রকৃতি সান্নিধ্যে নতুন জীবনরসে সঞ্জীবিত করে দেখিয়েছেন। কবি যেন আমাদের অবরুদ্ধ কণ্ঠকেই বাণীরূপ দিয়েছেন সমগ্র মেঘদূত কাব্যে। ..... মেঘদূত একই সঙ্গে মেঘসন্দর্শন এবং মেঘের মধ্যে দিয়ে বিশ্বদর্শন।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

৬.১.৪.১.১ মেঘদূত কাব্যের চিত্রসৌন্দর্য (পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ)

মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘে যক্ষের নির্বাসনস্থল রামগিরি থেকে তার প্রিয় বাসভূমি সুন্দরী অলকাপুরী পর্যন্ত মেঘদূতের যাত্রাপথের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ভূমিকাংশের কয়েকটি শ্লোক বাদে বাকি

শ্লোকগুলিতে বিধৃত হয়েছে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগের জনপদ, রাজ্য-রাজধানী, ভূপ্রকৃতি ও মানবলোকের বিচিত্র বর্ণরূপময় উপস্থিতি। তার প্রতিটি ছবি আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তারা যেন পরস্পর নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ নিপুণ শিল্পীর আঁকা অক্ষয় চিত্রপট। তাই সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা; কেবল চিত্রশালা নয়, সৌন্দর্যশালা। পূর্বমেঘের বিস্তারিত বর্ণনায় মেঘের যাত্রাপথবর্তী বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি-আশ্রিত শোভা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দানের মধ্যে পরিস্ফুট কবির সরস জীবনদৃষ্টিকে মোটামুটি কয়েকটি পর্বে বিভাজিত করে দেখানো যেতে পারে।—(১) শুভ যাত্রারম্ভ, (২) উজ্জয়িনীর পথে, (৩) পুনর্যাত্রা, (৪) ব্রহ্মাবর্ত ও (৫) কনখল থেকে অলকা।

(১) **শুভ যাত্রারম্ভ ঃ** বিরহী প্রেমিক যক্ষ কুটজকুসুমের অর্ঘ্য রচনা করে মেঘকে স্বাগত জানিয়েছে এবং কল্পনায় তার সঙ্গে সৌহৃদ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। অতপর রামগিরির নির্বাসনস্থল থেকে 'অলকা' নামে বসতির উদ্দেশ্যে শুরু হবে মেঘের পথ চলা। সুমন্দ বাতাস, চাতকের কূজন, সরস-কচি মৃণালদণ্ড মুখে আকাশে উড়ে চলা হংস-বলাকা শ্রেণী—নয়নাভিরাম-মনোমোহন এই দৃশ্য হবে তার শুভযাত্রার প্রেরণা। গুরু গুরু মেঘগর্জনে মাটি ফুঁড়ে অজস্র সহস্রে ফুটে উঠেছে শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী ফুল। শস্যশালিনী হয়েছে বসুন্ধরা। "যক্ষের বার্তাবহ মেঘ কেবল যক্ষদূত নয়, সে মঙ্গলেরও দূত। সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের যোগে তার অবারিত যাত্রাপথ হয়েছে সুগম চিত্তাকর্ষক ও রমণীয়। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপদচিহ্ন-অঙ্কিত মেখলা রামগিরিকে সোহাগে নিবিড় স্নেহালিঙ্গন জানিয়ে ঘনিয়ে এসেছে মেঘের অলকা যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রথম পর্বের সমাপ্তি এখানেই।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

(২) **উজ্জয়িনীর পথে ঃ** শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর পুণ্যস্মৃতিবহ রামগিরিকে সম্মান ও ভক্তিপ্রদর্শন করে শুরু হল মেঘের পথ চলা। মাঝে মাঝে পাহাড়চূড়ায় বিশ্রাম, স্বচ্ছ স্রোতোস্বিনীর মিষ্টি জলপান আবার শিখরে শিখরে পা ফেলে ফেলে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়া—এই হয়েছে তার রোজনামচা। তার আগমনে মুগ্ধা, গম্ভীর গর্জনে ও দুর্বার গতিতে সন্ত্রস্তা, সরলা সিদ্ধাঙ্গনাগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গুহাশ্রয়ে ফিরে যাবে। ঐ দূরে উইঢিবির আড়াল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্রবর্ণচ্ছটাসমুজ্জ্বল ইন্দ্রধনু। ভ্রান্তিবিলাস-অনভিজ্ঞা সরলা গ্রাম্যবধূদের চকিত দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত মেঘ কিছুটা পিছন ফিরে এবার আম্রকূটের দিকে এগিয়ে যাবে। আম্রকূট তাকে যথাবিহিত সমাদরে মাথায় করে রাখবে। কেননা হিতকামী বন্ধুর মতো দাবাগ্নি নিবিয়ে দিয়ে সুপক্ক আমের গন্ধে আমোদিত এই সানুমান পর্বতের মহা উপকার করেছে সে। আম্রকূটে রয়েছে বনচরবধূদের অবাধ প্রণয়ে সম্ভুক্ত কুঞ্জবন। সেখানে জলদান শেষ করেই সে যেন আম্রকূট ছেড়ে যায়।

সামনেই পড়বে বিন্ধ্যাচল। তার পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে 'রেবা' নামে ক্ষীণস্রোতা ভক্তিমতী নদীটি। মেঘ তার নির্মল সলিলসুধা পান করে যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করুক এবং সারবান হয়েই উড়ে চলুক। তার বর্ষণে পাহাড়ে ফুটেছে 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', নীচে থরে বিথরে কন্দলী। চলছে সারঙ্গদের শোভাযাত্রা। ঊর্ধ্বে হরিত-কপিশ বর্ণের কদম্ব পুষ্পগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে,

আর সদ্যপ্রস্ফুটিত ভুঁইচাপার কলিগুলি খেতে খেতে তারা যেন তাকে পথ দেখিয়ে চলবে। মেঘের সর্বগ্রহিষ্ণু দৃষ্টিতে একে একে ধরা পড়বে কত মনোরম দৃশ্য, পশুপাখী-জীবজন্তু। অম্ভোবিন্দু গ্রহণচতুর চাতক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা, অত্যাগসহন অমরমিথুন, কালো মেঘের নীচে ধাবমান হংসবলাকার দল, কুকুভ-সুরভি, শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকা। ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যোপহার ও কেকাধ্বনিরূপ স্বাগত সম্ভাষণে মুখর হবে তার পথ। সম্মুখেই দশার্ণ নামে জনপদের প্রান্তদেশে সুরভিত শ্যাম জম্বুবন। কেতকী পুষ্পের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই দশার্ণের উপবন। তার গ্রাম-পাশের বড় বড় গাছগুলিতে আশ্রয় নেওয়া পরিযায়ী পাখিদের নীড়রচনার ব্যস্ততা ও কলরবে মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাচীন জনপদ।

দশার্ণের রাজধানী ভুবনবিদিত বিদিশা। অদূরে বয়ে চলেছে তটিনী বেত্রবতী। বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' পাহাড় সম্ভোগশ্রান্ত মেঘের বিশ্রামস্থল। বিদিশার অরণ্য ও নদীতীরের নবজলসিক্ত পুষ্পোদ্যান, যূথীবনবিহারিণী পুষ্পলাবী বনাঙ্গনাদের 'রুজা' (কর্ণোৎপল নড়ে যাওয়ার বেদনা) মেঘকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের এক ভিন্ন জগতে পৌঁছে দেবে। অতপর তার উজ্জয়িনী প্রয়াণ। শোভা ও সৌন্দর্যের অধিরাজ্য উজ্জয়িনী। তার সুবিশাল প্রাসাদ, অভ্রংলিহ অট্টালিকাশ্রেণী, পুরসুন্দরীদের অপাঙ্গ-ইঙ্গিত—জীবন-যৌবনের সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ উজ্জয়িনী। তার প্রবেশপথে নদী নায়িকা নির্বিন্ধ্যার চিত্ত-বিমোহক সৌন্দর্য। তরঙ্গভঙ্গে কলরবমুখরিত বিহগশ্রেণীতে রচিত হয়েছে তার চন্দ্রহার। বিভ্রম-বিলাসিনী নায়িকা এই নির্বিন্ধ্যা। আর এক বিরহিণী নদী-নায়িকা একবেণীধরা সিন্ধু মেঘের অমৃতসলিল-বর্ষণ-প্রত্যাশী।

উজ্জয়িনী অবন্তীদেশের রাজধানী। উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধের কথামালায় সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যে-সম্পদে মহতী শ্রীবিশালা বিশালা নগরী যেন স্বর্গতুল্য—স্বর্গ থেকে ভূমণ্ডলে খসে পড়া স্বর্গীয় কান্তির এক টুকরো—'শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্'। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, চঞ্চল বাতাস, শিপ্রার বীচিক্ষুব্ধ জলধারা, ফুলের সমারোহ, পাখীর কলতানে মুখর প্রেমের দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য উজ্জয়িনী। ....শিপ্রার শরীর জুড়ানো মৃদুমন্দ বাতাস, পুররমণীদের কেশসংস্কার ধূপের সৌরভ, গৃহপালিত ময়ূর-ময়ূরীদের নৃত্যোপহার, ললিতা পুরলক্ষ্মীদের অলক্তরাগরঞ্জিত চরণক্ষেপে মণিকুট্টিমে (মেঝেতে) অঙ্কিত চরণচিহ্ন, চণ্ডীশ্বর শিবের পুণ্যধাম, জলকেলিমত্ত যুবতীদের স্নানীয় অঙ্গরাগদ্রব্যে ও পদ্মরজঃগন্ধে সুরভিত গন্ধবতী নদী, মহাকাল শিবমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে পাদবিক্ষেপে ক্বাণিতরশনা বিলাসলীলাচঞ্চলা বারাঙ্গ নাদের (দেবদাসিকাদের?) ভ্রমরশ্রেণীর মতো দীর্ঘকটাক্ষ, রক্তাক্ত গজাজিনের জন্য উন্মত্ত তাণ্ডবনিরত মহেশ্বর ও শান্তোদ্বেগ-স্তিমিতনয়না ভবানী, ...কামনাময়ী গম্ভীরা, বিদ্যুতের ক্ষীণালোকে পথচলা নিসাভিসারিকা প্রভৃতি অসংখ্য আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে উজ্জয়িনী। "জীবন-যৌবন সফল করবার যা কিছু আয়োজন তা সবই যেন থরে-বিথরে সাজানো রয়েছে উজ্জয়িনীতে। যৌবন-প্রসাধনকলার এমন বিচিত্র রূপ, বেহুঁশ করে ফেলা বর্ণগন্ধময় জগতের এমন সুতীব্র আকর্ষণ, জীবনে-যৌবনে কামনা-বাসনার রক্তরাগের সঙ্গে ভক্তিনম্র চিত্তের স্নিগ্ধ প্রশান্তির এমন সহাবস্থান শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

(৩) পুনর্যাত্রা ঃ উজ্জয়িনী থেকে মেঘের যাত্রা এবার দেবগিরির দিকে। দেবগিরি কুমার স্কন্দের নিত্য অধিষ্ঠানভূমি। সেখানকার কাননের উদুম্বর (ডুমুর)গুলিকে শীতল বায়ুসংসর্গে পাকিয়ে দিয়ে কার্তিকের বাহন ময়ূরদের গুরুগর্জনে নাচিয়ে দেবে সে। আর নিজের দেহটিকে পুষ্পমেঘে পরিণত করে আকাশগঙ্গার জল দিয়ে সেই শরবনভবকে স্নান করানোর পুণ্য অর্জন করবে। তারপর দশপরাধিপতি রন্তিদেবের অক্ষয় কীর্তি চর্মণ্বতী নদী পেরিয়ে, দশপুরবধূদের নেত্রকৌতূহল বর্ধিত করে মেঘ এগিয়ে যাবে ব্রহ্মাবর্তের দিকে।

(৪) ব্রহ্মাবর্ত ঃ মেঘ ব্রহ্মাবর্তে উপনীত। প্রাচীন আর্য উপনিবেশ ব্রহ্মাবর্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী জনপদ। এখানেই রয়েছে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র। গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের প্রতাপ প্রদর্শনের স্থল কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধের মহাপরিণামে অনুতপ্ত মহাবলী বলরামের শেষ জীবনের আশ্রয়স্থলও। এই কুরুক্ষেত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মেঘ কনখলের দিকে যাত্রা করবে।

(৫) কনখল থেকে অলকা ঃ ভক্তিস্নাত মেঘ পুণ্যতীর্থ কনখল থেকে দেবতাত্মা হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছে। তার উদ্দেশ্য দেবাদিদেব মহাদেবের চির অধিষ্ঠান ভূমি কৈলাস। এই কৈলাসেই অলকা, এখানেই মানসসরোবর। অফুরন্ত নিসর্গ সৌন্দর্যের আকর কৈলাস। এই সৌন্দর্যের দ্রষ্টাও উপভোক্তা মেঘ মহাভাগ্যবান। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"ভব-ভবানী অধ্যুষিত হিমালয়ের স্নিগ্ধ বাতাস, সমুন্নত দেবদারু, কুটজকুসুম, নীপ, উদুম্বর, ভুজতরুবন, অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তু শরভ, চমরী গাই, দাবাগ্নি, বিশাল উইয়ের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা, জানা-অজানা অজস্র গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশুপাখী, প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলশোভিত মানস সরোবর, হংসদ্বার, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, কীচকের সুমধুর বংশীধ্বনি-নিনাদিত কৈলাস। এই কৈলাসের ক্রোড় থেকেই রেশমী দুকূলের মতো খসে পড়া গঙ্গার সমীপবর্তী কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী। অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও অনন্ত যৌবনের রাজ্য যক্ষের বিলাসপুরী অলকা। তার সপ্ততল সুউচ্চ মেঘস্পর্শী হর্ম্যরাজি সুন্দরী রমণীপূর্ণ, নানা মণিকুট্টিম সমৃদ্ধ, চিত্রশোভিত, মুরজধ্বনিমুখর, নিত্যজ্যোৎস্নায় ঝলমলে, তাই প্রদোষরহিত। অলকার আকাশটিও যেন তারাফুলখচিত। সেখানকার বধূদের হাতে রয়েছে লীলাকমল, অলকে সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ, মুখে লোধ্রফুলের পরাগরেণুতে শুভ্রশ্রী, কেশপাশে নব কুরুবক, কর্ণদ্বয়ে সুন্দর শিরীষ কুসুম আর মেঘোদয়ে প্রস্ফুটিত নীপমঞ্জরী। ....অলকার অন্য আকর্ষণ—ইন্দ্রনীল-মণিখচিত ক্রীড়াশৈল, সুগন্ধ ফুলে ভরা বাপী, কুরুবকের বেড়া দিয়ে ঘেরা মাধবীকুঞ্জ, কিশলয়যুক্ত রক্তাশোক ও মনোহর কেশর বৃক্ষ, ...মণিবাঁধানো কাঞ্চনযষ্টিতে বসে থাকা নীলকণ্ঠ ভবনশিখী, যক্ষভবনের গায়ে আঁকা শঙ্খপদ্ম চিহ্ন আর তন্বী-শ্যামা ভবনবাসিনী—

"তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং

যা তত্র স্যদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যেব ধাতুঃ।।" (উত্তরমেঘ ২১) (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

উদার দৃষ্টি ও সমুন্নত কল্পনায় ভাস্বর এইসকল রূপকল্পনা ও কথাচিত্র মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের মাধুরীকে যুক্ত করে দিয়ে এক অসামান্য শিল্পরসে পাঠক মন ভরিয়ে তোলে। বর্ণসৌন্দর্য সুষমা-নিরীক্ষণ ও চিত্রসৌন্দর্য নির্মাণে কবির দক্ষতা অতুলনীয় ও অপূর্ব। তাই মনে হয় সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা, কেবল চিত্রশালা নয়, সৌন্দর্যশালা। সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল চিত্র পরম্পরায় ..... কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।" (কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা)

। ৬.১.৪.১.২মেঘদূত কাব্যে প্রকৃতি - নদী - নারী

ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কার। ঋষিকবি বলেছেন, জড় বলে কিছু নেই, সবই প্রাণময়, চেতনাময়। বাহ্যদৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্মবোধ ও অন্তর্দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়ে। আরও একটি সমুন্নত কল্পনা—বিশ্বপ্রকৃতিতে জননী অথবা জায়ারূপে কল্পনা। ঋষিকবির উপলব্ধি—'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ'।—এই মাটি আমার মা, আমি এই ধরিত্রীর সন্তান। কালিদাসের সকল সৃষ্টির মধ্যেই ঋষিকবির সেই সত্যের বিঘোষণ দেখা গেছে।

মেঘদূত কাব্যে কবি জড়প্রকৃতির বাইরের নয়নলোভন দৃশ্যাবলীর বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন। এই সকল মনোরম দৃশ্য অপরূপ চিত্রসৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের মনকে স্পর্শ করে। কিন্তু সেই সকল বর্ণনা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অনেক সময়ই তারা জড়স্বভাব-অতিক্রমী প্রাণবান সত্তা-চেতনার পরিচয় দিতে পারে না। এক্ষেত্রে এই কাব্যে ব্যবহৃত নদীগুলির উল্লেখ ব্যতিক্রম। মেঘদূতের নদীগুলি কেবল জড়প্রকৃতির অসংখ্য উপাদানের অন্যতম উপাদান মাত্র নয়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলঙ্কারসমৃদ্ধ নদীগুলি সেখানে নিছক তটিনী নয়, রক্ত-মাংসের শরীর ও উত্তাপ-আবেগ-অনুভবদীপ্ত প্রেমিকা রমণী। রেবা, নর্মদা, নির্বিন্ধ্যা, শিপ্রা, গম্ভীরা, সিন্ধু, জাহ্নবী, চর্মন্বতী, গঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি নদীগুলি কেবল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক সত্য নয়, তারা ভক্তিমতী, কামনা-বাসনাময়ী নদী-নায়িকা। প্রেমের দশ দশার বিভিন্ন দশাগ্রস্ত এই সকল নদী-নায়িকারা আসলে প্রেমিকপ্রবর নায়ক মেঘের মিলন-প্রত্যাশী প্রোষিতর্তৃভর্তৃকা বিরহিণী নায়িকা। এই সকল নায়িকার রূপালেখ্য নির্মাণে মহাকবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কালিদাস-অনুরাগী কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকৃতি-নদী-নারী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

উজ্জীবনী পাঠ

মেঘদূত (পূর্বমেঘ)-এর শ্লোক সংখ্যা ৬৪ (প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে)। সমগ্র পূর্বমেঘ-এর শ্লোকাবলীর উজ্জীবনী অংশ যোগ করার সুযোগ নির্দেশিকা-আলোচনায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূর্বমেঘের প্রথম ১০টি শ্লোকের মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, অন্বয়ার্থ ও উজ্জীবনী এখানে দেওয়া হল। অনুরূপভাবে সকল শ্লোক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত হতে হবে।

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥১॥

অন্বয় ঃ স্বাধিকারপ্রদত্তঃ কাশ্চিৎ যক্ষঃ কান্তাবিরহগুরুণা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃশাপেন অস্তংগমিতমহিমা সন্ জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু রামগির্যাশ্রমেষু বসতিং চক্রে।

শব্দার্থ ঃ স্বাধিকারপ্রমত্ত—নিজের অধিকার বা কর্তব্যে প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ অমনোযোগী, কশ্চিৎ যক্ষ—কোনো এক যক্ষ, কান্তাবিরহগুরুণা—কান্তার বিরহজনিত গুরু অর্থাৎ সুদুঃসহ, বর্ষভোগ্যেণ—এক বৎসরব্যাপী ভোগ্য, ভর্তুঃশাপেন—প্রভুর অভিশাপে, অস্তংগমিতমহিমা—অস্তমিত হয়েছে মহিমা অর্থাৎ তেজ, প্রভাব বা ঐশ্বর্য এমন, (সন্-হয়ে), জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু—জনকতনয়া সীতার স্নানে পুণ্য বা পবিত্র হয়েছে সলিল যার (এমন), স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু — স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহযুক্ত ছায়াপ্রধান তরুশ্রেণী বেষ্টিত, রামগির্যাশ্রমেষু—রামগিরির আশ্রমে অর্থাৎ আশ্রয়যোগ্যস্থলে, বসতিং চক্রে—বাস করেছিল।

অন্বয়ার্থ ঃ নিজের কর্তব্যে অমনোযোগী এক যক্ষ প্রিয়াবিরহে বর্ষকালভোগ্য প্রভুপ্রদত্ত অভিশাপে ঐশ্বর্যহীন হয়ে জনকতনয়া সীতার স্নানে পবিত্রসলিল, স্নেহময় ছায়াতরুঘেরা রামগিরির আশ্রমে বাস করেছিল ॥ ১॥

উজ্জীবনী ঃ স্বাধিকার—স্ব-অধিকার, অর্থে পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, কাজের বিষয়, পালনীয় কর্তব্য প্রভৃতি। এ থেকেই আধিকারিক-তত্ত্বাবধায়ক, পরিদর্শক ইত্যাদি। প্রমত্তঃ—অনবহিত-'প্রমত্তোহনবহিতঃ প্রমাদোহনবধানতা'—বলেছেন অমরকোষ। স্বাধিকারপ্রমত্তঃ বলতে এখানে নিজের অধিকারে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান বা কাজের বিষয়ে অমনোযোগী বোঝানো হয়েছে। কশ্চিৎ যক্ষঃ বলার কারণ

কোনো বিশেষ যক্ষ নয়, নির্বিশেষ বা সাধারণ (Universal) যক্ষ। বিশেষের (Particular) সামান্যীকরণের (Universalisation) দ্বারা কবি মেঘদূতকাব্যে যক্ষের বিরহকে চিরন্তন 'কান্তা-বিরহের' কাব্য করে তুলেছেন। ভর্তুঃ শাপেন — প্রভুর শাপে। টীকাকারগণের মতে এই প্রভু যক্ষের নিয়োগকর্তা ধনপতি কুবের। প্রাচীন টীকানুসারে জানা যায়—প্রভু কুবেরের প্রাত্যহিক শিবার্চনার ফুল যোগান দেওয়া ছিল যক্ষের কাজ। একদা প্রিয়াসঙ্গে আত্মবিস্মৃত হয়ে সে নিত্যকর্মে গাফিলতি করে। অমনি বর্ষিত হয় প্রভুর নির্মম অভিশাপ। প্রাচীন ভারতে কর্তব্যে কোনোপ্রকার অবহেলা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতো। তাই যক্ষের শাস্তি। যক্ষ—ধনাধিপতি কুবেরের সহচর, রক্ষক, উদ্যান-পালক দেবযোনী বিশেষ। ঋগ্বেদে (৭.৬১.৫) ও কেনোপনিষদে (১৫) 'পূজ্য' অর্থে যক্ষ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, পিশাচ, গুহাবাসী, সিদ্ধ প্রভৃতি দেবযোনী — 'বিদ্যাধরাপ্সরো যক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ। পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ।।' (অমরকোষ) কামনা করা হয় বলেই কান্তা < √ কম্। কান্তা, কান্তি, কামিনী প্রভৃতি শব্দগুলির মূলে রয়েছে এই ধাতু। রামগিরি — পর্বত বিশেষ — যক্ষের নির্বাসনস্থল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার অন্তর্গত রামগড়, পণ্ডিত Wilson- এর মতে নাগপুরের সন্নিকটে 'রামটেক' (মারাঠী ভাষায় 'টেক্' অর্থে পাহাড়); মেঘদূতের প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ ও বল্লভদের ভাষ্যে মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট পর্বত, আবার কারো কারো অনুমান, বিহারের রাঁচী জেলার রামগড় পাহাড়। আসলে যক্ষ, যক্ষপুরী, অলকা প্রভৃতির মতো রামগিরিও নির্বিশেষ কাল্পনিক কোনো গিরিস্থল বলেই মনে হয়। মহিমা — তেজ, প্রভাব, ঐশ্বর্য; মল্লিনাথ অর্থ করেছেন সামর্থ্য। ছায়াতরু — পুন্নাগবৃক্ষ, নমেরুবৃক্ষ; 'ছায়াবৃক্ষো নমেরু স্যাৎ' বলেছেন শব্দার্ণব। এই বৃক্ষের ফল থেকে রুদ্রাক্ষমালা তৈরি হয়। রামগির্যাশ্রমেষু — রামগিরির আশ্রম বা আশ্রয়স্থলগুলিতে। একটি নির্দিষ্ট আশ্রমে প্রেমোন্মাদ-চঞ্চল যক্ষের অবস্থান স্বাভাবিক নয়, তাই বহুবচন।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাপ্রিযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥

অন্বয় ঃ অবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ (সন্) তস্মিন্ অদ্রৌ কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আশ্লিষ্টসানুং মেঘং বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং (ইব) দদর্শ।

শব্দার্থ ঃ অবলাবিপ্রযুক্তঃ—প্রিয়া বিরহিত, প্রিয়া-বিচ্ছিন্ন, স কামী—সেই প্রেমার্ত যক্ষ, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ—স্বর্ণকঙ্কণ স্খলিত হয়ে পড়ায় শূন্য হয়েছে প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ হাতের মণিবন্ধ বা কব্জি (Wrist) যার (এমন হয়ে), তস্মিন্ অদ্রৌ — সেই পর্বতে (রামগিরিতে), কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা—কয়েক মাস কাটিয়ে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে, আশ্লিষ্টসানুং মেঘং—পর্বতের সানুদেশ (নিতম্ব) আলিঙ্গন করছে এমন মেঘকে, বপ্রক্রীড়া—উৎখাতলীলায়, পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং—উন্মত্ত নতদেহ গজের মতো (সুন্দর), দদর্শ—দেখল।

অন্বয়ার্থ ঃ অবলা বা প্রিয়া-বিরহিত সেই প্রেমার্ত যক্ষের মণিবন্ধ (হাতের কব্জি) স্বর্ণকঙ্কণশূন্য (অর্থাৎ রুগ্‌ণ বা কৃশ) হয়ে পড়েছিল। (এই অবস্থায়) সেই পর্বতে কয়েকমাস কাটিয়ে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে পর্বতের সানুদেশ-(নিতম্ব) আলিঙ্গনরত মেঘকে উৎখাতলীলায় উন্মত্ত নতদেহ গজের মতো (সুন্দর) দেখল ।।২।।

উজ্জীবনী ঃ অবলা—স্ত্রীবাচক শব্দ—"স্ত্রীযোষিদবলানারীবধূঃ সীমন্তিনী সমা। প্রতীপদর্শিনীবামা ললিতা বনিতা তথা।।" (অমরকোষ) অর্থাৎ স্ত্রী যোষিৎ, অবলা, নারী, বধূ, সিমন্তিনী, সমা, প্রতীপদর্শিনী, বামা, ললিতা, বনিতা প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দ। বিপ্রযুক্তঃ—বিচ্ছিন্ন, বিরহিত < সং বিপ্রয়োগঃ — বিচ্ছেদ বিরহ। কামী — কামনা আছে যার অর্থাৎ কামুক। কিন্তু আমাদের বিচারে যক্ষ কামুক নয়, প্রেমিক, তাই প্রেমার্ত। ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ—কৃশ মণিবন্ধ—দশটি কামদশার অন্যতম দশা কৃশতা — "দৃঙ্-মন-সঙ্গ-সংকল্পো জাগরঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্ছাস্তাঃ ইতিস্মরদশা দশঃ।।" (অমরকোষ) এখানে পঞ্চম দশা কৃশতা। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—কোনো কোনো টীকাকারের মতে এই পাঠ অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে' অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষদিনে। তাঁদের যুক্তি হল — চতুর্থ শ্লোকে 'প্রত্যাসন্নে নভসি' অর্থাৎ নভঃ বা শ্রাবণ মাস প্রত্যাসন্ন হলে — এই কথা বলা হয়েছে। অতএব 'প্রথম দিবসে' পাঠ যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু মল্লিনাথ 'প্রথম দিবসে' পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর ভাবটা এইরকম— আষাঢ় এলে শ্রাবণ আসতে আর কদিন?—অনেকটা যেন ইংরেজী কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'If winter comes, can spring be far behind'-এরই পূর্বধ্বনি। তুলনীয়—'কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথমদিবসে' ('মেঘদূত'-মানসী—রবীন্দ্রনাথ) অথবা 'এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস।' ('অবিনয়' ক্ষণিকা)। আশ্লিষ্টসানু < আশ্লেষ — আলিঙ্গন, রভস, সানু — পর্বতের সমতল শিখরদেশ, বপ্রক্রীড়া — উৎখাতকেলি, শব্দার্ণব-অনুসারে 'উৎখাতকেলিঃ শৃঙ্গারাদ্যৈর্বপ্রক্রীড়া নিগদ্যতে'—হস্তিবৃষ প্রভৃতি জন্তুর শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা উৎখনন-ক্রিয়া। বর্ষাকালে বৃষ্টিভেজা পাথুরে মাটিতে দাঁত অথবা শিংয়ের ঢুঁ মেরে বন্যপ্রাণীরা খেলা করে, এরই কাব্যিক নাম 'বপ্রক্রীড়া' পরিণত—সম্যকরূপে নত অর্থাৎ আনত বা অবনত, মল্লিনাথ অর্থ করেছেন-তির্যগ্‌দন্ত-প্রহাররত।

তথ্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধান হেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।।৩।।

অণ্বয় ঃ রাজরাজস্য অনুচরঃ অন্তর্বাষ্পঃ (সন্) কৌতুকাধানহেতোঃ কথমপি তস্য পুরঃ স্থিত্বা চিরং দধ্যৌ। মেঘালোকে (সতি) সুখিনঃ অপি চেতঃ অন্যথাবৃত্তি ভবতি। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে দূরসংস্থে (সতি) কিং পুনঃ?

শব্দার্থ ঃ রাজরাজস্য—রাজ — যক্ষ, যক্ষের রাজা যিনি তাঁর অর্থাৎ যক্ষরাজ কুবেরের, অনুচরঃ —ভৃত্য অর্থাৎ যক্ষ, অন্তর্বাষ্প—অন্তরে নিরুদ্ধ অশ্রুতে আর্দ্র, সন্ — হয়ে, কৌতুকাধানহেতোঃ — অভিলাষ বা কামনা-উদ্রেককারী, তস্য — সেই মেঘের, পুরঃ—সম্মুখে,

কথমপি — কোনো প্রকারে, স্থিত্বা—থেকে, চিরং—দীর্ঘক্ষণ, দধ্যৌ—ধ্যান করল অর্থাৎ ভাবল, মেঘালোকে (সতি)—মেঘ সন্দর্শনে, সুখিনঃ অপি চেতঃ—সুখীদের চিত্তও, অন্যথাবৃত্তি—আনমনা, অন্যপ্রকার, ভবতি—হয়ে যায়। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে—কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক ব্যক্তি, দূরসংস্থে (সতি)—দূরে থাকলে, কিং পুনঃ—আর কথা কি?

অন্বয়ার্থ ঃ যক্ষরাজ কুবেরের সেই অনুচর (ভৃত্য) অন্তরে অন্তরে নিরুদ্ধ অশ্রুতে আর্দ্র হয়ে অভিলাষ বা কামনা উদ্রেককারী সেই মেঘের সম্মুখে কোনো প্রকারে থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাবল। (কারণ) মেঘ সন্দর্শনে সুখীদের চিত্তও আনমনা হয়ে যায়। (সেক্ষেত্রে) কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক ব্যক্তি দূরে থাকলে তার কথা আর কি বলব? ।।৩।।

উজ্জীবনী ঃ রাজরাজস্য—এখানে পরপর দুটি 'রাজ' শব্দের প্রথমটি বিশেষ্য হয়েও দ্বিতীয় 'রাজ' শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, অর্থ যক্ষ—'রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়শক্রয়ো'—বলেছেন বিশ্বকোষ। এইসূত্রে রাজরাজস্য—রাজার রাজার অর্থাৎ যক্ষরাজ ধনাধিপতি কুবেরের। 'রাজরাজো ধনাধীপঃ'—বলেছেন অমরকোষ। কৌতুকাধান হেতোঃ—কৌতুক—কামনা বা অভিলাষ উদ্রেকের কারণ, বিশ্বকোষে কৌতুক শব্দের অর্থ করা হয়েছে অভিলাষ—'কৌতুকং চাভিলাষে স্যদুৎসবে নর্মহর্ষয়োঃ।'

প্রত্যাসন্নে নভসি দায়তাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ।।৪।।

অন্বয় ঃ নভসি প্রত্যাসন্নে (সতি) দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী সঃ জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিম্ হারয়িষ্যন্ প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ প্রীতঃ (সন্) প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।

শব্দার্থ ঃ নভসি—শ্রাবণ মাস, প্রত্যাসন্নে (সতি)—প্রত্যাসন্ন হলে, এগিয়ে এলে-দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী—দয়িতা-জীবিত-আলম্বন-অর্থী—দয়িতা—ভার্যা বা প্রেয়সীর জীবনরক্ষায় অভিলাষী, সঃ—সেই যক্ষ, জীমূতেন—মেঘদ্বারা, স্বকুশলময়ীং-—নিজের কুশলময়, প্রবৃত্তিম — বার্তাকে, হারয়িষ্যন্—বহন করাতে ইচ্ছুক হয়ে; প্রত্যগ্রৈঃ—সদ্য প্রস্ফুটিত, কুটজকুসুমৈঃ — কুটজকুসুম বা কুর্চিফুলের দ্বারা, কল্পিতার্ঘায়—অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে এমন, তস্মৈ—তাকে অর্থাৎ মেঘকে, প্রীতঃ (সন্) —প্রীত হয়ে, প্রীতিপ্রমুখবচনং—প্রীতিসম্ভাষণ, স্বাগতং—স্বাগত অভিবাদন, ব্যাজহার—জানাল।

অন্বয়ার্থ ঃ শ্রাবণমাস প্রত্যাসন্ন হলে দয়িতার জীবনরক্ষায় অভিলাষী সেই যক্ষ মেঘ দ্বারা নিজের কুশল-বার্তা বহন করাতে (অর্থাৎ প্রেরণ করতে) ইচ্ছুক হয়ে সদ্য প্রস্ফুটিত কুটজকুসুমের (কুর্চি ফুলের) দ্বারা দত্তার্ঘ্য সেই মেঘকে প্রীতিপূর্বক 'স্বাগত' রূপ সাদর সম্ভাষণ জানাল ।।৪।।

উজ্জীবনী ঃ নভসি—শ্রাবণমাস—'নভাঃ শ্রাবণিকাশ্চ' বলেছেন অমরকোষ, মূল অর্থ—আকাশ। জীমূত — জীব + মূত—পৃষোদরাদি শব্দ, 'ব' লোপে জীমূত। জীব মূত—বদ্ধ হয় যার দ্বারা অর্থাৎ জলবর্ষী মেঘ। বর্ষাকালে জীব এর দ্বারা গৃহবন্দী হয়ে থাকে, তাই জীমূত। অন্য অর্থও করা যায়।

জীমূত — জীব + মূত < সং মুক্ত > মুত্ত > মূত—যার দ্বারা জীব মুক্ত হয়। মেঘ এসে জীবের মনকে গৃহবদ্ধ জীবন থেকে বাইরে আকর্ষণ করে। পূর্ব মেঘের তৃতীয় শ্লোকে এরই পূর্বাভাষ — 'মেঘালোকে ভবতিসুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।' তু. 'কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে 'অন্যথাবৃত্তি চেতঃ', সেই যে পথ চেয়ে থাকা আনমনা, তারই গান হবে।' (নটরাজ—রবীন্দ্রনাথ)। প্রবৃত্তি—বার্তা—'বার্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ' বলেছেন অমরকোষ। কুটজ-কুর্চি, হলায়ুধ অর্থ করেছেন গিরিমল্লিকা—'কুটজো গিরিমল্লিকা।'

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ।
ইত্যোৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥৫॥

অন্বয় ঃ ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ ক্বঃ; পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়া সন্দেশার্থাঃ ক্ব? ঔৎসুকাৎ ইতি অপরিগণয়ন্ গুহ্যকঃ তং যযাচে। চেতনাচেতনেষু কামার্তাঃ হি প্রকৃতিকৃপণাঃ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ ঃ ধূমজ্যোতিঃ—ধূম (বাষ্প-ধোঁয়া) ও জ্যোতিঃ—তেজ বা সূর্যকিরণ, সলিলমরুতাং—জল ও বায়ুর, সন্নিপাতঃ—সংমিশ্রণ, মেঘঃ ক্ব—মেঘই বা কোথায়! পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ—পটু—শক্ত বা সমর্থ, করণ—ইন্দ্রিয়শক্তি বিশিষ্ট, প্রাণিভিঃ—প্রাণীদের দ্বারা, প্রাপণীয়া—প্রেরণযোগ্য, সন্দেশার্থাঃ ক্ব—সন্দেশ-অর্থাঃ— সন্দেশ বা সংবাদের উপযোগী বিষয়ই বা কোথায়! ইতি—তাই, ঔৎসুক্যাৎ—ঔৎসুক্য বা ইচ্ছাপূরণে, অপরিগণয়ন্—কৃতোদ্যম হয়ে, গুহ্যক—গুহাবাসী (যক্ষ), তং যযাচে—সেই মেঘকে প্রার্থনা জানাল। চেতনাচেতনেষু—চেতন—অচেতনেষু—চেতন ও অচেতনের বিচারে, কামার্তাঃ হি—কামার্তগণ, হি— সংযোজক অব্যয়, প্রকৃতিকৃপণাঃ—প্রকৃতি-স্বভাব, কৃপণা— কৃপার পাত্র (বহুবচন), (ভবন্তি হয়ে থাকে)।

অন্বয়ার্থ ঃ ধূম, জ্যোতিঃ, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণ সেই মেঘেই বা কোথায়! (আর) সমর্থ ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট প্রাণীদের দ্বারা প্রেরণযোগ্য বার্তা বা সংবাদই বা কোথায়! তাই ঔৎসুক্য বশত (ইচ্ছাপূরণে) কৃতোদ্যম হয়ে গুহাবাসী যক্ষ সেই মেঘকে প্রার্থনা জানাল। চেতন ও অচেতনের বিচারে কামার্তগণ স্বভাবতই কৃপার পাত্র হয়ে থাকে॥৫॥

উজ্জীবনী ঃ সন্নিপাত — সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষ, (Permutation and Combination), ধূম (বাষ্প-ধূম), জ্যোতিঃ, বায়ু ও জল—মেঘের চারটি উপাদান। সন্দেশ—মূল অর্থ সংবাদ, পরে অর্থ পরিবর্তনে মিষ্টান্ন। প্রাচীনকালে আত্মীয় বাড়িতে সংবাদ পরিবেশনের তত্ত্বের সঙ্গে মিষ্টান্ন পাঠানো হত। এ থেকেই পরবর্তীকালে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ হয়ে দাঁড়ায় আদৌ যে কোনো মিষ্টান্ন, পরে বিশেষ এক শ্রেণীর মিষ্ট দ্রব্য। গুহ্যক—গুহ্য + স্বার্থে ক। 'গুহায়াং ভব ইতি গুহ্যঃ—গুহাবাসী, বিশেষার্থে যক্ষপতি কুবেরের নিধিরক্ষক (Treasurer)—'নিধিং রক্ষন্তি যে যক্ষাস্তে স্যুর্গুহ্যকসংজ্ঞকাঃ' বলেছেন অমরকোষ। কামার্তা—কাম পীড়িত, এখানে প্রেমার্ত, কারণ যক্ষের কামনা কোনো প্রাকৃত নায়কের সাধারণ কামপীড়া

বা Passion মাত্র নয়, কামের মহিমান্বিত-ঊর্ধ্বায়িত (Sublimated) প্রেম। কালিদাসোত্তর কালে বৈষ্ণব কবিমনীষীর অনুভবে কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য অনেকটাই সুপরিস্ফুট হয়েছে—'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) এই কামক্রীড়াসাম্যের গুণেই প্রাকৃত কাম বৈষ্ণবের ভাব-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমে পরিণত হয়। কৃপণ—সাধারণ অর্থ অর্থগৃধ্নু, কঞ্জুস, এখানে বিশেষার্থে কৃপার পাত্র, কৃপার্হ। 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'—ফলাকাঙ্ক্ষীরা কৃপার পাত্র—গীতায় একথা বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। করণ—ইন্দ্রিয়। চেতনাচেতনেষু-চেতন-অচেতনের বাছবিচার না করে। যক্ষ পত্নীবিরহে বাহ্যজ্ঞান-বিস্মৃত প্রেমের নবম দশাগ্রস্ত 'উন্মাদ'। কথায় বলে, 'পাগলে কি না বলে?' গ্রীক পুরাণের সংস্কার—'Eros is blind'—প্রেমার্তরা অন্ধ। প্রেমের এই উন্মত্ত আর্তির কথা স্মরণ করেই 'Midsummer Nights Dream'-এ—Shakespeare মন্তব্য করেছেন—

> "The lunatic the lover and the poet
> Are of imagination all compact."

কালিদাসের 'যক্ষ একাধারে উন্মাদ, প্রেমিক এবং কবি' (মেঘদূত পরিচয়—পাবর্তীচরণ ভট্টাচার্য)। সে যেন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধার মতো 'হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি।' তাই তার ভাবদৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত। তাছাড়া আলঙ্কারিক ভামহ অব্যক্তবাকদের দিয়ে দৌত্যকার্য নিষেধ করেছিলেন। কারণ তাতে অযুক্তিমদ্ দোষ হয়। যক্ষকে পাগল বানিয়ে কালিদাস অযুক্তিমদ্ দোষের প্রবক্তা ভামহকে এড়িয়ে গেছেন। কারণ পাগলের কোনো শাস্ত্র মানার দায় নেই।

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥৬॥

অন্বয় ঃ পুষ্করাবর্তকানাং ভুবনবিদিতে বংশে জাতং, মঘোনঃ কামরূপং প্রকৃতিপুরুষং ত্বাং জানামি। তেন বিধিবশাৎ দূরবন্ধুঃ অহং ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ। অধিগুণে মোঘা যাচ্ঞা (অপি) বরম্, (পরং) অধমে লব্ধকামা (যাচ্ঞা) ন।

শব্দার্থ ঃ পুষ্করাবর্তকানাং—পুষ্কর-আবর্তক প্রভৃতি, ভুবনবিদিতে বংশে—ভুবনখ্যাত (মেঘের) বংশে, জাতং—জাত, মঘোনঃ—দেবরাজ ইন্দ্রের, কামরূপং—ইচ্ছাধীন বিচিত্র রূপধারণে সমর্থ, প্রকৃতিপুরুষং—প্রধান পুরুষরূপে (অনুচর), ত্বাং জানামি—তোমাকে জানি, তেন—তাই, বিধিবশাৎ—বিধির নির্বন্ধে, কপালদোষে, দূরবন্ধুঃ অহং—বন্ধুঃ—প্রিয়জন, দূরবন্ধুঃ—দূরবর্তী প্রিয়জন অথবা প্রিয়জন থেকে দূরবর্তী, অহং—আমি, ত্বয়ি—তোমাতে অর্থাৎ তোমার কাছে, অর্থিত্বং—প্রার্থী, গতঃ—হয়েছি, অধিগুণে—গুণবানের কাছে, মোঘা—নিষ্ফল, যাচ্ঞা—প্রার্থনা, (অপি—বরং) বরম—শ্রেয়, ভালো, (পরং—কিন্তু), অধমে—অধম ব্যক্তিতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছে, যাচ্ঞা—প্রার্থনা, ন — নয়।

অন্বয়ার্থ ঃ পুষ্কর-আবর্তক প্রভৃতি ভুবনখ্যাত (কুলীন মেঘের) বংশজাত, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রকৃতি-পুরুষ (প্রধান অনুচর), যথেচ্ছ বিচরণশীল তোমাকে আমি জানি। তাই কপালদোষে (বিধিবশে) প্রিয়জন থেকে দূরবর্তী (প্রিয়াবিচ্ছিন্ন) আমি তোমার কাছে প্রার্থী হয়েছি। (কেননা) গুণবানের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও বরং শ্রেয়, (তথাপি) (নির্গুণ) অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনায় সফল হওয়া নয়॥৬॥

উজ্জীবনী ঃ পুষ্করাবর্তকানাং—পুষ্কর, আবর্ত (ক), সংবর্ত, দ্রোণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মেঘের উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। এরা প্রলয়-পয়োধিসৃষ্টিকারী, বলেছেন পূর্ণসরস্বতী—'পুষ্করাবর্তকা নাম প্রলয়সমাধিকারিণো মহান্তঃ পয়োধরবিশেষাঃ।' আবহ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত মেঘের প্রধান চারটি শ্রেণী—Cirrus (wisp), Cumulus (Heap), Stratus (sheet) ও Nimbus (the black and shapless rain-cloud) পুষ্কর, আবর্ত প্রভৃতি মেঘেরই অর্বাচীন নাম। কামরূপ—যথেচ্ছ রূপ গ্রহণকারী ও বিচরণশীল। লঘু-গুরু নির্বিশেষে রক্ত, শ্বেত, পীত, পাটল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ-রূপ গ্রহণকারী মেঘ প্রকৃতার্থে কামরূপ। মঘোনঃ—মঘবন্(ইন্দ্র) শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, অর্থ—ইন্দ্রের, প্রকৃতিপুরুষ—প্রধান পুরুষ। মেঘকে প্রধান পুরুষ বলার কারণ, দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে এই পর্জন্যদেব বৃষ্টিদান করে জগৎকে শস্যশালিনী করে তোলেন। বর্ষণ থেকেই অন্ন, আর অন্ন থেকেই জীবন—'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি, পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ।' বিশ্বহিতে জলবর্ষী মেঘের এই জীবন্মুখী ভূমিকার জন্যই সে ইন্দ্রের প্রধান সহচর—দক্ষিণহস্ত, তাই প্রকৃতিপুরুষ।

অন্য আর এক দিক থেকেও মেঘ প্রকৃতির রাজ্যে প্রধান পুরুষ। সমগ্র পূর্বমেঘ জুড়ে মানব-প্রকৃতি ও নিসর্গ-প্রকৃতির বিচিত্র লীলার সহচর এই মেঘ। দুঃখে, আনন্দে, সোহাগে, সমবেদনায়, কল্যাণে, প্রেমে লিখিল মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির উপর তার অমৃত-আশিস্‌ধারা ঝরে পড়ছে। প্রকৃতির প্রধান পুরুষ মেঘ ছাড়া আর কে? সমালোচক ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "তিনি (কালিদাস) এখানে মেঘকে প্রকৃতির প্রধান পুরুষরূপে দেখেছেন—এবং এখান থেকে আগাগোড়া দেখে যাবেন। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে শোভা-সৌন্দর্য, আনন্দ-উৎসাহ সব এনে দিচ্ছে এই প্রকৃতি - পুরুষ—ভুবনবিদিত অভিনব মেঘ।" ('মেঘদূত পরিচয়'—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য) দূরবন্ধুঃ—বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ—যে বন্ধন করে সেই বন্ধু, বন্ধু > বঁধূ, মূলে রয়েছে ঐ √বনধ্, অর্থ বন্ধন করা। দূরে বন্ধুর্যস্য সঃ দূরবন্ধুঃ—যার বন্ধু দূরে রয়েছে তিনি দূরবন্ধু, এখানে যক্ষের ক্ষেত্রে বিযুক্তভার্য অর্থাৎ দয়িতা-বিচ্ছিন্ন যক্ষের বিশেষণ।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা॥৭॥

অন্বয় ঃ পয়োদ! ত্বং সন্তপ্তানাং শরণম্ অসি। তৎ ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য মে সন্দেশং প্রিয়ায়াঃ হর। বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা যক্ষেশ্বরাণাং অলকা নাম বসতিঃ তে গন্তব্যা।

শব্দার্থ ঃ পয়োদ—পয়ঃ (জল) দান করে যে, জলবর্ষী মেঘ, ত্বং—তুমি, সন্তপ্তানাং—সন্তপ্তগণের, শরণং অসি—শরণ বা আশ্রয় হও, তৎ—সেই কারণে, ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য—

ধনপতির (কুবেরের) ক্রোধে (প্রিয়া) বিচ্ছিন্ন, মে—আমার, সন্দেশং—বার্তা, প্রিয়ায়াঃ—প্রিয়ার জন্য, হর—হরণ কর অর্থাৎ নিয়ে যাও, বাহ্যোদ্যানস্থিত—বাইরের উদ্যানস্থিত, হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা—মহাদেবের মস্তকাশ্রিত চন্দ্রালোকে বিধৌত অট্টালিকা (-শোভিত), যক্ষেশ্বরাণাং—যক্ষেশ্বরের (কুবেরের), অলকা নাম বসতিঃ—অলকা নামে বসতি, তে—তোমার, গন্তব্যা—গন্তব্যস্থল।

অন্বয়ার্থ ঃ ওগো জলদ! সন্তপ্তগণের আশ্রয় তুমি! তাই ধনপতি কুবেরের ক্রোধে প্রিয়া-বিচ্ছিন্ন আমার বার্তা (আমারই) প্রিয়ার জন্য (কাছে) নিয়ে যাও। বাইরের উদ্যানস্থিত, মহাদেবের মস্তকাশ্রিত চন্দ্রালোক-বিধৌত অট্টালিকাশোভিত, যক্ষেশ্বর কুবেরের অলকা নামে বসতি তোমার গন্তব্যস্থল।।৭।।

উজ্জীবনী ঃ সন্তপ্তানাং—সম্যকরূপে তপ্ত—ব্যথিতগণের, যক্ষ নিদাঘ ও বিরহ—উভয়ের দ্বারাই সন্তপ্ত, ধনপতি—ধনসম্পদ বা ঐশ্বর্যের অধিপতি কুবের—"কুবেরং ধনদং খর্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েদ্ যক্ষগুহ্যক-সেবিতম্।।" (কুবেরের ধ্যানমন্ত্র)। অলকা—অলকা নামক কুবেরপুরী। 'বৃহৎসংহিতা'য় বরাহমিহির উল্লেখ করেছেন, 'অলক' এক জাতীয় মানুষ, তা থেকে স্ত্রীলিঙ্গে অলকা হতে পারে। আবার অলক—চূর্ণ কুন্তল, তা থেকে এরূপ কুন্তলের অধিকারিণী নায়িকাদের বাসস্থল অলকা—এমন অর্থও করা যায়। হর্ম্য—উচ্চ অট্টালিকা, মূল অর্থ ছিল ঘর্ম্য—ঘর্মায় ইদম্ ঘর্ম্যম্ অর্থাৎ গরম ঘর, পরে অর্থ পরিবর্তনে হল ঘর্ম্য (ঘাম) দূরীকরণের আশ্রয় অর্থাৎ আরামগৃহ। ঘর্ম্য > হর্ম্য (গ-ব্যঞ্জনলোপ ও হ-কারীভবন) √হৃ নিষ্পন্ন এই শব্দটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন 'হরতি মনঃ ইতি হর্ম্যম্'—যা মন হরণ করে তাই হর্ম্য—অর্থাৎ সুন্দর বহুতল অট্টালিকা। মল্লিনাথ হর্ম্য-এর অর্থ করেছেন 'ধনিক ভবনানি'—ধনীদের (মনোহর) ভবনসমূহ। যক্ষেশ্বরাণং—যক্ষেশ্বর কুবেরের—গৌরবে বহুবচন।

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদগৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়দাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ।।৮।।

অন্বয় ঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ (সত্যঃ) পবনপদবীম্ আরূঢ়ং ত্বাং প্রেক্ষিষ্যন্তে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি) বিরহবিধুরাং জায়াং কঃ উপেক্ষেত? অন্যঃ অপি জনঃ যঃ অহমিব পরাধীনবৃত্তিঃ ন স্যাৎ?

শব্দার্থ ঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ—উদ্‌গৃহীত—উপরে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ তুলে ধরেছে, অলকান্তাঃ—অলক—অন্তাঃ—অলক বা চূর্ণকুন্তলের প্রান্ত এমন যে সকল রমণী, পথিকবনিতাঃ—দেশান্তরগামী পান্থদের স্ত্রীগণ (প্রোষিতভর্তৃকা), প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ—প্রত্যয়াৎ দৃঢ়বিশ্বাসে, আশ্বসত্যঃ—আশায় বুক বেঁধে, আশ্বস্ত হয়ে, (সত্যঃ—হয়ে) পবনপদবীম্—পবনপথে, বায়ুমার্গে অথবা আকাশে, আরূঢ়ং ত্বাং—আরূঢ় (আরোহণকারী) তোমাকে, প্রেক্ষিষ্যন্তে—দেখবে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি)—তুমি আকাশে ঘনীভূত (উদিত) হলে, বিরহবিধুরাং জায়াং—বিরহবিধুরা জায়াকে, কঃ উপেক্ষেত—কে উপেক্ষা করবে? অন্য অপি যঃ জনঃ—অন্য কোনো ব্যক্তি, অহমিব পরাধীনবৃত্তি—আমার মতো জীবিকার জন্য পরাধীন, ন স্যাৎ—না হয়।

অন্বয়ার্থ ঃ অলকগুচ্ছের প্রান্তভাগ উপরে তুলে প্রোষিতভর্তৃকা রমণীরা প্রত্যাশায় বুক বেঁধে (আশ্বস্ত হয়ে) আকাশপথে আরূঢ় তোমাকে দেখবে। তুমি আকাশে উদিত হলে বিরহবিধুরা জায়াকে কে উপেক্ষা করবে, যদি না সে আমার মতো জীবিকার জন্য পরাধীন হয়?।।৮।।

উজ্জীবনী ঃ পবন-পদবী—পবনের পদবী বা পথ। পথ, মার্গ প্রভৃতি অর্থে পদবী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদের আমল থেকেই প্রচলিত—'পদবীঃ কবীনাম্' (ঋগ্বেদ ৩.৫.১)—কবিদের বিচরণের পথ। অর্থ পরিবর্তনে বর্তমানে পদবী—অধিকার, পদ, দশা, উপাধি (Title) প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত। পথ অর্থে শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত। অলক—চূর্ণকুন্তল, চিকুর—'কুটিলঃ কুন্তলঃ চূর্ণকুন্তলঃ' (অমরকোষ)। অলক—মুখশোভাঃ বর্ধক, তাই ভরতমুনি অর্থ করেছেন—'অলতি ভূষয়তি মুখম্ ইত্যলকম্।' শব্দটি কালিদাসের মতো রবীন্দ্রনাথেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'অলকে কুসুম না দিয়ো,' 'অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী/কথা কইত শৌরসেনী.....', অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে' প্রভৃতি 'অলক' শব্দের বহুল ব্যবহার রবীন্দ্র সাহিত্যে সুলভ। পথিক বনিতা—বনিতা—স্ত্রী < √বন্—কামনা করা। 'পন্থানঃ গচ্ছন্তি তে পথিকাঃ'—পথে চলেছে এমন পুরুষ, ভ্রমণশীল (প্রবাসী) পান্থ, তাদের স্ত্রী অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকা রমণিগণ। আশ্বসত্যঃ—বিশ্বসিতাঃ—বিশ্বাস হেতু আশ্বস্তা। সন্নদ্ধ—ব্যাপৃত, উদিত। পরাধীনবৃত্তি—মল্লিনাথ অর্থ করেছেন, 'পরায়ত্তজীবনকঃ' অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকার জন্য যে পরায়ত্ত বা অপরের অধীন। বিধুরা—বিশিষ্ট ধুর (ভার, দুঃখ, ক্লেশ) যাদের তারা অর্থাৎ বিরহক্লিষ্টা, চঞ্চলা নায়িকা, বধূ প্রভৃতি।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ।।৯।।

অন্বয় ঃ অনুকূলঃ পবনঃ ত্বাং মন্দং মন্দং যথা নূদতি, অয়ং সগন্ধঃ চাতকঃ চ তে বামঃ মধুরং নদতি, গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ খে আবদ্ধমালাঃ বলাকাঃ নয়ন সুভগং ভবন্তং নূনং সেবিষ্যন্তে।

শব্দার্থ ঃ অনুকূলঃ পবনঃ—অনুকূল বাতাস, ত্বাং—তোমাকে, মন্দং মন্দং—শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে, যথা—যেমন, নুদতি—ঠেলে নিয়ে যাবে, অয়ং—এই, সগন্ধঃ চাতকঃ—সগর্ব (গর্বিত) অথবা সুরভিত চাতকও (তেমনি), তে বামঃ—তোমার বাম ভাগে, মধুরং—মধুর স্বরে, নদতি—গান করবে (ডাকবে), গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ—গর্ভাধান-কালের পরিচয়ের জন্য, খে—আকাশে (খ—আকাশ), আবদ্ধ মালাঃ—মালার মতো রচিতশ্রেণী, বলাকাঃ—বকপঙ্‌ক্তি, হংসবলাকাশ্রেণী, নয়নসুভগং—নয়নশোভন, ভবন্তং—তোমাকে, নূনং—অবশ্যই, সেবিষ্যন্তে—সেবা করবে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) অনুকূল বাতাস তোমাকে যেমন ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যাবে, এই সগর্ব (সুরভিত) চাতক ও (তেমনি) তোমার বামভাগে সুমধুর কূজন করবে (ডাকবে)। গর্ভাধানকালের পরিচয়ের জন্য (অর্থাৎ গর্ভধান ঋতু সমাগত—এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য) আকাশে আবদ্ধমালা বকপঙ্‌ক্তি (হংস—বলাকাশ্রেণী) নয়নশোভন তোমাকে অবশ্যই সেবা করবে।।৯।।

উজ্জীবনী ঃ অনুকূল পবন—যক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বাতাস। মেঘ বায়ুবাহনের উপর ভর করে উড়ে যাবে উত্তরাপথে অলকার দিকে। তাকে সাহায্য করবে পবন, তাই অনুকূল পবন। অনুকূল পবন—শুভলক্ষণ সূচক। মন্দং মন্দং—অব্যয়; অর্থ ধীরে ধীরে, মৃদুভাবে। বাংলায় মৃদুমন্দ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়—"অতিশীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা। সখী বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা।।" (বৈষ্ণব পদাবলী) নুদতি—√নুদ—প্রেরণ করা, নিয়ে যাওয়া, রাখা, উদ্দীপিত করা প্রভৃতি। নদতি—√নদ্—কৃত্রিম শব্দ করা, কূজন করা, গান করা প্রভৃতি। অনুকূল বায়ু, পক্ষীর কূজন, বলাকাশ্রেণী প্রভৃতি শুভ লক্ষণ—'অনুকূলমারুতচাতকশব্দিতবলাকাদর্শনানাং শুভসূচকত্বং শকুনশাস্ত্রে দৃষ্টম্।'—বলেছেন মল্লিনাথ। সগন্ধঃ—গন্ধযুক্ত বা গন্ধবহ, মল্লিনাথ অর্থ করেছেন গর্বিত। সগন্ধ পদটিকে চাতকের বিশেষণ ধরে নিয়ে মল্লিনাথ থেকে একালের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজশেখর বসু, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ মেঘদুত-ব্যাখ্যাতাগণ সগন্ধঃ চাতকঃ-এর অর্থ করেছেন গর্বিত চাতক। আবার কেউ কেউ সগন্ধ অর্থে 'সম্বন্ধী' (Brother-in-law) পদের ব্যবহার সমীচীন মনে করেছেন। তাঁদের মতে মেঘের সঙ্গে চাতকের ভগিনীপতি-শ্যালক সম্পর্ক। কিন্তু মেঘদূত কাব্যের অনুষঙ্গে কি 'গর্বিত,' কি 'সম্বন্ধী' কোনো পদেরই অর্থসঙ্গতি নেই। মনে হয়, এগুলি কষ্টকল্পনা। চাতকের নিজস্ব সৌরভ থাকতে পারে। সগন্ধ অর্থাৎ গন্ধবহ সুরভিত চাতক অর্থও দূষণীয় নয়। এছাড়া সগন্ধ পদটি একটু দূরান্বয়ী হলেও পবনের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায়। তাতে অর্থ হয় অনুকূল সুগন্ধ পবন। এতে অর্থসঙ্গতি রক্ষা হয়, কষ্টকল্পনারও প্রয়োজন থাকে না।

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।।১০।।

অন্বয় ঃ অবিহতগতিঃ ত্বং দিবসগণনাতৎপরাং (অতঃ) অব্যাপন্নাং এক পত্নীং তাং ভ্রাতৃজায়াং চ অবশ্যং দ্রক্ষ্যসি। (যতঃ) আশাবন্ধঃ হি কুসুমসদৃশং বিপ্রয়োগে সদ্যঃপাতি অঙ্গনানাং প্রণয়িহৃদয়ং প্রায়শঃ রুণদ্ধি ।

শব্দার্থ ঃ অবিহতগতিঃ ত্বং—অব্যাহতগতি, অপ্রতিহতগতি তুমি, দিবসগণনাতৎপরাং—দিন গুণতে তৎপর (অতএব), অব্যাপন্না—অবিপন্না, অমৃতা, জীবিতা, এক পত্নীং—একমাত্র পতি যার অর্থাৎ পতিব্রতা, তাং ভ্রাতৃজায়াং চ—সেই (তোমার) ভ্রাতৃজায়াকেও (যক্ষবধূকে), অবশ্যং—অবশ্যই, দ্রক্ষ্যসি—দেখবে। (যতঃ—কেননা) আশাবন্ধঃ—আশারূপ বন্ধন বা আশারূপ বৃন্ত, কুসুমসদৃশং—ফুলের মতো, বিপ্রয়োগে—বিচ্ছেদে বা বিরহে, সদ্যঃপাতি—সদ্যভগ্ন অর্থাৎ ভঙ্গুর, অঙ্গনানাং-অঙ্গনাগণের, প্রণয়িহৃদয়ং—প্রণয়ে ভরা হৃদয়কে, প্রায়শঃ—বহুলভাবে, গভীরভাগে, প্রায়শঃ, রুণদ্ধি—রক্ষা করে, ধরে থাকে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) অব্যাহত গতি—দুর্নিবার তুমি, দিন গুণতে তৎপর (অতএব) অবিপন্না—অমৃতা (জীবিতা), পতিব্রতা, (তোমার) সেই ভ্রাতৃজায়াকেও অবশ্যই দেখতে পাবে। (কেননা) আশারূপ বৃন্ত

(আশাবৃন্ত) বিচ্ছেদে সদভগ্ন ফুলের মতো প্রণয়ে ভরা (কোমল) হৃদয়কে প্রায়শঃ (গভীরভাবে, বহুলভাবে) ধরে থাকে (রক্ষা করে থাকে)।।১০।।

উজ্জীবনী ঃ দিবসগণনাতৎপরা—দিন গুণতে তৎপর, প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা। অমরকোষ 'তৎপরা' শব্দের অর্থ করেছেন আসক্ত—'তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ।' প্রিয়াবিরহিণী নায়িকা প্রবাসী নায়কের (স্বামীর) গৃহপ্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি দিনের হিসেব রাখত। এমন এক নায়িকার বর্ণনা পাই কবি সাতবাহন হাল রচিত 'গাহাসত্তসঈ'র (গাথাসপ্তশতী) প্রাকৃত শ্লোকে। এখানে নায়িকা প্রিয়সমাগমপ্রত্যাশায় 'আজই গেল, আজই গেল, আজই গেল—এইরূপ গণনা করে দিবসের প্রথমার্ধেই গৃহকুড্য বা ঘরের দেওয়ালটিকে রেখা দ্বারা চিত্র-বিচিত্র করেছে—"অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গত্তত্তি গণরীত্র। পঢ়মে বি অ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও।।" উত্তরমেঘে কালিদাস অনুরূপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সেখানে অবশ্য নায়িকা দেহলীতে রাখা ফুলগুলি ভূমিতে সাজিয়ে বিরহ দিবস থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট মাসগুলি গণনা করেছে—'বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।' (উত্তরমেঘ ৯৩) বন্ধঃ—বৃন্ত বা বোঁটা(<সং বন্ধ, বৃন্ত > বন্ট > বোঁটা); আবার 'বধ্যতে অনেন ইতি বন্ধঃ বন্ধনম্ বৃন্তম্'—বেঁধে রাখে বা ধরে রাখে বলেই বন্ধ-বন্ধন, বৃন্ত। আশার বন্ধন সদুঃসহ বিরহ-যাতনাও লাঘব করে। মানব জীবনে আশার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সবদেশের সাহিত্যেই প্রতিফলিত। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' (মধুসূদন) অথবা 'ধন্য আশা কুহকিনী' (আশা—নবীনচন্দ্র সেন) প্রভৃতি বাঙালি কবির কাব্যে আশার ভূমিকা যেমন, তেমনি কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতেও বিপ্রকৃষ্টা নায়িকার উজ্জীবন বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। নায়িকা প্রিয়বিরহে যখন বলেন—"এখন তখন করি দিবস গমাওল/দিবস দিবস করি মাসা।/মাস মাস করি বরষ গমাওল/ছোড়লুঁ জীবনক আশা।।" তখন কবি তাকে আশ্বস্ত করেছেন—"ভণই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি/জীবনবন্ধন আশ-পাশ।" John Donne-এর 'Love Song' কবিতাতে প্রিয়বিরহে পতিব্রতা নায়িকা একই প্রত্যাশার বাণী উচ্চারণ করেছে—

"If our two loves be one, or thou and,
Loves so alike that none do slaken,
None can die."

আশা অর্থে 'আশা দিগতিতৃষ্ণয়োঃ' বলেছেন যাদব। ভ্রাতৃজায়া—বলার উদ্দেশ্য গুরুসম্বন্ধী; কামরূপ মেঘ যাতে সুন্দরী যক্ষপত্নীকে দেখে প্রলুব্ধ না হয় তারজন্যই এই সতর্কতা। যক্ষ যে সেয়ানা পাগল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সদ্যঃপাতি—সদ্যঃ—সবেমাত্র, পাতি—পতনশীল, ভ্রংশনশীল, সমাসবদ্ধ হয়ে সদ্যঃপাতি, অর্থ সদ্য-প্রস্ফুটিত (এই বুঝি ঝরে পড়বে এমন) ফুল। প্রণয়িহৃদয়ং—প্রণয়—প্রেম, স্নেহ, সৌহৃদ্য, বিশ্বাস প্রভৃতি। প্রণয় আছে যার যে প্রণয়ী, প্রণয়ে ভরা হৃদয়—প্রণয়িহৃদয়, (সমাসবদ্ধ) , কুসুমসদৃশং—ফুলের মতো (পবিত্র, কোমল, সুকুমার), অঙ্গনা—'সুন্দরাঙ্গী রমণী। অঙ্গনা শব্দে অঙ্গ সৌন্দর্যের দ্যোতনা এল।

মেঘদূতে (পূর্বমেঘ) ব্যবহৃত সুভাষিত

মহাকবি কলিদাস মেঘদূতকাব্যে (পূর্বমেঘ) যে সকল শাশ্বতবাণী বা সুভাষিত ব্যবহার করেছেন সেগুলি ভাবের মাধুর্যে ও অনুভূতির গভীরতায় অনুপম। এক দিক থেকে তাঁর ব্যবহৃত সুভাষিতগুলি অভূতপূর্ব, অনাস্বাদিত ও মৌলিক। অন্য দিক থেকে, সেগুলি মূল বক্তব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে গ্রথিত এবং নিবিড় জীবনরসে পূর্ণ। অনেকখানি ভাবকে সংহত, স্ফটিকঘন ভাষায় প্রকাশের উজ্জ্বল নিদর্শনও সেগুলি। ঐ সকল বহুমূল্য প্রৌঢ়োক্তির মধ্যে বাছাই করা কয়েকটি নমুনাস্বরূপ এখানে উল্লিখিত হল।—

১। 'মেঘালোকে ভবতি সখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'—মেঘ দেখলে সুখী মানুষের মনও উতলা আনমনা হয়। [পূর্বমেঘ ৩]

২। 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'—চেতন-অচেতনের বিচারে কামার্তগণ স্বভাবতই কৃপার পাত্র হয়ে থাকে [পূর্বমেঘ ৫]

৩। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'।—অধমের কাছে প্রার্থনা করে সফল হওয়ার চেয়েও বরং অধিকগুণশালীর কাছে প্রার্থনা করে নিষ্ফল হওয়াও শ্রেয়। [পূর্বমেঘ ৬]

৪। 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং

সদ্যঃপাতি প্রণয়ীহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।—বিরহে বা বিচ্ছেদে আশারূপ বৃন্ত সদ্যভগ্ন ফুলের মতো প্রণয়ে ভরা (কোমল) হৃদয়কে প্রায়শই রক্ষা করে থাকে। [পূর্বমেঘ ১০]

৫। 'শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তমৈব প্রার্থনাচাটুকারঃ।'—শিপ্রা নদীর বাতাস চাটুকারের প্রার্থনার মতো প্রিয়। [পূর্বমেঘ ৩২]

৬। 'মন্দায়ন্তে ন খলু সহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ'—যারা প্রয়োজনীয় বা অভিপ্রেত কাজটি করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা কখনো মন্দগতি বা ঢিলে হয় না। [পূর্বমেঘ ৩৯]

৭। 'আপন্নার্তিপ্রশমনফলা সম্পদোহ্যুত্তমানাম্'—বিপন্নদের দুঃখ লাঘব করাই হল মহৎ (উত্তম) ব্যক্তির সম্পদ। [পূর্বমেঘ ৫৪]

৮। 'কে বা ন স্যু পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ'—নিষ্ফল কার্যারম্ভে (অ-কাজের কাজে) যাদের উৎসাহ তারা চিরকাল পরাজিত বা ব্যর্থই হয়ে থাকে।

৬.১.৪. ৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (বর্ণানুক্রমিক)

১। অনুবাদে মেঘদূতঃ সার্ধশতবর্ষ (প্রথম খণ্ড)—ড. নরেশচন্দ্র জানা

২। অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৩। অমরুশতক (১৩৭২)—শ্রীবামাপদ বসু-অনূদিত

৪। অলঙ্কার-চন্দ্রিকা (২য় সং, ভাদ্র-১৩৬৩)—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

৫। আরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব (২য় সং ১৩৬৯)—ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৬। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধ্বন্যালোক (বঙ্গানুবাদ, ১ম সং, ১৩৬৪)—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

৭। উর্দু প্রেমের কবিতা (১ম সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৮। উপমা কালিদাস্য (১ম সং)—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৯। ঋগ্বেদসংহিতা (বঙ্গানুবাদ ১৯৬৩)—রমেশচন্দ্র দত্ত

১০। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (৪র্থ সং, ১৩৭২)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১১। কাব্য-জিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী ১৯৬১)—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১২। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র), বসুমতী (১০ম সং-১৩৬০)—রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১৩। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম সং, ১৯৬৫)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৪। কাব্যালোক (৩য় সং, ১৩৭৩)—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১৫। কাব্যকৌতুক (১লা আশ্বিন, ১৩৬৩)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৬। কালিদাসের কাব্যে ফুল (১ম সং, বুকল্যান্ড, কলিকাতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী (১ম সং, ১৯৬২)—ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

১৯। গাহা সওসঈ (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২০। পারস্য সাহিত্য-পরিক্রমা (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২১। পুরাণ প্রবেশ (২য় সং, ১৩৮৫)—গিরীন্দ্রশেখর বসু

২২। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড,১৩৭১)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী।

২৪। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (১ম সং, ১৩৫৯)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন

২৭। মেঘদূত পরিচয় (১ম সং, ১৩৭৪)—শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২৮। মেঘদূত জিজ্ঞাসা (২য় সং, ২০০৫)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৯। রবিদীপিতা (৩য় মুদ্রণ)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৩০। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (২য় সং, ২০০০)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৩১। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (২য় খণ্ড)—নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯

৩২। Aristotle on the Art of Poetry (Oxford Univ. Press, 1962)–Trs. by I. Bywater.

৩৩। An Introduction to Modern Knowledge–Abercrombie

৩৪। History of Indian Literature (Vol 1-3, 1963)–M. Winternitz

৩৫। Kalidasa : A Critical Study (Bharatiya Vidya Prakashan, 1977)–A.D. Sing

৩৬। The Meghaduta–(1st Ed. Sahitya Akademi, New Delhi, 1957)–Dr. S. K. De

৬.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। আধুনিক কাব্যের বিচারে 'মেঘদূত'কে গীতিকাব্য বলা যায় কি? তোমার মতামত আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।

৩। মেঘদূত কাব্য (পূর্বমেঘ) অবলম্বনে কালিদাসের নিসর্গচেতনার পরিচয় দাও।

৪। মেঘদূত কাব্যের 'পূর্বমেঘ' অবলম্বনে চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৫। রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের সৌন্দর্য-শোভার বর্ণনায় কবির কুশলতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। মেঘদূত কাব্যের উপমা সৃষ্টিতে কবির অন্যনতা কোথায় তা পূর্বমেঘ থেকে কয়েকটি উপমা চয়ন ও তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৭। 'মেঘদূত' কাব্যের নদীগুলি কেবল প্রকৃতির সম্পদ মাত্র নয়, বিরহিণী নায়িকা'।—প্রকৃতি-নদী ও নারী এই কাব্যে কীভাবে অভিন্নতা লাভ করেছে তা পূর্বমেঘ অবলম্বনে উপস্থাপন করো।

৮। মেঘদূত (পূর্বমেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিতাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করো।

৯। 'মেঘদূত সম্ভোগের উজ্জ্বল চিত্রাবলী—সমালোচকের এই মন্তব্য মেঘদূত কাব্যের 'পূর্বমেঘ' সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কিনা তা আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।

১০। 'মেঘদূত' (পূর্বমেঘ) অবলম্বনে কালিদাসের জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

১১। উল্লেখযোগ্য শ্লোকগুলি থেকে বিষয়ভিত্তিক (Textual) প্রশ্ন থাকবে। দৃষ্টান্ত যেমন—'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।' —এই বাক্যের বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? পঙ্‌ক্তিটির ভাব-তাৎপর্য বিশদ করো।

❖ অনুরূপভাবে শ্লোক ধরে ধরে প্রশ্ন থাকবে।

———

পর্যায় গ্রন্থ-২

মেঘদূত (উত্তরমেঘ)

একক - ৫

বিরহভাবনা

বিন্যাসক্রম ঃ

৬.২.৫.১ ঃ বিষয়সূচী

৬.২.৫.২ ঃ মেঘদূত কাব্যের বিরহ-ভাবনা

৬.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৫.১ঃ বিষয়সূচী

বিষয়	শ্লোক	বিষয়	শ্লোক
অলকা			
প্রাসাদ	১	মদনের ষষ্ঠবাণ	১২
অলকাবধূ	২	কল্পবৃক্ষ	১৩
অলকার সৌন্দর্য	৩	**যক্ষগৃহ**	
যক্ষ	৪-৫	তোরণ ও মন্দারবৃক্ষ	১৪
যক্ষকন্যা	৬	বাপী	১৫
পানোৎসব	৭	ক্রীড়াশৈল	১৬
ক্ষুদ্র অভ্রবৃন্দ	৮	মাধবীকুঞ্জ	১৭
যক্ষদম্পতি	৯	ময়ূর	১৮
বৈভ্রাজ উপবন	১০	শঙ্খপদ্মচিহ্ন	১৯
অভিসারপথ	১১	মেঘের দৃষ্টিসঞ্চার	২০
		যক্ষবধূ	২১-৩৭
		মেঘসন্দেশ	৩৮-৫৪

৬.২.৫.২ঃ মেঘদূত কাব্যের বিরহ-ভাবনা

প্রেমের দুটি প্রান্ত—মিলন ও বিরহ অথবা বিরহ ও মিলন। বিচ্ছেদের অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র পেরিয়ে মিলনের মঙ্গলমাধুর্য দয়িত-দয়িতার জীবনকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে। এই জন্যই বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতো' অর্থাৎ বিরহ ছাড়া মিলন পূর্ণতা পায় না। বিরহ-মিলনের মঙ্গলগীতি যুগে যুগে কবিদের সারস্বত অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে, আনন্দ দিয়েছে অগণিত সাহিত্যরসলিপ্সুদের। কালিদাসের মেঘদূত এমনি একটি মহৎ কাব্য যাতে বিরহের সকরুণ আর্তি ও মিলনের মাধুর্য একাকার হয়ে মিশ্ররসে পূর্ণ এক অনাস্বাদিত ভাবরসলোককে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

মেঘদূত কাব্য বিরহী-প্রেমিক যক্ষের বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা। এই স্মৃতিচারণাসূত্রে তার 'রোদনভরা বসন্তের' বা বসন্তবিলাপের পরিচয়ে ঋদ্ধ ও ভাস্বর মেঘদূত কাব্যের দুই পর্ব-পূর্ব ও উত্তরমেঘ। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'Nostalgia', ইংরেজ কবি টেনিসনের 'In Memorium' তার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু তাঁর রচনার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল জগতের প্রথম নস্টালজিক কাব্য মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মৎপ্রণীত 'মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি।—

"মেঘদূত কাব্যখানা যক্ষের স্মৃতিসুধারসে আর্দ্র অশ্রুর নির্ঝর। সুখের স্মৃতির সঙ্গে বেদনার ভাবস্পর্শে তার সুদূরপ্রসারী কল্পনা বহুগুণিত হয়ে বিরহিণী বধূর করুণা মাখানো একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য উপহার দিয়েছে—

"আলিঙ্ক্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ।
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কলি ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।" [উ.মে. ৪৬]

[(সৌগন্ধ্যসুরভিত) হিমাদ্রির যে বাতাস দক্ষিণ দিকে বইছে, ওগো গুণবতি,

তোমার অঙ্গ তাদের দ্বারা পূর্বস্পৃষ্ট, এই ভেবে আমি তাদের (বায়ুদলকে) মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করি।] বিরহী প্রেমিকের চোখের জলে যে নির্ঝর বেগবান তা নিখিল নিসর্গলোক ব্যাপ্ত করে উপলব্ধির প্রশান্ত সাগরে বিলীন হয়েছে। সেখানে বিরহ-মিলনের অনন্ত সুখার্তি বাঙ্ময় হয়েছে সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যের মতো মিলনে বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদের আর্তি (প্রেমবৈচিত্র্য) নেই। সমগ্র পূর্বমেঘ জুড়ে বিরহ-মিলনের অন্ত্যহীন বৈচিত্র্য কামনার বৃন্তে সৌন্দর্যের ফুল হয়ে ফুটেছে। পূর্বমেঘ সেই বাসনারক্তিম বিরহার্ত 'বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ' (রবীন্দ্রনাথ) যেখানে যক্ষদূত মেঘের প্রয়াণের পথরেখায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বর্ণগন্ধময় উপস্থিতি নিসর্গলোকে প্রতিফলিত হয়ে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে তুলেছে। এই সৌন্দর্য-সম্ভোগের পর্যবসান প্রেমানুভূতির সুনির্মল রসলোকে।" ['মেঘদূত-জিজ্ঞাসা' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

আসলে মেঘদূত কাব্যের মূল আশ্রয় সুনির্মল ও সুনিবিড় প্রেমানুভূতি। এই প্রেমের গৌরবময় বোধই সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় প্রেমিক হৃদয়কে সংবেদনশীল মাধুর্যরসে পূর্ণ করে। সুদীর্ঘ বা ক্ষণস্থায়ী কোনো কালসীমায় একে আবদ্ধ করা চলে না। কেননা মিলনের মঙ্গল মাধুর্যই হোক বা বেদনার দীর্ণতাই হোক, ভাবটি তো চিরকালের! সেই চিরায়ত ভাবটিই কবিসৃষ্টির আন্তরিকতায় হৃদয়ের রঙে, হৃদয়ের স্পর্শে নিখিল বিশ্বের চিত্তলোকে স্থায়ী হয়। এই অকৃত্রিম, প্রাণবান, আবেগদীপ্ত প্রেমের ভাবটিই বিশ্বজয়ী। মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ পর্যায়ে বিরহের এক অন্তলান্ত মহিমা কালজয়ী হয়েছে। এতেই মগ্ন হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়, বোধকরি স্রষ্টা কবিরও হৃদয়। যক্ষ নামধেয় অনির্দেশ্য সত্তাচেতনার আড়ালে স্পন্দিত কবিহৃদয়ের আর্তি 'বিশ্বের প্রবাসী প্রিয়জনদের চিরন্তন বিচ্ছেদার্তির' সূচক হয়ে মেঘদূতকে গীতিকাব্যে (Lyric Poetry) পরিণত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

"মেঘদূত যক্ষের বিচ্ছেদক্রন্দন ও মিলনার্তি আসলে কবির অন্তরাত্মারই আকুল ক্রন্দন—সীমাবদ্ধ জীবন থেকে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে মুক্তির জন্য ক্রন্দন। মেঘদূতে যক্ষের ভাবছায়ায় 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দনে' সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিখিল বিশ্বলোকে, জাগিয়ে তুলেছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত বিরহ-বেদনা। কাব্য-কাহিনী নয়, নিসর্গচিত্রণ নয়—সব কিছুকে ছাপিয়ে জেগে ওঠে বিরহী প্রেমিক সত্তার শাশ্বত বিরহসঙ্গীত, ইংরেজ কবি ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভাষায় সেই 'Eternal Passion! Eternal song'. (Philomela–Mathew Arnold) বিচ্ছেদেই প্রেম ঘনীভূত হয়—এই কথাটি উত্তরমেঘে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন কালিদাস—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাৎ
ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি।।" (উত্তরমেঘ ৫১)

তাই চিরন্তন বিরহের কাব্যরূপে মেঘদূতের ভাবমূর্তিটি আজও অম্লান হয়ে আছে। প্রেমের সেই নিবিড় অন্তঃসার অনুভব থেকেই উদার যক্ষের প্রার্থনা—'মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।' (উত্তরমেঘ ৫৪) মেঘ ও বিদ্যুতের প্রতীকে প্রেমিক যক্ষ যেন বিশ্বের বিরহী-বিরহিণীর মর্মব্যথাকেই প্রকাশ করেছে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা,' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মেঘদূত কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ কাব্যখানি পাঠ করে তার মধ্যে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে মেঘদূত বিরহের কাব্য কিন্তু কেবল পার্থিব বিচ্ছেদার্তির কাব্য নয়, কেননা তার মধ্যে আভাসিত হয়েছে বিরহের বিমূর্ত ভাব-ব্যঞ্জনা। সেই ভাব-ব্যঞ্জনাকে তিনি তুলে ধরেছেন এই ভাবে—

(১) মানুষের মধ্যে দেশে দেশে বিরহ—এক দেশের মানুষের জন্য অন্যদেশের মানুষের বিরহ।

(২) কালে কালে বিরহ—এক কালের মানুষের সঙ্গে অন্য কালের মানুষের বিরহ।

(৩) মানস বিরহ—একই মানুষের অন্তরে রয়েছে যে অবিনশ্বর মানুষ—অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই অবিনশ্বর মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের মানস বিরহ।

মেঘদূত কাব্যে যক্ষের ভাবছায়ায় ব্যক্তি-কবি-আত্মার মানসাভিসার পাঠক-পাঠিকাকে এক দিব্য ভাবলোকে পৌঁছে দেয়। এই দিব্য ভাবলোকই হল মেঘদূত কথিত কৈলাসের অন্তর্গত অলকা-যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার স্বপনপুরী। সশরীরে সেখানে যাওয়া যায় না বলে কল্পনাকে দূত করে মানসাভিসারে বের হতে হয়, এ ছাড়া অন্যপথ নেই। কবিও সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—

"সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।"

একক - ৬

কাব্যের চরিত্র

বিন্যাসক্রম

৬.২.৬.১ মেঘদূত কাব্যের চরিত্র

৬.২.৬.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৬.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৬.১ মেঘদূত কাব্যের চরিত্র

মেঘদূত ভাবপ্রধান প্রেমগীতিকা। কিন্তু কেবল ভাব বা আইডিয়াকে অবলম্বন করে সেই গীতিকার সৌরভ ফোটে না। একটা স্বপ্ন-কল্পনাশ্রিত ভাবাবেগকে প্রকাশ করবার জন্য উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন। মেঘদূত কাব্যের আধার বিরহী যক্ষ, আধেয় তার বিরহ-বেদনা -—রোদনভরা বসন্তবিলাপ। সুতরাং স্বপ্ন-কল্পনাবিলাসী যক্ষই মেঘদূত কাব্যের প্রধান চরিত্র। তার আনন্দ-বেদনা-বিধুর-মিলন-বিরহের কলোচ্ছ্বাস এই কাব্যের জীবনসঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাটা যে বিরহদীর্ণা অলকানিবাসিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সেই তার দ্বিতীয় জীবন (জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্) প্রিয়তমা যক্ষবধূ রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যে যিনি জগতে অতুলনীয়, বিধাতার আদিসৃষ্টি (সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ)। সুতরাং মেঘদূত কাব্যের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র অনামিকা যক্ষপ্রিয়া।

মেঘদূত দূতকাব্য। সুতরাং কাব্যবাণী—যক্ষের বিরহবার্তা প্রিয়তমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য একজন উপযুক্ত, সংবেদনশীল দয়াবান ও সুজন বাহন থাকা চাই। ইন্দ্রের প্রধান সহচর (প্রকৃতি পুরুষ),

যেখানে খুশি গমনশীল (কামরূপ), বন্ধুবৎসল, দরদী পর্জন্যদেব মেঘ ছাড়া তেমন উপযুক্ত পাত্র আর কেই বা হতে পারে? যার নামের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে উদ্দিষ্ট কাব্যের অভিব্যঞ্জনা —মর্মবাণী সেই কোমলস্বভাব মেঘদূতই প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক প্রধান চরিত্র।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে মেঘদূত কাব্যে পূর্বোক্ত তিনটি চরিত্রের পাশে আরও একটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এই চরিত্রটি একটা বিমূর্ত ভাবের নান্দনিক প্রকাশস্বরূপ বিশ্ববিমোহন নিসর্গ প্রকৃতি। বস্তুত এই নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য - সুষমাকে বাদ দিয়ে মেঘদূত কাব্যের রসাস্বাদন বৃথা। উজ্জীবন্ত নর-নারীর মতো প্রকৃতির কবোষ্ণ নিঃশ্বাস সমগ্র মেঘদূত কাব্যকে অতুলনীয় সৌন্দর্যেও প্রাণরসে পূর্ণ করে তুলেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"নিখিল নিসর্গ প্রকৃতিও একটি বিরাট চরিত্র। শোভা - সম্পদে, ঐশ্বর্যে-ধ্যানে, ব্যক্তিত্বের মহিমায় যক্ষের বিরহ-বেদনাকে সর্বব্যাপক রূপ দান করে সহযোগী সত্তারূপে সে আমাদের হৃদয়াসন জুড়ে বসেছে। কত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়, ঐশ্বর্যদীপ্ত অভিব্যক্তি তার!" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

একক - ৭

ছন্দ - উপমা

বিন্যাসক্রম

৬.২.৭.১ মেঘদূত কাব্যের ছন্দ: মন্দাক্রান্তা ও বাংলা ছন্দ
৬.২.৭.২ মেঘদুত কাব্যের উপমা
৬.২.৭.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.২.৭.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৭.১ মেঘদূত কাব্যের ছন্দ ঃ মন্দাক্রান্তা ও বাংলা ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যের গঠনশৈলীর অন্যতর উপাদান হল ছন্দ। কাব্য সৃষ্টিতে ছন্দোরচনায় নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে শ্রুতিমাধুর্যের বিশেষ মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দের যাদুকর কালিদাস শ্রুতিনন্দন ছন্দোনির্মাণে অসামান্য বুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সেই অসামান্যতা প্রমূর্ত হয়েছে মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রয়োগকুশলতায়। মেঘদূত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। আদ্যন্ত একই ছন্দে রচিত কাব্য মেঘদূতের আখ্যান মন্দাক্রান্তা ছন্দের শ্রেষ্ঠত্বদ্যোতক। এই ছন্দের বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার।

ছান্দসিক গঙ্গাদাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ছন্দোমঞ্জরী'তে 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন—'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মৌ ভনৌ তৌ গযুগ্মকম্।' এই শ্লোকানুসারে অম্বুধি = ৪, রস = ৬, ও নগ = ৭ অর্থাৎ ৪+৬+৭=১৭ অক্ষরের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ হয় মন্দাক্রান্তা ছন্দে নিবদ্ধ কবিতার এক-একটি চরণপংক্তি। আবার হ্রস্বস্বর বা লঘুস্বর এবং দীর্ঘস্বর বা গুরুস্বরের তারতম্যে মন্দাক্রান্তার পংক্তিবিন্যাস কয়েকটি সাংকেতিক অক্ষর সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই অক্ষর সংখ্যাগুলি যথাক্রমে—মভন ত ত গগ। সংস্কৃতে গুরুস্বরের সাংকেতিক চিহ্ন—এবং লঘুস্বরের সাংকেতিক চিহ্ন ⏑ । এই সূত্রে—

ম =———— (অর্থাৎ তিনটিই গুরুস্বর)

ভ =– ⏑ ⏑ (অর্থাৎ প্রথমটি গুরুস্বর, পরের দুটি লঘুস্বর)

ন = ⏑ ⏑ ⏑ (অর্থাৎ তিনটিই লঘু বা হ্রস্বস্বর)

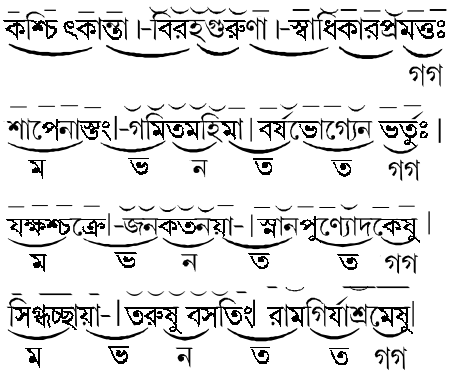
ত =–— ⏑ (অর্থাৎ প্রথম দুটি গুরু ও পরেরটি লঘুস্বর)

ত =–— ⏑ (অর্থাৎ প্রথম দুটি গুরু ও পরেরটি লঘুস্বর)

গ =– (অর্থাৎ একটিই গুরুস্বর)

গ =– (অর্থাৎ একটিই গুরুস্বর)

সূত্রানুসারে মন্দাক্রান্তার প্রতি চরণে গণের বা পর্বের বিন্যাস যথাক্রমে প্রথমে ৪ অক্ষরের পর্ব, মধ্যে ৬ অক্ষরের এবং শেষে ৭ অক্ষরের পর্ব; সর্বমোট ৪+৬+৭=১৭ অক্ষরের সমন্বয়ে চরণপংক্তির সম্পূর্ণতা বিধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেঘদূতের প্রথম স্তবকের ৪টি পংক্তির ছন্দোবিন্যাস দেখানো হল। অনুরূপভাবে পুরো মেঘদূত কাব্যের চরণপংক্তির ছন্দোবিন্যাস নির্ণয় করা যায়।—



‘পদ্যং অক্ষরসংখ্যাতং—এই সূত্রানুসারে সংস্কৃতের জাতিচ্ছন্দ ও মাত্রাছন্দ হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরানুযায়ী অক্ষর সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে মন্দাক্রান্তা-ছন্দোনিবদ্ধ প্রতি চরণপংক্তির মধ্যে প্রথম গণ বা পর্বযতির চারটি অক্ষর গুরু (—), দ্বিতীয়ের প্রথম পঞ্চাক্ষর লঘু (⏑), একাক্ষর গুরু এবং তৃতীয়ের বা শেষের প্রথম অক্ষরটি গুরু, দ্বিতীয়টি লঘু, তৃতীয়-চতুর্থ গুরু, পঞ্চমটি লঘু এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম দুটি গুরু অক্ষর। “এইভাবে সতেরোটি অক্ষরের ঠাস বুনুনিতে পূর্ণমন্দাক্রান্তার প্রতিটি চরণ-বিন্যাস। হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের স্পষ্ট-উদাত্ত-বিশুদ্ধ গমকে উচ্চারণের উপর নির্ভর করে এই ছন্দের মাধুর্যমহিমা।” (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিসুষমা ও রসমাধুর্য বাঙালি কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কালিদাস অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিমনীষী মন্দাক্রান্তার অনুসরণে বাংলা কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সফলতার মাত্রা নগণ্য। মন্দাক্রান্তার নকল করে বাংলায় মেঘদূতের কাব্যানুবাদ প্রায় অসম্ভব ধরে নিয়ে কবিগুরু সে পথ পরিহার করেছিলেন এবং মুক্তচ্ছন্দে তাঁর মেঘদূতাশ্রয়ী কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। মেঘদূতের কাব্যানুবাদে মন্দাক্রান্তার প্রয়োগ খানিকটা সফল হয়েও পুরোপুরি সফলতা অর্জন সহজলভ্য হবে না বুঝতে পেরে সত্যেন্দ্রনাথও সে পথ অচিরেই পরিত্যাগ করেছিলেন। আর বুদ্ধদেব বসু মন্দাক্রান্তার পর্বচালটিকে গ্রহণ করেই চিরাচরিত বাংলা ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সমকালে তো বটেই, সাম্প্রতিক কালেও কোনো বঙ্গীয় কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দের হুবহু অনুসরণে বাংলায় কবিতা রচনা করে সাফল্য অর্জন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নিয়ম-শৃঙ্খলার দুরূহতাই বোধ করি এই ছন্দানুশীলনের মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও তাই।

৬.২.৭.২ মেঘদূত কাব্যের উপমা

মহাকবি কালিদাসের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপমা সৃষ্টিতে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা। ‘উপমা কালিদাসস্য’—এই শিষ্ট বাক্যটি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কালিদাসের অনন্যতার সূচক। উপমা অলঙ্কার

সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁকে যেমন বিশিষ্ট করেছে, তেমনি উজ্জ্বল করেছে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তিকে। বৈদর্ভীরীতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের স্বর্ণোজ্জ্বল উপমাগুলি ভাবের গভীরতা, বক্তব্যের প্রসারতা প্রসাদ মাধুর্য ও ব্যঞ্জনায় পাঠক-পাঠিকার অন্তর স্পর্শ করে। উপমা কাব্যসুন্দরীর বরাঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। যে-কোনো উৎকৃষ্ট কাব্যের বিশেষগুণ এই অলঙ্কার।

অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে 'উপমা' শব্দের অর্থ তুলনা। স্বভাবধর্মে বিজাতীয় অথচ গুণ, অবস্থা ও ক্রিয়ার দিক থেকে সূক্ষ্ম মিল আছে এমন ব্যক্তি, বস্তু ও অবস্থার সঙ্গে তুলনা। উপমা অর্থালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত। তুলনাশ্রয়ী এমন অর্থালঙ্কারও অনেকগুলি—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, ভ্রান্তিমান, সমাসোক্তি, সন্দেহ প্রভৃতি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল উপমা ছাড়াও উল্লিখিত অলঙ্কারগুলিও উপমা প্রসঙ্গে আলোচ্য। উপমা অলঙ্কার ছাড়াও অন্যান্য অলঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কালিদাস রাজাধিরাজ। অবশ্য তাঁর এই অভিধা কেবলমাত্র সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ।

উপমা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। কালিদাস ব্যবহৃত অত্যুজ্জ্বল-সুন্দর উপমাগুলির "বেশির ভাগই সংযোজিত হয়েছে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলমে। সর্বোপরি তার উপমাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির অনিবার্য প্রকাশ, পৃথক কোনো অলঙ্কার নয়। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ সেই উপমাগুলি রসবোধে সমুজ্জ্বল।" (মেঘদূত জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বমেঘ-এর তৃতীয় শ্লোকটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি বলেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিংপুনর্দূরসংস্থে।।" (পূ.মে. ৩)

শ্লোকটির বাচ্যার্থ সাধারণ কিন্তু তার ব্যঞ্জনা সুগভীর। কবি যক্ষের বিরহবেদনার গভীরতাকে বোঝাতে গিয়ে বললেন—মেঘ সন্দর্শনে সাধারণ সুখী মানুষের মনও উতলা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিটি যদি স্বভাবধর্মে 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ী' হয়েও কপালবৈগুণ্যে দূরবর্তী হয় তা হলে তার বেদনা কি বলে শেষ করা যায়? "এই শ্লোকে উপমেয় কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ী যক্ষের বিরহ যাতনাকে উপমান সুখী ব্যক্তিদের চেয়ে বহুগুণিত করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ উপমানের চেয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য বা ঔৎকর্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুগভীর দার্শনিক অনুভবদীপ্ত অলঙ্কারটি হল ব্যতিরেক।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

পূর্বমেঘের আর একটি শ্লোক—

রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং

ভক্তিচ্ছেদৈরিববিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।। (পূ.মে. ১৯)

এই শ্লোকের মর্মার্থ এই যে মেঘ তার যাত্রাপথে উপলবিষম বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে শীর্ণা-বিশীর্ণা বেরা নদীকে দেখতে পাবে। কেমন রেবা নদীকে? না হাতির গায়ে ভক্তিচিহ্ন-প্রকাশক বিচিত্রভাবে আঁকা শৃঙ্গারলেখার মতো রেবা নদীকে। এখানে পরপর দুটি ভিন্নধর্মী অলঙ্কারের একত্রে সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে—প্রথমটি সমাসোক্তি, দ্বিতীয়টি পূর্ণোপমা। যেখানে প্রকৃতি জগতের রেবানাম্নী স্রোতস্বিনীকে প্রাণধর্মে প্রোজ্জ্বল ভক্তিমতী নায়িকারূপে কল্পনা, সেখানে বিভাসিত হয়েছে সমাসোক্তি অলঙ্কারের

দীপ্তি। আর যেখানে উপমেয় রেবার উপরে ভক্তিতে বিরচিত ভূতিচিহ্ন রূপ উপমানের সাদৃশ্যারোপ এবং তাদের মধ্যেকার সাধারণ ধর্ম 'ভক্তি' ও তুলনাবাচক শব্দ 'ইব'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে ঝলসে উঠেছে পূর্ণোপমা অলঙ্কারের লাবণ্য-সুষমা। সমগ্র পূর্বমেঘে এরূপ অনেকগুলি উজ্জ্বল-সুন্দর অলঙ্কারের পরিচয় আছে যাদের সাধারণ নাম উপমা।

উত্তরমেঘেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই পর্বের প্রথম শ্লোক 'বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতা সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ....' ইত্যাদি। সমগ্র স্তবকটি পূর্ণোপমা এবং একই সঙ্গে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের পূর্ণোপমা। এখানে বৈচিত্র্যমণ্ডিত অলকার প্রাসাদসমূহকে মেঘের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এখানে প্রাসাদ উপমেয় এবং উপমান মেঘ। উপমেয় প্রাসাদের গুণৈশ্বর্য তার মণিকুট্টিম, সুন্দরী রমণী, চিত্র, সঙ্গীত, মুরজধ্বনি, মেঘস্পর্শিতা, অন্যদিকে উপমান মেঘের গুণৈশ্বর্য তার বিদ্যুৎপ্রিয়া, ইন্দ্রধনু, স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদ, জলগর্ভিতা ও সমুন্নতি। ঐ সকল বিশেষত্ব নিয়েই উপমেয় ও উপমানের মধ্যেকার সাদৃশ্য কল্পনা। বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের পূর্ণোপমা অলঙ্কারে ''উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আভাসিত হয়। এখানে উপমেয় অলকার প্রাসাদের সঙ্গে উপমান মেঘের বিম্ব-প্রতিবিম্ব সাদৃশ্য বর্তমান। এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে বিদ্যুৎপ্রিয়া মেঘের সঙ্গে সুন্দরী বণিতাপূর্ণ প্রাসাদের, মেঘের ইন্দ্রচাপের সঙ্গে প্রাসাদের চিত্রাবলীর, মুরজবাদ্যের সঙ্গে স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদের, মেঘের জলগর্ভিত অবস্থার সঙ্গে প্রাসাদের মণিময় কুট্টিমের (মেঝের) এবং মেঘের অত্যুচ্চতার সঙ্গে অলকার অভ্রংলিহ প্রাসাদ শিখরের। কবিকল্পনার এই সমুন্নতির বিষয়টি লক্ষ্য করেই বোধ করি মল্লিনাথের সপ্রশংস মন্তব্য—'বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবেনেয়ং পূর্ণোপমা।'' (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

উত্তরমেঘের 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' (উ.মে. ২১)—শীর্ষক শ্লোকটি মালোপমা অলঙ্কারের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্লোকে উপমেয় বিধাতার আদি সৃষ্টি যক্ষবধূর দেহশ্রীর সকল উপাদানকে ঘিরে উপমেয়-উপমান সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে মালোপমা অলঙ্কার। এ প্রসঙ্গে উত্তর মেঘের ২২ সংখ্যক শ্লোকটিও বিবেচ্য। 'তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্'—শীর্ষক এই শ্লোকে ''বিরহী যক্ষের আত্মদর্শনে উদ্ভাসিত হয়েছে তার দ্বিতীয় জীবনতুল্য ('জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্), চক্রবাকীর মতো একাকিনী মিতভাষিণী প্রিয়তমার কথা। সুদীর্ঘ বিরহের দিনগুলো কেটে গেছে বলে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিতা সেই যুবতী শিশিরমথিতা পদ্মিনীর (পদ্ম-বধূর) মতো অন্যরূপে পরিণতা (অর্থাৎ শ্রীহীনা)—'শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।' এখানে 'চক্রবাকী মিবৈকাম্' ও শিশিরমথিতা পদ্মিনীর অনুষঙ্গে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার নির্মল শ্রীমূর্তিটি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই পূর্ণোপমা অলঙ্কারের দীপ্তি ফুটেছে যথাক্রমে উপমেয় যক্ষপ্রিয়ার (বালা) সঙ্গে চক্রবাকীর (উপমান) ও শিশির মথিতা পদ্মিনীর (উপমান) অবস্থাগত সাদৃশ্য কল্পনায়। এখানে তুলনাবাচক শব্দ 'বা' (মতো, সদৃশ অর্থে) এবং সাধারণ ধর্ম বিরহাবস্থা-জনিত কৃশতা ব্যঞ্জনায় আভাসিত।'' (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা,২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত স্বল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে 'উপমা কালিদাসস্য'—কথাটি গভীরতা ও খাঁটিত্ব সপ্রমাণ হয়।

একক - ৮

পূর্ব মেঘ ও উত্তরমেঘ

বিন্যাসক্রম

৬.২.৮.১ পূর্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ

৬.২.৮.২ বাংলা অনুবাদে মেঘদূত

৬.২.৮.৩ উজ্জীবনী

৬.২.৮.৪ মেঘদূত' (উত্তর মেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিত

৬.২.৮.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৮.১ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের দুটি ভাগ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রশ্ন জাগে, মূল কাব্যটি কি আদৌ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এইভাবে পরিচিত ছিল, না কি অবিভাজিত কাব্যটিরই সাধারণ শিরোনাম ছিল

মেঘদূত? এ প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের জানা নেই। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ মনীষী মেঘদূত কাব্যের পূর্ব ও উত্তর বিভাজনকে মেনে নিয়েছেন। মেঘদূতের বাংলা অনুবাদকগণের সকলেই কাব্যটির পর্ব বিভাজনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ও বিভিন্ন কাব্য কবিতায় মেঘদূত কাব্যের খণ্ড বিভাজনকে স্বীকার করেই দুটি খণ্ডের অন্তর্লীন ভাব-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেছেন। তদবধি তাঁর মেঘদূত কাব্যের সমালোচনা উদ্দিষ্ট কাব্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা রূপে বিদ্বৎসমাজ-কর্তৃক গৃহীত হয়ে এসেছে। তৎসত্ত্বেও কাব্যটিকে অখণ্ড কাব্যরূপে গ্রহণ করলেও তার রসাস্বাদনে ও উপলব্ধিতে কোনো হেরফের হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

৬.২.৮.২ অনুবাদে মেঘদূত

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কালিদাসীয় সাহিত্যের অনুশীলন প্রায় নেই বললেই চলে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গলে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কালিদাসের কবিতাপংক্তির কিম্বা ভাবাভিব্যক্তির ছিটেফোঁটা থাকলেও তা নগণ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘ নয় শত বছরের ইতিহাসে কেবল টোল-চতুষ্পাঠীর বিদ্যাচর্চায় কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি গৃহীত হলেও তার বাইরের বৃহত্তর সাধারণ জনমানসে তাদের কোনো পরিচিতি বা প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাসক প্রাগ্রসর বাঙালি জাতির পক্ষে বিষয়টি নিশ্চয়ই গর্বের নয়। যে প্রাচ্য মহাদেশ কালিদাসের মতো একজন মহান কবিকে পেয়ে ধন্য হয়েছিল তারই একাংশে—বাংলাদেশে তাঁর সাহিত্য এতকাল অনাদৃত ছিল এটা ভাবলে লজ্জাবোধ হয়।

বস্তুত উনিশ শতকে ভারতপ্রেমী কতিপয় বড়ো ইংরেজ এদেশে না এলে বিশেষ করে বাঙালি সারস্বত সমাজে কালিদাস প্রায় অপরিচিতই থেকে যেতেন। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে স্যার উইলিয়ম জোন্স ও হোরেস হেম্যান উইলসনের মতো বিদ্বান মনীষী এদেশে এসেছিলেন। ১৭৮৯ সালে প্রাচ্য বিদ্যার্ণব Sir William Jones কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কিয়দংশ জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ফলে তাঁর সময়ে ও তাঁর পরবর্তীকালে বহু শিক্ষিত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে পড়েন। এই সূত্রেই ১৮১৩ সালে Horace Hayman Wilson কালিদাসের মেঘদূত কাব্য ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে 'The Megha Duta or Cloud Messenger' শিরোনামে প্রকাশ করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর শুরু হয় কালিদাসচর্চা—কালিদাসীয় সাহিত্যের অনুসরণ-অনুশীলন-ভাষ্যরচনা-অনুবাদ প্রভৃতি। মেঘদূতের প্রথম অনুবাদক আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। ১৮৫০ সালে গদ্যভাষায় তিনি মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করেন। আর কাব্যটির প্রথম কাব্যানুবাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৯ সালে তাঁর কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

ঊনবিংশ শতকে মেঘদূত-এর কাব্যনুবাদ অথবা গদ্যানুবাদ করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভুবনচন্দ্র বসাক (১৮৬১) প্রাণনাথ পণ্ডিত (১৮৭২), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮২), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৭), হৃষিকেশ শাস্ত্রী (১৮৯১), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯১), বরদাচরণ মিত্র (১৮৯৩) প্রমুখ বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন।

এই ধারায় বিংশ শতকের বিশিষ্ট অনুবাদক হিসেবে উল্লেখযোগ্যদের নামের তালিকা বিশাল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন—কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত (১৯০৩), সতীশচন্দ্র রায় (১৯০৬), দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), হরিপদ ভট্টাচার্য (১৯২৫), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২৫), কবি নরেন্দ্র দেব (১৯২৯), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৩৬), রাজশেখর বসু (১৯৪২), বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৭), কবি কালিদাস রায় (১৯৬৩), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক-প্রণীত 'মেঘদূত জিজ্ঞাসা' (১৯৯৫)।

———

৬.২.৮.৩ : উজ্জীবনী (দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তরমেঘ-এর প্রথম ১০টি শ্লোকের ব্যাখ্যা)

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥১॥

অন্বয় ঃ যত্র ললিতবনিতাঃ সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ মণিময়ভুবঃ অভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাঃ তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ বিদ্যুৎবন্তং সেন্দ্রচাপং স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ অন্তস্তোয়ং তুঙ্গং ত্বাং তুলয়িতুম্ অলম্।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে, সেই অলকায়, সচিত্রাঃ—চিত্রযুক্ত, চিত্রশোভিত, সঙ্গীতায়—সঙ্গীতের জন্য, প্রহতমুরজাঃ—মুরজধ্বনিযুক্ত, মুরজ ধ্বনিমুখর (মুরজ—পাখোয়াজ), মণিময়ভুবঃ—মণিময় মেঝে-সমন্বিত, মণিকুট্টিম সমৃদ্ধ (কুট্টিম—মেঝে), অভ্রংলিহাগ্রাঃ—অভ্র বা মেঘকে লেহন (আস্বাদন) করে এমন

অগ্রভাগ (শিখর) যুক্ত অর্থাৎ মেঘস্পর্শী, উত্তুঙ্গ, প্রাসাদাঃ—প্রাসাদ সমূহ, সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ, তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ—সেই সেই বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে, বিদ্যুত্বন্তং = বিদ্যুৎবন্তং—সবিদ্যুৎ, সেন্দ্রচাপং—ইন্দ্রচাপযুক্ত, ইন্দ্রধনুযুক্ত, স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্—স্নিগ্ধ-গম্ভীরনাদ, অন্তস্তোয়ং—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, জলগর্ভ, তুঙ্গং ত্বাং—সুমুন্নত তোমাকে (তোমার) তুলয়িতুম্ অলম্—তুলনাই যথেষ্ট (অর্থাৎ একমাত্র তোমারই সমতুল হতে পারে)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেই অলকার মণিকুট্টিম-সমৃদ্ধ, সুন্দরী রমণীপূর্ণ, চিত্রশোভিত, সঙ্গীতের জন্য (সুমধুর) মুরজ-ধ্বনিমুখর, মেঘস্পর্শী প্রাসাদসমূহ তাদের (পূর্ববর্ণিত) বিশেষত্বগুলি নিয়ে সবিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনুযুক্ত, স্নিগ্ধ-গম্ভীরনাদ, জলগর্ভ ও সমুন্নত তোমার সমতুল হতে পারে ১।।

উজ্জীবনী ঃ বর্তমান শ্লোকটি বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা এবং পূর্ণোপমা অলঙ্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেনেয়ং পূর্ণোপমা' বলেছেন মল্লিনাথ। যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ভিন্ন হলেও অনুভবে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ধরা পড়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাকে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা। এখানে উপমেয় প্রাসাদের সঙ্গে উপমান মেঘের বিম্বপ্রতিবিম্ব সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে বিদ্যুপ্রিয়া মেঘের সঙ্গে সুন্দরী বনিতাপূর্ণ প্রাসাদের, মেঘের ইন্দ্রচাপের সঙ্গে প্রাসাদের চিত্রাবলীর, মুরজবাদ্যের সঙ্গে স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদের, জলগভির্ত অবস্থায় সঙ্গে প্রাসাদের কুট্টিমের এবং মেঘের অত্যুচ্চতার সঙ্গে অলকার অভ্রংলিহ প্রসাদ-শিখরের সূক্ষ্ম মিল কল্পনায়। ললিতবনিতাঃ—রম্যা বনিতা অর্থাৎ সুন্দরী রমণী (স্ত্রী), সচিত্রাঃ—আলেখ্যাদি মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলী—'আলেখ্যাশ্চর্যয়োশ্চিত্রম্।'—বলেছেন অমরকোষ। মুরজাঃ—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ-শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র—'মুরজা তু মৃদঙ্গে স্যাড্ঢক্কামুরজয়োরপি'—বলেছেন শব্দার্ণব। প্রাসাদ—সুউচ্চ-সুবৃহৎ অট্টালিকা। দেবগৃহ অর্থও গ্রহণযোগ্য—'প্রাসাদো দেবভূভুজাম্' (অমরকোষ)। অলম্—বাক্যালঙ্কার অব্যয়—যথেষ্ট পর্যাপ্ত অর্থদ্যোতক—'অলং ভূষণপর্যাপ্তি শক্তিবারণবাচকম্' বলেছেন অমরকোষ।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।। ২।।

অন্বয় ঃ যত্র বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্ আননে শ্রীঃ লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতাং নীতা চূড়াপাশে নবকুরুবকম্ চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং নীপম্ (অস্তি)।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্—বধূদের হাতে (রয়েছে) লীলাকমল, অলকে—চূর্ণকুন্তলে, অলকে, বালকুন্দানুবিদ্ধম্ = বাল-কুন্দ-অনুবিদ্ধম্—সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ বা গাঁথনি, আননে—মুখে, শ্রীঃ—শ্রী, সৌন্দর্য, লোধ্রপ্রসবরজসা—লোধ্রফুলের রজঃ বা পরাগরেণুতে, পাণ্ডুতাং নীতা—পাণ্ডুতা বা শুভ্রাবস্থা প্রাপ্ত, চূড়াপাশে নবকুরুবকম্—কেশপাশে নবজাত কুরুবক ফুল, চারুকর্ণে শিরীষং—সুন্দর কানদুটিতে শিরীষফুল অথবা কানে সুন্দর শিরীষফুল, সীমন্তে চ—আর সীমন্ত বা সিঁথিতে, ত্বদুপগমজং—তোমার আগমনে ফুটে ওঠা, নীপম্—কদম্ব ফুল (অস্তি—আছে)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) যে অলকায় বধূদের হাতে রয়েছে লীলাকমল, অলকে সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ বা গাঁথনি, মুখে লোধ্রফুলের পরাগরেণুতে মাখা শুভ্র শ্রী, কেশপাশে নবকুরুবক, সুন্দর কান দুটিতে শিরীষ ফুল (অথবা কান দুটিতে সুন্দর শিরীষ ফুল) আর সিঁথিতে আছে তোমার আগমনে ফুটে ওঠা নীপ (কদম ফুল)। ২॥

উজ্জীবনী ঃ লীলাকমল—'লীলার্থং কমলং লীলাকমলম্'—রমণীর বিলাস ক্রীড়া বা শৃঙ্গার চেষ্টার সহায়ক পদ্মফুল। সেকালে ফুল ছিলো রমণীদের অঙ্গসজ্জা ও খেলাধুলার অন্যতম উপকরণ। বিশেষতঃ পদ্মফুল নিয়ে পরস্পর লোফালুফি করে মেয়েরা খেলাধুলা করত। এই বিষয়েরই সাজানো নাম 'কন্দুকক্রীড়া'—বল খেলা। লীলা-বিলাসের উপকরণ হিসেবে পদ্মফুলের পাপড়ি গণনা মেয়েদের সহজাত ক্রীড়াপ্রকাশক। তাই কুমারসম্ভবে বিবাহ প্রস্তাবে সলজ্জা রক্তিমাভা পার্বতীর লীলাকমলের পত্রগণনা—'লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পাবর্তী।' (কু.স.৬.৮৪) আবার 'লীলা' অর্থে শোভন অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদ-ভূষিতা রমণীর প্রিয়ানুকরণ ('প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যবেশক্রিয়াদিভিঃ'—উজ্জ্বলনীলমণি) ধরে নিয়ে লীলাকমলের অর্থ করা যায়—সুরভিত পদ্মফুল হাতে সুন্দরী বনিতার প্রিয়ানুসরণ। লোধ্রপ্রসব—লোধ্র (শীতকালে ফোটে এমন এক ধরনের ফুল) ফুলের প্রসব অর্থাৎ প্রস্ফুটন—'প্রসবস্তু ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণাং গর্ভমোচনে' বলেছেন বিশ্বকোষ। এই স্তবকে অনেকগুলি গন্ধপুষ্পের পরিচয় আছে যেগুলি বিভিন্ন ঋতুপর্যায়ের। যেমন—কমল—শরতের, কুন্দ—হেমন্তের, লোধ্র—শীতের, কুরুবক—বসন্তের, শিরীষ—গ্রীষ্মের আর কদম্ব—বর্ষার। ষড়ঋতুতে বিকশিত ফুলগুলির একই কালে একত্র সমাবেশে অনেক সমালোচক অস্বস্তিতে পড়েছেন। আসলে অলকা এমনই এক ভাবলোক যেখানে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদির আপাত ভেদ বলে কিছু নেই। সেই কল্পলোকে সকল ঋতুই তাদের ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে একই কালে ভব-ভবানী তথা মেঘের অভ্যর্চনায় নিত্য-নিরত। সেই স্বপ্নলোকে কাব্যের কল্পলতায় ফুটল ফুটলে যুক্তিবাদী তার্কিকের বিচার বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, কিন্তু মার্মিক রসবোদ্ধার তাতে কি যায় আসে? কারণ এই ভাবরসের জগৎ আনন্দের জগৎ, সর্বোপরি সাহিত্যের জগৎ। সুতরাং বস্তুজগতের চুলচেরা বিশ্লেষণে তার মাধুর্যের অঙ্গহানি করে কি লাভ? পূর্ণ সরস্বতী অবশ্য এর একটি গ্রহণযোগ্য রসব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, ষড়ঋতুতে পুষ্পের কালাতিক্রমী একত্র সমাবেশ আসলে চাটুকারিতার দ্বারা মেঘকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই—'মেঘস্য চাটুকরণার্থম্।'

রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' (কল্পনা) ও 'সেকাল' (ক্ষণিকা) কবিতায় উত্তরমেঘের এই শ্লোকটির ভাবরসঘন স্বীকৃতি কাব্যের রসধ্বনি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে প্রথমে কবির পূর্ব জন্মের প্রথমা প্রিয়ার বর্ণনায়—

"মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।" "স্বপ্ন" (কল্পনা)

এবং পরে কবির মানসী প্রিয়ার বর্ণনায়—

"কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।" সেকাল (ক্ষণিকা)

এই শ্লোকের কাব্যানুবাদ প্রসঙ্গে তুলনীয় ঃ

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মাঃ নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৩॥

অন্বয় ঃ যত্র পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ (অতঃ) উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ নলিনাঃ নিত্যপদ্মাঃ (অতঃ) হংসশ্রেণীরচিতরশনাঃ ভবনশিখিনঃ নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ (অতঃ) কেকোৎকণ্ঠাঃ প্রদোষাঃ নিত্যজ্যোৎস্নাঃ (অতঃ) প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, পাদপাঃ—বৃক্ষগুলি, নিত্যপুষ্পাঃ—সর্বদা পুষ্পশোভিত, (অতঃ—সেই জন্য) উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ—মত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, নলিন্যঃ—জলাশয়গুলি, নিত্যপদ্মাঃ—নিত্য (সর্বদা) পদ্ম-প্রস্ফুটিত, (অতঃ—এজন্য), হংসশ্রেণী-রচিত-রশনাঃ—হংসমালা দ্বারা রচিত মেখলা (চন্দ্রহার), ভবনশিখিনঃ—গৃহপালিত ময়ূরগুলি, নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ—নিত্যই উজ্জ্বল (ঝলমলে) কলাপ বিস্তার করে আছে, (অতঃ—তাই), কেকোৎকণ্ঠাঃ—কেকাধ্বনিতে উৎকণ্ঠ (গলা-উঁচু), প্রদোষাঃ—প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল, নিত্যজ্যোৎস্নাঃ—নিত্য জ্যোৎস্নাময়, (অতঃ—এই কারণে) প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ—অন্ধকারের ব্যাপ্তি বা প্রসারতা (নিবারণ) করে রম্য—রমণীয়, (ভবন্তি—হয়।)

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) যে অলকায় (অর্থাৎ সেই অলকায়) বৃক্ষগুলি সর্বদাই পুষ্পশোভিত এবং মত্তভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, পুষ্করিণী বা জলাশয়গুলি নিত্য পদ্মপ্রস্ফুটিত এবং হংসমালার বেষ্টনে রচিত-মেখলা (চন্দ্রহার), গৃহপালিত ময়ূরগুলি সর্বদাই উজ্জ্বল কলাপ বিস্তার করে কেকাধ্বনিতে উৎকণ্ঠ, প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল সেখানে নিত্য জ্যোৎস্নাময় এবং অন্ধকারের প্রসারতা প্রতিহত করে রমণীয় হয়ে থাকে। ৩॥

উজ্জীবনী ঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ ইত্যাদি—অলকা চিরসৌন্দর্যের লীলাভূমি। তাই সৌন্দর্যের উপকরণগুলি সেখানে সবসময় মজুত। নলিনী শব্দের সাধারণ অর্থ জলজ-নলযুক্ত, তার থেকে নলযুক্ত অম্বুজ বা পদ্ম। 'নলানি অম্বুজানি অস্যাঃ স্যন্তি ইতি নলিনী', এবং পদ্ম—'পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্'। (অমরকোষ)। এই সূত্রে নলিন্ বা পদ্মের আশ্রয় নলিনী অর্থাৎ জলাশয় বা পুষ্করিণী—এরূপ অর্থ করেছেন অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। (দ্রঃ মেঘদূত পরিচয়—৪র্থ সং পৃঃ ১৫৫) আবার রাজশেখর বসু নলিনী > নলিন্যঃ (বহু ব.) শব্দের অর্থ করেছেন 'পদ্মের ঝাড়'। এ ক্ষেত্রে পুষ্করিণী বা জলাশয় অর্থ সমধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। রবীন্দ্র কবিতায় এই শ্লোকের আংশিক ভাবানুষঙ্গ—

"অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে....." 'মেঘদূত' (মানসী)

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।

নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি। ৪॥

অন্বয় ঃ যত্র বিত্তেশানাং নয়নসলিলং আনন্দোত্থম্ (ভবতি) অন্যঃ নিমিত্তৈঃ ন (ভবতি) ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ কুসুমশরজাৎ অন্যঃ তাপঃ ন (ভবতি) প্রণয়কলহাৎ অন্যস্মাৎ (কারণাৎ) বিপ্রয়োগপপত্তিঃ অপি ন অস্তি যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, বিত্তেশানাং নয়নসলিলং—ধনপতিদের (যক্ষগণের) অশ্রু, চোখের জল, আনন্দোত্থম্ (ভবতি)—আনন্দ থেকেই নির্গত হয়, অন্যৈঃ নিমিত্তৈঃ ন (ভবতি)—অন্য কোনো কারণে হয় না, ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ—প্রিয় সমাগমে সাধ্য, কুসুমশরজাৎ—মদনসন্তাপ (ছাড়া), অন্যঃ তাপঃ ন (ভবতি)—অন্য তাপ হয় না, প্রণয়কলহাৎ—প্রণয়কলহ ছাড়া, অন্যস্মাৎ (কারণাৎ)—অন্য কোনো কোরণে, বিপ্রয়োগপপত্তিঃ অপি ন অস্তি—বিপ্রয়োগ বা বিচ্ছেদের, উপপত্তি—প্রাপ্তি নেই অর্থাৎ বিচ্ছেদও ঘটে না, যৌবনাৎ অন্যৎ—যৌবন ব্যতীত অন্য কোনো, বয়ঃ চ নাস্তি—বয়সও নেই (যৌবনই হল বয়সের ঊর্ধ্বসীমা অর্থাৎ অনন্ত যৌবন)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে ধনপতিদের (যক্ষদের) চোখের জল আনন্দ থেকেই নির্গত হয়, অন্য কোনো কারণে নয় ; প্রিয়সমাগমসাধ্য (প্রত্যাশিত) মদনসন্তাপ ছাড়া অন্য কোনো তাপ নেই, প্রণয়কলহ ছাড়া অন্য কোনো কারণে বিচ্ছেদও ঘটে না এবং (সেখানে) যৌবন ব্যতীত বয়সও নেই (অর্থাৎ যৌবনই হল বয়সের ঊর্ধ্বসীমা, অতএব অলকায় অনন্ত যৌবন।৪॥

উজ্জীবনী ঃ যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি—যৌবন ছাড়া অন্য কোন বয়সও নেই। মানব জীবনের চারটি পর্যায়—বাল্য-কৈশোর-যৌবন ও বার্ধক্য। কিন্তু দেবভূমি অলকার দেবযোনিদের বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। স্বর্গের দেবতাদের মতো তারাও যে বাল্য-কৌমার-যৌবন-এই তিন দশার অধিকারী ত্রিদশ। তাই সেখানে মানবোচিত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুও নেই, আছে অনন্ত-অক্ষয় যৌবন। কিন্তু চিরন্তন সুখ ও আনন্দের বিলাসভূমি এই অলকা—ব্যঞ্জনায় এই ভাবটি পরিস্ফুট হচ্ছে। বিত্তেশানাং শব্দের বাচ্যার্থ বিত্তশালীদের। কিন্তু প্রসারিত অর্থ ধনী যক্ষদের—'বিত্তাধিপঃ কুবেরঃ স্যাৎ প্রভৌ ধনিক যক্ষয়োঃ'—বলেছেন শব্দার্ণব।

*মল্লিনাথ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। একথা সত্য হলেও শ্লোকটি যে শক্তিমান কোনো কবির রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥৫॥

অন্বয় ঃ যস্যাং (অলকায়াং) যক্ষাঃ উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ) সিতমণিময়ানি জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতানি হর্ম্যস্থলানি এত্য ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু পুষ্করেষু শনকৈঃ আহতেষু (সৎসু) কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু আসেবন্তে।

শব্দার্থ ঃ যস্যাং (অলকায়াং) —যে অলকায়, যক্ষাঃ—যক্ষরা, উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ)—সুন্দরী স্ত্রীসহ, সিতমণিময়ানি—শাদা মণিখচিত, চন্দ্রকান্তমণিময়, জ্যোতিশ্ছায়া-কুসুমরচিতানি—নক্ষত্র-প্রতিবিম্বস্বরূপ কুসুম-রচিত, হর্ম্যস্থলানি এত্য—হর্ম্যস্থলে বা সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদে গিয়ে, ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু—তোমার মতো গম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট, পুষ্করেষু—বাদ্যভাণ্ডমুখে, শনকৈঃ—মৃদুস্বরে, আহতেষু (সৎসু)—বাজতে থাকলে, কল্পবৃক্ষপ্রসূতং—কল্পবৃক্ষপ্রসূত, রতিফলং—রতিফল নামক, মধু-মদ্য, পানীয়, আসেবন্তে —পান করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (সখা!) সেই অলকায় যক্ষগণ সুন্দরী স্ত্রীসহ শাদা মণিখচিত (চন্দ্রকান্তমণিময়) নক্ষত্র প্রতিবিম্বরূপ কুসুম-রচিত সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদে গিয়ে তোমার মতো গম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্যভাণ্ডমুখে মৃদুস্বর ধ্বনিত হতে থাকলে কল্পবৃক্ষপ্রসূত 'রতিফল' নামক মদ্য পান করে।৫॥

উজ্জীবনী ঃ হর্ম্যস্থলানি—সপ্ততলবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদকে বলে হর্ম্য। হর্ম্যের স্থল > তল বা মেঝে, পূর্ণসরস্বতী অর্থ করেছেন 'সৌধশিখরকুট্টিমানি' অর্থাৎ ছাদগুলি। কল্পবৃক্ষ —স্বর্গীয় বনস্পতি যার কাছে প্রার্থনা করলে কাম্য বস্তুসকল পাওয়া যায়। জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতানি—জ্যোতিশ্ছায়া—নক্ষত্র বা তারকাদের ছায়া (প্রতিবিম্ব) ইব কুসুমানি—প্রতিবিম্বস্বরূপ কুসুম, তৈঃ রচিতানি—পরিষ্কৃতানি—তা দিয়ে রচিত—পরিষ্কৃত অর্থাৎ নক্ষত্রদের প্রতিফলিত আলোরূপ পুষ্পরচনার দ্বারা পরিষ্কার। পুষ্কর—বাদ্যভাণ্ডমুখ—'পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ডমুখে জলে' বলেছেন অমরকোষ। শনকৈঃ আহতেষু (সৎসু) মৃদুস্বরে বাদ্য প্রভৃতি নৃত্যগীতাদির উপলক্ষ্য বা অনুষঙ্গ। রতিফল—'রতিফল' নামক মদ্য—মদিরার্ণবে এই পানীয় তৈরির উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। বিভিন্ন বৃক্ষ-লতা-পুষ্পদ্রুম প্রভৃতির ক্বাথ একসঙ্গে মিশিয়ে এই 'স্মরদীপনং রতিফলাখ্যং স্বাদু শীতং মধু' তৈরি হয়। সিতমণি—মল্লিনাথের টীকানুসারে স্ফটিক অথবা চন্দ্রকান্তমণি।

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামণিতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥৬॥

অন্বয় ঃ যত্র অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ (সন্তঃ) অনুতটরুহাং মন্দারাণাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ (সন্তঃ) কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ অন্বেষ্টব্যৈঃ মণিভিঃ সংক্রীড়ন্তে।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে (সেই অলকায়), অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ—অমর বা দেবগণের প্রার্থিতা—আকাঙ্ক্ষিতা কন্যারা, মন্দাকিন্যাঃ—মন্দাকিনীর, সলিলশিশিরৈঃ—শীতল জলে, হিমসলিলে, মরুদ্ভি—বায়ুদ্বারা, সেব্যমানাঃ (সন্তঃ)—সেব্যমান, সেবিত, সেবা-পরিচর্যাপ্রাপ্ত (হয়ে), অনুতটরুহাং—তটজাত, মন্দারাণাং ছায়য়া—মন্দার বা পারিজাত বৃক্ষের ছায়া দ্বারা, বারিতোষ্ণাঃ (সন্তঃ)—শমিত (নিবারিত) তাপ হয়ে, কনক-সিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপগূঢ়ৈঃ—মুঠো মুঠো স্বর্ণবালুকা ছড়িয়ে, অন্বেষ্টব্যৈঃ মণিভিঃ—মণিগুলোকে খোঁজার বিষয় করে, সংক্রীড়ন্তে—খেলা করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত কন্যারা মন্দাকিনীর হিমসলিল বাহিত বায়ু দ্বারা সেবিত ও তটজাত মন্দার বা পারিজাতবৃক্ষের ছায়া দ্বারা শমিত (নিবারিত)-তাপ হয়ে মুঠো মুঠো স্বর্ণ বালুকা ছড়িয়ে (চাপা দেওয়া) মণিগুলোকে (আবার) খোঁজার খেলা খেলে।৬॥

উজ্জীবনী ঃ মন্দাকিনী—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—মন্দগামিনী, মূল অর্থ—আকাশগঙ্গা—"গঙ্গার যে প্রধান ধারা স্বর্গে গমন করে তার নাম মন্দাকিনী। এই ধারা বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছে।" ('পৌরাণিক অভিধান'—সুধীর চন্দ্র সরকার-সংকলিত, ৩য় সং পৃ. ৪১৫) শিশির—হিমযুক্ত শীতল; এছাড়াও বহু অর্থ হয়। অমরকোষের টীকায় এমন মজার ব্যাখ্যায় শিশির শব্দের অর্থ 'স্বামী'—'শিরোহত্যর্থং শ্যায়তেহনেনেতি শিশিরঃ ইতি স্বামী।' সিকতা—বালুকা (সৈকত জাত অর্থে), অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা.....সংক্রীড়ন্তে—স্বর্ণবালুকার স্তূপে মণি লুকিয়ে রেখে পুনরায় তাকে খুঁজে বের করা অনূঢ়া অলকা-কন্যাদের একপ্রকার জনপ্রিয় খেলা (Popular game)। শব্দার্ণবে এইরূপ কতকগুলি খেলাকে দেশজ খেলা (দৈশিক-ক্রীড়া) বলা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমান 'গুপ্তমণিখেলা' ('কুমারিভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা।') বিখ্যাত—"রাসক্রীড়া গূঢ়মণির্গুপ্তকেলিস্তুলায়নম্। পিণ্ডকন্দুকদণ্ডাদ্যৈঃ স্মৃতা দৈশিককেলয়ঃ।" মন্দার—মন্দার বৃক্ষ, স্বর্গের পারিজাতফুলের গাছ, বাংলায় মন্দার>মাদার গাছ।

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥৭॥

অন্বয় ঃ যত্র অনিভৃতকরেষু প্রিয়েষু নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং ক্ষৌমং রাগাৎ আক্ষিপৎসূ (সৎসু) হ্রীমূঢ়ানাং বিম্বাধরাণাং চূর্ণমুষ্টিঃ অর্চিস্তুঙ্গান্ রত্নপ্রদীপান্ অভিমুখং প্রাপ্য অপি বিফল-প্রেরণা ভবতি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে অর্থাৎ সেখানে, অনিভৃতকরেষু—চপল, চঞ্চল হস্তে, প্রিয়েষু—প্রণয়িগণ, নীবীবন্ধ-উচ্ছ্বসিতশিথিলং—নীবীবন্ধ—কটিবন্ধন মোচনে শিথিল, (আলগা) ক্ষৌমং—ক্ষৌমবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, রাগাৎ—অনুরাগবশতঃ, আক্ষিপৎসু (সৎসু)—আক্ষিপ্ত করে, টেনে ধরে এমন, হ্রীমূঢ়ানাং—হ্রী—লজ্জা অতএব লজ্জায় মুগ্ধ বা অভিভূত, লজ্জাবিধুরা, বিম্বাধরাণাং—বিম্বফলের ন্যায় অধরবিশিষ্টাদের, বিম্বাধরাদের, চূর্ণমুষ্টিঃ—(নিক্ষিপ্ত) চূর্ণমুষ্টি (হাতে ধরা কুঙ্কুমাদিচূর্ণ), অর্চিস্তুঙ্গান্—উজ্জ্বল শিখাযুক্ত, রত্নপ্রদীপান্—রত্নপ্রদীপগুলির, অভিমুখং প্রাপ্য—অভিমুখে বা সম্মুখে গিয়েও, বিফলপ্রেরণা—যাদের প্রেরণা বা উদ্যম বিফল, ভবতি—হয়।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে প্রণয়ীরা অনুরাগবশতঃ চপল হাতে (প্রেয়সীদের) কটিদেশের বন্ধন আলগা করে দিয়ে রেশমী কাপড় টেনে ধরে (হরণ করে), (ফলে) লজ্জাবিধুরা বিম্বাধরাগণ উজ্জ্বল রত্নদীপাবলির অভিমুখে বৃথাই চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে। (অর্থাৎ চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপেও প্রদীপ নেভে না কারণ সেগুলি রত্নপ্রদীপ)।৭॥

উজ্জীবনী ঃ নীবীবন্ধ-নীবী (নীবি) কটিদেশ, অতএব—কটিদেশের বা কোমরের বস্ত্রধারক বাঁধন অর্থাৎ বসনগ্রন্থি,—'নীবী পরিপণে গ্রন্থৌ স্ত্রীণাং জঘনবাসসি'—বলেছেন বিশ্বকোষ, তার বন্ধন—নীবীবন্ধ। বিম্বাধরা—বিম্বফলের (তেলাকুচা ফলের) ন্যায় রক্তিমাভ অধর বা মুখরুচি যে সকল বনিতাদের। 'বিম্বং

ফলে বিম্বিকায়াঃ প্রতিবিম্বে চ মণ্ডলে' বলেছেন বিশ্বকোষ। বিম্বাধরা বনিতার বিশেষণ অতএব স্ত্রীবিশেষ। শব্দার্ণবে আছে 'বিশেষাঃ কামিনীকান্তা ভীরুবিম্বাধরাঙ্গনাঃ'—অর্থাৎ 'কামিনী, কান্তা, ভীরু বিম্বাধরা অঙ্গনা প্রভৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক শব্দ। হ্রীমূঢ়া—লজ্জায় মুগ্ধা, মল্লিনাথের ভাষায় রত্নপ্রদীপ-নির্বাপণরতা নায়িকাদের বিমুগ্ধ ভাব—'অত্র অঙ্গনানাং রত্নপ্রদীপনির্বাণপ্রবৃত্তা মৌগ্ধ্যং বজ্যতে।' এক্ষেত্রে পূর্ণসরস্বতী বলবেন—অঙ্গনাদের এই হ্রীমূঢ়তা আসলে প্রিয়তমদের হৃদয়রসায়নের জন্যই—'প্রিয়তম—হৃদয়রসায়নং চ ধ্বন্যতে।' চূর্ণমুষ্টি—মুঠো মুঠো কুঙ্কুম—কস্তুরাদি গন্ধদ্রব্যচূর্ণ। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্যের গুঁড়ো (Powder) দিয়ে নায়িকার অঙ্গরাগ বিধানের ব্যবস্থা ছিল সেকালে। নীবীবন্ধ শিথিল করে দেওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গে এই শ্লোকে নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার-বিলাসের দ্যোতনা আছে। কারণ 'রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ'—তাই প্রণয়ীগণের অধীর চাপল্য এবং নায়িকাদের অন্তঃসঙ্গ-রসায়ন-জনিত বিমূঢ় ভ্রান্তি। এই ভাবেরই অন্য এক অভিব্যক্তি (ঈষৎ ভিন্নভাবে) লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কবিতায়। হ্রীমূঢ়া কামিনীদের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, প্রিয়সমাগমে তাঁর নায়িকাদের—অলকা বিম্বাধরাদের ঠিক বিপরীত ভাব—একটু বেশি বেশরম তারা। তাই 'শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।'

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমি-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকা 'দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কা স্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈঃ
ধূমোদগারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরাঃ নিষ্পতন্তি।৮।।

অন্বয় ঃ যত্র ত্বাদৃশাঃ জলমূচঃ নেত্রা সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমিঃ নীতাঃ (সন্তঃ) আলেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য সদ্যঃ শঙ্কা স্পৃষ্টাঃ ইব ধূমোদগারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরাঃ (চ সন্তঃ) জালৈঃ নিষ্পতন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে অর্থাৎ সেখানে, ত্বাদৃশাঃ জলমূচঃ—তোমার মতো, ত্বৎসদৃশ, মেঘদল, নেত্রা সততগতিনা—সর্বদা গতি বায়ুদ্বারা, নেত্রা—প্রেরিত, পরিচালিত, যদ্-বিমানা-অগ্রভূমিঃ—যে (অলকার) বিমান—সাততলা ভবন, অগ্রভূমি—সর্বোচ্চ তলা, নীতাঃ (সন্তঃ)—নীত প্রাপ্ত (হয়ে) পৌঁছে, আলেখ্যানাং—আলেখ্য বা ছবিগুলির, স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য—নিজের জলকণার দোষ উৎপাদন করে, দূষিত করে (অর্থাৎ ভিজিয়ে দিয়ে) সদ্যঃ—তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, শঙ্কা স্পৃষ্টাঃ ইব—শঙ্কা গ্রস্তের, ভয়ত্রস্তের ন্যায়, ধূম-উদগার-অনুকৃতিনিপুণাঃ—ধূম উদ্‌গীরণের অনুসরণে নিপুণ, জর্জরাঃ (চ সন্তঃ)—বিশীর্ণ হয়ে, জালৈঃ—গবাক্ষ পথে, জানালা দিয়ে, নিষ্পতন্তি—নিষ্ক্রান্ত হয়, বেরিয়ে যায়।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে তোমার মতো বায়ুপ্রেরিত মেঘদল (অলকার) সাততলা উঁচু ভবনগুলিতে প্রবেশ করে নিজেদের জলকণায় (দেওয়াল স্থিত) ছবিগুলিকে দূষিত করে (অর্থাৎ ভিজিয়ে দিয়ে) তখনই (আবার) ভয়ত্রস্তের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিপুণভাবে বিশীর্ণ হয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়।৮।।

উজ্জীবনী ঃ সততগতিনা—বায়ুপ্রবাহ নিত্য, তার গতি বা চলাও নিত্য, তাই সততগতি—'মাতরিশ্বা সদাগতিঃ—বলেছেন অমরকোষ। নেত্রা—নেতা-পরিচালক, প্রেরক, তারদ্বারা। আলেখ্য—সচিত্র ছবি—'চিত্রং লিখিতরূপাঢ্যং স্যাদালেখ্যং তু যত্নতঃ'—বলেছেন শব্দার্ণব। জর্জরাঃ—জর্জর—

বিশীর্ণ। 'জলমুচঃ আর জললবমুচঃ' দুটি শব্দের অর্থই জলবর্ষী মেঘ কারণ তারা জলমোক্ষণ বা মোচন করে। জলমুচ্ শব্দের বহুবচন।

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতলিঙ্গনানা—
মঙ্গগ্লানিং সূরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ।।৯।।

অন্বয় ঃ যত্র নিশীথে ত্বৎ সংরোধাপগমবিশদৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ তন্তুজালাবলম্বাঃ চন্দ্রকান্তাঃ প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতলিঙ্গনানাং স্ত্রীণাং সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং ব্যালুম্পন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—সেখানে (অলকায়), নিশীথে—মধ্যরাত্রে, গভীর রাতে, ত্বৎ সংরোধাপগমবিশদৈঃ—তোমার আবরণ অপগত বা অপসৃত হওয়ায়, খসে পড়ায়, বিশদ শুভ্র-নির্মল), চন্দ্রপাদৈঃ—চন্দ্রকিরণের দ্বারা, স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ—বিন্দু বিন্দু জলকণাবর্ষী, তন্তুজালাবলম্বাঃ—সূত্রমালালম্বিত, সুতোর মালা থেকে লম্বমান (ঝুলছে এমন), চন্দ্রকান্তাঃ—চন্দ্রকান্তমণিগুলি, প্রিয়তম-ভুজ-উচ্ছ্বাসিত-আলিঙ্গনানাং—প্রিয়তমের বাহুতে আলিঙ্গন সুদৃঢ় অথবা শিথিল হয়েছে এমন, স্ত্রীণাং—রমণীদের, কামিনীদের, সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং—সুরত বা সম্ভোগ জনিত দেহের অবসাদ, ব্যালুম্পন্তি—বিলুপ্ত করে, দূর করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে মাঝরাতে তোমার (কৃষ্ণবর্ণ) আবরণ খসে পড়ায় শুভ্র-নির্মল চন্দ্রকিরণে সূতোর মালায় ঝুলন্ত চন্দ্রকান্তমণিগুলি থেকে বিন্দু বিন্দু জলকণা ঝরে পড়ে প্রিয়তমের সুদৃঢ় অথবা শিথিল বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামিনীদের সুরত বা সম্ভোগজনিত অবসাদ দূর করে।৯।।

উজ্জীবনী ঃ নিশীথে—নিশীথ—রাত্রিবাচক শব্দ—'নিশানিশিথিনীরাত্রিস্ত্রিযামাক্ষণদা-ক্ষপা। বিভাবরী-তমস্বিন্যৌ রজনীযামিনী তমী।' (অমরকোষ) এখানে নিশীথে—অর্ধরাত্রে বা গভীর রাতে—'অর্ধরাত্র নিশীথৌ দ্বৌ'—বলেছেন অমরকোষ। মধ্যরাত্রি সম্ভোগকালরূপে চিহ্নিত। 'শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ—ঋতুসংহারে (১.৩) একথা বলেছেন কালিদাস। চন্দ্রপাদ—চন্দ্ররশ্মি—'পাদা রশ্ম্যঙ্ঘিতুর্যাংশীঃ'—বলেছেন অমরকোষ। স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ—স্ফুট—বিন্দু বিন্দু, জললব-জলকণা, স্যন্দিনঃ—স্যন্দন—ক্ষরণ বা বর্ষণ করছে, ঝরে পড়ছে এমন। তন্তুজালাবলম্বাঃ—তন্তু—সূতো অথবা সূক্ষ্ম তার, তাদের জাল অর্থাৎ মালা, সারি, শ্রেণী, এগুলিকে অবলম্বন করেছে অথবা এগুলি থেকে লম্বিত হয়ে ঝুলে পড়েছে এমন। মল্লিনাথ বলেছেন—'বিতানলম্বিসূত্রপুঞ্জাধারাঃ তদগুণগুম্ফিতাঃ' অর্থাৎ চাঁদোয়া থেকে সূতোর মালায় ঝোলানো। চন্দ্রকান্তাঃ—চন্দ্রকান্তমণি (Moonstone), এই মণি থেকে চাঁদের আলোর মতো বর্ণভা বিচ্ছুরিত হয়। এই মণিধারণ সৌভাগ্যপ্রদ বলে জ্যোতিষীদের বিশ্বাস। এই মণি থেকে নাকি বিন্দু বিন্দু জলকণা ক্ষরিত হয়।

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্।

বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বন্ধালাপাঃবহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি।।১০।।

অন্বয় ঃ যত্র অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ বন্ধালাপাঃ কামিনঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈঃ ধনপতিযশঃ উদ্‌গায়দ্ভিঃ কিন্নরৈঃ সার্ধং বৈভ্রাজাখ্যং বহিরুপবনং নির্বিশন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—সেখানে (অলকায়), অক্ষয্য-অন্তর্ভবননিধয়ঃ—যাদের ভবন বা গৃহের মধ্যে নিধি বা ধনরত্নসমূহ অক্ষয্য অর্থাৎ অক্ষয় হয়ে থাকে, বিবুধ্বনিতাবারমুখ্যাঃ সহায়াঃ—অপ্সরা রূপ বারবনিতা সহ, বন্ধালাপাঃ—আলাপনরত, কামিনঃ—কামিগণ, প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈঃ—প্রত্যহ মধুরকণ্ঠে, অনুরাগাশ্রিত কণ্ঠে, ধনপতিযশঃ—ধনপতি কুবেরের যশোগান, উদ্‌গায়দ্ভিঃ—উদাত্তকণ্ঠে গাইছে এমন, কিন্নরৈঃ সার্ধং—কিন্নরদের সঙ্গে, বৈভ্রাজাখ্যং—বৈভ্রাজ-আখ্যং—বৈভ্রাজ নামক, বহিরুপবনং—বহিঃ উপবনং—বাইরের উপবনটি, নির্বিশন্তি—উপভোগ করে, বিহার করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেই অলকায় অক্ষয় ধনরত্ন-ভবনের অধিকারী কামী যক্ষগণ প্রত্যহ বারবনিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে মধুর উদাত্তকণ্ঠে ধনপতিকুবেরের যশোগানরত কিন্নরদের সঙ্গে বৈভ্রাজ নামক বাইরের উপবনটি (বিশেষভাবে) উপভোগ করে (অথবা বৈভ্রাজ নামক উপবনে বিহার করে)।১০।।

উজ্জীবনী ঃ অক্ষয্য—ন ক্ষয্য—ক্ষয়ের অযোগ্য (ক্ষয্য—'ক্ষেতুং শক্যঃ' অর্থাৎ ক্ষয়শীল) অতএব অক্ষয্য= অক্ষয় (যার ক্ষয় নাই), অনশ্বর। 'আচারাদ্ ধনমক্ষয্যম্' বলেছেন মনু (মনু. ৪.১৫৬) রামায়ণে অক্ষয় সায়ক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'অক্ষয্যসায়কৌ' (রা.৩.১২.৩৩), মহাভারতে আছে অবিনশ্বর বটবৃক্ষের কথা—'অক্ষয্যকরণো বটঃ' (মহা.৩.৮৭.১১), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা-মহারাজগণের কল্যাণার্থে মুনি-ঋষিদের তপোলব্ধ অক্ষয় পুণ্যফলের এক ষষ্ঠাংশ দানের বিষয় স্মরণ করেছেন মৃগয়ার্থী মহারাজ দুষ্যন্ত; বয়স্য বিদূষককে বলেছেন—'তপঃ ষড়ভাগমক্ষয্যাং দদাত্যারণ্যকা হি নঃ' (অ.শ. ২.১৩)। মল্লিনাথ অক্ষয্যের অর্থ করেছেন—'যথেচ্ছভোগসম্ভাবনার্থম্। বিবুধ্বনিতা—বিবুধ-বনিতা—বিবুধ শব্দের বাচ্যার্থ বিশেষরূপে বুধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত বিশেষজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি, ব্যঞ্জিত অর্থে দেবতা। আর বনিতা অর্থে স্ত্রী, অঙ্গনা ইত্যাদি। অতএব বিবুধবনিতা—দেবাঙ্গনা, অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা প্রভৃতি। পরবর্তী শব্দ—বারমুখ্যা—বারযোষিত বা বেশ্যা শব্দটি ব্যবহার করায় এক্ষেত্রে অপ্সরা অর্থ গ্রহণযোগ্য। বারমুখ্যার সমার্থক শব্দ—''বারস্ত্রীগণিকা বেশ্যা রূপাজীবাথ সা জনৈঃ। সৎকৃতা বারমুখ্যা স্যাৎ''—বলেছেন অমরকোষ। উদ্‌গায়দ্ভিঃ—উচ্চৈঃ (উদাত্ত) স্বরে গান করছে এমন। উদাত্তকণ্ঠে সঙ্গীত দেবযোনীদের সাধ্য 'গান্ধার' নামক উদ্‌গান কেবলমাত্র কিন্নরকণ্ঠেই সম্ভব। 'কিন্নরোদগীতভাষিণি'—বলেছেন মহাভারত (মহা.১.১৭২.১০) সঙ্গীতশাস্ত্রে নারদ বলেছেন—''ষড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ নতু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ।'' রক্তকণ্ঠৈঃ—রক্ত—মধুর, মিষ্ট, কণ্ঠ-রব যার অর্থাৎ কোকিল। এখানে পদটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ মধুরস্বরবিশিষ্ট। নির্বিশন্তি—নিঃ(নির্) √ বিশ্ অর্থ উপভোগ, বিহার—'নির্বিশো ভূতিভোগয়োঃ'—বলেছেন অমরকোষ। (এ প্রসঙ্গে দ্র. উজ্জীবনী পূ.মে. শ্লোক— ৬৩)।

৬.২.৮.৪ মেঘদূত (উত্তরমেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিত

মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ-এর অন্তর্ভুক্ত সুভাষিতগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় যে সকল কথা বলা হয়েছে সেগুলি উত্তরমেঘ-এর সুভাষিতাবলী সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। মহাকবি-ব্যবহৃত ঐ সকল সুভাষিত যুগজয়ী হয়েছে কেবল সুভাষিত বলেই নয়, জীবনরসের নিবিড়তা ও প্রাচুর্যের জন্য। প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণ ও মঙ্গলের সমবায় শান্তিসুধারসে পূর্ণ ঐ সকল বাণী। ভাব-ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কয়েকটি সুভাষিতের উল্লেখ এখানে করা হল।—

(১) 'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্'। (উ.মে.১৯) সূর্য বিদায় নিলে পদ্ম তার সৌন্দর্য প্রকাশ করে না।

(২) 'প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা।' (উ.মে. ৩২)—যাদের অন্তঃকরণ কোমল তারা প্রায় সকলেই করুণা পরবশ হয়ে থাকে।

(৩) "কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।।" (উ.মে. ৪৮)—এ সংসারে কেই বা নিয়ত সুখ লাভ করে অথবা একান্ত দুঃখ? মানুষের অবস্থা (দশা) চক্রনেমি বা চক্রধারার মতো কখনো নীচে আবার কখনো বা উপরে নামা-ওঠা করে।

(৪) "স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাৎ ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি।' (উ.মে. ৫১)—বিরহে স্নেহরাশি কোনো কারণে ধ্বংস হয়—এরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু (আসলে) এই স্নেহরাশি ভোগের অভাবে অভিলষিত বস্তুতে বর্ধিতরস হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

(৫) 'প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব।' (উ.মে. ৫৩)—কথা বলার চেয়ে কাজের দ্বারা প্রত্যুত্তর দেওয়া মহতের ধর্ম।

৬.২.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী

১। অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২। অলঙ্কার-চন্দ্রিকা (২য় সং, ভাদ্র-১৩৬৩)—শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

৩। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব (২য় সং ১৩৬৯)—ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৪। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধ্বন্যালোক (বঙ্গানুবাদ,১ম সং ১৩৬৪)—শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য

৫। উর্দু প্রেমের কবিতা (১ম সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৬। উপমা কালিদাসস্য (১ম সং)—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৭। ঋগ্বেদসংহিতা (বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৩)—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮। কাব্য-জিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী ১৯৬১)—শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৯। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র), বসুমতী (১০ম সং ১৩৬০)—রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১০। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম সং, ১৯৬৫)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১১। কাব্যালোক (৩য় সং, ১৩৭৩)—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১২। কাব্যকৌতুক (১লা আশ্বিন, ১৩৬৩)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৩। কালিদাসের কাব্যে ফুল (১ম সং, বুকল্যান্ড, কলিকাতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৫। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী (১ম সং, ১৯৬২)—ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

১৬। গাহা সত্তসঈ (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১৭। পারস্য সাহিত্য-পরিক্রমা (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১৮। পুরাণ প্রবেশ (২য় সং, ১৩৮৫)—গিরীন্দ্রশেখর বসু

১৯। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

২১। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (১ম সং, ১৩৫৯)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন

২৪। মেঘদূত পরিচয় (১ম সং, ১৩৭৪)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২৫। মেঘদূত জিজ্ঞাসা (২য় সং, ২০০৫)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৬। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতসাহিত্য (২য় সং, ২০০০)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৭। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (২য় খণ্ড)—নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯

২৮। Aristotle On the Art of Poetry (Oxford University Press-1962) Trs, by Ingram Bywater.

২৯। History of Indian Literature (Vol. 1-3, 1963) M. Winternitz.

৩০। The Meghaduta (1st Ed—Sahitya Akademi, New Delhi, 1957)

৩১। Kalidasa : A Critical study (Bharatiya Vidya Prakashan, 1977)—A. D. Singh

৬.২.৮.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সৌন্দর্যরসবোধের দিক থেকে মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ-এর মধ্যে একটি তৌল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করো।

২। উত্তরমেঘ অবলম্বনে অলকার সৌন্দর্য বর্ণনা করো।

৩। উত্তরমেঘ অবলম্বনে যক্ষভবন ও যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনায় কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৪। 'উপমা কালিদাসস্য'—কথাটির গুরুত্ব উত্তরমেঘ থেকে কয়েকটি উপমা চয়ন করে ব্যাখ্যা করো।

৫। উত্তরমেঘে যক্ষভবনের পরিচয় দান-প্রসঙ্গে কবির বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দাও।

৬। 'প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে উত্তরমেঘ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবময়, স্বপ্নময়, দিব্য আনন্দরসলোকের কথা বলেছেন তার স্বরূপ বিশদ করো।

৭। উত্তরমেঘ অবলম্বনে মেঘদূত কাব্যের, বিরহভাবনা ব্যাখ্যা করো।

৮। 'সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা।'—উত্তরমেঘ প্রসঙ্গে কথাটির সত্যতা যাচাই করো।

৯। মেঘদূত কাব্য-অবলম্বনে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাজনের গুরুত্ব নির্দেশ করো।

১০। উত্তরমেঘ-অবলম্বনে কালিদাসের সরস জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

১১। মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘে ব্যবহৃত সুভাষিতাবলীর কাব্যসৌকর্য বিশ্লেষণ করো।

১২। উত্তরমেঘ এর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য শ্লোকগুলি থেকে বিষয়ভিত্তিক (Textual) প্রশ্ন থাকবে। দৃষ্টান্ত যেমন (ক)—'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্।'—এই বাক্যের বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? উদ্ধৃত পংক্তিটির ভাবতাৎপর্য বিশদ করো। (খ) 'মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।' —উক্তিটির বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এ কথা বলেছেন? শ্লোকটিতে কথিত ভাবটি বিশ্লেষণ করো।

*অনুরূপভাবে শ্লোক ধরে ধরে প্রশ্ন থাকবে।

———

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৩

অভিজ্ঞানশকুন্তলম

একক - ৯

কবি নাট্যকার কালিদাস

বিন্যাসক্রম :

৬.৩.৯.১ : কালিদাস প্রতিভা : কবি-নাট্যকার কালিদাস

৬.৩.৯.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.৯.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.৯.১ : কালিদাস প্রতিভা : কবি-নাট্যকার কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা মহাকবি কালিদাস। 'মহাকবি' এই গুণবাটক শব্দটি তাঁর প্রতিভার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যদ্যোতক। যিনি মহাকবি—মহৎকাব্য স্রষ্টা, তিনি আবার মহৎ নাট্যরচয়িতাও। কাব্যধর্মের সঙ্গে নাট্যধর্মের এমন সফল-সুন্দর বেণী রচনার উজ্জ্বলতা জগতের খুব বেশি প্রতিভার মধ্যে দেখা যায় না। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম উত্তরকালের জগদ্‌বরেণ্য নাট্যস্রষ্টা শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বড় মাপের সাহিত্যসাধক যাঁরা একাধারে কবি-নাট্যকার ও দার্শনিক।

কিন্তু তাই বলে তাঁকে 'Shakespeare of India' অভিধাভূষিত করলে বিস্মিত হতে হয়। কেননা, তাতে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ কেন্দ্রিত বিরোধ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এমন সরল সমীকরণে দুই কালের দুই মহাপ্রতিভার মূল্যায়নও অসমীচীন। সেক্ষেত্রে স্থান ও কালগত ব্যবধানের কথা বাদ দিয়েই তাঁদের প্রতিভা কতটা কাছাকাছি তা নির্ণয় করতে হয়। কালিদাস ও শেক্সপীয়র দুজনেই ছিলেন মহৎ সাহিত্য স্রষ্টা। তাঁদের সাহিত্যের জীবন-অন্বেষা দুই মহাদেশের হৃদয়কে ধারণ করে প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্য-কল্যাণ ও মঙ্গলকে আহ্বান করেছে। দুজনেই দুই ভিন্ন মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেই হয়েছিলেন বিশ্বমানবতার বাণীবহ—বিশ্বপথিক। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে 'এহো বাহ্য'।

আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কার কাব্য আর নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত করে বলেছে—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠকাব্য হল নাটক। এই পরস্পর বিরোধী প্রত্যয়টি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রাচীনকালের সাহিত্যও সংস্কৃতির চর্চা মূলত নাট্য-অবয়ব বা নাট্য-আধারেই বেশি বিকশিত ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। একথা কেবল ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্পর্কে নয়, ইউরোপের সাহিত্য (বিশেষত গ্রিসীয় সাহিত্য) সম্পর্কেও প্রযোজ্য। দুটি দেশের সাহিত্যেই কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ একসঙ্গে মিশ্রিত হয়েই কাব্য অথবা নাটক হয়ে উঠত। মহামতি Aristotle যখন গ্রীক নাটকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁর সমালোচনা গ্রন্থের নাম দেন 'Poetics', তখন এরূপ শিরোনামের তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণদীপ্ত এক সুমঙ্গল জীবনাদর্শের দ্রষ্টা-স্রষ্টা ও উপভোক্তা রূপে কালিদাস বিশ্ববরেণ্য। সুনীতি-সুরুচিসমুজ্জ্বল এক প্রশান্ত জীবনবোধের ভাষ্যকারও ছিলেন তিনি। বস্তুত চিরায়ত সাহিত্যের (Classic Literature) যা কিছু গুণৈশ্বর্য ও মহিমা তা তাঁর সাহিত্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠক-পাঠিকা-দর্শক-শ্রোতার অন্তরে। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বজনীন রসস্রষ্টা—বিশ্বকবি (Universal Poet or the Poet of the Universe)।

এই সূত্রে কোনো কোনো সমালোচকের মতো কালিদাসকে কেবল যুগন্ধর বা যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক বললে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয় বটে কিন্তু তাতে তাঁর প্রতিভার দেশ-কালোত্তীর্ণ যুগাতিশায়িতার দিকটি যেন অনেকটাই অনাদৃত তথা গৌণ থেকে যায়। কেননা, তাঁর মতো মহৎ ও বিরল প্রতিভাকে কোনো

সংকীর্ণ বৃতি দিয়ে আটকে রাখা যায় না, চলেও না। এই জাতীয় একপেশে সংকীর্ণ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে দেশ-বিদেশের সাহিত্যরসিক সমালোচকদের কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্যের উল্লেখই যথেষ্ট।

'হরিহরাবলী'তে প্রাচীন কবির্মনীষীদের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে একমাত্র কালিদাসকে 'প্রকৃত কবি' আখ্যায় ভূষিত করে বলা হয়েছে—

"পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতঃ কালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্য কবেরভাবাৎ
অনামিকা সার্থবতী বভুব।।"

অর্থাৎ পুরাকালে কবিদের সংখ্যা গণনা প্রসঙ্গে কালিদাসই কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে বা প্রথমস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তারপর আজ পর্যন্ত তাঁর মতো কবি প্রতিভার অভাবে দ্বিতীয় অঙ্গুলির 'অনামিকা' অর্থাৎ নামহীনা—এই শিরোনামটিকে সার্থকই বলতে হবে। (অর্থাৎ প্রকৃত 'কবি' বলতে তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ।)

মহাকবি বাণভট্ট থেকে শুরু করে কবি জয়দেব, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ কালিদাস-প্রশস্তিতে মুখর। জয়দেবের দৃষ্টিতে তিনি 'কবিকুলগুরু' এবং 'বিলাসকলার' কবি, মধুসূদনের কাছে তিনি 'পিককুলপতি' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বোধে তিনি ছিলেন 'চিরকালের কবি—'কবিপতি'। সর্বপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে গ্রহণ করেছেন ভারতাত্মার প্রতীক—'ভারতপথিক' রূপে।

কেবল প্রাচ্যদেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারস্বত প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতিধন্য হয়েছেন কালিদাস। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব সার উইলিয়াম জোন্স-কর্তৃক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর কিয়দংশের জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ (১৭৮৯ খ্রিঃ) ও ১৮১৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন-কর্তৃক 'মেঘদূতম্'-এর ইংরেজী কাব্যানুবাদ মহাকবি কালিদাসকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলে। অতঃপর কালিদাসীয় সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ভারতীয় রসলোকের সন্ধানে বিস্ময়বিমূঢ় অনেক বিদগ্ধ কবি-দার্শনিক-সমালোচক প্রাচ্য সাহিত্যের অমৃতরসলোকে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, মুখর হয়েছেন কালিদাস প্রশস্তিতে। হ্যামবলডট্, গ্যায়টে, ড. রাইডার, ড. সিলভ্যাঁ লেভি. মনিয়ের উইলিয়মস, ম্যাক্সমূলার, কীথ, উইনটারনিৎসজ, ওয়েবার, অধ্যাপক ল্যাসেন, রোমাঁ রল্যাঁ প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কালিদাসের রচনাবলী :

মহাকবি কালিদাসের রচনাবলীরূপে চিহ্নিত, অবিতর্কিত ও সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা মূলত সাত। এদের মধ্যে কাব্য চারখানি এবং বাকি তিনখানি নাটক। কাব্যগুলি যথাক্রমে 'ঋতুসংহার',

'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ' এবং নাটক তিনটি যথাক্রমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সৃষ্টি। এই একটিমাত্র নাট্যসৃষ্টি থেকেই তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। তাই বোধ করি সমালোচক আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা।।"

বস্তুত তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠাংশও ঐ চতুর্থ অঙ্ক যার মূল প্রতিপাদ্য দুষ্যন্ত-পরিণীতা আপন্নসত্ত্বা শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালীন বিদায়দৃশ্যের সংবেদনশীল আলেখ্য উপস্থাপনা। পাঠ্যসূচীতে গৃহীত নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট অধ্যায়টির বিচার বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় বিবেচ্য।

প্রশ্ন জাগে, কোন্ গুণৈশ্বর্যে কালিদাসের এই নাটকটি বিশ্বের বিবেকবান ও সহৃদয় সামাজিকদের মনে সাড়া জাগায়? উত্তরে বলা যায়, মহাকবির ভাবপ্রকাশের উপযোগী বিশিষ্ট রচনাশৈলী ও তাঁর অনুধ্যেয় আদর্শায়িত জীবনবোধ নাটকটিকে কালজয়ী সৃষ্টির মহিমা দান করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শৈলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠরীতি 'বৈদর্ভী'র যাবতীয় গুণ—শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা-মাধুর্য-সৌকুমার্য-সুগভীর অর্থদ্যোতনা-ঔদার্য্য-ওজোগুণ-কান্তি প্রভৃতির অত্যুজ্জ্বল প্রাকশে ঋদ্ধ হয়েছে তাঁর নাট্যভাষা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি-নাট্যকারের সুমার্জিত সুরুচি-সুশুচিসমুজ্জ্বল আদর্শায়িত অখণ্ড জীবনবোধ। তাঁর সাহিত্যের অন্যতম ভূষণ প্রকৃতিপ্রাণতা। নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিখিল মানবমনকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়ার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। তপোবন-আশ্রিত ভারতীয় জীবনচিকীর্ষার জীবন্ত চিত্রাবলী উপহার দিয়েছেন তিনি। কখনো ছোটো ছোটো বাক্যের স্ফটিকঘন সৌকর্য, কখনো বা আবেগদীর্ণ সংবেদনশীল সুদীর্ঘ নাট্যসংলাপের গভীরতা অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকটিকে অক্ষরার্থদীপ্ত অথচ অভিপ্রেত ভাব-ব্যঞ্জনায় পূর্ণ ও বোধির আলোকে বিভাসিত এক বিরল নাট্যসৃষ্টির মহিমা দান করেছে। অসমান্য বীক্ষণশক্তি, পরিমিতিবোধ, সংকেতময়তা ও সৌন্দর্যরসবোধ কালিদাসের সাহিত্যকে একটি শিষ্টমাত্রা দান করেছে। জীবন-অন্বেষার সুসূক্ষ্ম বুনোটে মানবিক অনুভূতির স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটককে করে তুলেছে জগতের অন্যতম বরেণ্য নাটক।

কালিদাসের কাল :

কালিদাসের সাহিত্যরসমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

সকল বিচার-বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যরসেই আকণ্ঠ তৃপ্ত

থাকবার বাসনা প্রকাশ করে উত্তমর্ণ কবির ঐশ্বর্য-গৌরবময় ভাবজগতের রহস্যাবৃত কল্পলোকে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একালের আধুনিক গীতিকবির নবরত্নের মালায় 'দশম রত্ন' হয়ে ফুটে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্তই বায়বীয় আবেগপ্রসূত, নাকি এক বিশেষকালের বিশেষ কবির মানস-বিকাশের পরিপ্রেক্ষা-আশ্রিত? রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যাই হোক না কেন, মহাকবি কালিদাস কোন্ বিশেষ যুগের সৃষ্টি এবং কোন্ সাহিত্যানুরাগী নরপতি ও রাজসভা তাঁর মতো অমূল্য রত্নকে ধারণ করে ধন্য হয়েছিল এ নিয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুতরাং কালিদাস ও তাঁর আবির্ভাবকাল, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহে পণ্ডিতকুল বিচিত্রমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সেইসকল পরস্পরবিরোধী মতবাদের সরল সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তাই পণ্ডিতবর্গের কূটযুক্তি ও তর্কজালের নিবিড় অরণ্যে পথ না হারিয়ে কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।—

(১) পণ্ডিত হিপ্পোলিতে ফৌস (Dr. Hippolite Fauche)-এর মতে কালিদাস খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কবি এবং রঘুবংশীয় নরপতি অগ্নিবর্ণের সমসাময়িক।

(২) ড. সি. কানহন্ (Dr. C. Kunhan), সারদারঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে শুঙ্গবংশীয় নরপতি অগ্নিমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কবি বলে মনে করেন।

(৩) উইলিয়াম জোনস্, সি. এস. পাণ্ডে, বি. ডি. উপাধ্যায়, এম. আর কালে, আর. এন. আপ্তে, আর. ডি. কর্মকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জি. এস. হীরাচাঁদ ওঝা, কে. পি. মিত্র, ড. রাজবলী পাণ্ডে প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে খ্রি.পূ. প্রথম শতকের কবি বলে মনে করেন। এঁরা সকলেই পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য সহযোগে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কালিদাস কিংবদন্তিখ্যাত উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নরপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভাকবি। বিক্রমাদিত্য খ্রি.পূ. ৫৭ অব্দে শকদের পরাজিত করেন এবং স্বনামে 'বিক্রংসংবৎসর' চালু করেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাস সম্মত নয়।

(৪) অধ্যাপক ল্যাসেন ও ওয়েবারের বিশ্বাস, কালিদাস ছিলেন খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক।

(৫) ড. এ. বি. কীথ মনে করেন, কালিদাস খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কোনো সময়ে হূন-বিজেতা ইতিহাসখ্যাত উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য'র রাজত্বকালে (খ্রি. ৩৮০-৪১৩) আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। এই দুই নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। ড. ব্যুলার, স্মিথ, ম্যাকডোন্যাল, ড. ডি. সি.

সরকার, উইনটারনিৎসজ্, স্টেনকণৌ, লাইবিস, টি. ব্লঁস, পণ্ডিত রামাবতার শর্মাচার্য প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণের অনেকেই এমতের সমর্থক। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট এই মতই এতাবৎকাল পর্যন্ত কালিদাসের আবির্ভাবকালরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

(৬) ড. ফার্গুসন কালিদাসের জীবৎকালকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। ড. হোর্ণলি, ভউ দাজী (Bhau Daji), কার্ণ, ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর, কে. বি. পাঠক প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতের সমর্থক। অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল কালিদাসকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কবি বলে মনে করেন।

যাইহোক, কালিদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হল এই যে, কালিদাস গুপ্ত যুগের খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কবি এবং খুব সম্ভবতঃ কিংবদন্তির জনপ্রিয় মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (খ্রি. ৩৮০-৪১৩) ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়া ও হূনবিজয়ের উল্লেখ, 'মালাবিকাগ্নিমিত্রে' পূর্বসূরী অথবা সমসাময়িক দার্শনিক-মনীষী ধাবক, সৌমিল্লক, কবিপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ, বৎসভট্টির দশপুর প্রত্নলেখে' (৪৭৩ খ্রি.) কালিদাসীয় রচনাশৈলীর অনুসরণ ও কুমারগুপ্তের জন্মোৎসবের ছায়ায় 'কুমারসম্ভব' রচনা, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রস্তরলিপিতে (Ihole Inscription) যশস্বী কবিদের নামের সঙ্গে কালিদাসের নামোল্লেখ এবং বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' (খ্রি. সপ্তম শতাব্দী) কালিদাস-প্রবর্তিত বৈদর্ভী রীতির অনুসরণ প্রভৃতি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে কালিদাস গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা।

গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। জ্ঞানে-গরিমায়, ঐশ্বর্যে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসন-শৃঙ্খলায়, শৌর্যে-বীর্যে-মন্ত্রণায়, সর্বোপরি দর্শন-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রদীপ্ত গুপ্তযুগ—ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট হিন্দু সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের পরিচয়ে ভাস্বর এই যুগ কালিদাসের রসচিকীর্ষার পথকে উজ্জীবিত ও প্রশস্ত করেছিল। "একটা পরম ঐশ্বর্যময়, জীবনবাদীও সম্পন্নকালের পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে জীবনরসের নিবিড়তা আমাদের এমন করে টানে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

একক - ১০

নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১০.১ নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

৬.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১০.১ : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কুশীলব (নাট্য-চরিত্র) :

চরিত্র পরিচয়—পুরুষ চরিত্র :

দুষ্যন্ত—হস্তিনাপুরের মহারাজা

মাধব্য—বিদূষক (রাজমনোরঞ্জক বয়স্য)

সর্বদমন (ভরত)—দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শিশুপুত্র

সোমরাত—রাজপুরোহিত

সূত—রাজসারথি

বাতায়ন—কঞ্চুকী

রৈবতক—দ্বাররক্ষক

শ্যাল—নগরপাল

জানুক ও সূচক (জানুঅ ও সূঅঅ) —নগররক্ষীদ্বয়

ভদ্রসেন—রাজসেনাপতি

করভক—রাজমাতার দূত

বৈতালিকদ্বয়

ভগবান কাশ্যপ—মহর্ষি কণ্ব, আশ্রমপ্রধান ও শকুন্তলার পালক-পিতা।

শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গালব্য বৈখানস, গৌতম, নারদ—মহর্ষি কাশ্যপের শিষ্যবৃন্দ

মারীচ—দেবর্ষি, দেবতা ও দানবদের পিতা

সূত্রধার—নাট্য পরিচালক

স্ত্রীচরিত্র :

শকুন্তলা—বিশ্বামিত্র-মেনকার কন্যা, মহর্ষি কাশ্যপ-পালিতা, নাটকের নায়িকা চরিত্র।

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা—শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী।

গৌতমী—মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমের প্রধানা তপস্বিনী

অদিতি—মহর্ষি মারীচের পত্নী, দেব ও দানবদের মাতা

সানুমতী—শকুন্তলার বান্ধবী, অপ্সরা

পরভৃতিকা ও মধুরিকা—মহারাজা দুষ্যন্তের উদ্যান-পালিকাদ্বয়

চতুরিকা—রাজপরিচারিকা

প্রতিহারী—দ্বাররক্ষিকা

নটী—সূত্রধারপত্নী

যবনী—রাজসেবিকা

পরোক্ষ চরিত্র (স্ত্রী ও পুরুষ) :

পৌলোমী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী

মেনকা—অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা

বসুমতী—দুষ্যন্তের জননী

হংসপদিকা—দুষ্যন্তপত্নী

ইন্দ্র—দেবরাজ

জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র

কৌশিক—ঋষি বিশ্বামিত্র, শকুন্তলার পিতা

নারদ—কাশ্যপশিষ্য

দুর্বাসা—বিশিষ্ট ঋষি যিনি স্বভাবতই অন্যের প্রতি কোপপরায়ণ

মার্কণ্ডেয়—ঋষিপুত্র, দুষ্মন্ততনয় সর্বদমনের খেলার সঙ্গী

বৃদ্ধশাকল্য—মারীচাশ্রমের বৃদ্ধতপস্বী

পিশুন—কোষাধ্যক্ষ ও প্রধানমন্ত্রী

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে ৪৭টি চরিত্রের সমবায়ে রচিত সুবৃহৎ একটি সপ্তাঙ্ক নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

একক - ১১

নাটকের বিষয়সংক্ষেপ

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১১.১ অভিজ্ঞান শকুন্তলার নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

৬.৩.১১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১১.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১১.১ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

নাট্য উপস্থাপনার সূচনাতে আদিনট, অষ্টমূর্তিরূপে প্রকাশিত ভগবান শিবের প্রশস্তিসূচক নান্দীপাঠ। তারপর মঞ্চে সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ—'নান্দ্যতে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।' সূত্রধার ও নটীর আলাপচারিতা থেকে জানা গেল যে সময়টা গ্রীষ্ম এবং ঐকালের পটভূমিকায় রচিত মহাকবি কালিদাসের নবনাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র অভিনয় হতে চলেছে। এরপর প্রথমাঙ্কের বিষয়।

মহারাজা দুষ্যন্ত রথারোহণ করে মৃগয়াযাত্রা করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সারথি ও বিনোদক বয়স্য প্রিয় বিদূষক মাধব্য। একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে অজ্ঞাতসারে কখন যে তিনি গভীর অরণ্য ছেড়ে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে প্রবেশ করেছেন বুঝতেই পারেন নি। তাঁর হুঁশ হল অচিরেই। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শিকারটির উপরে তিনি বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত এমন সময়ে শুনতে পেলেন ঋষিকণ্ঠের কাতর মিনতি—"ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোহয়ম্ ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।"—মহারাজ, এ আশ্রমমৃগ, অবধ্য।' শায়ক সম্বরণ করে তিনি রথ থেকে নেমে মহর্ষি কাশ্যপ (কণ্ব) ও আশ্রমের আশ্রিতদের

সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। তাপসদের অনুরোধে আতিথ্য গ্রহণ করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছেন, দেখলেন তিনটি সমবয়সী তরুণী সহকার বৃক্ষের আলবালে জল সেচনরত। তাঁদের মধ্যে রূপে-গুণে অতুলনীয়া তরুণীটিকে দেখামাত্রই তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হতে লাগল। সখীদের আলাপচারিতা থেকে তিনি বুঝলেন যে তার নাম শকুন্তলা। আরও জানলেন, শকুন্তলা আশ্রমের প্রাণস্বরূপা এবং তারই উপর আশ্রমের সর্বপ্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত করে মহর্ষি বর্তমানে আশ্রমের বাইরে সোমতীর্থে।

ইতিমধ্যে একটা দুষ্ট ভ্রমর বারবার শকুন্তলাকে উত্যক্ত করতে থাকলে সখীরা ঠাট্টা করে তাঁকে বলে, 'এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কি আর করবে, রাজা দুষ্যন্তকে ডাকো।' সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী দুষ্যন্তের আত্মপ্রকাশ এবং চারিচক্ষুর মিলন। প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়বন্ধন পরস্পরকে আরও অন্তরঙ্গভাবে জানার অবকাশ রচনা করে। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি এখানেই।

দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় বিদূষক ও দুষ্যন্তের ভাব-বিনিময়। মহারাজের বর্তমান ভাব-গতিক লক্ষ্য করে বিদূষকের কটাক্ষ, মহারাজ বুঝি তপোবনকে প্রমোদকানন করে তুলতে চান। দুষ্যন্ত সংগোপনে তার কাছে শকুন্তলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও দুর্বলতার বিষয় স্বীকার করেন। শকুন্তলার চিন্তায় আচ্ছন্ন মহারাজা ভাবছেন কেমন করে কোন অছিলায় তাকে আর একবার দেখতে পাবেন, এমন সময়ে ঋষিকুমারদ্বয় তাঁর কাছে এসে জানাল যে রাক্ষসেরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তারা শরণাগত এবং তাঁর সাহায্যপ্রার্থী। অগত্যা বিঘ্ননাশকল্পে কয়েকদিনের জন্য তিনি আশ্রমের আতিথ্য স্বীকার করলেন। কিন্তু বিপত্তি হল। রাজধানী থেকে দূতের মাধ্যমে খবর এসেছে। রাজমাতা আসন্ন পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে সত্বর মৃগয়াভূমি থেকে রাজধানীতে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছেন। দ্বিধায় পড়লেন মহারাজ। একদিকে অলঙ্ঘ্য মাতৃ আদেশ, অন্যদিকে শকুন্তলার আকর্ষণ ও রাক্ষসদলনরূপ পুণ্যকর্ম। কোন দিক রক্ষা করবেন তিনি। সমাধানের সূত্রও খুঁজে পেলেন তিনিই। বিদূষককে যে রাজমাতা পুত্রতুল্য মনে করেন। সুতরাং পুত্রের কাজ পুত্রতুল্য বিদূষককে দিয়ে করিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদায়ের আগে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, শকুন্তলার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা যেন কারো কাছে না প্রকাশ করে ফেলে। কেননা ব্যাপারটা তো সত্য নয়, কল্পনা মাত্র! পরিহাসচ্ছলেই তিনি তাকে শকুন্তলাতত্ত্ব বলেছেন—'পরিহাস বিজল্পিতম্।' (২য় অঙ্ক)।

রাক্ষস দলন তো হল। শকুন্তলাকে দেখবার জন্য আকুল হলেন দুষ্যন্ত। শকুন্তলার অবস্থাও ততোধিক। লতাকুঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন দুষ্যন্ত। শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠের কাতরতা। অসুস্থা শকুন্তলাকে নিয়ে বিব্রতা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কী করে যে প্রিয়সখীকে সুস্থ করে তুলবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। অগত্যা অকপটে শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রতি তার গভীর অনুরাগের কথা বলে ফেললেন—'সখি! যবে থেকে তপোবনের রক্ষক সেই রাজর্ষিকে দেখেছি....।' সখীদ্বয় সবই বুঝলেন। প্রিয়সখীর গভীর অনুরাগের কথা মহারাজের কাছে গোপনে পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা করলেন তাঁরা।

স্থির হল, শকুন্তলা নলিনীপত্রে প্রণয়পত্র রচনা করবেন আর তা ফুলের মধ্যে লুকিয়ে 'নির্মাল্য' বলে মহারাজের কাছে পৌঁছে দেবেন তাঁরা। শকুন্তলা মনে মনে কল্পনা করছেন পত্রে লিখবেন এই কথা—"ওগো নির্দয়! তোমার হৃদয়ের কথা আমি জানি নাচ কিন্তু তোমার অনুরাগী আমার অঙ্গগুলিকে প্রেমের দেবতা কামদেব যে নিরন্তর (দিবা-রাত্র) তাপিত করছেন।"—

(তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি

নিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্ত মণোরহাইং অঙ্গাইং।।)

শকুন্তলাসহ সখীদের বৃত্তান্ত অন্তরালে থাকা দুষ্যন্তের গোচরে আসা মাত্রই স্বয়ং সশরীরে তাঁদের সামনে হাজির হলেন তিনি। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝে সখীদ্বয় একটি মগশাবক কে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার অছিলায় লতাকুঞ্জ থেকে বাইরে গেলেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন হল। অদূরে মা গৌতমীর কণ্ঠস্বর শুনে রাজা লতাকুঞ্জের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি এখানে।

গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করলেন দুষ্যন্ত। যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে তাঁকে অচিরকালের মধ্যেই রাজধানীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তপোবন ছেড়ে গেলেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধুর মিলনবৃত্তান্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া আশ্রমের আর সকলের অগোচরেই রইল। আপন্নসত্ত্বা শকুন্তলাকে নিয়ে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চিন্তার শেষ নেই। প্রতিশ্রুতিমতো প্রিয়সখীকে নিয়ে যাবার জন্য রাজধানী থেকে মহারাজের কোনো দূত এলেন না। পতিচিন্তায় আত্মসমাহিতা শকুন্তলা। এদিকে মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলার রিষ্টিদোষ মুক্তির জন্য গিয়েছেন আশ্রমের বাইরে—সোমতীর্থে তপঃসাধনের উদ্দেশ্যে। আশ্রম পরিচালনার গুরুভার তিনি অর্পণ করে গেছেন পরম স্নেহাপদা শকুন্তলার উপর। ইতোমধ্যে ঋষি দুর্বাসা আশ্রমের প্রবেশদ্বারে এসে 'অয়মহং ভোঃ' ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর উপস্থিতি। পতিগতপ্রাণা শকুন্তলার বেহুঁশ চেতনায় দুর্বাসার আবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ক্ষুব্ধ-রুষ্ট দুর্বাসা 'আ অতিথিপরিভাবিনি! ...' ইত্যাদি বলে কঠোর অভিশাপ দিলেন তাঁকে। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে অভিশাপ তিনি তো আর নিজের মধ্যে নেই! দুর্বাসা-কেন্দ্রিত দুর্ভাবনা তাঁকে স্পর্শ করতেও পারল না। ঋষি কণ্ঠের আওয়াজ অনসূয়া-প্রিয়ংবদার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে আসন্ন দুর্বিপাক থেকে মুক্তিসূত্রের খোঁজ মিলল। স্বভাবরুষ্ট মহর্ষি শেষ পর্যন্ত ক্ষমার সুরে 'কোনো অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে তাঁর শাপ ফলবে না'—একথা বলতে বলতে দ্রুত চলে গেলেন। দুই প্রিয়সখী যে ঘটনার সাক্ষী শকুন্তলা তার কিছুই জানলেন না।

মহর্ষি কাশ্যপ আশ্রমে ফিরেছেন। শকুন্তলা-দুষ্যন্ত উপাখ্যান তাঁর ধারণারও বাইরে। এই বৃত্তান্ত যখন তিনি জানবেন, না জানি তিনি কিরূপ আচরণ করবেন। এ সকল ভেবে শঙ্কাতুর হয়ে পড়েছে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। এদিকে আকাশবাণীতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় থেকে পরিণয় কথা জেনেছেন মহর্ষি। তিনি রুষ্ট তো হনই নি, বরং এই শুভ ঘটনায় আনন্দিত হয়ে আশ্রমে ফিরেই শকুন্তলাকে পতিগৃহে

পাঠাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পিতার আচরণে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যারপরনাই খুশি। পুণ্যস্নানে পবিত্রগাত্রী শকুন্তলাকে দৈশিক অলঙ্কার-আভরণে ফুলসাজে সাজিয়ে দেবার ভার পড়ল সখীদ্বয়ের উপর। যজ্ঞীয় পূতাগ্নি ও বেদী প্রদক্ষিণ শেষে আশীর্বাদপর্ব। এক তপস্বিনী আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাছা, তুমি পতির কাছে বহুসম্মানের পাত্রী হও।' ('বচ্ছে! ভর্তুর্বহুমতা ভব।') অপর তপস্বিনী আশীর্বাদ করলেন, 'বাছা, বীর সন্তানের জননী হও। ('বচ্ছে, বীরপ্পসবিণী হোহি।')

এবার পতিগৃহগামিনী শকুন্তলাকে কেন্দ্র করে যাত্রা পর্ব। মহর্ষি কণ্বের (কাশ্যপ) নির্দেশে মা গৌতমী, সার্ঙ্গরব, শারদ্বত শকুন্তলাকে মধ্যমণি করে অগ্রসর হবেন। তপোবনলালিতা শকুন্তলা তপোবন প্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছেন। বনজ্যোৎস্না বনতোষিণী নবমল্লিকার সহকার আলিঙ্গন ও পল্লবিত হয়ে ওঠার আনন্দে তিনি আত্মহারা। সন্তান তুল্য মাতৃহারা হরিণ শিশুটি তাঁর আঁচল ধরে টানলে তাকে প্রবোধ দেন। মহর্ষি তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হলে পরম মমতায় তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেন। শেষ বিদায়ের আগে পতিগৃহে গুরুজন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের প্রতি বধূ শকুন্তলার ব্যবহার কেমন হবে সে সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিলেন মহর্ষি। তারপর বনরাজির আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে অশ্রুপ্লুতা অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর মনে হল, কন্যা যেন পরের ঘরে গচ্ছিত ধন। আজ তাঁকে পতিগৃহে পাঠিয়ে তিনি যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করছেন। চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু এই।

শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত ও গৌতমী দুষ্যন্তর রাজধানী হস্তিনাপুরে উপস্থিত। মহারাজা দুষ্যন্তের কাছে নিবেদন করা হল, তাঁর বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করা হোক। আকস্মিক অদ্ভুত আবেদনে বিস্মিত দুষ্যন্ত পূর্বকথা কিছুই মনে আনতে পারলেন না। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হলেন। শুরু হল তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। মহারাজা বিবাহের প্রমাণ চাইলে শারদ্বত ক্ষুব্ধ হলেন। শকুন্তলার মনে পড়ল সখীদের সাবধান বাণী। সখীরা বলেছিলেন অনুরূপ ক্ষেত্রে মহারাজদত্ত আংটিটি সে যেন দেখায়। কিন্তু কোথায় আংটি! অসহায়া শকুন্তলার প্রতি মহারাজের বিদ্রূপ তীব্রতর হলে ক্ষোভে দুঃখে-লজ্জায় অপমানাহত শকুন্তলা পুরানো দিনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করলেন যদি মহারাজ তাঁকে চিনতে পেরে গ্রহণ করেন এই আশায়। কিন্তু তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। হতাশ শারদ্বত গুরুর আদেশে শকুন্তলাকে মহারাজের কাছে রেখে অগত্যা আশ্রমে ফিরে যেতে চাইলেন।

এদিকে রাজগণৎকারগণ জানিয়েছেন যে মহারাজ পুত্রসন্তান লাভ করবেন এবং তাঁর শরীরে রাজচক্রবর্তীর চিহ্নসমূহ থাকবে। বিচলিত মহারাজ ও শকুন্তলাকে বর্তমান দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন রাজপুরোহিত। স্থির হল, যতদিন পর্যন্ত না শকুন্তলার সন্তান জন্মলাভ করে ততদিন তিনি রাজপুরোহিতের আশ্রয়েই থাকবেন। সন্তান যদি রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত হয় তবেই প্রমাণ হবে যে শকুন্তলা মহারাজের পরিণীতা। এই ব্যবস্থায় দুষ্যন্ত সম্মতি জানালেন।

অশ্রুভারনত শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন রাজপুরোহিত। হঠাৎ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি

এসে শকুন্তলাকে মহাশূন্যে নিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হলেন। ঘটনাটি দুষ্যন্তের কাছে নিবেদিত হলে এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। (পঞ্চম অঙ্ক)।

ষষ্ঠ অঙ্কের সূচনায় অন্য দৃশ্য। রাজরক্ষিগণ একটা জেলেকে ধরেছে মহারাজের নামাঙ্কিত আংটিটি নাকি সেই চুরি করেছে। এদিকে জেলে বলছে, মাছ কাটতে গিয়ে একটি মাছের পেট থেকে সে নাকি রত্নভাস্বর বহুমূল্য ঐ আংটি পেয়েছে। বিচারের আশায় সেই ধীবরকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিগণ রাজার কাছে এলে অঙ্গুরীয়ক দেখেই শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ের সকল কথা মনে পড়ে গেল। অনুতপ্ত বিষদাচ্ছন্ন ও অপুত্রক দুষ্যন্তকে সান্ত্বনা দিলেন স্বর্গ থেকে দেবরাজপ্রেরিত সারথি মাতলি। জানা গেল, দানবদলনের জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র দুষ্যন্তের সাহায্য চেয়ে মাতলিকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন। দুষ্যন্ত তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। (ষষ্ঠ অঙ্ক)

ইন্দ্রশত্রু দানবদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে আকাশপথে মর্ত্যে ফিরছেন দুষ্যন্ত। মাতলির কাছ থেকে শুনলেন, অদূরবর্তী হেমকূট পর্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রম। ইন্দ্রের জনক-জননী ঋষি মারীচ ও অদিতিকে বন্দনা করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর আগমন সংবাদ মহর্ষির কাছে পৌঁছে দিলেন মাতলি। আশ্রমে প্রবেশ করতেই একটি বিরলদৃশ্য দুষ্যন্তকে বিস্মিত ও পুলকিত করল। তিনি দেখলেন, একটি বালক সিংহশিশুর কেশ আকর্ষণ করতে করতে খেলা করছে। তাকে দেখেই স্নেহে পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। সঙ্গিনীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ছেলেটির পিতা পুরুবংশীয় এবং তার জননীর নাম শকুন্তলা। শুনেই চকিত হলেন তিনি। এমন সময়ে ছেলেটির হাত থেকে রক্ষাকবচ খুলে পড়ে গেছে মাটিতে। মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে সেটি মাটি থেকে তুলে নিতেই বিস্মিত তপস্বিনীরা বুঝে গেলেন যে মহারাজই ছেলেটির পিতা। কেননা তার পিতা ছাড়া অন্য কেউ সেটি ছুঁলেই তা সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা তাপসীরা জানালেন শকুন্তলাকে। ছুটে এলেন শকুন্তলা। সুদীর্ঘ বিরহে অনুতপ্ত দুষ্যন্ত তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বেদনার ভার বিগলিত মঙ্গলমিলনে মধুর হয়ে উঠল। সেই পবিত্র মিলনের বার্তা অচিরেই পৌঁছে দেওয়া হল মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের এখানেই সমাপ্তি। (সপ্তম অঙ্ক)

একক - ১২

চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১২.১ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বাংলা রূপান্তর

৬.৩.১২.২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কাশ্রিত রসাগ্রাহী বিশ্লেষণ

৬.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১২.১ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বাংলা রূপান্তর ১

(তারপর পুষ্পচয়ন-অভিনয়রত দুই সখীর প্রবেশ)

অনসূয়া — ওলো প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্বমতে শুভ বিবাহের দ্বারা শকুন্তলা উপযুক্ত পতি লাভ করেছে বলে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত, তাহলেও একটা চিন্তা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

প্রিয়ংবদা — কেন রে? কিসের চিন্তা?

অনসূয়া — পুণ্য কাজটি শেষ করে ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই রাজর্ষি নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। এখন অন্তঃপুরে গিয়ে এখানকার সকল ঘটনা তিনি মনে করতে পারছেন কি না—এইটেই চিন্তার বিষয়।

প্রিয়ংবদা — এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। আমার বিশ্বাস, তাঁর মতো সুপুরষ কখনো গুণহীন হতে পারেন না। তবে পিতা (মহর্ষি কণ্ব) এখন এই ঘটনার কথা শুনে ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবেন কে জানে।

অনসূয়া — আমার মন কি বলছে জানিস? পিতা বোধহয় ব্যাপারটা মেনে নেবেন।

প্রিয়ংবদা — কী করে একথা বলতে পারিস?

অনসূয়া — ভেবে দ্যাখ, গুরুজনদের প্রধান সংকল্প হল গুণবতী কন্যাকে সুপাত্রে দান করা। এখন সেই ব্যাপারটি যদি দৈবই ঘটিয়ে দেয় তাহলে বিনা চেষ্টাতেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন।

প্রিয়ংবদা — যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই। (সাজি দেখে) সখি! পূজার জন্যে যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে।

অনসূয়া — তাই তো! প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতার অর্চনা করতে হবে না?

প্রিয়ংবদা — অবশ্যই। (অভিনয় করে দেখালেন।)

(নেপথ্যে—অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি এসেছি।)

অনসূয়া — (কান পেতে) সখি! কোনো অতিথি এসে কিছু বলছেন মনে হচ্ছে!

প্রিয়ংবদা — চিন্তা নেই, কুটীরে শকুন্তলা আছে না! (মনে মনে) কিন্তু আজ ওর মন কি আর ওতে আছে!

অনসূয়া — থাক, আর ফুল তুলে কাজ নেই। এইই যথেষ্ট।

(নেপথ্যে) ওরে আতিথ্যধর্মভ্রষ্টা! একমনে যার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মতো তপস্বীর উপস্থিতিও তোর চোখে পড়ল না, (আমি অভিশাপ দিচ্ছি) সে তোকে কিছুতেই চিনতে পারবে না, বারবার মনে করিয়ে দিলেও না। উন্মাদ ব্যক্তি যেমন পূর্বকথা ভুলে যায়, তারও তেমনি অবস্থা হবে।

প্রিয়ংবদা — হায় হায়, কী সর্বনাশ না ঘটে গেল! শূন্যহৃদয়া প্রিয়সখী বুঝি অজ্ঞাতসারেই কোনো গুরুজনের কাছে অপরাধ করে ফেলল।

অনসূয়া — (সামনে তাকিয়েই) সখি! ইনি যে সে লোক নন, সুলভকোপা মহর্ষি দুর্বাসা স্বয়ং। ঐ দ্যাখ, অভিশাপ দিয়েই তিনি যেন ছুটে চলে যাচ্ছেন!

প্রিয়ংবদা — আগুন ছাড়া আর কে দগ্ধ করতে পারে? ছুটে যা। পায়ে পড়ে কোনোওভাবে ফেরা ওঁকে! ততক্ষণে আমি ওঁর পাদ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করি।

অনসূয়া — তাই হোক। (প্রস্থান)

প্রিয়ংবদা — (কয়েকপা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে) ওমা, আবেগে বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম বলেই বুঝি আমার ডানহাত থেকে ফুলের সাজিটা মাটিতে পড়ে গেল। (ফুল কুড়োনোর অভিনয় করলেন)।

অনসূয়া — (প্রবেশ করে) সখি! যার স্বভাবই বাঁকা তিনি কি কারো অনুনয় শোনেন! কোনো প্রকারে তাঁকে কিছুটা শান্ত করেছি।

প্রিয়ংবদা — (প্রসন্ন হয়ে) তাঁর কাছ থেকে এই যথেষ্ট। তা বল দেখি, তাঁকে কীভাবে প্রসন্ন করলি?

অনসূয়া — যখন কিছুতেই তিনি ফিরছেন না, তখন তাঁর পায়ে পড়ে বিনয়ের সঙ্গে বললাম— "ভগবান, শকুন্তলা আপনার মেয়ের মতো। আর এইটিই তার প্রথম অপরাধ। এইভেবে আপনার মতো তেজস্বী মহর্ষি কি কন্যার এই অচ্ছিাকৃত অপরাধ ক্ষমতা করতে পারেন না?"

প্রিয়ংবদা — তারপর! তারপর কী হল, বল্?

অনসূয়া — তারপর আর কী—"আমার কথার অন্যথা হয় না। তবে স্মৃতিচিহ্ন (অভিজ্ঞান) হিসেবে দেওয়া কোনো অলঙ্কার দেখাতে পারলে শাপ কেটে যাবে"—একথা বলতে বলতেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

প্রিয়ংবদা — যাক, কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। মহারাজ যাবার সময় প্রিয়সখীর হাতে স্বনামাঙ্কিত আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে, প্রতিবিধানের উপায় সখীর হাতেই আছে।

অনসূয়া — সখি, আয়, ওর মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করি। (এই বলে পরিক্রমণ করলেন)

প্রিয়ংবদা — (চারদিক দেখে নিয়ে) সখি! দ্যাখ, দ্যাখ! বাঁ হাতের উপর মুখ রেখে কেমন চিত্রপটে আঁকা ছবির মতন বসে আছে প্রিয়সখী। স্বামীর চিন্তায় এতটাই বিভোর যে নিজের সম্বন্ধেই হুঁশ নেই, অতিথিকে দেখা তো দূর অস্ত্।

অনসূয়া — দ্যাখ প্রিয়ংবদা! ব্যাপারটা যেন আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকে। স্বভাবকোমলা প্রিয়সখীকে রক্ষা করতে হবে তো!

প্রিয়ংবদা — নবমল্লিকায় কে আর উষ্ণ জল ঢালবে, বল্?

।। **বিষ্কম্ভক**।।

(তারপর সদ্যঘুম থেকে ওঠা শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য — প্রবাস থেকে ফিরে ভগবান কাশ্যপ (কণ্ব) আমাকে বেলা নির্ণয়ের ভার দিয়েছেন। রাত আর কতটা বাকি বাইরে গিয়ে দেখে আসি। (পরিক্রমা করে) ওই তো একদিকে ওষধিপতি চাঁদ অস্তে চলেছেন, আর অন্যদিকে অরুণকে সামনে নিয়ে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তেজোময় এই দুটি বস্তুর উদয় ও বিলয় যেন মানুষকে তার দশান্তরেরই সংকেত দিচ্ছে। আর চাঁদ অস্তগত বলে কুমুদ্বতীকে দেখেও নয়নের তৃপ্তি নেই, কেননা তার শোভা এখন স্মৃতির বিষয়। প্রিয়জন প্রবাসী হলে অবলার দুঃখ সত্যিই সুদুঃসহ। বদরীপত্রে জমে থাকা শিশিরবিন্দু ঊষার আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। সদ্যজাগা ময়ূর কুশ ঘাসে ছাওয়া কুটীরের চাল ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে। আর খুরের আঁচড়ে বিক্ষত বেদীর প্রান্ত থেকে ঐ হরিণটি উঠেছে। শরীর টানটান হওয়ায় তার পিছন দিকটা ঈষৎ উঁচু হয়ে উঠেছে। আবার অন্ধকার বিদীর্ণ করে, পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর শিরোদেশে কিরণঢেলে দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর মধ্যম ধামটি অধিকার করেছিলেন যিনি—সেই চন্দ্র এখন কলামাত্র শেষ হয়ে আকাশ থেকে ঢলে পড়েছেন। মহৎ ব্যক্তির অত্যুন্নতিও পতনের কারণ।

(যবনিকা-অন্তরাল থেকে প্রবেশ)

অনসূয়া — আমরা সংসারবিমুখ বলেই ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু একথা বলতেই হবে যে মহারাজ শকুন্তলার উপর অত্যন্ত অবিচার করছেন।

শিষ্য — যাই, গুরুকে জানিয়ে আসি যে হোমের সময় হয়েছে।

অনসূয়া — ঘুম তো ভাঙল। এখন করি কী! রোজকার কাজও করতে পারছি না। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে পড়ছে। কামনার দেবতা এখন সকাম হয়ে উঠুন। তা না হলে আমাদের শুদ্ধ হৃদয়া সখীকে সত্যরক্ষায় অক্ষম এক ব্যক্তির দিকে কেন তিনি এগিয়ে দেবেন! (স্মরণ করে) অথবা দুর্বাসার শাপই কী সব অনর্থের কারণ? তা না হলে ঐরকম করে বলে গিয়েও এতদিনে একটা পত্রও দিলেন না। (চিন্তা করে) তাই ভাবছি, এখান থেকেই রাজাকে তাঁর নামাঙ্কিত আংটিটা পাঠাই। কিন্তু দুঃখশীলা তাপসীদের কাকে অনুরোধ করি। সব দোষতো সখীর উপরেই পড়বে। আর সেইজন্যেই তো প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর পিতা কাশ্যপকে সকল কথা বলব বলব করেও বলতে পারছি না। বলতে পারছি না যে আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা মহারাজা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং আপন্নসত্ত্বা। এখন কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রিয়ংবদা — (প্রবেশ করে সহর্ষে) সখি! তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। শকুন্তলা-বিদায়ের শুভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনসূয়া — (সবিস্ময়ে) সখি! কী করে এ সম্ভব হল, বলতো?

প্রিয়ংবদা — তবে শোন। রাতে প্রিয়সখীর ঘুম ভালো হয়েছিল কিনা এইটে জানবার জন্য তার কাছে যাচ্ছিলাম।

অনসূয়া — তারপর! তারপর!

প্রিয়ংবদা — (তারপর আর কী!) তাত কণ্ব নিজেই সেই লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন। বললেন—"চোখ দুটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেও যজমানের আহুতি যথাস্থানে অগ্নিতেই পড়েছে। বাছা সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যা যেমন দুঃখের কারণ হয় না, তেমনি তোমার জন্যও অনুশোচনার কিছু নেই। আজই ঋষিপরিবৃত তোমাকে বরের কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

অনসূয়া — পিতা কী করে ব্যাপারটা জানলেন, বলতো?

প্রিয়ংবদা — হোমঘরের প্রবেশপথে ছন্দোময়ী এক আকাশবাণীতে।

অনসূয়া — (সবিস্ময়ে) বলিস কী!

প্রিয়ংবদা — (সংস্কৃতে) "হে ব্রাহ্মণ! জগতের কল্যাণের জন্য তোমার কন্যা অগ্নিগর্ভ শমীতরুর মতো দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করেছে, জেনো।"

অনসূয়া — (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) সখী। কী প্রিয় কথাই না বললি রে! কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া হবে জেনে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি মনখারাপও করছে রে!

প্রিয়ংবদা — দ্যাখ সখি! আমরা না হয় এ বিষাদ কোনো রকমে কাটিয়ে উঠব। কিন্তু ওই তপস্বিনী (শকুন্তলা) সুখী হোক।

অনসূয়া — দ্যাখ, আমগাছের শাখায় ঝোলানো নারকেলের সাজিতে সতেজ থাকবে বলে একটা বকুল ফুলের মালা রেখেছিলাম শকুন্তলার জন্যে। সেটিকে হাতের কাছে আনতো দেখি। ইতিমধ্যে আমি গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দুর্বার শিষ প্রভৃতি মঙ্গল-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি।

প্রিয়ংবদা — তাই কর। (অনসূয়ার প্রস্থান ও প্রিয়ংবদার ফুল তোলার অভিনয়)

(নেপথে) — গৌতমী, শকুন্তলাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য শার্ঙ্গরবদের আদেশ করো।

প্রিয়ংবদা — (কানপেতে) অনসূয়া, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। এই তো হস্তিনাপুরগামী ঋষিদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

অনসূয়া — (ফুলের সাজি হাতে প্রবেশ) সখি আয়, আমরাও যাই।

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাকে দেখে) সূর্যোদয়ের সময় পুণ্যস্নান সেরেছে শকুন্তলা। নীবার ধান্য হাতে স্বস্তিবচন পাঠ করে তপস্বিনীরা অভিনন্দিত করছেন তাঁকে। চল, ওঁর কাছেই যাই। (দুজনে কাছে গেল)।

(তারপর যথারীতি আসনমধ্যে উপবিষ্টা শকুন্তলার প্রবেশ)

তাপসীদের মধ্যে একজন—(শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে) বাছা, স্বামীর কাছ থেকে বহুমানসূচক 'মহাদেবী' উপাধি লাভ করো।

দ্বিতীয়া — বাছা, বীর সন্তানের মা হও।

তৃতীয়া — বাছা, স্বামীর অশেষ প্রিয়পাত্রী হও।

(আশীর্বাদ শেষে গৌতমী ছাড়া সকলে চলে গেলেন।)

সখীদ্বয় (কাছে এসে) সখি! এই 'শিখামজ্জন (মঙ্গলস্নান বা পুণ্যস্নান) তোকে সুখী করুক।

শকুন্তলা — তোদেরও স্বাগত জানাচ্ছি। আয়, এখানে এসে বোস।

সখী দুজনে — (মাঙ্গল্যপাত্র হাতে নিয়ে) ওলো ঠিক হয়ে বোস। আয়, তোকে এবার মঙ্গলসাজে সাজিয়ে দিই।

শকুন্তলা — আমার কাছে তোদের এটুকুই আজ অনেক, অনেক রে। সখীদের হাত থেকে সাজা এরপর আমার কাছে দুর্লভ হয়ে পড়বে জানি। (বলতে বলতে অশ্রুমোচন)

সখীদুজনে — সখী, শুভ সময়ে কাঁদতে নেই। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজানোর অভিনয় করতে লাগল)

প্রিয়ংবদা — অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর মতোই তোর সুরূপ। আর আমরা আশ্রমে যা জোটে তা দিয়েই তোকে সাজাচ্ছি। এ তোর রূপের অসম্মান ছাড়া কি?

ঋষিকুমারদ্বয় — (অলঙ্কার হাতে প্রবেশ করে) এই নিন অলঙ্কার। ওঁকে সাজিয়ে দিন।

গৌতমী — বৎস নারদ, কোথা থেকে এতসব পেলে?

প্রথম জন — তাত কাশ্যপের প্রভাবে।

গৌতমী — একি তাঁর মানসীসৃষ্টি?

দ্বিতীয় জন — না, না। শুনুন তাহলে। শকুন্তলার জন্য ফুল আনতে তিনি তো আমাদের আদেশ দিলেন। তারপরেই ঘটলো এই ব্যাপার! চাঁদের মতো সাদা এই মাঙ্গলিক ক্ষৌম বস্ত্রটি দিল একটি গাছ। আর একটি গাছ দিল পা-দুটি রাঙানোর উপযোগী আলতা। আরও অন্যান্য গাছগুলি বনদেবতাদের হাত দিয়ে দিল এইসকল অলঙ্কার। মণিবন্ধ পর্যন্ত প্রসারিত তাদের হাতের তালু নব কিশলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলার প্রতি) ওলো, এই অনুগ্রহেই সূচিত হচ্ছে, স্বামীর ঘরে রাজঐশ্বর্যভোগ করে তুই সুখেই থাকবি।

প্রথম (শিষ্য) — গৌতম এসো, এসো, অভিষেক-উত্তীর্ণ পিতা কাশ্যপকে আমরা বনস্পতিদের এই অনুগ্রহের (সেবা) কথা বলি।

দ্বিতীয় (শিষ্য) — ঠিক আছে, চলো তাই করি (প্রস্থান)

সখীদ্বয় — ওলো, কখনো অলঙ্কার পরিনি তো! তাই ছবিতে যেমন দেখেছি তেমনি ভাবেই তোর অঙ্গে অলঙ্কার পরাব।

শকুন্তলা — এ বিষয়ে তোদের নৈপুণ্যের কথা তো আমি জানি, সখি।

(দুজনে অলঙ্কার পরাণোর অভিনয় করতে লাগল।)

(অতঃপর অভিস্নাত কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ — শকুন্তলা আজই চলে যাচ্ছে বলে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। চোখের জল আটকাতে গিয়ে কণ্ঠ অবরুদ্ধ। চিন্তাভারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। স্নেহ-আদর যদি আমাদের মতো অরণ্যবাসীদের চিত্তকেও এমনভাবে বিকল করে দেয়, তা হলে, এরূপ ক্ষেত্রে কন্যাবিচ্ছেদের বিষাদ গৃহী নর-নারীকে কতই না পীড়িত করে! (এ সকল ভাবতে ভাবতে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন)।

সখীযুগল — ওলো শকুন্তলা! সাজানো-পর্ব তো শেষ হল। এবার এই রেশমী শাড়ী জোড়া পর তো দেখি।

(শকুন্তলা উঠে শাড়ী পরল।)

গৌতমী — বাছা, আনন্দোচ্ছল চোখে তোমাকে স্নেহে আলিঙ্গন করতে গুরু (পিতা কাশ্যপ) এসেছেন। তাহলে এবার আচার পালন করো।

(লজ্জাবনতা শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করলেন।)

কাশ্যপ — বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির সমাদর পেয়েছিলেন, তুমিও তেমনি তোমার স্বামীর সমাদর লাভ করো। শর্মিষ্ঠা যেমন সুসন্তান পুরুকে লাভ করেছিলেন, তুমিও তেমনি রাজ্যেশ্বর সুপুত্র লাভ করো।

গৌতমী — ভগবন্, এ তো কেবল আশীর্বাদ নয়, এ হল বর।

কাশ্যপ — বৎসে, সদ্য-প্রজ্জ্বলিত এই যজ্ঞীয় অগ্নি-প্রদক্ষিণ করো।

(সকলে প্রদক্ষিণ করলেন।)

বৎসে, এই যে সমিদ্বন্ত বেদীর চারদিকে প্রজ্জ্বলন্ত যজ্ঞীয় অগ্নি, এর প্রান্তভাগে ছড়ানো কুশতৃণ, হোমগন্ধে পাপনাশী এই পূতাগ্নি তোমাকে পবিত্র করুন।

(শকুন্তলা যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করলেন।)

বৎসে, এবার তাহলে এসো। (চারিদিক দেখে) শার্ঙ্গরবেরা সব কোথায়?

শিষ্যগণ — (প্রবেশ করে) ভগবন্, এই যে আমরা।

কাশ্যপ — তোমাদের ভগিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

শার্ঙ্গরব — দিদি, এদিকে, এদিকে। (সকল পরিক্রমা করলেন।)

কাশ্যপ — ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুরাজি! তোমাদের আগে জল দান না করে যে নিজে জল পান করত না, ভূষণপ্রিয়া হলেও নিজেকে সাজানোর জন্য তোমাদের একটি পল্লবও ছিঁড়ত না, তোমাদের প্রথম ফুলফোটা শুরু হলে যার আনন্দের সীমা-পারসীমা থাকত না (যার উৎসব শুরু হয়ে যেত), সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছে—তোমরা সকলে সম্মতি দাও!

(কোকিলের ডাক শুনছেন—এমন ভাব দেখিয়ে)

শকুন্তলার অরণ্যবন্ধু বৃক্ষরাজি যেন অনুমতি দিয়েছে। কোকিলের কুহুরবই তাদের সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর। শকুন্তলার যাত্রাপথে পড়বে সবুজ পদ্মপাতায় ঢাকা সরোবর। ছায়াবীথি রোদের খরতাপকে প্রশমিত করবে। শান্ত ও অনুকূল বাতাস বইতে থাকবে। পথের ধূলি হবে পদ্মরেণুর মতো কোমল। যাত্রাপথ হবে শুভ—মঙ্গলময়।

(সকলে সবিস্ময়ে শুনলেন।)

গৌতমী — পরমাত্মীয়ের মতো স্নেহময়ী বনদেবিগণ তোমার পতিগৃহগমনকে সমর্থন করেছেন। অতএব এঁদের সকলকে প্রণাম করো বৎসে।

শকুন্তলা — (প্রণাম শেষে পরিক্রমা কালে, আড়ালে) ওলো প্রিয়ংবদা, যদিও আর্যপুত্রকে দেখবার জন্যে উতলা হয়েছি, তবুও এই আশ্রম ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে বেদনায় পা আর এগোতেই চাইছে না।

প্রিয়ংবদা — সখি! তুই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন

বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনেরও একই অবস্থা হয়েছে, দ্যাখ। হরিণের মুখ থেকে খসে পড়ছে দর্ভ। ময়ূর-ময়ূরী ছেড়েছে নাচের আনন্দ, লতাবিতান থেকে খসে পড়ছে শুকনো পাতা, মনে হচ্ছে তারা যেন চোখের জল ফেলছে।

শকুন্তলা — (হঠাৎ মনে পড়ায়) পিতা, প্রিয় লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে আমন্ত্রণ করে যাই?

কাশ্যপ — বৎসে, আমি জানি, তুমি তাকে নিজের বোনের মতোই স্নেহ করতে। এই যে তোমার ডান দিকেই রয়েছে সে।

শকুন্তলা — (কাছে এসে আলিঙ্গন করে) বনজ্যোৎস্নে। সহকার তরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকলেও তোমার শাখা-বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করো। আজ থেকেই তোমাকে ছেড়ে দূরে চললাম।

কাশ্যপ — বৎসে, অনেক আগে থেকেই তোমার জন্য উপযুক্ত বরের কথা ভাবতাম। নিজের সুকৃতির ফলেই তুমি তা পেয়েছো। এই নবমল্লিকাও পেয়েছে সহকারকে। এখন তোমার ও নবমল্লিকার—কারও জন্যে আর আমার চিন্তা নেই। তাহলে এবার পথের দিকে তাকাও।

শকুন্তলা — (সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, একে (বনজ্যোৎস্না-নবমল্লিকা) তোদের হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।

দুজনে — সখি, আর আমাদের কার হাতে দিয়ে যাচ্ছিস, বল? (রোদন)

কাশ্যপ — অনসূয়া, কেঁদো না। তোমরাই তো ওকে সুস্থির করবে।

শকুন্তলা — পিতা, গর্ভভারে মন্থর যে মৃগবধূটি কুটীরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যেদিন নির্বিঘ্নে প্রসব করবে—সেই প্রিয় খবরটি কাউকে দিয়ে অবশ্যই আমার কাছে পাঠিয়ো।

কাশ্যপ — বৎসে, একথা কখনোই ভুলব না।

শকুন্তলা — (চলতে গিয়ে বাধা পেয়ে) ওমা! আমার কাপড়ে কে যেন লেগে রয়েছে! (ফিরে তাকালেন)

কাশ্যপ — বৎসে! কুশ ঘাসের তীক্ষ্ণ আগায় যার মুখে ঘা হলে সেই ঘা শুকোনোর জন্য ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দিতে, মুঠো মুঠো শ্যামাক ধান খাইয়ে যাকে তুমি বড়ো করে তুলেছ, তোমার পুত্রতুল্য মৃগপদবীযুক্ত সেই হরিণটিই তোমাকে ছাড়তে চাইছে না।

শকুন্তলা — বাছা, আমি যে তোদের সংসর্গ ছেড়ে যাচ্ছি; আর আমার পেছনে আসিস কেন? তোকে জন্ম দিয়েই তোর মা মারা গেল। তারপর আমিই তোকে পালন করে বড়ো

করে তুলেছি। আমি চলে গেলে এখন থেকে পিতা কাশ্যপই তোর দেখ-ভাল করবেন। তুই ফিরে যা? (কাঁদতে কাঁদতে চলার ভাব-প্রদর্শন।)

কাশ্যপ — বৎসে, কেঁদো না। স্থির হও। পথের এদিকে চেয়ে দ্যাখো!—তোমার চোখের পাপড়িগুলি ওপরে উঠছে। অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন তোমার দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে। অশ্রু সংবরণ করো। স্পষ্ট পথ দেখতে পাচ্ছো না বলে উঁচু-নিচু পথে তোমার পা ঠিক মতো পড়ছে না।

শার্ঙ্গরব — ভগবন্। শুনেছি প্রিয়জনকে শেষ জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই রীতি। তা সেই সরোবরতীর এসে গেছে। তাই এখানেই আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ-বার্তা দান করে আপনি আশ্রমে ফিরে যান।

কন্ব — তাহলে এসো, এই বকুল গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিই। (সকলে সেখানে এলেন।)

কাশ্যপ — (আত্মগতভাবে) মান্যবর দুষ্যন্তের উপযোগী কোন্ বার্তা পাঠানো উচিত হবে। (ভাবতে লাগলেন)

শকুন্তলা — (জনান্তিকে) ওলো, দ্যাখ, দ্যাখ। পদ্মাপাতার আড়ালে সহচরকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল চক্রবাকী বিলাপ করছে! আমি তাহলে দুঃসাধ্য সাধনই করছি, বল্!

অনসূয়া — সখি! এমন ভাবছিস কেন। এই চক্রবাকীকেও প্রিয়জন ছাড়াই বিষাদদীর্ঘ রাত কাটাতে হয়। আশার বাঁধনই দুঃসহ বিরহবেদনাকে হাল্কা করে দেয়।

কাশ্যপ — শার্ঙ্গরব! শকুন্তলাকে সামনে রেখে আমার কথা-অনুযায়ী সেই মহারাজা দুষ্যন্তকে সম্বোধিত করে বলবে—

শার্ঙ্গরব — আদেশ করুন, প্রভু!

কাশ্যাপ — সংযমই আমাদের মূলধন, আর আপনিও উচ্চকুলজাত! আপনার প্রতি শকুন্তলার যে অনুরাগ তাও প্রিয়জনের অজ্ঞাতেই কোনো না কোনো ভাবে ঘটেছে। এই সব ভাল ভাবে বিবেচনা করেই এঁকে সপত্নীদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবেন, আশাকরি। এরপর কোনো কথা বধূর আত্মীয়দের বলা উচিত নয়। ওঁর কপালে যা আছে তাই হবে!

শার্ঙ্গরব — মহারাজকে নিবেদন করবার জন্যে আপনার এই বার্তা গ্রহণ করলাম।

কাশ্যপ — (শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে) বৎসে! এবার তোমাকেও উপদেশ দেবো। আমরা বনবাসী, কিন্তু লৌকিক বিষয়ের কিছুই জানিনা এমন তো নয়।

শার্ঙ্গরব — ভগবন্। ধীমান ব্যক্তিদের অজানা তো কিছুই নেই!

কাশ্যপ — সেই তুমি এখান থেকে পতিকুলে গিয়ে—

গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। সপত্নীদের প্রিয়সখীর মতো দেখবে। স্বামী কোনো কারণে তোমার প্রতি রুষ্ট হলেও ক্রোধের বশে তুমিও তার বিরুদ্ধতা করবে না। পরিচারিণীদের প্রতি দানশীল ও সদয় হবে। ভোগে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবে না। এইরূপ আচরণ করলে যুবতীরা গৃহিণীপদে অভিষিক্তা হন।

বিপরীত আচরণকারিণীরা কুলের অধম।

এবার দেখা যাক গৌতমীই বা কী বলেন।

গৌতমী — এইগুলিই তো বধূজনের প্রতি যথার্থ উপদেশ। বাছা, এর সবগুলিই মনে রেখো।

কাশ্যপ — বৎসে, এসো আমাকে ও তোমার সখীদের আলিঙ্গন করো।

শকুন্তলা — পিতা, সখীরা কি এখান থেকেই ফিরে যাবে ?

কাশ্যপ — বৎসে, এদেরও তো সম্প্রদান করতে হবে ! তাই এদের সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাচ্ছেন।

শকুন্তলা — (পিতাকে জড়িয়ে ধরে) বাবা, তোমার স্নেহের কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মলয়তট থেকে উন্মূলিত চন্দন লতার মতো অন্য দেশে গিয়ে কী করে বেঁচে থাকবো ? (কান্না)

কাশ্যপ — বৎসে, কাতর হচ্ছ কেন ? উচ্চকুলে গৌরবময় গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হয়ে, প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী হয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়ত ব্যস্ত থেকে এবং অনতিকালেই প্রাচী যেমন অর্ককে প্রসব করে তেমনি তুমিও সূর্যের মতোই তেজস্বী ও পবিত্র সন্তানের প্রসূতি হয়ে আমাদের বিরহ দুঃখ ভুলেই থাকবে।

(শকুন্তলা পিতার চরণে প্রণতা হলেন।)

বৎসে, আমি যেমন ভেবেছি, যেন তেমনই হয়।

শকুন্তলা — (সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, তোরা দুজনে একসঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয় — (আলিঙ্গন করে) সখি। যদি সেই রাজর্ষি তোকে চিনতে দেরী করেন, তাহলে তাকে তাঁরই নামাঙ্কিত আংটিটি দেখাস।

শকুন্তলা — তোদের এই সংশয়ে আমি কেঁপে উঠছি।

সখীদ্বয় — সখি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অতি স্নেহ (অনেক সময়) অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব — (আকাশের দিকে তাকিয়ে) সূর্যদেব যুগান্তরে প্রবেশ করেছেন (অর্থাৎ বেলা দ্বিপ্রহর)। আপনাদের আর দেরী করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি করুন।

শকুন্তলা — (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে আশ্রমের দিকে ফিরে) পিতা, আবার কবে তপোবন দেখতে পাবো ?

কাশ্যপ — শোনো তবে—

সুদীর্ঘকাল সসাগরা পৃথিবীর সপত্নী হয়ে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্ত-তনয়কে সিংহাসনে বসিয়ে এবং তার উপর প্রজাদের ভার অর্পণ করে, তারপর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তরসাস্পদ এই আশ্রমে আবার আসবে।

গৌতমী — বাছা, যাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে। তোমার পিতাকে এবার ফিরে যেতে বলো। না হলে উনি বারম্বার এইভাবেই কথা কইবেন।

শকুন্তলা — (আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে) তাত, তপশ্চর্যায় আপনার শরীর রোগা হয়ে পড়ছে। তাই আমার জন্য বেশি ভাববেন না।

কাশ্যপ — বৎসে, কুটীর প্রঙ্গণে তোমার বোনা নীবার ধান অঙ্কুরিত হয়েছে। এ দেখে আমার শোক কেমন করে প্রশমিত হবে বলো ? এবার এসো মা ! তোমার যাত্রা শুভ হোক। (শকুন্তলা ও তার অনুগামীদের প্রস্থান)

সখীদ্বয় — (অনেকক্ষণ ধরে শকুন্তলাদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে করুণ স্বরে) হায় হায়, ঐ শকুন্তলা বনরাজির আড়ালে চলে গেল!

(আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।)

কাশ্যপ — (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) অনুসূয়া ! তোমাদের সহচারিণী চলে গেল। শোক ভুলে এবার আমার সঙ্গে এসো।

সখীদ্বয় — পিতা, শকুন্তলা ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করব।

কাশ্যপ — স্নেহের কারণেই এমনটা মনে হচ্ছে। (বিমর্ষ চিত্তে পরিক্রমা করে) শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলাম। কেননা কন্যা সন্তান যেন পরের গচ্ছিত ধন। তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার মনের ভার হাল্কা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, যার ধন তার কাছেই তাকে সমর্পণ করেছি। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

৬.৩.১২.২ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কাশ্রিত রসগ্রাহী বিশ্লেষণ

(ক) চরিত্র—অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে মুখ্য ও গৌণ চরিত্র মিলিয়ে মোট চরিত্র সংখ্যা-৪৭। তার মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ চরিত্রগুলির অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ আমাদের কাম্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে চরিত্রটি আমাদের প্রেক্ষণবিন্দুতে জ্বল জ্বল করেন তিনি মহর্ষি কাশ্যপের পালিতা কন্যা, আশ্রমের প্রাণ, তপোবনপ্রিয়া শকুন্তলা। গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা, মহারাজা দুষ্যন্তের ভার্যা, আপন্নসত্তা শকুন্তলা অপার্থিব সৌন্দর্যে লাবণ্যময়ী। তাঁর স্নিগ্ধ মাধুর্য, ধীর স্বভাব ও কমনীয় কান্তি প্রেমিক দুষ্যন্তের সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও প্রেমের বোধকে বহুগুণিত করেছিল। সেই অবস্থান থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল শকুন্তলার দেহবল্লরী ঘিরে সৌন্দর্যের যে কাঙ্ক্ষিত আবরণ তা উদ্যানলতার নয়। তপোবন লতার। সুতরাং তাঁর স্বীকার করতেও বাধেনি যে তপোবনলতা উদ্যানলতাকে হারিয়ে দিয়েছে—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।।" (অশ ১/১৬)

এই উদ্যানলতা যেদিন প্রেমের স্পর্শে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, সেদিনই আকস্মিকভাবে তাঁর উপরে নেমে এল দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ। স্বামীচিন্তায় আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলা। 'সুলভ কোবা মহেসি' (সুলভকোপা মহর্ষি) দুর্বাসার আশ্রমের কুটীরদ্বারে উপস্থিতি এবং আত্মঘোষণা 'অয়মহং ভোঃ'! —এর কিছুই তাঁর কানে গেল না। অভিশপ্তা হলেন তিনি। আতিথ্যধর্মভ্রষ্টার প্রতি নিষ্ঠুর-নির্মম কশাঘাত—যার চিন্তায় তিনি মগ্না সেই প্রিয়জন তাঁকে ভুলে যাবে পাগলের মতো; বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি তাঁকে চিনতে পারবেন না—

"স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"

অতঃপর শুরু হল তাঁর প্রেমের তপস্যা। তাঁকে ছায়ার মতো ঘিরে দুই প্রিয়সখী—অনসূয়া ও পিয়ংবদা প্রিয়সখীকে অযাচিত অভিঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিরন্তর সচেষ্ট। শকুন্তলাকে নিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ ও দুর্বাভাবনার অন্ত নেই। স্বস্তি একটাই—অভিশাপ প্রতিবিধানের উপায় শকুন্তলার নিজের হাতেই আছে—মহারাজের প্রিয়সখীকে প্রদত্ত স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি। সুতরাং প্রিয়সখীকে 'স্বাধীনোপায়া বলতেই হবে। এই সখীদ্বয়ের আলাপচারিতা থেকেই শকুন্তলার স্বভাববৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের যা কিছু বোধ। নায়িকা নিজে নাটকমধ্যে কথা বলেছেন খুবই কম, অথচ তাঁর স্রষ্টা মহাকবি তাঁর না বলা বাণীতে কত কথাই না, বলিয়ে নিয়েছেন। এ যেন আধুনিক কবির একটি গীতির কয়েক পংক্তির পূর্বরূপ—'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি।' (রবীন্দ্রনাথ)

শকুন্তলা মহর্ষি কাশ্যপের পালিতা কন্যা, অশেষ স্নেহের পাত্রী, প্রকৃতিপ্রিয়া, আশ্রমের প্রাণ। তাঁর কর্তব্যবোধ, সেবা-পরিচর্যার গুণে তপোবন-আশ্রমের সবার মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। আশ্রমের

গুরুজন, ভাই-বোন, বন্ধু, বৃক্ষ, তরুলতা, জীবজন্তু-সবার প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান দৃষ্টি, সমান স্নেহ-ভালোবাসা। সেবাময়ী, মমতাময়ী, সমদৃষ্টি ও প্রেমতপাস্বিনী শকুন্তলার চারিত্র্যমহিমা সমগ্র নাটকের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কেই ফুটেছে ভালো। মিলন-বিরহ, রাগ-অনুরাগের বিচিত্র সিঁড়ি ভেঙে প্রেমসাধনার যে দুশ্চর পথ পাড়ি দিতে হয়, তার মূর্ত প্রতীক যেন এই শুকুন্তলা। আত্মগ্রহণের আনন্দ ও আত্মত্যাগের তীব্র দহনে দীপ্ত জ্যোর্তিময়ী শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসসৃষ্ট বোধকরি শ্রেষ্ঠ প্রতিমা—বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম বিরল সৃষ্টি।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা

কবি-নাট্যকার কালিদাসের অপর দুটি অতুল সৃষ্টি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। বস্তুত শকুন্তলা-অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা—তিনটি চরিত্রই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তাঁদের মধ্যেকার অন্তর্লীন সখ্য তাঁদের এমনই এক আত্মপরভেদহীন অভিন্ন সূত্রে বেঁধেছে যে কোনো বিশেষ-একজনকে বিচ্ছিন্ন করে বেছে নিয়ে যেন সেই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফোটানোই যায় না। একই বৃন্তে ফুটে ওটা তিনটি পুষ্পকলির মতোই নির্মল-সুন্দর-মনোরম তাঁরা। শুকুন্তলার কথা আলাদা করে পর্যালোচনা করতে হয়েছে নাটকের সমগ্র অংশে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ আছে বলে। কেননা তিনিই নাট্যকারর লক্ষ্য। তাঁর নামেই নাটকের শিরোনাম। সুতরাং নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়িকা তিনিই। তা সত্ত্বেও আমাদের ভুললে চলবে না, নায়িকা শকুন্তলাকে স্ফুটোজ্জ্বল প্রকাশরূপ দানের পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল তাঁর অভিন্ন-হৃদয় দুই প্রিয়সখী—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার। তাই আমাদের বলতেই হয়, একা শকুন্তলা অসম্পূর্ণা, খণ্ডিতা, অনুসূয়া-প্রিয়ংবদাই তাঁকে পূর্ণ করে তুলেছে।

প্রিয়সখী শকুন্তলার গুণৈশ্বর্যের প্রায় সর্বাংশের দাবিদার তাঁরা। স্নেহ-প্রেম-মমতা স্যেন্দর্য-সেবা-ধৃতি-ত্যাগ ও কল্যাণব্রতে তাঁরা প্রিয়সখীর প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই। অনেক সময় বোধ করি তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছেন। নিজেদের প্রেমতৃষ্ণার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সংগুপ্ত রেখে সখী শকুন্তলার প্রেমের পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলবার জন্য তাঁদের যত্নের যেন শেষ নেই। যাকে ভালোবাসেন সেই শকুন্তলার প্রিয়বিরহে তাঁরা বিষণ্ণ হন। দুর্বাসার অভিশাপের ফল যাতে না ফলে তার জন্যে তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। আবার কোনো কারণে পতিগৃহে যদি প্রিয়সখীর অনাদর ঘটে, যদি মহারাজা তাঁকে চিনতে না পেরে নিগ্রহ করেন—সেই অনাগত দুর্ভাবনার ভারও নীরবে বহন করেন তাঁরাই। আর তাঁদের নাম দুটিও কত না সুন্দর! অনসূয়া অর্থাৎ যার ঈর্ষ্যা-অসূয়ারূপ ঘৃণা নেই এবং প্রিয়ংবদা অর্থাৎ যে সব সময় প্রিয় কথা—মিষ্টি কথা বলে। প্রিয়সখী শকুন্তলার সুখে সুখী, তাঁর দুঃখে দুঃখী এমন আত্ম-উৎসর্জিতা সরল-নির্মল হৃদয়া রমণী চরিত্র যেমন জগতে নজিরহীন, তেমনি তাদের অপূর্ব সখীত্বও জগতে বিরল। নাটকমধ্যে চরিত্র হিসেবে তাঁদের স্থান গৌণ হলে কি হবে, শকুন্তলা চরিত্রস্ফূর্তির অনুঘটক রূপে তাঁরা সহজেই দর্শক-শ্রোতার হৃদয়াসন নিঃশেষে অধিকার করে বসেছেন। তাঁদের গুপ্তপ্রেম প্রিয়সখীর আত্মহারা প্রেমের শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে ভাবীকালের নায়িকার পূর্বসুরে যেন সহজেই বলতে পারে—"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।' অথবা 'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি/রূপসী তোমার রূপে।' (চণ্ডীদাস)

মহর্ষি কাশ্যপ বা কণ্ব

মহর্ষি কাশ্যপ (কণ্ব) আশ্রম প্রধান, শকুন্তলার পালক পিতা। আশ্রম পরিচালনার পুরোধা হিসেবে

আশ্রমিক পরিবেশটিকে প্রশান্ত ও ঈশ্বর আরাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। আশ্রমের সকল প্রতিবেশী, গাছ-পালা জীবজন্তু সকলকে নিয়ে তপোবন-কেন্দ্রিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির জীবন্ত উত্তরাধিকার বহন করেছেন তিনি। পূজার্চনা, যজ্ঞ-হোম, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আশ্রমিক জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি। গাহস্থ্য জীবন থেকে দূরে তপোবনে কামনা-বাসনামুক্ত, অহিংসা-দীপিত ব্রহ্মর্ষির জীবন যাপনে অভ্যস্ত তিনি। তৎসত্ত্বেও মানবিক প্রত্যাশা ও মূল্যবোধগুলিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ আঁকড়ে থাকেননি। মহর্ষি জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত এই ব্যক্তিত্ব গৃহী নর-নারীর কল্যাণের জন্যই লৌকিক বিষয়সমূহের প্রতিও সমানভাবে আগ্রহী। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে বিদায় দিতে গিয়ে গৃহীর ধর্ম সম্পর্কে যে সকল কথা তিনি বলেছেন তাতে বিস্মিত শিষ্য-কন্যাদের মনে প্রশ্ন স্বাভাবিক। তাই তাদের সংশয় দূর করবার জন্যই তিনি বলেন, 'বনৌকসোহপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।'—অর্থাৎ তিনি বনবাসী হলেও লৌকিক বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নন। আরণ্যক সন্ন্যাসজীবন ও সংসার জীবনের সুষ্ঠ মেলবন্ধনেই যে জীবনের পূর্ণতা—কাশ্যপ চরিত্রাশ্রয়ে মহাকবি এই বার্তাটাই যেন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বস্তুত সন্ন্যাসীর নির্মোহ, কঠোরতা এবং গৃহীর স্নেহ-প্রীতি-মমতা-ভালোবাসা-করুণারূপ দুর্বলতার অত্যাশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে কাশ্যপ চরিত্রে। স্নেহময় পিতারূপে তিনি শকুন্তলার গোপন বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিবাহিতা কন্যাকে বিশেষতঃ আপন্নসত্ত্বা কন্যাকে অবিলম্বে পৃতিগৃহে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে যথার্থ পিতৃকর্তব্য সমাধা করেছেন। শকুন্তলার পাতিগৃহ গমন যাতে সুষ্ঠু, নির্বাধ ও কল্যাণকর হয় তার জন্য তিনি সজাগ। কন্যাবিদায়রূপ সংবেদনশীল বিষয়টি যাতে দেবার্চনা, পূজা-হোম, গুরুজনের আশীর্বাদ ও উপদেশ-নির্দেশে শুভঙ্কর হয়ে ওঠে তারই জন্য যথাসময়ে গৌতমী ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনীদের ডেকে পাঠান, অনসূয়া-প্রিয়ংবদাদের ভূমিকা ঠিক করে দেন এবং শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতম-নারদ-বৈখানস প্রভৃতিদের যথাকর্তব্য বাৎলে দেন।

অত্যন্ত স্নেহাদরে পালিতা কন্যা শকুন্তলা যে আশ্রমের প্রাণ-এ সত্য তিনি জানতেন। আশ্রমের গাছপালা, ফুল-ফল-জীবজন্তুও যে শকুন্তলার উপরে কতটা নির্ভরশীল তা জানতেন বলেই তিনি শকুন্তলাকে যেমন তপোবন প্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করতে বলেন, তেমনি নিজেও 'ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ।...' ইত্যাদি বলে সকল বনদেবতাদের কাছে শকুন্তলার বিদায়ে তাঁদের সম্মতি চেয়ে নেন। আবার শকুন্তলার ইচ্ছে—তাঁর দুই প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা হস্তিনাপুর গমনের সঙ্গী হোক—তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আবেদন নাকোচ করে দিয়ে তাঁকে বলেন—'ওঁরা অবিবাহিতা, তাই তোমার সঙ্গে ওঁদের সেখানে যাওয়া উচিত হবে না''—'তন্ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্।'

শকুন্তলার বনজ্যোৎস্না—নবমল্লিকা ও মাতৃহারা মৃগশিশুটির প্রতি প্রীতি লক্ষ্য করে তাঁর হৃদয় আকুলিত হয়। আবার শকুন্তলা বনরাজির আড়ালে চলে গেলে সঙ্গীরা যখন হায়, হায় করে ওঠে এবং পিতাকে বলে, 'তাত, শকুন্তলা ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করবো; তার উত্তরে পরম স্থৈর্যে, পরম স্নেহে তিনি বলেন, 'স্নেহপ্রবৃত্তিরেবং দর্শিনী।'—স্নেহের বশেই তোমাদের এমন মনে হ'চ্ছে।' চিরকালের আপেক্ষিক তত্ত্বদর্শনের কথায় মহর্ষির সংযম, বাস্তববোধ ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠে।

ঋষি হয়েও তিনি যে সাধারণ গৃহীর মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ তার পরিচয় আছে চতুর্থ অঙ্কের শেষদৃশ্যে। এখানে মহর্ষি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশোন্মুখ কন্যাকে গৃহের সুখ-স্বাস্থ্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য

উপদেশ দেন—'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে'..... ইত্যাদি এবং শেষে গৃহবধূর একান্ত প্রার্থিত 'গৃহিণীপদ' লাভের কথা—'যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ।।' (অশ.৪/১৮) আর সব শেষে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেলে তাঁর উপলব্ধি—তিনি যেন একটা বিরাট ভার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন। এর অনুকূলে যে যুক্তি তিনি খাড়া করেছেন তাও তাঁর চরিত্রটিকে একটি স্ফুটোজ্জ্বল মহিমা দান করেছে। তাঁর অনুভূতি—কন্যা যেন পরগৃহে অধিকারীর গচ্ছিত অর্থ। সেই সম্পদকে যথার্থ মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়েই তিনি যেন পরম স্বস্তি পেয়েছেন—

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিহগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।।" (অশ ৪।২২)

মহর্ষি কাশ্যপ একাধারে ঋষি কবি, দার্শনিক, নীতি-আদর্শনিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ণ এবং স্নেহ-মমতাময় পিতা। তাঁর চরিত্রটিও মহাকবির অতুলনীয় সৃষ্টি।

দুষ্যন্ত

মহাকবি কালিদাসের চরিত্রাঙ্কন দক্ষতার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন মহারাজা দুষ্যন্ত। তিনি প্রজাপালক, দুর্ধষ বীর, খেয়ালী, প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক। আবেগপ্রবণ কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ, কর্তব্যবোধে অবিচলিত কিন্তু রঙ্গ-রসিকতাপ্রিয় ও ললিতকলানিপুণ। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, গ্রহণ ও ত্যাগ, ভোগ ও ভোগবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও সংযম প্রভৃতি দক্ষিণ নায়কের সব গুণ ও দোষগুলিই তাঁর চরিত্রে বর্তমান। ফলে দুষ্যন্ত চরিত্রটি সজীব, প্রাণবান ও গতিশীলতা-মণ্ডিত বাস্তব ও স্বাভাবিক।

মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে অজ্ঞাত সারেই তাঁর মহর্ষি কাশ্যপের (কণ্বের) তপোবনে প্রবেশ। শিকার ও শিকারীর মধ্যস্থলে আশ্রম বালকের উচ্চারিত কণ্ঠরব—নিষেধবার্তা—'ভোঃ ভোঃ রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ম্ ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।'—মহারাজ! এ আশ্রমের মৃগ, একে বধ করবেন না।' শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঔচিত্য সচেতন মহারাজার অশ্ববল্গা কষে রথ থেকে অবতরণ এবং সংযত ও বিনম্র ভাষায় ভগবান কাশ্যপ ও আশ্রমবাসীদের কুশলগ্রহণে তাঁর চরিত্রের ধীরোদাও রূপটি স্পষ্ট হয়।

দুষ্যন্ত প্রেমপূজারী। বহুভর্তৃক হলেও যথার্থ প্রেমের পেয়ালাটি বোধকরি তখন অপীতই ছিল। তাই তপোবন পরিবেশে প্রকৃতির সুদুর্লভ সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে বিভাসিতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে অন্তঃসলিলা প্রেমের ধারায় জোয়ার আসে। দুর্লভ দক্ষিণবাহু স্পন্দনে অভাবনীয় অথচ অভিলষিত বস্তুটি (শকুন্তলা) লাভের প্রত্যাশা তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। অবশেষে শকুন্তলার সান্নিধ্যলাভ এবং আলাপে-প্রলাপে-সংরাগে 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবে'র প্রার্থিত মঙ্গলমিলনে আপন্নসত্ত্বা প্রেয়সীকে স্বনামাঙ্কিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক দান ও রাজবধূরূপে তাঁকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি। শকুন্তলার প্রণয়ে বিগলিতচিত্ত দুষ্যন্তের রাজধানীতে ফেরবার জন্য রাজমাতার আহ্বান ও ব্যর্থ হলে বয়স্য মাধব্যকে বলা 'পরিহাস বিজল্পিতং' কথাটির গূঢ়ার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত গান্ধর্বমতে শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হলেও

তাঁর মনের মধ্যে কোনো প্রকার আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না। তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য ও আরণ্যক শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ে বাধা হয়ে ওঠেনি। তাই তাঁকে—দেশের মহারাজার মতো ধীমান, প্রতাপশালী, বীর ও প্রজানুরঞ্জক, আর্যপুত্র রাজর্ষিকে বিশ্বাস করে শকুন্তলা কোনো অন্যায় করেন নি। সুতরাং উভয়ের প্রেমের উপলব্ধিতে বিশেষ ঘাটতি ছিল বলে মনে হয় না।

যথার্থ প্রেমের পরিণতি মঙ্গলমিলনে। সন্তানলাভ অতিরিক্ত পাওনা। গান্ধর্বমতে বিবাহও সংস্কার সিদ্ধ। সুতরাং রাজার চরিত্রে লাম্পট্যের ছায়া নেই। তৎসত্ত্বেও শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত—উভয়ের দিক থেকেই অশরীরী ছায়ার মতো অজ্ঞাত একটা অপরাধ হয়তো ঘটে গেছে কেননা, তাঁদের পবিত্র বিবাহটি অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া সকল স্বজন-পরিজনের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। সুতরাং আপাত বিচারে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ আশ্রম বা রাজ্য অনুমোদিত নয়।

আর দ্বিতীয় যে অপরাধের শাস্তি তাঁরা দুজনেই বহন করেছেন তার জন্যে দুষ্যন্তের কোনো দায় ছিল না। কর্তব্যকর্মে অবহেলা, আত্মবিস্মৃতি ও দুর্বাসার অভিশাপের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন, তবে তিনি শকুন্তলা স্বয়ম্। আত্মচিন্তায় কর্তব্যে অবেহলা, আতিথ্যের অপমান প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ী এক ধরণের অপরাধ—শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই অপরাধেই দুর্বাশার শাপে অভিশপ্তা শকুন্তলা। কিন্তু এক্ষেত্রে দুষ্যন্তের অপরাধটা কোথায়? রাজধানীতে নবপরিণীতা শকুন্তলার যে নিগ্রহ, তার জন্য দুষ্যন্তের দায় ছিল কি? তাঁর আত্মবিস্মৃতিও তো দুর্বাসার শাপের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া! দুষ্যন্ত প্রেমিক হিসেবে, রাজা হিসেবে কতটা সফল তার চূড়ান্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বর্গপ্রত্যাগমন কালে ভগবান মারীচের আশ্রমে পুত্র সর্বদমন (ভরত) সহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি শকুন্তলাকে দেখে। প্রবল অনুশোচনার তাপে পুড়ে পুড়ে দুষ্যন্ত প্রেমের অয়স্কান্ত সুরভি যেদিন অনুভব করেছেন, সেদিনই অদৃষ্ট তাঁকে নিয়ে গেছে মারীচের আশ্রমে। সেখানে প্রেমের তপস্যায় উত্তীর্ণা এই বিরহিণী শেষ পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষমানা। অবশেষে সৌভাগ্যলক্ষ্মী অপমানক্ষুব্ধ শকুন্তলার চরণপতিত অনুতপ্ত দুষ্যন্তকে মিলিয়ে দিয়ে জয় ঘোষণা করলেন প্রেমের। আদর্শপ্রণয় অনেক সংযম-সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার ধন। প্রেমের সেই সাধনায় তপস্বী ও তপস্বিনী—দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে প্রেমের গরিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক-সংশ্লিষ্ট মুখ্য চরিত্রগুলি অল্প-বিস্তর বিশ্লেষিত হয়েছে। এই অঙ্কে যে সকল গৌণ চরিত্র আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি প্রত্যক্ষ চরিত্র, আবার কয়েকটি পরোক্ষে উল্লেখিত চরিত্র নাটকমধ্যে যাঁদের ভূমিকা বিশিষ্ট কিম্বা স্পষ্ট নয়।

গৌতমী—প্রত্যক্ষ চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গৌতমী। চতুর্থ অঙ্কের মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর আবির্ভাব। নাট্যকার তাঁকে দিয়ে বেশি কথাও বলান নি। তবুও তাঁর কথা না বললে চতুর্থ অঙ্কটি বোধ করি অপূর্ণই থেকে যায়।

শকুন্তলা বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ফুলসাজে সাজিয়ে দিতে হবে তাঁকে। প্রিয়সখী অনসূয়া-

প্রিয়ংবদার চিন্তা শকুন্তলার রাজবধূর উপযুক্ত আভরণের জন্য। হঠাৎ প্রচুর ফুল-অলঙ্কার-আভরণ নিয়ে নারদের প্রবেশ। এসব দেখে বিস্মিত গৌতমী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'বৎস নারদ, কোথা থেকে এসব পেলে? (বচ্ছ নারঅ, কুদো এদং?) উত্তরে ভগবান মহর্ষি কাশ্যপের তপঃপ্রভাবের কথা উল্লেখ করলে তিনি প্রশ্ন করেন—কিং মানসী সিদ্ধী?—এগুলি কি তাঁর মানসসৃষ্ট? — এইভাবে এই প্রথম নাটকে তাঁর অনুপ্রবেশ কৌতূহলী স্বল্পপরিচিতা এক নারীরূপে।

শকুন্তলা-আশীর্বাদ পর্বের সূচনায় মহর্ষি কাশ্যপ আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদের বেদনায় আবেগ বিহ্বল! অনসূয়া-প্রিয়ংবদা তাঁকে ক্ষৌমযুগল পরিয়ে দিলেন। আনন্দোজ্জ্বল চোখে গুরুজনও তাঁকে শেষবিদায় দানের জন্য সমুপস্থিত। এমন সময়ে শকুন্তলাকে গুরুপ্রণামের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'বাছা, ওঁদের প্রণাম করো, আচার পালন করো।' (আআরং দাব পড়িবজ্জসস।) আবার মহর্ষি যযাতি-শর্মিষ্ঠার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সম্রাটপুত্রের মা হবার আশীর্বাদ করলে তিনিও সেকথার গুরুত্ব অনুধাবন করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন 'প্রভু, এতো কেবল বর নয়, এ আশীর্বাদ।' (ভগবন্, বরো ক্খু, এসো। ণ আসিস্য।) 'শকুন্তলার পতিগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুভঙ্কর হোক' মহর্ষির এই প্রার্থনার উত্তরে কোকিলের সম্মতিসূচক কুহুরব শুনে শকুন্তলাকে নির্দেশ দেন—"বাছা তোমার শুভযাত্রা স্নিগ্ন জ্ঞাতিজন ও তপোবন-দেবতাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এঁদেরও তুমি প্রণাম করো।" (জাদে, ণ্ণাদিজণসিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণাসি তবোবণদেবদাহিং। তা পণম ভঅবদীণং।) এই সকল ঘটনাবৃত্তের মধ্যে গৌতমী চরিত্রের যে দিকটি প্রতিফলিত হয় তাতে বোঝা যায়, তিনি যেন আশ্রমের অপরিহার্য কর্তব্যসচেতন জাগ্রত বিবেক, স্নেহে-মমতায়-করুণায় বিগলিতপ্রাণ এক আদর্শ সন্ন্যাসিনী। মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলাকে পতিগৃহে তাঁর আদর্শ আচরণ বিধি 'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে...' ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, আদর্শরমণীর কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে গৌতমীরও কিছু বলার থাকতে পারে। তাই আদর্শ নীতিবোধসমুজ্জ্বল উপদেশ দান করেও সে বিষয়ে চূড়ান্ত উপদেশের ভার গৌতমীর উপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো গৌতমীই বা কী বলেন।' (কথং বা গৌতমী মন্যতে।) এর উত্তরে গৌতমী অবান্তর কথাবিস্তার না করে মহর্ষির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন—'এত্তিও ক্খু বহুজনস্স উবদেসো।'—এই এল বধূজনের উপযুক্ত উপদেশ। বাছা, এগুলি সব মনে রেখো। নাটকমধ্যে তাঁর ভূমিকা এখানেই শেষ। এ থেকে তাঁর চরিত্রের অনিষিক্ত কোণগুলি আলোকিত হয়ে যায়। প্রৌঢ়া, ভূয়োদর্শিনী, স্নেহময়ী, মাতৃসমা এই সন্ন্যাসিনী যেন মহর্ষি কণ্বেরই প্রতিচ্ছায়া। আচারদীক্ষা, নীতি-আদর্শ, কর্তব্য ও সংযম-সহিষ্ণুতা সমুজ্জ্বল, স্থিরা-ধীরা-ব্যক্তিত্বময়ী স্বল্পবাক্ এই সন্ন্যাসিনী মহর্ষির মতোই সংসার-বিবিক্ত নির্জন-প্রশান্ত তপোবনের আনন্দরসময় পরিবেশের বাসিন্দা। তিনি যে আশ্রবাসীদের গুরু ও সম্মানার্হা নেত্রীস্থানীয়া তাতে সন্দেহ নেই। সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে গৃহধর্মের অপূর্ব মিলনে তাঁর চরিত্রটিও তাই মহর্ষি কাশ্যপের মতোই সমান শ্রদ্ধার্হ, সমান উজ্জ্বল।

অতঃপর চতুর্থ অঙ্কে ভীড় করেছে কয়েকজন ঋষিকুমার—মহর্ষিশিষ্য শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস গৌতম ও নারদ। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই শার্ঙ্গরব। মহর্ষির অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য এই শার্ঙ্গরব

অনেকটা যেন পরবর্তী কালের ভগবান বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য আনন্দের পূর্বরূপ। যখনই কোনো জরুরী প্রয়োজন, সবার আগে মহর্ষি তাঁকেই স্মরণ করেন এই বলে—'ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রা!? —'শার্ঙ্গরব, তোমরা সব কোথায়?' অনুগত শিষ্যও তৎক্ষণাৎ উত্তরে দেন—'ভগবন, ইমে স্মঃ।'—প্রভু এই যে আমরা। কাশ্যপ তাঁদের বললেন ভগিনী শকুন্তলাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। পতিগৃহগামিনী শকুন্তলা ও গৌতমীসহ যাত্রীদলের প্রধান হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করে মহর্ষি তাঁর উপর যে নির্ভরতা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ শিষ্যটির চরিত্রমহিমা স্ফুটোজ্জ্বল হয়েছে। সেই উজ্জ্বলতার আরও নিদর্শন আছে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যের শেষ দিকে। স্নেহে আত্মবিস্মৃত গুরু কাশ্যপকে সচেতন করে এই শার্ঙ্গবর যখন বলেন, 'ভগবন্। উদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্, অত্র নঃ সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি। (প্রভু, স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনদের অনুরূপ ক্ষেত্রে জলাশয় পর্যন্ত গমন করা উচিত বলে শুনেছি। তা এই তো সেই সরসীর তীর। তাহলে প্রভু, এখান থেকে আমাদের করণীয় বার্তা নির্দেশ করে আশ্রমে ফিরে যান।)—এই না উপযুক্ত শিষ্যের বোধ। প্রয়োজনের মুহূর্তে জ্বলে ওঠা এবং কর্তব্য যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। আবার আচার্যের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। রাজধানীতে গিয়ে মহারাজা দুষ্যন্তকে কি কি নিবেদন করতে হবে মহর্ষি সেকথা জানিয়ে দিলে বিনীত ভাবে তা পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, 'গৃহীতোহয়ং সন্দেশঃ।'—প্রভু আপনার এই বার্তা গ্রহণ করলাম। গৃহীদের পালনীয় অনেক কথা বলে বিস্ময় উৎপাদন শেষে মহর্ষি যখন তাঁর বাস্তব বোধের প্রসঙ্গে বলেন, 'বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।' অর্থাৎ তারা বনবাসী হলেও লৌকিক বিষয়ের খবরাখবরও রাখেন। তখনও বিনীত শার্ঙ্গরব গুরুর জ্ঞানের প্রসারতার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ভোলেন না, জানিয়ে দেন ধীমান গুরুর প্রতি উপযুক্ত শিষ্যের অগাধ আস্থার কথা। 'ভগবন্! ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্!' প্রভু ধীমান ব্যক্তিদের অজানা তো কিছু নেই! এই বিশ্বাস, এই আত্মনিবেদনের মধ্যেই ভারতীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার উজ্জ্বল-সুন্দর আদর্শটি ধরা পড়েছে।

শার্ঙ্গরবের সঙ্গে মহর্ষির আর এক ধীমান শিষ্য শারদ্বতের নাম একই প্রযত্নে উচ্চারিত হলেও নাটকে তার উপস্থিতি নগণ্য। বৈখানস, নারদ, গৌতম প্রভৃতি সম্পর্কেও একই কথা। সুতরাং এই সকল চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার অবকাশ এখানে নেই।

(খ) দুর্বাসার অভিশাপ : নাট্যগুরুত্ব :

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুষ্যন্তের প্রেমমগ্না আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন অপমানাহত সুলভকোপা ঋষি দুর্বাসা। ইংরেজিতে যাকে বলে Ego বা Self conceit সেই আত্ম অভিমানরূপ এক প্রকার অহঙ্কার যে সদ্যোবিবাহিতা একটি বধূর জীবনে কত ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কারণ হতে পারে তা তলিয়ে দেখার দায় হয়তো দুর্বাসার ছিল না। কেন না অঘটন-ঘটনশীল কূটবুদ্ধিই যে তাঁকে দেব-মানবের কাছে বিশিষ্ট করেছে। 'আ অতিথিপরিভাবিনি!' এই বিস্ময়কর সম্বোধন-বাক্যে যাঁর সর্বনাশের অশনি সংকেত দেওয়া হলো তাঁর

পরিণতি কী মর্মান্তিক, কী করুণ!—"স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ / কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।"—যাঁর কথা চিন্তা করতে করতে তুমি আত্মহারা, তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন। পাগল যেমন পূর্বকথা মনে আনতে পারেন না ঠিক তেমনি ভাবেই তিনিও তোমাকে স্মরণ করতে পারবেন না, এমন কি বারবার মনে করিয়ে দিলেও না।

বোঝা গেলো, স্বভাবরুষ্ট দুর্বাসার সংস্কারে কোনো না কোনো ভাবে অপরাধ করে ফেলেছেন শকুন্তলা। ভারতীয় সংস্কারে বধূরমণীর সাংসারিক অবস্থান কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে। পরিবারের সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, অতিথি-অভ্যাগতদের আতিথ্যসেবা, আত্মায়-স্বজন-পরিজন প্রভৃতি সকলের সঙ্গে সংসারের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নেওয়া, আত্মস্বার্থকে বড়ো করে না দেখে অন্যের কল্যাণে সেই স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি ভারতরমণীর সাধারণ সংস্কার। সেই সংস্কারকে অবহেলা করলে অপরাধ হয় এবং তার জন্য শাস্তিও ভোগ করতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতিতে এরকম শাস্তির নিদর্শন অপ্রতুল নয়। সুতরাং এই বিচারে অপরাধিনী শকুন্তলার প্রতিদুর্বাসার অভিশাপ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

কিন্তু একালের বিচারে ঐ পুরানো সংস্কারের গুরুত্ব কতখানি? দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্বমতে, সুতরাং সিদ্ধ। প্রচলিত সংস্কার অনুসারেও দুষ্যন্ত শকুন্তলার বৈধ স্বামী। সেই স্বামী-সংস্কার থেকেই নব-পরিণীতা বধূ শকুন্তলা যদি সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকে তাহলে তা কি নিষ্ঠুরভাবে অভিশপ্তা হবার মতো অন্যায়? প্রেমের শক্তিই প্রেমের ধর্ম। সেই ধর্ম যদি মোহগ্রস্ত হয়ে ম্লান হয়ে পড়ে তাহলে কাউকে লাঞ্ছিত করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু শকুন্তলা পতিমোহে আচ্ছন্ন ছিলেন বললে নর-নারীর জীবনে স্বাভাবিক ভালোবাসার ধর্মকে অস্বীকার করতে হয়। সুতরাং একালের দৃষ্টিতে শকুন্তলার আত্মমগ্নতায় পাপের বীজ ছিল না। তাই সামান্য বিচ্যুতির জন্য লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান সমীচীন হয়নি।

তবুও মহাকবি যখন নাটকের মধ্যে এমন একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন, তখন তার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।—

প্রথমত, কালিদাস যে সম্পন্নকালের পটভূমিকায় নাটকটি রচনা করেছিলেন, তখনকার রক্ষণশীল মূল্যবোধে নারীর সাংসারিক অবস্থানটি সুনির্দিষ্ট ছিল। সেই সুনীতিনিয়ন্ত্রিত সামাজিক অবস্থানে কেবল নারীর ক্ষেত্রেই নয়, স্ত্রী-পুরুষের সকলের ক্ষেত্রেই কোনোপ্রকার কর্তব্যকর্মে অবহেলা স্বধর্ম থেকে এক প্রকার বিচ্যুতি এবং অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হত। সুতরাং শকুন্তলা অপরাধিনী এবং তাঁর শাস্তির বিধান।

দ্বিতীয়ত প্রেম-পরিণয় জীবনে অপরিহার্য হলেও তার জন্যেও নর-নারীকে সংযম-শৃঙ্খলার শাসন মেনে চলতে হয়। যেখানে বেচাল, অসঙ্গতি, সেখানেই শাস্তির বিধান। প্রাচীন ভারতে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, জননীত্ব প্রভৃতিকে পরম মঙ্গলজনক বিষয় বলে মনে করা হত এবং তারজন্য নিয়ম-শৃঙ্খলারূপ কঠো বিধি-বিধান সমাজকে মেনে চলতে হত।

তৃতীয়ত, কালিদাস হয়তো বিশ্বাস করতেন, যা যথার্থ ভালোবাসা তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন। বিচ্ছেদের দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে, দুঃখ-বেদনার কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে প্রেমকে দহনদীপ্ত নিকষিত হেমে পরিণত করতে হয়। দুর্বাসার অভিশাপ বধূ শকুন্তলার আত্মদহন ও সেই দাহ থেকে মুক্তির সোপান তৈরি করে দিয়েছে। শকুন্তলা-দুষ্যন্ত দুজনেরই আত্মশোধনের পথ বাৎলে দিয়েছে ঐ অভিশাপ।

চতুর্থত, স্রষ্টার মানসিকতার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে দুর্বাসার অভিশাপ ঘটনাটির মধ্য দিয়ে। যে সুনীতি-সুরুচি-সমুজ্জ্বল মঙ্গলময় জীবনের ছবি কবি এঁকেছেন তাঁর সবকটি কাব্যও নাটকের মধ্যে, সেখানে প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণ-সব একাকার হয়ে গেছে। ত্যাগদীপ্ত প্রেমের সুবর্ণকান্তি বাসনামদির প্রেমের জোয়ারকে অতিক্রম করে গেছে। এই স্বর্ণফল দুর্বাসার দান। তাঁর অভিশাপ—'অয়মহম্ ভোঃ', তো আসলে চেতনার জাগরণ, কল্যাণবুদ্ধির আহ্বান, অভিশাপরূপে আশীর্বাদ!

পঞ্চমত, মহাকবি সৃষ্টির দাবিও মেনেছেন। তাই 'নাট্য কৌশলের দিক থেকেও দুর্বাসার অভিশাপের প্রয়োজন ছিল। Dramatic Suspense বা নাট্য-উদ্বেগ গতিকে যেমন ত্বরান্বিত করে তেমনি দর্শকের মনে একপ্রকার সম্ভাবিত-অসম্ভাবিত সংশজনিত রসানুভূতির সৃষ্টি করে। এর ফলে দর্শকের মনে ভাবের উত্থান-পতনে নাটকের গতি অব্যাহত থাকে। দুর্বাসার অভিশাপ সমস্ত নাটকটিকে রহস্যের আবরণে ঢেকে দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দুষ্যন্ত হারানো আংটি ফেরত পাচ্ছেন ততক্ষণ নাটকের পরিণতি কী, দর্শক অনুমান করতে পারেন না। এই নাটকীয় কৌশল শ্রেষ্ঠ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। (দ্রঃ মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'-গ্রন্থের 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অধ্যায় ২সং পৃ. ২২৬-২২৭)

সুতরাং দুর্বাসার অভিশাপ অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের মূলসূত্র বা Key Note। অভিশাপের জন্যই শকুন্তলার আংটি হারানো, দুষ্যন্তের শকুন্তলা বিস্মরণ এবং দুঃখসাধনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলময় উপসংহার—পুত্র সর্বদমনসহ শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মিলন। সুদীর্ঘ সপ্তাঙ্ক পর্যন্ত নাটকের গতিশীলতা ও কৌতূহল সজাগ রাখার অনুকূলে দুর্বাসার অভি শাপ ক্রিয়াশীল থেকে অপাপবিদ্ধ-নির্মল প্রেমসংস্কারকে পরমমূল্য বিভূষিত করেছে। নাটকে অভিশাপ-পর্ব সংযোজনের সার্থকতা এখানেই।

(গ) শকুন্তলা-বিদায় দৃশ্যের রসসৌন্দর্য :

নাটক দৃশ্যকাব্য। প্রত্যেক্ষ ঘটনার সমাবেশ ও তাদের ভাবরসস্নিগ্ধ আস্বাদন নাট্যবোধ ও কাব্যরসের সমন্বয়-সাধক কালিদাস মহাকবি। মহাকবিসৃষ্ট নাটকে তাই নাট্যধর্ম ও কাব্যধর্মের যুক্তবেণী রচিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঐ দুটি ধর্মকে একই অর্থে গ্রহণ করা হত। কাব্য আর নাটকের মধ্যে সাহিত্যের বিভাজনরেখা ছিল না বলেই হয়তো সেকালের রসবোদ্ধা বলতে পেরেছিলেন—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য হল নাটক। আর এরই সূত্রধরে প্রামাণ্য

হিসেবে তাঁরা পরম সমাদরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কথা—

"কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।
তত্র রম্যা শকুন্তলা॥
তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্কঃ।
যত্র যাতি শকুন্তলা॥"

সুতরাং বোঝা গেল, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' কালিদাসসৃষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট নাটক এবং এই নাটকের সবচেয়ে রম্য অংশ চতুর্থ অঙ্ক যার মূল বিষয় শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-উপলক্ষ্যে বিচিত্র সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অনুষঙ্গ। এই অঙ্কটিতেই তপোবন প্রকৃতি তথা বিশ্ববিমোহিনী বহিঃপ্রকৃতি (Nature) ও মানব প্রকৃতি (Human Nature) তাদের হাজারো সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়ে ধরা দিয়েছে। মনীষী গ্যেটে (Goete)-এর 'Young years blossoms' অথবা 'Fruits of its decline' অর্থাৎ 'তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল', 'মর্ত্য ও স্বর্গের' সেতু সেতুবন্ধনের পৌড়োক্তি অত্যুক্তি না হয়ে রবীন্দ্র-কথিত 'যথার্থ রসজ্ঞের বিচার' হয়ে থাকলে সেই উপলব্ধির পশ্চাতেও চতুর্থ অঙ্কের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট।

চতুর্থ অঙ্কের উপস্থাপনায় পুষ্পচয়নের অভিনয়নিরত দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপচারিতা। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপনে গান্ধর্বমতে পরিণয় ও তার উত্তরকালীন প্রতিক্রিয়া — সন্তানসম্ভবা প্রিয়সখীর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা—সেই রাজর্ষি কি রাজধানীতে গিয়ে শকুন্তলা বৃত্তান্ত সবভুলে গেলেন! এর সঙ্গে আরও চিন্তার বিষয়, সোমতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরে এসে মহর্ষি যখন প্রিয়সখীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানবেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবে! অনসূয়া অবশ্য এই সমস্যার সহজ সমাধান আশা করে বলেছেন—'জহ অহং দেক্খামি তহ তস্স অণুমদং ভবে।' (আমি যা দেখছি, ঘটনাটি তিনি (মহর্ষি) মেনে নেবেন।) নিজের বক্তব্যের অনুকূলে তাঁর যুক্তিটিও চমৎকার—মা-বাবার প্রথম সংকল্প গুণবতী কন্যাকে সুপাত্রস্থ করা। বিষয়টি যদি দৈবই সম্পাদন করে দেন তবে গুরুজন অবশ্যই কৃতার্থ বোধ করেন। এই সব বাস্তব জীবনরসসিক্ত সংলাপে নাটকটি ভাবের স্বাধীন লোক থেকে দর্শক-শ্রোতার মনকে মর্ত্যের মাধুরীমাখা জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

আবার দর্শক যখন একটা মধুর কিছু পরিণাম-প্রত্যাশী তখনই আকস্মিক ভূকম্পনের মতো মহর্ষি দুর্বাসার আবির্ভাব! বাম করতলের উপর মস্তক রেখে চিত্রার্পিতের মতো পতিচিন্তায় আত্মহারা শকুন্তলা। কুটীরপ্রাঙ্গণে কখন যে সুলভকোপা মহর্ষি বারংবার 'অয়মহং ভোঃ!' বলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে চলেছেন, সদ্যোবিবাহিতা শকুন্তলা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না। অভিশাপ বর্ষিত হল—আ অতিথিপরিভাবিনি!'...ইত্যাদি। কী নিষ্ঠুর নির্মম সেই অভিশাপ! তাঁর প্রিয়তমই তাঁকে চিনতে পারবেন না! অনেক কষ্টে দুর্বাসার প্রসন্নতা বিধান করে আসন্ন বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার একটা

উপায় হল সত্য, কিন্তু দর্শকের মানসিক আনন্দবোধের উপর প্রচণ্ডচাপ সৃষ্টি হল না কি? এমনি ভাবেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে নাট্যকার ললিত ও কঠোরের মিলন সাধন করে নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে গতিশীলতা দান করলেন।

অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়াশ্রিত এই চতুর্থ অঙ্ক। শকুন্তলার বিপ্রলম্ভের স্নিগ্ধতা ও প্রেমতপস্যার গভীরতা প্রকাশের জন্য ললিনীপত্রের আড়ালে অদৃশ্য চক্রবাককে না দেখতে পেয়ে চক্রবাকীর আকুল কান্নার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সখীদের কাছে শকুন্তলার আত্মসান্ত্বনা—'দুক্করং ক্খু অহং করেমি।' তিনি যে বিরহ বেদনাকেও সহনশীল করে নিয়ে দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন—এই তাঁর নিজেকে নিজের প্রবোধ দান। এমন মূহূতেই অনসূয়া-প্রিয়ংবদা প্রিয়সখীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁদের যে অহৈতুকী ভালোবাসা বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা মেলাভার। শকুন্তলা-অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অপূর্ব সখীত্বের নিদর্শন 'সখা' শব্দের নিগর্লিত অর্থকে (সমপ্রাণঃ সখামতম্) আরও বেশি অর্থবহ করে তুলল।

কী ঘটনাবহুল বাস্তবরসসৃষ্টিতে আর কী ভাববহুল কাব্যরস সৃষ্টিতে অতুলনীয় এই চতুর্থ অঙ্কটি। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা-শার্ঙ্গবর-শারদ্বত-গৌতমী-কাশ্যপ প্রভৃতি চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই স্বমহিম এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁদের নীতিবোধ, আদর্শ জীবনযাপন প্রণালী, প্রিয়জনের কল্যাণচিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শকুন্তলাকে ফুলসাজে সাজিয়ে দেওয়া, তপোবন-প্রকৃতির মানুষের মতো আচরণ, তাদের কবোষ্ণ নিশ্বাস যেন কেবল আশ্রমিক পরিবেশকে নয়, সমগ্র তপোবনকে জীবন্ত করে তুলেছে। শকুন্তলার বনজ্যোৎস্না নবমল্লিকার প্রতি ভালোবাসা, মাতৃহারা হরিণশিশুটির প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, আসন্নপ্রসবা মৃগীটির প্রতি মমতা প্রভৃতি দৃশ্য সত্যিই মনোরম। শকুন্তলা চলে যাবেন বুঝে যে হরিণশিশুটি পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, লেগে থেকেছিল তার সঙ্গে, কাপড়ের খুঁটধরে টেনেছিল—'কো ণু ক্খু এসো নিবসনে মে সজ্জই।' অথবা আশ্রমের প্রাণ আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—এই দেখে পালিত হরিণ-ময়ূর প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীদের খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সেই দৃশ্য!—মৃগের মুখ থেকে খসে পড়েছে দর্ভ, ময়ূর নাচ ভুলে গেছে। গাছ থেকে, লতাবিতান থেকে পাতা খসে পড়ছে যেন অশ্রুবিন্দুর মতো। দুঃখবেদনাতুর এই সকল ঘটনা যেন চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক! এই জন্যই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—'লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ সম্বন্ধ।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কন-দক্ষতার অপর একটি অপূর্ব নিদর্শন চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। ক্ষীরবৃক্ষের শান্ত আশ্রয়-ছায়ায় দাঁড়িয়ে মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলাকে 'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে।' ....প্রভৃতি বলে গৃহবধূর সেবাধর্মের মঙ্গলজনক দিকটি নির্দেশ করলেন। তারপর গৌতমী-শারদ্বত সকলের সঙ্গে গাছের আড়ালে চলে গেলেন শকুন্তলা। হায়, হায় করে উঠলেন দুই প্রিয়সখী—'হদ্ধী

হদ্ধী, অন্তরিদা সউন্দলা বণরাঈহিং।'—বেদনাদীর্ণ অপূর্ব সে দৃশ্য। এইরূপ ছোটখাটো ঘটনাবলীর মাধ্যমে কালিদাস নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন Detail-এর পরিচয় দান করে।

চতুর্থ অঙ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এর কাব্যসৌকর্য ও রসমাধুর্য। মহর্ষি কাশ্যপের বাণীতে, বিষ্কম্ভকে সুপ্তোত্থিত শিষ্যের প্রভাতের মনোরম বর্ণনায়, তপোবনপ্রকৃতির মানবোচিত আচরণের বর্ণনায় যে সকল অনুপম কাব্যসৌন্দর্য ঝরে পড়েছে তার শেষ পরিচয় মহর্ষির দার্শনিক উপলব্ধিতে—

" অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিত ন্যাস ইবান্তরাত্মা।।"

[কন্যা যেন পরের গচ্ছিত ধন। তাকে তার অধিকারীর হাতে সমর্পণ করে চিন্তামুক্ত আমি পরম সন্তোষ লাভ করছি।] এইভাবে মানবিকবোধে, উপমাঋদ্ধ চিত্রসৌন্দর্যে, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দানে চতুর্থ অঙ্কটি দর্শকের হৃদয়াসন জুড়ে রসেছে।

(খ) চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব :

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের বিশ্বজোড়া খ্যাতির সিংহভাগ জুড়ে আছে চতুর্থ অঙ্ক। সেই অঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় দুষ্যন্ত-পরিণীতা শকুন্তলার স্বামী-সন্দর্শনে যাত্রা। শুভবিবাহ শেষে নববধূর পিত্রালয় ছেড়ে স্বামীগৃহে—অতঃপর নিজের আলয়ে যাত্রা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। এতকালের পরিচিত-পরিজন ছেড়ে যাওয়ার বেদনা এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অনিশ্চয়তা ও সংশয় অবশ্যই নিষ্ঠুর জীবনসত্য এবং এটাই চতুর্থ অঙ্কের উপস্থাপ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কন্যাবিদায় বা অপত্যবিচ্ছেদ—অতি সহজেই দর্শক-শ্রোতার মন অধিকার করে। ভাবাবেগ প্রকাশের উপযোগী ঘটনা-সমাবেশ, পরিচ্ছন্ন ভাষা, প্রকৃতিও মানবসত্তার অভিন্নতা, নাটকীয়তা, কাব্যরস, সৌন্দর্যসম্ভোগ, জীবন অন্বেষা ও দার্শনিক বোধের সমাবেশে চতুর্থ অঙ্কটি সপ্তাঙ্কে সমাপ্ত নাটকটির যে-কোনো অঙ্কের তুলনায় বেশি বর্ণিল, চমকপ্রদ, ঘটনাবহুল এবং সূক্ষ্ম-সংবেদশীল অনুভূতির সুতীক্ষ্ণ বুনোটে উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর।

প্রথমেই ধরা যাক ভাবের কথা। চতুর্থ অঙ্ক মূলত দুটি মুখ্যভাবের সমন্বয়। প্রথমটি সদ্য-পরিণীতা নায়িকা শকুন্তলার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারজনিত করুণ দীর্ঘশ্বাস এবং দ্বিতীয়টি অবশ্যই পতিগৃহযাত্রাকালীন বিদায় দৃশ্য। দুটি বিষয়ই আমাদের মন কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সভ্য দুনিয়ার সব দেশে ও সব কালে ঐ দুটি বিষয়কে কেন্দ্রকরে রোমান্টিক কাহিনীর বিষামৃত-আশ্রয়ী কাব্য-নাটক-গল্প উপন্যাসরূপ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সুতরাং চতুর্থ অঙ্কের ভাবটি মহৎ এবং হৃদয়গ্রাহী।

দ্বিতীয় কথা—চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু। আপন্নসত্তা শকুন্তলার পতিবিরহে আত্মবিস্মৃতি, প্রিয়সখীর

ভবিষ্যৎ চিন্তায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাতরতা ও সতর্কতা, দুর্বাসার অভিশাপ, সখীদের উদ্যোগে অভিশাপমুক্তির প্রতিবিধান, সোমতীর্থ-প্রত্যাগত আশ্রমপ্রধান মহর্ষি কাশ্যপের (কণ্ব) কন্যাবিদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ, যজ্ঞীয় পবিত্র সংস্কার পালনশেষে পুষ্পসাজে সজ্জিতা শকুন্তলাকে মধ্যমণি করে গুরুজনদের আশীর্বাদ, কাশ্যপ ও গৌতমীর বিশেষ ভূমিকা, তপোবন-দেবতার উদ্দেশ্যে শকুন্তলার শুভকামনায় মহর্ষির শ্রদ্ধাঞ্জলি, পশুপক্ষী, তরুলতা-জীবজন্তু প্রভৃতি সকলের কাছে আশ্রমের প্রাণপ্রিয়া শকুন্তলার বিদায় প্রার্থনা, মহর্ষিকর্তৃক শকুন্তলাকে জীবন-পরিচালনার উপযোগী উপদেশ এবং সবশেষে মহর্ষি, আত্মীয়স্বজন-পরিজন, সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও আশ্রমের পশুপাখী সবাইকে কাঁদিয়ে বেদনার্ত শকুন্তলার বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হওয়া এবং মহর্ষির আত্মপ্রবোধ—এই সব বিচিত্র-সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের সমাবেশ চতুর্থ অঙ্কটিতে মনস্তত্ত্বসম্মত নাটকীয় প্রেক্ষাপট রচনা করে নাট্যমহিমা বর্ধন করেছে। বিষয় গৌরবেও এই অঙ্কটি অতুলনীয়। যে চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের নৈপুণ্য অসাধারণ সেই চরিত্রগুলিও এই অঙ্কে এক ধরনের সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা না থাকলে যেমন শকুন্তলা চরিত্রটি কাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতা পেতো না। তেমনি শার্ঙ্গরব-শারদ্বত, নারদ-বৈখানস-গৌতম, মা গৌতমীসহ বর্ষিয়সী সন্ন্যাসিনী এবং সর্বোপরি শান্ত পোবন প্রকৃতি না থাকলে সম্পূর্ণতা পেত না মহর্ষি কাশ্যপের চরিত্র। এমন কি প্রাচীন ভারত সংস্কৃতির যে অত্যুজ্জ্বল রূপটি—বিশ্ববন্দিত সেই অরণ্যপ্রকতি ও মানবচিত্তের অদ্বয় সংযোগ সুষমা-কেন্দ্রিত অধ্যায়টিও থেকে যেত সামানুপাতিক হারে অপরিস্ফুট। সুতরাং চতুর্থ অঙ্কটির নাট্যগত প্রয়োজন ও গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকার যথেষ্ট সতর্কতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নাটক যৌথ শিল্প এবং নাটকের পাত্র-পাত্রী ও তাদের ব্যবহৃত ভাষা অর্থাৎ সংলাপের মাধ্যমে সেই যৌথ শিল্প সফলতা অর্জন করে। নাটকের ভাষা হবে ঝরঝরে পরিষ্কার, উজ্জ্বল, সংকেতময়, তীক্ষ্ণধার এবং শায়কের মতো গতিশীল। পরিবেশ ও চরিত্রগত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নাট্যকার যে সংলাপ রচনা করবেন তা কখনো মাত্রাহীন, শ্লথ কিম্বা বিতানিত হবে না। সংলাপ রচনায় এই সংযম ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়ে নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে প্রত্যাশিত গতিশীলতা দান করেছেন তিনি। যে ভাষায় তিনি তা করেছেন তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন-মার্জিত-রুচিশীল ও আবেগধর্মী। কী সংস্কৃতে আর কী প্রাকৃতে কখনো ছোট ছোট বাক্যের স্ফটিকঘন সৌন্দর্য, আবার কখনো বা অনতিদীর্ঘ-অনতিহ্রস্ব বাক্যের শিল্পসম্মত প্রয়োগে নাট্য সংলাপের ভাষা হয়েছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। গদ্য ও পদ্য ভাষার সার্থক সমন্বয়ে এক প্রকার 'গাথা ভাষায়' ঋদ্ধ হয়েছে অভিজ্ঞানশকুন্তলার নাট্যভাষা। বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্কে সেই গাথা ভাষা বা মিশ্রভাষা-প্রয়োগ নৈপুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বলেও অঙ্কটি শ্রব্য অথবা দৃশ্য দুই দিকে থেকেই শ্রোতা-দর্শকের মনে দাগ রাখে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাট্যকাব্য। সুতরাং কী নাট্য আর কী কাব্য—উভয় দিক থেকেই সাহিত্যামোদী সমাজে তার আবেদন। গদ্য অথবা পদ্য অথবা গদ্য-পদ্যমিশ্র ভাষায় নাট্যকার আখ্যানবস্তুকে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। যেখানে ভাবটিকে সহজভাবে বললে নাট্যআবেদন কিম্বা নাট্যরস বেশি জমবে

সেখানে মহাকবি সরল গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। আর যেখানে অন্তর্গূঢ় কোনো কোনো আবেগকে রসস্নিগ্ধ প্রকাশরূপদান প্রয়োজন সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন স্পন্দিত ছন্দোময়ীবাণী-ঋদ্ধ, ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্য ভাষা। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে উজ্জ্বল-সুন্দর হয়ে উঠেছে সে কাব্যভাষা। অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের আদ্যন্ত কাব্যভাষার প্রয়োগ সেকালের নাট্যরীতি ও নাট্যভাষার সঙ্গে মানানসই হলেও মনে হয়, নিছক শ্রুতি-নাটক বা Reading Drama রূপেও তা কাব্য ও নাট্যরসলিপ্সু জনসমাজে সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। চতুর্থ অঙ্কটির শ্রুতিনাট্যগত আবেদন অন্য যে-কোনো অঙ্কের তুলনায় যে বেশিই ছিল—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কালিদাস প্রকৃতিপ্রেমিক কবি-নাট্যকার। নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সংযোগসূত্রটি তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁর নাটকে। প্রকৃতি ও মানবমনের অভিন্নতা অভিজ্ঞানশকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কে এমন একটি দৃশ্য রচনা করেছে যেখানে কোন্‌টি নিসর্গ-উপাদান আর কোনটি মানুষ চেনা যায় না। প্রকৃতির উপর মানবিকভাব কবি আরোপ করেছেন। ফলে নিসর্গপ্রকৃতি মানবীয় আনন্দ-বেদনামিশ্র রূপ নিয়ে উপস্থিত সেখানে। শকুন্তলাকে পুষ্প আভরণে সাজিয়ে দেবার জন্য চাঁদের মতো উজ্জ্বল-সুন্দর কচি কচি কিশলয়রূপ হাত বের করে ক্ষৌমবস্ত্র-অলক্তক প্রভৃতি দান, বনদেবতাদের অশ্রুবিন্দু, আশীর্বাদ, কোকিলের রব প্রভৃতি এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত চতুর্থ অঙ্কটি মহাকবির সৌন্দর্যরস সম্ভোগের অনন্য নিদর্শন। রবীন্দ্র অনুভব দিয়ে বিষয়টির ছেদ টানতে হয়—

> "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা,
> প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সম্ভোগ।"

মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমিক আবহ, নর-নারী, গাছ-পালা-পশুপাখী-অধ্যুষিত রম্য পরিবেশ, সংযম-সহিষ্ণু নিয়ম-শৃঙ্খলা-আশ্রিত জীবন-অন্বেষার সম্যক পরিচয় দানে চতুর্থ অঙ্কটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। আশ্রমিক জীবনের সংযত-উদার মহিমার সঙ্গে লোকজীবনের মঙ্গলময় বিন্যাস, জগৎও জীবনের শাশ্বত ন্যায়নীতি আদর্শের সঙ্গে প্রেমপ্রীতিরসসিক্ত মানবিক বোধের অপূর্ব সমন্বয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কটিকে নাটক হিসেবে কাব্যহিসেবে এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতসংস্কৃতি-নির্ভর জীবনশিল্প হিসেবে একটি শিষ্ট মাত্রা দান করেছে। এই মাত্রা চূড়ান্ত মহিমা অর্জন করেছে শকুন্তলার তপোবনত্যাগের শেষ মুহূর্তে। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন—

> "কাব্যেষু নাটকং রম্যম্
> তত্র রম্যা শকুন্তলা।
> তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্ক
> যত্র যাতি শকুন্তলা।।"

(ঙ) অভিজ্ঞানশকুন্তলা ও রবীন্দ্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের উত্তরসূরী। কালিদাসের কাছে তাঁর সারস্বত ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। মহাকবি কালিদাসকে ধ্যানের আসনে বসিয়েছিলেন তিনি। চৈতালি'র 'মানসলোক' কবিতায় কালিদাসের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"আজিও মানসধামে করিছ বসতি—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি।"

কালিদাসের উত্তরকালে তাঁর সাহিত্যের "ধ্রুবপথ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় কবি এতখানি যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। কালিদাসের সাহিত্যের প্রতি তন্ময় অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের মনে একদিকে যেমন নতুন আলোকে পুরাতনকে গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছে, অপরদিকে তেমনি কালিদাসের প্রতিভাকে সঠিকভাবে বিচার ও যথাযোগ্য মর্যাদায় নবযুগের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। মাঝখান থেকে আমরা দুই কালের দুই বহুমান্য কবির মনোধর্মগত সাদৃশ্যটুকু অনুভব করতে পেরে ধন্য হয়েছি।" ['রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, পৃ. ১৫৩] এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, "রবীন্দ্রনাথ অলোকসামান্য প্রতিভার দ্বারা কালিদাস থেকে অকুণ্ঠচিত্তে ঋণগ্রহণ করেও তাঁকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা কখনও অপরের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি।" [মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্যে' (২য় সং), পৃ. ১৫৩]

কালিদাস-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটক। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।' রবীন্দ্রনাথ নাটকটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই নাটকের সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত মনোহর শ্লোকগুলির কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। সংস্কৃতের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'র আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল সবার উপরে। আবার পুরো নাট্যাংশের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কটি তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। তিনি বোধ হয় মনে করতেন, "কালিদাসের যা মূলকথা তা ঐ চতুর্থ অঙ্কেই বলা হয়ে গেছে। সেইজন্য এই অঙ্কে বিধৃত কালিদাসের মূলভাবগুলিকে তিনি সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশে তাঁর স্বভাবসুলভ কবিমনের রং লেগেছে।" [পূর্ববৎ মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' (২য় সং) পৃ. ১৫৩।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের উপর রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। দুটি প্রবন্ধে কেবল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটক সম্পর্কেই নয়, সাধারণভাবে কালিদাসের মহত্তম সৃষ্টি সম্পর্কেও তাঁর অনুভবের কথা বলেছেন। মনীষী গ্যেটে নাটকটি সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছিলেন তাকে অভিনন্দিত করে তিনি লিখেছেন, গ্যেটের উক্তি 'আনন্দের অতুক্তি নয় রসজ্ঞের বিচার।' গ্যেটে যে 'ফুল থেকে ফলে পরিণতির' কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, এই পরিণতি

'স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি' এবং এ হল 'প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উন্নীত করিয়া দেওয়া।'

প্রাচীন সাহিত্যের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য প্রবন্ধটিতে নাটকটি সম্পর্কে প্রচলিত অনেক ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কবি-সমালোচক ও নাট্যরসবোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন আভাষণে ও চিঠিপত্রে তিনি কালিদাসের সাহিত্য বিশেষত অভিজ্ঞানশকুন্তালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপের গূঢ়তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অনুভবে দুর্বাসা কল্যাণবুদ্ধির প্রতীক এবং কালিদাসের সবকটি কাব্য-নাটকে এই কল্যাণবুদ্ধি কাজ করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আপন সৃষ্টির মধ্যে মহাকবি প্রেম-সৌন্দর্য-মঙ্গল-কল্যাণকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে কাব্যে-নাটকে মহৎ আদর্শের জয়গান করেছেন।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নানা স্তরে তিনি এই অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এই সকল ক্ষেত্রে তিনি কখনো মূল বিষয়ের কায়ানুসরণ করেছেন, কখনো বা করেছেন ছায়ানুসরণ। কয়েকটি দৃষ্টান্তে আমাদের বক্তব্য সপ্রমাণ হবে। যেমন 'তপোবন (চৈতালি) কবিতায় প্রাচীন আর্যঋষির তপোবন কবিকে মুগ্ধ করেছে। সেখানে ঋষিকন্যাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্য-কল্পনা এসে গেছে—

"ঋষিকন্যাদলে
পেলবযৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।"

আবার 'মিলনদৃশ্য' (চৈতালি) কবিতায় তপোবন বালিকা শকুন্তলার সঙ্গে তরুলতা, পশুপাখী, নদ-নদী, বন, নর-নারী প্রভৃতি সকলে মিলে এক করুণ মিলনদৃশ্য ফুটে উঠেছে—

".....যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতে ছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে—সখা সহকার
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশুপরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগীগর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে, স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি, পল্লবমর্মরে,
ছলছল মালিনীর জল কলস্বরে;
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর

মঙ্গল বিদায় মন্ত্র গদ্‌গদ্‌গম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলে করুণ ক্রন্দন।।"

—তপোবনের ছায়া-সুনিবিড় শান্তিনিকেতনের সুরভিস্নিগ্ধ ও ভাবঘন এই কবিতাটিতে যেন চতুর্থ অঙ্কের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও 'কড়ি ও কোমলের হাসি', 'সোনারতরী'র 'নিদ্রিতা', 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রকাশ', 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল', 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' প্রভৃতি একগুচ্ছ কবিতায় কবি অভিজ্ঞানশকুন্তলার অনুষঙ্গ এনেছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' (প্রাচীন সাহিত্য) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গভীর হৃদয়বত্তার সঙ্গে শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রতি মহাকবির উপেক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাসের হৃদয়হীনতার এই দৃষ্টান্ত অবশ্যই একালের কবিকে পীড়িত করেছিল। স্বভাবত অনসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রতি তাঁর প্রিয় কবির অনাদর কয়েকটি পরিপ্রশ্নকেও উস্কে দিয়েছিল।

পরিশেষে অভিজ্ঞানশকুন্তলার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমারই পুরানো লেখা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে চাই। " 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে দিক থেকে গভীর যোগ অনুভব করেছিলেন তাহল প্রকৃতির প্রাণবত্তার দিক থেকে যোগ। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে কালিদাস যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন। এই দিক থেকে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ধরা পড়ে।"* (রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, ২য় সং. পৃ. ২৩৩)

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৬.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (বর্ণানুক্রমিক)

১। অলঙ্কারচন্দ্রিকা (২য় সং ১৩৬৩)—শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

২। অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৩। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী-১৯৬১)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধন্যালোক (বঙ্গানুবাদ, ১ম সং—১৩৬৪)—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কালীপদ ভট্টাচার্য।

৫। উপমা কালিদাসস্য (১ম সং)—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৬। কাব্যজিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী, ১৯৬১)—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৭। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র, বসুমতী সং, ১৩৬০)—সম্পাদনা রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৮। কাব্যালোক (৩য় সং—১৩৭৩)—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

৯। কাব্যকৌতুক (১৯৬৩)—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

১০। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১১। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড সং, ১৩৭১)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

১৩। বঙ্গীয় শব্দকোষ (সমগ্র)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৬৭)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫। মেঘদূত-জিজ্ঞাসা (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

১৬। রবি-দীপিতা (৩য় সং)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

১৮। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় (২য় সং)—শ্রীক্ষুদিরাম দাশ।

১৯। রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা (১ম সং—১৩৬৮)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০। রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস (১ম সং)—পম্পা মজুমদার।

২১। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন)—জ্যোতিভূষণ চাকী-অনূদিত।

২২। Aristotle's Poetics–Ed. Bywater.

২৩। An Introduction to Modern Knowledge–Abercrombie.

২৪। Kalidasa (2nd Ed. 1950)–Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

২৫। Kalidasa : A Critical Study (Bharatiya Vidya Prakashan–1977)–A.D. Singh.

৬.১২.৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে কালিদাসের জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

৩। 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।'—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে উক্তিটির তাৎপর্য বিশদ করো।

৪। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর সাতটি অঙ্কের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কটিকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা যুক্তি ও দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৫। 'দুর্বাসার অভিশাপ' ঘটনাটিকে 'নাটকের মূলসূত্র' বলা হয় কেন তার অনুকূলে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো।

৬। চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বন করে যে-কোনো দুটি চরিত্রের নাট্যিক প্রয়োজন সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।—বিদূষক, গৌতমী, শার্ঙ্গরব, দুর্বাসা, অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা।

৭। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে মহর্ষি কণ্ব/গৌতমী/শকুন্তলা/অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। (যে-কোনো দুটি)

৮। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত শকুন্তলা বিদায় দৃশ্যের রসসৌন্দর্য পরিস্ফুট করো।

৯। রবীন্দ্র সাহিত্যে 'আভিজ্ঞানশকুন্তলম'র প্রভাব ও প্রেরণা সম্পর্কে একটি রসঘন নিবন্ধ রচনা করো। (চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে)

১০। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে তপোবন প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি 'অভিন্নতালাভ করেছে।'—আলোচনা করো।

১১। উদ্ধৃতি-কেন্দ্রিত প্রশ্ন : (দৃষ্টান্ত) কে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন? কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (যে-কোনো একটির) অনুরূপভাবে যে-কোনো উদ্ধৃতি তুলে প্রশ্ন থাকতে পারে।

ক) অতি সিণেহো পাবসঙ্কী

খ) বচ্ছে, বীরপ্সবিণী হোহি

গ) যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।

ঘ) বৎসে! অবৈমেতি তস্যাং সৌদর্যাস্নেহম্।

ঙ) বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।

চ) নলিণীপত্তন্দরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরটদি। দুক্করং ক্খু অহং করেমি।

ছ) গুরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি।

জ) হদ্ধী! হদ্ধী! অন্তরিদা সউন্দলা বণরাঈহিং।

ঝ) অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব...

পর্যায় গ্রন্থ ৪

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস

একক- ১৩

অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)

বিন্যাসক্রম :

৬.৪.১৩.১ : গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ পরিচিতি

৬.৪.১৩.২ : পোয়েটিক্সের প্রথম ন'টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

৬.৪.১৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৩.১ : গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচিতি

পাশ্চাত্যে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় গ্রিক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল-কেই পথিকৃৎ মনে করা হয়। তাঁর আগেও যে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কেউ ভাবেননি এমন কথা বলা যায় না, তাঁর গুরু প্লেটো এবং প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের নাম তো করাই যায়, কিন্তু অ্যারিস্টটল-এর মতো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাঁরা কেউ করেননি।

অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন গ্রিসের থ্রেস রাজ্যের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা শহরে, ৩৮৪ খ্রি.পূর্বাব্দে। তাঁর পিতা নিকোমেকাস ছিলেন একজন যশস্বী চিকিৎসক। অ্যারিস্টটল যৌবনে সৈন্যবিভাগে যোগ দেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ও করেন, তারপর বত্রিশ বছর বয়সে (মতান্তরে আঠারো) প্লেটোর কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়বার জন্য এথেন্সে যান। প্লেটোর মৃত্যুর পর (খ্রি.পূ. ৩৪৭ সাল) ম্যাসিডোনিয়ায় আসেন এবং গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩৩৫ খ্রি.পূর্বাব্দে তিনি এথেন্সে ফিরে এসে 'লাইসিউম' নামে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩২৩ খ্রি.পূর্বাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

অ্যারিস্টটল-এর গুরু দার্শনিক প্লেটো তাঁর এই শিষ্যকে বলেছেন 'Nous', অর্থাৎ মূর্তিমান মনীষা। তাঁর মতো সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অত্যন্ত দুর্লভ। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা তাঁর এই সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের একটি খণ্ডাংশ মাত্র, তিনি জানতেন না এমন কোনো বিষয়ই বোধহয় ছিল না। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র—সব বিষয়েই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চারশো, যদিও তার খুব অল্পই আমরা হাতে পেয়েছি। যা পেয়েছি তার কয়েকটির নাম করি ঃ

(ক) বিজ্ঞান বিষয়ক : Physics, On the Heavens, Meteorology, Growth and Decay, Natural History, The Parts of Animals, The Movements of Animals, The Generation of Animals.

(খ) তর্কশাস্ত্র বিষয়ক : Categories, Topics, Prior, Posterior, Analysis, Propositions, Sophistical Refutations.

(গ) দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক : On the Soul, Metaphysics.

(ঘ) নীতিশাস্ত্র বিষয়ক : Ethics.

(ঙ) সাহিত্যশিল্প বিষয়ক : Poetics, Rhetorics.

(চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক : Politics.

পোয়েটিক্স্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলেও এর আয়তন খুবই ছোট। অতি সংক্ষিপ্ত মাত্র ছাব্বিশটি

অধ্যায় এতে আছে। আলোচনাগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় সূত্রাকারে লেখা যে মনে হয় এগুলি যেন বড় আলোচনা করার জন্যে নেওয়া কিছু নোটস্। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন, সেইসব অনুষঙ্গ ধরিয়ে দেবার জন্য নিজের প্রয়োজনেই যেন সেগুলি নোট করে রাখা, তা থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার সময় যেন তিনি পাননি। ফলে গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও প্রচুর।

মূল পোয়েটিক্স্ গ্রন্থটি গ্রিক ভাষায় লেখা। আজ পর্যন্ত কত ভাষায় যে বইটির অনুবাদ হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। বাংলায় যে বইগুলি আছে তার বেশিরভাগই ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা। একমাত্র অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশই সরাসরি গ্রিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ করেছেন। এর ইংরেজি অনুবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এস. এইচ. বুচারের লেখা 'অ্যারিস্টটলস্ থিওরি অব পোয়েট্রি অ্যান্ড ফাইন আর্ট' এবং ইনগ্রাম বাইওয়াটারের 'অ্যারিস্টটল অন দি আর্ট অব পোয়েট্রি'। বাইওয়াটারের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় গিলবার্ট মারে বলেছেন, অ্যারিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক এই বইটির দুটি খণ্ড ছিল, প্রথম খণ্ডে ছিল ট্র্যাজেডি ও অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল কমেডি ও অন্য কিছু প্রসঙ্গের আলোচনা। দ্বিতীয় গ্রন্থটি আমাদের হাতে আসেনি।

৬.৪.১৩.২: পোয়েটিক্সের প্রথম ন'টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে অধ্যায়গুলির কোনো শিরোনাম অ্যারিস্টটল দেননি, আমরাও তাঁর আলোচনাকে ভিত্তি করে যেসব মূল প্রসঙ্গ সেখানে আছে, তাদেরই বিচারবিশ্লেষণ করব। কিন্তু মূল পাঠে ঠিক কী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তার একটা ধারণা সকলের থাকা দরকার বলেই অধ্যায়গুলির মূল প্রসঙ্গ একটু জেনে রাখা ভালো।

প্রথম অধ্যায় : শিল্পের স্বরূপ ও কাব্যের লক্ষণ নিয়ে একটি ভূমিকা এবং অনুকরণের মাধ্যম

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, অর্থাৎ মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথাইরাম্বিক কবিতা ইত্যাদি, সাধারণভাবে এরা সবই অনুকরণ মাত্র। এক রকম বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের পার্থক্য তিনটি দিকে—অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের রীতি। পদ্য একটা মাধ্যম মাত্র, পদ্যলেখককে কবি বলা যায় না, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র বা প্রকৃতিবিজ্ঞানও পদ্যে লেখা সম্ভব—লোকে ভুল করে পদ্যলেখককে কবিই বলে। সাহিত্যের কোনো কোনো বিভাগ অবশ্য কয়েকটি মাধ্যমকে মিশিয়ে ফেলে, যেমন কবিতা (ডিথাইরাম্বিক ও গথিক), ট্র্যাজেডি এবং কমেডি—এখানে ছন্দ, সুর, পদ্য মিশ্রিত ভাবে থাকে। শিল্পের মৌলিক পার্থক্য হয় অনুকরণের মাধ্যম পালটালে (এ কথা বলার উদ্দেশ্য, লিখিত ভাষামাধ্যমে হয় সাহিত্য, রঙ-তুলিতে চিত্র, মাটি ও পাথরে ভাস্কর্য ইত্যাদি)।

দ্বিতীয় অধ্যায় : অনুকরণের বিষয়

মানুষই হচ্ছে অনুকরণের বিষয়। মানুষের আচরণের নৈতিক পার্থক্য দিয়েই হয় তাদের মৌলিক ভেদ। যাদের অনুকরণ করা হবে তারা হয় আমাদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর, অথবা নিম্নশ্রেণীর, অথবা ঠিক আমাদেরই মতো হবে। হোমারের চরিত্রগুলি আমাদের চেয়ে উন্নত, হেগেমন আর নিকোকারিচের চরিত্র আমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, আর ক্লিওফোনের চরিত্র আমাদের মতোই। এই পার্থক্যটাই ট্র্যাজেডি এবং কমেডির স্বরূপ ঠিক করে—ট্র্যাজেডিতে পাই উচ্চশ্রেণীর মানুষ, কমেডিতে পাই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায় : অনুকরণের রীতি

অনুকরণের তৃতীয় পার্থক্য, রীতি বা রচনারীতি। কবি বর্ণনার দ্বারা সমস্ত ঘটনা জানাতে পারেন, হোমারের মতো অন্য ব্যক্তির মুখে বর্ণনা দিয়ে বা নিজের মুখেই তা বর্ণনা করে এবং পাত্র-পাত্রীকে দর্শকের সামনে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল ভাবে উপস্থাপিত করে। এর ফলেই কাব্য, নাটক ইত্যাদি শাখা পৃথক হয়ে যায়।

এরপর নাটক, ট্র্যাজেডি ও কমেডির উৎপত্তির সম্ভাব্য ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : কাব্য : সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রধান দুই ভাগ

অনুকরণবৃত্তি মানুষের সহজাত, জীবের মধ্যে মানুষেরই এ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। অনুকৃত বিষয় দেখে আমরা আনন্দ পাই, এমনকি লৌকিক জগতে যা বেদনা দেয় সে সব কার্যকলাপের অনুকরণও আমাদের আনন্দ দেয়। কারণ সেটি দেখা না থাকলে নতুন করে জানার জন্য আনন্দ হবে, আর যদি দেখা থাকেও, তবে তা কত ভালোভাবে নির্মিত, কতটা সুন্দর, এসবের ভাবনাই আনন্দ দেবে। অনুকরণের মতোই সংগতি আর ছন্দবোধও আমাদের সহজাত। এই সহজাত বৃত্তি থেকেই কাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই কাব্যেরও প্রধান দুটি ভাগ হয়—গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোকের মহৎ ঘটনা নিয়ে লেখা কাব্য এবং লঘু প্রকৃতির লোকের নীচ জাতীয় কার্যকলাপ নিয়ে লেখা কাব্য। প্রথম ধরনের কাব্যের উদাহরণ হোমারের রচনা, ট্র্যাজেডিও একই ধরনের রচনা। দ্বিতীয় ধরনের রচনা ব্যঙ্গ কবিতা ; নাটকের মধ্যে কমেডির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য।

এরপর ট্র্যাজেডির বিবর্তন নিয়ে কিছু তথ্য আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কমেডির উৎপত্তি এবং ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের সঙ্গে তার তুলনা

কমেডি নিম্নশ্রেণীর মানুষের অনুকরণ করে। নিম্ন বলতে বোঝায় হাস্যসম্পদ বা ludicrous আর হাস্যসম্পদ বলতে বোঝায় চরিত্রের একটা ত্রুটি বা অসংগতি (যেটা কমেডিতে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখানো হবে), কিন্তু অপরের পক্ষে যা ক্ষতিকারক নয়।

এরপর আছে কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস।

মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির মিল এখানে যে উভয়েই উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের অনুকরণ, অমিল রীতির

দিকে—একটি বর্ণনাত্মক, অন্যটি তা নয়। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য বেশি, ট্র্যাজেডি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (সূর্যের একটি আবর্তনের মধ্যে) সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। মহাকাব্যের সব উপাদান ট্র্যাজেডিতে আছে, ট্র্যাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যে নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও উপাদান

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন, বলেছেন তা গুরুগম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তনের, ভাষায় সব রকমের অলংকার থাকবে, রীতি কার্যাত্মক এবং উদ্দেশ্য আবেগের শোষণ করে করুণ ও ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করা।

সংজ্ঞার প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন অ্যারিস্টটল।

প্রত্যেক ট্র্যাজেডির ছ'টি অংশ আছে—বৃত্ত, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্য এবং গান। অর্থাৎ দুটি হল অনুকরণের মাধ্যম, একটি রীতি, তিনটি অনুকরণের বিষয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বৃত্ত বা কাহিনী। মানুষের জীবন বিভিন্ন কাজে কর্মেই প্রকাশিত হয়, কাজেই নাট্যঘটনার গুরুত্ব নাটকে খুব বেশি। তারপরই চরিত্র, কারণ চরিত্রই গুণের আধার। ট্র্যাজেডির জীবন এবং আত্মা যদি হয় কাহিনী বা বৃত্ত, তবে চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়। তৃতীয় হচ্ছে চিন্তা অর্থাৎ কী বলা হবে, কী বলা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগত হবে, তা ভেবে ঠিক করে নেওয়া। চতুর্থ হচ্ছে বাচন—শব্দের মধ্য দিয়ে চিন্তার প্রকাশ। গদ্য ও পদ্য দুই মাধ্যমই এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাকি দুটির মধ্যে সংগীতের শৈল্পিক মূল্য সবচেয়ে কম। আলংকারিক প্রয়োজনেই সংগীত ব্যবহার করা হয়। দৃশ্যসজ্জা নাটকের অভিনেয়তা এবং দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই বেশি দরকার।

সপ্তম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : আয়তন

বৃত্তের আদর্শ গঠন নির্ণয় করতে চেয়েছেন। প্রথমত তার আদি, মধ্য ও অন্ত থাকবে। আদি বলতে বোঝায় যা অন্য কোনো কিছু কারণ থেকে আসেনি, অন্ত বলতে বুঝি যার পর আর কোনো প্রশ্ন (আকাঙ্ক্ষা) থাকে না, মধ্য বলতে বোঝায় যা কোনোকিছুর পরবর্তী এবং কোনোকিছুর পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় কথা, তার মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য থাকতে হবে, নইলে তা সুন্দর হবে না। সজীব দেহের মতোই হতে হবে তাকে। সম্ভাব্যতার সীমা থেকে সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখাতে হবে।

অষ্টম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : ঐক্য

বৃত্ত বা কাহিনীর ঐক্য বলতে আমরা ঠিক কাজের ঐক্য মনে করি না, কারণ মানুষের জীবনে নানা রকমের কাজ থাকে। আসলে বৃত্তের ঐক্য বলতে বোঝায় কাহিনীর মূল ক্রিয়াগুলি হবে একমুখী। এটা সবচেয়ে ভালোভাবে করেছেন হোমার। তিনি 'অডিসি' রচনা করতে গিয়ে অডিসিউসের সমস্ত অভিযোগের কাহিনী

তাঁর কাব্যে, অন্তর্ভুক্ত করে নেননি। যেসব ঘটনায় কোনো অনিবার্যতা নেই তাদের তিনি বর্জন করেছেন ঘটনাগত ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে।

নবম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : কাহিনী সম্ভাব্যতা

কবি কীরকম ঘটনার বিবরণ দেবেন ? যা ঘটে গিয়েছে সবই তাঁর বর্ণনার বিষয় হবে না, যার সম্ভাব্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আছে তাই তিনি শোনাবেন। সেই জন্যেই ইতিহাসের চেয়ে ঐতিহাসিক কাব্যের মূল্য বেশি—তা সামান্য (universal) এবং আরও দার্শনিক গুণসম্পন্ন।

সব রকম ঘটনার জন্য 'এপেইসোডিক' ঘটনাই সবচেয়ে বর্জনীয়, কারণ তার মধ্যে কোনোরকম বিশ্বাস্যতা থাকে না। শুধু কাহিনীর আয়তন বাড়াবার জন্য তাদের প্রয়োজন হয়। ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলি অবশ্য এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে করুণা ও ভীতি দর্শকের মনে সঞ্চার করে। কথাগুলি মনে রাখতে পারলে আদর্শ বৃত্ত গঠন করা সম্ভব হবে।

একক - ১৪

অনুকরণ তত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৪.১ অনুকরণ তত্ত্ব

৬.৪.১৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৪.১ : অনুকরণ তত্ত্ব

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুকরণ তত্ত্ব। অনুকরণ তত্ত্ব কথাটি গ্রিক সাহিত্যে তাঁর আগেও অবশ্য প্রচলিত ছিল, তাঁর গুরু প্লেটোও অনুকরণ অর্থেই mimesis শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Art is imitation mimesis'। কিন্তু mimesis শব্দটিকে প্লেটো যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অ্যারিস্টটল সে অর্থে প্রয়োগ করেননি। প্লেটোর কাছে এই 'অনুকরণ' ছিল একটা ভাববাদী ধারণা মাত্র, অ্যারিস্টটল তাকে বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তুলনা না করলে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য বোঝা যাবে না, তাই সেটাই আগে করা যাক।

প্লেটো মনে করতেন আমরা চোখের সামনে যে পৃথিবী দেখছি সেটা একটা অনুকরণ মাত্র, আসল বা 'আইডিয়াল' পৃথিবীর ধারণা রয়েছে ঈশ্বরের মনে। কবিরা সেই 'আইডিয়ালের' যে অনুকরণ চোখে দেখতে পান, তার আবার একটা অনুকরণ করেন। সেইজন্যই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের তিনি নির্বাসিত করতে চেয়েছেন—কবিরা নকলের আবার নকল করে সত্য থেকে অনেকটা দূরে চলে যান।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর সেই 'আইডিয়াল'কে স্বীকার করেননি, দৃশ্যমান জগৎকেই তিনি আসল মনে করেছেন। কবিরা এই সৃষ্টির অনুকরণ করতে গিয়ে আর একটা নতুন সৃষ্টি করে ফেলেন, যা আমাদের আনন্দ দেয়। সুতরাং কবিদের তিনি কোনো মতেই নিন্দার যোগ্য মনে করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো মনে করতেন কেবলমাত্র সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই কবির কর্তব্য, অসুন্দর বস্তুর অনুকরণ করলে তাঁরা নিজেদের মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ধারণাকেও

সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন যা আপাত-অসুন্দর তাও কবির হাতে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই কারণে কেবল সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই শিল্পীর কাজ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভাববাদী ধারণা বর্জন করে শিল্পকলার আলোচনাকে অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর আগে শিল্প সম্বন্ধে অনেক ভাববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি করার জন্য আলাদা রকমের প্রতিভার দরকার হয় ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল এই সমস্ত ভাববাদকে নস্যাৎ করে, বলতে চাইলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই অনুকরণ করবার একটা প্রবণতা আছে, মানুষের এই ক্ষমতা সর্বাধিক—সে অনুকরণ করতে চায় এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে ভালো অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই সাহিত্য-শিল্পাদির জন্ম, কোনো বিশেষ প্রতিভা বা প্রেরণা থেকে নয়। একেই বলা হয় অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব বা mimesis theory। এই তত্ত্বটিকেই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝা যায় এই একই অনুকরণ প্রবণতা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্ম দেয় এবং বড় শিল্পী ও মাঝারি শিল্পীর তফাত করে দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, অনুকরণ প্রবণতা শিল্পের জন্মদাতা হলেও এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পের তফাত হয়ে যায় তিনটি ব্যাপারে—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। অনুকরণের বিষয় প্রকৃতি হলে তা চিত্রশিল্পের জন্ম দেয়, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিষয় মানুষের মনোভাব বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলে তা নৃত্যের জন্ম দেয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানুষ প্রধান বিষয় হলে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। মাধ্যমের পার্থক্য গুলিও লক্ষ করবার মতো—চিত্রশিল্পের মাধ্যম রঙ ও তুলি, নৃত্যের মাধ্যম দেহভঙ্গিমা, ভাস্কর্যের মাধ্যম ও উপাদান পাথর, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, উপাদান কাগজ, কলম। রীতি পাল্টালেও শিল্পের প্রকৃতি পাল্টে যায়। সাহিত্য শিল্পেও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয়।

এবার অনুকরণ তত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্লেটো যে অনুকরণের কথা বলেছেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবে imitate করা, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—যেমন দেখছ তেমন নকল করো। সত্যের অনুকরণকে বলেছেন eikastike, তা গ্রহণীয় ; মিথ্যার অনুকরণকে বলেছেন phantastike, তা বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু mimesis-এর দ্বারা বিশুদ্ধ নকলকে বোঝাতে চাননি। 'মিটিওরলজি' গ্রন্থে বলেছেন, অনুকরণ ঠিক নয়—শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, 'পলিটিক্সে' বললেন, প্রকৃতির অপূর্ণতা শিল্প পূর্ণ করে, 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প আর প্রকৃতি হচ্ছে দুই উদ্দীপক শক্তি—প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের তাগিদ, শিল্পের প্রবর্তনা রয়েছে শিল্পীর হৃদয়ে। 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে তিনি বললেন, কাব্য মানুষ ও মানবিক আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তা যান্ত্রিক অনুকরণ মোটেই নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। বাইওয়াটারের অনুবাদে তা এইভাবে বলা হয়েছে—'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight.' আদর্শায়িত অনুকরণ কী, তা জানতে গেলে universal element বা জীবনের সামগ্রিক সত্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে।

মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে সেই সমগ্র ঘটনা তুলে ধরলেই তা সামগ্রিক ঘটনা হয় না, এবং তা তুলে ধরা সম্ভবও নয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সব যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই বলেননি, অথচ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কেমন করে হল এটা ! তাহলে universal বলতে কী বোঝান অ্যারিস্টটল, সেটা বাইওয়াটারের অনুবাদ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদে পাই—'By the universal I mean how a person of certain type on occation speak or act according to the law of probability or necessity.' অর্থাৎ কিনা এক বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভাব্যতার বিষয় ভেবে যে আচরণ করে, তাই হল universal । সম্ভাব্যতার নিয়ম অবশ্য পদার্থশাস্ত্রের বিষয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি চরিত্রের বিশেষ পরিস্থিতির আচরণ যদি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাহলেই তার মধ্যে থাকে একটা শাশ্বত সত্য যাকে আমরা বলি universal বা সার্বজনীন বা সামগ্রিক সত্য। এটাকেই অ্যারিস্টটল যখন বড় করে দেখছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি অনুকরণকে তিনি নিছক 'নকল' হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন এক শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে। কবি কেবল অনুকরণ করেন না, জীবনের শাশ্বত সত্যে পৌঁছবার জন্য তাকে একটি পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেন মাত্র।

কবি যে অসুন্দর ও কুৎসিত ঘটনাকেও অবলম্বন ও অনুকরণ করতে পারেন—মানে প্লেটো 'phantastike' বলে যে অনুকরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তকেও যে মোটেই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল, তার কারণও ওই সম্ভাব্যতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলবার কাজে যদি তা সহায়তা করে তবে জীবনের অসুন্দর বৃত্তিগুলির অনুকরণও কবি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

বস্তুত প্লেটোর mimesis এবং অ্যারিস্টটলের mimesis-এর মধ্যে মিল শুধু কাজে, দুজনের ধারণায় আছে বিরাট তফাত। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে তিনি গুরুর সংজ্ঞা থেকেই শুরু করেছেন এবং সে কারণে অনুকরণ দিয়েই তাকে আলোচনা আরম্ভ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুকরণের মধ্যে গ্রহণ, বর্জন, পরিশোধন ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়াগুলি আছে—কবি কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের নকল করেন, এ কথা তিনি বলেননি। জীবনের এক সামগ্রিক রূপ নির্মাণের অবলম্বন হচ্ছে অনুকরণ, এই হল তাঁর অভিমত এবং তাঁর অনুকরণ তত্ত্বে আমরা পাই একই সঙ্গে শিল্পীর প্রচুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা।

একক - ১৫

কমেডি

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৫.১ কমেডি

৬.৪.১৫.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৫.১ : কমেডি : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

অ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনায় ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কমেডি নিয়ে কোনো পৃথক অধ্যায় তিনি রচনা করেননি। বাইওয়াটারের অনুবাদের ভূমিকায় অবশ্য গিলবার্ট মারে বলেছেন অ্যারিস্টটলের এই গ্রন্থের দুটি খণ্ড ছিল, যার প্রথম খণ্ডই শুধু আমাদের হাতে এসেছে, দ্বিতীয় খণ্ডে নাকি

কমেডির বিস্তৃত আলোচনা ছিল। কিন্তু যা হাতে পাইনি সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। প্রথম খণ্ড থেকে মনে হয়, কমেডিকে তিনি অন্তত ট্র্যাজেডির মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তবে বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি কমেডি সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, তা থেকে কমেডির প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমরা বুঝতে পারি এবং এর কী সংজ্ঞা তিনি নির্ধারণ করতে চান, তাও অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

অ্যারিস্টটল কমেডির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাননি, কাজেই ঠিক কখন এক বিশেষ ধরনের নাট্যকলা হিসাবে কমেডি আত্মপ্রকাশ করেছে তা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। 'কমেডি' শব্দের উৎপত্তি গ্রিক ভাষায়, এর ধাতুগত অর্থ আমোদকারীর গান। ডোরীয়দের দাবি, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি দুয়েরই আবিষ্কর্তা তারা। গ্রিসের মেগারীয়রা বলেন কমেডির শিল্পরূপ নাকি তাঁদেরই উদ্ভাবনা। আবার সিসিলির মেগারীয়রা বলেন তাঁদের পাশের গ্রামের নাম 'কোমাই', পুরো নাম 'কোমাইজেন' থেকেও কমেডিয়ান শব্দটি আসা সম্ভব। প্রাচীন কমেডি রচয়িতা এপিকারসাস যখন নিজে ছিলেন সিসিলির লোক এবং মেগারীয়, তখন তাঁদের এ দাবি সত্য হতেও পারে। কমেডির উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, এর সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত এবার জেনে রাখা যাক।

পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের একেবারে গোড়াতেই অ্যারিস্টটল কমেডির একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তাকে বিশ্লেষণ করলেই কমেডির প্রকৃতি সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মনোভাব ও ধারণা বুঝতে পারা যাবে। বাইওয়াটারের অনুবাদে এই সংজ্ঞা এই রকম : 'As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average ; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others.'

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা কমেডি জাতীয় নাটকের প্রকৃতিকে অনেক স্পষ্ট করে তুলতে পারে। এর আগে প্লেটো তাঁর 'ফিলেবাস' গ্রন্থে কমেডির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাকে এর চেয়ে অনেক নিম্ন ধরনের শিল্প বলেই মনে হয়েছিল। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় জীবন ও আচরণের কোনো একটা অসংগতি যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে, তখনই কমেডির আনন্দ মনে জাগে। এই অসংগতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অ্যারিস্টটল মোটেই বেদনাদায়ক বা ক্ষতিকর মনে করেননি।

আসলে পৃথিবীর সব মানুষই তো প্রতিভাবান বা সচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেন এমন স্থূলবুদ্ধি মানুষও আছেন। এই ভুল ধারণা থেকেই আচরণে বা কথাবার্তায় অসংগতি দেখা যায়। ক্ষমতাবান কমেডি লেখক এই আচরণকে ছোটখাট বিচ্যুতি বা কথাবার্তায় সামান্য অসংগতিকেই অতিরঞ্জিত করে দেখান। এই অতিরঞ্জনের উদ্দেশ্য তাঁকে হেয় করা নয়, দর্শকদের সঙ্গে নির্মল আনন্দ উপভোগ করা। এভাবে আনন্দ দেবার জন্যেই সম্ভবত আগে কমেডি নাটকের অভিনেতারা মুখে অদ্ভুত কিছু মুখোশ পরতেন। সার্কাসের ক্লাউনরা আজও মানুষকে হাসাবার জন্য মুখোশের ব্যবহার করেন।

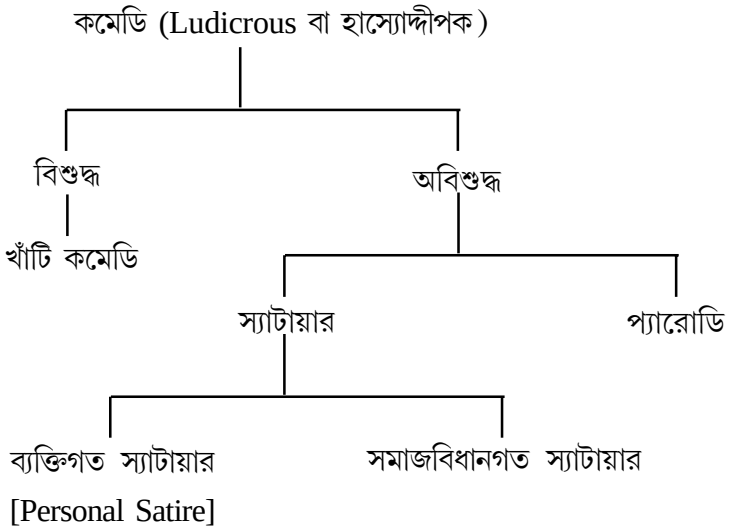
তবে দৈহিক অসংগতি বা বাহ্যিক অসংগতির চেয়ে চরিত্রগত অসংগতিই যে কমেডির প্রাণ, সেটা অ্যারিস্টটলের বিক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায়। কমেডির সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ে, কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়েই চরিত্রচিত্রণের রীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিক্যাল চরিত্রের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে চিত্রিত করা যায় তিন ভাবে—সে যেমন তার চেয়ে উন্নত রূপে, যথাযথ রূপে, অথবা সে যেমন তার চেয়ে একটু হেয় রূপ দিয়ে। এই তৃতীয় প্রকারের রূপদানই কমেডি-লেখকের বৈশিষ্ট্য। মানুষের বিকৃতি ও অসংগতি অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরে বলেই তাকে হেয় মনে হয়।

এখানে একটা অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেছেন অ্যারিস্টটল যা থেকে তাঁর চিন্তার গভীরতা আমরা বুঝতে পারি। চরিত্রের এই অসংগতিকে তিনি শুধু কমেডির বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেননি, তিনি বলেছেন এটি ট্র্যাজেডিরও বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার ঠিক কীভাবে এই অসংগতিকে দেখাচ্ছেন তার ওপরই নির্ভর করে এটি কী ধরনের নাটক হয়ে উঠবে। চরিত্রের অসংগতি যখন আমাদের মধ্যে দুঃখের উদ্রেক করে, করুণা ও ভীতি দ্বারা আমাদের অভিভূত করে ফেলে, তখনই জন্ম হয় ট্র্যাজেডির। পক্ষান্তরে এই অসংগতি যখন দুঃখের কারণ হয় না উপরন্তু আনন্দের খোরাক হয়, তখনই তা হাস্যরসাত্মক কমেডি হয়ে উঠতে পারে। ট্র্যাজেডি ও কমেডির তুলনা করতে গিয়ে কার্যত অ্যারিস্টটল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে এই শ্রেণীর নাটকের পার্থক্য সূচিত হয় অসংগতির মাত্রার ওপর।

কমেডির চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য অ্যারিস্টটল করেছেন, এবং তা কতখানি সত্য, আজ প্রত্যেকেই আমরা তা জানি। ব্যক্তিচরিত্রকে কমেডি-লেখকরা শ্রেণীচরিত্রে (অর্থাৎ type character-এ) পরিণত করে তোলেন। কিন্তু ট্র্যাজেডির লেখক চান ব্যক্তিকেই একটি শ্রেণীর প্রতিভূ করে তুলতে। কবে অ্যারিস্টটল এ কথা বলেছেন কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কমেডি রচয়িতাদের এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। কথাটি বাইওয়াটারের অনুবাদে এইভাবে আছে :

'Comedy tends to merge the individual in the type, tragedy manifests the type through the individual.'

অ্যারিস্টটল কমেডি নিয়ে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেননি বলে সেভাবে তার কোনো শ্রেণীবিভাগও করেননি। কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি কমেডি সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তার সাহায্যেই ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য একটি ছকের সাহায্যে এই শ্রেণীবিভাগ করে দেখিয়েছেন। সেটি এই রকম :



সমাজবিধানগত স্যাটায়ার বা Social Satire-এর নাম অ্যারিস্টটল কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু স্যাটায়ারের প্রকৃতিগত বিভাগ করতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলেছেন, তা থেকেই ড. ভট্টাচার্য নামটি গঠন করেছেন।

একক - ১৬

ট্রাজেডি

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৬.১ ট্রাজেডির সংজ্ঞা
৬.৪.১৬.২ ট্রাজেডির শ্রেণিবিচার
৬.৪.১৬.৩ ট্রাজেডির বিষয়বস্তু
৬.৪.১৬.৪ ট্রাজেডির উপাদান
৬.৪.১৬.৫ ট্রাজেডির নায়ক
৬.৪.১৬.৬ ট্রাজেডির মূল রস
৬.৪.১৬.৭ ক্যাথারসিস বা চিত্তশুদ্ধি
৬.৪.১৬.৮ মহাকাব্য: ট্রাজেডি সঙ্গে তার তুলনা
৬.৪.১৬.৯ ইতিহাস ও কাব্যের তুলনা
৬.৪.১৬.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
৬.৪.১৬.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৪.১৬.১ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

পোয়েটিক্‌স্ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রায় সম্পূর্ণ ট্র্যাজেডির আলোচনা। সেখানে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তা যে অভ্রান্ত আছে তাই শুধু নয়, ট্র্যাজেডি নিয়ে দীর্ঘকাল এত বিখ্যাত মানুষের এত সমৃদ্ধ আলোচনার পরও তার মূল্য এতটুকু কমেনি। আজও ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় সমস্ত পৃথিবীর সমালোচক এই সংজ্ঞাটিকে স্মরণ করেন।

বাংলায় সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি নাটককে আমরা বলে থাকি বিয়োগান্ত নাটক, কারণ প্রায়ই এই জাতীয় নাটকের শেষে একটি বিয়োগ বা মৃত্যুর ঘটনা থাকে। কিন্তু ট্র্যাজেডির পক্ষে মৃত্যু অপরিহার্য নয়, এবং মৃত্যু থাকলেই তা ট্র্যাজেডি হয় না। বাংলায় এই জাতীয় নাটককে বরং বিষাদান্ত নাটক বলা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব সমস্ত দিক বিচার করে কীভাবে তিনি এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

সংজ্ঞাটি বাইওয়াটারের অনুবাদে এইরকমভাবে পরিবেশিত হয়েছে :

‘A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its catharsis of such emotions.’

সংজ্ঞাটি বড়ো, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে ট্র্যাজেডির যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে তার কোনোটাই তাৎপর্যহীন নয়। যে লক্ষণগুলির কথা আছে, তার উল্লেখ করলেই সে কথা বুঝতে পারা যাবে—

(ক) ট্র্যাজেডি হবে বেশ গুরুগম্ভীর বা serious ঘটনার অনুকরণ।

(খ) ট্র্যাজেডির বেশ কিছুটা আয়তন থাকতে হবে (magnitude) এবং তাকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete in itself)।

(গ) ট্র্যাজেডির ভাষা হবে সমস্ত রকম কাব্যিক অলংকার যুক্ত এবং সেটা নাটকের একটা অংশে রাখলেই হবে না, নাটকের প্রত্যেক অংশেই সেই অলংকার এর ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) ঘটনাগুলির বর্ণনা গেলেই হবে না (not in a narrative form), সেগুলি দেখাতে হবে নাটকীয় রীতিতে, (dramatic form) অর্থাৎ ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে সেইভাবেই দেখাতে হবে।

(ঙ) নাট্যকাহিনী এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং সাজাতে হবে যাতে তা দেখে আমাদের মনে করুণা এবং ভীতি (pity and fear) জেগে ওঠে।

(চ) রস পরিণতিতে যেন এই দুই বৃত্তির শোধন বা পরিশুদ্ধি হয়, (catharsis) সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল তার বিষয়বস্তুর কথা (ক) মনে রেখেছেন, তার আঙ্গিক কেমন হবে (খ, গ) সে ব্যাপারে প্রত্যেকটি অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন, লক্ষ রেখেছেন তার নাটকীয়তার (ঘ) প্রতি, রস পরিণতির কথা (ঙ) ভেবেছেন এবং একেবারে ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল তাৎপর্যটিও (চ) ধরবার চেষ্টা করেছেন।

অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় যে-ক'টি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই বিস্তৃত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই সমালোচকগণ ও সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং তা সত্ত্বেও এমন প্রসঙ্গ আছে যেখানে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তার মীমাংসা আজও হয়নি। সুতরাং সেইসব সূক্ষ্মতায় না গিয়ে মোটামুটি ভাবে আমরা লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

(ক) ঘটনা নির্বাচনের ব্যাপারে নাট্যকারকে প্রথমেই সতর্ক হতে হবে। ঘটনার প্রকৃতি যদি গুরুগম্ভীর না হয় তবে সেই ঘটনা ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। কোনো লঘু ঘটনা দিয়ে ভালো ট্র্যাজেডি রচনা করা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে নাট্যকারকে অবহিত থাকতে হবে।

(খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলতে কী বোঝায় সে কথা অ্যারিস্টটল এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন— যে কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত আছে, অর্থাৎ প্রথম থেকেই যে নাট্যকাহিনীর সূচনা করা হচ্ছে এবং শেষ হবার পর আর কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা যেখানে থাকবে না, অর্থাৎ কোনো কাহিনীগত অতৃপ্তি নিয়ে নাটক শেষ হবে না।

(গ) অ্যারিস্টটল যেসব ট্র্যাজেডি দেখেছেন তাদের ভাষা জাঁকজমকপূর্ণ এবং আলংকারিক ছিল বলেই ভাষা তিনি সর্বত্র আলংকারিক হতে হবে বলেছেন। আসলে একটু উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্র বলেই সংলাপে তার উপযুক্ত ধ্বনিগাম্ভীর্য তিনি প্রত্যাশা করেছেন। যুগে যুগে এর ধারণা অবশ্য পালটায় এবং তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের আদর্শ অবলম্বন করেছে, এ কথা এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

(ঘ) নাটকের একেবারে মূল সত্যটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। নাটক বর্ণনামূলক কাব্য নয়, ঘটনামূলক কাব্য। কাজেই নাটক মাত্রেই ঘটনার বর্ণনার পরিবর্তে ক্রিয়াত্মক ঘটনার প্রত্যক্ষ উপস্থাপন বেশি কাম্য, বিশেষ করে ট্র্যাজেডিতে নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনার উপস্থাপন একেবারে অনিবার্য। সেভাবে উপস্থাপিত করতে না পারলে ট্র্যাজেডির প্রত্যাশিত সংবেদন নাটকে আমরা লাভ করতে পারব না।

(ঙ) Pity and fear বা করুণা ও ভীতি নামক দুটি মনোভাবের জাগরণ না ঘটলে যে ট্র্যাজেডির নাট্যকাহিনীর কোনো সার্থকতা থাকে না সে কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন এবং পরবর্তী প্রায় সমস্ত নাট্যতত্ত্ববিদ এ কথা সমর্থন করে নিয়েছেন। করুণা বা সহানুভূতি জাগতেই হবে, নইলে যার বিষাদান্ত পরিণতি নাটকে দেখানো হচ্ছে, সেই চরিত্রের প্রতি দর্শক সম-মনোভাবসম্পন্ন হতে পারেননি, এটাই বলতে হবে। ভীতিও অবশ্যই থাকবে, এবং সেটা এই কারণেই যে, একজন এই রকম উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনেই যদি এই বিষাদ নেমে আসতে পারে, আমরা কেউই তো তাহলে সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। তবে এই ভীতি (fear) যেন প্রবল মাত্রায় ভয়ঙ্কর (horror) হয়ে না ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(চ) Catharsis বা চিত্ত পরিশুদ্ধির ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এটাই ধরে নিতে পারি যে একটি মহৎ জীবনের বিষাদ দেখেও যে আমরা এক ধরনের আনন্দ লাভ করি, তার কারণই হল এই চিত্ত পরিশুদ্ধি। এটা হয় বলেই ট্র্যাজেডিও (অর্থাৎ বিষাদান্ত নাটক) আমাদের আনন্দ দেয়।

৬.৪.১৬.২ : ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিচার

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে কতরকমের ট্র্যাজেডি হতে পারে, সে আলোচনাও করেছেন। পরবর্তীকালে এই বিভাগের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকরকম সমালোচনা হয়েছে, সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাথমিক একটি শ্রেণীবিভাগ যে তিনি অনেক আগেই করে দিয়েছেন এবং আজও যে তা স্মরণ করার প্রয়োজন রয়েছে, এটাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি মোট চার প্রকারের—Complex বা জটিল, Pathetic বা বিষাদমূলক, Ethical বা নীতিমূলক এবং Simple বা সরল। তিনি ট্র্যাজেডির আলোচনায় 'Spectacular' শব্দটা গ্রিক ভাষায় অনেকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু লক্ষণীয় হল spectacular বা দর্শনীয় কোনো ট্র্যাজেডির শ্রেণী তিনি নির্দেশ করেননি।

বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি বলতে অ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি অর্থাৎ জটিল ট্র্যাজেডিকেই। ট্র্যাজেডির রসপরিণতিতে করুণা ও ভীতি নামক দুটি চিত্তবৃত্তি থাকে এ কথা তিনি আগে বলেছেন, কিন্তু জটিল ট্র্যাজেডিতে থাকে অধিকন্তু অদ্ভুত রস। প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে বিস্ময় নামক স্থায়ীভাব থেকেই অদ্ভুত রসের সৃষ্টি। ট্র্যাজেডি যাঁরা রচনা করেন তাঁদের বিস্ময় সৃষ্টি করার দুটি পন্থা আছে—পরিস্থিতি বিপর্যয় (ইংরেজিতে বললে Reversal of situation) এবং প্রত্যভিজ্ঞান (ইংরেজিতে বলা হয়েছে Recognition)। এই দুটি পন্থা কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বলেই এই ধরনের ট্র্যাজেডিতে 'awe and grandeur' থাকে বেশি, এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীর নাটককেই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সম্মান দেওয়া যায়। অ্যারিস্টটল এই ধরনের ট্র্যাজেডির সার্থক উদাহরণ মনে করেছেন 'ঈডিপাস দি রেক্স্'-কে। কারণ এখানে ভয় এবং করুণার সঙ্গেই বিস্ময় অসাধারণভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে। এদের মিলিত সংবেদন দর্শককে অভিভূত করে।

প্যাথেটিক বা বিষাদমূলক ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা ধরনের সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'প্যাথেটিক' এবং 'ট্র্যাজিক'। এই দুটি শব্দই মূলত একই জিনিস বোঝায়, কাজেই একটি শব্দ আর-একটি শব্দের শ্রেণী বোঝাতে পারে না। আবার অন্য কেউ-কেউ এমন কথা বলেছেন যে, যা প্যাথেটিক অর্থাৎ আমাদের চূড়ান্ত ভাবে বিষণ্ণ করে তোলে, তাকে ট্র্যাজেডি বলাই যায় না, কারণ ট্র্যাজেডি বিষাদান্ত হলেও তা দেখে আমরা আনন্দ পাই।

অ্যারিস্টটল নাটকের এই শ্রেণীটি নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন এবং সেগুলি থেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়। তবু আমরা নিজেরাই যদি এর উত্তর সন্ধান করতে চাই তাহলেও এর সমাধান খোঁজা কষ্টকর নয়। 'ট্র্যাজিক' একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংবেদন যার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক সংবেদন, 'প্যাথেটিক' তার একটা মাত্র। তাছাড়া অতিরিক্ত pathetic হলেই তার ট্র্যাজিক আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়, এ কথাও বোধহয় সত্য নয়। এর উদাহরণ সব সাহিত্যেই আছে—'নীল দর্পণ' বা 'ম্যাকবেথ', কিংবা এ কালের 'মাটির ঘর' (বিধায়ক ভট্টাচার্য)-ও তার উদাহরণ। অ্যারিস্টটল তাঁর সময়ের দুটি নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—Ajax এবং Ixion । 'Mad-brained error'-এর ফলে আয়াস যে দুর্নাম ও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হন, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও ভয়ংকর যে যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন, সেটাই প্রথম নাটকের বিষয়বস্তু। কিন্তু তা সত্ত্বেও—আয়াসের প্রচুর বিক্ষোভ ও বিলাপ থাকলেও (আমাদের মনে পড়তে পারে 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের বারংবার বিলাপ 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল') ট্র্যাজিক সংবেদনে তা বাধা দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আর একটি কথা। Pathetic নাটকের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে, অ্যারিস্টটল বলেছেন 'where the motive is passion'। সুতরাং passion বা চিত্তসংক্ষোভকে প্রাধান্য দেওয়াটাই যেখানে মুখ্য, সেখানে আবেগের কিছু বাড়াবাড়ি হতেই পারে। সে কারণে তার ট্র্যাজিক মর্যাদার হানি করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

ট্র্যাজেডির তৃতীয় শ্রেণীটিকে অ্যারিস্টটল বলেছেন, নীতিমূলক নাটক। এর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'where the motives are ethical'। নাম শুনেই বোঝা যাবে, এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে উপস্থাপিত হয় কোনো নৈতিক সমস্যা। এই নৈতিক সমস্যা অবশ্য কোনো নাটকীয় সংঘাত তৈরি করতে পারে কিনা, এর ফলে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিনা সেসব অবশ্য নাট্যকারকে ভেবে দেখতে হবে। নীতিমূলক ট্র্যাজেডিকে খুব সাধারণভাবে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে উচ্চ শ্রেণীর নাটক বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর নাটক থেকেই উদ্ভব ঘটেছে Tragedy of Character-এর, এ কথা স্মরণ রাখলে তার উৎস হিসাবে নীতিমূলক নাটককে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করতে পারি না। শুধু তাই নয়, এর পর ভাবমূলক নাটক, দিদরো যাকে বলেছেন Drama of ideas এবং আরও আধুনিক কালে সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্ভবের সঙ্গেও এই শ্রেণীটির একটা যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাব।

সরল ট্র্যাজেডি নামে যে শ্রেণীটি নির্দেশ করেছেন অ্যারিস্টটল, তার সারল্য বিষয়ে ততটা না, যতটা তার গঠনে। একটি সহজ সরল কাহিনীর একমাত্রিক বিন্যাসই এই ধরনের নাটকের বৈশিষ্ট্য। রসপরিণতির কথা ভেবে করুণা ও ভীতি উদ্রিক্ত করার আয়োজন এখানে থাকে, কিন্তু পরিস্থিতি বিপর্যয় বা প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা বিস্ময় সৃষ্টির চেষ্টাও যেমন এখানে থাকে না, তেমনি থাকে না জটিল নাটকের বর্ণাঢ্যতা ও ঘটনার ঘনঘটা, যাকে পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে বলা হয়েছে 'awe and grandeur'। সব সময় ঘটনাধারার মধ্যে সম্ভাব্যতাও হয়তো বজায় রাখার দিকে সতর্ক থাকেন না নাট্যকার, তা সত্ত্বেও এরকম নাটক কিন্তু দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

ট্র্যাজেডি নাটকের নানারকম শ্রেণীর কথা পরবর্তী নাট্যতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, কিন্তু প্রাথমিক যে শ্রেণীবিভাগটি অ্যারিস্টটল করে দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব ও মূল্য আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারি না।

৬.৪.১৬.৩ ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু

ট্র্যাজেডি ঠিক কী ধরনের নাটক, সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট থাকলেই বোঝা যায়, এর বিষয়বস্তু কী রকম হবে। ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ এখন পর্যন্ত লেখা হয়েছে, কিন্তু খুব সামান্য কথায় ট্র্যাজেডির প্রকৃতি এবং তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা অ্যারিস্টটল তাঁর ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থটিতে দিয়েছিলেন, সেই কথাক'টির মূল্য এখনও স্বীকার করতে হচ্ছে প্রত্যেকটি নাট্যতত্ত্ববিদ্‌কে।

মাত্র দুটি শব্দে ট্র্যাজেডির প্রকৃতি পরিস্ফুট করেছিলেন অ্যারিস্টটল—অপ্রাপনীয় ভাগ্যবিপর্যয়, বা unmerited misfortune। ট্র্যাজেডি কোনো এক ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এবং সেই ভাগ্যবিপর্যয়কে হতে হবে অবশ্যই অপ্রাপনীয় যা তার অদৃষ্টে ঘটবার কথা নয়। কোনো নরঘাতক পাষণ্ড বা অপরাধীর ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয় না, দুই শত্রুর মধ্যে সংগ্রামে যখন একজন আহত বা নিহত হন, তাকেও অভাবনীয় বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যার জীবনে এমন শোচনীয় আঘাত বা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, এমনটা মনেই করা যায় না, তার জীবনেও যখন চরম বিপর্যয় আমরা চোখের সামনে দেখি তখনই ঘটে সেই রসসংবেদন যাকে বলে ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দিষ্ট রসাবেদন—'the circumstances which strike us terrible or pitiful'।

ভাগ্যবিপর্যয় অপ্রত্যাশিত কখন হয় তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন ভাই যখন ভাইকে হত্যা করে, পুত্র যখন পিতাকে বা পুত্র মাতাকে হত্যা করবার নেশায় মেতে ওঠে, কিংবা এইরকমই অতি প্রিয় দুটি মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রবল চক্রান্ত করতে থাকে এবং পরিশেষে সফল হয় তখন একজনের ভাগ্যবিপর্যয় হয়ে ওঠে শোচনীয় এবং একান্তভাবেই অপ্রাপনীয়। ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যিনি সন্ধান করবেন তাঁকে এই ধরনের ঘটনাই অবলম্বন করতে হবে নাট্যকাহিনীর জন্য।

ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু হিসাবে এই ধরনের ঘটনাকেই উপজীব্য মনে করেন অ্যারিস্টটল, কারণ এইরকম সব পরিস্থিতিতেই মানুষের শুভবোধ, কল্যাণবোধ, মূল্যবোধ এবং যাবতীয় কোমল বৃত্তি আলোড়িত হবার সুযোগ পায়। মানুষ যেখানে সামান্য উপলক্ষের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অতি তুচ্ছ লাভের জন্য তার মানবিকতাকে বিসর্জন দেয়, সেখানেই তার প্রতি আমাদের চিত্তবিক্ষোভ হয় অত্যন্ত বেশি। আরও একটি ব্যাপার এখানে আছে, মানুষ যখন তার মানবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে তখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগবেই। নাট্যকার সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করার সুযোগটিও কাজে লাগাতে পারেন। অর্থাৎ যে মানুষের বিরুদ্ধে কিছু করা হল, যিনি ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন তিনি তো ট্র্যাজেডি লেখকের উপজীব্য চরিত্র হলেন বটেই, কিন্তু যে মানুষ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে নিজের বিবেক এবং শুভবোধ বিসর্জন দিয়ে বসল সেই ট্র্যাজেডি-নাট্যকারের কাছে কম আকর্ষণীয় চরিত্র নয়।

এই সূত্র ধরেই অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডির উপস্থাপনের বিষয় বা প্রধান উপজীব্য হল সেই সব মানুষের কাহিনী—'who have done or suffered something terrible'। লক্ষ করতে হবে, শুধু যাঁরা 'something terrible' সহ্য করেছেন কেবল তাঁরাই নন, যাঁরা সেই ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন তাঁরাও সমানভাবে ট্র্যাজেডির উপাদান। মানুষ তার অন্ধ প্রবৃত্তির বশে, নিজের কোনো অভীষ্ট বস্তু লাভ করবার জন্য, অথবা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যখন মানবিক অনুভূতির গলা টিপে মেরে একটা অন্যায় কাজ করতে তৎপর হয়ে ওঠে, তখন something terrible ঘটাবার জন্য সে হয়ে ওঠে নাট্যকারের প্রধান আকর্ষণের চরিত্র। তাকে নাট্যকার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন 'for doing something terrible'। আবার যখন কোনো মানুষ এই রকম কোনো চক্রান্তের শিকার হয় ; পরিবেশের সঙ্গে, অন্য মানুষের সঙ্গে, নিজের আদর্শের বা ভাবের

সঙ্গেও বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়—অথচ বার বার আঘাত পেয়েও সে দমিত হয় না, ভেঙে পড়ে না, শেষ পর্যন্ত মানসিক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়ে যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলিকে সে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য হয় শোচনীয় এক ভাগ্যবিপর্যয়, তখন তার এই মহৎ প্রতিরোধকে বলা যায় 'suffering something terrible'। কাজেই রোমহর্ষক কিছু কাজকর্ম বা অমানবিক ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে তুলবার কারণেও যেমন ট্র্যাজিক চরিত্র হওয়া যায়, একের পর এক অমানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিহত করার মানসিক সামর্থ্যেও হওয়া যায় উপযুক্ত ট্র্যাজিক কারণ। দুজনকেই ট্র্যাজেডি রচয়িতা তাঁর নাটকের উপাদান বা আকর্ষণীয় অবলম্বন হিসাবে বেছে নিতে পারেন।

তবে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতেই এর বিষয়বস্তু হিসাবে অ্যারিস্টটলের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—'action that is serious', অর্থাৎ বিষয়বস্তুটিতে যথেষ্ট গুরুগম্ভীর এবং ওজনদার হতে হবে, কোনো লঘু ঘটনা বা তরল চরিত্রকে ট্র্যাজেডির ঘটনা বা অবলম্বন হিসাবে বেছে নেওয়া চলবে না। সেরকম ভুল যদি কোনো নাট্যকার করেন তাহলে মহৎ নাট্যপ্রতিভা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হবে না। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের এই নির্দেশ মানা হয়নি এবং ট্র্যাজেডি হিসাবে সমর্থ নাট্যকারের রচনাও দুর্বল সৃষ্টি হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে আমরা অনেক পেয়েছি।

৬.৪.১৬.৪ ট্র্যাজেডির উপাদান

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির উপাদান নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন এবং তাদের পারস্পরিক গুরুত্বের কথাও বলেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার উল্লেখ করার আগে অ্যারিস্টটলের নির্দেশ এবং তাঁর যুক্তিগুলির পরিচয় আমরা গ্রহণ করব।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির উপাদান ছ'টি—কাহিনী বা বৃত্ত (Fable or Plot), চরিত্র (Character) , বাচন (Diction), মনন (Thought), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle), এবং সংগীত (Music)। এগুলি বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন এবং কাকে উপাদান হিসাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সে সব কথাও বলেছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করেই একে একে উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করছি। তারপর গুরুত্ব প্রশ্নটি বিচার্য।

প্রথম উপাদানটিকে Fable or Plot বললেও বৃত্ত বলতে অ্যারিস্টটল যে ট্র্যাজেডির কাহিনী অংশকেই বোঝেন, অথবা কাহিনীর কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত বিন্যাস, এটি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কারণ তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'The Fable, in our present sense of the term is simply this, the combination of the incidents, or things done in the story ;' নাটকে ঘটনা বলতে বোঝায় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যা প্রদর্শিত হয়। সুতরাং কাহিনী হচ্ছে ক্রিয়াসমূহের দ্বারা প্রকাশিত তথ্যাবলী।

চরিত্র বলতে অ্যারিস্টটল বোঝেন নাটকের কাহিনীকে উপস্থাপন করবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নৈতিক গুণসম্পন্ন কিছু মানুষ। তাদের আচার-আচরণ এবং সংলাপের দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। তাঁর বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদ এইরকম—'Character is what makes us ascribe certain moral qualities to the agents.'

বাচন বলতে অ্যারিস্টটল খুব সাধারণ অর্থেই বোঝেন নাটকটি কীরকম ভাষায় লেখা হল। ছটি উপাদানের কোনটি বিষয় আর কোনটি অঙ্গসংক্রান্ত, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তাতেই এটা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—'two of them arising from the means, one from the manner, and three from the objects of dramatic imitation.' অর্থাৎ 'বাচন' হল 'manner of dramatic imitation.' আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন এক জায়গায়—'by Diction I mean merely this, the composition of the verses ;'

মনন বা Thought বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন তা তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্পষ্ট হয়নি। মনন পদ্ধতি তো সমস্ত নাটকেই পরিব্যপ্ত থাকে—যেমন কাহিনী গ্রন্থনে, তেমনি চরিত্র সম্বন্ধে বোধে, আবার তার অঙ্গ সম্পদে বা বাচনেও। একে আলাদা করে ভাবার তেমন কিছু আছে কিনা বলা শক্ত। আবার আধুনিক ধারণা অনুসারে বলতে হবে, এটিই তো নাটকের সর্বস্ব। বিশেষত বার্নার্ড শ যেমন বলেছিলেন, নাটক মানে কেবল আলোচনা, আলোচনা এবং আলোচনা—তখন মননকেই তো আধিপত্য করতে দেওয়ার কথা তিনি বলেন। অ্যারিস্টটল আলাদা করে মনন বলতে কী বলতে চেয়েছেন এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, সমগ্র নাটক চরিত্র ও চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে যে সত্যে উপনীত হতে চায় তাই মনন।

নাটক যেহেতু দৃশ্যাত্মক শিল্প, সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য, দৃশ্যাত্মক ব্যাপারটিকে গুরুত্বহীন বলা চলে না। তবে শৈল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে এর যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, অ্যারিস্টটল সে কথাই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন, দৃশ্যাসজ্জা ব্যাপারটা 'Connected least with the art of poetry..... the production of spectacular effects depends more on the art of stage machinist than on that of poet.' তাই যদি হয়, অর্থাৎ মঞ্চ নির্মাণ শিল্পীর ওপরই যদি বর্তায় দৃশ্যসম্পদ ব্যাপারটা, শৈল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে যদি তার বিশেষ যোগই না থাকে, তাহলে ট্রাজেডির দু'টি উপাদানের মধ্যে অ্যারিস্টটল তাকে ধরলেন কেন! তা যে ধরতে হবে, সেটাও তিনি বলেছেন, এর যত কম গুরুত্বই থাক না কেন—'the spectacle (or stage appearance of the actor) must be some part of the whole.

ষষ্ঠ উপদান সংগীত সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বিশেষ কোনো মন্তব্যই করেননি, কারণ তাঁর সময় নাটকে সংগীতের ব্যবহার ছিল প্রচুর। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ সংগীতই এক সময় নাটকে প্রায় একচ্ছত্র স্থান অধিকার করেছিল। সেই কারণেই অ্যারিস্টটল শুধু বলেছেন, 'by Melody what is too completely understood to require explanation'. আজ অবশ্য ট্র্যাজেডির সঙ্গে সংগীতের সেই অপরিহার্যতার সম্বন্ধ নেই।

নাটকের দু'টি উপাদানের মধ্যে অ্যারিস্টটল কোনটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবার সেই প্রসঙ্গ। অ্যারিস্টটল সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন কাহিনীর ওপর। এই নিয়ে পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক সমালোচনা করেছেন—কেউ তাঁকে সমর্থন করেছেন, কেউ সম্পূর্ণ ভিন্ন মতই পোষণ করেছেন, কিন্তু সে আলোচনার এখন দরকার নেই, আমরা অ্যারিস্টটলের মন্তব্যগুলিই জেনে রাখব।

অ্যারিস্টটল এ বিষয় যা বলেছেন সেটি আমরা এই অংশটির অনুবাদ করে, বাংলায় সাজিয়ে দিলাম :

'এই দু'টির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কাহিনীর ঘটনাবলীর সংঘটন। ট্র্যাজেডি বলতে ব্যক্তির অনুকরণ বোঝায় না, বোঝায় ক্রিয়া এবং জীবনের অনুকরণ—সুখ এবং দুর্ভাগ্যের অনুসরণ। মানুষের যাবতীয় সুখ ও ভাগ্যবিপর্যয় ক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় এবং তার পরিণতি হচ্ছে একটা কার্যপদ্ধতি, কেবলমাত্র গুণ নয়। চরিত্র মানুষের অনেক গুণের আধার, একথা ঠিক, কিছু মানুষ কষ্টাদির মাধ্যমেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে—অর্থাৎ কিনা যেসব কাজ সে করে।'

অ্যারিস্টটলের যুক্তি বোঝা কষ্টকর নয়। ট্র্যাজেডিতে মানুষের জীবনের একটা, রূপ আমরা দেখতে চাই, সেই রূপ ঘটনার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। নাট্যকার যে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করেন সেটা ঘটনা এবং কার্যের বিন্যাস সজ্জিত করেছে। এই বিন্যাসের ওপরই নির্ভর করে চরিত্রেরও গড়ে ওঠা। কাজেই আগে ঘটনার সজ্জার ওপর যত্নবান হতে হবে নাট্যকারকে, চরিত্রের গুরুত্ব তারপর।

চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে, কাহিনী নির্মাণের গুরুত্ব যে অনেক বেশি, একথা বোঝবার জন্য অ্যারিস্টটল আরও কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন, যেমন—

এক ॥ খুব সূক্ষ্ম চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা না থাকলেও ভালো ট্রাজেডি রচনা করা সম্ভব, কিন্তু বৃত্তের গঠন যদি দুর্বল হয় তাহলে মহৎ ট্রাজেডি গড়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

দুই ॥ এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে চরিত্রগুলি সুচারু রূপেই ফুটে উঠেছে—সংলাপও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সুরচিত, অথচ সমগ্র নাটকটি দেখে যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন জেগে উঠল না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঘটনাসজ্জায় সঠিক দক্ষতা নাট্যকার দেখাতে পারেননি। যদি এর উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ ঘটনাসজ্জার সার্মথ্য নাট্যকারের আছে, কিন্তু চরিত্র নির্মাণের কৌশল তাঁর ঠিকমতো জানা নেই, এসব সংলাপ রচনা করার ব্যাপারেও একটু দুর্বলতা আছে—তাহলেও কিন্তু দেখা যাবে নাটক রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

তিন ॥ কমবয়সি নাট্যকাররা সংলাপ অত্যন্ত ভালো রচনা করতে পারে, চরিত্রচিত্রণের সামর্থ্যও তাদের কম নেই, কিছু নাটকের ঈপ্সিত রসাবেদন তারা জাগাতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে বৃত্তগঠনে তাদের ব্যর্থতা।

৬.৪.১৬.৫ . ট্র্যাজেডির নায়ক

ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র ঠিক কেমন হবে, এ বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ অনেক মন্তব্য করেছেন অ্যারিস্টটল। প্রায় সূত্রাকারে তিনি নায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। দীর্ঘদিন আগেকার এই নির্দেশ আজও সমানভাবে মানা হবে, অথবা নাট্যতত্ত্ববিদরা তার কোনো সমালোচনা করবেন না, এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে যে আদর্শ ধরা পড়েছে তার ফলেও এ ধারণা কিছু পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সেই সমালোচনার মধ্যে না গিয়ে সূত্রাকারে অ্যারিস্টটলের নির্দেশগুলি এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। পরে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে।

এক ।। মানুষকে পরিস্ফুট করার তিনটি উপায় কবিদের কাছে আছে—সে যেমন তাকে তার চেয়ে উন্নত রূপে দেখানো, সে যেমন ঠিক সেইভাবেই তাকে দেখানো এবং সে যেমন তার চেয়ে হীনভাবে তাকে দেখানো। ট্রাজেডিতে আমরা দেখাই প্রথম উপায়ে অর্থাৎ সে যেমন তার চেয়ে উন্নত রূপে, কারণ জীবনের গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনে এই রূপায়ণই কাম্য।

দুই ।। ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন বিখ্যাত মানুষ এবং উন্নতিকামী। কীরকম সেটা অ্যারিস্টটল দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে জানিয়েছেন—'He must be one who is highly renowned and prosperous–a personage like Oedipus, Thyestes or other illustrious men of such familis.'

তিন ।। ট্র্যাজেডির নায়ক হবে প্রকৃতই সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ।

চার ।। শুধু উন্নতভাবে চিত্রিত করা নয়, ট্র্যাজেডির নায়কদের বস্তুতই হতে হবে উচ্চশ্রেণীর মানুষ। কমেডিতে যেমন সাধারণ অপেক্ষা নীচু স্তরের মানুষ বা lower type-কে বাছা হয়, ট্র্যাজেডিতে বেছে নেওয়া হয় সাধারণের চেয়ে উচ্চ স্তরের মানুষ বা higher type-এর মানুষকে।

পাঁচ ।। অত্যন্ত ভালো মানুষ (too good a man) অথবা প্রকৃতই কোনো ধার্মিক ব্যক্তি (virtuous man) ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ ঐরকম মানুষ্যের ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের মনে ঠিক ট্র্যাজিক সংবেদন আনেনা—আমাদের এইরকম ঘটনা অত্যন্ত আহত করে (shocks us)। এই বেদনার অনুভূতি ট্র্যাজেডির pity and fear-এর অনুভূতি থেকে পৃথক।

ছয় ।। অত্যন্ত মন্দ লোক (too bad a man) বা অত্যন্ত শয়তান একটা ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে না। ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল কথাটাই হল তাকে হতে হবে এমন একজনের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় যার পক্ষে সেটা আদৌ প্রাপ্য বলে আমরা মনে করতে পারি না। অত্যন্ত খারাপ

লোকের যদি শোচনীয় পরিণাম দেখানো হয়, আমাদের মনে হবে সেটাই তো তার প্রাপ্য, কাজেই ট্র্যাজেডির সংবেদন কখনই জাগাবে না।

সাত ।। ট্র্যাজেডির নায়ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন অ্যারিস্টটল যেটা শুধু ব্যাখ্যার যোগ্য যে, তাই নয়, গ্রিক ট্র্যাজেডি থেকে শুরু করে শেক্সপীরিয় ট্র্যাজেডি—এবং বলতে পারি আমাদের দিনের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। [বাইওয়াটারের ইংরেজি অনুবাদটা আগে বলি—"He falls from a positon of the lofty eminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to a great error] তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট সংবেদন আমরা লাভ করতে পারি কেবল আমাদের মতো মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় দেখলেই। অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়ক হবেন না-অতি ভালো না-অতি মন্দ, আমাদের মতোই মানুষ। তাঁর পতন বাইরে থেকে কেউ ঘটাবে না, কোনো 'vice or depravity'-র জন্য তাঁর সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে না, পতনের কারণ থাকবে তাঁরই চরিত্রের মধ্যে। কিসের কারণে তাঁর পতন ঘটতে পারে, এই কথাদুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ—হয় কোনো বিচার-বিভ্রমের (error of judgement) ফলে, অথবা অন্তর্নিহিত কোনও ত্রুটির (frailty) ফলে।

বিচার-বিভ্রম মানুষের ঘটতেই পারে এবং একটি সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত তার জীবন শোচনীয় করে তুলতে পারে। এ ঘটনা বহু আগেও যেমন ঘটেছে, আজকেও সে রকম ঘটতে পারে। অ্যারিস্টটল ঐতিহাসিক নাটক থেকে বা বিখ্যাত গ্রিক চরিত্র থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আজকের দিনে ভুল সিদ্ধান্ত মানুষকে কোন 'lofly eminence' থেকে কোন 'disaster-এ নামিয়ে আনতে পারে, তার অনেক ভালো উদারহণ পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় কথাটি হল frailty বা অন্তর্নিহিত ত্রুটি। এই ত্রুটিকে অনেক সময়ই ত্রুটি বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু একটা কথা আছে too much of everything is bad। অনেক সময় অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রীতি, অতিরিক্ত উচ্চাশা বা মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মানুষের পতন ডেকে নিয়ে আসতে পারে। ভ্রাতৃপ্রীতির এই প্রাবল্য যেমন জীবনে সর্বনাশ নিয়ে এসেছিল অ্যান্টিগোনের ('প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশেরও তাই হয়েছিল), উচ্চাশার প্রাবল্য শেষ করে দিয়েছিল ম্যাকবেথের মতো বীরকে, নির্বোধ আত্মবিশ্বাস পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্রাট জুলিয়াস সিজারের।

ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল যে মন্তব্যগুলি করেছেন তার শেষেরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সে আলোচনাই আমরা আগে করলাম। অন্যান্য মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে বলা যায়, ট্রাজেডির নায়ককে বিখ্যাত উন্নতিকামী হতে হবে বলে যে মন্তব্য তিনি করেছেন, সেটা করেছেন ঐতিহাসিক ট্রাজেডির কথা স্মরণ রেখেই। অন্যান্য শ্রেণীর নাটকের কথা চিন্তা করলে এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। নায়ক অতি ভালো হবেন কিনা, অতি মন্দ হলে চলবে না কিনা, এসব কথার উদ্দেশ্য আসলে এই কথা বলা যে, দোষেগুণে

তাঁকে হতে হবে রক্তমাংসের মানুষ—তা না হলে তাঁর পতনে আমরা করুণাও অনুভব করব না, তাঁর পরিণতি আমাদের মনে ভয়ও জাগাবে না।

ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনা অ্যারিস্টটল অন্যত্র যা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা ট্র্যাজেডির বিষয়ে একটি কথা সংযোজন করতে চাই। ট্র্যাজেডি যদি দু ভাবে হয়—spectacle of *doing* something terrible এবং spectacle of *suffering* something terrible, তাহলে নায়কও দুরকমই হতে পারে, এক, দুর্দান্ত কিছু করে এবং দুর্দান্ত কিছু সহ্য করে। অ্যারিস্টটল অন্যত্র দুরকম নায়কের কথা স্বীকার করেছেন—প্রথম প্রকারের নায়ককে বলেছেন active hero এবং দ্বিতীয় প্রকারের নায়ক acted upon (বা passive) hero. Passive নায়কের ক্ষেত্রেও একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্দম মানসিক বা শারীরিক আঘাত সহ্য করার শক্তি সে নায়কের থাকতে হবে, কারণ সহ্য করার মহত্ত্বেই তিনি নায়কের সম্মান পেতে পারেন। মানসিকভাবে যিনি পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন, আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাই যাঁর নেই, তিনি এ জাতীয় নায়ক হতে পারেন না।

৬.৪.১৬.৬ : ট্র্যাজেডির মূল রস

ট্র্যাজেডির মূল রস সংবেদন কী, এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি, তিনি স্পষ্টতই pity এবং fear এই দুটি অনুভূতির কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা মনে করেন মূল রস সংবেদন একটিই হতে পারে, দুটি নয়। সুতরাং আগে সন্ধান করা যাক কাজ দুটি কখন কীরকম তাৎপর্যে তিনি ব্যবহার করেছেন, তারপর এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা আমরা করব।

(ক) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে দুটি সংবেদনকেই অ্যারিস্টটল ঠিক একই রকম গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, নাট্যকারের লক্ষ্য—'incidents arousing pity and fear'.

(খ) ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বৃত্ত বলতে কী বোঝেন, অ্যারিস্টটল সে কথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে pity এবং fear-এর কথা একবার বলেছেন। কিন্তু লক্ষ করে দেখলে বোঝা যাবে, সেখানে তিনি দুটি সংবেদনকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন একই ভাবে, কিন্তু ট্র্যাজিক সংবেদন হিসাবে দুটিই প্রয়োজন এমন কথা বলেননি। সেখানে তাঁর বক্তব্য, হয় pity অথবা fear, দুটির মধ্যে একটি সংবেদন ট্র্যাজিক আবেদনের পক্ষে প্রয়োজন—'Tragedy is an imitation not only of a complete action, but of events inspiring fear or pity.'

(গ) পরিস্থিতি বিপর্যয় (peripety) প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জটিল বৃত্তের গঠনে তার কী ভূমিকা, এ বিষয়ে আলোচনায় অ্যারিস্টটল যেভাবে গোটা ব্যাপারটাকে উপস্থিত করেছেন তাতে স্পষ্ট

করে না বললেও ইঙ্গিত এমনই আছে যে দুটি সংবেদনের একটি থাকলেই বোধ হয় ট্র্যাজিক অনুভূতি জাগে—'This with a Peripety, will arouse EITHER pity or fear—actions of that nature being what Tragedy is assumed to represent.'

(ঘ) ট্র্যাজেডির নিখুঁত গঠন বিষয়ে আলোচনার সময় অবশ্য শব্দদুটিকে একই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অ্যারিস্টটল এবং তাঁর মন্তব্যের গতি থেকে বোঝা যায় দুটি সংবেদন একসঙ্গে সৃষ্টি করাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তিনি লিখেছেন—'it should, moreover, imitate actions which excite pity and fear, this being the distintive mark of tragic imitation'.

এবার আমাদের ধারণা আমরা নিবেদন করতে পারি। প্রথম কথা হল, fear বা ভয়ের অনুভূতি যে ট্র্যাজেডি দেখলেই আমাদের মনে জাগে, এ কথা অ্যারিস্টটল বারবারই বলেছেন। মানসিক উৎকণ্ঠা বা আতঙ্ক থেকেই এই হবেই সৃষ্টি হয়, কারণ এরকম একটু মানুষের জীবনেও এমন পরিণতি নেমে আসছে দেখলে ভয় আমাদের করেই। কিন্তু সম্পূর্ণ মনের ভেতর থেকে যদি ভয় না জাগে, বাইরে ভয়ংকর দৃশ্যসজ্জার দ্বারা যদি নাট্যকার দর্শককে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে তা যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, এ কথা তিনি লিখেছেন এইভাবে—'those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible, but only monstrous, are strongers to the purpose of tragedy'। কাজেই বোঝা যায়, fear সম্বন্ধে সামান্য হলেও কিছু কম গুরুত্বের ব্যাপারটা অ্যারিস্টটলের মনে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কথা, করুণা সম্বন্ধে এরকম কোনো সাবধানবাণী তিনি শোনাবার প্রয়োজন মনে করেননি। শুধুমাত্র 'ভয়' এই সংবেদন দিয়ে কোনো মহৎ ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। Horror stories-এর মতো Horror plays—হয়তো থাকতেও পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে চারটি বিভাগ করেছিলেন সেখানে ভীতিপ্রধান ট্র্যাজেডি বলে কোনো বিভাগ তিনি করেননি। জটিল প্লটের perfect tragedy-তে বরং এই দুই সংবেদনের সঙ্গে আর একটি সংবেদনের মিশ্রণের কথা তিনি বলেছেন—বিস্ময়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে যে-কোনো মহৎ ট্র্যাজেডিতেই এই বিস্ময়ের মিশ্রণ থাকে—'The element of the wonderful is required in Tragady'। কাজেই শুধু pity এবং fear কেন, তার সঙ্গে wonderful-ও ট্র্যাজেডি মাত্রেই থাকতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই তিনটিকেই আমরা বলতে পারি মনোভাব বা চিত্তবৃত্তি। সংস্কৃত আলংকারিরা যাদের 'রস' বলেন, এরা তা নয়। আমাদের মনে হয় এদের সম্মিলিত কাজ হল, মূল রসাবেদন জাগিয়ে তোলা এবং সেই অঙ্গীরসটি হল করুণ বা করুণা। অর্থাৎ মূল রসের সংবেদন সৃষ্টিকারী ভাব ট্র্যাজেডিতে অনেক থাকলেও অ্যারিস্টটলের আলোচনার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করলে সম্ভবত এ বিষয়ে একমত হওয়া যাবে যে, তার মূল রসনিষ্পত্তি হচ্ছে করুণ রস।

৬.৪.১৬.৬ : ক্যাথারসিস বা চিত্তশুদ্ধি

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি অ্যারিস্টটল ব্যবহার করেছিলেন। গোটা সংজ্ঞা এখানে উদ্ধার করার দরকার নেই, তার শেষ অংশটি ছিল এইরকম '....incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its Catharsis of such emotions' শেষে 'emotions' শব্দটি আছে বলেই বাংলায় একে আমরা করেছি চিত্তশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধি। অ্যারিস্টটল তাঁর এই সংজ্ঞার প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু 'ক্যাথারসিস' শব্দটি দিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি, ফলে এ নিয়ে নাট্যতত্ত্ববিদরা অনেক জল্পনা-কল্পনা ও বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। এখনো পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, এমন কথা বলব না, তবে বিভিন্ন যে ব্যাখ্যাগুলি আমরা পেয়েছি, সেগুলি আমরা জেনে রাখতে পারি। তারপর নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করব।

একেবারে প্রাথমিকভাবে দেখতে গেলে, এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা, যার নিজস্ব অর্থ হচ্ছে purgation বা বিমোক্ষণ। অ্যারিস্টটলের পিতা ছিলেন চিকিৎসক, শব্দটিও সাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল না। সেইজন্যেই কথাটি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে এটি বিশেষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেননি অ্যারিস্টটল, এমন অভিমত কেউ কেউ পোষণ করেন। তাঁদের মতে, রূপকার্থে এটাই অ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন যে, জীবনের ভীতিপ্রদ ও করুণাদায়ক ঘটনার অনুকরণ করে ট্র্যাজেডি দর্শকদের দেখায় উদ্দেশ্য একটাই—রেচক ওষুধ যেমন আমাদের শরীরের বর্জ্য পদার্থ বার করে দেয়, এই নাট্যাভিনয়ও আমাদের মনের কু-প্রকৃতির শোষণ ঘটিয়ে একভাবে আমাদের মানসিক পরিশোধন করে। এর ফলে ভয় ও করুণার প্রাবল্য থেকে আমাদের মন মুক্ত হয় এবং আমরা সাহসী হয়ে উঠি।

এই ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি বা আমরা গ্রহণ করতে পারি, দ্বিতীয়াংশটি একেবারেই পারি না। এমন হতেই পারে যে শব্দটি অ্যারিস্টটলের অতি পরিচিত বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মনের বৃত্তিকে নিষ্কশিত করার জন্য আমাদের ট্র্যাজেডি দেখতে হবে, এ কথা সমর্থনযোগ্য নয়। চিত্তবৃত্তি যদি নিষ্কাশিতই হয়ে গেল, তবে কোন অনুভূতির সাহায্যে আমরা নাটক দেখব! চোখের সামনে একটি উচ্চাশা বা উচ্চভাবের পতন দেখলে আমরা ভয় পাই বা আমাদের সহানুভূতি জাগে এ কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে ভয় ও সহানুভূতির মনোভাবই আমাদের মন থেকে চলে যায়, এ কথা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে এই বৃত্তিগুলির এমন কোনো অহিনকুল সম্পর্কও নেই যে এদের মন থেকে তাড়াতে না পারলেই মানুষ ভীরু হয়ে যাবে।

লুকাস প্রমুখ সমালোচক 'ক্যাথারসিস' শব্দটির একটি অন্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। প্রথমেই চিকিৎসাক্ষেত্রের অনুষঙ্গ থেকে শব্দটিকে তাঁরা তাড়াতে চেয়েছেন, বলেছেন শব্দটির তাৎপর্য যদি কিছু বার করতেই হয় তবে শৈল্পিক প্রক্রিয়াতেই তা করতে হবে, চিকিৎসার সঙ্গে একে সম্পর্কিত করে কোনো লাভ নেই। ট্র্যাজেডিকে মানুষের হাসপাতালে পরিণত করার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়, এমনকী যদি তাকে মনের

হাসপাতাল বলতে চাওয়া হয়, তাও নয়। এঁদের মতে, নাটকে প্রদর্শিত কাহিনীর দ্বারা সৃষ্ট ভয় এবং করুণা নামক দুটি ভাব যে শিল্পিত প্রক্রিয়ায় আনন্দে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকেই অ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন ক্যাথারসিস।

এই ব্যাখ্যা এবং ট্র্যাজেডি কেন আমাদের আনন্দ দেয়—এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় সমার্থক। কিন্তু অ্যারিস্টটল ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন কিনা বোঝার বিশেষ কোনো উপায় নেই। কারণ ভয় ও করুণার সংবেদন মানুষকে কেন আনন্দ দেয়, এ বিষয়ে তিনিও কয়েকবার আলোচনা করেছেন, কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার কোথাও 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেননি। ট্র্যাজেডির আনন্দ যে 'ক্যাথারসিস'- জনিত আনন্দ, এমন কথা না বলে তিনি বলেছেন, এই আনন্দ—'comes from pity and fear through imitation'। অর্থাৎ অনুকরণের শিল্পরূপই যে আনন্দ সৃষ্টির কারণ, এ কথাই বিভিন্নভাবে তিনি বলতে চেয়েছেন।

'ক্যাথারসিস' শব্দটির তৃতীয় আর একটি ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভীতি এবং করুণা এই দুটি মনোভাব হল পরস্পর বিরোধী বা বিপ্রতীপ। এই বিপ্রতীপ দুটি ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব আমাদের মনে ক্রিয়াশীল হয় ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখে এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি মানসিক ভারসাম্যে উপনীত হয় অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশমনের ফলে মন শান্ত হয়, তখন সেই প্রশান্তির আনন্দকেই বলা হয়েছে 'ক্যাথারসিস'।

এটি একটি নতুন ব্যাখ্যা কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অ্যারিস্টটলের আলোচনায় এর কোনোরকম ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের মনে হয় না। পোয়েটিক্সের আলোচনা থেকে এ কথা একবারও মনে হয় না যে অ্যারিস্টটল ভীতি ও করুণাকে দুটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ট্র্যাজেডি নাটক দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের এ কথা বলে না যে ভয় এবং সহানুভূতির মনোভাব প্রশমিত হয়ে গেলে, অর্থাৎ মন থেকে চলে গেলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়। বরং উল্টোটাই যেন হয়—এদের তীব্রতা যত বাড়ে, অভিনয় দেখার আনন্দও বাড়ে তত।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল! লুকাস প্রভৃতি সমালোচকেরা যেখান থেকে ব্যাখ্যা শুরু করেছেন, সেটা আমরা মেনে নিতে পারি, 'ক্যাথারসিস' কথাটাকে শৈল্পিক প্রক্রিয়া হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে, চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজ হিসাবে নয়। এর পর অ্যারিস্টটলের ব্যবহৃত বাক্যগুলি থেকে যদি ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত সন্ধান করতে হয় তবে বলতে হবে সেটা এই বাক্যের মধ্যেই আছে, যেখানে তিনি বলেছেন—'he , who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity.' অর্থাৎ নাট্যকার এমনভাবেই তাঁর সৃষ্টি উপস্থাপিত করবেন, যাতে দর্শকদের মনে ভয় ও করুণা পৌঁছবে চরম মাত্রায়। এই চরম মাত্রায় পৌঁছনোকেই বোধহয় বলে 'purgation of such emotions'। একেই বোধহয় রসনিষ্পত্তি বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং তা যদি হয় তবে 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল একেই বোঝাতে চেয়েছেন।

৬.৪.১৬.৮ মহাকাব্য : ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার তুলনা

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এর পর বিস্তৃত আকারে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না থাকলেও পরে কোনো কোনো অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার তুলনা প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। আমরা মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণার পরিচয় পাই, ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনায় তিনি যা বলেছেন, এবং শিল্প হিসাবে উভয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব বিষয়ে তাঁর যা ধারণা, সেগুলি সূত্রাকারে এভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি :

এক ।। মহাকাব্যের লক্ষ্যও ট্র্যাজেডির মতো গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ এবং মহাকাব্যও উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করে থাকে।

দুই ।। ট্র্যাজেডিকে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো 'দৃশ্যকাব্য' না বললেও একে দৃশ্যাত্মক কাব্য (Narrative of spectacles) অ্যারিস্টটল বলেছেন। তার সঙ্গে তুলনায় মহাকাব্যকে বলেছেন শ্রবণমূলক কাব্য (Narrative in form)।

তিন ।। মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির বৃত্ত গঠনের রীতি একরকম হওয়া উচিত বলেই অ্যারিস্টটল বিভিন্ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন।

চার ।। ঘটনাগত ঐক্য বা unity of action ট্র্যাজেডির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অ্যারিস্টটল মনে করেন এই ঐক্য মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দরকার। তা ছাড়াও মহাকাব্যে যা দরকার বলে তিনি মনে করেন তা একেবারে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়—'It should have for its subject a single action, whole and complete with a beginning, a middle and end. It will thus resemble a living organism in all its unity.'

পাঁচ ।। অ্যারিস্টটল মনে করেন ট্র্যাজেডির যতগুলি প্রকারভেদ হতে পারে, মহাকাব্যের শ্রেণীভেদও ততগুলিই হতে পারে। ট্র্যাজেডির মতোই মহাকাব্যের শ্রেণীভেদ করেছেন তিনি চারটি—জটিল, নীতিমূলক, সরল এবং করুণ রসাত্মক। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছেন, গঠনের দিক থেকে 'ইলিয়াড' মহাকাব্য সরল, 'ওডিসি'-র গঠন একটু জটিল ; কিন্তু রসের বিচারে আবার ইলিয়াড করুণ রসাত্মক, ওডিসি-কে বলা যায় নীতিমূলক মহাকাব্য।

ছয় ।। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের প্রধান পার্থক্য আয়তনে। আয়তন বলতে অ্যারিস্টটল দুটি জিনিস বুঝিয়েছেন—বিশালতা (in the scale on which it is constructed) এবং দৈর্ঘ্য (length)। দু- দিক থেকেই মহাকাব্য অনেক বড়ো। অবশ্য মহাকাব্যে আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলেই তা বাড়তে পারে, নাটকে একই সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপাখ্যানের একত্র সমাবেশও মহাকাব্যে ঘটানো সম্ভব যার ফলে

মহাকাব্যের সৃষ্টিতে বিশালতা ও গাম্ভীর্য আনা সম্ভব। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত—'This then is a gain to the Epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest and room for episodes of diverse kinds.'

সাত ।। ছন্দের বিচারে বলা যায়, হিরোইক ছন্দই মহাকাব্যের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাব্য বলেই শুধু নয়, অ্যারিস্টটলের অভিমত হল এই যে, হিরোইক ছাড়া অন্য যে কোনো ছন্দে বর্ণনাত্মক কাব্য রচনা করতে গেলে তা কাব্যের রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করবে। কারণ হিরোইক ছন্দই সবচেয়ে স্থাপত্যধর্মী এবং রাজকীয়। অন্য দিকে মোটামুটি জীবনের চলমান দিকটি দেখাবার উপযুক্ত ছন্দ হল আয়াম্বিক আর ট্রোকাইক—দ্বিতীয়টি আবার নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

আট ।। মহাকাব্যের এত প্রশস্তি সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল কিন্তু মনে করেন, ট্র্যাজেডি মহাকাব্য অপেক্ষা আরও উচ্চস্তরের সৃষ্টি। তার্কিকের মতো তিনি মহাকাব্যের স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন ও ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ট্র্যাজেডির বিপক্ষে বড়ো যুক্তি হল অভিনয়ের সাহায্য না পেলে তার রস পরিস্ফুট হয় না। বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গির সাহায্য না পেলে যা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাকে কেমন করে উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলা যায় ! অ্যারিস্টটল এর উত্তরে বলেছেন, অঙ্গভঙ্গি মহাকাব্য পাঠেও যে হয় না এমন নয়। তাছাড়া মহৎ ট্র্যাজেডি অভিনয় ছাড়া শুধু পাঠেই পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, মহাকাব্যের উপাদান চারটি, কিন্তু ট্র্যাজেডির উপাদান ছটি। মহাকাব্যের ছন্দেও নাটক লেখা যায়। আরও সংহত সৃষ্টি বলে নাটকের রসাবেদন আরও তীব্র। সুতরাং তাঁর অভিমত, 'Tragedy is the higher art'।

৬.৪.১৬.৯: ইতিহাস ও কাব্যের তুলনা

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের নবম অধ্যায়ে ইতিহাস এবং কাব্যের মধ্যে তুলনায় কিছু বাক্য ব্যয় করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, mimesis ব্যাপারটা যে নিছক নকল বা অন্ধ অনুকরণ নয়, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। সেই প্রসঙ্গেই তিনি ইতিহাসের তুলনায় কাব্যকে অনেক উন্নত এবং তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। পরে যখন তিনি সম্ভাব্যতা (probability) এবং ঘটমানতা (possibilities) কথা দুটিকে ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তখন মূলত তাঁর নবম অধ্যায়ের আলোচনার তাৎপর্য এসে দাঁড়িয়েছে ঐতিহাসিক কাব্যের (বা নাটক, এবং আধুনিক কালে অবশ্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস) সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বোঝায় এবং ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাস নির্ভর শিল্পের উৎকর্ষ কেন বেশি।

মহৎ কবি যখন কিছু অনুকরণ করেন তখন সেটির অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন না, তাঁর মনে আরও দুটি ব্যাপার সেই সঙ্গে সক্রিয় থাকে—বস্তুটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা ভাবা হয়, এবং বস্তুটির যেমন হওয়া উচিত। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়—চরিত্রটি ঠিক কীরকম, তার সঙ্গে যোগ দেয় তার কীরকম হওয়া উচিত ; অথবা তাঁর অধিকার, যাকে শ্রেয় ভাবে চিত্রিত করার, বা হেয় ভাবে তুলে দেখাবার।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের এখানেই প্রধান তফাত। অনেকে মনে করেন তফাতটা মাধ্যমের—একটি গদ্যমাধ্যমে লেখা, অন্যটি পদ্যমাধ্যমে, সেটিও কিন্তু কোনো প্রকৃত তফাতই নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা গদ্যে লেখা না হয়ে যদি পদ্যে লেখা হতো, ছন্দ থাকা সত্ত্বেও সেটা ইতিহাস হয়েই থাকত, কাব্য তাকে কেউ বলত না।

কাব্যকে যে ইতিহাসের চেয়ে অ্যারিস্টটল মহত্তর শিল্প বলতে চান তার প্রথম কারণ, সঠিক ভাবে যা-যা হয়েছে, ইতিহাস তারই একটা নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে, পক্ষান্তরে কাব্য কিন্তু যা ঘটতে পারে এবং যা ঘটা উচিত বলে মনে হয়, সেটারও বর্ণনা দিতে পারে। যেসব ঘটনা সত্যিই ঘটেছে যাকে ইংরেজিতে বলে possible ঘটনা বা incidents, সেগুলোকেও অনেক সময় অসম্ভব বলে মনে হয়, কারণ তার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধতা বা probability হয়তো থাকে না ; পক্ষান্তরে এমন অনেক ব্যাপার থাকতে পারে বা হয়তো আদপে কখনোই ঘটেনি অর্থাৎ অঘটন (impossibility), কিন্তু যুক্তি দিয়ে দেখলে মনে হয় ঘটতেই তো পারে, অর্থাৎ সম্ভাব্য (probable)। অ্যারিস্টটল মনে করেন কাব্যে অসম্ভাব্য ঘটনার চেয়ে সম্ভাব্য অঘটনও বরং অনেক বেশি কাম্য। তাই ইতিহাসের চেয়ে কাব্য অনেক বেশি দার্শনিক মূল্য সম্পন্ন (more philosophic)।

দ্বিতীয় কথা, কাব্য ইতিহাসের চেয়ে মহত্তর শিল্প এই কারণেই যে, কাব্য প্রকাশ করতে চায় একটি শাশ্বত বা সামান্য সত্য (universal)-কে, কিন্তু ইতিহাস প্রকাশ করে এক বিশেষ সত্যকে (particular)। বিশেষ সত্য বলতে বোঝায় একটি বিশেষ লোক একটি সময়ে ও বিশেষ পরিস্থিতিকে ঠিক কীরকম ব্যবহার করেছে। সাধারণ সত্য তাকেই বলে যেখানে একটি বিশেষ লোক বিশেষ পরিস্থিতি আবশ্যিক ও সম্ভাব্যের নিয়ম মেনে ঠিক কীরকম প্রতিক্রিয়া করে থাকে। ইতিহাস একটি শ্রেণীগত সত্যের পরিবর্তে একটি মানুষের জীবনের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণই ফুটে ওঠে। কবিও সেই একই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সময়ের কিছু পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের আচার-আচরণ দেখান। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে, সেই ব্যক্তিগত জীবনচিত্র থেকে একটি সার্বজনীন চিত্র পাঠককে উপহার দেবার।

এবারে আমরা এসে উপস্থিত হতে পারি সেই প্রসঙ্গে, যখন শুধু কাব্য নয়, আমরা ঐতিহাসিক কাব্যের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি ইতিহাসের। যেখানে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ই কবি তাঁর কাব্যবিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে তাঁকে আমরা কী বলব, কবি না ঐতিহাসিক ! অ্যারিস্টটলের অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা যখন কবির আছে তখন প্রকৃতই যা ঘটেছে (অর্থাৎ ইতিহাসে যার বিবরণ থাকে)

কবি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ঘটে যাওয়া সেই অতীত ঘটনার যথাযথ বিবরণে তাঁকে নিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, সেই ঘটনা অনিবার্য এবং বাস্তবতার গুণে সম্ভাব্য হয়ে উঠেছে কিনা, তাও তাঁকে বিচার করতে হবে। সব ঘটনার সম্ভাব্যতার গুণ থাকে না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কবি যদি নির্বিচারে ইতিহাসের ঘটনামাত্রই গ্রহণ করে যান তবে তা ইতিহাস হয়েই থাকবে, কাব্যের মর্যাদা পাবে না। ইতিহাসের চেয়ে কাব্য মহত্তর সামগ্রী, কাজেই ইতিহাস যদি তিনি অনুসরণও করেন, নিজের বিচারবুদ্ধি, সম্ভাব্যতার বিধি এবং ঔচিত্যবোধ দিয়ে সেই বিশেষ ঘটনাকে তাঁকে সাধারণ সত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

৬.৪.১৬.১১০: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব : সাধনকুমার ভট্টাচার্য

২। কাব্যতত্ত্ব : অ্যারিস্টটল (অনুবাদ) : শিশিরকুমার দাশ

৩। নন্দনতত্ত্ব : সুধীরকুমার নন্দী

৪। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ : ভবানীগোপাল স্যান্যাল

৫। সাহিত্য-বীক্ষণ : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৬। নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

৬.৪.১৬.১১ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ অবলম্বন করে তাঁর অনুকরণ-তত্ত্বের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

২। কমেডিকে অ্যারিস্টটল কেন উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলতে চাননি বল।

৩। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির কী সংজ্ঞা দিয়েছেন লেখো এবং সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে এর যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও।

৪। ট্র্যাজেডির প্রধান শ্রেণী কটি বলে অ্যারিস্টটল মনে করতেন ? প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

৫। ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিষয়বস্তু কী হতে পারে বলে অ্যারিস্টটল মনে করতেন, সে বিষয়ে আলোচনা করো।

৬। ট্র্যাজেডির উপাদান মোট কটি ? অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের কোন অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন ? কোন উপাদানকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, তুলনামূলক আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৭। ট্র্যাজেডির নায়ক হবার যোগ্যতা কী ধরনের চরিত্রের আছে, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করো।

৮। 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে ভিন্ন ধরনের কয়েকটি মতের পরিচয় দিয়ে তোমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করো।

৯। মহাকাব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের যে অভিমত তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।

১০। ইতিহাস এবং কাব্যের মধ্যে কোনটিকে অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠতর মনে করেন এবং কেন, যুক্তি সহকারে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

সপ্তম পত্র

বিশেষ পত্র –ভাষাবিজ্ঞান

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস - অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী - অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ২. প্রাচীন রোমে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ৩. তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি

একক ৪. ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

একক ৫. পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ৬. গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

একক ৭. পাণিনির পূর্ববর্তী যুগে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

একক ৮. পাণিনির ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ৯. পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ১০. বঙ্গদেশে ভাষাতত্ত্বচর্চা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১১. নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

একক ১২. বাংলা ভাষার সংবর্তন

একক ১৩. সমাজভাষাবিজ্ঞান

একক ১৪. শৈলীবিজ্ঞান

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

সপ্তম পত্র

সূচিপত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)	**পাঠপ্রণেতা**	**পৃষ্ঠা**
একক ১. প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১-১২
একক ২. প্রাচীন রোমে ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৩-১৮
একক ৩. তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৯-২৩
একক ৪. ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	২৪-২৬
পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৩ ঘণ্টা)		
একক ৫. পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	২৭-৩১
একক ৬. গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩২-৩৫
একক ৭. পাণিনির পূর্ববর্তী যুগে ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৩৬-৪০
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৩ ঘণ্টা)		
একক ৮. পাণিনির ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৪১-৪৬
একক ৯. পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৪৭-৫২
একক ১০. বঙ্গদেশে ভাষাতত্ত্বচর্চা	ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী	৫৩-৬০
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)		
একক ১১. নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ	ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী	৬১-৭৭
একক ১২. বাংলা ভাষার সংবর্তন	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৭৮- ৯৯
একক ১৩. সমাজভাষাবিজ্ঞান	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১০০-১১১
একক ১৪. শৈলীবিজ্ঞান	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১১২ -১২৭

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ১

প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম :

৭.১.১.১ প্রাচীন গ্রীসে ভাষাতত্ত্বচর্চা
৭.১.১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.১.১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.১.১.১ : প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্বচর্চা

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। ভাষার মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। ভাষাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। নিজের ভাবনা ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয় ভাষাই। সুতরাং শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা অন্য জৈববৃত্তি প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি। উন্নততর চিন্তা ও উন্নততর ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। জার্মান মনীষী হুমবোল্ট্ বলেছেন—

"মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা আর তার

আত্মাই হল তার ভাষা।"

সুতরাং ভাষা হল খুবই মূল্যবান সম্পদ। সারা পৃথিবীতে ভাষার আলোচনা হচ্ছে এবং অতীতেও হয়েছে। তবে অতীতে ভাষার আলোচনা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হচ্ছে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে একটি মানুষ দিনে এক লক্ষ শব্দ বলে-লেখে-পড়ে বা শোনে। প্রত্যেকটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে কথা বলা, শোনা, লেখা বা পড়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই ভাষার চর্চা করা প্রত্যেকটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রেনেশাঁস হয়েছিল, খ্রিস্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই রেনেশাঁস বা নবজাগরণের ফলে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহল ভাষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় থেকেই পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ভাষাতত্ত্বচর্চার জগতে নব উদ্যোগ সূচিত হয়। সেই উদ্যোগের ঢেউ আমাদের দেশেও আছড়ে পড়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময় নব জাগরণের ফলে আমাদের দেশেও ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত ঘটে।

প্রাচীনকালে ভাষাতত্ত্বচর্চার ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রেখেছিল প্রধানত পাঁচটি প্রাচীন দেশ। যেমন—প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন গ্রিস, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রিস ও প্রাচীন রোম। তবে এই দেশগুলির মধ্যে দুটি দেশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রিস।

প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে দেখা যায় গ্রিক ভাষাকে কেন্দ্র করে তেমন আলোচনা নেই। বরং তাদের গভীর আসক্তি ইতিহাস ও ইতিবৃত্তের দিকেই। তাই পরবর্তীকালে গ্রিকরা সেই অভাব কাটিয়ে উঠে ভাষাতত্ত্বচর্চায় গভীরতা আনে। বিস্তারিত আলোচনা করলেই—এ কথা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

যে-কোনো বিদ্যারই আদি উন্মেষ অনেকটা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল 'বেদ'-'উপনিষদ'-কে কেন্দ্র করে। এ দুটি ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এগুলি বৈদিক ভাষায় রচিত।

তবে এখানে ভাষার তত্ত্বগত আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উজ্জ্বল। এরপরে আসে প্রাচীন গ্রিসের কথা। এখানেও ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। মূলত 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'কে কেন্দ্র করে। এবারে গ্রিস দেশের ভাষাতত্ত্বচর্চায় কোন্ কোন্ ধর্মগ্রন্থগুলি সহায়তা করেছিল, সেগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হল।

বাইবেল :

বাইবেল খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। পাশ্চাত্য দেশের ভাষাজিজ্ঞাসার প্রাচীন নিদর্শন 'বাইবেল'-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে ভাষাকে ঐশ্বরিক ভাবনা থেকে আলোচনা করা হয়েছে। বাইবেলের 'First Book of Moses' গল্পে মূলত মানব ঐক্যের কথা বলতে গিয়েই ভাষার প্রসঙ্গ এসেছে। এই গল্পের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> ".... The people is one, and they have all one language ... There confound their language, that they may not understand one another's speech ..... the Lord die there confound the language of all the earth."

প্রাচীন ইহুদিদের এই ভাষাজিজ্ঞাসার মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি না থাকলেও, ইতিহাসের ধারা দেখলে আমরা এর সত্যতাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। এক ভাষা থেকে বহু ভাষা সৃষ্টির যে তত্ত্ব 'বাইবেল' এ আছে তাকে সত্য বলেই মেনে নিতে হয়।

'বাইবেল'-এর 'জেনেসিস অধ্যায়ে'র Tower of Bibel-এর গল্পেও ভাষাজিজ্ঞাসার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এখানে দোভাষীদের কথা বলা হয়েছে। দোভাষী হল যারা বহুভাষা বিশারদ। এই সময়কার রাজারাও ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেই কারণে তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সময় দোভাষী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যেমন গ্রিক রাজা ফ্যারাও দোভাষী সঙ্গে নিয়ে যেতেন অন্য দেশের ভাষা বোঝার জন্য।

ক্রমে মানব জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে যতই ছড়িয়ে পড়ে, ততই তাদের ভাষা পৃথক পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ একই ভাষা আর থাকে না। খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা মনে করেন ঈশ্বরের নির্দেশেই নানা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মূল ভাষা থেকে পৃথক পৃথক একাধিক ভাষা সৃষ্টি হওয়ায় একের ভাষা অন্যে বুঝতে পারে না। এই তথ্যটিকে সত্যি বলেই মনে হয়। কারণ ভাষার ইতিহাসের ধারায় দেখা যায় একটি ভাষার মধ্যেই আঞ্চলিক পার্থক্য খুব বেশি হয়ে গেলে আঞ্চলিক রূপগুলিই ক্রমে পৃথক পৃথক ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের যে ক-টি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়েছে, সেই আদি ভাষাগুলির মধ্যে আর এমন কিছু পারস্পারিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ওই ভাষাগুলি আবার কোনো একটি প্রাচীনতম মূল ভাষা থেকে জাত বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং 'বাইবেল'-এর ভাষাজিজ্ঞাসায় মানব ঐক্যের ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

তবে প্রাচীন ইহুদিরা বিভিন্ন ব্যক্তি নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। এই নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না। অবশ্য পরবর্তীতে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ভাষাজিজ্ঞাসায় নানা সম্প্রদায় আসে। ফলে তাঁদের প্রচেষ্টায় ভাষাচর্চা এগিয়ে যায়।

সফিস্ট সম্প্রদায় :

প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্বচর্চায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সফিস্ট সম্প্রদায়। ভাষাতত্ত্বের নানা দিক তারা আলোচনা করেন। গ্রিস ভাষায় জ্ঞানী বা পণ্ডিতকে 'সফিস্ট' বলা হয়। অনেকে বলেন এরা অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক। কেউ বলেছেন এরা সক্রেটিসের সমসাময়িক। এরাই সর্বপ্রথম মহাকাব্যকে বাদ দিয়ে ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত করেন। কারণ তারা মূলত বিষয়ের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরা ভাষাতত্ত্বে যেসব দিক উদ্ঘাটন করেন সেগুলি হল—

ক. এরাই প্রথম শব্দের প্রয়োগরীতির ভিত্তি স্থাপন করেন।

খ. সফিস্টরা অলংকার রীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া বাক্যে একটি শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশের কারণও তাঁরা নির্দেশ করেন।

গ. সফিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রোটাগারাস। ইনিই প্রথম বাক্যের বিভিন্ন রীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তিনি মোট চারটি (প্রশ্নবোধক, প্রার্থনা, নির্দেশ ও বিবরণ) বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন বাক্য নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁর মতে বাক্য মোট সাত প্রকার। যেমন—প্রশ্নবোধক, প্রার্থনা, নির্দেশ, বিবরণ, উত্তর, আদেশ ও আমন্ত্রণ।

ঘ. শব্দের অর্থগত রূপ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

ঙ. প্রোটোগোরাসই প্রথম লিঙ্গ আর ক্রিয়ার কালের পার্থক্য নির্দেশ করেন।

চ. শব্দে ব্যবহৃত অক্ষর সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেন।

ছ. এ ছাড়াও প্রোডিকুস শব্দ বিশ্লেষণ ও হিপ্পায়িসাস ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ভাষা সম্পর্কে সফিস্ট সম্প্রদায় বিস্তৃত আলোচনা করলেও তাদের মধ্যেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন — সফিস্ট সম্প্রদায় তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা ছিল। নিজেদের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেকারণে ঘাটতি থেকেই গেছে।

হেরোডোটাস :

হেরোডোটাস সফিস্ট সম্প্রদায়ের সমসাময়িক কালেই অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাকে নিয়ে তাঁর মনেও জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছিল। তবে সবটাই আখ্যানমূলক। যেখানে বিশ্লেষণের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর 'History' গ্রন্থে ভাষা জিজ্ঞাসার কথা কিছুটা জানা যায়।

এখানে পৃথিবীর আদি ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এখানে তিনি একটি গল্প বলেন। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা কোন্‌টি এটি পরীক্ষা করার জন্য দুটি সদ্যোজাত মানব শিশুকে একটি নির্জন পরিবেশে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে থাকেন। মানব সংসর্গ থেকে মুক্ত এই দুটি শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে কথা বলার সময় একটি শিশু প্রথম উচ্চারণ করে 'Bekos'। এই শব্দটি খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন ফ্রীজীয় ভাষায় এর অর্থ 'রুটি'। আর এর থেকেই অনুমান করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা ফ্রীজীয় ভাষা এবং এটিই মানুষের সহজাত ভাষা। আর অন্য ভাষাগুলি পরবর্তীকার্লে অর্জিত ভাষা। মিশর নৃপতির এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। কারণ এর মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে গ্রন্থটি ভাষাবিজ্ঞান চর্চার জগতে নতুন দিকের উন্মোচন ঘটায়। আসলে হেরোডোটাসের এই পরীক্ষাটা ছিল মূলত গল্পই।

প্লেটো :

প্লেটো ছিলেন মূলত ভাবুক, কবি ও দার্শনিক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিসে আবির্ভূত হন। গ্রিসের দর্শনশাস্ত্রকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যান এবং ভাষা নিয়েও খানিকটা আলোচনা করেন। তাঁর 'Dialogues' বা 'কথোপকথন' গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বগত আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে দুটি অধ্যায় আছে। যথা—ক্রাতুলোস ও সফিস্ট।

'ক্রাতুলোস' অধ্যায়ে প্লেটো ভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং প্রশ্নের আলোচনাও করেন। মানুষ যে ভাষার সাহায্যে কথা বলে, কিভাবে তা সৃষ্টি হয়েছে? তার উত্তরে প্লেটোর মত মানুষের নিজের প্রয়োজনে ভাষার সৃষ্টি। এই অধ্যায়ে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা আলোচনা আছে। আমাদের কথা বা ভাবের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ বা ধ্বনির মিল বা অমিল কতখানি? এ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। ভাষার যে সব ভাব বা বস্তুকে প্রকাশের জন্যে যে সব ধ্বনি সৃষ্টি বা নাম শব্দ আমরা ব্যবহার করি সেইসব ভাব বা বস্তুর সঙ্গে এই ধ্বনির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বা নেই—এই প্রসঙ্গেও এক বিতর্ক হয়েছিল। এই নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই সমস্যার জন্য পরস্পরবিরোধী দুটি পক্ষ গড়ে ওঠে—(ক) সাদৃশ্যবাদী (খ) খেয়াল খুশিবাদী।

সাদৃশ্যবাদীরা বলেন অর্থের সঙ্গে ধ্বনির, বস্তুর সঙ্গে তার নামের ভাবের একটি সাদৃশ্য আছে। এই কারণেই এদেরকে সাদৃশ্যবাদী বলা হয়। যেমন—

ব্যবহৃত ধ্বনি **বস্তুর নাম**	**প্রকাশিত ভাব** **অর্থ**	**মিল/অমিল** **সিদ্ধান্ত**
নিবেদিতা (ভগিনী নিবেদিতা) [= নি+$\sqrt{}$ বেদ (বিদ+নিচ) +ক্ত+আ	নিবেদিতা প্রাণ (স্ত্রী) আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই আমাদের ভারতবর্ষের জন্য ভগিনী নিবেদিতা বিদেশি হয়েও কি অসাধারণ আত্মত্যাগ করেছিলেন।	মিল রয়েছে

সুতরাং এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা যায় প্রকাশিত ভাবের সঙ্গে ব্যবহৃত ধ্বনির ব্যুৎপত্তিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকবেই।

আর অদৃশ্যবাদীরা বলেন বস্তুর নামের সঙ্গে ভাবের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন—

মাতৃবাচক শব্দ	**প্রকাশিত ভাব বা অর্থ**	**মিল/অমিল**
মা	জন্মদাত্রী বা জননী কিন্তু বিভিন্ন দেশে এর বিভিন্ন নাম।	মিল নেই। মিল থাকলে সব দেশেই একই নাম হত।

প: ব: — মা
বাংলাদেশ — আম্মা
আরবি — আম্মান (Ummun)
রুশ — মাট (Mat)
ইংরেজি — 'মাদার' (Mother)

ভাবের এই দুটি ধারা প্লেটো ক্রাতুলাস অধ্যায়ে আলোচনা করেন। তবে প্লেটো দুটি মতের সত্যতাকেই স্বীকার করে নেন। বস্তুর নামের সঙ্গে অর্থের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে প্লেটো বলেন বস্তু হচ্ছে ভাষার নিম্নস্তরের দৈহিক প্রসার। আর এই কারণেই তিনি ভাষাকে 'শব্দমালা' বলে মনে করতেন।

প্লেটো ভাষা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন 'সফিস্ট' অধ্যায়ে। মানুষ কথা বলে ভাষার সাহায্যে। এই অধ্যায়ে তিনি মানুষের চিন্তাশক্তির সঙ্গে ভাষার অপরিহার্য সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ভাষার দুটি রূপ। তা হল চিন্তা ও কথা। চিন্তা হল মানব আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন। আর ধ্বনির সাহায্যে চিন্তা থেকে যে প্রবাহটি আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তাই হল ভাষা। এ ছাড়াও প্লেটো ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের কথাও বিশ্লেষণ করেছেন। প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বগত যে সমস্ত আলোচনা পাওয়া যায় তা হল—

ক. তিনি বিভিন্ন শ্রেণির গ্রিক শব্দ বা বাক্যরূপে ধ্বনির অনুক্রম স্বরধ্বনি, অর্ধ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত করেন। প্লেটোর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বৈয়াকরণরা গ্রিক ধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করেছিলেন।

খ. বাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় ও ব্যুৎপত্তি নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

গ. তিনি বর্ণকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। যথা—ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ। ঘোষবর্ণে সমস্ত স্বরকে ফেলেছেন। আর অঘোষ বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ ও অন্ত্যস্থ বর্ণ অর্থাৎ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

ঘ. তিনি ভাষার বহিরঙ্গ গঠন নিয়েও আলোচনা করেন।

ঙ. শব্দ সংযোজনার ব্যাপারে তিনি বলেন প্রাকৃতিক বস্তুগুলি যেমন একসঙ্গে সঙ্গীভূত হতে পারে এবং অন্যবস্তু তা পারে না, ভাষাতেও তেমনি কতগুলো শব্দ পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। এবং অন্য শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য তিনি প্রথাগত নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করেন ও তর্কশাস্ত্রের প্রেক্ষিতে বিভাজনের সূত্র নির্দেশ করেন।

তা সত্ত্বেও বলতে হয় প্লেটো ভাবুক, কবি ও দার্শনিক। তাঁর আলোচনা কবিমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনিও তাঁর ভাষাতত্ত্বগত চর্চা হাতে কলমে প্রমাণ করেননি। আলোচনার মধ্যেই তাকে আটকে রেখেছেন। তবে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল তা খানিকটা পূর্ণ করেছিলেন।

অ্যারিস্টটল :

প্লেটোর শিষ্য হলেন গ্রিসের বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব অ্যারিস্টটল। তিনি প্লেটোর শিষ্য হলেও প্লেটোর মতকে সবসময় অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেননি। আসলে তাঁরা দুজন ছিলেন দুরকম মনের অধিকারী। প্লেটো ভাবুক দার্শনিক। কিন্তু অ্যারিস্টটল ছিলেন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী, বিশ্লেষণী মনোভাবের অধিকারী। এই বিশ্লেষণী মনোভাব গুরু প্লেটোর কাছে নয়—চিকিৎসাজীবী পিতার কাছ থেকে পাওয়া। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্যই তাঁর ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা তত্ত্বপ্রধান না হয়ে তথ্যপ্রধান হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, তা সত্ত্বেও বলতে হয় তিনি প্লেটোর মতো বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেননি। কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত বই 'পোয়েটিক্স'। এই গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে তিনি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভাষার চর্চা করেছেন। যেমন—

ক. ভাষাকে অ্যারিস্টটল আটটি অংশে বিশ্লেষণ করেছেন। যথা—Letter, Syllable, Conjuction, Articale, Noun, Verb, Case ও Speech। এই আলোচনা ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে বৃহত্তম উপাদানের দিকে এগিয়ে গেছে।

খ. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান Letter কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা—(১) Vowel (২) Mute (৩) Semi vowel.

গ. তিনি বৃহত্তম একক শব্দ বা পদের মধ্যে ফেলেছেন Noun, Verb, Case, Article, Conjuction। তবে শেষে শব্দের থেকে বাক্যকেই বৃহত্তম একক বলেছেন।

ঘ. ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগরীতির দিকটাও তিনি আলোচনা করেছেন। কাব্যশৈলীর কথাও বলেছেন। কাব্যশৈলী বা Poeticdietan সম্পর্কে তিনি বলেন—

> "The Diction becomes distinguished and nonprosaic by the use of unfamiliar terms, i. e strange words, metaphors, tengthened forms, and everything that diviateo from the ordinary modes of speech."

ঙ. আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণ রচনাতেও আমরা যে ইংরেজি ব্যাকরণের কাঠামো অনুসরণ করি, তাতেও পরোক্ষভাবে অ্যারিস্টটলের অবদান আছে।

শুধু তাই নয় অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থে তিনি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেগুলি হল—

ক. তিনি বিভিন্ন অর্থপূর্ণ তদ্বার্থহীন অভিন্নতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।

খ. তিনি সাধিত পদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি স্বরাঘাত নিয়েও আলোচনা করেছেন। স্বরাঘাতের উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কারক ও বিভক্তি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এককথায় প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে অ্যারিস্টটলের নাম ভোলার নয়।

তবে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল কাব্যতত্ত্ব প্রসঙ্গেই ভাষাতত্ত্বের উপর আলোচনা করেছেন, আলাদাভাবে কিছুই বলেননি। অর্থাৎ তিনি কাব্যের ভাষা নিয়েই আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁর 'De-Interpretion' গ্রন্থে কাব্যের ভাষাকে বাদ দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নিয়েই আলোচনা করা যথাযথ বলে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া তিনি ভাষাকে আলাদা শাস্ত্র হিসেবে দেখাতে পারেননি। তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনার অনেক ক্ষেত্রে ভুল ধরা পড়েছে। ধ্বনি আর বর্ণের পার্থক্যকে তিনি ধরতে পারেননি। পদ বিভাগের ক্ষেত্রে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার উল্লেখ করলেও বিশেষণ ও সর্বনামের কথা বলেননি। আলোচনা করেননি সংযোজক ও অন্য অব্যয়ের কথা। তবে ব্যাকরণের যে মূল কাঠামো তিনি রচনা করেছিলেন, তার জন্য তিনি পাশ্চাত্য ব্যাকরণ চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

স্টোইক গোষ্ঠী :

গ্রিসে অবস্থিত স্টোইক গোষ্ঠী কাব্যতত্ত্ব ও দর্শনের মোড় থেকে বের করে এনে ভাষাকে পৃথক শাস্ত্র হিসেবে মর্যাদা দিলেন। এই গোষ্ঠী ভাষাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে জিনো এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলত জিনোর নেতৃত্বেই ভাষা স্বতন্ত্রবিদ্যার মর্যাদা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জিনো নিজেও সম্মিলিতভাবে ভাষাচর্চার অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের আলোচিত বিষয় হল—

ক. ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

খ. ভাষায় ব্যবহৃত শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

গ. প্রয়োগগত পরিভাষা ব্যবহারের ব্যাপারেও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

ঘ. ধ্বন্যাত্মক উদ্ভব তত্ত্বের আলোচনা প্রথম করেন এই স্টোয়িক সম্প্রদায়ই। শুধু তাই নয় এঁরা ভাষার অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন নিয়েও আলোচনা করেন। পদ পরিবর্তনের ধারণাও প্রথম আলোচনা করেছিলেন এঁরাই।

ঙ. কারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও এঁরা করেন।

গ্রিসে কারকের ধারণা গিয়েছিল ল্যাটিন থেকে ফরাসিদের মাধ্যমে। তাঁদের কাছে কারকের অর্থ ছিল 'পতন'। কিন্তু স্টোয়িক গোষ্ঠী কারক সম্পর্কে অন্য এক ধারণা দেন। বিশেষ করে কর্তৃকারক সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

চ. এই সম্প্রদায় চিহ্ন বা প্রতীকের অর্থ কি, সেটি আলোচনা করেননি।

আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী :

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্টোইক সম্প্রদায় ভাষাচর্চাকে যে স্বতন্ত্রবিদ্যার মর্যাদা দিয়েছিল, তাকেই পূর্ণতা দেন গ্রিসের সম্প্রদায় আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী। খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতকে আর্বিভূত হয়ে এই আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী ভাষাতত্ত্বচর্চাকে একেবারে উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বজাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কগত দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মিশফের আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে আলেকজান্ডার তার প্রিয় শাসককে সেখানে পাঠান। তাই এই শহরটি জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান হয়েছিল। এমনকি জানা যায় আলেকজান্দ্রীয়া শহরে অ্যারিস্টটলের নিজস্ব একটা পাঠগৃহ ছিল। এবং সেখানে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাগম হতে থাকে। সেখানে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীই আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিসের ব্যাকরণ চর্চায় এই আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। ওঁদের প্রধান প্রবক্তা হলেন দিওনুসিত্তস থ্রাক্স (Dionusios Thrax)। তিনি গ্রিক ভাষার যে ব্যাকরণ রচনা করেন, সেটি হল 'তেকনে গ্রামাতিকে'। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রিক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত দিকই এখানে আলোচিত হয়েছে। মোট কথা এই গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রথম 'Grammar' শব্দটি এসেছে। গ্রন্থটিতে থ্রাক্সের যেসব অবদান আছে, সেগুলি হল—

(ক) তিনি এখানে ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ব্যাকরণ হল ভাষার প্রায়োগিক জ্ঞান। আরও বলেন ব্যাকরণের ছ-টি অংশ আছে। যথা—শুদ্ধ উচ্চারণ, প্রধান কাব্যিক গূঢ়োক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা, শব্দমালা ও পৌরাণিক উদাহরণের সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা, শব্দের ব্যুৎপত্তির আবিষ্কার, সাদৃশ্যের আবিষ্কার এবং কবিদের রচনা সম্পর্কে নানা সমালোচনাসহ সিদ্ধান্ত।

(খ) গ্রিক ভাষায় যে চব্বিশটি বর্ণ আছে, তার আলোচনাও তিনি করেছেন। প্রধানত আলফা ও মেগা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেছেন স্বরবর্ণ ৭টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ১৭টি। তিনিই প্রথম বলেন স্বরবর্ণ অন্যের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে।

(গ) অক্ষর বিন্যাস রীতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন অক্ষর তিন রকমের। যথা—স্বর দিয়ে গঠিত, ব্যঞ্জন ও স্বর দিয়ে গঠিত ও স্বরের অর্ধেক নিয়ে গঠিত অক্ষর।

(ঘ) অ্যারিস্টটলের মতো থ্রাক্সও ভাষাকে কয়েকটি উপাদানে ভাগ করেছেন। উপাদানগুলি হল—Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Participle, Article, Preposition, Conjunction। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের আলোচনায় যে ঘাটতি ছিল, তা পূরণ করেন।

(ঙ) লিঙ্গ, বচন, রূপ ও কারক নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা—পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও নিরপেক্ষ লিঙ্গ। এ ছাড়াও আর একটি লিঙ্গের কথাও বলেছেন। তা হল—সাধারণ লিঙ্গ। বচনের ক্ষেত্রে বলেছেন বচন তিন প্রকার। যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। কারকের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বিশেষ্যের পাঁচটি কারক আছে। যথা—কর্তৃকারক, কর্মকারক, সম্প্রদান কারক, সম্বন্ধ কারক ও সম্বোধন কারক।

(চ) ক্রিয়া বিশেষণ শব্দটিকে তিনি বোঝালেও, ক্রিয়া বিশেষণের এমন একটি অংশ যার কোনো কারক নেই। ক্রিয়ার মোট আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি বলেছেন। পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন পুরুষ হল তিন প্রকার। যথা—প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ। ক্রিয়ার কালকেও তিন ভাগে ভাগ করেছেন। —বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তবে সর্বনাম সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে এবং এটি বাক্যের একটি অংশ মাত্র।

(ছ) আমরা বাক্য কীভাবে তৈরি ও বিশ্লেষণ করি, তা বোঝাতে থ্রাক্স 'Syntaxis' কথাটি ব্যবহার করেন। তবে বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি। আর রূপতত্ত্বের মূল কাঠামো তিনি বিধিবদ্ধ ভাবেই আলোচনা করেছেন।

সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যায় থ্রাক্সের ব্যাকরণ প্রাচীন ভাষাতত্ত্বচর্চায় অনেকটা গুরুত্ব পেয়েছিল। বিশেষ করে এই ব্যাকরণটি পূর্ববর্তীদের ভাষাতত্ত্বচর্চার অনেক ঘাটতি পূর্ণ করেছিল। বলা যায় থ্রাক্সই গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তাঁরই হাত ধরে পরবর্তীতে আসেন আরও কয়েকজন বৈয়াকরণ।

আপোলোনিত্তস দুস্‌কোলোস :

থ্রাক্সের পরপরই খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি অতীতের ভাষাতত্ত্বচর্চাকে অনেক দূর প্রসারিত করেন। তিনি সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিচার বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ রচনা করেন অনেকগুলো। তবে তাঁর লিখিত ব্যাকরণের কোনোটিই আজ আর পাওয়া যায় না। থ্রাক্স syntaxis শব্দটি আবিষ্কার করলেও আলোচনা করেননি। যেখানে দুসকোলোস সেই বাক্যতত্ত্বের আলোচনাকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন বলেই জানা যায়। শুধু তাই নয় ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দুসকোলোস আলোচনা করেন। সেটি হল ইলিয়ড ও ওডিসির পাঠোদ্ধার ও টীকাকরণ। থ্রাক্স সেটা না করলেও ইলিয়ড ও ওডিসির স্বরাঘাতবিধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোট কথা প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চায় তাঁর ভূমিকা একেবারে কম নয়।

হেরোদিয়ানুস :

দুসকোলোসের পুত্র হেরোদিয়ানুস পিতার মতই ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মনোনিবেশ করেন। গ্রিক ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি উদঘাটন করেছেন। সেটি হল ধ্বনির ছন্দোগুণ ও অবিভাজ্য স্বনিম। তিনি গ্রিক ভাষার স্বরাঘাতবিধি ও বিরামবিধি আলোচনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন সূত্র আলোচনা করেছেন।

এইভাবে সফিস্ট সম্প্রদায় থেকে শুরু করে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, স্টোয়িক গোষ্ঠী, আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী, দুস্‌কোলাস ও হেরোদিয়ানুস্‌ প্রত্যেকেই গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁদের আলোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। যেমন—

ক. তাঁদের ভাষাতত্ত্বচর্চা নিজেদের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য ভাষাকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি। ফলে তাঁদের আলোচনা ব্যাপকতর হয়নি।

খ. ভাষাতত্ত্বচর্চায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যায় তাঁদের মধ্যে। তাঁরা নীতিশাস্ত্র ও দর্শনের দৃষ্টিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য আর প্রমাণের ঘাটতি থেকেই গেছে।

গ. তাঁদের ভাষাদৃষ্টি গ্রিক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁরা অন্য ভাষার গঠনগত স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারেননি। আর তাছাড়া অ্যারিস্টটল কাব্যের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন 'The Interprettion' গ্রন্থে। চলমান ভাষাকে নিয়ে আলোচনা করেননি।

ঘ. জীবন্ত ভাষার কোনো আলোচনা গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চায় হয়নি। আর তাঁদের আলোচনায় যুক্তির অভাব ছিল।

ঙ. তাঁরা বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি। তাঁদের ভাষা বিচার করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। আবার তাঁদের পদ্ধতি সবটা সঠিক ছিল না। কিন্তু তা সংশোধনের চেষ্টাও তাঁরা করেননি।

চ. আধুনিক কালে আমরা ব্যাকরণকে যে 'গ্রামার' বলি, সেটি গ্রিকরা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন সত্য, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।

তবে মূল্যায়নে ঘাটতি ধরা পড়লেও তাঁদের ব্যাকরণ চর্চায় প্রভাবেই কিন্তু বিজিত রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল। গ্রিসে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে ভাষাতত্ত্বচর্চায়ও বিপর্যয় দেখা দেয়। রোমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রিসে হানা দিলে গ্রিসের সংস্কৃতি চর্চার ধারা ক্রমশ রোমের সংস্কৃতি চর্চার ধারায় পরিণত হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চায় এখানেই অবসান ঘটে। কিন্তু রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে পরিণত করার পিছনে কার্যকরী ছিল গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চা।

৭.১.১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রাচীন গ্রীসে ভাষাতত্ত্বচর্চা বিবরণ দাও।

৭.১.১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২

প্রাচীন রোমে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম :

৭.১.২.১ প্রাচীন রোমে ভাষাতত্ত্বচর্চা
৭.১.২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.১.২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.১.২.১ : প্রাচীন রোমে ভাষাতত্ত্বচর্চা

পাশ্চাত্যে ভাষাতত্ত্বচর্চা প্রতিষ্ঠা লাভ করে মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। ভাষাজিজ্ঞাসার সূত্রপাতও হয় ইউরোপীয় ভাষাসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। তবে ভাষাতত্ত্বচর্চায় সবথেকে বেশি এগিয়ে ছিল প্রাচীন গ্রিস। আর এই গ্রিসের পরই রোমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রিকরা শিল্প-সাহিত্যে উন্নত হলেও রোমানরা ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন। দেশজয়ের আকাঙ্খায় মত্ত ছিল তারা। হিব্রু ভাষাকে শ্রেষ্ঠ মনে করত তারা। কিন্তু তাদের ধারণা পরবর্তীতে বদলে যায়। লাতিন ভাষাকে তারা শিল্প ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক মনে করে। কিন্তু গ্রিস রোমের অধীনস্থ হওয়ার পর গ্রিসের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের সংস্পর্শে এসে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের মনে কৌতূহল জেগে ওঠে। গ্রিক সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন তাদেরকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রিকদের অনুসরণ করতে থাকে। তাই ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও তারা গ্রিক মনীষীদের কাঠামো অনুসরণ করেছিল।

রোমে ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে যার নাম সবার আগে আসে তিনি হলেন বৈয়াকরণ ক্রাতেস (*Krătĕs*)। রোমে ভাষাতত্ত্বচর্চার শুরু মূলত ক্রাতেসের প্রেরণা থেকেই। শোনা যায় খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতকে গ্রিসের বৈয়াকরণ ক্রাতেস রোমে এসে অসুস্থ হন। ফলে দীর্ঘদিন রোমে থাকেন তিনি। এই সময় ভাষা সম্পর্কে তিনি একটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। আর তাঁর বক্তৃতা শুনে রোমানরা গ্রিক ভাষাদর্শন সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় এবং গ্রিক ব্যাকরণের আদর্শে লাতিন ব্যাকরণ রচনা করে। শুধু ক্রাতেস নয় গ্রিক পণ্ডিতদের সাহচর্য রোমের ভাষাচর্চার উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

ভারো :

রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা' নামের ব্যাকরণটি রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। এটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত। গ্রন্থটির রচয়িতা বৈয়াকরণ ভারো। তিনি এই গ্রন্থটি যখন রচনা করেন তখন রোমে গ্রিসের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। তাই গ্রন্থটিতে মৌলিকতা আছে। তবে সম্পূর্ণরূপে গ্রিক প্রভাব মুক্ত নয় গ্রন্থটি। গ্রিক বৈয়াকরণ প্লেটো 'কথোপকথন' গ্রন্থে প্রকাশিত ভাবের সঙ্গে ব্যবহৃত ধ্বনির সম্পর্ক বিষয়ে যে বিতর্ক আলোচিত। এ ছাড়া ভারো পরবর্তীতে গ্রিস দেশের কয়েকটি ব্যাকরণ গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানগুলি হল—

ক. লাতিন ভাষার যে-কোনো অর্থযুক্ত শব্দকে তিনি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বলে মনে করতেন।

খ. বিভিন্ন প্রত্যয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন।

গ. সাদৃশ্যবাদীরা এবং বৈসাদৃশ্যবাদীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ অ্যারিস্টটল করেছিলেন, ভারোও তা করেন।

কুইন্তিলিয়ানুস :

গ্রিক ব্যাকরণের আরও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলেন কুইন্তিলিয়ানিস। ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদান কোনো মতেই ভোলার নয়। বৈয়াকরণ ভারোর পরেই তাঁর আর্বিভাব। তিনি লাতিন ভাষায় একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি লাতিন ভাষার দ্বিতীয়তম ব্যাকরণ। ব্যাকরণটি হল 'ইন্সতিতুতিও ওরাতোরিও'। গ্রন্থটিতে মৌলিকতা খুব একটা নেই। তবে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে নানা আলোচনা এখানে আছে। গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলে মনে করা হয়। গ্রিক দার্শনিকদের গ্রন্থ পড়ে কুইন্তিলিয়ানুস গ্রন্থটি রচনা করেন বলে তাঁর স্বাতন্ত্র্যতা এখানে ধরা পড়েনি। তবে এখানে তিনি সাহিত্যতত্ত্ব, বক্তৃতাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণতত্ত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন। ভাষাতত্ত্বের যে দিকগুলি কুইন্তিলিয়ানুস তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তা হল—

ক. তিনি এখানে ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

খ. ব্যাকরণের পাশাপাশি সাহিত্যতত্ত্ব এখানে আলোচিত হয়েছিল।

গ. বক্তৃতাবিজ্ঞান সম্পর্কেও কিছু কথা এখানে আলোচিত।

তবে 'ইন্সতিতুতিও ওরাতোরিও' গ্রিক প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ায় রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারেনি।

দোনাতুস :

কুইন্তিলিয়ানুসের পরেই খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময় রোমে আবির্ভূত হন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ দোনাতুস। রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদান খুবই বেশি। কারণ তাঁর রচিত ব্যাকরণ 'লাতিন ব্যাকরণ' ই হল লাতিন ভাষার প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। শুধু তাই নয় এই ব্যাকরণটি রোমের প্রথম মৌলিক ব্যাকরণ। এবং এটি রোমানদের উপর এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, এটির প্রতিটি অক্ষর কাঠের উপর যত্ন করে খোদাই করা হয়েছিল। দোনাতুসের এই ব্যাকরণ প্রাথমিক শিক্ষার কাজেও অত্যন্ত সহায়ক গ্রন্থ।

প্রিস্কিয়ানুস :

দোনাতুসের আদর্শ 'লাতিন ব্যাকরণ' রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চায় যে জোয়ার আনে, তাতেই সৃষ্টি হল অন্যান্য নতুন গ্রন্থ। এগিয়ে এলেন নতুন নতুন বৈয়াকরণ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রিস্কিয়ানুস হলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কারণ তিনিই হলেন 'ইন্সতিতুতিওনেস গ্রামাতিকাএ' নামের লাতিন ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির রচয়িতা। ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্বচর্চায় সংস্কৃত বর্ণনামূলক ব্যাকরণ যেমন পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ তেমনি প্রিস্কিয়ানুসের 'গ্রামাতিকাএ'ও বর্ণনামূলক ব্যাকরণগ্রন্থ। গ্রন্থটিকে আদর্শ লাতিন ব্যাকরণের মর্যাদা দেওয়ার কারণ হল, প্রিস্কিয়ানুস এই গ্রন্থে প্রাচীন রোমের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত সূত্রের উল্লেখ করেছেন এখানে। পাশাপাশি ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার প্রিস্কিয়ানুসের সময় রোমে রাজনৈতিক দিকটি অস্বস্তিতে ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের দরুন রোমের পরিবেশ ভাষাতত্ত্বচর্চা ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল না। তাই বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা রোম ছেড়ে কন্সট্যান্টিনোপোলের রাজধানী বসপোরাসে আশ্রয় নেন। আর এখানেই তিনি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে তিনি গ্রিক বৈয়াকরণ অ্যারিস্টটল ও প্লেটোকে অগ্রাহ্য করেননি, বরং স্বীকার করেছেন। এবং তাঁদের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব নিয়েই লাতিন ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণটি রচনা করেছেন।

ক. প্রিস্কিয়ানুসের এই ব্যাকরণ গ্রন্থে লাতিন ভাষার প্রায় সবকটি সূত্রই আছে। পাশাপাশি সূত্রগুলির বিশ্লেষণও আছে। ডাইকোলাসের আদর্শ অনুযায়ী প্রিস্কিয়ানুস তাঁর ব্যাকরণকে মোট আঠারোটি অসম দৈর্ঘ্যে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে ষোলোটি অধ্যায় আছে শব্দ সম্পর্কে ও শেষ দুটি অধ্যায় আছে বাক্য সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। প্রথম থেকে ১৬টি অধ্যায়কে বলা হয় 'প্রিস্কিয়ানুস মাইনর' ও শেষ দুটি অধ্যায়কে বলা হয় 'প্রিস্কিয়ানুস মাইওর'।

খ. ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাকরণের অর্থতত্ত্বীয় ও আকারগত আদর্শ প্রয়োগ করেন। তবে অনেক সময় আকারগত আদর্শ অনুসরণের ফলেই ভাষা আলোচনায় স্পষ্টতা এসেছে।

গ. প্রিস্কিয়ানুস ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন চার রকমের। যথা—১. প্রথম শ্রেণির ধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুলির অর্থগত সম্পর্ক আছে। ২. দ্বিতীয় শ্রেণির ধ্বনি অর্থের জন্য উচ্চারিত নয়। ৩. তৃতীয় শ্রেণির ধ্বনি লেখার জন্য ব্যবহৃত। কিন্তু ৪. চতুর্থ শ্রেণির ধ্বনি লেখা বা উচ্চারণ করা যায় না।

ঘ. অক্ষর সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অক্ষর হল নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত একক স্বরাঘাতযুক্ত। একেও লিখিতরূপে ব্যবহার করা যায়।

একটি বর্ণ দিয়েও অক্ষর হয়। আবার ছ-টি বর্ণ দিয়েও অক্ষর হতে পারে। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন লাতিন ভাষার সব স্বরবর্ণ দিয়েও অক্ষর হতে পারে।

ঙ. রূপতত্ত্ব (Morphology) সম্পর্কেও তিনি বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন।

চ. অ্যারিস্টটল ও থ্রাক্সের পদ বিভাগ অনুসারেই তিনি পদ বিভাজন করেন। পদকে তিনি আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা— Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Participle, Preposition, Conjunction ও Interjection। থ্রাক্স কিন্তু Interjection-এর কথা বলেননি। শুধু তাই নয় তিনি ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়া বিশেষণকে নিয়েও আলোচনা করেছেন।

ছ. বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কেও বিধিবদ্ধ আলোচনা করেছেন থ্রাক্স। তাঁর নিজের মন্তব্য, বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে সমস্ত তত্ত্বই সমীক্ষা অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে বাক্যতত্ত্ব বিচারে তিনি অর্থের উল্লেখ

করেছেন সত্য, কিন্তু অর্থের প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলেননি। ফলে তাঁর ব্যাকরণ চর্চায় অসঙ্গতি কিছুটা হলেও এসেছে।

অতএব বলা যায় প্রিস্কিয়ানুস ক্রমশ ব্যাকরণকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রভাব শুধু তাঁর সময়ই নয়, পরবর্তী কয়েক শতক ধরেই পড়েছিল। এই গ্রন্থটি সবার সামনে আদর্শ রূপে দাঁড়িয়েছিল।

আয়েলফ্রিক :

খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে আয়েলফ্রিক ভাষাতত্ত্বচর্চায় অংশ নেন। তিনি প্রিস্কিয়ানুসের পথই অনুসরণ করে 'কোলেকুইয়াম' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি লেখেন। এটি পুরোপুরি নির্দেশমূলক ব্যাকরণ। প্রিস্কিয়ানুসের প্রভাব এড়ানোর ক্ষমতা আয়েলফ্রিকের ছিল না ঠিকই, তবে তিনিই প্রথম চলিত ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে চলিত লাতিন ভাষায় কথোপকথন শিক্ষা-বিষয়ক ব্যবহারিক গ্রন্থ রচনা করেন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'De Interpretion' গ্রন্থে যে চলিত রীতিকে প্রাধান্য দেবার কথা বলেছিলেন আয়েলফ্রিক তা মেনেছেন এই গ্রন্থে। প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণকে সামনে রেখে আয়েলফ্রিক ব্যাকরণ রচনা করলেও এটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার গ্রন্থ। কারণ এটিই চলিত ভাষা সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ। কারণ এটিই চলিত ভাষা সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ এটা বলা যায়। তিনিই প্রথম বইয়ের ভাষাকে ত্যাগ করে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অবশ্য সেই ভাষাকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

এ ছাড়াও রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে এসেছেন আরও কয়েকজন বৈয়াকরণ। যেমন—খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভিলেদ্যুর আলেকজান্দার 'দক্তিনেল' নামে একটি ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লেখেন। এটি পদ্যে লেখা। তবে বিশেষ মৌলিকতা এখানে তিনি দেখাতে পারেননি।

সুতরাং বোঝা যায় প্রাচীন গ্রিস থেকেই রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস শুরু হয়। তারপর নানা বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত সেই ভাষাতত্ত্বচর্চাকে আরও অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রিক বৈয়াকরণ ক্রাতেসের অনুপ্রেরণায় রোমে যে ভাষাতত্ত্বচর্চায় জোয়ার এসেছিল, তা একটু একটু করে পরিণতিতে এগিয়ে দিয়েছে কুইন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিস্কিয়ানুস ও আয়েলফ্রিকের মতো বৈয়াকরণরা। আর এভাবেই রোমের ভাষাবিজ্ঞান চর্চা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে উন্নীত হয়। এরপর ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যান্টিনোপল পতনের পর গ্রিস ও রোমে ভাষাতত্ত্বচর্চার অবসান ঘটে। গ্রিস ও রোমের ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইতালিতে আশ্রয় নেয় এবং ইতালিতে নবজাগরণ ঘটে।

৭.১.২.২: আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। প্রাচীন রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় দাও।

৭.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৩৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মুজমদার, দেজ পাবলিশিং

৮। 'ভাষা-দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) —অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি

————————

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ৩

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি

বিন্যাসক্রম :

৭.১.৩.১ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি

৭.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.১.৩.১ : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমি

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ইংরেজি নাম 'Comparative Linguitics'. নাম শুনেই বোঝা যায়, এই ভাষাতত্ত্বে একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয়। অর্থাৎ একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই এই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। এককথায়, যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে সেই ভাষার জন্ম-উৎসের ইতিহাস নির্ণয় করা হয়—তাই-ই হল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। তাই তুলনামূলক ভাষার বিজ্ঞানে তুলনা করার জন্য একাধিক ভাষার প্রয়োজন হয়, যেমন বাংলা ভাষার কোনো শব্দ বা বাক্যের আদিরূপ নির্ণয় করতে হলে অসমিয়া, ওড়িয়া বা হিন্দির প্রসঙ্গ যেমন আসতে পারে—তেমনি ইংরেজি বা চিনা ভাষার প্রসঙ্গও এসে যেতে পারে। এইভাবে একাধিক ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, তারা আলাদা আলাদা ভাষাবংশে হলেও মূলত একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ভারতেই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত হয়েছে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'Royal Asiatic Society'-র সভাপতি স্যার উইলিয়াম জোনস (William Jones) এক বক্তৃতাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ আনেন। কিন্তু এই ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা এর পটভূমি হিসেবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. নানা দেশ ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক অভিযান।

খ. তুর্কিদের কন্সট্যান্টিনোপল অধিকার।

গ. মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ঘ. মিশনারীদের ধর্মপ্রচার।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের (১৯৪২) পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং একাধিক ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রাশ্চাত্যের ভাস্কো-দা-গামার আগমনের প্রভাব সূদরপ্রসারী। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ম্যাকমিলান বলেছেন—

> "perhaps no event during the middle ages hed such for reaching reprecussions on the civiliged world as the opening of the sea route to India."

প্রকৃতপক্ষে এই নতুন পথটি আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে নবজাগরণ ঘটে, অন্যদিকে ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে ইউরোপীয়রা অবহিত হয়ে ওঠে। এবং তাদের তুলনামূলক ভাষা অধ্যয়নে স্থান পায় সংস্কৃত ভাষা। রোমানরা গ্রিস অধিকার করার পর কন্সট্যান্টিনোপলই গ্রিক পণ্ডিতদের বিদ্যাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তুর্কিরা যখন কন্সট্যান্টিনোপল দখল করে তখন সেখানকার গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতরা ইতালিতে আশ্রয় নেয়। ফলে ইতালি গ্রিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। ইতালি শিল্প সাহিত্য চর্চায় গ্রিক ও রোমানদের থেকে দূরে থাকলেও শিল্পের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল। তাই তারা গ্রিক ও ল্যাটিন শিল্পসাহিত্য গ্রহণ করেন। এর ফলে পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে নবজাগরণ দেখা যায়। এই সময় গ্রিস, ইতালি, রোমের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

জার্মানিতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। মুদ্রিত হবার ফলে মানুষের হাতে আসে। এতে বিভিন্ন ভাষার মানুষ তাদের ভাষার সাথে অন্য দেশের ভাষার তুলনামূলক চর্চার সুযোগ পায়। তাহলে, পাশ্চাত্য দেশে নবজাগরণের যুগে যে ভৌগোলিক অভিযান শুরু হল এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হল তার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এতে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য ও সাদৃশ্য যতই ধরা পড়তে থাকে ততই ভাষাবিদদের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে শুরু করে।

১২০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের সময় মঠ মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রভাব দেখা যায় ধীরে ধীরে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এই সময় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলের অনুবাদ করে বিভিন্ন ভাষায় এবং তা পৌঁছে দেয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে। এতে বিভিন্ন দেশের মানুষ শুধুমাত্র ধর্ম নয়, তুলনামূলক ভাষাচর্চায়ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে স্যার উইলিয়াম জোনস কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন তাতেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়। কারণ এই বক্তৃতায় তিনি লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তীয় প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি প্রথম ধরিয়ে দেন। অবশেষে আলোচনার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই সমস্ত ভাষা একটিমাত্র ভাষাবংশ থেকে জন্মলাভ করেছে। সেই ভাষাবংশ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষকরা উইলিয়াম জোনসের এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। যদিও আগেই স্পেনীয় ইহুদি ইব্‌ন্ বারুন্ আরবি ও হিব্রু ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, তবুও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত হয় নবজাগরণ সূচিত হবারও প্রায় তিন শতাব্দী পরে জোনসের হাত ধরে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন নাম ছিল সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোনস কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। জার্মান মনীষী হের্ডার, হুমবোল্ট, গ্যেটে এবং শিলার শকুন্তলা পাঠে মুগ্ধ হন। এবং তাঁদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ওই মনীষীরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ভারতের মাটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই ধারার বিকাশ হয়েছিল জার্মানিতে। জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেল এ ব্যাপারে ভূমিকা নেন। তিনি পৃথিবীর ভাষাগুলোর তুলনা করে তার উৎস, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করেন। 'On the Language and Wisdom of the Indians' গ্রন্থে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রয়োগ করেন। এখানে বিভিন্ন ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে তাদের বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ শ্লেগেল দিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "The work is considered the first attempt at Indo-Germanic linguistics and the starting point at the study of Indian languages and comparative philology."

শ্লেগেলের নেতৃত্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য পরবর্তীতে রাস্ক, বফ, গ্রীম, হের্ডার, হুমবোল্ট প্রমুখ মনীষী তুলনামূলক ভাষাচর্চার পথকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান।

৭.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি আলোচনা করো

৭.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

একক-৪

ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৭.১.৪.১ ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৭.১.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.৪.১: ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভাষার প্রচলন আছে। এই ভাষাগুলিকে যে ছ-টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে ভাষার আদি, উৎস, বংশ নির্ণয় এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপরেখা চিত্রিত করা হয়। এই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাচীন নাম ছিল 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব' (Philological linguistics)। এই ধারার প্রথম সূচনা হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। এই সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের মধ্যে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের জন্ম, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের যে রূপরেখা অঙ্কন করা হত আধুনিককালে তা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে পরিগণিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধুনিককালে শুধু প্রাচীন নয় আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও তুলনা করা হয়। ভারতে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয় এবং তার সূত্রপাত করেন স্যার উইলিয়াম জোনস। তিনি কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়েছিল—

> "The Sanskrit language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquistitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine then all three, with out believing them to have sprung from some common source, which perhaps, no longer exists. There is a similiar reason, though notquite so forcible, for supposing that both the Gothic and Celtic, though blended with a different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the old persian might be added to the same family."

এর তিনবছর পর জোনস কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এর ফলে কালিদাসের নাটকের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এরপর জার্মান মনীষী হের্ডার, হুমবোল্ট, গ্যেটে ও শিলার শকুন্তলার পাঠে মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলা সম্পর্কে নানা প্রশংসা করেন।

ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস ঘাটলে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগেও কিন্তু স্পেনীয় ইহুদি ইবন বারুনের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আরবি ও হিব্রু ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রন্থ লিখেছিলেন। তবে শুধুমাত্র তুলনা করেন, কোনো ভাষার জন্ম উৎসের নির্দেশ দেননি। এই কারণে স্যার উইলিয়াম জোনসকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রতিষ্ঠাতা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।

ভারতবর্ষের মাটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হলেও এই ধারার বিকাশ ঘটে জার্মানিতে। এখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেন ফ্রীদ্রিশ শ্লেগেল। এই ধারা অব্যাহত রাখেন হুমবোল্ট, র‍্যাসসুস ক্রিস্টিয়ান রাস্ক, ফ্রান্‌ৎস বপ্, য়্যাকপ গ্রীম প্রমুখ।

৭.১.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি আলোচনা করো

৭.১.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

পর্যায় গ্রন্থ -২

একক - ৫

পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৭.২৫.১ পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৭.২.৫.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৫.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.৫.১ : পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

১৭৮৬ তে স্যার উইলিয়াম জোনসের হাত ধরে যে নতুন ভাবে ভাষাতত্ত্বচর্চার শুরু হয়েছিল, তার ফলে জার্মানিতেও ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয়।

শ্লেগেল :

তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। জার্মানিতে শ্লেগেলই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বীজ বোনেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তুলনামূলক ব্যাকরণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যাকরণ শব্দটি শ্লেগেলের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

শ্লেগেল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Language and Wisdom of the Indians'.। এখানে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি এখানে বিভিন্ন ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে তাদের বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু উৎস নয়—একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের ভিতরের ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বের করে ভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য নির্ণয় যে সম্ভব সে কথাও তিনি বলেছেন। এই কারণেই গ্রন্থটির অপরিসীম গুরুত্ব আছে। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> "The work is considered the first attempt at Indo-Germanic Linguistics and the starting point of the study of Indian Languages and comparative philology."

হুমবোল্ট :

শ্লেগেলের প্রায় সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানী হলেন হুমবোল্ট। অনেকে তাঁকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। তবে এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ শ্লেগেলই জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তবে হুমবোল্ট মালয় পলিনেসীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁর অবদান স্মরণীয়। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানেও তিনি প্রথম ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটার কথা বলেছেন। এ ছাড়া বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার বর্গীকরণও করেছিলেন। আর ভাষার মনোগত দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন বলেই, তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে হুমবোল্ট অবহেলার পাত্র ছিলেন না।

ফ্র্যানৎস বপ্ :

শ্লেগেলের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকে পর্যাপ্ত দৃষ্টান্তসহ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আলোচনার রূপদান করেন যে তিনজন ভাষাতত্ত্ববিদ্, তাঁদের অন্যতম হলেন ফ্রানৎস বপ্। তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক, লাতিন, পারসিক, জার্মানিক, লিথুয়ানীয়—প্রভৃতি ভাষার একটি তুলনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রিক, লাতিন, পারসিক ও জার্মানিক ভাষার সঙ্গে তুলনা করে সংস্কৃতের ক্রিয়ারূপ নিয়ে গঠিত গ্রন্থটির নাম 'উয়েবর্ দাম্ কোন্‌য়ুগাৎসিওন্স জিস্‌টেমদ্যের জানাস্ক্রিট স্প্রাখে ইন ফ্যেরগ্লাইশুং সিট্

য়েনেস্দ্যের গ্রীশিশেন লাটাইনিশেন্। প্যেরজিশেন্ উন্ট্ গ্যের্মানিশেন্ স্প্রাখে।' এটি তুলনামূলক ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ রচনা। তবে এখানে তিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষা সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জার্মান ভাষার তুলনা করে আর একটি গ্রন্থ লেখেন, যার নাম 'ফ্যেরগ্লাইশেন্ডে গ্রামাটিক দেস্ জান্স্ক্রিট্ জেন্দ, গ্রীশিশেন্ লাটাইনিশেন্, গোটিশেন্উন্ট ভয়টশেন্'।

র‍্যাসসুস ক্রিস্টিয়ান রাস্ক :

রাস্ক জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল 'উনদ্যের স্যেগেল্সে অম্ দ্যে গাম্লে নরদিস্কে এলের ইস্লান্দস্কে স্প্রোক্ ওপ্রিন্দেলসে'। এখানে তিনি টিউটনিক শাখার ভাষার ধ্বনির মধ্যে একটি নিয়মিত বিধিবদ্ধ পার্থক্যকে প্রথম স্পষ্ট করে দেখালেন। তিনি এখানে বলেছেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্যান্য শাখায় ভাষায় যেখানে 'প' (p) হয়, সেখানে টিউটনিক শাখায় ভাষায় উষ্ম 'ফ' (f) হয়। এ ছাড়া তিনি আবেস্তার পুঁথি সংগ্রহ করে তার ভাষাকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্দের সামনে তুলে ধরেন। ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার কিছু মূল উপাদান এখানে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাচীন নর্স ও প্রাচীন ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'ফেয়লেৎনিং তিল দ্যেৎ ইস্লান্দ্স্কে এলের গাম্লে নর্দিস্কে স্প্রোর'।

য়াকপ গ্রীম :

রাস্কের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে যান য়াকপ্ গ্রীম। রাস্কের তথ্যকে তিনি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন। গ্রীম এই ধ্বনিকে নাম দেন জার্মানিক ধ্বনি পরিবর্তন। এটি পরবর্তীতে 'গ্রীমের সূত্র' নামেই খ্যাত হয়। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ব্যাকরণ 'ডয়ট্শে গ্রামাটিক' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি জার্মানিক বা টিউটনিক শাখার ভাষা গথিক, স্ক্যান্ডিনেভীয়, ইংরেজি, ফ্রীজীয়, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণে তিনি ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করেন এবং মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেন। যথা—

অ. মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'প' (p) হয়েছে 'ফ' (f).

আ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ঘোষবৎ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি শাখায় ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যথা—

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	**জার্মানিক**
bh	= b
dh	= d
gh	= g

ই. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— p; t; k, k^w > f; o; x, x^w

তবে গ্রীমের এই সূত্র সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর গ্রীম এই সূত্রের মধ্যে নিজের এটি দেখতে পান। পরবর্তীতে তাই এই সূত্রের পূর্ণরূপ দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ের মধ্যে।

স্যাডল্ফ কার্ল ভের্নার :

গ্রীমের সূত্রে যে ঘাটতি ছিল তা পূর্ণ করেন স্যাডল্ফ কার্ল ভের্নার। তিনি গ্রীমের সূত্র নতুন ভাবে বিধিবদ্ধ করেন। ফলে তাঁর সূত্রের নাম হয় 'ভের্নার-এর সূত্র'। এই সূত্রে ভের্নার ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—৫০০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বাব্দের ধ্বনি পরিবর্তন ও খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর ধ্বনি পরিবর্তন। প্রথম প্রকারের ধ্বনি পরিবর্তনের তিনি নাম দিয়েছেন প্রথম ধ্বনি পরিবর্তন ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম দিয়েছেন দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন। তিনি বলেছেন ধ্বনি পরিবর্তন মূলত দুই ভাবে হয় । যথা—

ক. পশ্চিম জার্মানিক ভাষায় স্বরপরবর্তী পদমধ্যস্থ বা পদাতিক স্পর্শধ্বনি (p) জার্মানিক উপশাখায় দ্বিত্ব হয়ে উষ্মধ্বনি হয়েছে।

খ. শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে এবং দ্বিত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় পশ্চিম জার্মানিক শাখার (p) উপশাখায় এসে ঘৃষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

আউগুস্ট ফ্রিদ্রিস পট :

ভাষার ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে ফ্রিদ্রিস পটের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তাঁকে অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের জনক অভিধা দিয়েছেন। তিনি শব্দের প্রাচীনতম রূপটির আলোচনা যেমন করেছেন, তেমনি সেই রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষার রূপ নিয়েও আলোচনা করেন। এই তত্ত্ব তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ছাড়াও তিনি তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়েও আলোচনা করেন এবং ইন্দো-ইউরোপের ভাষাসমূহের ধ্বনির একটি তালিকা করে দেন।

আউগুস্ট শ্লাইগার :

এ ক্ষেত্রে শ্লাইগারের অবদানও যথেষ্ট। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেন, যার নাম 'কমপেন্ডিউস্‌ দ্যের ফ্যেরগ্লাইশেনডেন্‌ গ্রামাটিক দ্যের ইণ্ডো-গ্যেরমানিশেন্‌ স্প্রাখে।' এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে একটি নতুন তথ্য দেন। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে একে একে বিভিন্ন ভাষাবংশের উদ্ভবকে তিনি গাছ ও তার শাখাপ্রশাখার মতো করে এঁকেছিলেন। আর তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের চিত্র আঁকেন।

কার্ল ব্রুগম্যান :

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে ব্রুগম্যানের অবদান অপরিসীম। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'গ্রন্ড্রিশ দ্যের ফ্যেরগ্লাইশেন্ডেন গ্রামাটিক দ্যের ইন্ডোগ্যেরমানিশেন্ স্প্রাখ্যেন'। গ্রন্থটি ডেলব্রুকের সহায়তায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক দৃষ্টিতে আইরিশ, বুলগারীয়, জার্মানিক, গথিক, লিথুয়ানীয় প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে এই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ্ তুলনামূলক গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন এবং নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করতে থাকেন। সুতরাং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ।

একক - ৬

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

৭.২.৬.১ গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

৭.২.৬.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৬.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৮.১.২.৪ : গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয় ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৩০ সালে বা তার আগে। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে প্রথমে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হত। তবে পরবর্তীতে ভাষার ক্রিয়াগত দিকও পুনর্বিচার করা হয়। ভাষার সামাজিক ক্রিয়া এবং ঐতিহাসিক বা সমকালীন ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের একটা পার্থক্যও টেনে দেওয়া হয় এই ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে। প্রথমে ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস আলোচনা করা হল।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রথম প্রবক্তা হলেন ফার্দিনান্দ দ্য সসিউর। তিনি ভাষার গঠনগত দিকের কথা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়েই বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে—

> "Language is a system, and sould be studied as such: individual facts should not be taken in isoloation, but always as a while, takling into accouts that every detail is determined by its place within the system. Language is primarily a social phonomenon which serves the purpose of mutual understanding, and ought to be studied as such the correction of should and meaning should always be borne in mind, since it is of crucial importance in the process of communiciation. The evolution of language and its actual state are two fundamentally different phonomena, from the point of view of method it is inadmissable to bring historical criteria into the interpretation of the present state of language."

এই বক্তব্যে ভাষার গঠনগত দিকটিও চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা :

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা বা পর্যায় লক্ষ করা যায়। যথা—

ক. জেনেভা

খ. প্রাগদল

গ. গ্লস মেটিসিয়ান দল।

ইউরোপের জেনেভা দল গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দলটি সসিউরের ধ্রুপদী ধারা অনুসরণ করেছিল। সেইসময় এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও বর্তমানে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনো অবদান নেই।

প্রাগদলে অনেক খ্যাতনামা শ্লাভ ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। আপেক্ষক ভাষাতত্ত্বচর্চা করে এই দলটি। ধ্বনিরূপ কিভাবে যোগাযোগের চিহ্ন হিসেবে ক্রিয়াশীল তা তাঁরা আলোচনা করেন। ধ্বনিগত সমস্যাও তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল। দলটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এমনকী ধ্বনিতাত্ত্বিক দলরূপেও চিহ্নিত হয়েছিল এই প্রাগ দলটি।

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার তৃতীয় ধারাটি অনুসৃত হয় গ্লসমেটিসিয়ান দলের দ্বারা। কেউ কেউ এই দলটিকে নিও-সসিউরিয়ানইজম হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন। নির্বস্তুকের প্রতি এঁদের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল। সসিউরের ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের সঙ্গে দলটির বিশাল সাদৃশ্য ছিল। এমনকী বর্তমানে দলটি ভাষাচিহ্নের সাধারণ একটি সূত্র গঠনে প্রয়াসী। তবে বস্তুবাচক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে এই দলটি আগ্রহী নয়।

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা :

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপের ভাষাতাত্ত্বিকরা কিন্তু সসিউরকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তাঁরা মৌল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের গঠনগত দিকটি বর্ণনা করলেও পদ্ধতিগত ধারণার সঙ্গে মতানৈক্য ছিল ইউরোপের বা ফার্দিনান্দ সসিউরের ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। আমেরিকায় সপির ও ব্লুমফিল্ড গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সসিউরের সঙ্গে আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকদের বিরোধিতাও ছিল। যেমন সসিউরের মতে ভাষামনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এবং ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন মানুষের মধ্যে নির্বস্তুক সত্তারূপে অবস্থান করে। কিন্তু আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেন—ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার রূপটি স্পষ্টভাবে নির্দেশমত ও ভাষার গঠনরূপের মাধ্যমে ভাষা যারা ব্যবহার করবেন, তাদের ভাষাতাত্ত্বিক সচেতনতা আসবে। ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষা বস্তুগত ও পরীক্ষামূলক সত্য, তা মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ ফার্দিনান্দ দ্য সসিউরকে সরাসরি

বিরোধিতা করেছেন। আমেরিকায় দুটি দল গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যথা— ক. ইয়েল দল খ. হার্ভার্ড দল।

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। ব্লুমফিল্ডই প্রথম গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার জন্য একটি দল গঠন করেন। এটি বিভাজন পদ্ধতির প্রয়োগে গঠিত হয়। দলটি মনে করত কথা বলার সময় ভাষাতাত্ত্বিক এককের বিভাজন সূত্র প্রয়োগ করেই আপেক্ষিক সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। এই দলটি ছিল নিয়মগত পদ্ধতিতে বিশ্বস্ত। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অর্থের প্রত্যক্ষ যোগাযোগকে এঁরাও বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু দলটি ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় ক্ষেত্রে দলটির অবদান অনস্বীকার্য।

য়াকবসনও আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে এসে ভাষাতত্ত্বের এক নতুন দিক তিনি উন্মোচন করেন। স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যর তত্ত্ব ক্রমাগত আরোপ করেন তিনি ও তাঁর অনুগতরা। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভাজনের মানকেও তিনি স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ ব্লুমফিল্ডের ইয়েল দলকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার য়াকবসনের দলটি করেনি। ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য দলটি বিভাজনক পদ্ধতিই অনুসরণ করে। তবে ধ্বনিবিচারের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে দলটি। ব্লুমফিল্ড দলের আদর্শ, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও বিচার পদ্ধতি অধিকতর সাফল্য পায় এই হার্ভার্ড দলের সৌজন্যেই। সুতরাং আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে হার্ভার্ড দলের ভূমিকাও কম নয়।

তবে ইয়েল ও হার্ভার্ড দলের মধ্যে বিরোধ অনেক কমে যায় ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণে ইনফরমেশন থিওরি ও গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে। বর্তমানে আমেরিকার অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি ও হার্ভার্ড উভয় দলের পদ্ধতিই অনুসরণ করছেন। যেমন—রূপান্তর ও সৃজনমূলক ব্যাকরণের প্রবক্তা নোয়াম চমস্কি বিভাজন পদ্ধতি, গাণিতিক পদ্ধতি যেমন অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি হার্ভার্ড দলকেও গ্রহণ করেছেন। আবার হার্ভার্ড দলের সদস্য মরিসহালে একই সঙ্গে বিভাজন পদ্ধতি ও গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন তাঁর রূপান্তরমূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে। থিওরি অব ইনফরমেশনেও বিশ্বাসীও ছিলেন তিনি।

এ ছাড়া চাইনিজ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইয়েনরেন চাও গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'The Non-Unigueness of phonemic solution of phonetic system.'

ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানের গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার আলোচনা থেকে এই ভাষাতত্ত্বের যে দিকগুলি উঠে আসে, তা হল—এখানে ভাষার সাংগঠনিক দিক আলোচিত হয় বস্তুগত বিচারমানের সাহায্যে। শুধু ভাষাবিশ্লেষণ নয়, ভাষার ক্রিয়াগত দিকটিও গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রতিকল্পকের সাহায্যে ভাষার উপাদানেরও ক্রিয়াগত দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে কোনো সংজ্ঞা, সূত্র আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীক, সূত্র, নকশা ব্যবহার করা হয়।

৭.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বলতে কী বোঝো? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমি আলোচনা করো।

২। ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস আলোচনা করো।

৩। পাশ্চাত্যের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় দাও।

৪। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব বলতে কী বোঝো? ফের্দিনা দ্য সসিউর থেকে ইরেনরেন অবধি গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় দাও।

৭.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৩৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মুজমদার, দেজ পাবলিশিং

৮। 'ভাষা-দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) —অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি

————————

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৭

পাণিনির পূর্ববর্তী যুগে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাস ক্রম:

৭.২.৭.১ : পাণিনি পূর্ববর্তী যুগে ভাষাচর্চা

৭.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.৭.১: পাণিনি পূর্ববর্তী যুগে ভাষাচর্চা

প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বচর্চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পাণিনির কথা। খ্রি: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 'অষ্টাধ্যয়ী' প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণরূপে আজও বিবেচিত। সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে তিনি যেভাবে ভারতবর্ষে তথা সমগ্র পৃথিবীতে 'বর্ণনামূলক' ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। তাঁর আমলেই প্রাচীন ভারত ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় উচ্চ শিখরে উঠেছিল। তবে পাণিনির আগেও প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার সূচনা হয় বৈদিক যুগে। বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে বিধিবদ্ধ আলোচনা না থাকলেও ভাষা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে মধ্যে গভীর তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যেহেতু ওগুলি ভাষার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নয়, তাই এগুলিকে ভাষার ব্যাকরণ বলা যায় না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বচর্চায় তা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের আর্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। বেদের 'সংহিতা মন্ত্রে' প্রথম ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। ভাষা বিশ্লেষণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণ যজুর্বেদে। সেখানে বলা হয়েছে বাক্ প্রথমে অপ্রত্যক্ষ ও অব্যক্ত (অখণ্ড) ছিল। ইন্দ্র প্রথম সেই অব্যাকৃত-বাক্ এর মধ্যভাগ বিশ্লিষ্ট করে তাকে ব্যাকৃত করলেন। ব্যাকৃত করা অর্থেই ব্যাকরণ (বি + আ + $\sqrt{}$ কৃ + অনট্) শব্দের প্রচলন হল। এখানে ভাষাবিশ্লেষণের উল্লেখ থাকলেও নীতিপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তবে এটা ঠিক, প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসা প্রধানত ব্যাকরণ রূপেই বিকাশ লাভ করেছিল। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ'। এখানে সংহিতার অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা ও ভাষার নানা আলোচনা আছে। বর্তমানে আমরা যাকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব বলি; সেই ধরনের ভাষাচর্চার সূত্রপাত এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেই হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষাবিশ্লেষণে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা হল—ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধির বিধান, পদবিভাগ, বিভক্তি, বচন ও ক্রিয়ার কাল। এইভাবে বৈদিকযুগেই 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলিতে ব্যাকরণের মূল ধারণা গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে এটাই ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানী A Berriedale Keith তাঁর 'A History of Sanskrit Literature (1973) গ্রন্থে লিখেছেন—

> "In the Brahmanas of the vedic period we find sufficient proof that, as in Greece, grammatical study in India began with consideration of such points pronunciation of parts of speech which gives us terms such a vibhakti,

casetermi, present tense possibly hence it derived its name Vyakarana."

অর্থাৎ গ্রিসে যেমন ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয়েছিল, তেমনি বৈদিক যুগে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলীতে ভাষাতত্ত্বচর্চার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বচর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। শব্দের উচ্চারণ এবং পদবিভাগ সম্পর্কে এখানেই প্রথম ধারণা পাওয়া যায়।

বেদ পাঠের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতি রচিত হত বেদাঙ্গের অনুশীলনে। বেদাঙ্গগুলি উত্তর বৈদিক পর্বের রচনা হলেও বেদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। বেদাঙ্গ ছটি। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এদের মধ্যে চারটিতে অর্থাৎ শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আছে। 'কল্প' ও 'জ্যোতিষ' এগুলিতে ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। এই চারটি বেদাঙ্গই প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের উৎসস্বরূপ। এগুলি থেকেই প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখা, যথা—'ধ্বনিবিজ্ঞান' (Phonetics) 'ব্যাকরণ' (Grammar) 'ব্যুৎপত্তি ও অভিধান' (stymology and lexicon) এবং 'ছন্দশাস্ত্র' (prosody) বিকশিত হয়েছে।

আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান বলি, বৈদিক যুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই-ই বোঝাত। বেদাঙ্গের 'শিক্ষা' শাখায় ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে। এখনকার দিনে অর্থবিস্তারের ফলে শিক্ষা বলতে সর্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু শিক্ষা কথাটি তখন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত। তখন ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই সব বেদেরই শিক্ষাগ্রন্থ ছিল পৃথক। যেমন—সাম বেদের শিক্ষাগ্রন্থ 'নারদীয় শিক্ষা', শুক্ল যজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' ও অথর্ববেদের শিক্ষাগ্রন্থ 'মাণ্ডুকী শিক্ষা'। ঋকবেদের শিক্ষা গ্রন্থ লুপ্ত হবার ফলে পাণিনির শিক্ষাকেই ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ বলে ধরা হয়। এতে সাধারণত ধ্বনিতত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মূল শিক্ষাগ্রন্থগুলির অধিকাংশ পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়েছে। ফলে পরিপূরক রূপে 'প্রাতিশাখ্য'গুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন—শিক্ষাগ্রন্থে সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলিতে আছে প্রধানত প্রয়োগমূলক ধ্বনি (Applied phonetics) সম্পর্কে আলোচনা। আরও বলা যায় শিক্ষাগ্রন্থে বৈদিক ধ্বনির উচ্চারণ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত এবং পরে ধ্বনিতত্ত্বের মূলনীতি আলোচনা করা হত। কিন্তু প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলিতে এই মূলনীতি প্রয়োগ করে বেদের ধ্বনির বিচার করা হত। এরই সঙ্গে বেদের ধ্বনির স্বরাঘাত মাত্রা, বিষয়, সন্ধি ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হত। এছাড়াও 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থগুলিতে ধ্বনিতত্ত্বের অনেক বিষয় এবং ব্যাকরণের কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। বেদের ভাষা ক্রমে প্রাচীন হয়েছে, কিন্তু মানুষ আধুনিক হয়েছে। স্বরাঘাত চিহ্নিত করে প্রত্যেক পদ ও পদ্যাংশকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে বেদের পদপাঠে। মোটামুটিভাবে 'শিক্ষা' গ্রন্থগুলি খ্রি: পূ: ৮ম থেকে ৫ম ও 'প্রাতিশাখ্য'গুলি খ্রি: পূ: ৫ম থেকে ১ম এর মধ্যে রচিত। বেদের সূত্রগুলির সমাস ও সন্ধি বিশিষ্টকরণ, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি বিশ্লিষ্ট করে প্রত্যেক পদ ও পদ্যাংশকে পৃথকীকরণ ও স্বরাঘাত

চিহ্নিতকরণকেই বেদের 'পদপাঠ' বলা হয়। বেদের পদপাঠের এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় ভাষাতত্ত্বচর্চায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল। সে কারণেই সমাস, সন্ধি, ধ্বনির স্বরূপ ও স্বরাঘাত সেখানে আলোচিত হয়েছে।

আসলে 'ব্রাহ্মণ' ও বেদাঙ্গের 'শিক্ষা'য় ধ্বনিবিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছিল তারই সার্থক পরিচয় বহন করে বেদের পদপাঠগুলি। যথার্থই বলেছেন winterneit তাঁর 'A History of Indian, Literature' (vol-1-1972) গ্রন্থে—

> "Pada-paths ..... are the oldest
> production of the Siksa schools."

অর্থাৎ পদপাঠগুলি শিক্ষাগ্রন্থেরই অঙ্গ।

প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বের আর একটি সমৃদ্ধ ধারা হল 'নিরুক্ত' ও 'কোশগ্রন্থ'। ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে! কিন্তু সেই সব ব্যুৎপত্তি বৈজ্ঞানিক ও বিধিবদ্ধ ছিল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায় যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর মধ্যে। আর বৈদিক ভাষায় অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দগুলির একটি তালিকা 'নিঘন্টু' নামে সমসাময়িক কালেই প্রকাশিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ ও পণ্ডিত ভগবৎ দত্ত দুজনেরই মতে যাস্ক (খ্রি: পূ: ৮ম) নিঘন্টুর রচয়িতা। আবার 'মহাভারত' থেকে জানা যায় প্রজাপতি কাশ্যপ ছিলেন এর রচয়িতা।

'নিরুক্ত' গ্রন্থটিতে আছে মোট পাঁচটি অধ্যায়। যথা—

প্রথম তিন অধ্যায়—নৈঘুন্টক কাণ্ড। এখানে বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়—নৈগম কাণ্ড। এখানে দুরূহ শব্দাবলী তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়—দৈবত কাণ্ড। এখানে বৈদিক দেবদেবীর তালিকা দেওয়া হয়েছে।

যাস্ক বৈয়াকরণ ছিলেন না। কিন্তু ব্যাকরণের মূল কাঠামোর বোধ তাঁর ছিল। তাই 'নিরুক্ত' গ্রন্থে শব্দের ব্যুৎপত্তিই শুধু দেওয়া হয়নি, তাদের অর্থও আলোচিত হয়েছে। এখানে 'পদবিভাগ' (part of speech) নিয়ে আলোচনা আছে। অর্থাৎ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা আছে। আবার শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি সম্পর্কে আলোচনা এখানে আছে। যাস্ক 'নিরুক্ত' গ্রন্থের মধ্যে তৎকালে যে অর্থগত বিষয়টি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটাই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে এবং ভারতবর্ষে অভিধান রচিত হয়েছে।

যাস্কের আগে শাকটায়ন শব্দের মূলতত্ত্বের কথা বলেন। তিনি সমস্ত ক্রিয়া, এমনকী নাম শব্দ এবং তা কোন্ ধাতু থেকে জাত, এই মতবাদের সূচনা করেছিলেন। যাস্ক এই ধারণাকে সামনে রেখেই 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি লেখেন। অর্থাৎ শাকটায়ন শব্দের মূল তত্ত্বের কথা প্রথম বললেও তাকে প্রতিষ্ঠা দেন যাস্ক। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটাই যাস্কের আসল অবদান। আধুনিক গবেষকরা

মনে করেন পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থটি লেখেন যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটিকে সামনে রেখেই। কাত্যায়ন তাঁর 'নামশালা' এবং অমরসিংহ 'নামলিঙ্গানুশাসন' রচনা করেন যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটিকে সামনে রেখেই।

বৈদিক সংহিতার প্রধান অংশই ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত। তাই বেদ অধ্যয়নের প্রস্তুতি হিসেবে ছন্দোশাস্ত্র পঠিত হত। আর এই ছন্দোবিজ্ঞান বেদাঙ্গের অন্যতম শাখা ছিল। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলী ও ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাতে ছিল না। ছন্দ সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ হল পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র'। এখানে বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পুংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে ছন্দ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।

ভাষাতত্ত্বচর্চায় 'ব্যাকরণ' গ্রন্থের ভূমিকাও কম নয়। এখানে পদবিভাগ, সন্ধির বিধান ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে। এই সময় ব্যাকরণ বলতে মানুষ Morphology-কেই বুঝত। কারণ ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছিল। যার নাম 'শিক্ষা' ও 'প্রাতিশাখ্য'।

বস্তুত প্রাক্ পাণিনিযুগে উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। পাণিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণকে উল্লেখ করেছেন। যেমন—শাকটায়ন, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, গালব প্রমুখ। কিন্তু পূর্বসুরীদের ব্যাকরণ গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। শুধু যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর রচনাটি ব্যাকরণের ধারায় পড়ে না। তাই খ্রি: পূ: ৫০০ অব্দে পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থটিই ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাকরণ, আর পাণিনির আগে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক -৮

পাণিনির ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৭.২.৮.১ পাণিনির ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৭.২.৮.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৮.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.৩.৮.১ :পাণিনির ভাষাতত্ত্বচর্চা

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। রচনার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। পতঞ্জলি তাঁকে বলেছেন 'দাক্ষীপুত্র'। অনেকে এই নাম থেকে অনুমান করেন তাঁর মায়ের নাম ছিল দাক্ষী। তবে পাণিনির পিতার নাম জানা যায়নি। পাণিনির জন্ম পরিচয়ই নিয়েই শুধু নয়, তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রয়ীর মতে পাণিনির আবির্ভাব কাল ২৪০০ খ্রি: পূ:। কিন্তু ভেবর ও মাক্সমূলরের মতে খ্রিস্টের জন্মের ৩৫০ বছর আগে পাণিনির আবির্ভাব হয়। আর গোল্ডস্ট্যুকার পাণিনির জন্মকাল নিয়ে নানা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসেন পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। আবার ভাণ্ডারকর বলেছেন পাণিনি ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহলে মোটামুটি ভাবে বলা যায় পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পাণিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। তিনি যখন ব্যাকরণ রচনা করেন, তখন বৈদিক ভাষা, শাস্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। উদীচ্য ও মধ্যদেশের (বর্তমান দিল্লি থেকে মথুরা) মানুষের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করেই তো পাণিনি 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তাঁর মতে লৌকিকভাবে ব্যবহৃত বৈদিক ভাষাই পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত হয়েছে।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চারটি পদ আছে। এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে অনেকগুলি সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও পরিভাষায় পরবর্তী অধ্যায়সমূহের সূত্রগুলি ব্যাখ্যার নিয়মের আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাস, কারক ও বিভক্তি নিয়ে আলোচনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কৃৎ প্রত্যয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে স্বরাঘাত ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম নীতির আলোচনা আছে এবং অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে স্বরাঘাতবিধি ও সন্ধির নিয়ম আলোচিত হয়েছে।

তবে পাণিনির ব্যাকরণের বিষয় বিভাগ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মতো নয়। অনেক সময় একটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনাও শেষ করেছেন। তাঁর বিন্যাসরীতি অপূর্ব। যেমন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল কৃৎ প্রত্যয়। কিন্তু কৃৎ প্রত্যয় আলোচনার সাথে সাথে তৃতীয় অধ্যায়ে পাণিনি স্বরাঘাতের আলোচনাও করেছেন। কিন্তু এই স্বরাঘাত রূপতত্ত্বের নয়, ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পাণিনি রূপতত্ত্বের সাথে ধ্বনিতত্ত্বের কিছু আলোচনাও সেরে নিয়েছেন। আবার সন্ধি রূপতত্ত্বের বিষয় না হলেও তিনি রূপতত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেকে এটিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু পাণিনির মতে বিষয় বিন্যাসের নিজস্ব রীতি এটি। আসলে রূপতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব যেখানে যুক্ত সেখানে রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। আধুনিককালের ভাষাবিজ্ঞানীরা রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের পার্থক্য সবসময় মেনে চলেননি।

তাঁর ব্যাকরণে চার হাজার সূত্র আছে মোট আটটি অধ্যায়ে। এর মধ্যে আড়াই হাজার সূত্র পাণিনির নিজের। আর বাকি দেড় হাজার কাত্যায়নের 'বার্তিক সূত্র'। এই সূত্রগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) সংজ্ঞা (defination) (২) পরিভাষা (interpretation) (৩) বিধি (general rule) (৪) নিয়ম (particular rule) (৫) অপবাদ (exception) (৬) অধিকার (governing rule) (৭) অতিদেশ (extertion rule)। সূত্রগুলির নির্মাণ কৌশলে ও বিন্যাসে ব্যাকরণটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়েছে। তবে সংস্কৃত ভাষা বোঝার মতো নির্মাণ কৌশল এখানে নেই। যারা সংস্কৃত ভাষা জানে, তারাই এই ব্যাকরণ পাঠে যথার্থভাবে সমর্থ হবে।

অষ্টাধ্যয়ীতে যে সব সূত্র আছে তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান সূত্র (Main laws) এবং কতগুলি উপসূত্র (Sub laws) আছে। অধিকার সূত্রগুলি, উপসূত্রগুলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তবে প্রত্যেকটি

উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্রগুলি পাঠ্য হিসেবে যুক্ত। অধিকার সূত্রের অংশ বারবার উপসূত্রের সঙ্গে ধরে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে অনুবর্তন বা অনুবৃত্তি। কিন্তু পাণিনি প্রত্যেক উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করেননি। আবার অনেক সময় অনুবৃত্তি উহ্য রেখেছেন। যেমন—'সুপ্তিঙন্তংপদম' এই অধিকার সূত্রটির শেষে আছে 'পদম'। কিন্তু উপসূত্রে বলা হয়েছে 'নঃ ক্যে'। এখানে উহ্য রয়েছে 'পদম'। অর্থাৎ উপসূত্র সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

পাণিনির ব্যাকরণে সংক্ষিপ্ততা সাধনের জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেটা হল ব্যবহৃত সূত্রগুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে পুরো বাক্য ব্যবহার না করে শুধু কতগুলি বর্ণের সাহায্যে সংক্ষেপে বীজগণিতের সূত্রের মতো প্রতীকধর্মী সূত্র রচিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমে উদ্ধৃত ১৪টি প্রত্যাহার সূত্র বা মহেশ্বর সূত্রগুলিই বীজগণিতের সূত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যেমন—

(১) অইউন্ (২) ঋ৯ন্ক্ (৩) এ ও ঙ (৪) ঐ ঔ চ্ (৫) হয় ব রট্ (৬) লন্ (৭) ঞমঙণনম্ (৮) ঘটধ্ষ (৯) ঝঙঞ (১০) জবগতদশ্ (১১) খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ (১২) ক প য্ (১৩) শ ষ স র্ (১৪) হল্।

এই সূত্রগুলিই পাণিনির ব্যাকরণের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এই সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত। ফলে সংক্ষিপ্ততার জন্য শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি (non-sense sound) বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে সংস্কৃত ধ্বনির প্রসঙ্গকে সংক্ষেপে উল্লেখ করার জন্য সূত্রগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্বনীয়কে বাদ দিলে প্রত্যাহার সূত্রগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সমগ্র বর্ণমালা বর্তমান। যেমন—সন্ধির একটি সূত্রে পাণিনি বলেছেন—

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ"।

আগে আমরা দেখলাম অ-ই-উ-ঋ-৯—এই বর্ণগুলিকে সংক্ষেপে অক্ বলা হয়। সুতরাং সন্ধির ওই সূত্রটির অর্থ হল অ, ই, উ, ঋ, ৯ এদের সমান স্বরের পর সমান স্বর থাকলে দীর্ঘস্বর হয়। অর্থাৎ 'অ', এর পর 'অ' থাকলে দুটো মিলে দীর্ঘস্বর হয়। আবার 'ই' এর পর 'ই' থাকলে তা মিলে হবে 'ঈ'। এই প্রত্যাহার সূত্রগুলিও ছাড়া পাণিনি অনেক সূত্র বীজগাণিতিক নিয়মে রচনা করেছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ চিন্তায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণবিভাগ। মূল বিষয়টুকু তিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' অধ্যায়ে উল্লেখ করে 'গণপাঠ' গ্রন্থে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সব ধাতু একই রকম নিয়ম অনুসরণ করেও একই রকম ক্রিয়ারূপ লাভ করে সেগুলিকে তিনি একটি গণে বিন্যস্ত করেছেন। সংস্কৃতের সব ধাতুকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—যে সব ধাতুর রূপ 'ভূ' ধাতুর মতো তাদের ভ্বাদিগণীয় বলা হয়েছে। 'তুদ্' ধাতুর মতো হলে 'তুদাদিগণীয়' বলা হয়েছে।

পাণিনি বাক্যকে ভাষার প্রথম বৃহত্তম একক রূপে (Unit) গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বাক্যকে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বাক্যের বিভিন্ন অংশকে 'পদ' বলেছেন। পদের মধ্যে বিভিন্ন অংশ জুড়ে আছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার মূল অংশ হল ধাতু। তবে পাণিনি ক্রিয়া ছাড়া নামশব্দের বিশ্লেষণে ও তার মূলেও ধাতুই পেয়েছেন। পাণিনির মতে সব শব্দই এমনকী নামশব্দ ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন। পাণিনির এই তত্ত্বকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা "root theory" বলেছেন। এই তত্ত্বটি প্রথম প্রবর্তন করেন শাকটায়ন।

পাণিনি পৃথিবীর প্রথম এককালিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। কারণ তিনি সংস্কৃত ভাষার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করলেও ওই ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করেননি। তিনি শুধু ভাষায় গঠনের ওপর ভিত্তি করে পদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবার পদ কি নিয়ে গঠিত, তা উল্লেখ করেছেন। তবে পদের অর্থ বা ভাবের প্রসঙ্গ তিনি আনেননি। এজন্য তাঁকে গঠন সর্বস্বতাবাদী ভাষাবিজ্ঞানী বলা হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে পদের অর্থের সাহায্য নিয়েও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'পূর্বপদার্থপ্রধানোহব্যয়ীভাব, অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতিয়মান হয় যে সমাসে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা হয়। আবার তৎপুরুষ' সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—'উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষ'। অর্থাৎ সংজ্ঞাতে বোঝা যাচ্ছে উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে তৎপুরুষ সমাস হবে। এখানে অর্থের সাহায্য নিয়ে সংজ্ঞা রচনা করা হয়েছে। তবে গঠনসর্বস্বতাবাদীদের মতো পাণিনি নন। কারণ তিনি ভাষার অর্থের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি গঠনের ওপরেও। তবে পাণিনিকে গঠনসর্বস্বতাবাদী নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী।

শুধু প্রাচীন ভারতের নয়—পাণিনি সারা পৃথিবীর প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা (যেমন ড. সত্যস্বরূপ মিশ্র) স্বীকার করেছেন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ও সংস্কৃতে তাঁর অবদানকে—

> "the first descriptive grammar of language,
> being the sanskrit grammar of Panini ....."

এছাড়া পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা পাণিনিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন যে পাণিনির ব্যাকরণ মানব মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ।

আর অতি আধুনিক কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা পাণিনির ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে স্বীকার করে এই ব্যাকরণকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য দেশে পাণিনির ব্যাকরণের একটা সংস্করণ বের করেন ওটো ব্যোয়েটলিঙ্ক। এই সংস্করণ পাশ্চাত্য দেশের বর্ণনামূলক

ভাষাবিজ্ঞানীদের ওপরই পাণিনির প্রভাব পড়েনি, আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কি ও (chomsky) পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর নিজের অভিনব তত্ত্বের বীজ আবিষ্কার করেছিলেন—

> "What is more, it seems that even panini's grammar can be that even as a fragment of such a generative grammar in essentially the contemporary sense of this term."

পাণিনিকে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য চমস্কি উপরোক্ত মন্তব্য করেননি। এর মধ্যে একটা তথ্যনির্ভর সত্যতা আছে। এই সত্য পরবর্তীকালের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণে চমস্কির 'Deep Structure' ও 'Surface Structure'-এর তত্ত্ব দেখেছেন অনেকেই। সুতরাং সব মিলিয়ে বলা যায় সারা বিশ্বের ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে মহামনীষী পাণিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

৭.৩.৮.২: আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রাক্-পাণিনি যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা কীভাবে হয়েছিল, তা বুঝিয়ে দাও।

২। পাণিনি কে ছিলেন? বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় তাঁর অবদান লেখো।

৩। পাণিনির ভাষাতত্ত্বচর্চাই হল প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চর্চা, আলোচনা করো।

৭.৩.৮.৩:: সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্‌টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

পর্যায় গ্রন্থ -৩

একক - ৯

পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা

বিন্যাসক্রম

৭.২.৯.১ পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৭.২.৯.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৯.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.৩.৯..১ ঃ পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা

পাণিনির পর ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চার ধারায় অনুর্বরতার পর্ব চলে। তারপরে ভারতীয় ব্যাকরণচর্চায় কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, যাঁরা পাণিনির ব্যাকরণ ধারার সঙ্গে যুক্ত। এঁরা হলেন কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রমুখ। এঁরা পাণিনির ব্যাকরণকে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে পূর্ণতা আনেন। প্রথমেই আসবে কাত্যায়নের নাম।

কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। বেলভালকরের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রি: পূ: পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী, কীথের মতো খ্রি: পূ: তৃতীয় শতাব্দী। আর কথাসিরৎসাগরে বলা হয়েছে তিনি পাণিনির সহপাঠী। তবে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন তিনি পাণিনির অনেক পরবর্তীকালের ব্যাকরণবিদ।

কাত্যায়ন ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দুটি গ্রন্থ লেখেন—(১) 'বার্তিক' (২) 'বাজেসনেয়ি প্রাতিশাখ্য। ভাষাতত্ত্বচর্চায় এই দুটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'বার্তিক' গ্রন্থটি। কারণ এই গ্রন্থে তিনি পাণিনির সূত্রকে যেমন খণ্ডন করেছেন, তেমনি নিজেও কিছু সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি পরবর্তীকালে অচল হয়ে যায়। তিনি এই অচল সূত্রগুলোকে বাদ দেন। পাণিনির সব সূত্রের সমালোচনা না করে মাত্র দেড় হাজার সূত্র কাত্যায়ন সংশোধন করেছেন। এরই পাশাপাশি কিছু নতুন সূত্রও তিনি লিখেছিলেন। 'বার্তিক'-এর সূত্রগুলি কোথাও পদ্যে রচিত। অর্থাৎ ভাষার দুটি রীতিতেই তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। কাত্যায়নের 'বার্তিকসূত্র' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের সংশোধন ও পরিমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা করা। তাই অনেকে তাঁকে পাণিনি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলে মনে করেন। কথাসরিৎসাগরের উল্লেখ থেকে জানা যায় তিনি ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ ছিলেন। পতঞ্জলির উল্লেখ থেকে জানা যায় কাত্যায়ন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। কেননা দক্ষিণ ভারতে পাণিনির ব্যাকরণের থেকে পৃথক একটি ব্যাকরণের প্রভাব ছিল। তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শ অনুসরণ করেন। সে কারণেই ভাসের নাটকেও এমন কিছু প্রয়োগ চোখে পড়ে যা পাণিনির থেকে আলাদা।

কাত্যায়নের 'বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য'-তে শুক্ল যজুর্বেদের ভাষার ধ্বনি, বানান ইত্যাদি সম্পর্কে আলেচনা আছে। গ্রন্থটি মূলত বেদকেন্দ্রিক ছিল। এটি তুলনামূলক ভাবে অন্য ধরনের গ্রন্থ। 'বার্তিক' গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থে কাত্যায়নের বেশি মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা অবশ্যই বলতে হয় যে কাত্যায়ন তাঁর 'বার্তিক' সূত্রে পাণিনির ব্যাকরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কাত্যায়নের সমালোচনার জন্যই পাণিনির ব্যাকরণ আরও বেশি পরিণত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণদের মধ্যে কাত্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাণিনির ব্যাকরণকে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছে কাত্যায়নের

এই ব্যাকরণ। কাত্যায়নের সঙ্গে পতঞ্জলির কালগত ব্যবধান অনেক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কাত্যায়নের প্রায় দুশো বছর পর পতঞ্জলি আবির্ভূত হন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জলি তার ব্যাকরণ গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। পাণিনির মতই এই গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চারটি করে পর্ব আছে। পতঞ্জলির ব্যাকরণ ছিল মূলত টীকামূলক। কাত্যায়ন তাঁর 'বার্তিক' গ্রন্থে পাণিনির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পাণিনির সূত্রকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাণিনি যেভাবে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সেই ধারাকে সামনে রেখেই পতঞ্জলি দ্বিতীয় শতকে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন।

বিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণের নীরস বস্তুকে যাঁরা সরস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পতঞ্জলি। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি পাণিনির ব্যাকরণের এই ভাষ্যগ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভাববার কথা' গ্রন্থে বলেছিলেন—

> "পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ, এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কথা কয়।"

বিবেকানন্দ পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন কিন্তু তিনি পতঞ্জলির রচনারীতির যে সব বিক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে।

কাত্যায়ন, পতঞ্জলির পরে প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ রচনায় আবার অনুর্বরতা দেখা যায়।

এই সময়ে ব্যাকরণ রচনার ধারায় আবির্ভূত হন চন্দ্রগোমী, ৪৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু চন্দ্রগোমী রচিত ব্যাকরণটি ছিল পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের ভাষ্য। তাঁর ব্যাকরণে কোনো মৌলিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায় না। চন্দ্রগোমী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় উপনিষদের হিন্দুত্বের কথা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। চন্দ্রগোমী হিন্দুধর্মীয় ভাবনা থেকে সরে এসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর ব্যাকরণ বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি।

পাণিনির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে যে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত ঘটে, তা কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কাত্যায়ন পাণিনির বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন বলেই পাণিনি সম্পর্কে সকলের মনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কাত্যায়নের 'বার্তিক সূত্র' সমালোচনামূলক গ্রন্থ ছিল। একই সঙ্গে গ্রন্থটি ছিল মৌলিক। আবার পতঞ্জলি পাণিনির সূত্রের সমর্থনে রচনা করেন 'মহাভাষ্য'। এখানেও পাণিনির ব্যাকরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। তবে পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণকে অবলম্বন করেই কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণ

রচনার সূত্রপাত হয়। পাণিনিকে বলা হয় আদিমতম বৈয়াকরণ বা মুনি। আর কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকেও কম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় না। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একত্রে 'মুনিত্রয়' বলে সম্মান দেওয়া হয়।

এবারে ভর্তৃহরির প্রসঙ্গ। প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগোমীর পর উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির জীবনকাল ৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থের নাম হল—

(১) বাক্যপদীয়

(২) রাবণ বধ

'বাক্যপদীয় গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক। কিন্তু 'রাবণ বধ' গ্রন্থটি কাব্য। যাই হোক গ্রন্থ দুটি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। গবেষকদের মতে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটির রচয়িতা ভর্তৃহরি ও 'রাবণ বধ' গ্রন্থের ভর্তৃহরি হলেন আলাদা ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে কবির নিজের একটা উক্তি থেকে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়। ভর্তৃহরির উক্তিটি ছিল এইরকম—

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্ঃ"

আসলে ভর্তৃহরি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে যে সব নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তারই দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর মহাকাব্যে এনেছেন। তাই বলা যায় উপরোক্ত গ্রন্থদুটির লেখক ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি বিশ্লেষণে দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—

(১) 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি পদ্যবন্ধ ছন্দে রচিত। ভর্তৃহরি প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণকে গদ্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

(২) এই গ্রন্থটিতে ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণের চেয়ে দার্শনিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা বেশি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায় ভর্তৃহরির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টিপাত করে। দীর্ঘকাল পরে বাংলায় নব্য বৈয়াকরণিক গোষ্ঠী ভাষার দার্শনিক দিক আলোচনায় গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ভর্তৃহরির ব্যাকরণে।

ভর্তৃহরির ব্যাকরণের প্রায় সমসাময়িক রচনা হল জয়াদিত্য ও বামন রচিত 'কাশিকাবৃত্তি' (৬৫০ খ্রি:) মূলত পাণিনির ব্যাকরণের ব্যাখ্যা। পাণিনির ধারার পরবর্তীকালের আর এক জন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন টকব্যাট। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'প্রদীপ'। আর এই ধারার শেষ কৌমুদী। এখানে ভট্টোজি, পাণিনির সূত্রগুলিকে যুগের প্রয়োজনে নতুন করে সাজিয়ে এদের টীকা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল, তা বিকাশলাভ করেছিল মূলত ব্যাকরণচর্চার মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত পাণিনির হাতেই যথার্থভাবে হয়েছে সত্য, কিন্তু পাণিনির আগে ও পাণিনি পরবর্তীতে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির রচনায় ব্যাকরণের ধারা আরও সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণচর্চা বা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এঁদের কথা ভোলার নয়।

৭.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পাণিনি পরবর্তীযুগে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখের হাতে ভাষাতত্ত্বচর্চার বিকাশ কীভাবে হয়েছিল, তা আলোচনা করো।

২। ভাষাতত্ত্বচর্চায় কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির অবদান লেখো।

৭.৩.৯.৩: সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্‌টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

বঙ্গদেশে ভাষাতত্ত্বচর্চা

বিন্যাস ক্রম :

৭.৩.১০.১ : বাংলা ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

৭.৩.১০.২ : ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

৭.৩.১০.৩ : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

৭.৩.১০.৪ : উপভাষা

৭.৩.১০.৫ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭.৩.১০.৬ : সুকুমার সেন

৭.৩.১০.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৩.১০.৮ : সহায়ক প্রশ্নাবলী

৭.৩.১০.১ ঃ বাংলা ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

আধুনিক বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞানচর্চার নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাবিজ্ঞানচর্চাও সেই অনুসারে চলেছে। ভাষাবিজ্ঞানচর্চার নানা শাখা অনুসারে এই ভাগগুলি করা হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া হল—

ক. কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্ম [Central Linguistics]

১. ধ্বনিবিজ্ঞান-ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক কাজকর্ম [Phonetics Phonology]

২. রূপিম-রূপতত্ত্ব বিষয়ক কাজকর্ম [Morphem Morphology]

৩. অন্বয় সংক্রান্ত কাজকর্ম [Syntax]

৪. শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ক কাজকর্ম [Semantics]

খ. বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্ম [Peripheral Linguistics]

৫. সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারা [Socilinguistics]

৬. মনোভাষাবিজ্ঞানের ধারা [Psycholinguistics]

৭. দর্শন-ভাষাবিজ্ঞানের ধারা [Philo-linguistics]

৮. জীব-শারীর ভাষাবিজ্ঞানের ধারা [Bio-Physical Linguistics]

৯. গণিত-ভাষাবিজ্ঞান [Mathametical Linguistics]

১০. নৃ-ভাষাবিজ্ঞান [Anthropolinguistics]

১১. ফলিত ভাষাবিজ্ঞান [Applied Linguistics]

(i) মাতৃভাষা শেখানো

(ii) বিদেশি ভাষা শেখানো

(iii) অনুবাদ (ক) ব্যক্তিগতভাবে (খ) যন্ত্রের সাহায্যে

(iv) টেলিকমিউনিকেশন বা দূরসংযোগ

(v) শব্দকোশ, অভিধান প্রভৃতি সৃষ্টি

(vi) গণকযন্ত্র বা কম্পিউটার কেন্দ্রিক কাজকর্ম

(vii) ভাষা প্রযুক্তি

(viii) ভাষা-চিকিৎসা বা স্পিচ থেরাপি

(ix) বানান সংস্কার

(x) অন্যান্য।

৭.৩.১০.২ ঃ ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মূলত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা এবং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়ে যায়। বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Comparative Philology বিভাগের প্রতিষ্ঠায় [১৯০৪] তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এখান থেকেই সারা ভারতে ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ধারা ছড়িয়ে পড়ে। তিনজন মানুষ বাংলা ভাষাসংস্কৃতি তথা ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of Bengali Language' [১৯২৬] গ্রন্থে তার সার্থক রূপায়ণ চোখে পড়ে। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা এবং ঐতিহাসিক ব্যাকরণচর্চা মিলিতভাবে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা হয়ে এগিয়ে চলে। এসব কাজে প্রাধান্য পেয়েছিল ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বগত আলোচনা।

সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক যে ব্যাকরণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তৈরি করলেন তারই ধারায় এক এক করে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ব্যাকরণগুলি লেখা হতে থাকে। সুনীতিবাবুর শিক্ষক তারাপোরওয়ালা রচনা করেছিলেন 'Elements of the science of Language' [১৯৩১]। বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' [১৯৩৯]। বটকৃষ্ণ ঘোষ-এর 'Linguistics Introduction to Sanskrit' [১৯৩৭]। শহীদুল্লাহ্-র কাহ্ন ও সরহপাদর ওপর গবেষণা কর্ম এবং 'বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত' [১৯৬৫]। বাণীকান্ত কাকতীর 'Assamese, its Promation asnd Development', উদয়নারায়ণ তেওয়ারি-র 'The Origin and Development of Bhojpur', বাবুরাম সকসেনা-র 'Evolution of Awadhi', সুভদ্র ঝা-র 'The Formation of Maithili', সত্যস্বরূপ মিশ্র-র 'A Comparative Grammar of Sanskrit, Greek and Hititttile' [১৯৬৮], 'A Historical Grammar of Ardhamagadhi' [১৯৮২], 'The Avestan : A Historical and Comparative Grammar' [১৯৭৯], সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'Indo-European Tense and Aspect in Greek and Sanskrit' [১৯৮৩], 'A Hand book of Sanskrit Philology' [১৯৮৭], 'সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব' [১৯৯৮], পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', 'বাংলাভাষা পরিক্রমা', সুভদ্র সেনের 'Proto New Indo Aryan' [১৯৭৩], মৃণাল নাথের গবেষণা 'A Semantic study of Sanskrit Lexis in Early Bengali' [১৯৭৯], প্রবন্ধ-'O Indo-European First Personal Pronoun' [১৯৭৯, Indian Linguistics] 'Etymological notes on some Early Bengali words' [১৯৮১, ওই] 'পূরক দীর্ঘায়ণ' [১৯৮৩, ভাষা], 'চর্যাগীতির ভাষার পুনর্মূল্যায়ন' [১৯৮৫-৮৬ ভাষা]

প্রভৃতি কাজকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কাজের মধ্যে অন্বয় সংক্রান্ত আলোচনা খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে যখন 'Language and Literature of Modern Indian' গ্রন্থটি লেখেন তখন বাক্যের আন্বয়িক গঠনের দিকে সামান্যই নজর দেন।

৭.৩.১০ .৩ ঃ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চা

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব' [১৯০৭] বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্বের ওপর লেখা নানা প্রবন্ধের সংকলন। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত আরো নানা প্রবন্ধ যোগ করে পরবর্তীকালে তিনি 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' [১৯৩৮] নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' [১৯৩৯] ছোটোদের জন্য সরসভাবে লেখা। সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানী বলে মনে করেছেন।

বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক আলোচনা সুনীতিকুমার-ই বিশেষভাবে শুরু করেন 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' [১৯২১], 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' [১৯৩৯] গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-র 'বাগর্থ' [১৯৫০], দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু-র 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা' [১৯৭৫], 'Bengali Formatives' [১৯৭৯], সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখ্য ও কথ্যভাষা নিয়ে পিএইচ ডি গবেষণা গ্রন্থ, রামেশ্বর শ'-র পিএইচ ডি গবেষণা গ্রন্থ 'The Phonological System of Bengali and German' [১৯৭৭], মহম্মদ আবদুল হাই-এর 'A Phonetic and phonological study of Nasals and Nasalization in Bengali' [১৯০৬], 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' [১৯৬৪], ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরীর 'Phonemes of Bengali' (১৯৬০, Language) রফিকুল ইসলামের 'ভাষাতত্ত্ব' [১৯৭০], প্রবাল দাশগুপ্তের 'কথার ক্রিয়াকর্ম' [১৯৮৭], পবিত্র সরকারের 'The Bengali verb' [১৯৭৬, 'The International Journal of Dravidian Linguistics'], মনজুর মোরশেদ-এর 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব' [১৯৭৫] প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭.৩.১০.৪ ঃ উপভাষা

G.A. Grierson-এর ১৯০৩-এ লেখা Languages of India এবং ১৯২৭, Linguistic Survey of India। 'Indo-Aryan Family : Eastern Group. Specimens of the Bengali and Assamese Languages' গ্রন্থ থেকে সার্থকভাবে উপভাষাচর্চার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে উপভাষা-জরিপ এবং মানচিত্র নির্মাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Grierson-এর কাজটি এককালীন, বহুকালীন বা বিবর্তনধর্মী কাজ নয়। তাঁর পরবর্তীকালে উপভাষা নিয়ে নানা ধরনের কাজকর্ম হলেও—এত ব্যাপক অনুসন্ধান আর করা হয়নি। তবুও, এ কথা ঠিক বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের যেসব গবেষণা ও কাজকর্ম হয়েছে তার মধ্যে সিংহভাগ নিয়েছে উপভাষা সংক্রান্ত কাজকর্ম। অধ্যাপক মণিরুজ্জামান উপভাষাচর্চার ভূমিকা গ্রন্থে বিভিন্ন অঞ্চলের

উপভাষা নিয়ে যে-সব কাজকর্ম হয়েছে তার আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের অধিকাংশ গ্রন্থেই উপভাষা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবুও একথা বলা যায়, উপভাষা নিয়ে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার মানচিত্র তৈরি হয়নি। সমশব্দ-রেখচিত্র পাশ্চাত্যে যেভাবে হয়েছে, সেভাবে বাংলা ভাষা নিয়ে তৈরি হয়নি। I. J. Taraporewala-র 'Bengal and Assam' [১৯০১] প্রথম কাজ। এছাড়া বিভিন্ন গেজেটিয়ারে উপভাষাগত তথ্য ১৮৬৭ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্র ঘোষ-এর প্রবন্ধ 'চাকমাদিগের ভাষাতথ্য' [১৯০৬] এবং গ্রন্থ-'চাকমা জাতি', 'জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত' [১৯০৯], বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'How Oriya is Related to Bengali, History of Bengali Language' [১৯২০], প্রফুল্লচন্দ্র বসু-র প্রবন্ধ 'The social and Religious ceremonies of the chakmas' [১৯৩১], এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা], W. sutton-page-এর 'An Introduction of colloquial Bengali' [১৯৩৪], Mrs. U. G. B.-র 'Daflas of the Subansiri Area' [১৯৪৯, R. Cent Asian Journal] প্রথম অর্ধের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরবর্তী অর্ধে আবদুস সাত্তার রচিত প্রবন্ধ 'চাকমা ভাষার রূপ' [১৯৬০, মাহে নও, কার্তিক], বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা' [১৯৬৭-৬৮, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা], মনিরুজ্জামান রচিত প্রবন্ধ চট্টগ্রামের 'উপভাষা প্রসঙ্গে' [১৯৬৬, বলাকা ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা], 'বাংলাদেশের ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন' [১৯৭৫] 'বাংলাদেশে ভাষা ও উপভাষাতত্ত্বের অনুশীলন' [১৯৮৫], গোপাল হালদারের 'A Brief phonetic sketch of the Noakhali Dialect by South. Eastern Bengali' [১৯২৭, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Letters-এর পত্রিকা], 'ভারতের ভাষা' [১৯৬৭], মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' [১৯৬৫], রফিউদ্দিন আহ্মদের 'Bangladesh Society Religion and Politics' [১৯৮৫], রামেশ্বর শ' রচিত 'উপভাষা সমীক্ষার রীতি পদ্ধতি' [১৯৮৩ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা], সুভাষ রায়চৌধুরী-র 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' [১৯৩৫], সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ককবরক' [১৯৭৪], হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা, বাংলা ও আসাম' [১৩৮৫], অনিমেষকান্তি পাল-এর পিএইচ. ডি গবেষণা গ্রন্থ 'A Dacca Dialect of Eastern Bengali' [১৯৭০] এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ যথা—'বাংলা ওড়িয়ার সীমারেখা' [১৯৭৪ বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ], 'বাংলা উপভাষাচর্চা প্রসঙ্গে' [১৩৮৪, ভাষা সাহিত্যপত্র], 'বাংলা উপভাষাচর্চার ত্রিধারা' [১৯৮০, পরিচয়], 'Dialect Geography' [১৯৮০, এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা], 'বাংলা ভাষার রূপভেদ' [১৯৬৬, নতুন পরিবেশ], 'একটি লোকগীতিকায় চট্টোগ্রামের উপভাষা' [১৩৮৭, সাহিত্যিকী], 'phonetics of Dacca Dialect of Bengali and the Importance of Tone' [১৯৬৫, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা], 'phonology of Dacca Dialect' [১৯৬৯, গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইনস্টিটিউট পত্রিকা], 'ঢাকা জেলার একটি উপভাষায় মহাপ্রাণতা এবং স্বর' [১৯৭৪, নিসর্গ, ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা] প্রভৃতি কাজকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন উপভাষা নিয়েও বহুবিধ অনুসন্ধান করেছেন। সুনীতিকুমার রচিত ODBL [১৯২৬] গ্রন্থে উপভাষা-র অনেক ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। সুকুমার সেনের

'বাংলায় নারীর ভাষা' [১৯২৭, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা], 'The cast Dialect of the Musics of the South East Burdwan' [১৯৫৫, Indian Linguistics, vol-16], 'বাংলা স্থান নাম' [১৩৮৮] প্রভৃতি কাজ যথেষ্ট মূল্যবান, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'সামাজিক উপভাষা' [১৯৮৩ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা], পবিত্র সরকারের 'ভাষা দেশ কাল' [১৩৯২], 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি' [১৩৯৮], কৃষ্ণা ভট্টাচার্যর ওড়িয়া ও বাংলা ক্রিয়া বিষয়ক গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ। নির্মল দাস-এর উত্তরবঙ্গের ভাষা-প্রসঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা প্রথমে পত্রিকায় পরে গ্রন্থগারে প্রকাশিত। শ্যামাপ্রসাদ দত্ত-এর 'পাঁচ পরগণিয়া উপভাষা', নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা' প্রভৃতি কাজকর্ম লক্ষণীয়।

বর্তমানে চমস্কি তত্ত্বের বা সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণামূলক কাজকর্ম খুবই সীমাবদ্ধ। এই ধরনের কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ 'সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষাবিচারে তার প্রয়োগ' [রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা-১৬ বর্ষ সংখ্যা-৪], হুমায়ুন আজাদ-এর 'Pronomitization in Bengali' [১৯৮৩] এবং 'বাক্যতত্ত্ব' [১৯৮৪], এছাড়াও ড: উদয়কুমার চক্রবর্তী-র 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ' [১৯৯৮]-এ চমস্কির 'Government and Binding' তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানের নানা আধুনিক তত্ত্ব নিয়ে মীনা দাঁ-র কাজকর্মও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলা ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় প্রবাল দাশগুপ্ত কারকতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

৭.৩.১০.৫ ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া জেলার শিবপুরে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। সুনীতিকুমার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল শীলের ফ্রি-স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাশ করেন। তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় প্রবল দারিদ্রের মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়। স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণে আদ্য-মধ্য পাশ করেছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin and Development of Bengali Language' সংক্ষেপে ODBL-এর জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. লিট. উপাধি পান।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন। অবসর নেবার পর তিনি 'এমারিটাস অধ্যাপক' হিসেবে স্বীকৃত হন। পরবর্তীকালে, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সচিব হিসেবে জাভা-সুমাত্রা-বলি প্রভৃতি অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি রচনা করে 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থটি।

ODBL গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসটি বিবৃত করলেন। এভাবে বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষার দলিল আর কেউ তাঁর পূর্বে রচনা করেননি। নব আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি সাহিত্য তাঁর এই গবেষণায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ধ্বনিপরিবর্তনের নানা সূত্রও তিনি আবিষ্কার করেন।

Bengali Phonetic Reader গ্রন্থে আন্তর্জাতিক স্বনিমলিপির প্রয়োগ করেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামোটি তিনি এভাবে তৈরি করেছেন আমাদের কাছে। Indo Aryan and Hindi গ্রন্থে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। ইংরেজি ভাষায় লেখা 'কীরাতজনকৃতি' আর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে বিরাত জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য যেমন অনুসন্ধান করেছেন তেমনি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে বর্তমান ভারতবর্ষের নানা জাতির ঐতিহ্য তিনি অনুসন্ধান করেছেন তা লক্ষ করা যাবে।

ভাষাবিজ্ঞানী ও ভারততত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে পরলোক গমন করেন। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় যে ধারা তিনি রেখে গেলেন তা আজও অব্যাহত। এর পাশাপাশি তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও করেছিলেন। ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেখার কথা তিনি বলেছেন। নিজেও ভাষা ও সংস্কৃতিকে মিলিয়ে ভাষার এক পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করে গেছেন।

৭.৩.১০.৬ ঃ সুকুমার সেন

বর্ধমান জেলার 'গোতান'-এ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়েন। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

সুকুমার সেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য রচনা করেছিলেন 'Women's Dialect' নামক গ্রন্থ। সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে সমাজউপভাষা হিসেবে নারীর ভাষা নিয়ে আলোচনা এদেশে এই প্রথম। সুকুমার সেন রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯) গ্রন্থটি ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর কাছে অপরিহার্য গ্রন্থ। বাংলা ভাষার রচিত এই গ্রন্থ সাধারণ বাঙালির কাছে তাঁকে পরিচিত করায়। খণ্ডে খণ্ডে রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দলিল। তিনি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন নানা গ্রন্থে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র হিসেবে তিনি ভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

৭.৩.১০.৭ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক বঙ্গদেশে ভাষাতত্ত্বচর্চার দিকগুলি আলোচনা করো।

২। বঙ্গদেশে উপভাষা চর্চার দিকগুলি বুঝিয়ে দাও।

৩। ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবদান লেখো।

৪। ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুকুমার সেনের পরিচয় দাও।

৭.৩.১০.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

পর্যায় গ্রন্থ -৪

একক - ১১

নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

বিন্যাস ক্রম

৭.৪.১১.১ : নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

৭.৪.১১.২ : অব্যাহতি উপাদান

৭.৪.১১.৩ : সাধারণ বাক্য

৭.৪.১১.৪ : নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

৭.৪.১১.৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব

৭.৪.১১.৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ

৭.৪.১১.৪.৩ : পারঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার

৭.৪.১১.৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য

৭.৪.১১৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন

৭.৪.১১৪.৬ : উপাদান শ্রেণি

৭.৪.১১৪.৭ : ব্যাকরণ সম্মত সংবর্তন

৭.৪.১১.৫: আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১১.৬: সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.১১.১ ঃ নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

পৃথিবীর প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। শিশু যেমন বড় হতে হতে তার চারপাশের লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মাতৃভাষা শিখে ফেলে তেমনিভাবেই যখন আমরা বড় হয়ে দেখি ব্যাকরণ না শিখেই আমরা ভাষার ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ব্যবহার করতে পারছি—তখন অবাক হয়ে যাই বই কি। কিন্তু আবার হবার ব্যাপার নয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি (Noam Abraham Chomsky) জানিয়েছেন আমাদের মাথার মধ্যে রয়েছে ভাষা শেখার কৌশল (Language Acquistion Devise)। একে সংক্ষেপে LAD বলে। এরই ফলে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাষা শিখতে থাকি। স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুচিকিৎসকগণ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত ভাষা এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। কান দিয়ে শোনার অনুভূতি—দেখার অনুভূতির পাশাপাশি রয়েছে কানে শোনার মনস্তত্ত্ব—চোখে দেখার মনস্তত্ত্ব। এগুলির সঙ্গে ভাষার অর্থাৎ কথা বলা ও লেখার কেন্দ্রগুলি যুক্ত হয়। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে স্নায়ু। আমরা কথা বলি।

কথা বলাই ভাষার ব্যবহার। এই ভাষার সবচেয়ে বড় একক (Unit) হল—বাচন (Discourse)। একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বা কোনো একটি প্রসঙ্গকে ধরে তৈরি হয় বাচন। বাচনকে বিশ্লেষণ করলে পাই বাক্য (Sentence)। প্রথানুসারী (Traditional) ব্যাকরণে বাক্য বলতে যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসক্তিযুক্ত পদসমষ্টিকে বোঝায়। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাকরণেও পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। এই বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে পদগুচ্ছ (Phrase)। কোনো একটি প্রধান পদকে অবলম্বন করে এক বা একাধিক পদের সমষ্টি তৈরি করে পদগুচ্ছ। পদগুচ্ছ আর বাক্যখণ্ড (Clause) এক নয়। একটি সরল (Simple) বাক্য আর একটি বাক্যখণ্ড গঠনগত বিচারে একই। পদগুচ্ছকে বিশ্লেষণ করলে পাবো পদ (Grammatical Word)। সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'সুপ-তিঙন্তং পদম্'। অর্থাৎ শব্দবিভক্তি (সুপ্) ও ক্রিয়াবিভক্তি (তিঙ্) যুক্ত শব্দ-ই হল পদ। যে শব্দ (Word) বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা রাখে তাকেই পদ বলা হয়। একটি পদ এক বা একের বেশি রূপ (Morph) জুড়ে তৈরি হয়। রূপগুলি তৈরি হয় এক বা একাধিক স্বনিম (Phoneml) জুড়ে। সাধারণত স্বনিম-ই ক্ষুদ্রতম একক। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে স্বনিমের চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক আছে। এক বা একাধিক স্ব-লক্ষণ (Distinctive Features) যুক্ত হয়ে স্বনিম গঠিত হয়। বৈয়াকরণগণ ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এইসব নানাবিধ গঠনের কথা বলেছেন। এখানে আমরা অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার বাক্যকে সবচেয়ে বড় একক হিসেবে ধরে গঠনগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ব্যাকরণগত বড় একক বাচন নয়, বাক্য-ই।

প্রথানুসারী ব্যাকরণে একটি বাক্যকে উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate) এই দুভাগে ভাগ করা হত। যেভাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ করা হত সেখানে গঠনগত বিন্যাসের অসুবিধা বিশেষভাবে দেখা যেত। যেমন, 'আমি তোমাকে ডাকলাম' এই বাক্যে যেমন সহজে উদ্দেশ্য-আমি এবং বিধেয়-তোমাকে

ডাকলাম ভাগ করা যায় তেমন সহজে 'আজ আর ওখানে সে যাবে না'—কে ভাগ করা যায় না। এখানে 'সে' উদ্দেশ্য হলে তার আগে কিছুটা অংশ বিধেয় এবং পরেও বিধেয় কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে। ফলে, উদ্দেশ্য-বিধেয় সংগঠন বক্তব্যধর্মী, গঠনধর্মী নয়।

৭.৪.১১.২ ঃ অব্যাহতি উপাদান

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছোট ছোট এলাকায় আন্বয়িক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইভাবে তাঁরা দুটি করে উপাদান যুক্ত করে অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের (Immediate Constitution Structure) কথা বলেন। অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের ক্ষেত্রে দুটি করে উপাদান যুক্ত হয়ে ক্রমোচ্চ স্তর নির্মাণ করতে করতে বাক্যস্তরে উপনীত হয়। প্রথমে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক।

'আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না'—এই বাক্যে 'যাব'-র সঙ্গে 'না' এবং 'তাদের' ও 'সঙ্গে'-র অন্বয়িক সম্পর্ক ঘনিষ্ট। ফলে উপাদান দুটি যুক্ত হয়ে একটি করে উপাদানে পরিণত হবে। যথা—'যাব না' ও 'তাদের সঙ্গে'। এবার এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে তৈরি করবে 'তাদের সঙ্গে যাব না'—এই একটি উপাদান। এর সঙ্গে 'আজ' যুক্ত হয়ে 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না, এই একটি উপাদানে পরিণত হবে। এরপর, 'আমি' ও 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না,—এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে একটি উপাদানে পরিণত হবে। এইভাবে পদস্তর থেকে ক্রমোচ্চ স্তর গঠন করতে করতে সর্বোচ্চ স্তর—বাক্যে উপনীত হতে হবে। একেই অব্যহতি উপাদান গঠন বলে। যেভাবে এই অব্যহতি উপাদান দেখানো হয় তা এখানে দেখানো হল—

আমি	আজ		তাদের	সঙ্গে	যাব	না	* স্তর ১
আমি	আজ		তাদের সঙ্গে		যাব না		* স্তর ২
আমি	আজ	তাদের সঙ্গে যাব না					* স্তর ৩
আমি	আজ তাদের সঙ্গে যাব না						* স্তর ৪
আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না							* স্তর ৫

এখানে সমান্তরালভাবে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের পাশাপাশি সম্পর্ক হল—অব্যবহিত সম্পর্ক। আবার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে পরবর্তী স্তরের সম্পর্ক অব্যবহিত সম্পর্ক। স্তর-২ যেমন স্তর-১ এর অব্যবহিত পরবর্তী স্তর তেমনি তা স্তর-৩ এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর। কেবল স্তর-১ এর সঙ্গে স্তর-৫ এর সম্পর্ক চূড়ান্ত উপাদান সংগঠন সম্পর্ক (Ultimate Constitute Construction)। দুটি করে উপাদান এইভাবে যুক্ত হয়ে অব্যবহিত উপাদান সংগঠন তৈরি করছে।

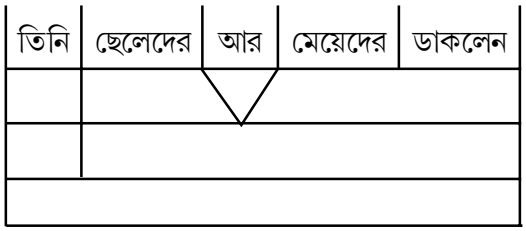
একই স্তরের দুটি উপাদান বা তার চেয়ে বেশি উপাদান একই সঙ্গে অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। যেমন, 'কাগজ-বই-খাতা-কলম' এগুলি একই স্তরের উপাদান। এগুলি একই সঙ্গে একটি উপাদানের মতো ভূমিকা নেবে। আন্বয়িক গঠন তৈরি করবে একই সঙ্গে। অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন—

ক.

সে	কাগজ	বই	খাতা	কলম	কিনল
সে	কাগজ বই খাতা কলম কিনল				
সে কাগজ বই খাতা কলম কিনল					

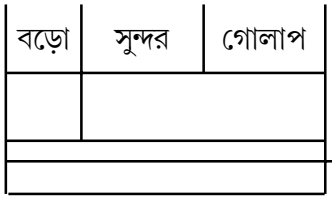
সংযোজক অব্যয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁকানো রেখা দিয়ে সংযুক্তি দেখানোর কথা হকেট (Hockett) বলেন।

খ.

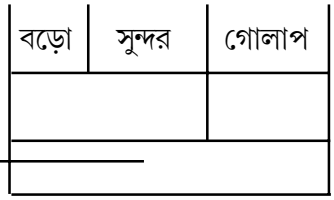


দ্ব্যর্থ বোধকতা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। হকেট একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'Stout major's wife'-এই বাক্যে কে 'stout'? 'major's wife' কে? সমাধান সূত্র হিসেবে বলেছেন যেখানে শ্বাসাঘাত জোরে পড়ছে সেখানেই এই অর্থবোধের সূত্র পাওয়া যাবে। যদি 'Stout'-এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে তবে 'major's wife' কে 'stout' বোঝাবে। আর 'Major' এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়লে 'stout' বোঝাবে 'major' কে। বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রাধান্য পায় না। তাই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলির অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। 'বড়ো সুন্দর গোলাপ'—এই বাক্যে 'গোলাপ'-টি বড়ো বোঝাচ্ছে নাকি 'সুন্দর'-এর 'বিশেষণ' হিসেবে 'বড়ো' ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা যায় না। এখানে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করার সময় দুটি সম্ভাবনাই প্রাধান্য পেতে পারে।

ক.



খ.



অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক গঠনগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে। একই শ্রেণির পদগুলি কীভাবে পদগুচ্ছ তৈরি করে তা বোঝা যায়। বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাবিজ্ঞানীগণ এভাবেই বাক্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করলেন। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leouard Blommfield), হকেট (Hockett), গ্লিসন (Gleason), কুইনে (Quine), হ্যারিস (Harris) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর ভাবনাচিন্তায় এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্লুমফিল্ডের ছাত্র

হিসেবে নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) এই বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো গবেষণা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রপথ নির্মাণ করেছিলেন। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখানে কিছু অব্যবহিত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযুক্তিকরণ দেখানো যেতে পারে।

৭.৪.১৯.৩ ঃ সাধারণ বাক্য

স্তর

১	তিনি	ওই	পোড়ো	বাড়িতে	কাল	কিম্বা	পরশু	সারারাত	ধরে	বড়ো	বড়ো	মশার	কামড়ে	রাত্রি	কাটিয়েছেন
২															
৩															
৪															
৫															
৬															

এই বিশাল বাক্যটি মাত্র ছ'টি স্তরে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, এমন বাক্য যদি পাওয়া যায় যেখানে বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ক ধরে ঠিকঠাক বিন্যাস লাভ করা যাবে না। তাহলে কি করা হবে সেখানে? যেমন, 'ওই পোড়ো বাড়িতে তিনি কাল যাবেন'—এই বাক্যটি। এখানে বাক্যের মাঝখানে 'তিনি' পদটি অবস্থিত। সেখানে আন্বয়িক সম্পর্ক দেখানোর জন্য সংযোগসাধন করছে না এমন উপাদানকে পৃথক করে দেখানো যেতে পারে। যেমন—

স্তর

১	ওই	পোড়ো বাড়িতে	তিনি	কাল	যাবেন
২					
৩					
৪					
৫					

স্তর-৪ এর বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে গেল 'তিনি' এই উপাদানকে বাদ রেখেই 'ওই পোড়ো বাড়িতে'— এই উপাদানটির সঙ্গে 'কাল যাবেন' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে। আবার 'তিনি' এই উপাদানটি 'ওই পোড়ো বাড়িতে কাল যাবেন' এই উপাদানটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্তর-৫ এ। এভাবেই অব্যবহিত উপাদানগুলি আন্বয়িক গঠনে যুক্ত হয়ে হয়ে একটি বড় গঠন তথা বাক্য নির্মাণ করে। অব্যবহিত উপাদানে সব বাক্য বিশ্লেষণে সম্ভব নয়। পরন্তু, মুখের ভাষা নিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ কাজ করেছেন। মুখের ভাষায় জটিল গঠন সবসময়ে এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। আর এই কারণেই নোয়াম চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণের পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৭.৪.১১.৪ ঃ নোয়াম চমস্কি ও সঞ্জননী ব্যাকরণ

আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির জন্ম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মূলত ব্লুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গঠনমূলক (Structural) ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। ভাষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং অঙ্ক ছিল তাঁর পাঠ্য বিষয়। তিনি একসময়ে আচরণবাদী (Behaviourist) ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনাচিন্তা থেকে একটু আলাদা ভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ব্লুমফিল্ডের পথ থেকে সরে এলেন। বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)-এর 'Verbal Behaviour' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করলেন। এখান থেকেই বলা চলে তাঁর ভাবনাচিন্তা নতুন পথ অবলম্বন করেছে তা স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের কাছে। ১৯৪১ থেকেই তিনি অবশ্য তাঁর নতুন পথে যাত্রা শুরু করেননি। এই সময়ে তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র হিসেবে হিব্রু ভাষার রূপ-স্বনিম তত্ত্ব (Morphophonemics of Modern Hebrew) নিয়ে কাজ করেছিলেন। অন্বয় নিয়ে ভাবনা শুরু হয় আর দুবছর পরে। ১৯৪৩-এ পত্রিকায় (Journal of Symbolic Logic, vol-18) আন্বয়িক বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞানের (Symolic Logic) পরিভাষা ও সূত্র প্রয়োগ করেন এই প্রবন্ধে (Systems of Syntactive Analysis)। ১৯৫৪-তে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেন অন্বয় নিয়ে। এ টি গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। 'The Logical Structure of Linguistic Theory' (১৯৫৫)- এই মিমিয়োগ্রাফ গ্রন্থটি বেশি লোকের চোখে পড়েনি। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে বোঝা গিয়েছিল যে সংবর্তনী ব্যাকরণের সূত্রপাত এই ১৯৫৫ থেকেই ঘটে গেছে। আসলে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Syntactic Structures' গ্রন্থটি তাঁর তত্ত্বকে বিশেষভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৫৭-র 'Syntactic Structures' গ্রন্থে বাক্য বিশ্লেষণ করার তিনটি মডেল দিলেন। এই তিনটি মডেল আসলে তিন ধরনের ব্যাকরণ তৈরি করল।

ক. Finite State Grammar

খ. Phrase Structure Grammar

গ. Transformational Grammar

কীভাবে শব্দ জুড়ে জুড়ে আন্বয়িক গঠন তৈরি করা হয় সে বিষয়টি 'Finite State Grammar'-এর মডেলে রয়েছে। 'Phrase Structure Grammar'-এর মডেলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেলের মধ্যে বাক্যগঠনের যে দিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে সেই দিকগুলি নিয়েই আন্বয়িক সূত্র নির্মিত হয়েছে। পরে ১৯৬৫-র তত্ত্বে 'Phrase Structure'-এর ব্যাকরণকে একটু পরিবর্তন করে 'Phrase Structure Rule' [PSR] হিসেবে দেখেছেন। 'Transformational Grammar'-এর ক্ষেত্রে যে নূতনত্ব দেখালেন তিনি তা সকলের কাছে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছিল। চমস্কির ১৯৫৭-র এই গ্রন্থটির তত্ত্ব ১৯৫৭-র তত্ত্ব হিসেবে প্রচার লাভ করে। পরে ১৯৫৭-র তত্ত্বকে নানাভাবে পরিমার্জিত করে ১৯৬৫-তে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির তত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের (Generative Grammar) মান্যতত্ত্ব বা Standard Theory বা সংক্ষেপে ST হিসেবে পরিচিত।

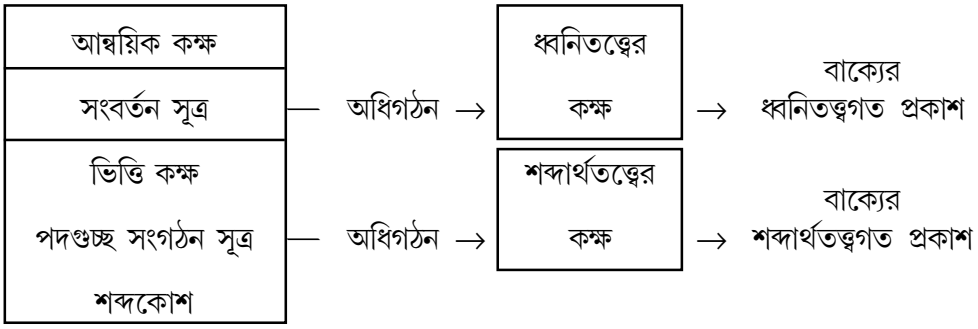
১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন, 'Language and Mind' গ্রন্থটি। মনোভাষাবিজ্ঞানের (Psycholinguistics) আলোচনায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চমস্কির মান্যতত্ত্ব পরবর্তীকালে নানাভাবে সমালোচিত হয়। তিনি নিজেই এর নানা পরিবর্তন করতে থাকেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে Extended Standard Theory বা EST তৈরি করেন। ১৯৮১-তে প্রকাশ করেন 'Lectures on Government and Binding' গ্রন্থটি। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের 'Principal and Parameter' বা 'P & P' তত্ত্ব হিসেবে দেখলেন। তৈরি হল 'Revised Extended Standard Theory' বা REST তত্ত্ব। এখানে তিনি বৈশ্বিক ব্যাকরণের (Universal Grammar) সূত্র নির্মাণ করলেন।

সঞ্জননী তত্ত্বের গোড়ার কথা হল—বাক্য তৈরি করা বা সৃষ্টি করা। ভাষাতত্ত্বের (Philology) কাজকর্ম চলেছিল লিখিত নিদর্শনের ওপর নির্ভর করে। ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) মূলত মুখের ভাষাকেই গুরুত্ব দেয়। আমরা যেভাবে ভাষা শিখি—ভাষা ব্যবহার করি তা আসলে বাক্য সঞ্জনন (Generation) করা। চমস্কি এই বাক্য সঞ্জননের কথা বললেন। বাক্যের দুটি গঠনের কথা বললেন। একটি হল আদর্শ গঠন, অন্যটি হল প্রকৃত গঠন। ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের কাঠামোকে মেনে নিয়েই তৈরি হয় বাক্যের আন্বয়িক কাঠামো। এই কাঠামোকেই অধোগঠন (Deep Structure) নাম দিয়েছেন তিনি। সীমাবদ্ধ আন্বয়িক গঠন তৈরি করে অসংখ্য বাক্য। এই উচ্চারিত বাক্যগুলি হল অধিগঠন (Surface Structure)। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে সেগুলিকে বলে সংবর্তন (Transformation)। এইভাবে তিনি তৈরি করলেন সঞ্জননী সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar)। একে সংক্ষেপে TG Grammar বলা হয়।

চমস্কি সঞ্জননী ব্যাকরণকে কতকগুলি নিয়মের পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। 'Aspects of the Theory of Syntax' (1965) গ্রন্থে তিনি তিনটি প্রধান উপাদান শ্রেণির বিন্যাস কক্ষ আছে বলে জানিয়েছেন। আন্বয়িক কক্ষ ও ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের কথা জানিয়েছেন।

> "This system of rules can be analyzed into three major components of generative grammar : The syntactic, phonological and semantic components" [p-16]

১৯৫৭-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বলেননি। বিশেষ গুরুত্বও দেননি। পরবর্তীকালে ছাত্র ও সহকর্মীদের কথায় তিনি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। চমস্কি সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার কথা যেভাবে বলেছিলেন তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—



ভিত্তি কক্ষে (Base) রয়েছে দুটি বিষয়। একটি হল—শব্দকোশ (Lexicon)। এখান থেকে শব্দ নিয়ে তৈরি হয় বাক্য। পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র তৈরি করে একটি প্রাথমিক গঠন। এই কক্ষের সঙ্গে অধোগঠনের যোগ রয়েছে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের সঙ্গে। সেখানে থেকেই বাক্যের অর্থবোধ ঘটে। অন্যদিকে সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে আন্বয়িক নিয়মাবলী আন্বয়িক কক্ষ থেকে যুক্ত হয়ে তৈরি করছে অধিগঠন। এই অধিগঠন ধ্বনিতত্ত্বের কক্ষের মাধ্যমে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম যুক্ত হয়ে উচ্চারিত বাক্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এইভাবে একদিকে অধোগঠন অন্যদিকে অধিগঠন একদিকে শব্দের বা বাক্যের অর্থবোধ অন্যদিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকাশ নিয়ে বাক্যসঞ্জনন ক্রিয়া চলতে থাকে। একই নিয়মের দ্বারা তৈরি হতে থাকে অসংখ্য বাক্য।

৭.৪.১১.৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব

নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি দুটি করে তত্ত্ব নিয়ে একটি তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। একটি তত্ত্ব আর একটির পরিপূরক। একে যুগ্মতত্ত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রধান চারটি যুগ্মতত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যথা—

ক. বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar) ও বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)

খ. পারঙ্গমতাবোধ (Competence) ও ভাষা ব্যবহার (Performance)

গ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence) ও গ্রহণযোগ্য বাক্য (Acceptable Sentecne)

ঘ. অধোগঠন (Deep Structure) ও অধিগঠন (Surface Structure)

এক এক করে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল। মনে রাখতে হবে, এগুলি পরিপূরক যুগ্ম তত্ত্ব।

৭.৪.১১.৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ

পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণ এক কী করে হতে পারে, এমন প্রশ্ন বহুবার উঠেছে। এইসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজ করে দেখা যাক বৈশ্বিক ব্যাকরণ (UG) বলতে কী বোঝায়। যে-কোনো ভাষারই রয়েছে অন্তর্গত গঠন। সেই গঠন বোঝা যায় বাক্যের উপাদান শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে। যেমন, কোনো কিছুর নাম বোঝালে তা অবশ্যই নামপদ হবে। কাজ করা বোঝালে হবে ক্রিয়া। কোনো বস্তু বা বিষয়ের গুণ-দোষ ইত্যাদি বোঝালে হবে বিশেষক (modifier)। এইভাবে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদবিভাগ সব ভাষারই যেমন আছে তেমনি পদগুলির আন্বয়িক বিন্যাসও রয়েছে। যেমন বিশেষণ নামপদ বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হবে। আগে হতে পারে পরেও হতে পারে। যেমন, 'যাব না'—তে 'না' ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসেছে। 'জোরে যাবে'—তে ক্রিয়ার আগে বসেছে বিশেষণ। 'দেবী বিশালাক্ষ্মী'-তে বিশালাক্ষ্মী বিশেষণের ভূমিকা পালন করছে। আবার চমস্কি বৈশ্বিক ব্যাকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিকে। ভাষা শেখার তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণা। পৃথিবীর সব ভাষাই একই পদ্ধতিতে শেখা হয়। একে বলা হয় LAD বা Language Acquisition Device অর্থাৎ, ভাষা গ্রহণের পদ্ধতি। ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন এই LAD-এর দ্বারাই আমরা শিখে যাই। আমাদের মাথার মধ্যে তৈরি হয় Language Faculty বা ভাষার এলাকা। 1972 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Language and Mind' গ্রন্থে চমস্কি এই ধারণা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। বৈশ্বিক ভাষা বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিষয়ক ধারণা মানুষের সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত। 1986-তে প্রকাশিত 'Knowledge of Language : Its Nature, Origin and Use' গ্রন্থে তিনি জানান, আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ভাষা শেখার শক্তিই বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত ভাষা বিষয়ক ধারণাই হল বৈশ্বিক। একটি বিশেষ ভাষার সঙ্গে অন্য একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণের পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু উভয় ভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি এক। যেমন ধরা যাক, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে চিনা ভাষার ব্যাকরণের তফাৎ অনেক আছে। কিন্তু উভয় ব্যাকরণের গঠনগত ও বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল সূত্রগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীনতা লক্ষ করা যায়।

যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ হল বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)। যেমন, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ, তামিল ভাষার ব্যাকরণ—এসবই আলাদা আলাদা ভাষার ঐতিহ্য বহন করে সেই ভাষার অন্তর্গত কাঠামোর ওপর নির্ভর করে রচিত। এগুলি এক একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ হিসেবেই গ্রহণ করা হবে।

একথায় বলতে গেলে, যে সব সূত্র পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন ভাষা শেখার পদ্ধতি, অধোগঠন (Deep Structure) সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা তা বৈশ্বিক ব্যাকরণের মূল এলাকা। আর এই বৈশ্বিক ব্যাকরণের সূত্র মেনে বিশেষভাবে বিশেষ শব্দভাণ্ডার, আন্বয়িক নিয়ম ও ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে তৈরি হয় বিশেষ ব্যাকরণ।

৭.৪.১১ .৪.৩ : পারমঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার

মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে অসীম সম্পদ। সেই মনের অতলে অবস্থিত ভাষা সম্পর্কিত যে সম্পদ রয়েছে তার ওপর আলো ফেলাই সঞ্জননী ব্যাকরণের মূল কাজ বলে মনে করেন চমস্কি। তিনি মনে করেন ভাষা হল মানুষের মনের দর্পণ। আমরা আমাদের পরিবেশ থেকে ভাষা শিখি। সে ভাষা মূলত মাতৃভাষা। তাই ব্যক্তির মনের মধ্যে তার মাতৃভাষা সম্পর্কিত যে ধারণা থাকে, মাতৃভাষার যে শব্দভাণ্ডার, যে গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাকে এককথায় পারঙ্গমতাবোধ (Competence) বলে। 1965-তে চমস্কি যে পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেন তার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার (Performance) জড়িয়ে থাকে।

ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান বা ধারণা হল পারঙ্গমতাবোধ। কথা বলতে পারা, শুনে তা বুঝতে পারা ইত্যাদি ক্ষমতা হল—পারঙ্গমতাবোধ। আর কথা বলা বা শোনা হল ভাষা ব্যবহার। পারঙ্গমতাবোধ আর ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে এই সম্পর্ক আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভাষা ব্যবহার আর পারঙ্গমতাবোধ এক। আমাদের কথা বলার সময় অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের সময় নানা রকমের বাধা চলে আসতে পারে। যেমন, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে যেতে পারে। ঠিকমত গুছিয়ে বলতে না পারা—এলোমেলো বলা। বলতে বলতে ভুলে যাওয়া। ঠিকঠাক না বলা বা ভুল বলা। কোনো বিষয় বলতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা। হঠাৎ অন্য কোনো বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে কথার মাঝখানে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন। কথা বলার সময় তোতলামি করা-পেকগেলা-গলা শুকিয়ে যাওয়া-নার্ভাস হওয়া-ভুল উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়ও বাধার সৃষ্টি করে। তাই ভাষা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সরাসরি বক্তার পারঙ্গমতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রকৃত ভাষা ব্যবহার হল আদর্শ বক্তা—শ্রোতার কথা বলা। সেখানে স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা থাকবে না। এলোমেলো বলা—ছড়িয়ে বলা থাকবে না। কথার মাঝখানে মনোযোগ বদলানো চলবে না। কোনো কিছু ভুল বলবে না। কোনো ধরনের বাক্-বিচ্যুতি ঘটবে না। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃত পারঙ্গমতাবোধের সম্পর্ক তৈরি হয়। বলা বাহুল্য, আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে বাস্তবে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়।

অনেকে মনে করেন Saussure-এর Langue ও Parole-এর ধারণার সঙ্গে চমস্কির Competence-Performance-এর ধারণার মিল আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চমস্কি Humboldt-এর 'Underlying Competence, এর ধারণা থেকেই এই পারঙ্গমতাবোধের ধারণা পেয়েছেন। একথা চমস্কি নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থের ভূমিকায়। যে-কোনো ভাষার সঞ্জননী ব্যাকরণ আদর্শ

বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধকে বিশ্লেষণ করে দেখাবে। বক্তা-শ্রোতার ভাষা ব্যবহারকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করবে। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান কাজ হল—আদর্শ বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণ।

দুধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা চমস্কি বলেছেন—(ক) Grammatical বা ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধ এবং খ. Pragmatic বা প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধ। ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধকে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক (Linguistic) পারঙ্গমতাবোধ বলা হয়। সাধারণভাবে বক্তার স্বজ্ঞায় দুধরনের জ্ঞান কাজ করে। একটি হল—বাক্যটির গঠন ঠিক আছে কিনা তা দেখা। অন্যটি হল—বাক্যের গঠন সম্পর্কিত বোধ অর্থাৎ ধ্বনি ও ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারণা, রূপ বিষয়ক ধারণা, আন্বয়িক গঠন সম্পর্কে ধারণা ও অর্থ বা শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা। সবার মধ্যে এই ধারণাগুলির সবকটিই অল্পবিস্তর থাকে।

সংযোগমূলক (Communicative) বা প্রয়োগমূলক (Pragnatic) পারঙ্গমতাবোধের কথা 1966 খ্রিস্টাব্দে Dell Hymes আমাদের কাছে জানান। তিনি বলেন, বক্তার বাক্য সঞ্জননের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি লক্ষ করা প্রয়োজন। চমস্কি প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন, 'Today was a disaster'-এই বাক্যে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী ধারণার উপর নির্ভর করে আছে। আগের তথ্য না জানলে এই বাক্যের অর্থ জানা সম্ভব হয় না। ফলে, বাক্যের ব্যবহারের দিকটি এখানে প্রাধান্য পায়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের প্রধান তিনটি দিক জানা যায়।

ক. মৌখিক সঙ্কেত এবং মৌখিক নয় এমন সঙ্কেত। ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এই ধরনের পারঙ্গমতাবোধ।

খ. ঠিকমতো কথা বলা ও বিষয় অনুসারে কথা বলা। একে আদান-প্রদান বিষয়ক ক্ষমতা বলে।

গ. সমাজের গঠন ও তার নানা বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো জেনে কথা বলা। একে সংস্কৃতি-বিষয়ক জ্ঞান বলে।

চমস্কি পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে একই আদর্শ ভাষার দিকটির কথা বলেন। সেখানে বৈশ্বিক ব্যাকরণ প্রাধান্য পায়। সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষাবৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ভাষা ব্যবহার চমস্কি বুঝিয়েছেন, '...the actual use of language in concrete situation' [Chomsky, Aspects of ther Theory of Syntax, page-4]। বক্তার কথা বলা আর শ্রোতার ভাষা-বোধ বা উপলব্ধি করা হল ভাষা ব্যবহার। গতানুগতিকভাবে মনে করা হয় যে, যতটা পারঙ্গমতাবোধ ততটাই ভাষা ব্যবহার করা হয় বা পারঙ্গমতাবোধ যতটা অনুমতি বা ছাড়পত্র দেবে ততটা পর্যন্ত ভাষা ব্যবহার করতে পারব আমরা। বর্তমানে এ ধারণা ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে

এর আগে আলোচনা করেছি আমরা। এখানে বলা যায়, ভাষাব্যবহার ব্যাকরণের বিচ্যুতি বা বিভিন্ন বাক্যের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। ভাষাব্যবহারের ভুল বা Performance error নানাভাবেই দেখা যায়। যেমন, Black bird-এর অর্থ দুরকম। যদি Black-এ শ্বাসাঘাত দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তবে তা এক ধরনের বিশেষ পাখিকে বোঝাবে। যদি দুটি অংশকেই শ্বাসাঘাত পড়ে তবে তা কালো রঙের পাখিকে বোঝাবে। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয়, তাদের এই ধারণা নাও থাকতে পারে। তবে তা পারঙ্গমতাবোধের বিষয়। কিন্তু পারঙ্গমতাবোধ থাকা সত্ত্বেও কথা বলার সময় ভুল উচ্চারণ যে-কোনো সময়েই হতে পারে।

আরো নানা ধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ। যেমন, পাঠগত (Textual) পারঙ্গমতাবোধ, বাচনগত (Discourse) পারঙ্গমতাবোধ, বর্ণনা বা আখ্যান নির্মাণের (Narrative) পারঙ্গমতাবোধ, সাহিত্যিক (Literary) পারঙ্গমতাবোধ, ধারণাসম্পর্কিত বা জ্ঞান সম্পর্কিত (Cognitive) পারঙ্গমতাবোধ ইত্যাদি।

৭.৪.১১.৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য

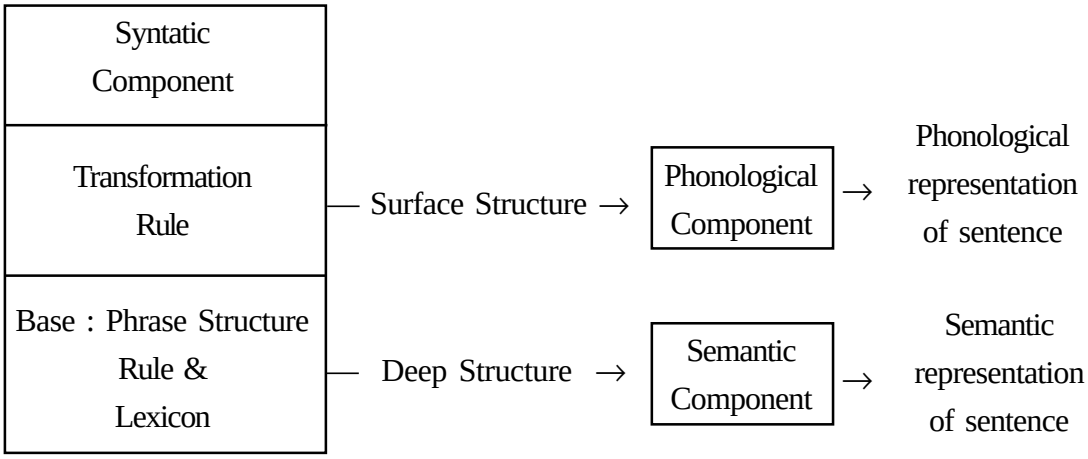
যে বাক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি এবং মনে মনেই তার বিশ্লেষণ করতে পারি তাকেই চমস্কি গ্রহণযোগ্য বাক্য বলে মনে করেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য না লিখেই বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে যে বাক্য রচিত হয় তাকে ব্যাকরণসম্মত বাক্য বলে। পারঙ্গমতাবোধের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে। পারঙ্গমতাবোধ নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি হল বাক্যের বা ভাষার ব্যাকরণ মেনে চলা। ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য বাক্যের ধারণাকে মেলানো উচিত নয়। গ্রহণযোগ্য বাক্যের একটিমাত্র দিক হল ব্যাকরণ মেনে চলা। কিন্তু এছাড়াও অন্য নানা দিক আছে। ভাষাব্যবহার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হল গ্রহণযোগ্যতা।

কোনো বাক্য আদর্শ বা ব্যাকরণের গঠন থেকে বিচ্যুতি হলেও তাকে গ্রহণযোগ্য বাক্য কেন বলব তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। যেমন, খুব তাড়াতাড়ি বললেও বোঝা যাবে এমন বাক্য, মনে রাখা সহজ হচ্ছে এমন বাক্য, স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে এমন বাক্য ইত্যাদি। সঞ্জননী ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বাক্য চমস্কি গ্রহণ করতে চান না। যে বাক্যগুলি খুব সহজেই সঞ্জনিত হয় সেই বাক্যগুলিকেই গ্রহণযোগ্য বাক্য অর্থাৎ সূত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য বলে মনে করেছেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য হতে গেলে যেমন খুব সহজেই সঞ্জনিত হতে হবে তেমনি খুব সহজেই বোঝা যাবে। স্বাভাবিক ও আয়তনে ছোট বাক্যই তাই ভাষা বিশ্লেষণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বাক্য।

৭.৪.১১.৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন

আন্বয়িক উপাদান শ্রেণি দিয়ে প্রত্যেক বাক্যের ক্ষেত্রে একটি করে অধোগঠন (Deep Structure) ও একটি করে অধিগঠন তৈরি করে। বাক্যের আদর্শ গঠন তৈরি হয় অধোগঠনের মাধ্যমে। অধোগঠনে থাকবে ভিত্তি কক্ষ। সেখানে থাকবে শব্দশেষ আর পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র। আন্বয়িক কক্ষে থাকবে আন্বয়িক সূত্র এবং

সংবর্তন কক্ষে থাকবে সংবর্তন সূত্র। ১৯৫৭-তে শব্দার্থতত্ত্বের কথা চমস্কি বলেননি। ১৯৬৫-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বললেন। অধোগঠনেই বাক্যের অর্থবোধের দিকটি পরিচালিত হবে। অধোগঠন সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনে পরিণত হয়। অধিগঠনে বাক্যের ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonological) প্রকাশ ঘটে। চমস্কি প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে এই দুটি গঠন দেখানো হল—

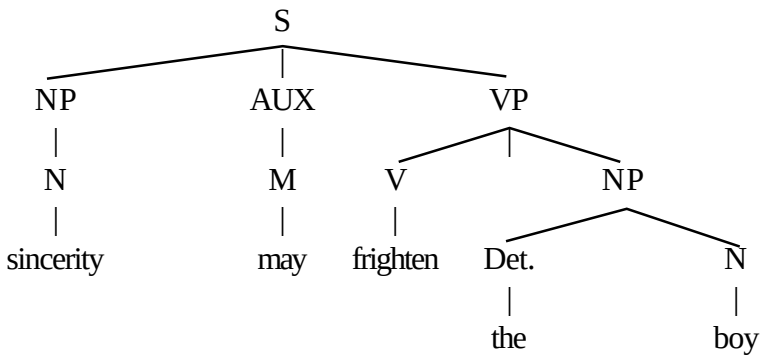


৭.৪.১১.৪.৬ : উপাদান শ্রেণি

সঞ্জননী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে যে যে তথ্য লাভ করা যায় তা দেখা যেতে পারে চমস্কি মনে করেছিলেন [1965 : 128]। যেমন, 'Sincerity may frighten the boy' এই বাক্যটি সম্বন্ধে প্রথানুসারী ব্যাকরণে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা অনেকটা এই ধরনের—

১. এই শব্দশৃঙ্খলটি একটি বাক্য = Sentence (S), 'frighten the boy' হল ক্রিয়াগুচ্ছ (Verb Phrase) = (VP), এতে ক্রিয়াপদ 'frighten' রয়েছে। ক্রিয়া = Verb (V), বিশেষগুচ্ছ = Noun Phrase (NP) হল 'the boy', 'Sincerity'-ও একটি বিশেষগুচ্ছ। বিশেষগুচ্ছ 'the boy'-তে নির্দেশক = Determiner (Det) হল 'the' ইত্যাদি।

এইসব তথ্য অবশ্যই বাক্যের গঠন বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাক্যটির গঠন বিশ্লেষণ করলে তার বৃক্ষচিত্রটি এইরকম দাঁড়ায়—



এই ধরনের পদগুচ্ছ বিশ্লেষণী ব্যাকরণে দুটি প্রধান চিহ্ন থাকে—একটি হল শব্দ প্রতীক (formatives) অন্যটি হল—শ্রেণি প্রতীক (Category symbols)। the, boy ইত্যাদি হল শব্দ প্রতীক আর S, NP ইত্যাদি হল—শ্রেণি প্রতীক। পুনর্লিখন সূত্রের মাধ্যমে এই বৃক্ষচিত্রটি এভাবে দেখানো যেতে পারে—

(i) S → NP Aux VP

VP → V NP

NP → Det N

NP → N

Det → the

Aux → M

(ii) M → may

N → sincerity

N → boy

V → frighten

এই সূত্র অনুসারেই বাক্যটি সঞ্জনিত হয়েছ। এই সূত্র ধরে অজস্র বাক্য সঞ্জনিত হতে পারে। S, NP, VP, AUX এই চারটি শ্রেণি হল Major Categories বা প্রধান উপাদান শ্রেণি। আর M, N, V ইত্যাদি হল Lexical Categories বা শব্দ শ্রেণি।

প্রথানুযায়ী ব্যাকরণের উদ্দেশ্য (Subject)—বিধেয় (Prdicate) বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এই সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয় বলে চমস্কি জানিয়েছেন। Allen এবং Buren জানান—

> "The notion 'Subject', as distinct from the notion 'NP', designates a grammatical function rather than a grammatical category." [Chomsky : Selected Readings, p-45]

বাক্যে ব্যবহার অনুসারে পদভূমিকা অনুসারে উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজন হয়। এই পদভূমিকার সঙ্গে শ্রেণি প্রতীককে এক করে দেখা সঙ্গত নয়।

৭.৪.১১.৪.৭ : ব্যাকরণসম্মত সংবর্তন

অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে সংবর্তন। এই সংবর্তন দুধরনের হতে পারে। (১) একক (singulary) সংবর্তন। একটি পদগুচ্ছ সংগঠনের দ্বারা পরিচালতি হয় যে সংবর্তন তাকে একক সংবর্তন বলে। যেমন,

John kissed Mary → Mary was kissed by John

They will win → Will they win?

The problem was difficult → The problem wasn't difficult.

২. সাধারণীকৃত (generalized) সংবর্তন। একের বেশি পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি নতুন পদগুচ্ছ চিত্র নির্মাণ করে। যেমন,

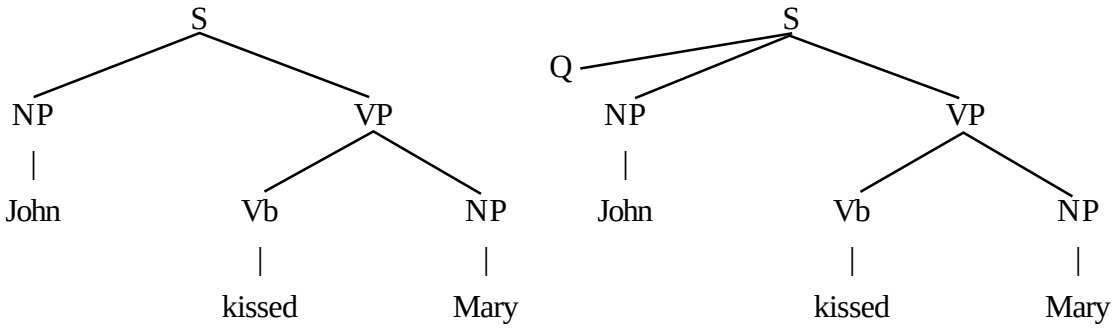
The man stayed for supper
The man bought the house
→ The man who bought the house stayed for supper.

He said it
He was going
→ He said that he was going.

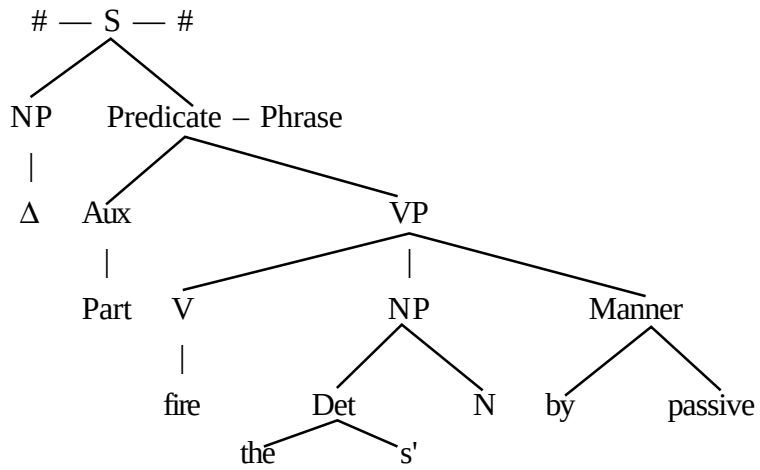
We have to work hard
It is a nuisance
→ Our having to work hard is a nuisance.

চমস্কি প্রদত্ত সংবর্তনগুলি চমস্কি প্রদর্শিত বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

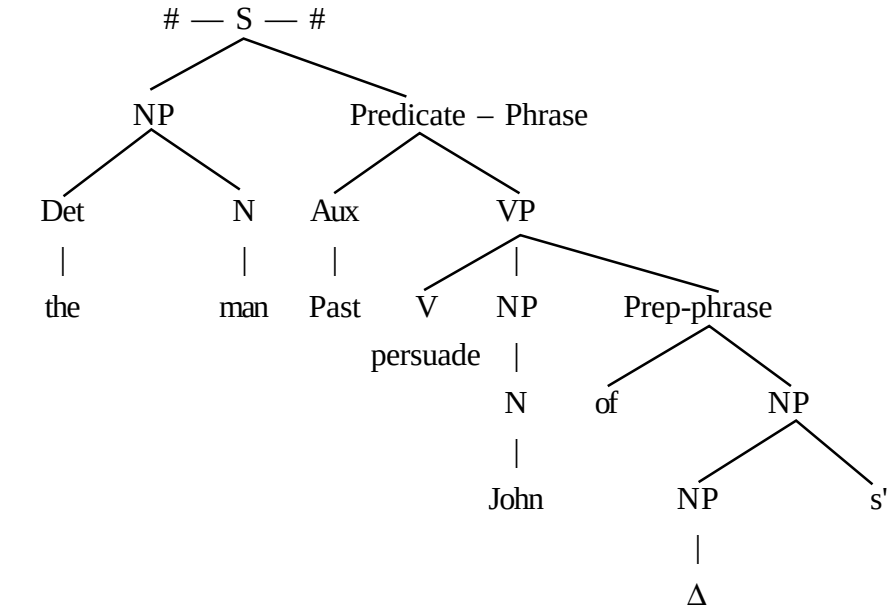
প্রশ্ন সংবর্তন—

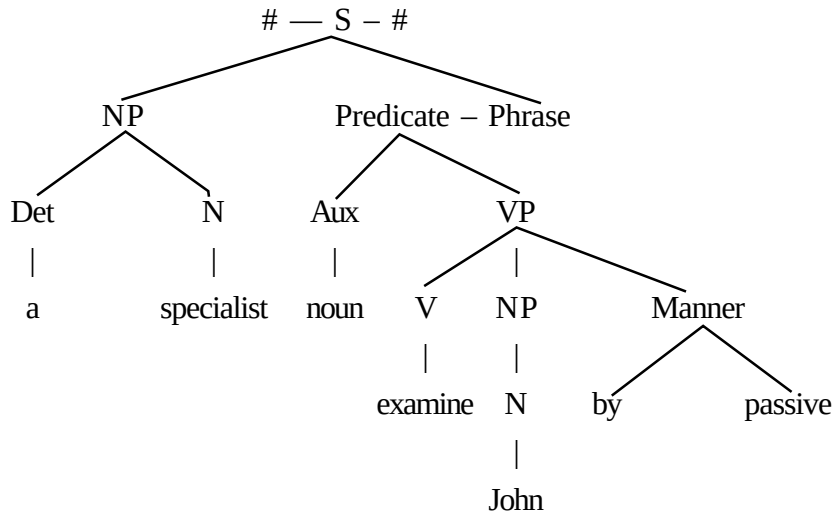


এখানে Q চিহ্ন থাকলে প্রশ্ন সংবর্তটি বাধ্যতামূলক সংবর্তন হবে। যদি Q চিহ্ন না থাকে তাহলে প্রশ্ন সংবর্তন ইচ্ছামূলক সংবর্তন হবে।



এই বৃক্ষচিত্রে s´ চিহ্ন থাকায় এর সঙ্গে আর একটি বৃক্ষচিত্র যুক্ত হবে।





the man who persuaded John to be examined by a specialist was fired—এই বাক্যটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃক্ষচিত্র প্রয়োজন।

চমস্কি জানালেন,

"Thus the syntactic component consists of a base that generates deep structures and a transformational part that maps them into surface structures."

এভাবে আন্বয়িক কক্ষ থেকে অধোগঠন তৈরি হয়। সংবর্তন কক্ষ তাকে অধিগঠনে পরিণত করে।

বাক্যের অধোগঠন শব্দার্থতত্ত্ব কক্ষের মাধ্যমে অর্থবোধ ঘটায়। সঞ্জননী ব্যাকরণের কাজ হল শব্দার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের প্রকাশকে মিলিয়ে দেওয়া।

> "The final effect of a grammar, then, is to relate a semantic interpretation to a phonetic representation—that is, to state how a sentence is interpreted."—Chomsky 'Aspect of the theory of Syntax'.

একক-১২

বাংলা ভাষার সংবর্তন

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১২.১ পাণিনির পূর্ববর্তী যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৭.৪.১২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১২.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.৪.১২.১: বাংলা ভাষার সংবর্তন

বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করেই নোয়াম চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণের যে সূত্র নির্মাণ করেছেন তার বিন্যাস বিশেষ ব্যাকরণের। কারণ, তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গ ধরেই অধোগঠন এবং অধিগঠনের বৃক্ষচিত্র এবং পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (Phrase Structure Rule) তৈরি করেছেন। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে বৃক্ষচিত্রর বিন্যাস পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র হুবহু চমস্কি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে হবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান লেখকের 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় বৃক্ষচিত্র ও পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দেওয়া হল।

বাক্য → বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ [বি. গুচ্ছ + ক্রি. গুচ্ছ]

বি. গুচ্ছ → নির্দেশক + বিশেষণ + বিশেষ্য [নি. + বিণ. + বি.]

ক্রি. গুচ্ছ → বি. গুচ্ছ + ক্রিয়া + সহায়ক

সহায়ক → বিভক্তি [কালবিভক্তি, ভাব বিভক্তি, প্রকার বিভক্তি], নঞর্থক, প্রশ্নবোধক

বি. → বই, গাছ, আমি...

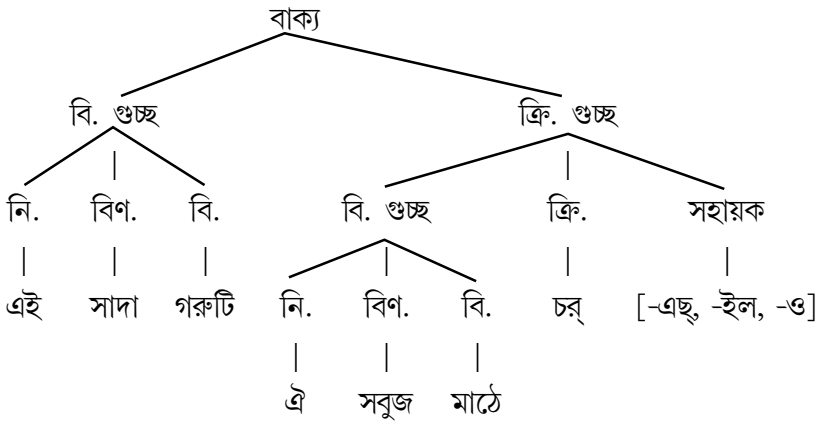
বিণ. → ভালো, খারাপ, দামী...

ক্রি. → যা, খা, বল্, শুন্...

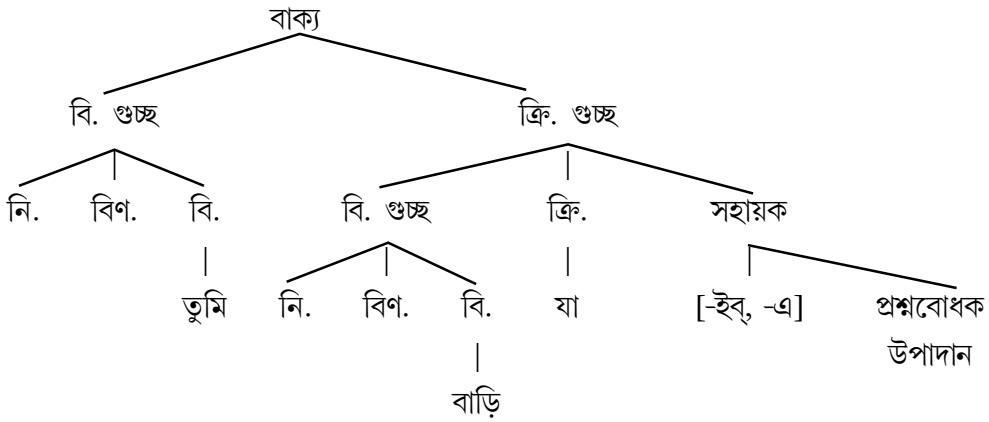
নি. → ঐ, এই, কই...

ইংরেজি ভাষায় সহায়কের গুরুত্ব বেশি। তাই সহায়ক প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। বাংলা ভাষায় সহায়ক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেকারণে সহায়ককে প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে দেখা হয় না। ক্রিয়াগুচ্ছর অন্তর্গত একটি শ্রেণি হিসেবে দেখা হয়। ইংরেজি বাক্যের বিন্যাসক্রম হল—'কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম' = [SVO], কিন্তু বাংলা বাক্যের প্যাটার্ন - [SVO] বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া গঠন। তাই ইংরেজি ভাষার বৃক্ষচিত্রে যেমন কর্মকে বাক্যের শেষে রাখা হয়েছে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা করা চলে না। তাই বিন্যাসক্রম ইংরেজির মতো না হয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী হবে। কয়েকটি বাক্য বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

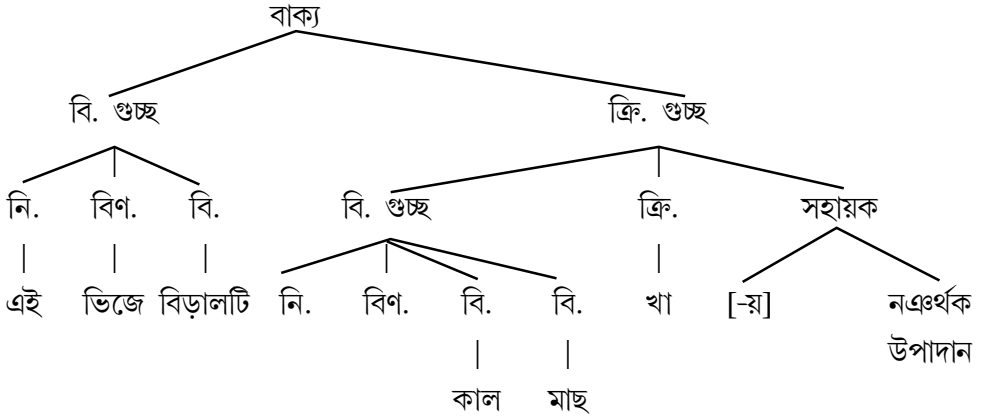
১. এই সাদা গরুটি ঐ সবুজ মাঠে চরেছিল।



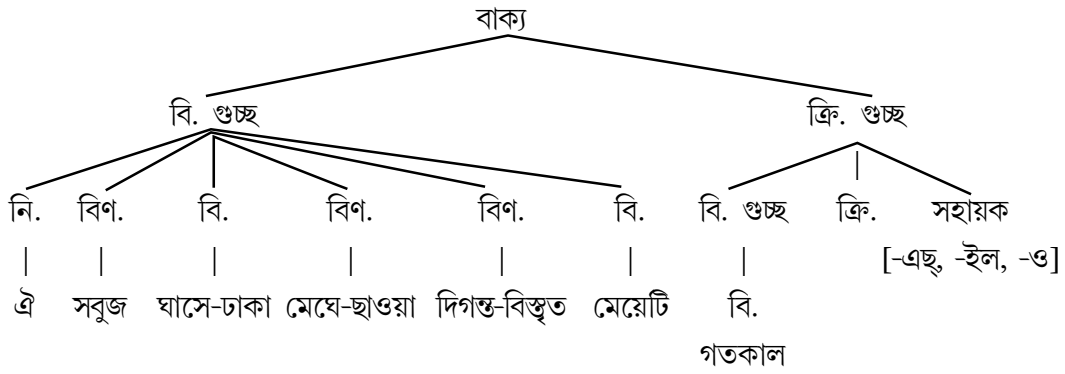
২. তুমি বাড়ি যাবে কি?



৩. এই ভিজে বিড়ালটি কাল মাছ খায়নি।



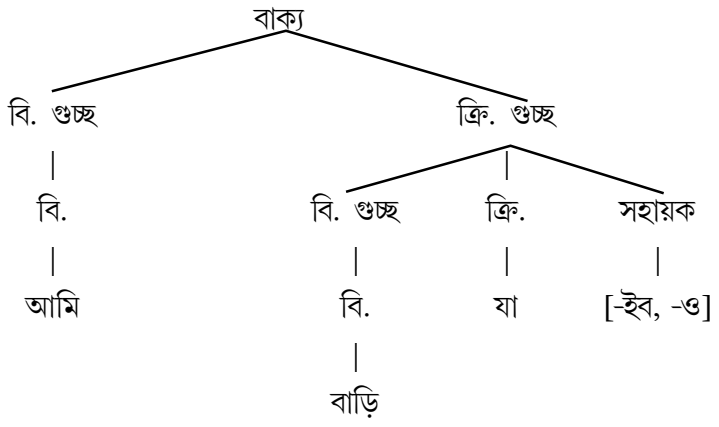
৪. ঐ সবুজ ঘাসে ঢাকা মেঘে-ছাওয়া দিগন্ত-বিস্তৃত মেয়েটি গতকাল এসেছিল।



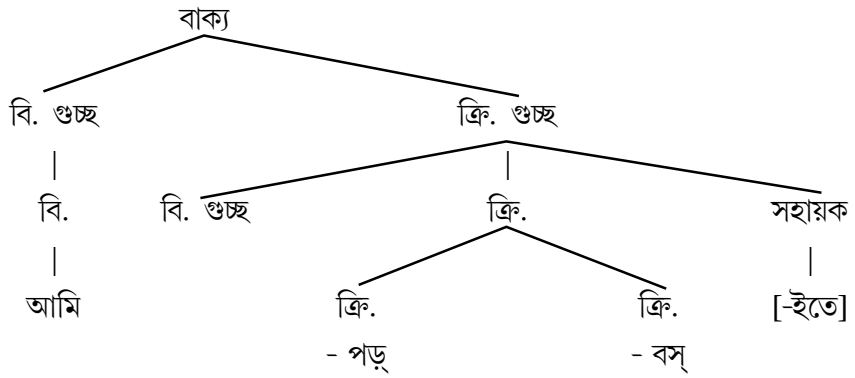
প্রথম তিনটি বাক্য স্বাভাবিক। চতুর্থ বাক্যটির বক্তব্যে রয়েছে অর্থগত বিসঙ্গতি। যদিও কবিতার ভাষায় এধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। 'মেয়েটি'-র বিশেষণ হিসেবে যে পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির অর্থগত বিপর্যাস একটি প্রতীক অর্থ ব্যঞ্জিত করে। ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্য গ্রহণযোগ্য বাক্য নয়। প্রথম বাক্যটি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক বাক্য এবং তৃতীয়টি হল নঞর্থক বাক্য। নিজের উদাহরণগুলিতে গঠন অনুসারে ভিন্ন ধরনের বাক্য বৃক্ষচিত্রে দেখানো হল।

ক. মৌলিক (= সরল) বাক্য (mono-clause structure)। এই বাক্য একটিমাত্র বাক্যখণ্ড দিয়ে গঠিত।

১. আমি বাড়ি যাব।

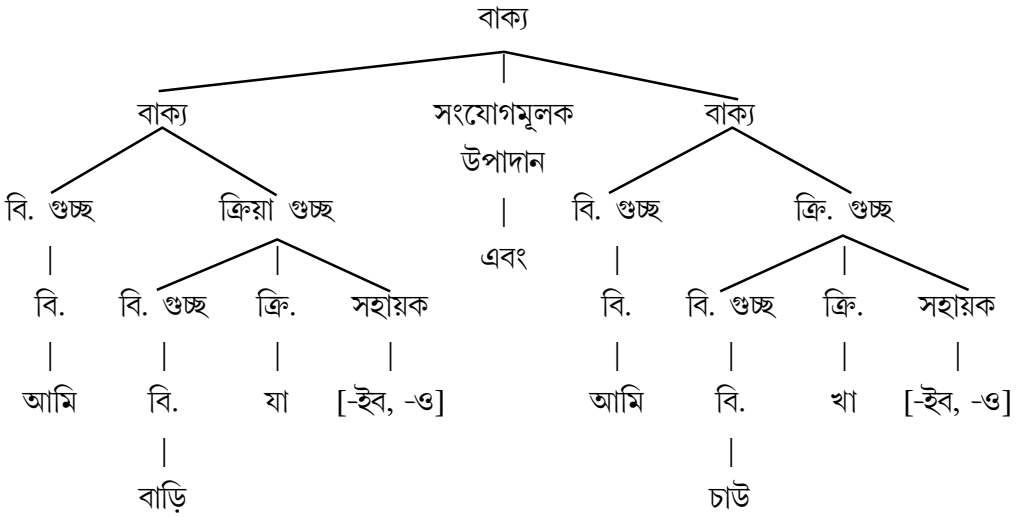


২. আমি পড়তে বসব।

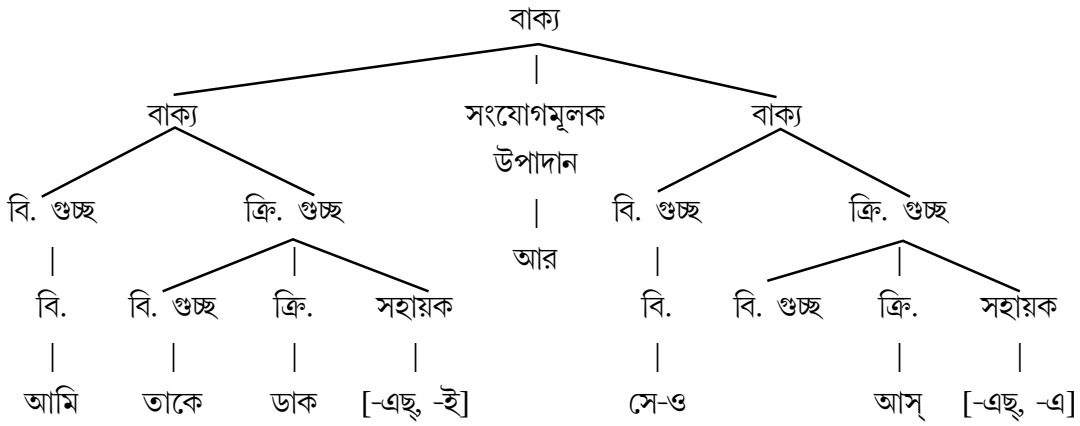


খ. অমৌলিক বাক্য। সংযোগমূলক বাক্য (Co-ordinating structure)

৩. আমি বাড়ি যাব এবং আমি চাউ খাব।

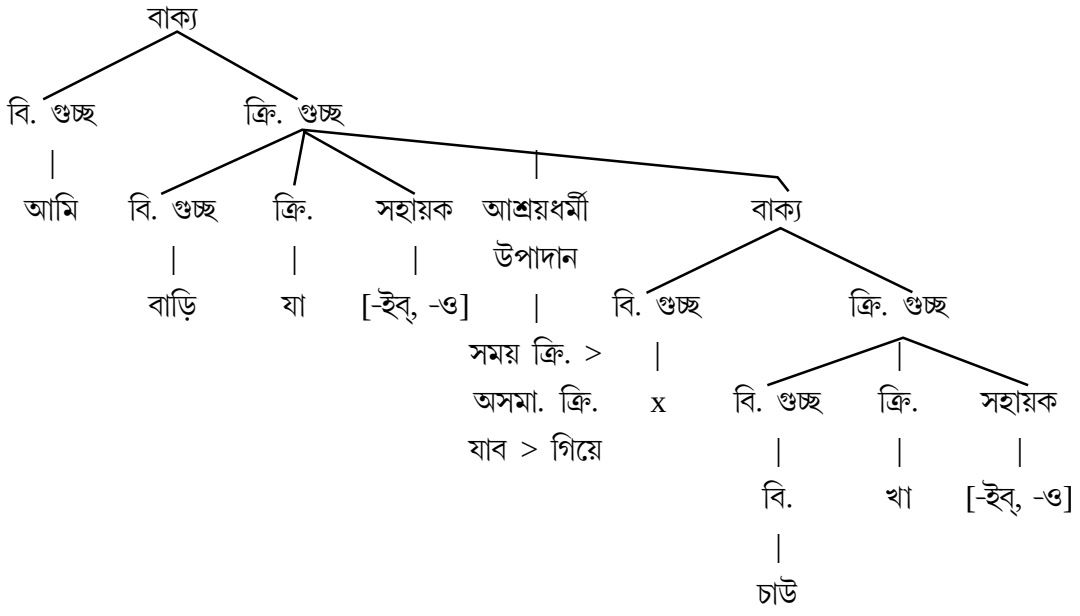


৪. আমি তাকে ডেকেছি আর সে-ও এসেছে।



গ. অ-মৌলিক বাক্য। আশ্রয়মূলক বাক্য (Sub-ordinating structure)।

৫. আমি বাড়ি গিয়ে চাউ খাব।



বাক্য সংবর্তন

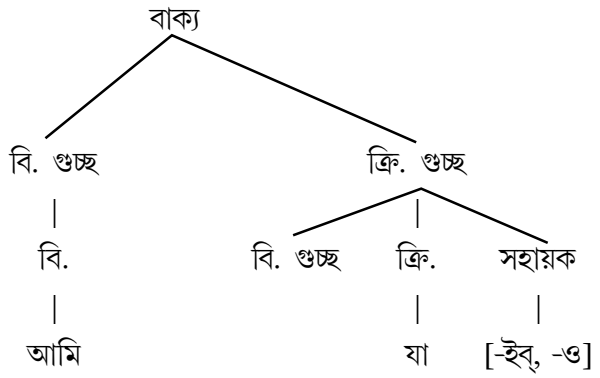
পরিণাম অনুসারে সংবর্তন চার ধরনের। কোনো উপাদান বাড়তি যোগ হলে বলা হয় সংযোজন (Addition)। কিছু বাদ গেলে বলা হয় বিলোপন (Delection)। একটি উপাদানের বদলে অন্য উপাদান ব্যবহৃত হলে হয় রূপান্তরণ বা বি-স্থাপন (Substitution)। দুটি উপাদানের পারস্পরিক অবস্থান বদলালে হল বিপর্যাস (Extraposition)। যখন আমরা কথা বলি তখন এ ধরনের অজস্র সংবর্তন ঘটতে থাকে। একটি বাক্য অধোগঠন থেকে অধিগঠনে রূপান্তরিত হবার সময় এক বা একাধিক সংবর্তন হতে পারে। যত ধরনের সংবর্তন হোক না কেন সব ধরনের সংবর্তনকে এই চার শ্রেণির অন্তর্গত করা হয়।

সংবর্তনে নানা ধরনের নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—প্রশ্ন সংবর্তন, নঞ্ সংবর্তন, বিগর্ভন, বিশেষ্যীভবন, সংযোজন, স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন ইত্যাদি। এগুলি সবই পরিণাম অনুসারে যে-কোনো একটি বা একের বেশি সংবর্তনের এলাকায় থাকবে। প্রথমে পরিণাম অনুসারে চার ধরনের সংবর্তন আলোচনা করব। পরে বিশেষ ধরনের কিছু সংবর্তন দেখানো হবে।

ক. সংযোজন (Addition) :

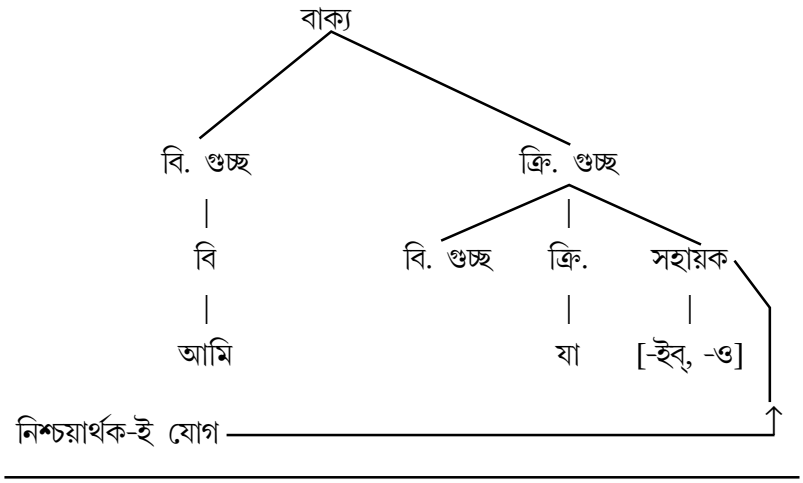
বাক্যে বাড়তি উপাদান যুক্ত করাকে সংযোজন বলে। কোনো কিছু বক্তব্য জোর দিতে গেলে নিশ্চয়ার্থক-ই ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি যাব' বনাম 'আমি যাবই' বা 'আমিই যাব'। 'আমি যাব'। 'আমি যাব' সাধারণ বিবৃতি। নিশ্চয়ার্থক 'ই' যোগ করে বক্তব্যের বিশেষ রূপ তৈরি করা হয়েছে। অধোগঠন থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে অধিগঠন তৈরি হচ্ছে তা বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

১. আমি যাব > আমিই যাব।



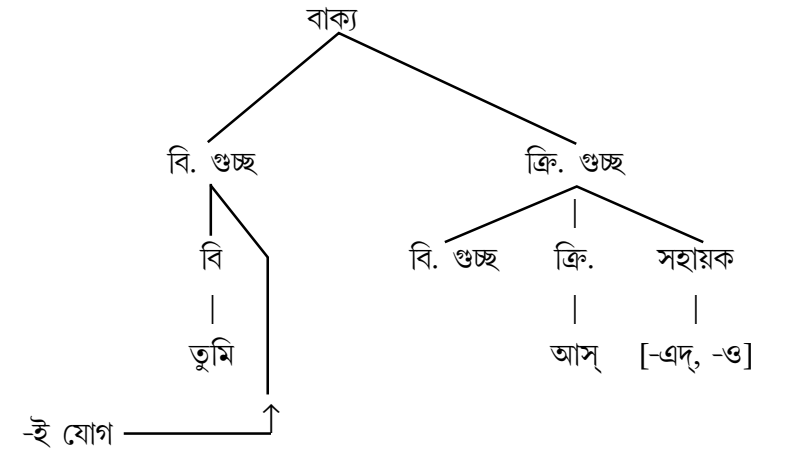
অধিগঠন → আমিই যাব।

২. আমি যাব > আমি যাবই



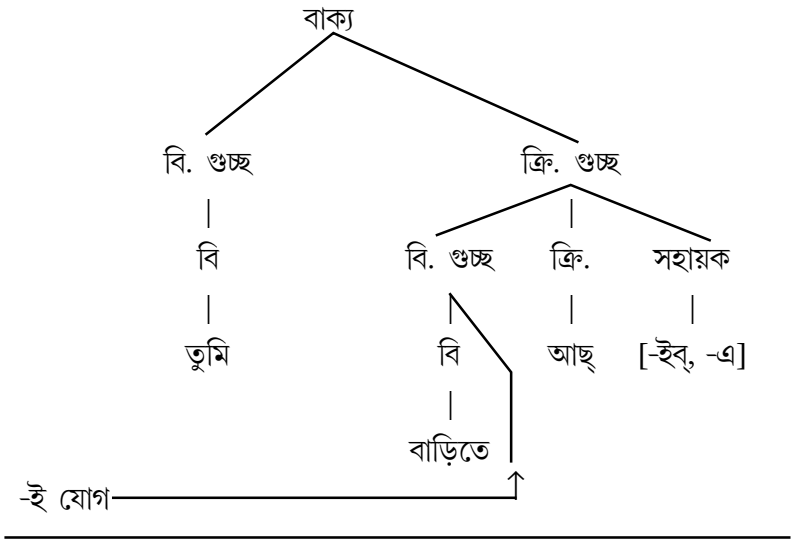
অধিগঠন → আমিই যাবই।

৩. তুমি এসেছো > তুমিই এসেছো



অধিগঠন → তুমিই এসেছো!

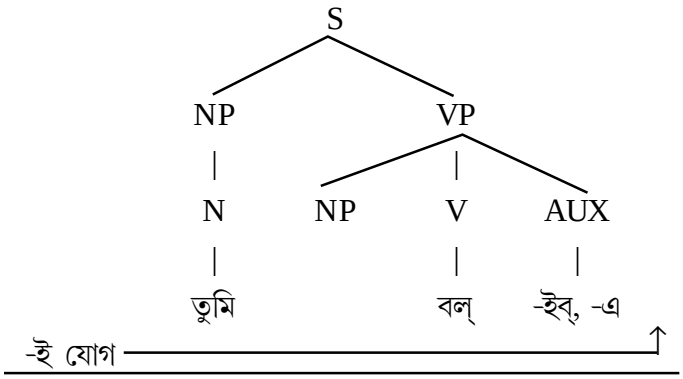
৪. তুমি বাড়ি থাকবে > তুমি বাড়িতেই থাকবে



অধিগঠন → তুমি বাড়িতেই থাকবে!

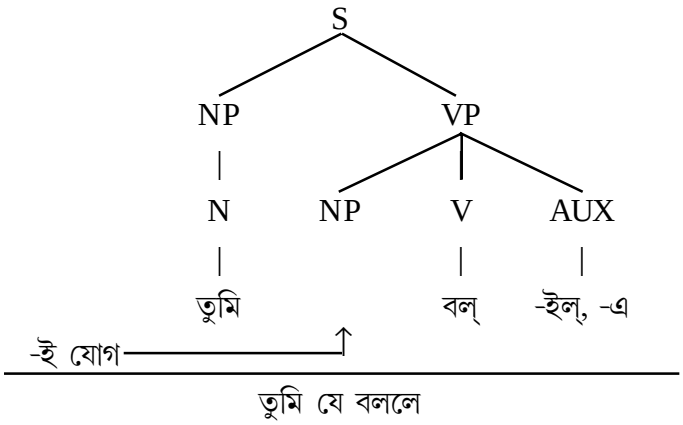
এই ধরনের সংযোজনকে '-ই সংযোজন' বলে। আবার 'যে সংযোজন' -ও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় যেমন, (দ্রুত লেখার জন্য ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।)

৫. তুমি বললে > তুমি বললে যে



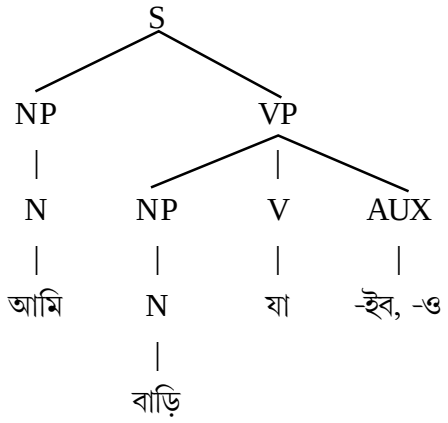
তুমি বললে যে

৬. তুমি বললে > তুমি যে বললে

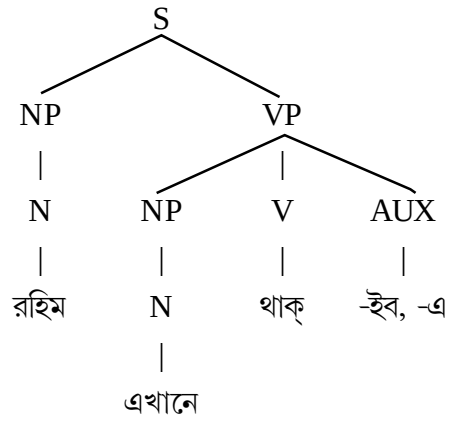


একের বেশি বাক্যকে জুড়ে একটি বড় বাক্য তৈরি করাও বাক্য সংযোজন। সংযোগধর্মী উপাদান বা আশ্রয়ধর্মী উপাদান এখানে যুক্ত করা হয়। এই ধরনের বাক্যের গঠনে একটি বাক্যের মধ্যে একের বেশি বাক্য যুক্ত হয়। যেমন—

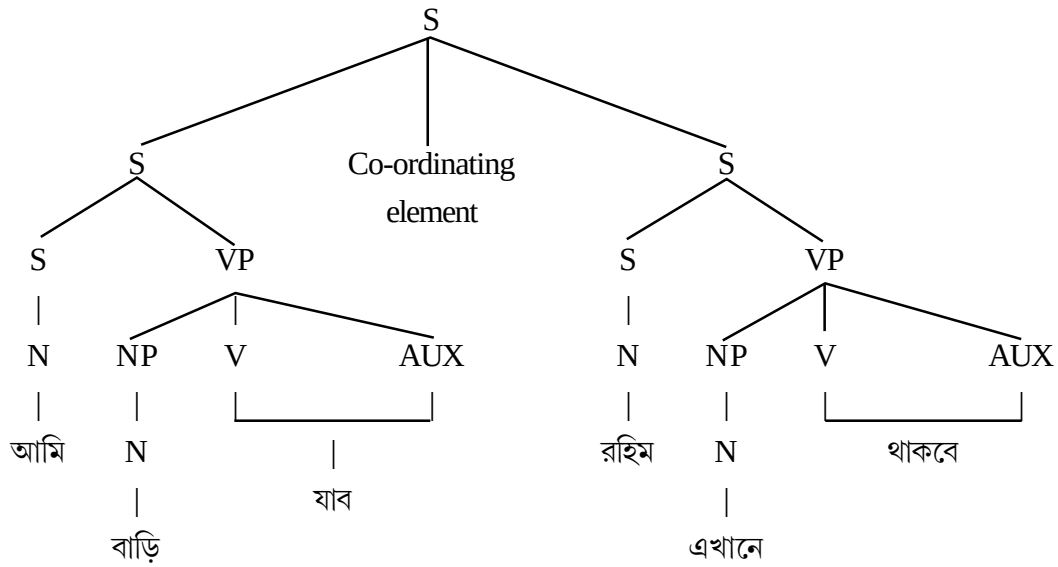
বাক্য ১ - আমি বাড়ি যাব।



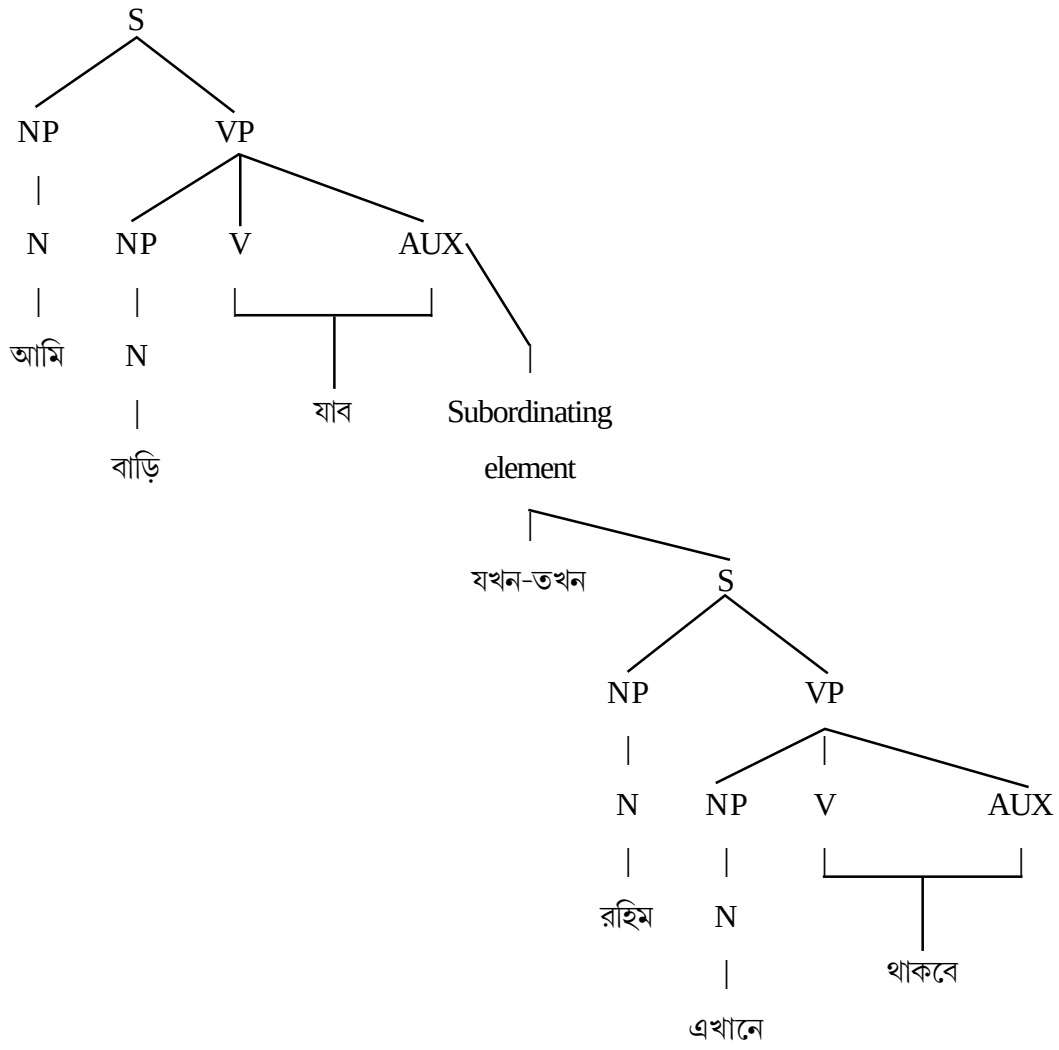
বাক্য ২ - রহিম এখানে থাকবে।



এই দুটি বাক্যের ক্ষেত্রে যেমন সংযোগমূলক উপাদান যোগ করে সংযোগধর্মী বাক্যে পরিণত করা যায় তেমনি আশ্রয়মূলক উপাদান যোগ করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য হিসেবেও সংবর্তিত করা সম্ভব। এখানে এক এক করে এই দুধরনের সংযোজন দেখানো হল—

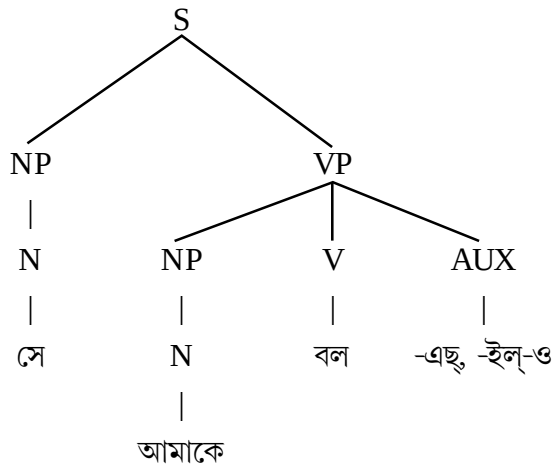


এখানে সংযোগধর্মী উপাদান ‘আর’ যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও দুটি বাক্য পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। এই একই বাক্য দুটি আশ্রয়মূলক বাক্য হিসেবে কীভাবে সংযোজিত হতে পারে তা দেখানো হল।

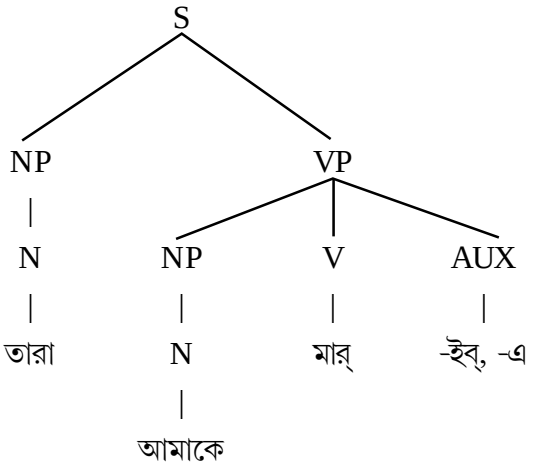


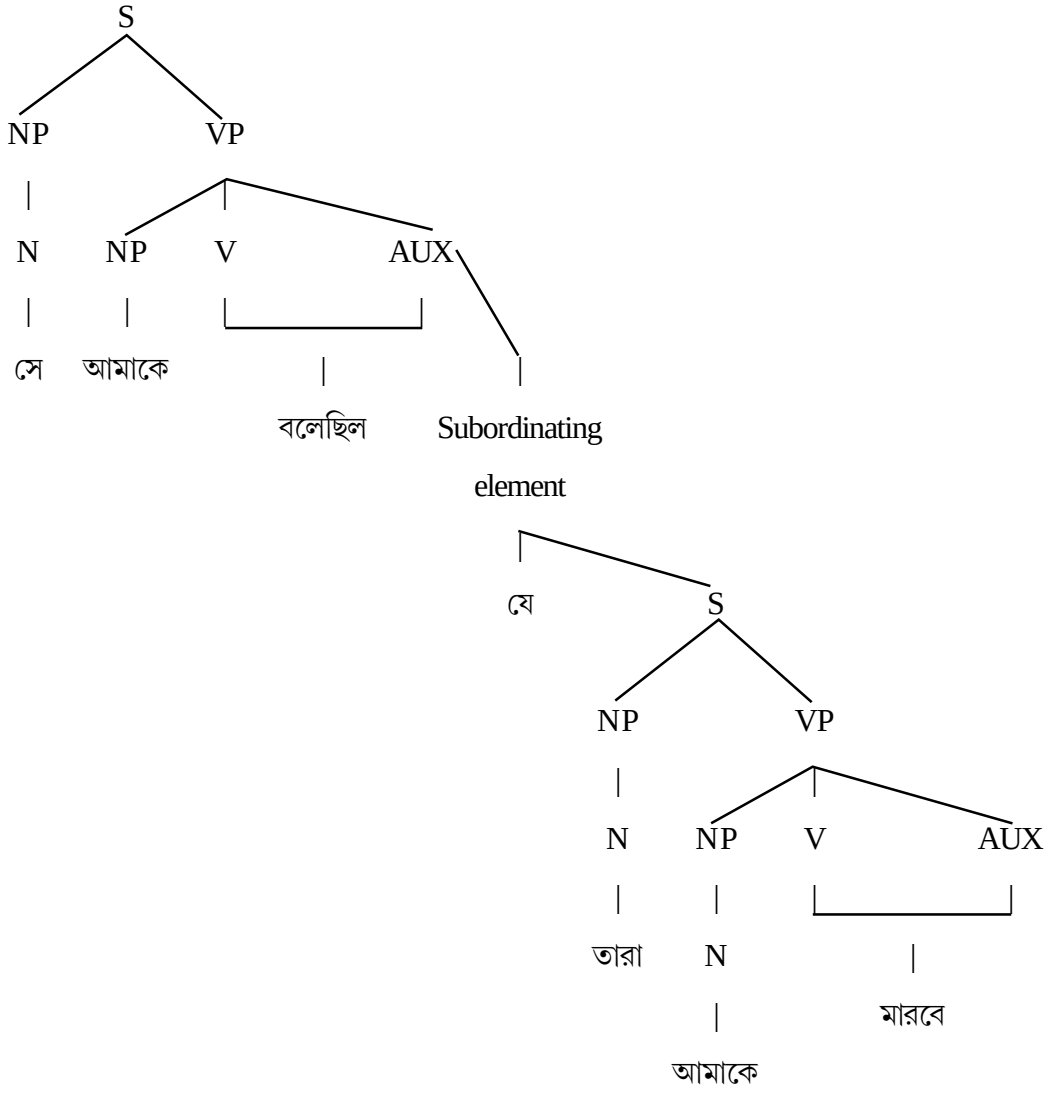
সংযোজিত আশ্রয়মূলক বাক্য—যখন আমি বাড়ি যাব তখন রহিম এখানে থাকবে ‘যদি-তবে’ দিয়েও এই বাক্য গঠিত হতে পারে। তখন ‘যাব’ ক্রিয়াপদটি ‘যাই’ রূপে ব্যবহৃত হবে। ‘যদি আমি বাড়ি যাই তবে রহিম এখানে থাকবে।’ এই ধরনের সংযোজনের উদাহরণ আরও একটি দেওয়া হল।

বাক্য-১ সে আমাকে বলেছিল।



বাক্য-২ তারা আমাকে মারবে।



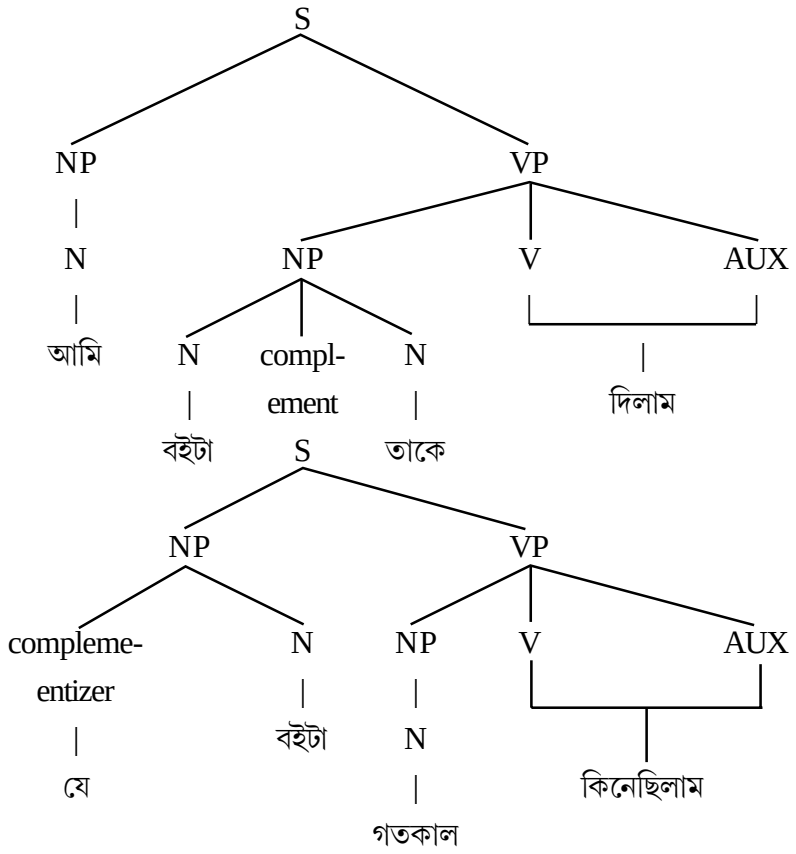


সে আমাকে বলেছিল যে, তারা আমাকে মারবে।

একটি বাক্যের অভ্যন্তরে বা ভিতরে আর একটি বাক্য যুক্ত করাও এক ধরনের বাক্য সংযোজন। একটি বাক্যের অভ্যন্তরে অন্য একটি সাধারণ বাক্য বা বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে নিয়ে আসাকে বাক্য বিগর্ভণ (Sentence Embedding) বলে। যেমন,

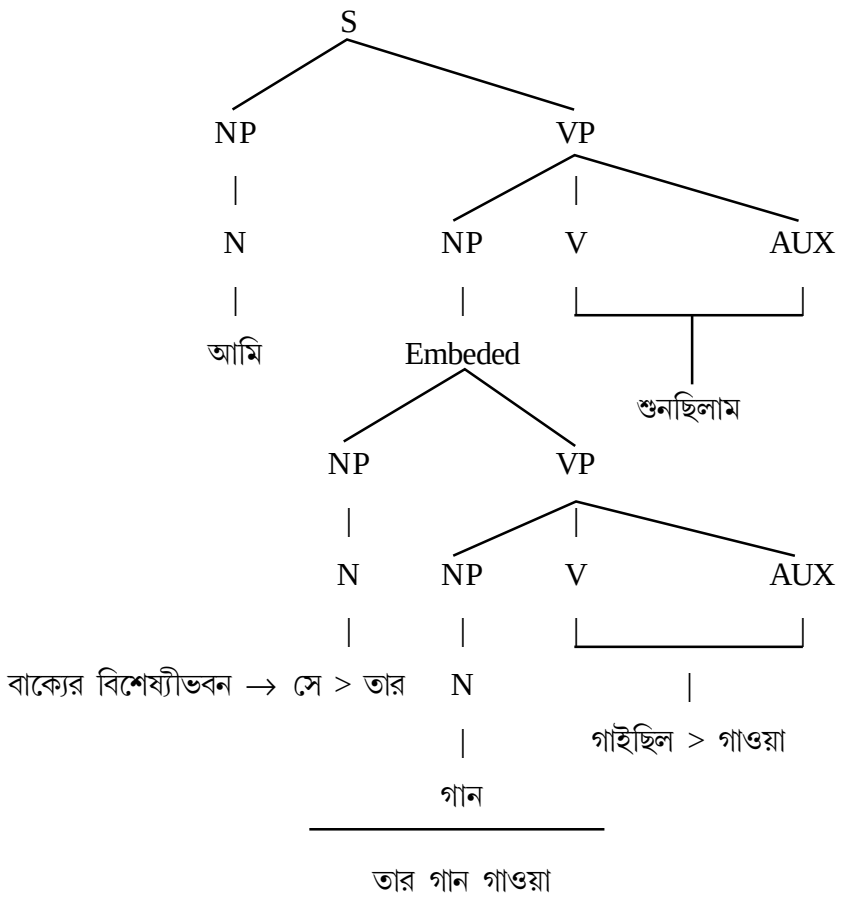
১. আমি বইটা তাকে দিলাম।

২. বইটা গতকাল কিনেছিলাম।


S
NP
VP
N
NP
V
AUX
আমি
N
compl-
N
ement
বইটা
S
তাকে
দিলাম
NP
VP
compleme-
entizer
যে
N
বইটা
NP
N
গতকাল
V
AUX
কিনেছিলাম

১. সে গান গাইছিল।

২. আমি গান শুনছিলাম।



বাক্য বিগর্ভণের কালে প্রাপ্ত বাক্য - আমি তার গান গাওয়া শুনছিলাম

একটি বাক্যকে বিশেষ্যপদে পরিণত করাকে বিশেষ্যীভবন (Nominalization) বলে। ক্রিয়াপদটি এইসব বাক্যে ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয়। ফলে, পুরো বাক্যটিই বিশেষ্য পদে পরিণত হয়। এই ধরনের বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে অন্য একটি বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একটি বাক্যের ভিতরে বিশেষ্যীভূত বাক্য যোগ করাকেও বাক্যবিগর্ভণ বলে।

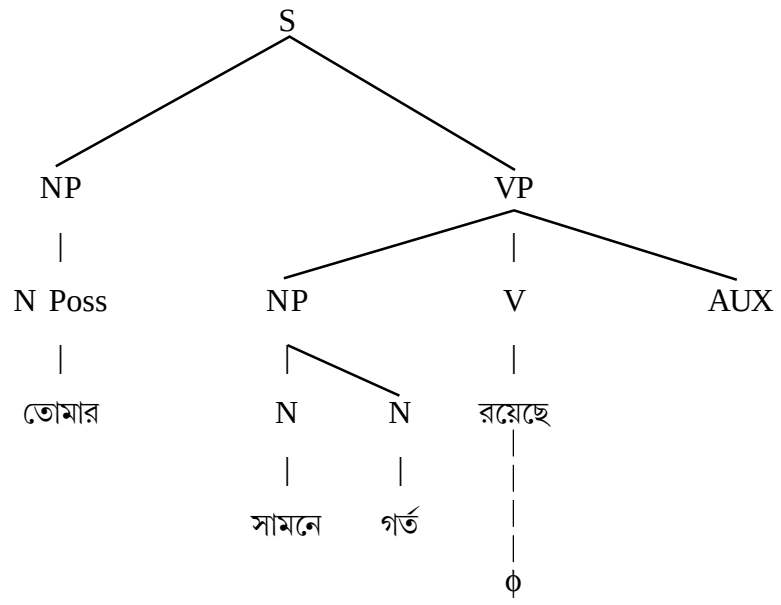
খ. বিলোপন

যখন বাক্যের কোনও একটি উপাদান লোপ পায় তখন বিলোপন জাতীয় সংবর্তন ঘটে। নানা ধরনের বিলোপন হতে পারে। এখানে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন।

কোনও কিছু আছে বা অবস্থান করছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় স্থিতিক্রিয়া (Existencial Verb)। অধিকাংশ সময়েই আমাদের কথাবার্তায় এই ক্রিয়াপদকে বাদ দিই। 'ওখানে একটা গাছ আছে' না বলে বলি 'ওখানে একটা গাছ'। 'সামনে গর্ত রয়েছে' না বলে বলি 'সামনে গর্ত ইত্যাদি। এখানে দুটি উদাহরণ দিয়ে কীভাবে স্থিতিক্রিয়া বিলোপিত হচ্ছে তা দেখানো হল।

বাক্য- তোমার সামনে গর্ত।

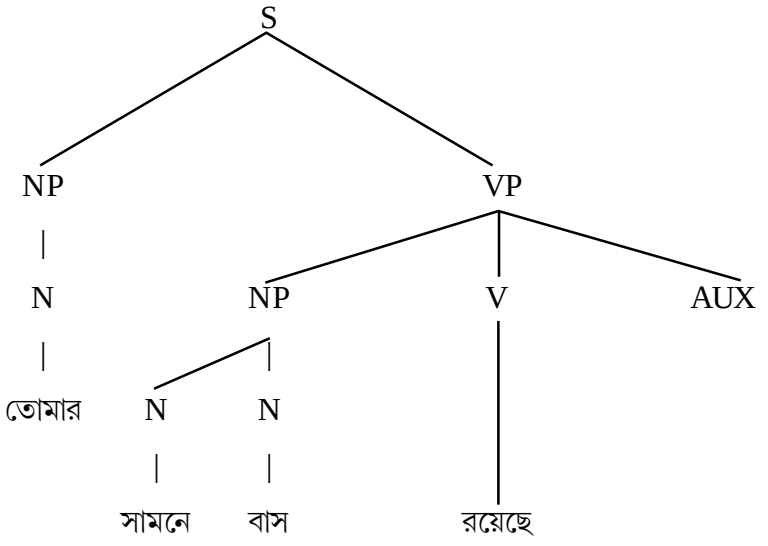


স্থিতিক্রিয়া বিলোপন

অধিগঠন : তোমার সামনে গর্ত

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন এবং কর্তা বিলোপন।

বাক্য- সামনে বাস।



স্থিতিক্রিয়া বিলোপন- ϕ

কর্তা বিলোপন- ϕ

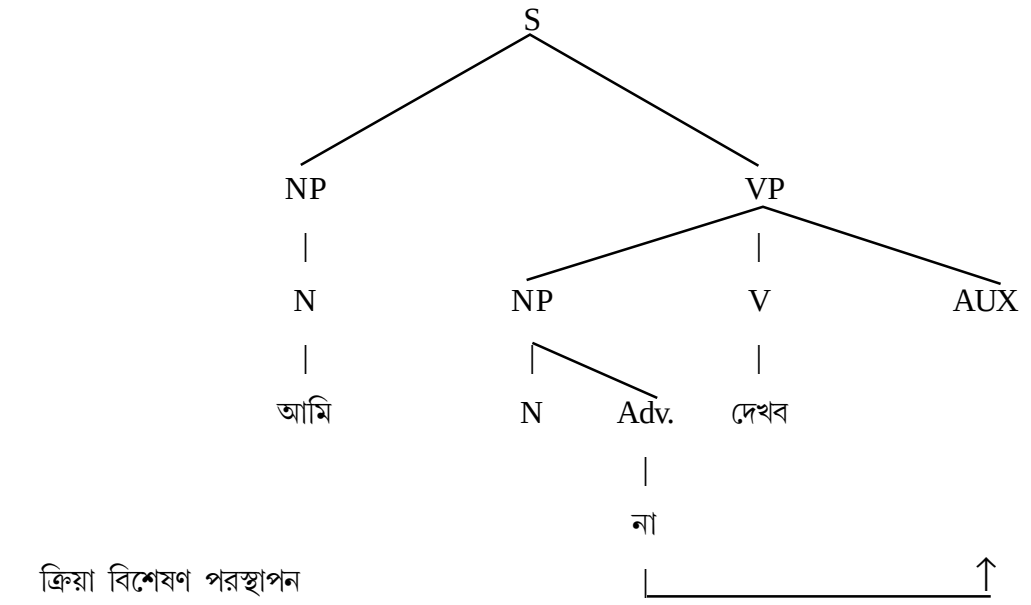
অধিগঠন : তোমার সামনে বাস

এখানে স্থিতিক্রিয়া বিলোপন ছাড়াও আরও একটি বিলোপন দেখানো হয়েছে। সেটি হল—বাক্যের কর্তা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তখন বাক্য বিষয়কে গুরুত্ব দেবার জন্যই কর্তার বিলোপন ঘটানো হয়। এই বিলোপনকে 'কর্তা বিলোপন' (Subject Deletion) বলে।

গ. অধোগঠনে বাক্যের বা আদর্শ বাক্যের দুটি উপাদান পদের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তন করলে অর্থাৎ একটি উপাদানের জায়গায় অন্য উপাদান ও অন্য উপাদানের জায়গায় বদলি উপাদানটি বসলে বিপর্যাস সংবর্তন ঘটে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' এই ধরনের বিপর্যাস সংবর্তন। এখানে উদাহরণ দিয়ে বিপর্যাস সংবর্তন দেখানো হল।

ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন

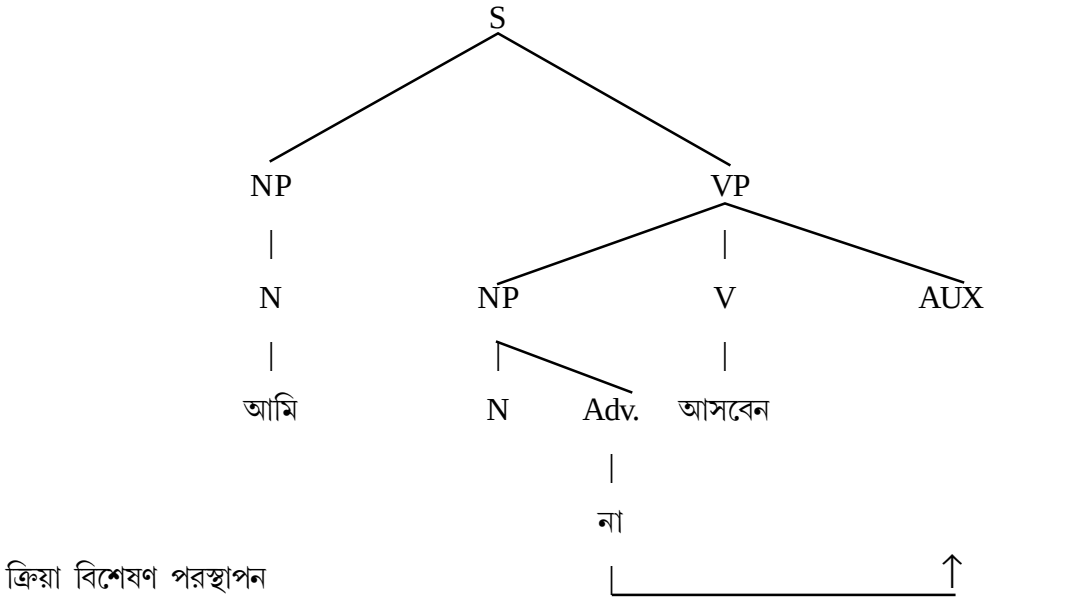
আমি দেখব না।



না দেখব > দেখব না

অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে 'না' থাকলে সেক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' সংবর্তন হয় না। যেমন, 'সে না দেখে বলেছে', 'আমি না জেনে বলব না' অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই কেবল ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন ঘটে।

তিনি আসবেন না।

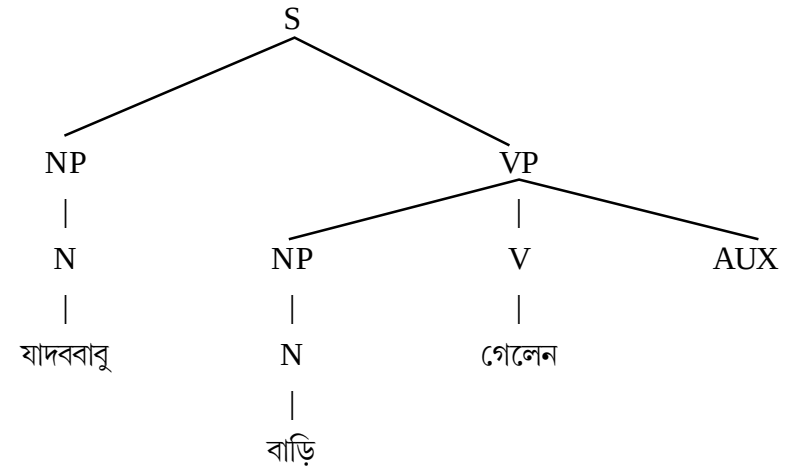


তিনি না আসবেন > তিনি আসবেন না

ঘ. রূপান্তরণ

একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করাই হল—রূপান্তরণ (Substitution)। 'কলম' না বলে যদি 'পেন' বলি তাহলে তা হল রূপান্তরণ। অনেক সময় পরিভাষা ব্যবহার করলে যদি কেউ বুঝতে না পারে তখন সেটা ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে বা অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও রূপান্তরণ জাতীয় সংবর্তন হয়। বাংলা ভাষায় নানা ধরনের রূপান্তরণ সংবর্তন হয়। যেমন—ক্রিয়াপদ যদি ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয় তবে তা এক ধরনের রূপান্তরণ। যেমন, সে খেল > তার খাওয়া। এখানে 'খেল' ক্রিয়াপদ এবং 'খাওয়া' ক্রিয়াবিশেষ্য পদ। নামপদকে সর্বনামপদে রূপান্তরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবর্তন। এখানে সেই ধরনের সংবর্তন দেখানো হল।

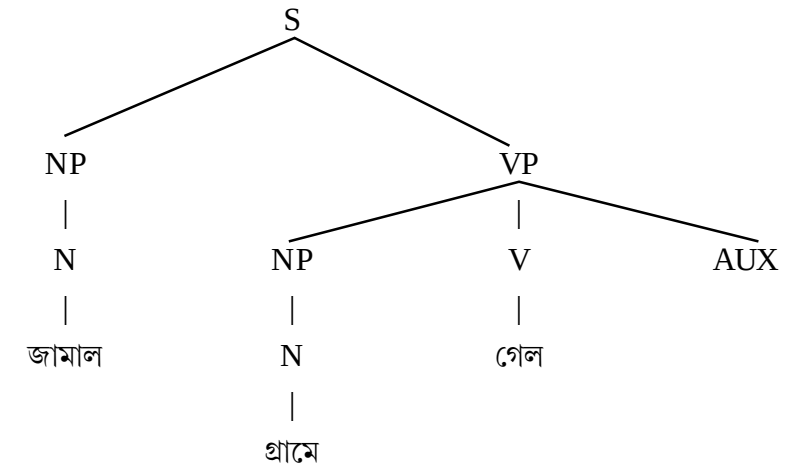
তিনি বাড়ি গেলেন।



সর্বনামীভবন → তিনি

তিনি	বাড়ি	গেলেন

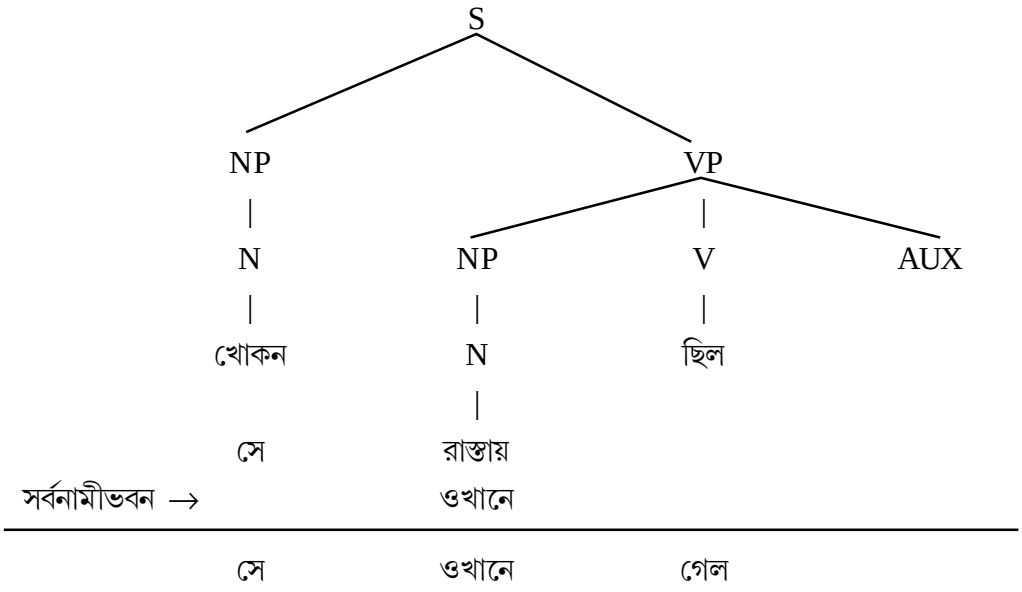
জামাল সেখানে গেল।



সর্বনামীভবন → সেখানে

জামাল	সেখানে	গেল

সে ওখানে ছিল।



সর্বনামীভবনের ক্ষেত্রে মূল বিশেষ্যপদটি বক্তা-শ্রোতা উভয়ের কাছেই পূর্বপরিচিত থাকে।

৭.৪.১২.২ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অব্যবহিত উপাদান কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে অব্যবহিত উপাদান গঠন-এর বিস্তারিত আলোচনা করো।

২। কীভাবে নোয়াম চমস্কি সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন তা আলোচনা করো।

৩। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি লেখো।

৪। পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখো।

৫। উপাদানশ্রেণি বলতে চমস্কি কী বুঝিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬। ব্যাকরণসম্মত সংবর্তন নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৭। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) ভাষার একক (খ) সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ (গ) বৈদ্ধিক ব্যাকরণ (ঘ) পারঙ্গমতাবোধ (ঙ) ব্যাকরণসম্মত বাক্য - গ্রহণযোগ্য বাক্য (চ) অধোগঠন - অধিগঠন (ছ) উপাদান শ্রেণি (জ) পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (ঝ) একক সংবর্তন (ঞ) সাধারণীকৃত সংবর্তন (ট) বৃক্ষচিত্র।

৮। বাংলা ভাষার পদগুচ্ছ সংগঠন নিয়ে আলোচনা করো।

৯। বাংলা মৌলিক ও অমৌলিক বাক্যের গঠন সম্পর্কে লেখো।

১০। সংবর্তন কাকে বলে? যে-কোনো দুটি সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১১। সংযোজন কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১২। বিলোপন জাতীয় সংবর্তন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

১৩। রূপান্তরণ সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১৪। বিপর্যাস ধরনের সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করো।

১৫। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) মৌলিক বাক্য (খ) আশ্রয়মূলক বাক্য (গ) সংযোগমূলক বাক্য (ঘ) বাক্য বিগর্ভণ (ঙ) বিলোপন (চ) রূপান্তরণ (ছ) বিপর্যাস (জ) স্থিতিক্রিয়া বিলোপন (ঝ) ক্রিয়াবিশেষণ পরস্থাপন (ঞ) সর্বনামীভবন।

৭.৪.১২.৩: সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

সমাজভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৭.৪.১৩.১ : প্রস্তাবনা

৭.৪.১৩.২ : সমাজভাষাবিজ্ঞান : এলাকা বা শ্রেণি

৭.৪.১৩.৩ : বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৭.৪.১৩.৪ : সচল বা পরিবর্তনমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

৭.৪.১৩.৫ : প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৭.৪.১৩.৬ : উপসংহার

৭.৪.১৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.১৩.১ : প্রস্তাবনা

সমাজের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের সূত্রে ভাষার সঙ্গেও রয়েছে সমাজের সম্পর্ক গভীর। কেননা ভাষাই মানুষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মুখ্য অবলম্বন। সেই কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত ভাষাগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। প্রাচীনকালে তাত্ত্বিক আলোচনা না হলেও আধুনিককালে ভাষাকে নিয়ে গবেষকরা তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। অবিভক্ত বাংলায় ভাষা নিয়ে কাজ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' নিয়ে গবেষণা করেন। সুকুমার সেন ১৯২৬-এ মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে রচনা করেন 'নদীর ভাষা'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and developement of Bengali Language' (1926) গ্রন্থে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানী সসিউরও ভাষার সামাজিক দিক নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ 'Sociolinguistics' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন Haver C. Currier ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে আবার সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটি পছন্দ করেননি, বরং তারা 'Sociology of Language' কথাটি সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিবর্তে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটিই বহুল প্রচলিত। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে, ১৯৫২ সালের আগে মার্কিন দেশে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' নামটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয়নি। কিন্তু চারের দশকে নানা আঞ্চলিক উপভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। সাপির, ম্যাকডেভিড, ফার্থ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্মেলন হয় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাষার তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা না হলেও এখান থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। আসলে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্কই হল 'সমাজ ভাষাবিজ্ঞান'। সমাজে ব্যবহৃত প্রায় সব ভাষা, তার বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, সমাজের ভাষাগুলির প্রয়োগ ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে সামাজিক মানুষের মনোভাব— সমস্ত কিছু সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। ভাষার সঙ্গে সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখেই ভাষাবিজ্ঞানীরা 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' শব্দটির প্রয়োগ ঘটান।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা :

এবারে দেখা যাক, সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর দেওয়া আলোচনাসমূহ।

Haver C. Curriec 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' বলতে বুঝিয়েছেন সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার গবেষণা। সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক স্বীকার করে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট সমাজ ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'Social group'-এর কথা বলেছেন। তাঁর মতে 'Social group' থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। হুইটনিও বলেছেন ভাষা হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Language

is a social institution) 'sociolinguistics' পরিভাষাটি ঠিকঠাক ব্যবহার করেছিলেন ব্রাইট। তাঁর মতে —

'.....linguistics DIVERSITY is precisely
the subject..matter of sociolinguistics''

W. Labour বলেছেন 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' পরিভাষাটি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। Hardson 'Sociolinguistics' (১৯৮৫) গ্রন্থে বলেছেন সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যয়ন হল 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'। তিনি ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজ ভাষাবিজ্ঞান-এ দুটিকে আলাদা করতে চাননি। R.T. Bell সমাজ ভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝেছেন সেই ভাষাবিজ্ঞানকে যেখানে সামাজিক উপায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে শক্তিশালী করেছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবভ সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটি পছন্দ করেননি। তাঁর মতে ভাষা মাত্রেই সামাজিক। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব বা linguistics মানেই তো 'Sociolinguistics' সুতরাং আলাদা করে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' পরিভাষাটি ব্যবহার করা অযৌক্তিক। কিন্তু ফিশম্যান একটিকে আর একটির পরিপূরক মনে করেছেন। তাঁর মতে —

"The sociology of language focusses
upon the entire gamut of topics related
to social organization of language behaviour,
including not only language usuage
per se but also language attitude,
over behaviour language users''.

আসলে ফিশম্যান মনে করেন ভাষা সমাজের সঙ্গে যুক্ত, সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেই ভাষা সম্পর্কিত। ফিশম্যান ভাষায় সমাজতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রাইট অবশ্য 'linguistic diversity' অর্থাৎ 'ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্নতাকে বুঝিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, সমাজের আদিবাসী মানুষদের ভাষা নিয়েই প্রথম সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়েছিল। কুরিই সর্বপ্রথম 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর বোয়েস, ম্যাকডেভিড, লেবভ, ফিশম্যান প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। ব্রাইটই প্রথম সমাজভাষাকে তাত্ত্বিকতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সমাজভাষাবিজ্ঞানের সম্মেলনে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও পরিধি নির্দেশ করা হয়। উল্লেখ্য, সেখানে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে আলাদা একটি ভাষাবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭.৪.১৩.২ : সমাজভাষাবিজ্ঞান : এলাকা বা শ্রেণি

সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উইলিয়াম ব্রাইট ভাষাবৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সাতটি মাত্রার কথা বলেছেন। আর ফিশম্যান তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার ফিশম্যান ও ব্রাইট-এর দেওয়া ধারণাকে মিলিয়ে একটা নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। অধ্যাপক মৃণাল নাথ সমাজভাষাবিজ্ঞানকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা —

ক. অন্যোন্য ক্রিয়াবাচক (Interactional)

খ. পরস্পর সম্বন্ধী (Co-relational)

গ. ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা সংযোগ (Language change and contract)

ঘ. ভাষা সমস্যা (Language problem)

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী আবার সমাজভাষাবিজ্ঞানকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন। যেমন —

১. পারস্পরিক কথোপকথনমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

২. পরিমাণবাচক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

৩. সমাজপ্রতিষ্ঠানমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

৪. ভাষা পরিকল্পনা।

৫. ভাষা লঘু-সম্প্রদায় ও সমাজভাষাবিজ্ঞান।

তবে ফিশম্যান সমাজ ভাষাবিজ্ঞানকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, সেটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি ভাগ হল —

১. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Sociolinguistics)

২. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান (Dynamic Sociolinguiestics)

৩. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Applied Sociolinguiestics)

৭.৪.১৩.৩ : বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

ভাষার বর্ণনামূলক আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি বর্ণনাত্মক দিক। ব্রাইটের মতে ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল ভাষাবৈচিত্র্যের বর্ণনা। ব্রাইটের মতো ফিশম্যানও বর্ণনামূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সাতটি দিক নির্দেশ করেছেন। যথা —

১. বক্তা

২. শ্রোতা

৩. উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

৪. ভাষার রূপ

৫. Extent of Diversity

৬. ফিশম্যান এর কোনো নাম দেননি

৭. অবস্থা বা situation

বক্তা :

ভাষার বৈচিত্র্য কেমন হবে, তা নির্ভর করে বক্তার উপর। বক্তা কোথায়, কখন, কিভাবে কথা বলবে তার ওপর নির্ভর করে। তবে এক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় বক্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যথা— সে সমাজের কোন্ স্তরের মানুষ? সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? সে নারী না পুরুষ? তার পেশা কী? সমাজের মানুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন? তার বয়স কত? এসব নির্ভর করে বক্তার বলার ওপর। তবে সবার আগে বিচার করা দরকার বক্তার সামাজিক পরিচয়টি।

সমাজের স্তরগুলিকে উল্লম্বভাবে ভাগ করলে অনেকগুলি স্তর পাওয়া যায়। যেমন উঁচু তলায় ধনী শিক্ষিত লোকেরা থাকে। আর নীচু তলায় থাকে সমাজের নিরক্ষর গৃহহীন দরিদ্র মানুষেরা। মাঝখানে আর কতগুলি তলা থাকবে তা নির্ভর করে দেশের পরিস্থিতির উপর। আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সামাজিক মানুষের শ্রেণিভেদ করা হয় এবং সেই শ্রেণি অনুসারে ভাষার বিভিন্নতাও দেখা যায়। তবে শ্রেণিচরিত্র যে সবসময় ভাষা চরিত্র সঠিকভাবে নির্ণয় করবে এমন কথা বলা যায় না। যাই হোক শ্রেণি ও অবস্থানগত দিক বা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেই বক্তা ভাষা ব্যবহার করে। যেমন— গ্রাম ও শহরের মানুষের কথাবার্তা-চাল-চলন আলাদা। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলে বাড়িতে একরকম কথা বলে, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে অন্যরকম ভাবে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে রকের আড্ডায় যে ভাষায় কথা বলে, তা সম্পূর্ণ আলাদা রকম। সুতরাং বোঝা যায় এক একটি সামাজিক স্তরে বক্তা এক-এক রকম ভাষা ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় উপলক্ষ্য অনুযায়ী বক্তা আবার ভাষা বদলাতে পারে। যে কারণেই বলা হয় বক্তার শ্রেণি পরিচয় ভাষার স্বরূপ নির্ধারণ সম্পূর্ণ করতে পারে না। শ্রেণিচরিত্র সমাজ-ভাষার অনেকগুলি নির্ণায়কের মধ্যে একটি।

শ্রোতা :

বক্তা যেমন সমাজ-ভাষার বৈচিত্র্য নির্ণয় করে, তেমনি শ্রোতার উপরও সমাজ-ভাষার বৈচিত্র্য নির্ভর করে। তবে শ্রোতাকে আগে বিচার করে নিতে হবে। সামাজিক মানুষের বক্তব্যের রীতি নির্ণয় হয় শ্রোতা অনুযায়ী। যেমন বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে ও যে ভাষায় কথা বলি, গুরুজনদের সঙ্গে নিশ্চয় সেইভাবে হয় না। আবার শিশুদের সঙ্গে কথা বলার সময় আলাদা এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ভাষার নির্দিষ্ট চরিত্রকে বোঝার জন্য বক্তা যেমন দেখতে হবে, তেমনি যাকে বলা হচ্ছে, তাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

উদ্দেশ্য :

শুধু বক্তা বা শ্রোতা নয়, ভাষার বৈচিত্র্য উদ্দেশ্য বা পরিপ্রেক্ষিতের উপরও নির্ভর করে। বক্তা শ্রোতাকে কি বলবে, তা উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষিত অনুযায়ীই আলাদা হবে। যেমন — সভা সমিতির বক্তৃতায় যেমন ভাষা ব্যবহার করা হয়, ঝগড়াতে কিন্তু তেমন ভাষা ব্যবহার করা হয় না। আবার শিক্ষক পড়ানোর সময় যেমন ভাষায় কথা বলে, বাড়িতে সেই ভাষায় বলে না। আবার সংবাদপত্রের ভাষা আর আইনের ব্যাখ্যার ভাষাও এক হয় না। সুতরাং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয়। প্রায় সবসময়ই এই রকম হয়ে থাকে।

ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য বিষয়টিকে ডিট্‌মার ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন— উপভাষা অঞ্চলের জার্মান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই জার্মান ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাড়িতে নিজেদের উপভাষাতেই কথা বলে। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা এই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষা রীতি বদলকে বলেছেন রেজিস্টার। ফিশম্যান মনে করেন ব্যক্তিভেদে ভাষার বদল ঘটে। যেমন—ব্রাসেল্‌সের ডাচ ভাষাভাষী ফ্লেমিশ গোত্রের লোকেরা কিন্তু ডাচ ভাষা ব্যবহার করে না। তারা ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে। তাও আবার তিনরকম ফরাসি। যথা — বাজারি ফরাসি, মার্জিত ও সংস্কৃত ফরাসি এবং অফিসের ফরাসি ভাষা। ডাচ ভাষা আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারও করা হয়।

আমাদের বাঙালি সমাজে দুটি ভাষা প্রচলিত আছে। যেমন সাধু ও চলিত এই দুটি ভাষা পাশাপাশি সমানভাবে অনেকদিন ধরে চলেছে কিন্তু সাধু ভাষার সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে নানা উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপী ইত্যাদি। সুতরাং বক্তা কি উপলক্ষ্যে উপভাষা ব্যবহার করবে, সেটাও দেখা দরকার। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা 'রেজিস্টার' বলেছেন এই বিষয়টিকে। বিষয়টি এইরকম — বাঙালিরা যখন নিজেদের সঙ্গে কথা বলে, তখন বাংলায় বলে। কিন্তু অফিসে গিয়ে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলে, আবার ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায়। আবার ধর্মস্থানে হিন্দুরা সংস্কৃত, মুসলিমরা আরবি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। সুতরাং বক্তার উপলক্ষ্য সমাজভাষাবিজ্ঞানের আদর্শ বক্তব্য।

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে উপলক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়ম লেভবও দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির কারণে ভাষা নানারকম হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেছেন উপভাষা যেমন ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করে, তেমনি পুরুষ ও নারী ভেদে ভাষা কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। যেমন— বাংলা ভাষা ও উপভাষায় মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তা পুরুষদের থেকে কিছুটা আলাদা। বাংলা ভাষায় এই মেয়েলি কথ্যরীতিকে সুকুমার সেন বলেছেন 'women's dialect' বা 'মেয়েলি উপভাষা'।

ভাষার রূপ :

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষা বিভিন্ন হয়। সমাজের স্তরগুলিকে বহুতল বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়। সবচেয়ে উঁচু স্তরে থাকে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী লোক। আর নীচের তলায় থাকে নিরক্ষর। দরিদ্র

মানুষের দল। এই দুই স্তরের ভাষার রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে। আসলে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণির কারণে ভাষার রূপের বদল ঘটে। মান্য ভাষা বা উচ্চ ভাষা সবসময়ই উপরের স্তরে থাকে। শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বলে। সমাজের নীচের স্তরের অশিক্ষিত মানুষরা কিন্তু তা পারে না। আবার সব উচ্চশিক্ষিত লোকেদের ভাষা একরকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী উচ্চশিক্ষিত মানুষের ভাষার মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে খুঁজে বের করা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

Extent of Diversity :

সমাজ-নির্দিষ্ট ভাষাবৈচিত্র্যের পরিমাণ ও প্রকারের নাম ব্রাইট দিয়েছেন Extent of Diversity। যেমন— কলকাতায় যারা বাস করে তাদের ভাষা এক রকম। আবার কাজের সূত্রে যারা কিছুদিনের জন্য শহরে থাকে, তাদের ভাষা আলাদা। সুতরাং এক জায়গায় বসবাস করলেও ভাষার বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে। আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ ভাষার এই বিভিন্নতা খুঁজে বার করা।

ফিশম্যান এর কোনো নাম দেননি :

ফিশম্যান বলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দুটি ভাষাসংযোগের ফলে একটি মিশ্র ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম 'পিজিন'। কথাটির উদ্ভব ইংরেজি 'Business' থেকে। যার বাংলা অর্থ ব্যবসা। চিনা ভাষায় 'পিজিন' কথাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। পিজিনকে যোগাযোগের ভাষা বলা হয়। 'পিজিন' থেকেই বিকৃত ইংরেজি একটি ভাষা এসেছে, সেটি হল 'পিপিন ইংলিশ'। 'পিজিন' ভাষাটি মূলত দ্বিতীয় ভাষা বা L_2 হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মনে রাখতে হবে, সারা পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতেই বেশি 'পিজিন' ভাষা গড়ে উঠেছে। তবে মাতৃভাষা হিসেবে কিন্তু 'পিজিন' ভাষা সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। এর এলাকাও সীমিত। আর ভাষাটির শব্দভাণ্ডারও সীমিত। এই ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অল্প কথাবার্তার কারণে 'পিজিন' ভাষাটির সৃষ্টি হয়েছে। তবে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মিলনে যে 'পিজিন' ভাষা গড়ে ওঠে, তা স্থানীয় ভাষার একটি নীচের স্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

একই ভাষা সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু কখনও নিজেদের মধ্যে 'পিজিন' ভাষায় কথা বলে। সাম্রাজবাদী শক্তির উৎস থেকেই অধিকাংশ 'পিজিন' ভাষা তৈরি হয়েছে, এইরকম অনুমান করা যেতেই পারে।

আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন ভাষার লোকেরা এক জায়গায় জড়ো হয়। ফলে তারা ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। মূলত দ্বিতীয় ভাষাও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্র ভাষাটি নিয়ে কাজ করাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মনে রাখতে হবে, চিনাদের মুখে সর্বপ্রথম এই মিশ্র ভাষা অর্থাৎ 'পিজিন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে নানা সময়ে একাধিক 'পিজিন' ভাষার জন্ম হয়েছে বাণিজ্যের প্রয়োজনে। নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে চিনাদের মুখে 'পিজিন' ভাষায় পরিণত হয়েছে ইংরেজি ভাষাটি। পশ্চিম আফ্রিকা, জার্মানির তুর্কি শ্রমিকরাও 'পিজিন' ভাষা তৈরি করেছে। 'ক্রেয়োল' ভাষাটি হল 'পিজিন' ভাষার পরবর্তী ধাপ। 'পিজিন' ভাষাটি কোনো ভাষা ভাষীর গোষ্ঠীর মাতৃভাষা রূপে স্বীকৃত হলে, তবে তাকে 'ক্রোয়েল' বলা হয়। 'পিজিন'কে পূর্ণ ভাষা হিসেবে

ধরা না হলেও 'ক্রেয়োল'কে ধরা হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মরিশাসের অধিবাসীরা 'ক্রোয়োল' ভাষায় কথা বলে।

অবস্থা বা Situation :

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'অবস্থা' বা 'Situation' ব্যাপারটি অধিকতর তাত্ত্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আসলে একটি ব্যক্তি কেবলমাত্র একটিই অবিমিশ্র ভাষা আয়ত্ত করে না — সে একাধিক ভাষা বলতে পারে। যেমন একজন মানুষ বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে, চাকরি সূত্রে অন্য জায়গায় গিয়ে আরেকরকম ভাষা বলে। ফলে দীর্ঘদিন এভাবে পরিবর্তিত ভাষাটি ব্যবহার করতে করতে সে প্রথম ভাষাটি— প্রায় ভুলে যায়। ফিশম্যানের মতে, Situation অনুযায়ী মানুষ আগের ভাষা ভুলে নতুন ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান Situation অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তনের বৈচিত্র্য আলোচনা করে।

এখনকার ভাষাবিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছেন যে একটি ব্যক্তি একটি ভাষা ব্যবহার করে না। সে একই ভাষা ব্যবহার করলেও সেই ভাষার একাধিক রীতি, উপভাষা, সমাজভাষা ব্যবহার করে। আসলে বাড়িতে সেই ব্যক্তিই যে ভাষায় কথা বলে, বাইরে গেলে সেই ভাষায় কথা বলে না। ফিশম্যান বলেছেন ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। তাই Situation অনুযায়ী ভাষার বদল হয়। শুধু ভাষা নয় এমনকী ভাষারীতিও বদলে যায় অনেকক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্রাসেলসের ডাচ ভাষী মানুষরা নিজেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ডাচ ভাষা ব্যবহার করলেও চাকরি সূত্রে বা অন্য অনেক কারণে ডাচ ভাষার পরিবর্তে ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে। আবার নানা উপভাষাও তারা ব্যবহার করে। সুতরাং এই উপভাষা ব্যবহারের বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল।

আমরা জানি, সমাজের সবথেকে ওপরে বিত্তশালী লোক থাকে। নীচে থাকে দরিদ্র মানুষের দল। অবস্থাগত এই বৈচিত্র্য উভয়শ্রেণির লোকদের ভাষাকে পৃথক করেছে। কারণ উচ্চশ্রেণির লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে বা অর্থনৈতিক দিক থেকেও এগিয়ে আছে। কিন্তু নীচু শ্রেণির লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষা বা অর্থের দিকে পিছিয়ে আছে। সুতরাং যে ভাষায় উঁচু শ্রেণির লোকেরা কথা বলে তা নীচের স্তরের লোকেরা ব্যবহার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ factor হয়ে দাঁড়িয়েছে Situation বা অবস্থাগত পার্থক্য। কারণ একজন শিক্ষিত লোক মান্যভাষায় কথা বললেও গুণ্ডা কিন্তু সেই ভাষায় কথা বলে না। এখানে তো Situation-ই কাজ করে। আর বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ Situation অনুযায়ী ভাষার এই পরিবর্তনকে আলোচনা করা।

৭.৪.১৩.৪ : সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে দ্বিতীয় ভাগটির কথা বলেছেন তা হল সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান। সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজ ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন, বিস্তার, সংকোচনের ধারাক্রমের দিক ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেভবও সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা করেছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দ্বীপের মানুষদের

নিয়ে এ ব্যাপারে গবেষণা করেন। এখানে দেখা যায় অল্প ও বেশি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আবার ভিন্ন ভাষাভাষী কিছু মানুষের কাছে এই দ্বীপের ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তনটা আরও বড় ভাবে ধরা পড়ছে। কেননা, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের ভাষা আয়ত্ত করতে চাইলেও বেশি বয়স্করা প্রাচীন রীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় তা আয়ত্ত না করেই থাকে। তারা সংস্কৃতির গর্ব ও ভাষার স্থানীয় উচ্চারণরীতিকেই ধরে রেখেছে। কিন্তু অল্প বয়সীরা মিশ্র ভাষায় কথা বললে সাধারণ মানুষের একটি দল বিরাট সমস্যায় পড়ল। তারা কোন্ ভাষা ব্যবহার করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। এই যে ভাষার পরিবর্তনশীলতা, তাকে লেবভ বলেছেন —'Dynamic Sociolinguistics'.

শুধু এটা নয়, একটা ভাষার জনগোষ্ঠী যখন অন্য ভাষার দেশে কাজ করতে যায়, তখন সে সেখানে বসবাস করার দরুন ভাষার বদল ঘটায়। ফলে সেক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতার উদ্ভব ঘটেছে। এই দ্বিভাষিকতাকে ফিশম্যান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা

২. অস্থির দ্বিভাষিকতা

স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা ও অস্থির দ্বিভাষিকতার মধ্যে পার্থক্যকে ফিশম্যান ভালোভাবে দেখিয়েছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই দুটি দ্বিভাষিকতাই ব্যবহৃত হয়। তবে ক্লস দ্বিভাষিকতাকে অন্য দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা —

১. অন্তদ্বিভাষিকতা

২. বর্হি:দ্বিভাষিকতা।

ফিশম্যানের মতে অনেক মানুষ কাজের সূত্রে কোনো জায়গায় গেলে গোষ্ঠীর সূত্রে দুটি করে ভাষাই বলতে থাকে। নিজের ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বলে। আবার নতুন সমাজের লোকের সঙ্গে অন্য ভাষায় বলে। এভাবে তারা দুটি ভাষাকেই পাশাপাশি রাখে। ফিশম্যান একেই বলেছেন স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা। কিন্তু ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ না হয়ে যদি অল্প কয়েকজনের সঙ্গে কোনো জায়গায় যায়, তাহলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানকার ভাষাতেই কথা বলে। ফলে নিজের মাতৃভাষা ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে। এটিকে ফিশম্যান অস্থির দ্বিভাষিকতা বলেছেন।

দ্বিভাষিকতাকে ফিশম্যান 'Situation' বা 'code switching'-এর এলাকাভুক্ত বলে মনে করেছেন। আসলে এক ভাষাবৈচিত্র্য থেকে অন্য ভাষাবৈচিত্র্য অবস্থা অনুসারে ও প্রয়োজন অনুসারে ঘটে থাকে। বহুভাষিক দেশে ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটে থাকে। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীরাও মনে করেন একজন মানুষ একাধিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার যদি একাধিক উপভাষা কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করে, তবে সে দ্বি-উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন— ইটভাটার কর্মরত সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতার ব্যবহার এসেই যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সাহিত্য- সংস্কৃতির মধ্যে আমরা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখি। তাই ভাষার সংরক্ষণ বা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করাও সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ। যেমন আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধুভাষা ব্যবহৃত হত। কিন্তু ক্রমে সাধুভাষার ব্যবহার কমে আসতে থাকে। আবার পাণিনির সংস্কৃত ভাষাও মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। এগুলি আলোচনা করা পরিবর্তনশীল সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

মনে রাখতে হবে একভাষী দেশে অস্থির দ্বিভাষিকতা যতটা সহজভাবে পাওয়া যায়, বহুভাষী দেশে তেমনি স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা লক্ষ করা যায়। যেমন— ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। এখানে ইংরেজি শিক্ষিত মানুষরা বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাই ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষিতদের মধ্যে মাতৃভাষাও ইংরেজির একটা স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা মোটামুটি বজায় আছে। কারণ ইংরেজি আর বাংলার প্রয়োগ বা function-এর ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। আবার অনেক জায়গায় ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা যায়। যেমন—চিনারা অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাই তারা তাদের ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে। চায়না টাউন, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলস ইত্যাদি স্থানে গেলে ভাষায় এই রক্ষণশীলতা দারুণভাবে বোঝা যায়। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত অনুকরণ, নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি মমত্ব ও গর্ববোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন চলে এবং তার ফলে ভাষার যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় লেবভ তাও দেখিয়েছেন। এই সবই সচল সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

বহুভাষী দেশে স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা আছে সত্যি, কিন্তু দুটি ভাষার মধ্যে একটির স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। যেমন—শিক্ষিতরা মাতৃভাষা ও ইংরেজির মধ্যে একটা স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা বজায় রাখলেও ইংরেজির স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা এখানেও ক্রমশ বাড়ছে। যেমন— ইথিয়োপিয়াতে 'অ্যামহারিক ভাষা' ক্রমশ ইংরেজি ভাষাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কানাডাতে একসময় ইংরেজি ও ফরাসি এই দুই ভাষার মধ্যে স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ফরাসিরা নিজ ভাষাতেই কাজের সুযোগ পাচ্ছে বলে ইংরেজি ভাষাকে ক্রমশ তারা বর্জন করার চেষ্টা করছে। ফলে সেখানে আবার একভাষিকতার সৃষ্টি হয়েছে ফ্রান্সের কুইবেক অঞ্চলে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতা থাকছে না।

৭.৪.১৩.৫ : প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে তৃতীয় বিষয়টি হল প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। ব্রাইট এর নাম দিয়েছিলেন 'Application'. কিন্তু ফিশম্যান 'Application' বলতে পরিকল্পিত প্রয়োগ বোঝেন। সামাজিক কল্যাণ এই প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। যেমন মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতির সংশোধন এবং উন্নয়ন, অন্যান্য ভাষাশিক্ষার নীতি, অনুবাদের নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ। আসলে কোনো সাহিত্যের নান্দনিক আনন্দকে বুঝতে গেলে অনুবাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। সেই ভাষার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আগে জানা দরকার। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যাখ্যা খুবই জরুরী, যেটি করে প্রয়োগমূলক ভাষা বিজ্ঞান। ভাষার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করাও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। উইলিয়াম কেরিকে আমরা বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে জানি। আবার বিদ্যাসাগরকেও বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর বা কেরির হাতে বাংলা ভাষার যে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়েছে তাও এই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।

প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের আরও একটি কাজ হল বিষয় অনুযায়ী ভাষার পর্যায় নির্ধারণ। যেমন- পত্রিকায় বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয় এক একটি বিষয়ের জন্য এক এক রকমের ভাষারীতি ব্যবহার করা হয়। 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে মৃণাল নাথ বিষয়টির সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন—

১. আপনার যন্ত্রণার উপশমের জন্য একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি।

২. খানিক পর কড়ায় আলু ও টমোটো ছেড়ে দিন। কষতে থাকুন। বেশি খানিক কষা হলে কড়ায় অল্প জল ঢেলে দিন। সঙ্গে দিন সামান্য নুন ও মিষ্টি।

সুতরাং এখানে বোঝা যায় প্রথমটি চিকিৎসা ব্যাপারে ব্যবহার করা ভাষা, আর দ্বিতীয়টি রান্নার জন্য ব্যবহৃত ভাষা।

উপরের কাজগুলি ছাড়াও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান আরও কতগুলি কাজ করে। যেমন— বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষায় ব্যবহৃত মিডিয়াম নিয়ে আলোচনা করে এই ভাষাবিজ্ঞান। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই বিষয়টিকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন—

১. বানান সংস্কার।

২. লেখ্য প্রণালীর উদ্ভাবন বা ভাষার স্টাইল সৃষ্টি করা।

৩. ভাষা পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দান ও জাতীয় ভাষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

এমনকি ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমারেখার বিন্যাসও প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইত্যাদি কয়েকটি দেশে শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে মেজর ও মাইনর ভাষার সম্পর্ক কেমন হবে, তাও নির্ধারণ করে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। এখন এই কাজের ক্ষেত্রটিকে বলা হয় 'Language planning'।

আসলে ব্রাইট ও ফিশম্যানের আলোচনায় কিছু বক্তব্যে মিল ও কিছু বক্তব্যে অমিল আছে। কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ব্রাইট সেই ভাষার মানুষদের জাতিভেদ শ্রেণিভেদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের কথা বলেছেন। একে ব্রাইট নাম দিয়েছেন 'diognatic' প্রয়োগ।

বলাবাহুল্য বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে। আসলে ফিশম্যান তাত্ত্বিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করলে, বাস্তবক্ষেত্রে সবসময় তা মানা যায় না। তাই বর্ণনামূলক ও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে এক হয়ে গেছে।

সুতরাং আলোচনার শেষে দেখা যাচ্ছে সমাজের ভিতরে যে সব স্তর আছে তাদের ভাষারীতি আলাদা, ভাষা অভ্যাসও আলাদা। এই পার্থক্য বক্তা, শ্রোতা, উপলক্ষ্য বা পরিস্থিতি অনুসারে আলাদা হয়। উচ্চ ও নীচ সমাজের ভাষা আলাদা। বিত্ত, জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মান্য শিষ্ট ভাষাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ফলে মান্যভাষার একাধিক রূপও ব্যবহার হতে থাকে সমাজের মধ্যে। আর্থিক উন্নতির সূত্র ধরে সমাজের মধ্যে বাস করা মানুষদের মধ্যে পার্থক্য বা হয় এবং বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়। সেই স্তরে ভাষা অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন গোষ্ঠীগত বা স্থানগতভাবে হলে তাকে বলে সমান্তরাল ভাষিক পরিবর্তন। যেমন গ্রাম আর শহরের ভাষার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। আবার বাড়ির ভাষা থেকে শহরে এসে আর একরকম ভাষার সৃষ্টি হয়। ব্লুমফিল্ড ভাষার এই স্তরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা —

১. সাহিত্যিক আদর্শ।

২. আদর্শ চালিত।

৩. প্রাদেশিক আদর্শ।

৪. আদর্শের ভাষা।

৫. স্থানীয় উপভাষা।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়।

৭.৪.১৩.৬ : উপসংহার

বলা বাহুল্য, ভাষার অভ্যাস প্রথম অর্জিত হয় মাতৃক্রোড়ে, নিজের পরিবারে, নিজের গ্রামে ও সামাজিক মানুষদের কাছ থেকে। তারপর বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কাছ থেকেও তারা ভাষা শেখে। গ্রামের মানুষরা মূলত মান্যভাষাটি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই আয়ত্ত করে। তবে সামাজিক অবস্থান সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে ভাষার ওপর। সুতরাং আমাদের দেশের ভাষা পরিস্থিতির সঙ্গে সমাজভাষাবিজ্ঞানের যোগ নিবিড় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৪.১৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝো ? সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা নির্বাচন করে সচল সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

২। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করো।

৩। সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও শ্রেণি নির্বাচন করে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাও।

৪। সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন করে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

৭.৪.১৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ্, পুস্তক বিপণি

২। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৩। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ

৪। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি

৫। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

শৈলীবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৭.৪.১৪.১ : প্রস্তাবনা

৭.৪.১৪.২ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলী

৭.৪.১৪.৩ : শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞান

৭.৪.১৪.৪ : শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

৭.৪.১৪.৫ : শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব

ক. ধ্বনি :

খ. শব্দ :

গ. বাক্য :

৭.৪.১৪.৬ : সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে শৈলী

ক. ছোটগল্প :

খ. উপন্যাস :

৭.৪.১৪.৭ : শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপতা

৭.৪.১৪.৮ : শৈলীবিজ্ঞান : ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী

৭.৪.১৪.৯ : উপসংহার

৭.৪.১৪.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১৪.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.১৪.১ প্রস্তাবনা

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শেষের কবিতা'র লাইন। উপন্যাসটি পড়লে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'অমিত লাবণ্য'র প্রেমজ দর্শন ও পরিণতি লক্ষ করা যায়। তারই সঙ্গে আরও বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় 'শৈলী'র প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ শৈলীগুণে অনায়াসে এখানে 'সময় চেতনা'কে উন্নীত করেছেন 'দার্শনিক চেতনা'য়।

বাংলায় 'শৈলী' শব্দটা শুনলেই মনে পড়ে ইংরেজি 'Style' শব্দটি। ল্যাটিন ভাষায় একটি শব্দ 'স্টিলোস'। এই 'স্টিলোস'-এর অর্থ হল, মোমের চৌকো টুকরোর উপর লেখার জন্য ছুঁচলো কলম। পরবর্তীকালে এই 'স্টিলোস' থেকেই 'স্টাইল' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, ইংরেজি 'Style' কথাটির অর্থ কিন্তু একাধিক। কারও মতে 'Style' মানে 'রীতি'। কেউ বা বলেন 'শৈলী'। তবে বর্তমানের বিভিন্ন সাহিত্যালোচনায়, এমনকী সংবাদপত্রেও 'রীতি'-র চেয়ে 'শৈলী'র আবেদন বেশি। কারণ 'শৈলী' শব্দের পৌনঃপুনিকতা (frequency) রীতির চেয়ে অনেক বেশি।

'Style' সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক বুফোঁর বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন —

'Le Style c'est I'homme me'me.
(Style is the man himself)

অর্থাৎ 'শৈলী' হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। দার্শনিক প্রুস্ত-এর প্রতিধ্বনি করে অনেকেই বলেছেন— শিল্পীর কাছে রঙের যে ভূমিকা, কবি-সাহিত্যিকদের কাছে 'শৈলী'র সেই একই ভূমিকা। 'শৈলী' হল— লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অচেতনভাবে নিয়োজিত সেই সব ভাষাগত উপায়, যারা দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন। অর্থাৎ লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তার প্রকাশই হল 'শৈলী'।

৭.৪.১৪.২ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলী

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে যা 'রীতি', ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বে তাকেই বলা হয়েছে 'স্টাইল'। এটা অবশ্যই দেশকাল নিরপেক্ষ ধারণা। আমরা যদি একটু পিছনে তাকাই, তবে 'শৈলী' সম্পর্কে ধারণা আরও একটু গাঢ় হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বামন বলেছিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য, বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ বিশেষো গুণাত্মা'। রীতি বা শৈলীকেই বামন কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। বামনের মতে, বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি রীতির কথা বলেছেন যথা— বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। পরবর্তীকালে 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ বলেছেন, 'রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান বিশেষবৎ' অর্থাৎ

তিনি রীতিকে দেখেছেন কাব্যের বিশিষ্ট অবয়ব সংস্থানের বিষয় হিসেবে। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের রীতি বিষয়ক ধারণা থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসা যায়। সেটা হল, মানবদেহের 'আত্মা'কে বিশ্লেষণ করা যায় না। উপলব্ধি করতে হয়। ঠিক সেইরকমভাবেই রীতি অবিশ্লেষ্য। রীতি উপলব্ধির।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের মতো, ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বেও 'শৈলী' সম্পর্কিত অনেক ধারণা আছে। গ্রীক সাহিত্যে স্টাইল সম্পর্কে দুধরনের মতবাদ প্রচলিত। প্রথম মতবাদের প্রবক্তা প্লেটো। তিনি 'স্টাইল'কে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, স্টাইল হল সাহিত্যের একটি মৌলিক গুণ। এবং এই স্টাইলের ওপরই সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে। এই গুণ যেহেতু ভেতরের, তাই একে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অপরপক্ষে দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তা অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে, স্টাইল হল রচনার অনেকগুলি উপাদানের ফল। অ্যারিস্টটল সম্প্রদায়ের মতে শৈলী হল কোনো রচনার বাহ্যিক বস্তুগত উপাদান ও গুণ। তিনি তাঁর শৈলী বিষয়ক তত্ত্বের সাহায্যে হোমারীয় স্টাইল, মধ্যযুগীয় স্টাইল, ফরাসি স্টাইল ইত্যাদির প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। প্রাচীনকালের মতো আধুনিক ইউরোপেও স্টাইল সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত। শোপেনহাওয়ার স্টাইলকে বলেছেন, 'Physiogromy of the mind'. নিউম্যান বলেছেন 'Style is a thinking out into language. আবার ওয়ালটার পেটারের মতে স্টাইল হল '..... the finner accommodation of speech to that vision within'. এরই মধ্যে সব মনীষীর মতবাদকে ছাপিয়ে গেছে দার্শনিক বুফোঁর মতবাদ। তাই 'Style is the man himself' বর্তমানে প্রবচনে রূপান্তরিত। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের 'শৈলী' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা থেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশই হল 'শৈলী'। সাহিত্য রচনায় যদি শৈলী বা স্টাইল-এর কোনো অস্তিত্ব থাকে তবে তা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। বামনের 'বিশিষ্ট পদরচনা' (way of writing) থেকে শুরু করে একালের বিশ্বনাথের 'অবয়ব সংস্থান' (a good way of expressing oneself) আসলে প্রকারান্তরে সাহিত্যের ভাষাকেই ইঙ্গিত করছে।

৭.৪.১৪.৩ : শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞান

আকর্ষণীয় শৈলীর প্রাণবিন্দুই হল প্রাঞ্জলতা। সাধারণত কবিতায় বা গদ্যে লেখকের প্রথম লিখে ফেলার ঘটনাটা ঘটে। সেক্ষেত্রে লেখক যে সবসময় খুব ভেবেচিন্তে রীতির বিভিন্ন উপাদানগুলি নির্বাচন করেন তা নয়। অনেকসময় নির্বাচন ব্যাপারটা আসে পরবর্তী ভাবনায়। 'After thought' হিসেবে। দেখা গেল, কিটস কবিতা লিখতে গিয়ে 'blue'-এর চেয়ে 'আরও নীল' কোনো শব্দের খোঁজ করছেন। অথবা রবীন্দ্রনাথ 'গগনে' শব্দ কেটে দিয়ে 'অম্বরে' বসাচ্ছেন। কিটসের 'আরও নীল' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'অম্বরে' নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই হল সচেতন। যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে 'After thought'. লেখক ঠিক কোন্ শব্দটি বসাবেন, কোন্ ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করবেন, কীভাবে অনুচ্ছেদ সাজাবেন, কীভাবে রচনার পরম্পরা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেগুলি নানা উপলক্ষ্য বা context-এর উপর নির্ভরশীল। এই যে রচনাগত ভিন্নতা বা শৈলী— সেই সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনাকে বলা হয় 'শৈলীবিজ্ঞান' বা 'stylistics'.

সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান'-কে নানাদিক থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। জিওফ্রে এন. লিচ তাঁর 'A Linguistic Guide to Brglish Poetry' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানকে বলেছেন যে, সাহিত্যের শৈলী বিষয়ক আলোচনা। বিশেষভাবে সাহিত্যের ভাষাবিষয়ক ব্যবহারের অনুশীলন। 'Theory of Literature' গ্রন্থে রেনে ওয়েলাস বলেছেন যে, স্টাইলিসটিকস হচ্ছে সাহিত্যের ভাষার আলোচনা। এ ছাড়া অনেক সমালোচকই স্বীকার করেছেন, শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য সাহিত্যের ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন। এই প্রসঙ্গে G.W. Turner -এর বক্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'Stylistics'(1973) গ্রন্থে লিখেছেন —

> ''.....Stylistics is that part of Linguistics which concentrates on variation in the use of Language, often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses of Language in Literature.....Stylistics means the study of style, with a suggestion, from the form of the word, of a scientific or at least methodical study.'' Page-(7-8)

বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক ' শৈলীবিজ্ঞান'কে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা থেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান'-এর একটা সাধারণ ধর্ম আমরা অনুভব করতে পারি। সেটা হল, শৈলীবিজ্ঞান মূলত সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলন এবং তার ভিতর দিয়েই সাহিত্যের শৈলী প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে থাকা উচিত, 'শৈলীবিজ্ঞান' নিছক ভাষা বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। তারও একটা নন্দনতাত্ত্বিক দিক আছে।

সেই প্রাচীনকাল থেকে 'শৈলী' সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও ইউরোপে নানা ধরনের চিন্তাচেতনার পরিচয় মিললেও 'শৈলীবিজ্ঞান'-এর ধারণা একান্তভাবেই ইউরোপের। শৈলীর বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শৈলীবিজ্ঞানের জন্ম। মূলত ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করে সাহিত্যের শৈলীকে নতুন পথে যাচাই করার প্রবণতা দেখা দিতেই জন্ম হল শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞানের। স্টাইল থেকে স্টাইলিস্টিক্সের। শৈলীবিজ্ঞানে ভাষাচর্চার পথ ধরে শৈলীর চর্চা করা হয়। এর মূল কথাই হল সাহিত্যকর্মের ভাষাবৈচিত্র্য খুঁজে বার করা। এটি শব্দের সজ্জা বা ভাষাবৈজ্ঞানিক গঠনকে স্পষ্ট করে। Linguistic stylistics সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে।

G.W. Turner তাঁর 'Stylistics'(1973) গ্রন্থে লিখেছেন সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে যে শিল্পসৌন্দর্য লাভ করে, সেই সৌন্দর্য-বিচারকেও বুঝতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। ''The study of style, stylistics, must like other branches of linguistics, generalize.'' P-13

৭.৪.১ ৪.৪ : শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

বিংশ শতকে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছিল। কারণ সকল সমালোচক ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী। এরপর সাহিত্যকেন্দ্রিক আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ফরাসি সমালোচকরা। ইংরেজ ও মার্কিন সমালোচকদের তুলনায় ফরাসিদের আলোচনার গভীরতা ছিল বেশি। সেসময় শৈলীবিজ্ঞানের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিষয়গুলি ছিল : বাক্‌প্রতিমা (imagery); রূপক (allegory); প্রতীক (symbol); প্রত্নপ্রতিমা (archetype) ইত্যাদি। আর চমস্কির 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব' আবিষ্কারের পর ভাষাগত দিক দিয়ে শৈলীবিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। মূলত দুটি বিষয় এখানে প্রাধান্য পেল—(ক) সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব (খ) বাক্য ও শব্দের অর্থ। সাহিত্যালোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শৈলীবিজ্ঞানের তিনটি শাখা বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

(১) শৈলীভাষাবিজ্ঞান : এখানে শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের শাখা।

(২) সাহিত্যশৈলীবিজ্ঞান : এটি সাহিত্যালোচনার উপশাখা।

(৩) সাধারণ শৈলীবিজ্ঞান : এটি প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার মিলিত রূপ।

এখানে প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সমালোচনার সাহায্য নেওয়া হয়। সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে যেহেতু ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সাহিত্যালোচনা সবই থাকে তাই এই শাখা নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে।

৭.৪.১৪১.৫ : শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব

Linguistic Stylistics সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির মধ্যেই স্টাইলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ স্টাইলিস্‌টিকস কোনো আইডিয়া নয়, কোনো ভাববস্তুও নয়। এই প্রসঙ্গে স্টিফেন উপম্যান তাঁর 'Style in the French Novel' (1957) গ্রন্থে লিখেছেন —

''It is concerned with Linguistic values, not with historical development. Naturally, any stage in the evolution of a Language can become the subject of stylistic enquiry, but the approach will always be descriptive.''

Page 20-21

কেউবা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আলোচনা থেকে শৈলীবিজ্ঞানের একটা প্রণালীতত্ত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। সেটা এই রকম—

বাক্য নির্মিতি (Sentence structure) : এখানে আলোচনা করা এই বিষয়গুলো

১. বাক্যের দৈর্ঘ্য : হ্রস্ব, দীর্ঘ ২. সরল, জটিল ও যৌগিক ৩. বাক্যাংশ ৪. অনুচ্ছেদ ৫. শব্দক্রম

শব্দনির্মিতি *(verbal structure)* : ১. শব্দরূপ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশিবিদেশি ২. ধ্বনি ও অক্ষর ৩. বিশেষণ ৪. দ্ব্যর্থকতা ৫. একক যৌগিক

বাক্যবিন্যাস *(Syntax)* : ১. বিরাম চিহ্ন ২. উদ্দেশ্য-বিধেয় সংযোজক ৩. শব্দক্রম ৪. বাক্যাংশের অনুক্রম →

ব্যাকরণ *(Grammar)* : ১. পদরূপ— বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম ইত্যাদি ২. ধ্বনিতত্ত্ব ৩. শব্দার্থতত্ত্ব →

বিচ্যুতি *(Deviations)* : ১. শব্দার্থগত ২. শব্দগত ৩. ব্যাকরণগত ৪. ধ্বনিগত ৫. আঞ্চলিক

অলংকারতত্ত্ব *(Rhetoric)* ১. উপমা ২. চিত্রকল্প ৩. অলংকার ইত্যাদি

পরিসংখ্যান *(Statistics)* : ১. বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের সংখ্যা ২. অনুপাত ৩. শতকরা হার

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ১৫২ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন —

> "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী— আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম-নদী-প্রান্তর-পর্বত-নগর-বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে ক্লান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে"।

অনুভূতিতে এই ভাষার ঐশ্বর্য সুদূরপ্রসারী। প্রতিটি শব্দ বেদনাময় সঙ্গীতের সুরে গঠিত। নীল, আকাশ, ধূসর, সঙ্গীহীন, ম্লান নেত্র, মৌন মুখ, সোনার চেলি ইত্যাদি শব্দ সুরসঙ্গতিতে সমৃদ্ধ। শব্দসজ্জায় বিশেষণ নির্বাচনেও শিল্পী সার্থক। 'কোমল গান্ধার'-এর বিষাদময় ব্যঞ্জনার নিবিড়তা সৃষ্টিতে — একাকিনী, ম্লান নেত্রে, মৌন মুখে, অসীম সন্ধ্যা শব্দগুলোর ব্যবহার অসাধারণ। তাছাড়াও একটি কমা, একটি সেমিকোলন আর একটি পূর্ণচ্ছেদও সঙ্গীতের মীড়, গমক ও মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্বে এই ভাষা বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার মাধ্যমে এখানে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। চোখের জল আর গানের সুরে বেদনাঋদ্ধ আনন্দ দিয়েছে পাঠককে।

এখানে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের বিস্তারিত প্রণালীতত্ত্ব আলোচনা না করে মূলত সংক্ষিপ্ত রূপে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের শৈলী খুঁজব।

সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে গদ্য ও পদ্য দু-জাতীয় রচনারই বিশ্লেষণ করা হয়। একে বলা হয় শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব। গ্রাহাম হগ, স্টিফেন উপম্যান, রেনে ওয়েলস, চমস্কি প্রমুখ সমালোচক

শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালীতত্ত্বের কথা বলেছেন। কেউ শব্দার্থতত্ত্ব, কেউ বিচ্যুতি, কেউ অলঙ্কারতত্ত্ব, কেউ পরিসংখ্যান, কেউ বাক্যগঠন, কেউ শব্দগঠন, কেউ বা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈলীবিজ্ঞানে কোনো লেখক বা যুগের শৈলী খুঁজতে হলে সেই লেখক বা সেই যুগের নিজস্ব রচনালক্ষণ বিশ্লেষণ করতে হয়। সেগুলি — ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, রচনার আরম্ভ, শেষ ইত্যাদি। আমরা জানি, ভাষায় বিভিন্ন উপকরণ আছে। সেগুলি — ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। তাদের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্য প্রচলিত ব্যাকরণে কিছু নিয়মনীতি আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ভাষা ব্যবহারকারী সবসময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক নিয়মনীতি মেনে চলে না। প্রচলিত নিয়মনীতি থেকে এই যে সরে আসা (deviation) ঘটা অনেক সময় বিশেষ ভাবপ্রকাশে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং অপরিহার্য হয়। বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যাকরণের এই নিয়ম লঙ্ঘনকে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। একেই বলা হয় ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য (variation in the use of Language)। এর দ্বারাই লেখক বা যুগের শৈলী ধরা পড়ে। নীচে পর্যায়ক্রমে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির আলোচনা করা হল —

ক. ধ্বনি : শৈলীবিজ্ঞানে সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো শব্দের ধ্বনিগত, রূপগত এবং অর্থগত দিকগুলি শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধ্বনিগত আলোচনায়, আধুনিক কালে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(১) ধ্বনির অনুকারক শব্দ (Primary oromatopocia)

(২) ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ (Secondary oromatopocia)

এই দুই ধরনের ধ্বন্যাত্বক শব্দ বাংলা ভাষাতে অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্ব প্রবন্ধাবলী'তে 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে দুই ধরনের শব্দেরই বিশ্লেষণ হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে।— প্রথমে ধ্বনির অনুকারক শব্দের আলোচনা —

(ক) বৃষ্টি পড়ে **টাপুরটাপুর** (ছেলেভুলানো ছড়া)

(খ) **শনশন** বনবীথিকা (বর্ষামঙ্গল)

(গ) পাতায় পাতায় **টুপুরটুপুর** (গীতবিতান)

এবারে ধ্বনির অনুকারক নয় কিন্তু ভাবের প্রকাশক এমন শব্দের আলোচনা—

(ক) **টনটন** করে বুকের ভিতরটা। (শেষ সপ্তক)

(খ) চারিদিকে তীক্ষ্ম আলো **ঝকমক** করে। (নবজাতক)

(গ) ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছে ঘরের কোণে **মিটমিটে** আলোয়। (শেষ সপ্তক)

উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণির ধ্বনিগুলোর আবেদন পাঠকের শ্রুতির কাছে। এই শ্রেণি পাঠকের মনে 'গতিশীল বাক্‌প্রতিমা (Kinesthetic imagery) সৃষ্টি করেছে। আবার দ্বিতীয়টির আবেদন পাঠকের

মনোলোকে। পাঠকের মনে দ্বিতীয়টি 'স্থিতিশীল বাগ্‌প্রতিমা' (Static Imagery) সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যে সাধারণত এই ধরনের ধ্বনিগুলো মূলত সংকেতের কাজ করে। লেখক বা বিষয়ভেদে এই সংকেতের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই হল ধ্বনির শৈলীচর্চা।

খ. শব্দ : ভারতীয় সনাতন ভাবনায় শব্দমাত্রই ব্রহ্ম। কারণ শব্দমাত্রই ব্রহ্মের মতো নির্গুণ। লেখকদের কলমে শব্দ সাধারণত ব্যাকরণের আক্রোশ আর অভিধান নির্দিষ্ট অর্থের অনুশাসন অস্বীকার করে। এর ফলে শব্দগুলো নতুন নতুন ইশারা, নতুন কৌশল, নতুন ভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের রাজ্যে নিত্যনতুন দ্যোতনায় উপস্থিত হয়। সাধারণত ওই শব্দসকল রচনার মধ্যে দুই ধরনের শৈলী গড়ে তোলে—

(১) স্বাভাবিক বাগ্‌ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রচলিত, রূপকায়িত, প্রসারিত শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে অস্বাভাবিক শৈলী।

(২) প্রচলিত ও যথার্থ শব্দের দ্বারা গঠিত হয় স্বচ্ছতম শৈলী।

শৈলীবিজ্ঞানে 'শব্দ' বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সেখানে শব্দের আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা প্রসঙ্গাধীন অর্থই বেশি গুরুত্ব পায়। ব্যাকরণের নিয়মকানুন সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র উদাহরণ দিয়ে বলা যায় —

"এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।।"

অথবা

"খোকা যাবেন নায়ে।
লাল **জুতুয়া** পায়ে।।"

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে উপরের ছড়া দুটি অংশবিশেষ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ। প্রথমটিতে পুংলিঙ্গবাচক 'ভাই' শব্দটির আগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষণ 'গুণবতী' ব্যবহার করা হয়েছে। আবার 'জুতুয়া' শব্দের গঠন ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'জুতা'-র সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় ব্যাকরণের নিয়মে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'ভাই' ও 'শিশু'-র প্রতি দিদি ও অন্যের যে স্নেহমমতার ভাব তা 'গুণবতী' ও 'জুতুয়া'-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই যে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম একে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। বরঞ্চ ওই বিশেষ ভাবটি প্রকাশের পক্ষে ওই প্রত্যয়টি অপরিহার্য। এই "অপরিহার্য ব্যতিক্রম" হল শৈলীর মূল পরিচয়। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকা যেখানে শেষ, শৈলীবিজ্ঞানের এলাকা সেখান থেকে শুরু। এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা। যাকে সাহিত্যিক শৈলীবিশেষজ্ঞরা বলেছেন—idiosyncrasy.

প্রত্যেকটি শব্দের যেমন আভিধানিক অর্থ আছে, তেমনি আছে বাক্যের অন্তর্গত গঠনসাপেক্ষ অর্থ। কিন্তু শব্দগুলো যখন বিভিন্ন বাক্যে পরিবেশিত হয়, তখন বাক্যের রূপসজ্জা অনুসারে তার অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন—

বালিকারা কুকুরটি ভালোবাসিত।

আবার কুকুরটি বালিকাদের ভালোবাসিত।

উপরের দুটি বাক্যে শব্দসজ্জার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাক্যের অর্থগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে অবশ্য শব্দের আভিধানিক অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং বলা যেতে পারে—

শব্দের অর্থ = আভিধানিক অর্থ + বাক্যের সজ্জা অনুসারী অর্থ

আবার কবি বা সাহিত্যিকের সমগ্র রচনায় অনেক সময় একটি শব্দকে বহুবার আবর্তিত হতে দেখা যায়। এর ফলে শব্দমধ্যে আভিধানিক অর্থের সীমা ছেড়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ কেউই এর ব্যতিক্রম নন। জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কিছু কিছু শব্দকে বারবার ব্যবহার করেছেন। যেমন-'শিশির' শব্দটি।

(১) সমস্ত দিনের শেষে **শিশিরের** শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে। (বনলতা সেন)

(২) হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে

শুধু **শিশিরের** জল,

(পেঁচা)

(৩) আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে সে **শিশিরের** জল।

(নির্জন স্বাক্ষর)

(৪) চোখের উপরে নীল মৃত্যু উজাগর

বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, **শিশিরের** ঘ্রাণ।

(রূপসী বাংলা)

আবার 'নক্ষত্র' শব্দটিও তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন—

(১) সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

বিকেলের **নক্ষত্রের** কাছে।

(সুচেতনা)

(২) ..হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার;

নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

(জার্নাল-১৩৪৬)

(৩) ফিরে এসো সুরঞ্জনা

নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

(আকাশলীনা)

(৪) .... একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর **নক্ষত্রের** তলে

অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে।

(দূর পৃথিবীর গন্ধ)

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ 'শিশির' ও 'নক্ষত্র' শব্দদ্বয় বারবার ব্যবহার করেছেন। কবির শৈলীসত্তার গুণে শব্দদুটি আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অনবদ্য চিত্ররূপময়ী দ্যোতনা প্রকাশ করেছে। এইভাবে কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ঘ্রাণ, ঘুম, ঘাস, ক্লান্তি ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেক শব্দই তাদের সামান্য অর্থের সীমাতিশায়ী হয়ে বাগ্‌প্রতিমা বা ইমেজের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—

শালবনের মধ্যে সুঁড়িপথ

লুটিয়ে চলেছে কাপড়ের মতো।

(শালবনে)

আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে, একটি শব্দই কবির রাজনৈতিক মানসের বিশেষ প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় 'লাল' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে কবির ব্যক্তিমানসের সঙ্গে গোষ্ঠীমানসের সম্মেলন ঘটেছে এবং শব্দটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

শৈলীবিজ্ঞানে 'শব্দ' কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল। সাম্প্রতিককালে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' ও 'মনস্তাত্ত্বিকবিজ্ঞান'-এর অগ্রগতির ফলে শব্দপ্রয়োগে মানসিক ও সামাজিক ব্যাখ্যায় অনেকে দৃষ্টি দিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, শব্দপ্রয়োগের সূত্র ধরে লেখকের বিশেষ মুহূর্তের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটে তাঁর নিজস্ব শৈলীতে।

গ. বাক্য : শৈলীচর্চায় শব্দ ও ধ্বনির পাশাপাশি বাক্যগঠনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি হয় বাক্য। বাক্যের অবয়ব বিচারে শৈলীবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি তন্ময়, নিরাসক্ত। চমস্কি তাঁর 'Aspects of the Theory of syntax' গ্রন্থে বলেছেন বাক্যের দুটি রূপ—

(১) অন্তরঙ্গ রূপ (Deep structure)

(২) বহিরঙ্গ রূপ (Surface structure)

চমস্কি বলেছেন যে, বচনে ও রচনে বক্তা বা লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থাকে বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ, তার প্রকাশ ঘটে বহিরঙ্গ রূপে। একটি বাংলা বাক্যে 'হওয়া' ক্রিয়াপদটি উহ্য থাকে। এটি বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপের অন্তর্গত। যেমন —

(ক) সায়ক ভাল ছেলে । (বহিরঙ্গ রূপ)

(খ) সায়ক (হয়) ভাল ছেলে। (অন্তরঙ্গ রূপ)

বর্তমানে 'হওয়া' ক্রিয়াপদটি উহ্য থাকলেও বাংলা গদ্যের শুরুতে লেখকরা বাংলা বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ ব্যবহার করেছিলেন —

(ক) সে **হয়** উত্তম দাতা। (রামরাম বসু)

(খ) আমি বেকার **আছি**। (উইলিয়াম কেরী)

অনেক সময় ইংরেজি বাক্যের বহিরঙ্গ রূপ অনুসরণে বাংলা বাক্যে নিত্য বা পরস্পর সম্বন্ধী অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন —

(ক) 'না এ পর্যন্ত তিনি আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল'।

(ভ্রান্তিবিলাস ২য় অধ্যায়)

কখনও বা ইংরেজি বাক্য অনুসারে বাংলায় যখন (when) ও তখন (then) শব্দদুটির প্রথমটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ইংরেজি বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ অনুসরণে 'তখন' উহ্য রাখা হয়। এটাও একধরনের বাক্যগঠনগত শৈলী। যেমন —

(ক) কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে।

(যোগাযোগ)

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যাবলীর প্রাথমিক সজ্জার প্রকৃতি পরীক্ষা করেছেন। সেখানে মোটামুটি ছয় ধরনের সজ্জার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। Subject কে 'S' Object কে 'O' এবং verb কে 'V' দিয়ে বিষয়টা চিহ্নিত করা যেতে পারে—

(১) কর্তা - কর্ম - ক্রিয়া (SOV)

(২) কর্তা - ক্রিয়া - কর্ম (SVO)

(৩) ক্রিয়া - কর্তা - কর্ম (VSO)

(৪) কর্ম - কর্তা - ক্রিয়া (OSV)

(৫) ক্রিয়া - কর্ম - কর্তা (VOS)

(৬) কর্ম - ক্রিয়া - কর্তা (OVS)

বাংলা বাক্যে সাধারণভাবে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের পরে। কিন্তু ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের মাঝখানে। বিশ্বের ভাষাসজ্জার চিত্র লক্ষ করলে, প্রথম তিনটি সজ্জার প্রাধান্যই দেখা যায়। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার সজ্জাবৈচিত্র্যেরই বিষয়টি শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সজ্জাবৈচিত্র্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্য সম্পর্কান্বিত। একটা বাংলা বাক্য দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে —

আশিস লাঠির আঘাতে বিশ্বজিতের মাথা ফাটিয়েছিল।

এই বাক্যটিতে ব্যাকরণগত উপাদানের মধ্যে আছে কর্তা বা কর্তৃকারক (আশিস); করণকারক (লাঠির আঘাতে); সম্বন্ধ পদ (বিশ্বজিতের); কর্ম বা কর্মকারক (মাথা) এবং ক্রিয়াপদ (ফাটিয়েছিল)। এই বাক্যটিকে আবার অন্যান্য পদসজ্জায় সাজিয়েও বাক্যের শৈলী নির্ধারণ করা যায়।

৭.৪.১৪.৬ : সাধারণ শৈলীবিজ্ঞান শৈলী

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে শৈলীর চর্চা করা যেতে পারে। কারণ সাহিত্যের মাধ্যম তো আর একটি নয়, একাধিক। যেমন গদ্যশৈলীর মধ্যে মধ্যে পড়ে ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। রচনাগত ভিন্নতার জন্য এক একটির শৈলী এক একরকম। গদ্য পদ্যের বিপরীত। তাই বলা যায়, যা পদ্য নয়, তাকেই গদ্য বলা যায়। ভাষার যেমন জ্ঞানমূলক এবং সৃষ্টিমূলক দিক আছে, গদ্যেরও তাই। গদ্যের আওতায় পড়ে লিখিত ভাষণ, চিঠি, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। এখানে মূলত ছোটগল্প ও উপন্যাসের গদ্যশৈলী আলোচনা করা হল—

ক . ছোটগল্প :

কোনো ছোটগল্পের প্রাণই হল প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একতা। কারও কাছে ছোটগল্প সহজ-সরল প্রাঞ্জল রচনা। কারও কাছে বা তা চাবুকের কড়া আঘাত। এখানে উপন্যাসের মতো চরিত্রের ভিড় থাকে না। কিন্তু লেখকের একটা দায় থাকে। গল্পটাকে সংকটের কাছাকাছি আনার। সরল বা জটিল থেকে জটিলতর প্রান্তে দ্রুততলে উপসংহারে নিয়ে যাবার। এই দায়বদ্ধতার উপরেই লেখকের নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী ধরা পড়ে। ছোটগল্পের মিতায়তনও কখনও কখনও উপন্যাসের চেয়েও উঁচুদরের প্রত্যক্ষতা দান করে। আর এখানেই ছোটগল্পকারের শৈলীগত ভিন্নতা। যেমন ধরা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটা। এই গল্পে মূল শাস্তি পেয়েছে চন্দরা। মিথ্যা অভিযোগ অভিযুক্ত চন্দরা। ফাঁসির আগে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিগ্যেস করেন যে তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি ডেকে দেবেন কি? এর প্রত্যুত্তরে চন্দরার সংক্ষিপ্ত জবাব-'মরণ'। অর্থাৎ এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো। মাত্র একটা শব্দের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বামীর প্রতি চন্দরার তীব্র ঘৃণামিশ্রিত অভিমান প্রকাশ করিয়েছেন। তার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হয়ে দাঁড়াল। এই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে 'মরণ' কথাটিতে। আর এখানেই ধরা পড়েছে ছোটগল্পে রবীন্দ্রশৈলী। তা চাবুকের কড়া আঘাতের মতো সমাজকে বিদ্ধ করেছে। সামান্য একটা শব্দ গল্পমধ্যে অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

খ. উপন্যাস :

উপন্যাসের মতো বিমিশ্র সাহিত্য মাধ্যম খুব কমই আছে। ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, কবিতা, নাটকীয় সংলাপ, চিঠিপত্র, বর্ণনাত্মক গদ্য, জ্ঞানমূলক গদ্য সবই আছে উপন্যাসে। চরিত্র, সংলাপ, ভাষা, অবয়ব, উপলক্ষ, আলোচনা সব মিলেই উপন্যাসের শিল্পজগৎ। বিভিন্ন ঔপন্যাসিক এগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই সেখানেই উপন্যাসের শৈলী বিভিন্ন হয়ে যায়।

ক্রিয়ার কালের প্রয়োগ পার্থক্যের সঙ্গে বাক্যের রূপগত ও অর্থগত পরিবর্তন শৈলীচর্চার অন্তর্গত। সাধারণত উপন্যাসের কাহিনীসজ্জায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার দুটি দৃষ্টিকোণ অনুসৃত হয়।

(১) পাঠকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল।

(২) লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল।

বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা সাধারণত পাঠকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার অতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন —

(ক) হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। (কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিমচন্দ্র)

ইংরেজি বাক্যে —

A. The unusual events described in the chronicle occurred in 1947, at Oran, Everyone agreed that, considering their some what extraordinary character, they were out of place there.

(The Plague, Albert Camus)

আবার কখনও লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। উপন্যাস জুড়ে অতীতকালাশ্রয়ী বাক্য থাকলেও উপক্রমণিকা অংশে বর্তমান কালের রূপ পরিলক্ষিত —

(ক) অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। (আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র)

আবার ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাক্যে প্রথমে ক্রিয়ার অতীতরূপ ব্যবহৃত, পরক্ষণেই ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে —

(a) .....and which I shall describe in its proper place.

(The Brothers Karamazov, Dostoyevsky)

আবার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও গতানুগতিকতা থেকে যুক্ত হয়ে লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহার করেছেন—

(ক) অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে।

ঠিক এর পরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ 'অমিত বলে.../সিসি বলে .../লিসি বলে....' ধরনের বর্তমান কালাশ্রয়ী বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর এখানেই ধরা পড়েছে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শৈলীচর্চা।

ধরা যাক, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কথা। শশী কলকাতার পাশ করা ডাক্তার। গাঁয়ের মেয়ে কুসুম ঘরের কেউ। শশীর প্রতি কুসুমের প্রেম আপনা থেকে জেগেছিল। একদিন তালবনে কুসুমকে ডেকে উতলা শশী জিগ্যেস করল, "তোমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না বৌ।" উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় কুসুম বলল, "কি করে বুঝবেন? ..... হলেনই বা ডাক্তার। এ তো জ্বর জ্বালা নয়। .....কতবার নিজে যেচে এসেছি।" তারপরেই কুসুমের কড়া ভাষায় জবাব, "আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।...লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না? কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

টকটকে লাল তাতানো লোহার ঠান্ডা হয়ে যাবার অন্তরালে লেখক যেভাবে কুসুমের দশ বছরের উপবাসী ভালবাসার মৃত্যু ঘটিয়েছেন তা কল্পনাতীত বিস্ময়কর। সহজ সরল বাক্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈলীচর্চা।

৭.৪.১৪.৭ : শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপতা

গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৈলীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তাই শৈলী বা স্টাইলের 'লোকমান্য' (Popular) সংজ্ঞা দান করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ লেখক, বিষয়, পাঠক, উদ্দেশ্য, শ্রেণি ইত্যাদি ভেদে স্টাইল পরিবর্তন হয়ে যায়। এর কোনোটিতেই আলাদা করে এককথায় স্টাইলের ব্যাখ্যা করা যায় না। এবারে সেটা আলোচনা করা যেতে পারে —

১. **লেখক ও শৈলী :** প্রত্যেক লেখকের চিন্তা চেতনা বিভিন্ন। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, স্তবক রচনা, রচনার শুরু ও শেষে ওই পৃথকত্ব ধরা পড়ে। লেখকভেদে চিন্তাচেতনা পৃথক হবার ফলেই শৈলীও বিভিন্ন হয়।

২. **বিষয় ও শৈলী :** অনেক সময় দেখা যায়, বিষয়ই লেখকের ভাষারীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলেই গবেষণা পত্রের ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ভাষা আলাদা হয়ে যায়। এই জন্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাসের শৈলী আলাদা। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও 'ঘরে বাইরে'-এর শৈলী বিভিন্ন মাত্রার।

৩. **পাঠক ও শৈলী :** লেখকের রচনা পাঠকের রুচি অনুযায়ীও ভিন্ন শৈলীর হয়ে যায়। সাহিত্যবিষয়ক, ক্রীড়াবিষয়ক, সিনেমাবিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক, ইত্যাদি রচনার পাঠক বিভিন্ন। অভিপ্রেত পাঠকের রুচি অনুসারে কিছু লিখলেই শৈলীর পার্থক্য ঘটে যায়।

৪. **উদ্দেশ্য ও শৈলী :** কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে লেখকদের কলম ধরতে হয়। কারও উদ্দেশ্য সাহিত্যবোধ জাগানো, কারও আনন্দ দেওয়া, কারও দেশপ্রেম জাগানো, কারও দেশের লুপ্ত সংস্কৃতি জাগিয়ে দেওয়া, কারও বা উদ্দেশ্য প্রচলিত প্রথা ভেঙে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠিত করা। ভিন্নমাত্রার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই লেখকদের শৈলী এক হতে পারে না।

৫. **শ্রেণি ও শৈলী :** সাহিত্যের শ্রেণি অনুযায়ী শৈলী আলাদা হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ভাব অনুযায়ী শব্দচয়নই এর মূলকথা। ফলে, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটকের শৈলী আলাদা।

এর থেকে বলা যায়, একজন লেখকের বিষয় ও রচনাভেদে স্টাইল বিভিন্ন রকম হয়। আবার সময়ান্তরে স্টাইলও পরিবর্তিত হয়। তবে এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৭.৪.১৪.৮ : শৈলীবিজ্ঞান : ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী

উইলিয়াম কেরী থেকে আধুনিককালের লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ করলে দুধরনের শৈলীর প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণত ওইসব লেখকের সবচেয়ে পরিচিত রচনার পরিসংখ্যানগত লক্ষণ দেখেই ধরা যায় লেখকদের শৈলী। অর্থাৎ রচনারীতির মধ্যে 'identific' ব্যাপারটাই লেখককে কোনো না কোনো ভাবে চিনিয়ে দেয়। তাই অনেক সময় নাম না দেওয়া রচনা দেখেই বলা যায়, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বা প্রমথ চৌধুরী বা সমরেশ বসুর লেখা।

অনেক সময় লেখকের নিজস্ব রচনা লক্ষণগুলো খুবই সুস্পষ্ট থাকে। যার জন্য Pun প্রবণতামূলক গল্পগুলো শিবরাম চক্রবর্তীর মনে হয়। আবার বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'তথ্যমূলক' রচনা মানেই সত্যজিৎ রায়ের লেখা। কোনো রচনায় 'দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই ইত্যাদি শব্দ বা উদিপুরী, হাস্যময়ী, রহস্যময়ী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চিনিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রকে। এগুলো রীতির নির্দোষ সীমানা ছাড়িয়ে উৎকেন্দ্রিকতার গণ্ডীতে পৌঁছে গেছে। আর এর থেকেই উদ্ভব হয়েছে বঙ্কিম রীতি, বিদ্যাসাগরীয় রীতি, হুতোমী রীতি বা রবীন্দ্ররীতি। এইসব লেখকের অনুগামী লেখকদের রচনায় বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে যুগশৈলী।

শব্দের রূপগত দিক বিচার করেও ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী উদ্ঘাটন করা যায়। কেরী থেকে বিদ্যাসাগরের রচনায় ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎকালের রূপের সঙ্গে 'ক' -এর অতিরিক্ত সংযোগ লক্ষ করা যায়। যেমন— ক্রিয়াপদের অতীতকাল—করিলেক, মানিলেক, বলিলেক ইত্যাদি। আবার ভবিষ্যৎকালের রূপ—জন্মিবেক, হইবেক, আসিবেক ইত্যাদি।

বাক্যসজ্জার দিক থেকেও ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর ধারণাটা স্পষ্ট হয়। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি হল—প্রধান খণ্ডবাক্য + অধীন খণ্ডবাক্যে অথবা অধীন খণ্ডবাক্য + প্রধান খণ্ডবাক্যের ব্যবহার। বর্তমানকালে বাক্যের তন্বীরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ছোট ছোট সরল বাক্য, তার সঙ্গে সহজ-সরল আটপৌরে শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণ মানুষ হয়তো লিখবেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং ....' আর কালিদাস লিখবেন 'নীরস ঃ তরুবরঃ.....। এই পার্থক্যই ব্যক্তিশৈলীর মূল কথা। আর ভাষা প্রয়োগের তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি বা যুগের শৈলী সন্ধানই শৈলীবিজ্ঞানের উপজীব্য।

৭.৪.১৪.৯ : উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতিতে আলোচনা করাই শৈলীবিজ্ঞানের কাজ। এর ফলে সাহিত্য সমালোচনা হয়ে ওঠে তন্ময় ও বৈজ্ঞানিক। শৈলীবিজ্ঞান একদিকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় বাক্যের রূপগত ও অর্থগত দিকটি আলোকিত করে তোলে। অন্যদিকে পরিসংখ্যানের সহায়তায় শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এটা ঠিক, লেখকের বিষয় এ রচনাভেদে শৈলী বিভিন্ন প্রকার হয় বলে 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটি সর্বজনসম্মত নয়। যদিও সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা বাংলায় বেশি দেখা যায় না। তবুও বিতর্কাভাস সম্ভাব্য জেনেও 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। আমাদের এই প্রশ্নের মীমাংসা তখনই হবে যখন 'শৈলীবিজ্ঞান' নিত্য-অনুশীলন সাপেক্ষ একটি শৃঙ্খলায় পরিণত হবে।

৭.৪.১৪.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। শৈলী বলতে কী বোঝো? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলীর স্বরূপ আলোচনা করো।

২। শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করে শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব আলোচনা করো।

৩। শৈলী সৃষ্টিতে কাব্যের মধ্যে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। শৈলী থেকে কীভাবে শৈলীবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে? একই সঙ্গে উপন্যাসে শৈলীসৃজনে বাক্যর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৫। শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপত আলোচনা করে ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর পরিচয় দাও।

৮.৪.২.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ্, পুস্তক বিপণি।

২। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৩। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

৪। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

৫। শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিষ দে, পুস্তক বিপণি।

———————

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

সপ্তম পত্র

বিশেষ পত্র – নাট্যসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রেজাউল করিম - অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ড. প্রবীর প্রামাণিক - অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

চতুর্থ ষাণ্মাসিক বা চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : নাট্যসাহিত্য

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. বাংলার বিদেশি রঙ্গালয়

একক ২. লেবেডফ

একক ৩. শখের নাট্যশালা

একক ৪. যাত্রাভিনয়

একক ৫. পেশাদারি নাট্যশালা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৬. গণনাট্য, নবনাট্য

একক ৭. গ্রুপ থিয়েটার

একক ৮. থার্ড থিয়েটার

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. নাটক ও নাটকীয়তা

একক ১০. নাটকে ঘটনা, গতি

একক ১১. সংঘর্ষ, কৌতূহল

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১২. ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ

একক ১৩. ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন, অতিনাটক

একক ১৪. প্লট, চরিত্র, সংগীত, দৃশ্য

একক ১৫. সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক

একক ১৬. ক্ল্যাসিক ও রোমাণ্টিক নাটক, রূপক ও সাংকেতিক নাটক, একাঙ্ক নাটক

বিশেষ পত্র : নাট্যসাহিত্য

সপ্তম পত্র

সূচিপত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)	**পাঠপ্রণেতা**	**পৃষ্ঠা**
একক ১. বাংলার বিদেশি রঙ্গালয়	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৫- ১৩
একক ২. লেবেডফ	ড. প্রবীর প্রামাণিক	১৪-২২
একক ৩. শখের নাট্যশালা	ড. প্রবীর প্রামাণিক	২৩-৪১
একক ৪. যাত্রাভিনয়	ড. রাজশেখর নন্দী	৪২-
একক ৫. পেশাদারি নাট্যশালা	ড. প্রবীর প্রামাণিক	৪০-৪৯
পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৩ ঘণ্টা)		
একক ৬. গণনাট্য, নবনাট্য	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০-৫৬
একক ৭. গ্রুপ থিয়েটার	ড. শ্রাবন্তী পান	৫৭-৬৩
একক ৮. থার্ড থিয়েটার	ড. শ্রাবন্তী পান	৬৪-৭৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৩ ঘণ্টা)		
একক ৯. নাটক ও নাটকীয়তা	ড. রেজাউল করিম	৮০-৮৪
একক ১০. নাটকে ঘটনা, গতি	ড. রেজাউল করিম	৮৫-৮৮
একক ১১. নাটকে সংঘর্ষ, কৌতূহল	ড. রেজাউল করিম	৮৮-৯৩
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)		
একক ১২. ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ	ড. শ্রাবন্তী পান	৯৪-১০০
একক ১৩. ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন, অতিনাটক	ড. রেজাউল করিম	১০১-১০৭
একক ১৪. প্লট, চরিত্র, দৃশ্য সংগীত	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. শ্রাবন্তী পান	১০৮-১১৫
একক ১৫. সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৫-১২০
একক ১৬. ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক নাটক, রূপক ও সাংকেতিক নাটক, একাঙ্ক নাটক	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ড. শ্রাবন্তী পান	১২১-১২৯

বিশেষ পত্র : নাট্যসাহিত্য
সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ১
বাংলার বিদেশি রঙ্গালয়

বিন্যাসক্রম :

৭.১.১.১ ভূমিকা

৭.১.১.২ ওল্ড প্লে হাউস

৭.১.১.৩ দি নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার

৭.১.১.৪ মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার

৭.১.১.৫ হোয়েলার প্লেস থিয়েটার

৭.১.১.৬ এথেনিয়াম থিয়েটার

৭.১.১.৭ চৌরঙ্গী থিয়েটার

৭.১.১.৮ দমদম থিয়েটার

৭.১.১.৯ বৈঠকখানা থিয়েটার

৭.১.১.১০ সাঁ সুসি থিয়েটার

৭.১.১.১১ লেবেডফ বেঙ্গলী থিয়েটার

৭.১.১.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১.১.১৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.১.১.১ ঃ ভূমিকা

জোব চার্নক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন সাধারণ কর্মচারী হয়ে এদেশে আসেন ১৬৮৫ সালের নভেম্বর মাসে। ইনিই কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কলকাতা শহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বস্তুত সেদিন থেকেই বাংলার প্রাণকেন্দ্র রূপে কলকাতা শহরের গড়ে ওঠা শুরু। ফলে পাশ্চাত্য অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমরা ক্রমশ পরনির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকি। রঙ্গালয় তথা নাট্যশালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রঙ্গালয় স্থাপনের মূল উদ্যোগও নিয়েছিলেন বৃটিশরা। প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্য করতে এলেও, শুধুমাত্র ব্যবসাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, কূটনৈতিক কলাকৌশল নিয়ে থাকলেও ইংরেজরা মূলত ছিল রস পিপাসু, থিয়েটারের ঐতিহ্যও তাদের অনেকদিনের। ফলে বিনোদনের অভাব তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল প্রতিনিয়ত। আর সেই অভাব থেকেই, এ দেশে জন্ম নেয় রঙ্গ ালয়। মনে রাখতে হয়, সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ ব্যবহার করা হলেও আমাদের দেশীয় অভিনয়ের জন্য কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। তখন রাজা, মহারাজা, জমিদার তথা ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছা মতো আসর বসাতেন। চারদিক খোলা মঞ্চে চন্ডীমন্ডপ বা ঐ জাতীয় কোনো স্থানে অভিনয় হত। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজ কোনোদিনই এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়নি। সাধারণত অশিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ছিল এর পক্ষে। ফলে কোনোভাবেই ইংরেজদের প্রচেষ্টার পূর্বে কোনো স্থায়ী মঞ্চের স্বপ্ন দেখিনি আমরা।

১. লেবেডেফের আগে পর্যন্ত আমাদের ইংরেজি নাট্যমঞ্চগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশি রঙ্গমঞ্চের মডেলকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

২. নাট্যমঞ্চগুলির অভিনয় পরিচালনা এবং সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হত বিদেশি অভিনেতা এবং বিদেশের নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত ভাবনার উপর। আলোকসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আমাদের প্রাথমিক পর্বের নাট্যশালাগুলি ছিল পরনির্ভরশীল।

৩. প্রথম পর্বের ইংরেজি রঙ্গালয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে দর্শকদের ভালো-মন্দের দিকটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখার চেষ্টা করা হত।

৪. বাংলা ভাষায় রচিত বা অনুদিত নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত মুক্তমঞ্চ, যা মূলত নাট্যমন্দির নামে পরিচিত ছিল।

৫. এককথায় ইংরেজ সংস্কৃতি ও বিদেশি রীতিনীতি দ্বারা প্রস্তুত হলেও ওল্ড প্লে-হাউস থেকে সাঁ-সুসি থিয়েটার পর্যন্ত, যে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সন্ধান মেলে, তা আমাদের পরবর্তী নাট্যমঞ্চের অন্যতম সূচনা হিসেবে স্মরণীয়।

৭.১.১.২ ঃ ওল্ড প্লে-হাউস (OLD PLAY-HOUSE)

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা ওল্ড প্লে হাউস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় কলকাতায় ইংরেজদের নির্মিত এই থিয়েটার এবং সংলগ্ন নাচঘর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। এ দেশে তখন কোনো খবরের কাগজ না থাকার জন্য রঙ্গালয়টির প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সাল জানা যায় না, জানা যায় না এই নাট্যশালায় অভিনয়ের তথ্যাদিও। তবে ১৭৫৩ সালে যে সেখানে অভিনয় হত তার প্রমাণ রয়েছে। ১৭৫৭ সালে উইলের আঁকা কলকাতার মানচিত্রে দেখা যায় ৮, নম্বর লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জার বিপরীত দিকে ওল্ড প্লে হাউস নামক রঙ্গালয়ের অবস্থান। প্রথম এই নাট্যশালার অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যব্যক্তিত্ব ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে তাঁরা বহু পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। খুব সঙ্গত কারণেই এই নাট্যশালার দর্শকরাও ছিলেন বিদেশি। ১৭৫৬ সালের ১৬ই জুন নবাব সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কেল্লার পাশাপাশি ধ্বংস হয়ে যায় ওল্ড প্লে-হাউস।

৭.১.১.৩ ঃ দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার

প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে ভেণ্ডুমাস্টার নামে পরিচিত নিলামাধ্যক্ষ জর্জ উইলিয়ামসন বর্তমান চীনাবাজারের কাছে রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন ১৭৭৫ সালে। নাট্যশালাটি নির্মাণের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস, এলিজা ইম্পে, হাইড, রিচার্ড বারওয়েল প্রমুখ ইংরেজ ব্যক্তিত্ব আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। নাট্যশালাটির ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মি. রেওয়ার্থ। ম্যাসিঞ্জার, শেরিডান, ওটওয়ে, শেক্সপীয়র প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অভিনয় হয়েছিল এই রঙ্গমঞ্চে । হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, দি রিভেঞ্জ, রিচার্ড দি থার্ড, দি ক্রিটিক প্রভৃতি অভিনয়ে রাতের পর রাত মাতিয়ে রাখা এই রঙ্গমঞ্চে টিকিটের মূল্যও ছিল অত্যধিক বেশি, বক্সের জন্য একটি সোনার মোহর এবং পিটের জন্য আট সিক্কা টাকা। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের মতো দি নিউ প্লে-হাউসকে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল সংগঠকদের। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সাহায্য ও উপদেশ, ম্যাসিংগারের আঁকা দৃশ্যপট এই মঞ্চের গর্বের বিষয় ছিল। সেই সময়ের বহু অভিজাত ইংরেজরা এই নাট্যমঞ্চের সদস্যদর্শকও হয়েছিলেন। এই রঙ্গালয়ের শিল্পীরাও ছিলেন অ্যামেচার। দি নিউ প্লে-হাউস - এ অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ব্যান্ডেল, রবিনসন, পোলার্ড, মিসেস হরিটো, মিসেস বেসেট প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রথম দিকে নারীর ভূমিকায় পুরুষেরা অভিনয় করলেও পরে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদেরও আবির্ভাব ঘটে। মিসেস ব্রিস্টো এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাফল্যের সাথে এগিয়ে গেলেও

ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল নাট্যশালার ঋণের মাত্রা। তাছাড়া হোয়েলার প্লেস থিয়েটার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার সূত্রে এবং প্রচন্ড অর্থাভাবে ১৮০৮ সালে এই দি নিউ প্লে-হাউস নাট্যালয়টি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গোপীমোহন ঠাকুর এই রঙ্গমঞ্চটি কিনে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

৭.১.১.৪ ঃ মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (MRS. BRISTO'S PRIVATE THEATRE)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে প্রথম বিদেশি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারটির নাম মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার। প্রতিষ্ঠাতা নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী মিসেস এমা ব্রিস্টো-র চৌরঙ্গীর বাড়িতে ১৭৮৯ সালে ১লা মে 'পুত্তর সোলজার' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা নাট্যশালাটির সূচনা। 'পুয়োর সোলজার' নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। স্মরণীয় যে এই নাট্যশালায় পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নারীরা। এরপর এই নাট্যশালায় অভিনীত অন্যান্য নাটকগুলি যথাক্রমে 'জুলিয়াস সীজার', 'দি সুলতান', 'দি প্যাডলক'। মিসেস ব্রিস্টো ১৮৯০ সালে লন্ডন চলে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায় এই নাট্যশালাটি।

৭.১.১.৫ ঃ হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (WHELER PLACE THEATRE)

১৭৯৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস রোডে মূলতঃ অভিজাতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হোয়েলার প্লেস থিয়েটার। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাউন্সিলের এক নামজাদা সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলারের নামে নামকরণ হয় নাট্যশালাটির। তখনকার সময়ে ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এই নাট্যশালাটির। হোয়েলার প্লেস নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয় 'দি ড্রামাটিস্ট'। প্রবেশপত্রের দাম ধার্য হয় এক সোনার মোহর। এরপর একে একে অভিনয় হয় 'দি মোগল টেল', 'দি মাইনর', 'থ্রি উইক্স আফটার ম্যারেজ', 'ক্যাথারিন অ্যান্ড পেট্রুসিও', 'দি লায়ার', 'দি ক্রিটিক' প্রভৃতি নাটক। দর্শকদের আকর্ষণের জন্য এই থিয়েটারের পক্ষ থেকে সিজন টিকিট, বেনিফিট নাটক, প্রবেশ মূল্যের দাম কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা নিলেও, মূলতঃ অর্থের অভাবে ১৭৯৮ সালে বন্ধ হয়ে যায় নাট্যশালাটি।

৭.১.১.৬ ঃ এথেনিয়াম থিয়েটার (ATHENEUM THEATRE)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি স্মরণীয় প্রয়াস এথেনিয়াম থিয়েটার। ১৮০৮ সালে দি নিউ প্লে-হাউস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় কিছুদিনের জন্য নাট্যশালার অভাব দেখা দেয়। থিয়েটার অনুরাগী

মি: মরিস ১৮১২ সালের ১৯ শে মার্চ 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি নতুন নাট্যশালা স্থাপনের প্রচেষ্টা করেন। ১৮ নং, সার্কুলার রোডে দু'শ আসনবিশিষ্ট সেই নাট্যশালাটির এথেনিয়াম থিয়েটার নামে ৩০শে মার্চ উদ্বোধন হয়। টিকিটের দাম ঠিক করা হয় এক সোনার মোহর। প্রথম রাতে অভিনয় হয় বিয়োগান্তক নাটক 'আর্ল অফ এসেক্স' এবং একটি প্রহসন 'রেজিং দি উইণ্ড'। ৩০শে মার্চ দর্শক আসনের কোনোটিই শূন্য ছিল না। কিন্তু অভিনয় দর্শকদের হতাশ করে। এরপর নাট্যশালাটি সম্পর্কে এবং অভিনয় সম্পর্কে নানারকম বিদ্রূপ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবু মি: মরিস এই মঞ্চেই একে একে মঞ্চস্থ করেন 'হ্যামলেট' (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪), 'লাইং ভালেট' (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪), জন হোমস্-এর বিয়োগান্তক নাটক 'ডগলাস' (আগস্ট, ১৮১৪), 'আর্ল অফ ওয়ারউইক' (নভেম্বর, ১৮১৪), 'দি ম্যাজিক পাইপ' (নভেম্বর, ১৮১৪)। কিন্তু বারবারই দক্ষ অভিনয়ের অভাবে নাটকগুলি দর্শক মন জয় করে মঞ্চ সফল হতে পারেনি। এরই মাঝে ১৮১৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় এথেনিয়াম থিয়েটারের মালিকানা বদলের কথা। মূলতঃ আর্থিক অভাব, সফল অভিনয়ের অভাবে এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বারবার চেষ্টা করেও মি: মরিস নাট্যশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।

৭১.১.৭ ঃ চৌরঙ্গী থিয়েটার (CHOWRINGHEE THEATRE)

চৌরঙ্গী আর থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে (শেক্সপীয়র সরণী) ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের অন্যতম নাট্যশালা চৌরঙ্গী থিয়েটার। নাট্যরসিক এবং অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্য হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন, পণ্ডিতপ্রবর হোরেস হেম্যান উইলসন, 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্টোকলার, হেনরী মেরেডিথ পার্কর, চতুর্থ উইলিয়মের একমাত্র পুত্র জর্জ ফিজ ক্লেয়ারেন্স, চার্লস প্রিন্সেস, উইলিয়ম লিন্টন প্রমুখ বিদেশি ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা, প্রচেষ্টা তথা উদ্যোগ কাজ করেছিল, এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পিছনে। চৌরঙ্গী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশীয়দের মধ্যে একমাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। বড়লাট লর্ড ময়রা এবং লেডি ময়রার উপস্থিতিতে ১৮১৩ সালের ২৫শে নভেম্বর যথেষ্ট জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয় নাট্যশালাটির। প্রথম রাতে মঞ্চস্থ হয় বিয়োগান্তক নাটক 'কাস্‌ল স্পেকটার' এবং গীতবহুল নাটিকা 'সিক্সটি থার্ড লেটার'। অভিনয় সফল হয়েছিল; দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং অর্কেস্ট্রাবাদনেরও বিশেষ প্রশংসা হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী স্টোকলার, ডয়েলী, লিন্টন, মিসেস এসথার লীচ, মিসেস ফ্যান্সিস প্রমুখেরা অভিনয় করেছিলেন উদ্বোধনের রাত্রে। পরেও একটার পর একটা মঞ্চ সফল অভিনয়ের (ওথেলো, লেডি অব লায়ন্স, দি ওয়াইফ, দি মার্চেন্ট অব ভেনিস, ম্যাকবেথ, দি আয়রল চেষ্টা, বিজি বডি প্রভৃতি) দ্বারা চৌরঙ্গী থিয়েটারের সাফল্যের পালা অব্যাহত থাকে। নাট্য কুশলিনী অনেক অভিনেত্রীরও সমাগম হয়েছিল এই মঞ্চে; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিসেস ফ্রান্সিস, গট্‌লিয়েবও, মিসেস চেস্টার প্রমুখ। বিশেষকরে সেই শতকের গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রী মিসেস এসথার লীচের জন্য চৌরঙ্গী থিয়েটারের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। তবে এই নাট্যশালার আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই

সুস্থ ছিল না। ক্রমশ ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে নাট্যশালা চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং রঙ্গালয়টিকে নিলামে তোলা হয় বিক্রির জন্য। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ত্রিশ হাজার একশ টাকার বিনিময়ে কিনে নেন রঙ্গালয়টি। অভিনয়, দৃশ্যপট, সাজসজ্জার উন্নতি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৮৩৯ সালের ৩১শে মে রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নাট্যশালাটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিদেশিদের নির্মিত ও অভিনীত উনিশ শতকের অন্যতম নাট্যশালা চৌরঙ্গী থিয়েটারের এই ভাবেই অবসান ঘটে।

৭.১.১.৮ ঃ দমদম থিয়েটার (DUM DUM THEATRE)

কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে একটি সেনাবাহিনীর ছাউনিতে ১৮১৭ সালে গড়ে উঠেছিল একটি ছোট্ট নাট্যশালা দমদম থিয়েটার। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নাট্যশালা ড্রুরি লেন থিয়েটারের নাম অনুসারে কলকাতার সে সময়ের পত্রপত্রিকাগুলোতে নাট্যশালাটিকে লিটল ড্রুরি নামে সম্বোধন করা হত। চৌরঙ্গী থিয়েটারের যখন খুব সুনাম চারদিকে, তখন দমদম থিয়েটারও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। দমদম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ছিলেন সৈনিকেরা। সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের স্ত্রীরা এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন। দমদমে অবস্থিত এই নাট্যালয়টি আকারে ছোট হলেও ছিল বেশ সুন্দর। গোলন্দাজ সৈনিক চার্লস ফ্রাঙ্কলিং এই নাট্যশালার একজন কুশলী অভিনেতা ছিলেন। মিসেস এসথার লীচ চৌরঙ্গী থিয়েটারে যাওয়ার অগে এই নাট্যশালাতেই অভিনয় করতেন। দমদম থিয়েটারে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রীরা ছিলেন মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গট্‌লিয়ের, মিসেস ব্ল্যাণ্ড। দমদম নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল রাইভ্যাসস, দি উইল, ব্রোকন সোর্ড, দি পেজেন্স বয় প্রভৃতি নাটক। ১৮২৪ সালে চালর্স ফ্রাঙ্কলিং- এর মৃত্যুর পরপরই এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

৭.১.১.৯ ঃ বৈঠকখানা থিয়েটার (BOITHAKKHANA THEATRE)

চৌরঙ্গী থিয়েটারের সুখ্যাতির কালেই ১৮২৪ সালের ২৪শে মে ১৭৭ নং বৈঠকখানা রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় বৈঠকখানা থিয়েটার। বাইরে থেকে সুন্দর না হলেও এই নাট্যালয়ের ভিতরের সাজসজ্জা ছিল যথেষ্ট সুন্দর। মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস কোহেন প্রমুখ অভিনেত্রীরা দমদম থিয়েটার থেকে এসে বৈঠকখানা থিয়েটার যোগ দেন। 'থ্রি উইক্‌স আফটার ম্যারেজ', 'স্লিপিং ড্রাফ্‌ট', 'বোম্বাসীটস', 'ফিউরিওসো', 'রম্প, দি লাইং ভ্যালেট', 'রেজিং দি উইণ্ড' প্রভৃতি নাটকের সার্থক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নাট্যশালাটি বেশ' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রবল সাফল্যের পাশাপাশি, প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারার কারণে, কিছুদিনের মধ্যেই বৈঠকখানা থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়।

৭১.১.১০ঃ সাঁ সুসি থিয়েটার (SANS SOUCI THEATRE)

চৌরঙ্গী থিয়েটার আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর নাট্যরসিক মানুষজন বেশ হতাশ হয়ে পড়েন। আর সেই হতাশা কাটিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মিসেস লীচ ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলে ডালহৌসী অঞ্চলে ওয়াটারলু স্ট্রীট ও গভর্নমেন্ট হাউস ইস্টের কোণে থ্যাকার কোম্পানীর দোকানের নীচে গড়ে ওঠে সাঁ সুসি থিয়েটার। এই নাট্যশালা নির্মাণে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন মি. স্টোকলার। নাট্যালয়ে প্রবেশপত্রের মূল্য ছিল স্টলের জন্য ছ'টাকা বক্সের জন্য পাঁচ টাকা এবং আপার বক্সের জন্য চার টাকা। প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ থাকত। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে (চৌরঙ্গী থিয়েটার) প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম রজনীতে (২১শে আগস্ট, ১৮৩৯) অভিনয় হয়েছিল 'ইউ কান্ট ম্যারি ইয়োর গ্রাণ্ড মাদার' নাটক এবং 'বাট হাইএভার' ও 'মাই লিটল অ্যাডাপটেড' নামে দুটি গ্রহসন। পরবর্তীতে অভিনীত হয় 'ক্যাথেরিন অ্যান্ড প্যাট্রসিও', 'মিন্সট্রেল', 'দি আয়রিশ লায়ন', দি ওয়েদার কক' প্রভৃতি নাটক। নাট্যশালাটি আকারে খুব ছোট থাকার কারণে, বহু দর্শক রোজই নাট্যশালায় এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হত। এই কারণেই মিসেস লীচ বড় প্রেক্ষাগৃহ তৈরির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেন। পার্ক স্ট্রীটে নির্মাণ হয় নতুন নাট্যশালা। এই নবনির্মিত নাট্যশালা নির্মাণে সেদিন অর্থ সাহায্য করেন বড়লাট অকল্যাণ্ড, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জে. পি. গ্রান্ট, রাধানাথ ঠাকুর, স্যার জ্যাসপার নিকল্‌স, হেন্ডারসন, অধ্যাপক গুডিড, রাধামাধব ব্যানার্জি, এইচ. এম. পার্কার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ১৮৪১ সালের ৬ ই মার্চ ওল্ড বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডে (পার্ক স্ট্রীটে, আজ যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ) সাঁ সুসি থিয়েটারের উদ্বোধন হয় 'দি ওয়াউফ' নাটকটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। অভিনয় করেছিলেন মিসেস লীচ, স্টোকলার প্রমুখ শিল্পীরা। নাট্যশালাটির বাইরের এবং ভিতরের সাজসজ্জা তথা সৌন্দর্য মুগ্ধ করত মানুষকে। পরবর্তীকালে জেমস ব্যারী, মিসেস ডীক্‌ল্, মিসেস ডাইনিং, মিস কাউলি, জেমস ভাইনিং প্রমুখেরা এই নাট্যশালায় এসে যোগ দেন। অভিনয় হয় 'চার্লস দি সেকেন্ড', 'দি ওয়েলচ গার্ল, 'স্ট্রোঞ্জার', 'দি জেন্টলম্যান ইন ব্লাক' প্রভৃতি নাটক। ১৮৪১ সালের ২রা নভেম্বর অভিনয়ের সময় মিসেস লীচের পোশাক-পরিচ্ছদে আগুন লেগে যায় এবং ১৮৪৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। মিসেস লীচের হঠাৎ মৃত্যুতে নাট্যমোদী দর্শক বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে নাটকের দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও একে একে এই নাট্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে যান। মিসেস লীচ থেকে নিনা ব্যাক্সটার এবং মিঃ ব্যারীর কাছে নাট্যশালাটি হাতবদল হয়ে ঘুরতে থাকলেও এক অজ্ঞাত কারণে সাঁ সুসি থিয়েটারে দর্শক সংখ্যা আর বাড়ল না। ১৮৪৯ সালে ২১শে মে এই নাট্যশালায় শেষ অভিনয় হয়। অভিনীত হয় 'মিসেস চার্লস গোর দি মেড্ অভ ক্রয়সী' এবং 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসের' কয়েকটি নির্বাচিত অংশ।

সাঁ সুসি থিয়েটার উঠে যাবার পরেও উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় বেশ কয়েকটি বিদেশি নাট্যশালা গড়ে ওঠে। নাট্যশালাগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তারা উল্লেখযোগ্য নাম।

নাট্যশালাগুলি যথাক্রমে সেন্ট থিয়েটার, রয়াল থিয়েটার, জুভেনাইল থিয়োর, অপেরা হাউস, ফোর্ট উইলিয়ামে থিয়েটার রয়াল, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। বস্তুত ইংরেজদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত এদেশের প্রথম পর্বের নাট্যশালাগুলির গুরুত্ব বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অনস্বীকার্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ইতিহাস ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক রীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজদের পরিচালিত রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

৭.১.১.১১ ঃ লেবেডেফ ও বেঙ্গলী থিয়েটার (LEBEDEFF AND THE BENGALEE THEATRE)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে ১৭৯৫ সালে গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ নামে একজন রুশ দেশীয় একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতার ডোমটোলায় (এজরা স্ট্রীট) প্রতিষ্ঠা করেন 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার'। ২৫ নং, ডোমটোলার ভবনটি ছিল জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের। লেবেডেফ মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় গৃহটি অধিগ্রহণ করে, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাঙালীর থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগে ১৭৯৫ সালের ৫ই নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের অনুলিপি এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ :

''MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah.
DECORATED IN THE BENGALIE STYLE
Will be opened very shortly with a play called
THE DISGUISE
The characters to be supported performers of both sexes,
To commence with Vocal and Instrumental Music, called
THE INDIAN SERENADE''

গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়ার ইয়ার শ্লাভল শহরে। খুব ছোট বয়সে চলে আসেন লেলিনগ্রাদে। এখানে শুরু হয় সঙ্গীত শিক্ষা। এরপর ইতালি, ভিয়েনা, প্যারিস, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময় থাকেন তিনি। ১৭৮৫ সালে তিনি আসেন মাদ্রাজে। সেখানে যোগ দেন বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে। ১৭৮৭ সালে তিনি আসেন কলকাতায়। ক্রমশ কলকাতাতে নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনি। এই সময়ই লেবেডেফ থিয়েটার গড়ার সংকল্প করেন। অনুমান করা যায় বঙ্গ সংস্কৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই থিয়েটারের নামও হয় 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার'।

৭.১.১.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলার বিদেশি রঙ্গালয়ের বিবরণ দাও।

৭.১.১.১৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২
লেবেডফ

বিন্যাসক্রম :

৭.১.২.১ ভূমিকা

৭.১.২.২ লেবেডফ : যাত্রা গীতাভিনয় – শৌখিন রঙ্গালয় –পেশাদারী থিয়েটার

৭.১.২.৩ যাত্রা গীতাভিনয় থেকে বাংলা নাটক : সখের নাট্যশালা

৭.১.২.৪ শৌখিন রঙ্গালয় ও বাঙালি নাট্যকার

৭.১.২.৫ পেশাদার থিয়েটারের যাত্রা শুরু

৭.১.২.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১.২.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.১.২.১: ভূমিকা

বাংলা নাট্যশালার উপর নানা প্রবন্ধ লেখা হতে পারে। এখানে এ জাতীয় প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি বোঝাবার জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ তুলে ধরা হল।

৭.১.২.২: লেবেডফ : যাত্রা - গীতাভিনয় — শৌখিন রঙ্গালয় - পেশাদারী থিয়েটার

বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুশো পূর্ণ হয়েছে ১৯৯৫ সালে। এটি যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে সন্দেহ নেই, কেননা ১৭৯৫ সালে লেবেডফের থিয়েটার শুরু হওয়ার আগে বিদেশী রঙ্গালয়ে বিদেশী নাটকের অভিনয় হলেও বাংলা ভাষায় সেটি প্রথম নাট্যপ্রযোজনা। আর একটি কথাও পরিষ্কার হওয়া দরকার, লেবেডফ বিদেশী নাটককে বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করান ; কাজেই ঠিক বাংলা নাটকের দুশো বছর পূর্তি বলে চারদিকে যে হৈ চৈ হচ্ছে তা যথাযথ নয়। লেবেডফ কোনো মৌলিক বাংলা নাটক করলেই কেবল সে দাবী করা চলত।

এবার আমাদের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আগে বলে নিতে চাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শিশির বসু, অজিতকুমার ঘোষ ও দর্শন চৌধুরী বাংলা থিয়েটার ও বাংলা নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি আকর গ্রন্থ ইতিমধ্যেই লিখেছেন। কাজেই বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং দুশো বছরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা থিয়েটারকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয়টি নেওয়া যাক।

লেবেডফের নাম সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আমরা সব সময়ই স্মরণ করব কেননা আর দশজন বিদেশী মিশনারীদের মত তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোনো অর্থানুকুল্য পাননি শুধু নয়, ব্রিটিশদের বিরোধিতায় তাঁর কপালে কষ্ট জুটেছিল। এই মানুষটি রুশ, ইংরাজি, সংস্কৃত, তামিল ও বাংলা ভাষা জানতেন কিন্তু রাশিয়া বা মাদ্রাজে কোনো নাটক অভিনয় করেননি, বরং কোলকাতায় এসে বাসা বাঁধলেন ২৫ নম্বর ডোমটোলায়, বাঙালী দর্শক তৈরী করবার জন্য, রঙ্গশালার নাম দেন *'The Bengali Theatre'*। যে সব বাঙালী দর্শক এতদিন *Old play House, The New play House, Calcutta Theatre, Mrs. Bristo's Private Theatre* -এ ইংরেজ দর্শকের পাশে বসে নাটক দেখে নিজেদের সম্মানিত মনে করতেন তাঁরা ঐসব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শেক্সপীয়রের *'The Merchant of Venice'*, সেরিডানের *'School for Scandal'*, টমাস অটওয়ের *'Venice Preserved'* ইত্যাদির নাট্যরস আদৌ কতদূর অনুধাবন করতে পারতেন সন্দেহ আছে। তবে তাঁদের যে নাট্যতৃষ্ণা কম নয় তা লেবেডফ বুঝেছিলেন। তাই তিনি প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হন।

এই যে আমরা দুশো বছর পরেও লেবেডফের নাম স্মরণ করছি তা কিন্তু তাঁর প্রযোজনার রজনী-সংখ্যার উপর দাঁড়িয়ে নয়। তাঁর উদ্যোগে ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেল-এর লেখা *'The Disguise'*-এর প্রথম অভিনয় হয় ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫। এর দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ২১ মার্চ, ১৭৯৬। নাটকটির

অনূদিত নাম 'কাল্পনিক সংবদল' এবং এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরবর্তীকালে বার হয়। কিন্তু তৃতীয়বার অভিনয়ের আগেই রঙ্গমঞ্চটি আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। এর কারণটি এতাবৎ কেউ খুঁজতে চাননি, অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতেই পারে।

যেমন, লেবেডফ প্রথমেই কোনো মঞ্চ স্থাপনের চেষ্টা করেননি। তিনি ক্যালকাটা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা নাটকটি অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চটি ব্যবহারের অনুমতি চান। হেস্টিংস, বারওয়েল, স্যার এলিজা ইম্পের মত রক্ষণশীল ইংরেজরা ছিলেন সেই মঞ্চের পৃষ্ঠপোষক। জমজমাট ভীড় হত সেই প্রেক্ষাগৃহে। তারা লেবেডফকে মঞ্চ ব্যবহারের সুযোগ দেবে কেন ? বাধ্য হয়ে লেবেডফ বর্তমানে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ক্যালকাটা থিয়েটারের কাছেই ডোমটোলায় (বর্তমানে এজরা স্ট্রীট) 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার সূত্রে ক্যালকাটা থিয়েটারে বাঙালী দর্শক কমতে থাকে। সস্তা নাটক দেখিয়েও যখন দূরবস্থা কাটাতে পারল না ক্যালকাটা থিয়েটার, তখন সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল লেবেডফের উপর। ক্যালকাটা থিয়েটারের ম্যানেজারই কি এই নাট্যাঙ্গনটি ধ্বংসের কারণ? — এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা ক্যালকাটা থিয়েটারের দৃশ্যপট পরিকল্পনার সাফল্য, ব্যাণ্ডেল, পোলার্ড, খ্রিট উড, রনিসন প্রমুখের অভিনয় কৌশল, নৃত্যগীত পরিকল্পনা ইত্যাদি ছোটো করে দেখছি না ; কিন্তু লেবেডফের প্রতি, বিশেষ করে তার ম্যানেজার মিঃ রোওয়ার্থ-এর আচরণ রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'ছোটো ইংরাজ'-এর অভ্রান্ত নিদর্শন।

আর একটি বিষয়ও এক্ষেত্রে বিচার্য হতে পারে। লেবেডফ বাঙালী দর্শকদের মত ইংরেজী দর্শকদেরও আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালান। সাহেবদের জন্য অনূদিত বাংলা নাটকের একটি ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার বিলি করা হয়। ২১ মার্চের অভিনয়রাত্রে তিন অঙ্কের নাটকটির বাংলা প্রযোজনার মাঝে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি অভিনয় করে দর্শকদের খুশি করা হত।

যাই হোক, লেবেডফ যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারতবর্ষ ত্যাগ না করতেন তাহলে হয়ত বাংলা নাটক ও নাট্যশালার যৌবন বিলম্বিত হত না। যেমন ঃ

(ক) তিনি অনূদিত নাটকের পাশাপাশি মৌলিক বাংলা নাটক লেখাতে পারতেন ;

(খ) বাংলার শৌখিন রঙ্গালয়েও অভিনেত্রীদের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হতে পারত ;

(গ) লেবেডফ নিজে সংগীত শিক্ষক ছিলেন এবং দেশী বিদেশী যন্ত্রসঙ্গীতেরও ব্যবহার জানতেন, কাজেই তাঁর প্রযোজনাগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। ইংরেজরা তা বুঝেছিল বলেই ক্যালকাটা থিয়েটারের টমাসরোওয়ার্থ-জোসেফ ব্যাটেল-এর চক্রান্তে, এমনকি কোম্পানীর আদালতও যোগ দেয়। চুক্তিভঙ্গকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিচারে শাস্তি পেল না, ইংরেজ উকিলরা লেবেডফের পক্ষে দাঁড়াল না, বিচার হল না তাঁর থিয়েটার ভস্মকারীদের। সর্বহারা লেবেডফ-শূন্য রঙ্গশালা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের সম্ভাবনা প্রায় সাতটি দশক পিছিয়ে গেল।

৭.১.২.৩:যাত্রা-গীতাভিনয় থেকে বাংলা নাটক : সখের নাট্যশালা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একদল ইংরেজী জানা বাঙালী সাহেবদের থিয়েটারে হাজির হয়ে শেক্সপীয়র, সেরিডান, কোলম্যান, ফ্লেচার ইত্যাদি আরও নানা বিদেশী নাট্যকারের বিখ্যাত নাটকগুলি দেখতে হাজির হতেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, সাঁ সুসি থিয়েটার, ড্রামাণ্ডস একাডেমি, জুভেনাইল থিয়েটার, সেন্ট জেমস থিয়েটার কিংবা থিয়েটার রয়ালে একটিও বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি। আর থিয়েটারের টান না থাকলে নাট্যকার জন্ম নেবেই বা কেন ? অথচ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ কেবল চৌরঙ্গী থিয়েটারের পরিচালকমণ্ডলীতেই ছিলেন না, পরে তার মালিকও (১৮৩৫-৩৯) হয়েছিলেন। তার উপর তিনি ড্রামাটিক সোসাইটির সদস্যও। সাঁ সুসি থিয়েটারে বড়লাট অকল্যান্ডের মতই দ্বারকানাথও একহাজার টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। তিনি চেষ্টা করলেই কোনো বাঙালীকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে তা মঞ্চস্থ করাতে পারতেন। রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ রায় ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের মত মহারাজারাও সে সুযোগ তৈরী করতে পারতেন। বিদেশী রঙ্গালয়ে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য যদি সাধারণ বাঙালী হয়ে 'ওথেলো' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন ইংরেজদের নানা বাধার মোকাবিলা করে, তাহলে চাপ সৃষ্টি করে বাংলা নাটক লিখিয়ে মঞ্চস্থ করাও অসাধ্য ছিল না।

ভাগ্য ভালো মিসেস লীচ, মিসেস স্টোকলার, মিসেস ব্যারী জেমস ভাইকিং প্রমুখ নাট্যব্যবসায়ীরা দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন বা নাট্যাভিনয় ছেড়ে দিচ্ছিলেন, অন্যথায় বাংলা নাটক রচনা আরও বিলম্বিত হতই।

উচ্চাঙ্গের বাংলা নাটক রচনা অথবা পেশাদারী প্রক্রিয়ায় তার উপস্থাপনায় দেশীয় বাধাও এসেছিল মূলত যাত্রার কাছ থেকে। মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রার বদল ঘটিয়ে উনিশ শতকে যে সখের যাত্রা জন্ম নিয়েছিল তাও কেবল ধনী বাঙালীদের ঠাটবাট-জাঁকজমকের পথই ধরেছিল। কোনো মঞ্চ ব্যবস্থা নয়, উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশনও নয়, ইয়ংবেঙ্গলরা যে এই নতুন যাত্রার বিরোধী হয়েছিল তা অসঙ্গত ছিল না। যাত্রাগুলির সঙ্গে আঙ্গিকগত কারণেই, থিয়েটারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই নাটক ও নাট্যশালার প্রয়োজন ঘটলো। ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬৬ বঙ্গাব্দের 'সংবাদ প্রভাকর' সঠিকভাবেই লিখেছিল : "প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যত তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

এর আগেই, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি এনে আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেছিলেন। দৃশ্যপট, ঐকতান, বাদন, সবই ছিল। কিন্তু পুরনো কাহিনী নিয়ে নাটক 'বিদ্যাসুন্দর' আর যাত্রা থেকে আমদানি করা কালুয়া ভুলুয়ার মত চরিত্র। এভাবেই নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাকি একটি শৌখিন থিয়েটার খোলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রেরণায়, কিন্তু বিশদ কিছু আর জানা যায় না। প্যারীমোহন বসুর 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' (১৮৫৪), আশুতোষ দেবের (লাটুবাবু) বাড়ির থিয়েটার (১৮৫৭), রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা (১৮৫৭), গঙ্গাধর শেঠের বড়বাজারের বাড়ির রঙ্গশালা (১৮৫৮), চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

(১৮৫৬), পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, রামগোপাল মল্লিকের চিৎপুরের বাড়িতে মেট্রোপলিটন থিয়েটার (১৮৫৯), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়' (১৮৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫), ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা (১৮৬৫), বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৮), বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (১৮৬৮) সম্পর্কে এতাবৎ যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ একারণেই, বাঙালী নাট্যকারদের নাটক রচনায় অনুপ্রেরিত করা। বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার তাগিদ এগুলি থেকেই শুরু হয়।

৭.১.২.৪:শৌখিন রঙ্গালয় ও বাঙালী নাট্যকার ঃ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে শৌখিন রঙ্গালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকরা অবসর বিনোদনের জন্য নিজেদের পছন্দমত অভিনেতাদের নিয়ে অতি পরিচিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন ; যদি তাও হয় তাহলেও প্রকারান্তরে বাংলা নাটক রচনায় তাঁরা উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন একথা সত্য। বিভিন্ন শৌখিন রঙ্গালয় যেসব সুপরিচিত নাট্যকারের নাটক সেকালে প্রযোজনা করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া দরকার।

নন্দকুমার রায় কর্তৃক কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অনুবাদ — সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা।

মণিমোহন সরকার — কৃত বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুসরণের 'মহাশ্বেতা' নাটক — ঐ।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' — রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা।

ঐ — বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা।

ঐ — চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা।

রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহারে'র অনুবাদ — বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রীসত্যবান' — ঐ

রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র অনুবাদ — বেলগাছিয়া নাট্যশালা।

মধুসূদন দত্তর 'শর্মিষ্ঠা' — ঐ

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক — মেট্রোপলিটান থিয়েটার।

রামনারায়ণের প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' — পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গরঙ্গালয়।

রামনারায়ণ কৃত ভবভূতির 'মালতীমাধবে'র অনুবাদ, 'রুক্মিনীহরণ', 'উভয়সঙ্কট' — ঐ।

মধুসূদন দত্তর 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' — শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি এবং ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা।

মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' ও 'সতী' নাটক — বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়।

এছাড়াও আরও নানা নাটক প্রযোজনা থেকে বোঝা যাবে বাংলা মৌলিক নাটক রচনার তাগিদ পৃষ্টপোষকরা নাট্যকারদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, শৌখিন রঙ্গালয়গুলির মঞ্চ ব্যবস্থা ও অন্যান্য নাট্যরীতি সংস্কৃত অনুশাসন ভেঙে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিকে আত্মস্থ করতে শুরু করে। আর তারই ফলে মধুসূদন থেকে পরবর্তী নাট্যকারগণ দেশীয়রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতি মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ বাংলা নাট্যধারার ভিত তৈরী করেন। সখের নাট্যশালাগুলির অবশ্যই সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু পরবর্তী পেশাদারী-অপেশাদারী থিয়েটারের অগ্রগতিতে এবং বাংলা নাট্যশাখার সমৃদ্ধির পিছনে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৭.১.২.৬: পেশাদার থিয়েটারের যাত্রা শুরু ।

১৮৭২-এ ৭ ডিসেম্বর বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সেই কবে, লেবেডেফের থিয়েটারে বাঙালী টিকিট কেটে নাটক দেখেছিল, সাতাত্তর বছর পরে বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মত মধ্যবিত্ত যুবকরা আবার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করে তাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, সুলভ সমাচার, ইংলিশম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন-বিবরণ এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির স্মৃতিকথা জড়ো করলে দেখা যাবে :

১. ন্যাশনাল থিয়েটারের টিকিটের মূল্য কম ছিল না। রিজার্ভ সিট ২ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৫ আনা।

২. সাধারণ দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা হয়নি, বরং ভাবা হয়েছিল টিকিট কিনতে হবে ভাবলে অনেকে পিছিয়ে যাবেন এবং সেক্ষেত্রে দর্শক সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩. প্রথম প্রযোজনা 'নীলদর্পণ'। তারপর সোওয়া মাসের মধ্যে বিভিন্ন নাট্যকারের লেখা 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'নবনাটক', 'নয়শো রূপেয়া', 'জামাই বারিক'। এছাড়া নাটিকা 'মুস্তাফি সাহেবের পাক্কা তামাসা', 'কুজ্জার কুঘটন', 'নববিদ্যালয়', 'পরীস্থান'। সব মিলিয়ে পুরোনো কলকাতার বুকে জমজমাট নাট্য আসর।

কিন্তু ৮ মার্চ, ১৮৭৩-এ প্রথম পর্বের শেষ অভিনয় হওয়ার পর দল ভেঙে গেল। এর পিছনে রয়েছে নানা কারণ। যেমন সংগঠকদের মধ্যে কারও অর্থলোভ, কারও কর্তৃত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, কারও খ্যাতিলাভের বাসনা, আবার একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের লড়াই।

এরপর গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার — সবগুলিরই প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকেই। এইসব থিয়েটারে নানা রজনীতে রকমারি ঘটনা ঘটত। প্রতিটি নাট্যশালারই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ছিল। এক একটি নাট্যশালায় এক একজন নাট্যকার তাঁদের নাটক প্রযোজনার সুযোগ পেতেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ প্লে-রাইট। আজ শতবর্ষ - অতিক্রান্ত সেইসব থিয়েটারের প্রত্যেকের অবদান, আমরা স্মরণ করি। সেগুলি নিয়ে গবেষণা আজও শেষ হয়নি। তবে এইসব থিয়েটার সম্পর্কে যেসব তথ্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করছি :

বাঙালী যুবকদের প্রচণ্ড আত্মদানে সৃষ্ট ন্যাশনাল থিয়েটার যখন নীলাম হয় তখন অবাঙালী প্রতাপচাঁদ জহুরী তা কিনে নেন। ব্যবসায়িক কারণে সাধারণ রঙ্গালয় তার প্রতিবাদী উদ্দেশ্য হারাল। এই থিয়েটারের সূচনা তো হয়েছিল গণভিত্তিক নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়ে। পরে সেখানে পৌরাণিক নাটকের রমরমা। প্রতাপচাঁদ অবশ্য দর্শকদের বেলেল্লাপনা বন্ধ করতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু গিরিশের সঙ্গে তাঁর বিরোধের পিছনে তাঁর মাতব্বরি কম ছিল না। তা ছাড়া তিনি ছিলেন পাকা ব্যবসায়ী। বিনোদিনীর কদিন অনুপস্থিতির জন্য তাঁর মাইনে কাটতে চেষ্টা করেছিলেন। যে নাট্যকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য তাঁর প্রচুর আয় ঘটেছিল, তাদের কোনো মাইনে বাড়ানো বা সুযোগ সুবিধা বাড়ানো তিনি চাননি। বাঙালীদের তিনি নাকি পছন্দ করতেন না। তিনি কমার্শিয়াল থিয়েটারের প্রথম ভিত করে দিলেন কিন্তু নিজের দোষেই তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া অমৃতলাল মিত্র, উপেন্দ্র মিত্র, বিনোদিনী, অঘোরনাথ পাঠক, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি সহ স্বয়ং গিরিশ যদি অন্য পথে চলে যান তাহলে প্রতাপচাঁদের কি-ই বা ভবিষ্যৎ?

বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ, অমৃতলাল বসু প্রমুখরা প্লে-রাইটের ভূমিকা পালন করলেন তবে গিরিশের মত অধিকাংশ পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ কখনোই গড়ে ওঠেনি। এর অর্থ গিরিশ যেভাবে থিয়েটারের অলিগলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন তেমন সক্রিয়তা বাংলাদেশে আর কারও ছিল না। একইভাবে তাঁর নাট্য প্রতিভাও ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ১৮৭২ -এর পর থেকে অধিকাংশ পেশাদারী থিয়েটারের মালিকের লক্ষ্যই ছিল নিজ নিজ থিয়েটারের প্রয়োজনে অন্য রঙ্গমঞ্চ থেকে গিরিশকে সরিয়ে আনা, নিজেদের থিয়েটারের দর্শক সমাগমের জন্য তাঁকে দিয়ে ফরমায়েসী লেখা তৈরী করিয়ে নেওয়া।

এক, প্রথমদিকে ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে গিরিশের যোগ ছিল না। বরং তিনি নামোল্লেখ না করে সংবাদপত্রে থিয়েটারের নিন্দে করেন। আবার 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের সময় তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। সংগঠন, অর্থ ও অভিনয় — এই তিনটে কারণে গিরিশের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধ বাধে। ন্যাশানাল থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার পরও তিনি ন্যাশানালের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তিনি দলের সঙ্গে ঢাকায় যাননি।

দুই, সুপরিচিত বেঙ্গল থিয়েটারের লক্ষ্য ছিল গিরিশকে না নেওয়া। সেটাই বেঙ্গল থিয়েটারের বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ। যে মঞ্চে গিরিশ, দর্শকেরা সেখানেই যেতে চায়।

তিন, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারেরও গিরিশচন্দ্র প্রথমে যোগ দেননি। তার কারণ প্রথমত গিরিশের কাছে আমন্ত্রণ না পেলে তিনি যোগ দিতেন না। দ্বিতীয় কারণ, বিলিতি থিয়েটারের জাঁকজমক ও বিলিতি ধাঁচের মঞ্চের যে অনুসরণ গ্রেট ন্যাশানালে চলছিল তা তাঁর পছন্দ ছিল না। তবু তাঁর কাছে ডাক আসায় তিনি ঐ মঞ্চে যোগ দিয়ে 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করলেন, পশুপতি চরিত্রে অভিনয়ও করলেন। রাতারাতি গ্রেট ন্যাশানালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর বন্ধু অমৃতলাল বসুও এই মঞ্চের জন্য 'হীরকচূর্ণ' নাটক লিখলেন তাঁরই অনুপ্রেরণায়।

চার, প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাশানাল থিয়েটার' গিরিশকে পুরোদস্তুর নাট্যকার ও অভিনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। এখানে তিনি নিয়ে এলেন নটী বিনোদিনীকে। বিনোদিনীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, "গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' -এর পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান হইত না।"

পাঁচ, এরপর গিরিশ সদলে বেরিয়ে আসেন এবং ১৮৮৩ সালে ২১ জুলাই বিডন স্ট্রীটে গুর্মুখ রায় প্রতিষ্ঠিত স্টার থিয়েটারে নিজের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে দক্ষের ভূমিকায় নামেন। সেই অভিনয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রমুখ। এই মঞ্চে থাকার সময়ই তিনি ও বিনোদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যধন্য হন এবং তাঁর জীবনসাধনা পথে অগ্রসর হন।

ছয়, ১৮৮৭ -তে প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিয়েই গিরিশ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব অভিনীত 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্তরায়' অভিনয় বন্ধ করে দেন। তখন নাট্যকার, পরিচালক, ম্যানেজার এবং অভিনেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। আবার গিরিশ স্টারে ফিরে গেলে এই থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' অভিনীত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবেই গিরিশ অবহেলায় স্টার থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভায় যোগ দেন, আবার মিনার্ভা ছেড়ে স্টারে ফিরে আসেন (১৮৯৬) ; আবার মাত্র দু-বছর কাটতে না কাটতেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি স্টার ছেড়ে দেন। 'সিটি থিয়েটার' ছেড়ে আসার সময় তিনি বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ভাঙিয়ে আনেন। যোগ দেন মিনার্ভায়।

সাত, মিনার্ভাকে অবলম্বন করে গিরিশ এবং তাঁকে অবলম্বন করে মিনার্ভা চূড়ান্ত সাফল্য পায়। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক নাটক ম্যাকবেথ, মুকুলমঞ্জুরা, আবু হোসেন, নলদময়ন্তী, জনা, বড়দিনের বখশিস, প্রফুল্ল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস এখানেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু সেই থিয়েটারও যে তিনি ছেড়ে এলেন তার কারণ মালিক নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। পরে মিনার্ভাকে বাঁচাতে অর্ধেন্দুশেখরকে সঙ্গে নিয়ে, পরবর্তী মালিক নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে, যেমন ফিরে এলেন তেমনি তাঁর সঙ্গে বিরোধে আবার ছেড়েও এলেন। সেই গিরিশ আবার ১৯০৮-এ কোহিনূর ছেড়ে যে মিনার্ভায় ফিরে এলেন, তা-ও অমরেন্দ্র দত্ত-বিহীন মিনার্ভাকে বাঁচাতে।

৭.১.২.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাট্যজগতে লেবেদফের অবদান আলোচনা করো।

৭.১.২.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ৩

শখের নাট্যশালা

বিন্যাসক্রম

৭.১.৩.১ ভূমিকা

৭.১.৩.২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

৭.১.৩.৩ নবীন চন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার

৭.১.৩.৪ ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও অন্যান্য

৭.১.৩.৫ প্যারী বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার

৭.১.৩.৬ আশুতোষ দেব বা সাতু বাবুর থিয়েটার

৭.১.৩.৭ রামজয় বসাকের নাট্যশালা

৭.১.৩.৮ গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা

৭.১.৩.৯ চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা

৭.১.৩.১০ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

৭.১.৩.১১ বেলগাছিয়া নাট্যশালা

৭.১.৩.১২ মেট্রোপলিটন থিয়েটার

৭.১.৩.১৩ পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়

৭.১.৩.১৪ শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি

৭.১.৩.১৫ জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

৭.১.৩.১৬ বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়

৭.১.৩.১৭ কলকাতায় ও মফঃস্বলে বিচ্ছিন্ন অভিনয়

৭.১.৩.১৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.৩.১৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

ভোলানাথবাবুর ভৃত্য রামসন্তোষের পত্নী যথেষ্ট ভাগ্যবতী। বিশেষ কাজে ভোলানাথবাবু রামসন্তোষকে নিয়ে কলকাতায় এসে এক ভ্রষ্টা নারী শশীমুখীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে সুখময় তার প্রেমিককে পরীক্ষা করার জন্য ভাগ্যবতী ও রতনমণি নামক দুই সহচারীকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে মোহনচাঁদের ছদ্মবেশে ভোলানাথবাবুর কাছে থেকে জানতে পারেন শশীমুখীর কথা ভৃত্য রামসন্তোষ এরই মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ভাগ্যবতীকে অন্য নারী ভেবে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়। মোহনচাঁদের বিবাহের আয়োজনের মধ্যেই একদিন মোহনচাঁদ ভোলানাথবাবুর কাছে শশীমুখী সম্পর্কে কদর্য মন্তব্য করে বসে। রামসন্তোষ কর্তার পত্র বারাঙ্গনাকে দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং উকিলের সাহায্য নেয়। কর্তা মোহনচাঁদের কাছে সুখময়ের ফটো দেখে ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। পরে আরো নানা ঘটনামালার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় যে, হবু স্বামীর প্রণয় পরীক্ষার জন্যই সুখময় ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। খুব স্পষ্ট যে, লেবেডেফের নাটকে নাটকের স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধু চরিত্রনামের ক্ষেত্রে নয়, স্থান-নামও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি নাটকের মধ্যে লঘু রঙ্গপ্রিয়তা, করুণ রসের প্রভাব, আদি-রসাত্মক মন্তব্য বিশেষ স্মরণযোগ্য।

৭.১.৩.১ : ভূমিকা : সখের নাট্যশালা বা শৌখিন রঙ্গালয়

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্ম সংগ্রামের গর্ভে, তার পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। প্রতি পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনও সংগ্রাম করতে হয়েছে, বিদেশি শাসকচক্রের নানা অপশাসনের বিরুদ্ধে, কখনও বা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে, আবার কখনও কখনও বাংলা রঙ্গ মঞ্চের অভ্যন্তরেই ঘটেছে তীব্র আদর্শের সংগ্রাম। বস্তুত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা নাট্যশালার এক একটি প্রয়াস। লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী থিয়েটার' থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার কালসীমাকে ধরে, অর্থাৎ ১৭৯৫ সাল থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যবর্তী সময় সখের থিয়েটারের বা শৌখিন রঙ্গালয়ের কাল সেইরকমই বাংলা নাট্যশালার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসকাল রূপে চিহ্নিত। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সখের থিয়েটারের গড়ে ওঠার পিছনে কাজ করেছে বিদেশিদের নাট্যচর্চার প্রণোদনা। পাশাপাশি দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের আনন্দের জন্য বা আমোদ উপভোগের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চ । কখনও কখনও ইংরেজের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার উদ্দেশ্যেও দেশীয় বিত্তবানেরা নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সখের নাট্যশালাগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা নাট্যচর্চা এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চ এক ধারাবাহিক অগ্রসরতা লাভ করেছে।

১. সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পিছনে যেমন আয়োজকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি অভিনয় ও মঞ্চ -ভাবনার ক্ষেত্রেও দর্শক রুচির তুলনায় আয়োজকদের রুচি ও মতামত বেশি বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছিল।

২. নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হত না, বিলাসের খেয়ালী কল্পনার সাথে সে যুগের নাট্য বিষয়টাও সংযুক্ত ছিল।

৩. অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আয়োজকরা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করার জন্য, দর্শক মহলের মন সর্বদা রাখা যেত না।

৪. স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাব; বাড়ির উঠান, দালান, প্রশস্ত নাটমন্দিরের ব্যবড়ার শৌখিন থিয়েটারের অন্যতম অঙ্গ।

৫. দর্শক আসনও পূর্ণ হত আয়োজকদের ইচ্ছা এবং সম্পর্কের উপর।

সুতরাং, সেদিনের নাট্যশালায় নাটক পরিদর্শনের সুযোগ সকলের জন্য ছিল না, নাটকেরও উপায় ছিল না পরিবারিক আমোদ, উল্লাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার। তবু বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সেদিনের অভিনয়, নাট্য প্রচেষ্টা আজ অগ্রগতির লিপিমালায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

৭.১.৩.২: প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

'গৌড়ীয় সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৩১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়—"ঐ নর্তনশালা ইঙ্গলন্ডীয় রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলন্ডীয় ভাষায়।" একদিকে চৌরঙ্গী থিয়েটারের জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠাতার ইংরেজ প্রীতির কারণে হিন্দু থিয়েটার বিদেশি রঙ্গালয়ের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই হিন্দু থিয়েটারে অভিনীত নাটকের ভাষাও ছিল ইংরাজি। প্রসন্নকুমার ছাড়াও এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাচরণ সেন, রামচন্দ্র মিত্র, নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, মাধব মল্লিক প্রমুখ ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। প্রথম রজনীতে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৩১) শেক্সপীয়রের 'জুলিয়ার সিজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং এইচ. উইলসন কর্তৃক অনূদিত 'উত্তররামচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক এই মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৮৩২ সালের ২৯ শে মার্চ 'Nothing Superfluous' নামে একটি প্রহসনও এই মঞ্চে অভিনীত হয়। "কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়রদের মধ্যে এক নর্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম সকল নির্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুক্তবাবু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্তবাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্রঘোষ।

৭.১.৩.৩: নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার

বর্তমানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে ছিল, সেকালের অন্যতম ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবীন বসুর অট্টালিকা, উদ্যান, পুকুর ইত্যাদি। এই নবীন বসুর বাড়িতেই দু লক্ষ টাকা খরচ করে, প্রতিষ্ঠিত হয় একটি নাট্যশালা। নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের প্রেরণা কাজ করেছিল। নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। কেউ মনে করেন প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩১ সাল (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি), কেউ মনে করেছেন ১৮৩৩ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), আবার কারও মতে ১৮৩৫ সাল (ড. দর্শন চৌধুরী)। স্মরণীয় এই নাট্যশালাতে অভিনীত হয়েছিল বাংলা নাটক। কিন্তু বাংলা নাটক তখন না থাকার জন্য নবীনচন্দ্র বেছে নেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি অবলম্বনে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা। রামতনু মগ নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা দেখে সবিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর শ্যামবাজার থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। নবীন বসুর নাট্যশালায় প্রতি রাতে প্রায় এক হাজার দেশীবিদেশি দর্শকের সমাগত ঘটত। নাটকের দৃশ্যগুলি বাড়ির নানা জায়গায় সাজিয়ে রাখা হত। যেমন নবীন বসুর বৈঠকখানায় সজ্জিত হয়েছিল বীরসিংহের দরবার, উদ্যানের একপাশে সজ্জিত হয়েছিল, মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ । দর্শকদের অভিনয় দেখার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উঠে যেতে হত। রাত সাড়ে বারোটা থেকে অভিনয় চলত সকাল সাড়ে ছটা পর্যন্ত। নাটকে ব্যবহার হত ঐকতান বাদন (সেতার, সারেঙ, পাখোরাজ, বেহালা প্রভৃতি)। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন সুন্দরের ভূমিকায়, ষোল বছরের কিশোরী রাধামণি অভিনয় করেছিলেন, বিদ্যার ভূমিকায়, মালিনীর ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন জয়দুর্গা এবং বিদ্যার দাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাজকুমারী। সমকালীন যাত্রার অনুসরণে নবীন বসু নিজে 'কালুয়া' এবং রাজা বৈদ্যনাথ রায় 'ভুলুয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আলোর ব্যবহার ঘটেছিল মঞ্চে । অভিনয় সম্পর্কে দেশি ও বিদেশি দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। তবে একথা সত্য যে নবীন বসুর শ্যামবাজার নাট্যশালা সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজে বিশেষ উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ এই নাট্যশালাতে যাত্রা ও থিয়েটারের একটা সমন্বয় ঘটেছিল। তৈরি হয়েছিল 'বিলাতী যাত্রা' এবং 'স্বদেশী থিয়েটারের' একটা মিশ্র রূপ। নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারই বাঙালির তৈরি প্রথম নাট্যশালা যেখানে অভিনয় হয়েছে বাংলা নাটকের। অর্থাৎ নবীন বসু প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা যায় এবং বাংলা ভাষাতেই তার অভিনয় সম্ভব। মূলত নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। বাঙালি নির্মিত নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়, নারী চরিত্রে নারীর উপস্থিতি, আলোর ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্যামবাজার থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর ঘটিয়েছিল। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য জনপ্রিয় নাটকের উপস্থাপনা, 'কালুয়া-ভুলুয়া' প্রসঙ্গ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয় ইত্যাদি কারণে, শৌখিন নাট্যশালার ইতিহাসে শ্যামবাজার থিয়েটার

আজও স্মরণীয় নাম। তাই 'হিন্দু পাইওনিয়র' পত্রিকা এই নাট্যশালায় নারীদের অভিনয় নিয়ে শুধু প্রশংসা করেনি, সমাজ সংস্কার ও নারী প্রগতির বিষয়েও যে এই নাট্যশালার অবদান গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে লিখেছিল — "দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না ? ..... এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্তমান বলিলেই চলে।"

৭.১.৩.৪: ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও অন্যান্য

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র বসুর পর তৃতীয় বাঙালি হিসেবে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্যশালা 'দি ওরিয়েন্টাল'। ১৮৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকায় এই নাট্যশালাটির উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। নাট্যশালাটির বিস্তৃত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এই সময়ে বাংলাদেশে ডেভিড হেয়ার একাডেমির রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কোনো নাট্যপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। ১৮৫৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ডেভিড হেয়ার একাডেমিতে একটি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় করা হয়। অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। নাটকটি দু'বার মাত্র অভিনয় হয়েছিল। অভিনয়ের প্রশংসার বিবরণ পাওয়া যায় সংবাদ প্রভাকর এবং বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায়।

১৮৫৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ২৬৮ নম্বর চিৎপুর রোডের ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে একটি নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালাটি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে পরিচিত। গৌড়মোহন অ্যেরে বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখেরা এই নাট্যশালাটিতে অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। সাঁ সুসি থিয়েটারের মি. ক্লিঙ্গার ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ছাত্র-অভিনেতাদের শিক্ষা দিতেন। এখানে 'ওথেলা' নাটকটি ১৮৫৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খুব সার্থকভাবে অভিনীত হয়। পরে শ্রীমতি ইলিস-এর তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের আরও দুটি নাটক — 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'হেনরি দি ফোর্থ'। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপদেশে কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা বহুবার চেষ্টা করেন এই নাট্যশালাটিতে দেশীয় নাটক ও দেশীয় বাদনের প্রচলন করতে। বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য সাময়িক পত্রেও দর্শকদের মধ্যে দাবি প্রবল হয়েছিল। কিন্তু তা তো হয়নি এবং দুবছরের মধ্যেই এই নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়।

৭.১.৩.৫: প্যারী বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার

নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ৩রা মে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার মতো এখানে বাংলা নাটক অভিনীত হল না।

প্যারীমোহন নিজে ছিলেন, ইংরাজি ভাষার পৃষ্ঠপোষক, তাই জোড়সাঁকো থিয়েটারে অভিনীত হয় ইংরাজি নাটক 'জুলিয়াস-সিজার'। প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিতে সে রাতে কলকাতা বিপন্ন হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অস্বীকার করে প্রায় চারশ দর্শক সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল বসুর পিতা বজ্রলাল বসু এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন, মহেন্দ্রনাথ বসু অভিনয় করেছিলেন জুলিয়াস সীজারের চরিত্রে, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্যাসিয়াসের চরিত্রে এবং কৃষ্ণধন দত্ত ব্রুটাসের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন। নাটকের ট্র্যাজেডি সকলকে অভিভূত করেছিল। সংবাদ প্রভাকর এবং হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নাটকের সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা এবং অভিনেতাদের সুখ্যাতি করা হলেও জোড়াসাঁকো কর্তৃপক্ষের ইংরাজি নাটক অভিনয়ের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারেনি। অচিরে বন্ধ হয়ে যায় জোড়াসাঁকো থিয়েটারের দ্বার। এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য যে আবেদন পাঠায় তা আসলে যুগেরই আবেদন — "let the Jorasankowallahs take in hand a couple a good Bengali plays and we will promise them success." আবার জোড়াসাঁকো থিয়েটারে হিন্দু যুবকদের দ্বারা ইংরেজি নাটকের মূলভাব ধরে রাখার ক্ষেত্রে, যেমন সমস্যা তৈরি হয়, তেমনি নিজেদের মধ্যেও শুরু হয় এক গভীর অন্তর্কলহ। পাশাপাশি বাংলা নাটকের অভিনয় এবং বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের বেশ কিছু প্রয়াস মানুষকে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রতি বিমুখ করেছিল বলে জানা যায়।

৭.১.৩.৬: আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর থিয়েটার

সখের নাট্যশালা বা শৌখিন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আশুতোষ দেবের থিয়েটার একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বরং বলা আশুতোষ দেবের থিয়েটারের সময়কাল থেকেই সখের থিয়েটারের বিকাশ পর্ব লক্ষ করা যায়। বসু পরিবার, ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার ও ঘোষ পরিবারের উদ্যোগে এই সময়ের নাট্যশালাগুলিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা নাটকের অভিনয় শুরু হয়। সমাজ সমস্যার বিভিন্ন দিক নাটকের মধ্যে দিয়ে, প্রকাশ করার চেষ্টা করা করা হয়। মঞ্চের উন্নতির দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়। সমকালীন পত্রপত্রিকাগুলিতেও উন্নত নাট্যশালা নির্মাণের জন্য উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে অনুরোধ জানানো হত। বলাবাহুল্য এই উৎসাহ থেকেই সাতুবাবুর বাড়িতে 'জ্ঞানদায়িণী সভা'র সভ্যেরা সাতুবাবুর মৃত্যুর পর একটি নাট্যশালা নির্মাণ করে, বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং চারুচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন আশুতোষ দেবের রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয় মহাকবি কালিদাসের লেখা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র বাংলা অনুবাদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন নন্দকুমার রায়। অভিনয় করেছিলেন প্রিয়মাধব মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি। মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। কবিচন্দ্রের লেখা একটি গান এই নাটকে গাওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। শকুন্তলা অভিনয়ের দিন প্রায় চারশ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। নাটকের

এবং নাট্যশালার স্তুতি প্রকাশ হয়েছিল বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকাতে। আর পত্রপত্রিকাগুলির প্রশস্তিতে উৎসাহিত হয়ে আশুতোষ দেবের থিয়েটারের পরিচালকেরা ২২শে ফেব্রুয়ারি এবং ২৩শে জুলাই 'শকুন্তলা' নাটকটি পুনরায় অভিনয় করেন।

এই মঞ্চেই ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় 'মহাশ্বেতা'। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ করেন মণিমোহন সরকার। এই নাটকে শরৎচন্দ্র ঘোষ তরলিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাদম্বরী চরিত্রে নারী ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন একটি বালক চরিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূবনমোহন ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে 'মহাশ্বেতা' নাটকটির অভিনয় সাফল্য শকুন্তলা নাটককে স্পর্শে করতে পারেনি। নাটকটির সংলাপ যেমন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি অভিনেতারাও অভিনয়ের বিষয়ে সুশিক্ষিত ছিলেন না। সবমিলিয়ে 'শকুন্তলা' এবং 'মহাশ্বেতা' এই দুটি নাটকেরই অভিনয় হয়েছিল আশুতোষ দেবের থিয়েটারে। ড. অজিত কুমার ঘোষ 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে অবশ্য জানিয়েছেন— "শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের একমাস পরেই (১৮৫৭, মার্চ) প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়"। দুটি নাটকই অনুবাদ করা। প্রযোজনা, সংগীত পরিচালনা, মঞ্চ উপস্থাপনা কোনোদিক থেকেই এই নাট্যশালা কৃতিত্বের দাবি করে না। তবু বাংলা রঙ্গমঞ্চের জাগরণে সাতুবাবুর থিয়েটার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাতুবাবুর থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নাট্যশালাতে ইংরাজি নাটকের অভিনয় পুরোপুরি বন্ধ হল। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ হল, মৌলিক বাংলা নাটকের অভাব দেখা দিল বাংলা নাট্যজগতে। এছাড়া পরবর্তীকালে সাতুবাবুর থিয়েটারের উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ যে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠায় অবশ্য করে কাজ করেছে সাতুবাবুর থিয়েটারের অনুপ্রেরণা এবং অভিজ্ঞতা। জড়োয়ার গহনা পরে শরৎচন্দ্র যখন শকুন্তলার বেশে মঞ্চে প্রবেশ করেন, তা দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে যান। তাই শকুন্তলা সম্পর্কে Hindu Intelligence পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল - "To see simple Shakuntolah clothed in the splendid garments of the richest Hindu girls and decorated in the most precious jewels brings to our mind a painful sight of the murder of truth and nature."

৭.১.৩.৭: রামজয় বসাকের নাট্যশালা

সখের নাট্যশালার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে রামজয় বসাকের নাট্যশালা তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কলকাতার বিখ্যাত ধনী রামজয় বসাক তাঁর চড়কডাঙার বাড়িতে (টেগোর ক্যাসল রোড) স্থাপন করেন, একটি নাট্যালয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নির্দেশ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা, যখন দেশীয় নাটক অভিনয় ও দেশীয় ঐকতান বাদনের দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন, তখনই তাঁরা গড়ে তুললেন নতুন নাট্যশালা তথা নতুন নাট্যসম্প্রদায়। অবশ্যই এই নাট্যসম্প্রদায় বা নাট্যশালা গড়ে তোলার পিছনে রামজয় বাবুর অর্থানুকূল্য বিশেষ

ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার নতুন বাজারে চড়কডাঙায় রামজয় বসাকের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয় সমকালীন সমস্যাভিত্তিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। নাটকটি এখানে মোট চার রাত্রি অভিনয় হয়। সমগ্র বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে যখন ইয়ংবেঙ্গল থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা সামাজিক আন্দোলন গঠন করেছেন; তখন এই নাটক অবশ্যই বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল মানসিকতার সঙ্গে জোয়ার এনেছিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাধাপ্রসাদ বসাক, রামজয় বসাক, নারায়ণচন্দ্র বসাক, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয়ও ছিল উল্লেখযোগ্য। আর সবকিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বস্তুত রামজয় বসাকের নাট্যশালা বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেই নাট্যশালা যেখানে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকের অভিনয় হয়। পাশাপাশি সমকালীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে, রচিত নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এই নাট্যশালাই প্রথম প্রতিবাদের নাট্যভাষা গড়ে তোলে। সামাজিক নিপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে জনসাধারণ এবং সমাজ সংস্কারকদের মনের কথার প্রথম রূপায়ণ ঘটেছিল 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র মধ্যে দিয়ে। তাই ১৮৫৭ সালের ১৯ মার্চ 'এডুকেশন গেজেটে' এই অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃত খবর প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখা হয় — "The Educational gazette state that the well-known force of Koolin Kulo Sharabasyh was acted in the private rresidence of a Baboo in calcutta with great success."

৭.১.৩.৮: গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা

বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যসম্প্রদায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় করেন ১৮৫৮ সালের ২২শে মার্চ। এ নাটকে উদরপরায়ণ ও ঘটকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, রাধাপ্রসাদ বসাক এবং ধর্মশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, শিক্ষক শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই নাট্যাভিনয় দেখতে এসেছিলেন। নাটকে দর্শক উপস্থিত ছিলেন প্রায় সাতশ'। কেউ কেউ মনে করেছেন রামজয় বসাকের নাট্যশালার থেকে গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের নাটকের অভিনয় অনেক উন্নত হয়েছিল।

৭.১.৩.৯: চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা

কলকাতায় জনপ্রিয়তালাভের সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কলকাতার বাইরেও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৮ সালের ৩রা জুলাই চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীনাথ পালের উদ্যোগে তাঁদের বাড়িতে অভিনীত হয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা

করেন প্রবোধচন্দ্র মন্ডল। প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রায় নয়শ' দর্শক। গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ভাটপাড়া থেকে বহু কুলীন ব্রাহ্মণও এই নাটক দেখতে এসেছিলেন এবং বিরোধিতাও করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ থেকে জানা যায় ৫ই জুলাই রবিবার এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী এই নাটকের অভিনয়ের জন্য গান রচনা করেছিলেন এবং অভিনেতাদের তালিমও দিয়েছিলেন। 'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে' — নটীর কণ্ঠে এই গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে এই নাট্যশালা তথা নাট্যাভিনয়ের বিবরণ মেলে।

৭.১.৩.১০: বিদোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার থেকে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত, যে শৌখিন নাট্যশালাগুলির উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলো পরিচালনা করত কলকাতার ধনশালী ব্যক্তিবর্গ। কলকাতা সমাজের ধনকুবের, বিলাসী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বাড়িতে স্থাপন করেন, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ । বিদ্যোৎসাহি ও সাহিত্যরসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বাড়িতে একটি সাহিত্যসভার সূচনা করেছিলেন ১৮৫৩ সালে। এই সাহিত্যসভার নাম ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। স্মরণ করতে হয়, কবিশ্রী মধুসূদনকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জন্য প্রশংসাপত্র দিয়েছিল, এই সাহিত্যসভা। বস্তুত সাহিত্য জগতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বাংলা রঙ্গমঞ্চের। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত এই নাট্যালয়ই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ নামে খ্যাত হয়। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ একবছর পর ১৮৫৭ সালের ১১ই এপ্রিল শনিবারে অভিনীত হয়ে ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার'। নাটকটি অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন ভানুমতী চরিত্রে। কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিময় সরকার অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। দুর্যোধনপত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় অভিনয় কুশলতা দেখান মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেশি ও বিদেশি ব্যক্তিরা। অতিথিদের প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছিল। ভানুমতীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কালীপ্রসন্ন পরিধান করেছিলেন প্রায় এক লাখ টাকা মূল্যের জড়োয়া গয়না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'বেণীসংস্থার' অভিনয়ের সুখ্যাতি প্রকাশ হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিকথায়' বলেছেন —

> "দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stage - এর উপর ঝলমল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানিনা।"

এরপর মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং।

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বিক্রমোর্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ২৪শে নভেম্বর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় হয়। এ নাটকে কালীপ্রসন্ন অভিনয় করেন পুরুরবার ভূমিকায়। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও অভিনয় করেছিলেন এই নাটকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। এই মৌলিক নাটকটি অভিনয়ের জন্য রচিত হলেও এটি ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়নি। তবে গীতবাদ্য সহযোগে এই নাটকটি পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে লেখক বলেছেন —

> "এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাটক যে রূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ পঠিক হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিত্মর গীত সংযোজিত হইবার তাহা যন্ত্রের সহিত মিলিইয়া গান করা যাইবেক।" [বঙ্গীয় নাট্যশালা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৮৫৯ সালে 'মালতী মাধব' নাটকটিও এভাবেই পাঠ করা হয়েছিল। অবশ্য 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের পর আর কোনো নাটক এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শুধু অভিনয়ের জন্য নয় নাটকের 'আভিনয়িক পাঠের'র জন্যও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্মরণীয়। মাত্র দুই বছর স্থায়ী হলেও এই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে পাইকপাড়ার রাজারা স্থাপন করেছিলেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হওয়ার জন্য। রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, মঞ্চের সার্বিক উপকরণ এবং আবহসঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই রঙ্গমঞ্চেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যপ্রথায় মঞ্চ নির্মাণ, অভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব এবং মঞ্চে প্রাচীন নাট্যব্যক্তিত্বদের মূর্তি ও চিত্র স্থাপনার মধ্যে দিয়ে সে যুগের পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চকে স্মরণীয় করে রাখে।

৭.১.৩.১১: বেলগাছিয়া নাট্যশালা

'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটকের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় কবি মধুসূদন দত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছিলেন—

"যদি কোনোদিন আমাদের দেশে নাটক নামক শিল্পটির বিকাশ ঘটে, তাহলে উত্তরপুরুষেরা নিশ্চয় ভুলবেন না এই মহান ভদ্রমহোদয়গণকে, যারা জাতীয় নাট্যশালার একেবারে ঊষালগ্নের বন্ধু।" উক্তিটি বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রসঙ্গে মনে রাখবার মতো। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। সিংহ পরিবারের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'Our Own Club' নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে, গৌরদাস বসাক ছিলেন এই সংস্থার সম্পাদক। পরবর্তীকালে এই সংস্থাটিই বেলগাছিয়া থিয়েটারে পরিণত হয়। তৎকালীন সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং বিশিষ্ট অভিনেতা গৌরদাস বসাকের 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায়, সে যুগের প্রায় সব নব্য শিক্ষিত বাঙালিই এ মঞ্চের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আশুতোষ দেবের বাড়িতে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সময় কলকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। বেলগাছিয়ার রাজারা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য নাটকের রসাস্বাদন করেছিলেন। মধুসূদনের জীবনীকার লিখেছেন, অভিনয় শেষ হলে; -

"যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেন - দেখুন দু' একদিনের জন্য আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করে, একটি স্থায়ী মঞ্চ স্থাপন করলে বোধহয় অধিক উপকার হয়।" ঈশ্বরচন্দ্র আগে থেকেই উদ্যোগী ছিলেন, সেই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রতাপচন্দ্র। স্থির হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার সুন্দর উদ্যানবাটীটিতে নাট্যশালা স্থাপন হবে। এরপর মহাসমারোহে নাট্যশালা স্থাপিত হলে অভিনয়ের উদ্যোগ চলতে থাকে। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয় 'রত্নাবলী' নাটক, শ্রীহর্ষের নাটক, অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন ছোটলাট হেলিডে সাহেব, মি: হিউম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছ'সাতবার অভিনীত হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখেই মধুসূদন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে তিনি 'রত্নাবলী' নাটকটির ইংরাজিতে অনুবাদও করেন। 'শর্মিষ্ঠা'তে 'রত্নাবলী'র প্রভাব আছে।

বেলগাছিয়ার রাজারা শুধু স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করেননি, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন একটা নতুন সংস্কৃতি, একটা নতুন ভাবাবেগ জাতির শিকড়ে প্রবেশ করছে। বলাবাহুল্য সেই প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, বেলগাছিয়ার আয়োজনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা ছিল। অভিনয়, সাজসজ্জা, গীতবাদ্য সবকিছুর মধ্যেই ছিল পরিচ্ছন্নতার ছাপ। ঐকতান বাদনের দায়িত্বে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ পাল। নাট্য পরিচালক ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি নিজে অভিনয়ও করতেন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায় সিংহ পরিবার বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য ব্যয় করেছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়। রাজা, যযাতি, মাধব্য, শুক্রচার্য, শিষ্য কপিল ও সেনাপতি বকাসুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যথাক্রমে প্রিয়নাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীননাথ ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই অভিনয়ের মূল্য অসীম। 'শর্মিষ্ঠা'র আখ্যাপত্রটি স্মরণ করলেই বোঝা যায় — 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা'র সাফল্যে আনন্দিত হন বেলগাছিয়ার রাজারাও। এরপর বেলগাছিয়ার রাজারা মহরায় নিয়ে এলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা', প্রতিবাদ করে ওঠেন ইয়ংবেঙ্গলের দল। রাজারা মহরায় বন্ধ করে দেন। আহত হন মধুসূদন। এবার লেখেন 'কৃষ্ণকুমারী'। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হয় না, বিশেষ করে ১৮৬১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুতে নাট্যশালার দরজাও যায় বন্ধ হয়ে।

বস্তুত বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বেলগাছিয়া এক বন্দিত নাম। এই শৌখিন মঞ্চেই বাঙালির নাটক ও নাট্যমঞ্চের ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছিল। বেলগাছিয়াতেই নাট্যকার মধুসূদন পাশ্চাত্য স্রোতকে বহন করে আনার চেষ্টা করেছিলেন। আর মূলত বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যই মধুসূদন লিখেছিলেন 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা'। 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ' নাটক ও প্রহসন। রাজারাও সমীহ করেছিলেন মধুসূদনকে। স্বভাবে 'ফিউডাল লর্ড' হলেও ধনবাদী সভ্যতায় বিকর্ষণে রেনেশাঁসে সামিল হয়েছিলেন বেলগাছিয়ার রাজারাও। তাই শুধু সখ নয়, বাংলা নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার পিছনে বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোগ অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকে। রামনারায়ণ অনুবাদের কারণে পারিশ্রমিক পান দুশো টাকা। নাটকের নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন — রাজার ভূমিকায় প্রিয়নাথ দত্ত, সেনাপতির ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, বিদূষকের ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মন্ত্রীর ভূমিকায় গৌরদাস বসাক, সূত্রধরের ভূমিকায় ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী, বাহুভূতির ভূমিকায় গিরিশ চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তার ভূমিকায় মহেন্দ্র গোস্বামী, বাজিকরের ভূমিকায় শ্রীনাথ সেন। এছাড়াও নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নবীন মুখোপাধ্যায়, অঘোরচন্দ্র, যদুনাথ ঘোষ, রমানাথ লাহা, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মল্লিক, হেমচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন গুরুদয়াল পাল এবং নাট্যশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ বেলগাছিয়া নাট্যশালার মধ্যে দিয়েই সেকালের শিক্ষিত বাঙালি ও নাট্যপ্রিয় মানুষেরা এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। নাট্যপ্রিয় মানুষেরা বেলগাছিয়া নাট্যশালার মধ্যে দিয়েই দেখেছিলেন শৌখিন নাট্যশালার এক নবরূপকে । সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে, দ্বদেশীয়ানাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তা এককথায় অভিনব। সর্বোপরি এইরঙ্গমঞ্চে বিদেশি নাটকের পরিবর্তে স্বদেশী নাটকের যে প্রবর্তনা ঘটে, তা যেন বাংলা নাটক রচনার আগামী সুরকে নির্দেশিত করে।

৭.১.৩.১২: মেট্রোপলিটান থিয়েটার

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের এক অংশে ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, মেট্রোপলিটান থিয়েটার। রামগোপাল মল্লিকের অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত এ মঞ্চে বিধবা বিষয়ক নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। ১৮৫৯ সালের ২৩শে এপ্রিল অভিনীত হয়, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই নাট্যশালাতে ব্যয় করা হয়েছিল প্রচুর অর্থ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুরলীধর সেন এই নাট্যশালার জন্য দিয়েছিলেন চার হাজার টাকা। 'বিধবা বিবাহ' নাটকের দৃশ্যপটগুলি এঁকেছিলেন মি: হলবাইন। অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন মুরলীধর সেন। বিখ্যাত অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার এই নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন এবং বিধবাদের জন্য কেঁদে উঠেছিল তাঁর মহৎ প্রাণ। 'বিধবা বিবাহ' নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৫৯ সালের ৭মে। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার পর এদেশে সৃষ্টি হয় নানা রকম প্রতিক্রিয়া। মেট্রোপলিটান

থিয়েটার কর্তৃপক্ষ যে বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন না, তাঁদের নাট্যপ্রয়াস দেখেই অনুমান করা যায়। নাট্যকার উমেশচন্দ্রও তাঁর নাটকে তুলে ধরেছিলেন বিধবা নারীর যন্ত্রণা ও সমাজপতিদের নিষ্ঠুরতার ছবি। জনমানস বিবর্তনে ও জনচেতনার শুভবোধ জাগরণে নাটক, যে অন্যতম মাধ্যম তা আর একবার প্রমাণিত হয় এই নাট্যশালার মধ্যে দিয়ে। তাই শুধু শৌখিন নাট্যচর্চা নয়, মেট্রোপলিটান থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সমাজ পরিবর্তনের পথ অনুসন্ধান।

৭.১.৩.১৩: পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। ১৮৫৯ সালে সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক। অভিনয়ের উদ্যোক্তা মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ভাই সৌরিন্দ্রমোহন। নাটকে সৌরিন্দ্রমোহন কঞ্চুকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেজেছিলেন বিদূষক। সে সময়ই ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্য গঠিত হয়েছিল, একটি কার্যনির্বাহক সমিতি। সমিতির সভ্যরা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশব গঙ্গোপাধ্যায় ও দীননাথ ঘোষ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, বেলগাছিয়া থিয়েটারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী, ধনী ও নাট্যবিষয়ে উৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫ সালে। দর্শকাসন ছিল দুশোরও বেশি। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। নাট্যরূপ দেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অবশ্যই ভারতচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত বলে 'বিদ্যাসুন্দর'-এ মৌলিকতার অভাব ছিল। অভিনয় রাধাপ্রসাদ বসাক, মদনমোহন বর্মন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। নাট্যশিক্ষক ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তাঁর ভাই সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় এই অভিনয়ে ঐকতান বাদ্য বাজানো হয়েছিল। ঐকতান বাদ্যদলের নেতা ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। একই রাতে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঐ মঞ্চে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। দুটি নাটকই এই মঞ্চে আট-নয়বার অভিনীত হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন রেওয়ার মহারাজ। অভিনয়ে খুশি হয়ে তিনি প্রত্যেক অভিনেতাকে একটি করে শাল এবং সকলকে একসঙ্গে তিনহাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'যেমন কর্ম তেমন ফল' অভিনয়ের পর একে একে অভিনয় হয়েছিল —

- **'বুঝলে কিনা'** — একটি প্রহসন, নাট্যকার ভোলা মুখোপাধ্যায় (মতান্তরে প্রিয় মাধব বসু)। অভিনয় হয় ১৮৬৬ সালে। নাটকের বিষয় কলকাতার দলপতিদের চক্রান্ত ও দলাদলি।

- **'মালতিমাধব'** — অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন। দশ-এগারবার নাটকটির অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৯ সালে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্র সেন ও হরি বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে মাধব, মালতী ও অঘোরঘন্টের ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন।
- **'মালোবিকাগ্নিমিত্রম্'** — কালিদাসের রচিত নাটক, অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন।
- **'রুক্মিনীহরণ'** — একটি পৌরাণিক নাটক। রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। অভিনয় হয় ১৮৭২ সালে।
- **'উভয় সংকট এবং চক্ষুদান'** — প্রহসন দুটির রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। উভয় সংকট প্রহসনের মূল বিষয় সপত্নী সমস্যা। নাট্যকার দেখিয়েছেন দুই নারীকে নিয়ে এক পুরুষ সংকটে পড়েছেন।
- **'রসাবিষ্কারকবৃন্দ'** — ১৮৭১ সালে একবার এবং ১৮৭৩ সালে একবার নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেলেও পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮১ সালে শেষ যে নাটকটির অভিনয় হয়, তার নাম 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ'। রচনা করেছিলেন সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর।

দুশো বছরেরও বেশি সময়ের অতীত বাংলা থিয়েটারের দিকে পিছন ফিরে তাকালে বলতেই হয়, — পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে আমাদের থিয়েটার, আমাদের নাটক আন্তরিকভাবে লালিত হয়েছিল। দেশী-বিদেশি দর্শকরা লক্ষ করেছিলেন সুষ্ঠু মঞ্চব্যবস্থা, দৃশ্যপট, গীতবাদ্য এবং সার্থক অভিনয়। বিশেষ করে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যপ্রতিভা বিকাশের একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার। এই নাট্যালয়ে অভিনীত হয়েছে, কালিদাসের নাটক, ভবভুতির নাটক, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। রামনায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই নাট্যশালার জন্যই লেখেন তাঁর পৌরাণিক নাটক 'রক্মিনীহরণ' এবং প্রহসনগুলি। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে খুব প্রগতিশীল নাটকের অভিনয় না হলেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগ সাধুবাদ লাভ করেছে বারবার। দীর্ঘস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন, সৌরিন্দ্রমোহনের কনসার্টের জনপ্রিয়তা, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অনুপ্রাণিত হওয়া এবং 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এই নাট্যশালাকে 'জাতীয় নাট্যশালা' আখ্যা দেওয়া এই সবকিছু ছাড়িয়ে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয় জনপ্রিয় হয়ে আছে, শুধু রঙ্গমঞ্চের জন্য নয়, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও। পাথুরিয়াঘাটায় এসে রামনারায়ণ তর্করত্নের উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠাকে ইতিহাস কখনো ভুলবে না।

৭.১.৩.১৪: শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি

১৮৪৮ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে একটি বড় হলঘরের মধ্যে ছোট একটি মঞ্চ তৈরি করে ১৮৪৪ সালের সালের ১৯শে অক্টোবর অভিনয় হয়েছিল দুটি ইংরাজি নাটকের — 'লাভার্স অফ সালামাঙ্কা' এবং 'দি ফক্স অ্যান্ড দি উলফ'। সাঁ সুসি থিয়েটারের স্টেজ ম্যানেজার মি: ব্যারী মঞ্চ নির্মাণ ও নাট্য নির্দেশনায় সাহায্য করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ১৮৬৫ সালে শোভাবাজার রাজভবনে রাজপরিবারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি। এই নাট্যশালায় ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি। অভিনয় হয়েছিল

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কৌতুককর। শোভাবাজার নাট্যশালার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো এক কারণে এই নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরবর্তীকালে নাট্যশালার অন্য সদস্যদের প্রচেষ্টায় ১৮৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই মঞ্চে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের যে প্রহসনের অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মূলত ইয়ংবেঙ্গলদের চাপে, শোভাবাজার থিয়েটারে তারই সফল অভিনয় বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ২৯ জুলাই। কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কালী - উপেন্দ্রকুমার দেব, প্রসন্নময়ী - অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, হরকামিনী - বজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং নব-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনি সরকার। নাটকের অভিনয়ের সার্থকতা বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রত্রিকায় বিশেষ সাধুবাদ করা হয়। বিশেষ করে নববাবু এবং দুজন নর্তকীর অভিনয়ের সুখ্যাতি করা হয়। যদিও ১৮৬৫ সালের ৩১ জুলাই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির অভিনয়ের সুনাম করেও বলা হয়, পরিবারিক নাট্যশালায় এ জাতীয় নাট্যভিনয় উচিত নয়। কারণ এ নাটকে এমন অনেক চরিত্র আছে যাদের অভিনয় 'shocking to good taste and morals' এছাড়াও বিভিন্ন ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন — বলেন্দ্র সিংহ — প্রিয়মাধব বসুমল্লিক, কৃষ্ণকুমারী — ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অহল্যাবাঈ — অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জগৎ সিংহ — উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, তপস্বিনী — উদয়কৃষ্ণ দেব, সত্যদাস — আনন্দকৃষ্ণ দেব, ধনদাস — মণিমোহন সরকার, বিলাসবতী — হরলাল সেন, মদনিকা — রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

৭.১.৩.১৫: জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

জোড়সাঁকোয় ঠাকুর পরিবার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুর বিদেশি রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ঠাকুরবাড়িতে যাত্রাভিনয় হত। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একত্রিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে 'কমিটি অফ ফাইভ'। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ, শ্রীনাথ ঠাকুর, নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এঁদের সকলের অন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকো থিয়েটার নতুন করে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৬৭ সালের ১৪ জুলাই গুণেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি এবং গণেন্দ্রনাথকে লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠিতে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের অনুপ্রেরণার সূত্র মেলে। তবে পূর্বজনদের প্রেরণা, কর্মপ্রয়াস এবং সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি, বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাধুবাদ 'কমিটি অফ ফাইভ'কে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। যে প্রেরণার ফল স্বরূপ কৃষ্ণবিহারী সেনের অভিনয় শিক্ষার দ্বারা ১৮৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকো থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'। অহল্যাবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কৃষ্ণকুমারী'

অভিনয়ের কিছুদিন পরেই মধুসূদন দত্তের একটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয় এই নাট্যশালায়। এই প্রহসনে সার্জেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই প্রহসন শেষ পর্যন্ত 'কমিটি অফ ফাইভ' - এর পছন্দ হয়নি। ফলে তাঁদের গৃহশিক্ষক এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রথম শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে সমাজ সমস্যা বিষয়ক নতুন নাটকের জন্য 'Indian Daily News' পত্রিকার জুন সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নাট্যকারদের নাটক বিচার করে শ্রেষ্ঠ নাটক অভিনয়ের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কারণ হিন্দু মহিলার দূরাবস্থা বিষয়ে নাটক লিখে (হিন্দু মহিলা নাটক) সোমড়া নিবাসী শ্রী বিপিন বিহারী সেনগুপ্ত দুশো টাকা পুরস্কার জিতে নিলেও নাট্যমঞ্চটি উঠে যাবার কারণে তা আর অভিনীত হয়নি। বরং বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ বিষয়ক নাটক ('নব নাটক') রচনা করে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার গৌরব লাভ করেন। 'নব-নাটক' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি। প্রস্তুতি চলে ছ-মাস আগে থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নব-নাটকের অভিনয়ে সাবিত্রীর ভূমিকায় ছিলেন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। নবনাটক অভিনয় হয়েছিল ঠাকুর বাড়ির দোতলার ঘরে। বনের দৃশ্যের জন্য নানা তরুলতা ও তাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আটকে দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুক্তোর মালা, হীরের গহনা পরে নটীর বেশে সংস্কৃতে বসন্ত বর্ণনায় গান গেয়েছিলেন। 'The National Paper' - এর মতে অভিনয় হয়েছিল 'most superior order' এবং 'কনসার্টে' বিদেশি ছোঁয়া ছিল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালাতে 'নবনাটক' মোট নয়বার অভিনয় হয়েছিল। নবনাটকের অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি বলেছিলেন, এই অভিনয় দেখে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে যা কিছু দেখার, শোনার ও জানবার বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

বস্তুত জোড়াসাঁকো থিয়েটারের কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন, গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করতে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বাস্তব রীতিকে অবলম্বনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল, দৃশ্য অঙ্কন ও দৃশ্যসজ্জায়। আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও এই নাট্যশালার নতুনত্ব মনে রাখার মতো। দৃশ্যাঙ্কন এবং সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশীয় ভাবনাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধনী বাঙালিদের প্রাসাদমঞ্চের সঙ্গে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই নাট্যশালা নির্মাণ এবং অভিনয়ের পিছনে অর্থের জৌলুস এবং আমোদ-প্রমোদ মুখ্য ছিল না, পরিবারের তথা বাড়ির সকলে মিলে এখানে অভিনয় করতেন এবং এই নাট্যশালার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য নাট্যধারা, ভারতীয় নাট্যচর্চা এবং বাংলার দেশজ নাট্যরীতির একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা চলেছিল। ১৮৬৭ সালের শেষদিকে জোড়াসাঁকোয় অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বহু পড়ে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে জোড়াসাঁকোতে আবার নাটকের আসর বসেছিল। Indian Mirror পত্রিকাতেও ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত হয় একই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ —

"Advertisements"

The following prizes are offered by the committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic productions on the following subjects :

No. 1 — Rs. 200/-

The Hindoo Females, — Their condition and Helplessness. To be handed over to the committee before the 1st June 1866

Adjudicators — Babu Perya Chand Mitra
Prof. Krisna Comul Bhuttcharjee
Pundit Dwaraka Nath Bidyabhoosun

No. 2 — Rs. 100/-

The village Zaminders.

Period — Before the 1st February 1866.

Adjudicators — Pundit Eshwar Chandra Vidyasagar
Pundit Dwarka Nath Bidyabhoosun
Babu Raj Krishna Bannerjee

"The dramas are to be written in Bengali and must be dedicated to the Jorasanko Theatre."

৭.১.৩.১৬: বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

বহুবাজারে বিশ্বনাথ- মতিলালের গলির গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হয় একটি নাট্য সমাজ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু। সেখানেই ১৮৬৮ সালে প্রথমে একটি ছোট রঙ্গালয় নির্মাণ করে, অভিনীত হয় মনোমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক'। পাঁচ বছর পর উদ্যোক্তা ও স্থানীয় নাট্যরসিক মানুষের চেষ্টায় ও আর্থিক সাহায্যে ২৫ নং, বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে বহুবাজার নাট্যসমাজের নতুন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। ১৮৭৪ সালে এই রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় মনোমোহন বসুর 'সতী' এবং ১৮৭৫ সালে অভিনীত হয় 'হরিশচন্দ্র' নাটকটি। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ের বিখ্যাত অভিনেতা বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উপস্থিতি অবশ্যই বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়কে অভিজ্ঞতার দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া অবৈতনিক অভিনেতার দ্বারা নাটকের নিয়মিত অভিনয়, সীট সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সর্বোপরি ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম শিষ্য, হিন্দুমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর আবির্ভাব ও একাধিক নাট্যরচনা বহুবাজার বঙ্গনাট্যলয়কে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

৭.১.৩.১৭: কলকাতায় ও মফঃস্বলে বিচ্ছিন্ন অভিনয়

সংবাদপত্রের তৈরি জনমতের বলে বা ধনী অভিজাতদের অনবরত নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বা নিম্নবিত্তদের চাপে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শৌখিন থিয়েটারের আদল ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। যে নাটক এতদিন অভিজাতদের খাসমহলের সম্পত্তি ছিল, তা যেন ক্রমে ক্রমে 'পিপলস থিয়েটার' হয়ে উঠতে থাকল। তাই শৌখিন থিয়েটারের শেষ লগ্নে বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হতে লাগল নাটক। ১৮৬৫ সালের ১১ ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটার কোনো এক ধনীর গৃহে অভিনীত হয়, মধুসূদনের 'পদ্মাবতী'। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই। ১৮৬৭ সালের মধ্যে একাধিকবার 'শকুন্তলা'র অভিনয় হয়। কাঁসারিপাড়ার কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়িতে ঐ বছরই অভিনীত হয় 'শকুন্তলা' এবং 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ'। ১৮৬৭ সালে হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে অভিনীত হয় 'কিছু কিছু বুঝি', নাট্যকার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৮ সালে বাগবাজার নাট্যসমাজের সভাপতি ক্ষেত্রমোহন বসুর সুরারোপিত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইন্দুপ্রভা' নাটকটি অভিনীত হয়।

সেকালের মফঃস্বলে কলকাতার প্রভাব ছিল খুব বেশি। কাজেই কলকাতার নাট্যচর্চার প্রভাব খুব সহজেই মফঃস্বলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন ১৮৫৮ সালের ১ জানুয়ারি যশোহরের অর্ন্তগত রাড়ুলিগ্রামে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। পৃষ্ঠপোষকতা করেন স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের সেরপুরে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'। ১৮৭০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের 'সাহিত্য সংসৎ' সভার উদ্যোগে অভিনীত হয় এডিসনের 'কেটো' এবং শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার সরকারের উদ্যোগে 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয় চুঁচুড়ায়। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ ও ১৩ এপ্রিলে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' ঢাকায় ও তমলুকে অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়।

৭.১.৩. ১৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শখের নাট্যশালাগুলির বাংলা নাট্যজগতে ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৭.১.২. ১৮ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

বাংলা (এম.এ), চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র ঃ নাট্যসাহিত্য

সপ্তম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ১

একক ঃ ৪ - যাত্রাভিনয়

বিন্যাসক্রমঃ

৭.১.৪.১ ঃ ভূমিকা

৭.১.৪.২ ঃ যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস

৭.১.৪.৩ ঃ যাত্রা ও অপেরা

৭.১.৪.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.৪.১ ঃ ভূমিকা

'যাত্রা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'গমন'। এই 'গমন' বা 'প্রস্থান'কে আগেকার দিনে দেবতার উৎসব হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন ছিল। দেবতার উৎসবে মিছিল বা শোভাযাত্রা করে, নৃত্যগীত সহযোগে পৌরাণিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হতো। সর্বোপরি দেবতার উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে থাকে। 'যাত্রা' ধর্ম উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে, তাতে পুরনো দিনের ইতিহাস বা লোকসাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়। তখনকার দিনের মানুষ ভক্তিতে, দেবদেবীর উপর নির্ভরশীল ছিল। সাংসারিক প্রতিটি কাজে দেব-দেবীকে স্মরণ করার রীতির প্রচলন ছিল। সেইজন্য মানুষ সকাল-সন্ধে দেব-দেবীর বন্দনা করতো। নির্দিষ্ট তিথিতে দেব-দেবীকে লোকজ রীতি মেনে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। এই 'গমন' উপলক্ষ্যেই নৃত্য, গীত সহযোগে উৎসব অনুষ্ঠিত হত বলে, উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের দেশের রক্ষণশীলতার কারণে সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তারফলে বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সমাজ যা বিধান দিতেন, সাধারণ মানুষ তাই মেনে নিতেন। প্রেম আর ভক্তির কারণে শক্তি বিষয়ক তত্ত্বের আরাধনা করতেন।

৭.১.৪.২ ঃ যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস

যে কোন দেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রাধান্য ধনী সম্প্রদায়ের, কেননা তারাই তো সবকিছুর মাথার উপর। একদিকে

যেমন ছিল কৃষিকাজ, অপরদিকে তেমন ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কারণে লোকে সুখে বসবাস করতো। তারফলে সাধারণ মানুষকে বাড়ির বাইরে যেতে হতো। এই প্রসঙ্গে একটি লোকজ প্রবাদ খুবই জনপ্রিয় -

''মঙ্গলে উষা যাত্রা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।''

এই প্রবাদ থেকেও 'যাত্রা' কথাটির উৎপত্তি বলে অনেক সমালোচক মনে করেন । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গ্রন্থে, অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - ''সূর্যের গমনাগমনের উপর কৃষি জীবন যেমন নির্ভর করত, তেমনি তাকে কেন্দ্র করেই নানা উৎসব হত। সূর্যের প্রধান দুই গমন - উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ। দক্ষিনায়ণকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে 'রথযাত্রা' উৎসব এবং সূর্যের বিষুবরেখার অবস্থানকে কেন্দ্র করে চড়ক উৎসব। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্য প্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করে 'কৃষ্ণযাত্রা' গড়ে ওঠে।'' (পৃ.৩২) কৃষ্ণ কথা নিয়ে রচিত যাত্রাকে বলা হতো কৃষ্ণযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল ধর্মভাবের মাহাত্ম্য বর্ণণার মধ্য দিয়ে, ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্বে; ধর্মের জয় ঘোষণা করা। সাধারণ দর্শক কৃষ্ণযাত্রা শোনে সত্য ও ন্যায়ের পথকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। সাধারণ মানুষ সংসারের পুণ্যের কথা ভেবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও রাসযাত্রা পালন করে এসেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও ভারতবর্ষে গান ও কাহিনী কাব্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বাদশ শতকে রচিত হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বিভিন্ন রাগ, বিভিন্ন তাললয়ের উল্লেখ রয়েছে। ''গীতগোবিন্দ বিভিন্ন চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ ও সখী) উক্তি- প্রত্যুক্তি- সমন্বিত নাট্যলক্ষণযুক্ত কাব্যগ্রন্থ।'' 'গীতগোবিন্দ' মহাকাব্যরোচিত স্বভাব বর্ণনারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্রের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। তা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটগীত বা যাত্রার প্রচলনটি আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা 'কালীয়দমন' লীলার পরিচয় পেয়েছি - ''একটি বড়ো পুকুরকে কালিন্দীর হ্রদ হিসেবে সাজিয়ে এই অভিনয় হতো।''

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক অভিনব যুগান্তকারী ঘটনা। কবি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪২) গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুও নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং তৎকালীন সমাজে পুরাণ- নির্ভর বিভিন্ন কাহিনী চরিত্রানুযায়ী পোশাকে সজ্জিত হয়ে সংলাপ আকারে পরিবেশনের রীতি ছিল 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

কবি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাট্যাভিনয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। কবি জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু একবার মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি বঁড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অংশ বিশেষের অভিনয় করেছিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য বললেন যে, তিনি 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' করবেন। তখন তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে চরিত্র বন্টন করা হলো। রুক্মিনীর চরিত্রে গদাধর, সখির চরিত্রে ব্রহ্মানন্দ, বড়াই বুড়ির চরিত্রে নিত্যানন্দ এবং দেবী লক্ষীর চরিত্রে স্বয়ং মহাপ্রভু অভিনয় করবেন ঠিক হলো। নগরের কোতোয়াল আর নারদের ভূমিকায় নামলেন যথাক্রমে হরিদাস এবং শ্রীবাস। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তখনকার দিনে সামাজিক নাটক ছিল না, পৌরাণিক ঘটনা কেবল নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হতো। তখন স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতো পুরুষেরা। অবশ্য সাধারণ দর্শকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সবাই থাকতো। তবে নাট্য সংলাপ তৈরী হতো মুখে-মুখেই। অভিনেতাদের তেমন জোরালো সংলাপ শুনে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়তো, করুণ দৃশ্যে তারা কাঁদতো। আর তখন অভিনয় চলতো সারারাত ধরে। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলেও খানিকটা এখনকার লোকনাট্যের ধরনে অভিনয় দলও থাকতো। ''একথা ঠিক, প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার মতো একটি লৌকিক নাটক (Folk Drama) প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে তাকেই নাটগীত বলা হত। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য দেবতার সম্মুখে নাট মন্দিরে যে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হত, তাকে বলা হল নাটগীত।'' আনুমানিক ১৫০৯ সালে চৈতন্যের সময়কালে যাত্রার সঙ্গে অভিনয় কলা যুক্ত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। আর প্রথম যাত্রাপালা হিসেবে 'রুক্মিনীহরণ' কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে অধিকারীকেন্দ্রিক যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রাওয়ালারা নিজেদের পারদর্শিতায় যাত্রা শিল্পকে খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ মানুষের কাছে উপহার দিতো। সাধারণ মানুষ তখন সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতো, দৈনন্দিন জীবনে এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য মনোরঞ্জন হিসেবে যাত্রা দেখতে যেত। যদিও দর্শক হিসেবে সমাজের নারী - পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল অবাধ। সেই সময় কালীয়দমন যাত্রা পালাকার হিসেবে শ্রীদামদাস, সুবলদাস এই দুই ভাই বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী ছিলেন। দুই ভাই এর পর যাত্রাপালাকার হিসেবে নাম করেছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। সেই সময় পরমানন্দ দাসের সমসাময়িক ছিলেন প্রেমচাঁদ। বাংলা যাত্রাভিনয়ের ইতিহাসে, যাত্রাশিল্পী হিসেবে বদন অধিকারীর নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রেমচাঁদের শিষ্য। অপর আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, তাকে পরমানন্দ দাসের 'ছোকরা' বলে অভিহিত করা হতো। কালীয়দমন যাত্রার অভিনয় সর্বজনবিদিত ছিল বলে, পরবর্তীকালে অভিনয় চর্চায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। গোবিন্দ অধিকারী কালীয় দমন যাত্রায় বৈষ্ণব গীতির পরিবর্তে নাট্যিক ক্রিয়া ও সংলাপের ব্যবহার যুক্ত করেছিলেন। তবে সাধারণ দর্শক সমাজ চাইতো যাত্রার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভক্তিরস ও আদিরসের খোঁজ পেতে।

‘যাত্রার ইতিবৃত্ত’ প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - ‘‘যাত্রা পরিবেশনার পরিবেশ নিয়ে যে আগে বৃহৎ জনসমুদ্র যাত্রা গায়করা যে সুর ও স্বরক্ষেপন ব্যবহার করতেন তারফলে সবাই তা শুনতে পেতো। তাঁরা চিৎকার করতেন না কিন্তু এমন বিশেষ স্বরগ্রামে পৌছে দিতেন তাদের গান বা কথাকে যা সকলের শ্রুতি গ্রাহ্য হতো। এটা এক ধরনের দক্ষতা -অভ্যাস ও চর্চার ফল। বন্দুকের আওয়াজ যত দূর থেকে যেতে পারে তার চেয়ে অনেক দূরগামী চৌকিদারী হাঁক ও ডাকাতদের ‘কুক’। যাত্রাপালা গায়কেরাও এক বিশেষ স্বরক্ষেপনের সুর আয়ত্ব করেছিলেন বলে তা সম্ভব হতো।’’

মহাপ্রভুর আগমনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন পালাবদলের পালা ঘটেছিল ঠিক তেমনটাই ঘটল আঠের শতকে। নতুন এক জমিদার শ্রেণী তৈরি হল, ‘‘মাটিতে যাদের পড়ে না চরণ’’। স্থিতাবস্থার অভাব দেখা গেল দেশে, এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় সাহিত্য নতুন পথে এগোতে লাগল। এগোতে যে লাগল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠের শতকের ভারতচন্দ্রের রচনায়। ‘বিদ্যাসুন্দরের’ রসালো কাহিনী সেইসময় জনপ্রিয় ছিল। আঠের শতকে দেব-দেবীর কথা লেখা হলেও ভক্তি ততটা ছিলনা। ভারতচন্দ্র রায়কে আমরা দেখলাম দেবাদীদেব মহাদেবকে নিয়ে তিনি যেমন মজার গল্প লিখলেন। এই ‘রায়গুণাকর’ কবি রাজকণ্ঠের মণিমালা দিয়ে গোটা একটা যুগকে এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে পরের যুগও তাতেই ঝলমল করেছে। আবার এই আঠের শতকেই সহজ সরল ভাষায় লেখা ঊমা ও শ্যামা সঙ্গীত গুলিতে গোটা বাঙালি জাতির মনোরঞ্জন করেছেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। সেইসব গান বাঙালির পারিবারিক জীবনে দুঃখের বারমাস্যা দিয়ে বাঁধানো। আসলে সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকে না। তাই আগের যুগ, পরের যুগকে প্রভাবিত করে। আর এই সময় শিক্ষাদীক্ষাহীন সমাজে, আনন্দ উপভোগের জন্য কবিগান, খেউড়গান, হাফআখড়াই গানের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বাড়তে লাগল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একদিকে গদ্য সাহিত্যের প্রচলন, সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা পালার অভিনয় চর্চা। সেইসময় লোচন অধিকারীর ‘অক্রুর সংবাদ’, ‘নিমাই সন্ন্যাস’, বদন অধিকারীর মান, দান, মাথুর পালার অভিনয় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। যাত্রাপালাকার গোবিন্দ অধিকারী ‘কৃষ্ণযাত্রা’ ‘কালীয়দমন যাত্রা’র অভিনয় করিয়েছেন। সাধারণ দর্শক সমাজ উপরোক্ত যাত্রা পালার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছে। এমনও শোনা যায় তখন নাকি খেমটা নাচের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তারফলে যাত্রা কাহিনীর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নৃত্য ও গীত প্রবেশ করেছে। ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাহিনি বা নলদময়ন্তী কাহিনীর থেকে সাধারণ দর্শক অশ্লীল নৃত্য-গীত বেশি করে পছন্দ করতে শুরু করেছে। ‘‘তখন কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর -মেথরানি, ঘেসড়ে-ঘেসেড়নি, নাপিত-নাপিতানি প্রভৃতি অশ্লীল নৃত্যগীত প্রবেশ করে আবার যাত্রাকে নিম্নরুচির বাহন করে তুলেছে।’’ ‘যাত্রার ইতিবৃত্ত’ প্রবন্ধে

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন - ''এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ বর্গীরূপে আমাদের লুণ্ঠন করতে এসেছিল। তখন ধনী পুরুষেরা ধন রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এরপর যখন মহারাষ্ট্রীয় নারী বাঈজীরূপে আমাদের বাংলায় এল তখন ধনীরা সব ধন তাদের পায়ে ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়, এই বাঈজীরা আরো এক সর্বনাশ করলো আমাদের, তা হলো আমাদের সাবেকী সুরের যে মহিমা ও আভিজাত্য ছিল এই বাঈজী সংস্কৃতি তা বিনষ্ট করলো।

এই সময় কলকাতায় ইংরেজেদের সাহচর্যে এক শ্রেণির মানুষ ধনী হয়ে উঠল। এদের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকলেও তারা ক্রমশ শৌখিন হতে লাগল। এইরূপ সংকটের সময় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশি রঙ্গ ালয়। ইংরেজ শাসক তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল থিয়েটার স্থাপন করে। শৌখিন নাট্যশালা বা বাবু থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে বাঙালিদের থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক শ্রেণির যুবক সম্প্রদায়, যারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ধনী বাঙালিগণ সেইসময় শৌখিন রঙ্গালয় গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। কলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায় তখন শ্রীখোল-খঞ্জনির মধুর মধুর বোল ছেড়ে তবলার মৃদু তালে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। ধনী ব্যক্তিরা বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শ ত্যাগ করে তবলা ও ঘুঙুরের বোলে শখের দলের সৃষ্টি করলেন।

তখন সাধারণ দর্শক সমাজ অনুভব করতে পেরেছে শ্রীখোল -খঞ্জনির সহযোগে কালীয়দমন পালার অভিনয় হয়েছে। আর তবলার ঘুঙুরের সহযোগে নতুন রীতির অভিনয় শুরু হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, কালীয়দমন পালায় বৈষ্ণব ভক্তি, আর শৌখিন রঙ্গালয়ে সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এমনকী লোক মনোরঞ্জনের জন্য তখন যাত্রা পালার মধ্যে অশ্লীল নাচ-গানের আয়োজন করা হতো। জমিদার শ্রেণির মানুষ সারারাত ধরে যাত্রার অভিনয় দেখতেন। সেইজন্য যাত্রাওয়ালারা বা নির্দেশকরা বা নিজেদের ইচ্ছেমতো যাত্রাকাহিনিকে টেনে নিয়ে যেতেন ভোর পর্যন্ত। এর নিদর্শন পাওয়া যায় কালী প্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায় (১৮৬২)। '' একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড় মানুষের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছে। .... বছর ষোল বয়সের ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিশে রূপের গেলাসে ব্রান্ডি চলছে।''

৭.১.৪.৩ ঃ যাত্রা ও অপেরা

বাংলা যাত্রার সঙ্গে ইংরেজী অপেরার একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। ''যে নাটকে সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্য এবং রস দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়, তাকে বলে অপেরা।'' শখের নাট্যশালা তৈরি হওয়ার পর থেকে যাত্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমতে থাকে। কলকাতা শহরের নাট্যশালাগুলিতে নাটকের অভিনয় দেখতে সাধারণ মানুষ বেশি পছন্দ করেছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। তখন যাত্রাপালার নির্দেশকরা

যাত্রা শিল্পের দিকে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, যাত্রার প্রাথমিক রূপই ছিল কাহিনীসুত্রে গানের মালা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন - '' রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।'' আমরা জানি, গীত ও নৃত্য সহযোগে যে নৃত্যনাট্যের আবির্ভাব, তারসঙ্গে গীতিনাট্য বা অপেরার পার্থক্য আছে। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে' , ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন - ''রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক দেখিবার সুযোগ পাইলেও দর্শক সাধারণ ধর্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা দেখিতে অভিলাষী ছিল। নাটকের প্রচলন হইলেও সর্বত্র রঙ্গালয় স্থাপন করা সম্ভব এবং সাধ্য ছিল না। এই দুই কারণেই নাটকের মত লিখিত অথচ যাত্রার ন্যায় অভিনেতব্য এইরূপ এক প্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হইল। ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইত।'' (পৃ১১২) গীতিনাট্যে প্রাধান্য পায় গীতিময়তা তথা লিরিক মূর্ছনা, নৃত্যনাট্যে শরীরের অঙ্গভঙ্গি সমান্তরাল সংলাপ রচনা করেছে। সেইজন্য নৃত্যনাট্য আরও বেশি মানবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। যাত্রা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের পাশাপাশি অপেরা মালিকদের বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। কলকাতা শহরের অপেরা গুলির সঙ্গে সঙ্গে জেলা শহরেও ছোট ছোট যাত্রাদলগুলি সবদিক থেকে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া মানুষের হাতে এমনিতেই সময় খুব কম, তার উপর যদি যাত্রা দেখে যদি ভালো না লাগে তাহলে তো খুবই মুশকিল। অপেরা লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন বসু শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল - 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫), 'প্রণয়-পরীক্ষা' (১৮৬৯) প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - '' পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে।'' কেননা বিভিন্ন অপেরার মধ্যে আর যাত্রার সুর নির্ভরতা নেই, সেই জায়গা দখল করল 'Action' । মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আর পৌরাণিক পালা যেমন চলবে না, তেমনি যাত্রায় সংগীত কমে অভিনয়ের কারুকার্য বেশি করে তুলে ধরা হতে লাগলো। বর্তমানে অপেরা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে যাত্রাদলকে। যেমন - সত্যস্বর অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, ভৈরব অপেরা, দিগ্বিজয়ী অপেরা ইত্যাদি।

বিশ শতকের শুরুতে যাত্রাপালার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমমূলক কাহিনির অভিনয় শুরু হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার জন্য অপেরা মালিকরা বা নির্দেশকরা যাত্রাকাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে এলেন। স্বদেশী যুগে শ্রেষ্ঠ পালাকার ছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯১৭-১৯৭৬)। মুকুন্দ দাস স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক গান ও নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলির মধ্যে 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্মক্ষেত্র', 'দাদা', 'জয়পরাজয়' প্রভৃতি। আর যাত্রার পালাবদলের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নাম স্মরণীয়। ''তিনি কেবলমাত্র পালাসম্রাট বা লোকনাট্যগুরু ছিলেন না, তিনি

ছিলেন বাংলার যাত্রাপালা ও লোকাভিনয়ের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তক।'' যাত্রাপালা নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন। আগেরকার দিনে যাত্রাপালার মঞ্চায়নে সংলাপ থাকত দীর্ঘ, বক্তব্যে থাকতো রঙ্গ রস। তিনি এসব বিষয়গুলিকে বর্জন করে যাত্রাপালার বিষয়ে নিয়ে আসেন বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান করেছেন। পৌরাণিক পালা ও ঐতিহাসিক পালার পরিবর্তে সামাজিক পালা, বিপ্লবীপালা তাঁর হাতে রচিত হতে থাকে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল - 'ব্রজনাভ', 'লীলাবাসনা', 'চাঁদের মেয়ে', 'মায়ের ডাক', 'লোহার জাল', 'বালির বাঁধ', 'বিদ্রোহী নজরুল', 'ভারত পথিক রামমোহন', 'নন্দকুমারের ফাঁসি', 'অনাথ জননী' প্রভৃতি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গ্রন্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - ''প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাত্রাপালা লিখতে শুরু করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় নিরন্তর যাত্রাপালা লিখে গেছেন। বহু ঘটনার উত্থান পতনের সাক্ষী ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাতেও বিষয়ের নানা বিস্তার ঘটিয়ে তাঁর পালাকে বহুমুখী করে তুলেছিলেন অবক্ষয়ী যাত্রাপালকে নানাভাবে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন।'' (পৃ. ৪৩)

বিশ শতকের পাঁচের দশক ও ছয়ের দশকে প্রচলিত ও গতানুগতিক ধারার সংস্কার লক্ষ্য করা গেছে। যাত্রাপালার বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি যাত্রাপালায় কোনো কোনো বিখ্যাত চরিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়। এই সময় আবার নাটকের জনপ্রিয়তার সঙ্গে যাত্রাপালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন অপেরা তাদের সাধ্যমতো প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে, তারফলে মানুষের মনোরঞ্জন বেড়েছে। এমনকী চলচ্চিত্র ও নাটকের বিখ্যাত কলা কুশীলব বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাত্রাপালায় অভিনয় করতে দেখা গেছে, এতে কিন্তু সাধারণ দর্শক আনন্দ পেয়েছে বেশি করে। সর্বোপরি যাত্রাপালার অভিনয় দেখার মজাই আলাদা। একদিকে গান, অপরদিকে প্রমোটারের নির্দেশনা কিছু সময়ের জন্য হলেও মুগ্ধ করে রেখেছে দর্শকদের।

সবশেষে একথা বলা যায় যাত্রা শিল্পটি লোকনাট্য ধারায় একটি মাধ্যম, এতে ৪ ঘন্টা ব্যাপী পরিবেশনায় উচ্চ শব্দে ও চড়া আলোর ব্যবহারে, চারিদিকে খোলা মঞ্চে সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট, মোবাইলের যুগে মানুষের হাতে এখন বিনোদনের নানা সম্ভার। তাছাড়াও টেলিভিশনের প্রভাবে গ্রাম-শহর সর্বত্রই সারাদিন মেগা সিরিয়াল চলতে থাকে। আগেরকার দিনে বাড়ির বয়স্ক মহিলা-পুরুষ যাত্রাপালার অভিনয় দেখতে যেতেন, এখন খুব কম সংখ্যক মানুষ বাড়ির বাইরে পা রাখেন। সেই সময় তারা মেগা সিরিয়াল দেখতে থাকেন। আর বর্তমান প্রজন্ম দ্রুতগতির জীবনে যাত্রার অভিনয় দেখা নিয়ে খুব একটা উৎসাহী নয়, বরঞ্চ তারা মোবাইলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম করতেই পছন্দ করেন। আবার বিভিন্ন মেলাতে যাত্রার অভিনয় প্রদর্শিত হলেও দর্শক সাধারণ বিভিন্ন কেনাকাটি ও খাওয়া দাওয়াতে সময় ব্যয় করেন। এমনকী সেইসব দর্শক অর্কেস্ট্রা, ডি.জে, দেখতে-শোনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ

সরকার কলকাতার বাগবাজারে স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি।

৭.১.৪.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। যাত্রার সঙ্গেঁ অপেরার সম্পর্ক কোথায়?

৩। বর্তমান শতাব্দীতে যাত্রা শিল্পের সংকটের কারণ নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৭.১.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস – ড. অজিত কুমার ঘোষ

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস – দর্শন চৌধুরী

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। নাটকের রূপনীতি ও প্রয়োগ – সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৫। সাহিত্যের রূপ রীতি কোষ – ড. অশোক কুমার মিশ্র

একক -৫

পেশাদারি নাট্যশালা

বিন্যাস ক্রম :

৭.১.৫.১ : ভূমিকা

৭.১.৫.২ : ন্যাশনাল থিয়েটার

৭.১.৫.৩ : গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটার

৭.১.৫.৪ : মিনার্ভা থিয়েটার

৭.১.৫.৫ : বেঙ্গল থিয়েটার

৭.১.৫.৬ : স্টার থিয়েটার

৭.১.৫.৭ : এমারেল্ড থিয়েটার

৭.১.৫.৮ : বীণা থিয়েটার

৭.১.৫.৯ : কোহিনূর থিয়েটার

৭.১.৫.১০ : জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

৭.১.৫ ১১ : ক্লাসিক থিয়েটার

৭.১..৫.১২ : মনমোহন থিয়েটার

৭.১.৫.১৩ : শ্রীরঙ্গম থিয়েটার

৭. ১.৫ ১৪ : বিশ্বরূপা থিয়েটার

৭.১.৫.১৫ : রঙমহল থিয়েটার

৭.১.৫.১৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.১.৫.১৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.৫.১ : ভূমিকা

মৌলিক বাংলা নাটক উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি দেশীয় লোকজ উপাদান অথবা প্রাচীনঐতিহ্য অনুযায়ী মৌলিক বাংলা নাটক উদ্ভব হয়নি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে জানতে পারি তাদের লোকজ উপাদান অথবা প্রাচীন ঐতিহ্যের যে কোনো একটির হাত ধরেই মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে। একমাত্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই এই দুই উপাদানের বাইরে গিয়ে বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিপূর্বেই সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের পথচলা শুরু হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মৌলিক বাংলা নাটক আমাদের সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রায় সকলেই অনুভব করেন। পার্থক্য হল এই নাটক মঞ্চস্থ হলে অক্ষরজ্ঞানবিহীন মানুষও নাটক বোঝেন। কাজেই নাটকের এই মঞ্চায়নের জন্য প্রয়োজন হয় নাট্যমঞ্চ বা নাট্যশালা।

ইতিপূর্বে নাটকের ইতিহাস আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব নাট্যশালার ইতিহাস। নাট্যযাত্রার ইতিহাস অনুযায়ী এক রুশদেশীয় ভদ্রলোক লেবেডেফের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রথম (১৭৯৫ সালে) 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বাংলা নাট্যশালার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার লেবেডেফের থিয়েটারের পূর্বে বাংলায় শুধুমাত্র কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কিছু পালা, কিছু গ্রাম্য স্থূল আমোদ-প্রমোদের জন্য কথকতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। লেবেডেফের থিয়েটারের প্রায় ৩৫ বছর পর বাঙালীর দ্বারা প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি হল প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটার যার সময়টা ছিল ১৮৩১সাল। এরপর একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামবাজারের নবীন বসুর নাট্যশালা, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার, আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়ির নাট্যশালা ইত্যাদি। তবে এগুলি ছিল সখের নাট্যশালা। সামগ্রিক ভাবে সাধারণের কাছে এগুলি তখনো পৌঁছোতে পারেনি। এর অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২), যা প্রথম বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ । এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, লেবেডেফ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারের আগে পর্যন্ত প্রায় ৭৭ বছর বাঙালী থিয়েটারকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি। সেই সময় আমাদের দেশ পরাধীন, জনমত গঠনে থিয়েটার বিরাট একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু উদ্যমহীন বাঙালী নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নিজেদের মধ্যেই থিয়েটার কালচারকে আবদ্ধ রেখে দেশের প্রতি দায় দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল, এটা বাঙালী জাতির এক চরম লজ্জার অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। যাইহোক ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই প্রথম পেশাদারিত্বের সূচনা হয় বাংলা থিয়েটারের। আপামর সাধারণ মানুষের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দেবার এক গূরুত্বপূর্ণ কাজ করে ন্যাশনাল থিয়েটার। সখের নাট্যশালা থেকে নাট্যশালা সাধারণের হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে সাধারণ রঙ্গালয়, এখন আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের আলোচনায় প্রবেশ করব।

৭.১.৫.২: ন্যাশনাল থিয়েটার

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত একদল যুবকের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুবকদের বেশিরভাগই বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত ন্যাশনাল থিয়েটার নির্মাণে এগিয়ে আসা যুবকেরা হলেন মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন মনমোহন বসু, শিশির কুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র।

এই নাট্যশালার মঞ্চ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন ধর্মদাস সুর, সহপ্রধান ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছিলেন জেনারেল মাস্টার, ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয় ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। 'নীলদর্পণে'র অভিনয়টি হয়েছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, মতিলাল সুরেদের অভিনয়ও খুব প্রশংসা পেয়েছিল। তবে কলকাতার দর্শকদের কাছে গ্রামবাংলার মানুষদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী অজ্ঞাত থাকায়, অনেকে প্রস্তাব করেন নাটকটি গ্রামবাংলায় অভিনয় করবার জন্য।

তবে ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মকর্তারা আর্থিক কারণেও ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য টিকিট প্রথা চালু করলেন, টিকিটের মূল্য করলেন — প্রথম শ্রেণী ১টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী — আট আনা, রিজার্ভ সিট — ২টাকা, দালানের সিঁড়িতে বসলে — ৪ আনা। যাইহোক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর ১৪ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'জামাই বারিক'। এরপর আবার 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয় ২১ ডিসেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'সধবার একাদশী'। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭৩ এ অভিনীত হয় 'নবীন তপস্বিনী', ৪ জানুয়ারি, 'লীলাবতী', ১১ জানুয়ারি, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', ১৫ জানুয়ারি, 'নবীন তপস্বিনী' ১৮ জানুয়ারি, 'নবনাটক' ২৫ জানুয়ারি, 'নীলদর্পণ' ১ ফেব্রুয়ারি 'নয়শো রুপেয়া' (শিশির ঘোষ), ৮ ফেব্রুয়ারি, 'জামাই বারিক' ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি। এখানে প্রায় সব নাকটই দীনবন্ধুর। এর আগে কোনো সখের নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়নি, নাট্যপাগল যুবকেরা এই নাটক দিয়েই তাদের থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন। এতে করে সাহেবরা মনোক্ষুণ্ণ হলে তাঁরা কোনোক্রমে তা সামাল দেন। তবে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় কিন্তু তারা চালিয়ে যায়।

প্রথম পর্বের ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের শেষ অভিনয় ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ', শেষ রজনীতে অভিনীত হয় 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। অভিনয় শেষে অর্ধেন্দুশেখর বিদায় ভাষণ দেন এবং বিহারীলাল বসুর গান দিয়ে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়। এরপরই দল ভেঙে যায় এবং দুটি দলে পরিণত হয় -- একটি রইল ন্যাশনাল থিয়েটার নামে, অন্যটি হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নামে। প্রথম দলে রইলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দল ভেঙ্গে যাওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে —

১. টিকিট বিক্রির ফলে ন্যাশনালের উপার্জ্জন বেশ ভালোই হচ্ছিল। সেই আয়ের হিসেব রাখা, কারা কত টাকা পাবে, কারা পাবে না, এই নিয়ে প্রথম মতান্তর দেখা যায়।

২. গিরিশ ঘোষ ন্যাশনালে যোগ দেওয়ার পর ন্যাশনালের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে স্পষ্ট মতভেদ দেখা দিল, কারণ গিরিশ সবদিকেই নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়ে পরিস্থিতির জটিলতা বাড়িয়ে তুললেন।

৩. খ্যাতির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শুরু হল মনোমালিন্য। পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত।

যাইহোক দুটো দলই কিছুকাল নিজেদের মতো করে অভিনয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এদিকে শেষপর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে উঠল, কিনে নিলেন ব্যবসায়ি প্রতাপচাঁদ জুহুরী। পাকাপাকি ভাবে বাংলা থিয়েটার বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত হল।

এবারে প্রশ্ন হল, ন্যাশনাল থিয়েটার কতটা জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা পেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পরাধীন দেশের নাগরিকদের জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে না, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একমাত্র জাতীয় নাট্যশালা সম্ভব। সেই হিসেবে ব্রিটিশ-পরাধীন বাংলায় জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠতে পারে না। তবু, এই নাট্যশালার নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে এর মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ন্যাশনাল থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব :

১. এর আগে সখের নাট্যশালায় সাধারণের প্রবেশ অবাধ ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটারে যে কোনো ব্যক্তি টিকিট কিনে নাটক দেখার সুযোগ পেলেন এবং টিকিটের মূল্যও ইংরেজদের থিয়েটারের থেকে অনেক কম ছিল। তাই সাধারণ মানুষ সহজেই টিকিট কিনতে পারত।

২. সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই যোগ ও প্রবেশাধিকার স্বীকৃত ছিল বলে একে সাধারণ রঙ্গালয় বলা হয়ে থাকে।

৩. এখানকার অভিনেতারা প্রয়োজনে কিছু কিছু অর্থ পেতেন, অভিনেতাদের অর্থগ্রহণের মধ্যে পেশাদারি থিয়েটারের বীজ তৈরী হয়েছিল।

৭.১.৫.৩ : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও স্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আরেকটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) মহেন্দ্রনাথ দাসের খালি জমি মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের জন্য ভুবনমোহন ইজারা নেয়। ধর্মদাস সুর সেখানে গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের ছাঁচে কাঠের তৈরী এক সুদৃশ্য রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। এই নতুন রঙ্গালয়ের নাম হল — গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

১৮৭৩ এর ৩১ ডিসেম্বর থিয়েটারের উদ্বোধন হল অমৃতলাল বসুর 'কাম্যকানন' নাটক দিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমরাত্রেই কিছুক্ষণ অভিনয় চলার পর সামনের 'star light' থেকে আগুন লেগে থিয়েটার বাড়ির ক্ষতি হয়। এরপরের দিনই গ্রেট ন্যাশনাল বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে, 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করে। প্রথম অভিনয়ে এই ভাবে বাধা পেয়েও এঁরা পিছু পা হননি। নতুন উৎসাহে থিয়েটার বাড়ি পুনর্নির্মাণ করে, ১৮৭০-এর ১০ জানুয়ারি আবার অভিনয় শুরু হল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক দিয়ে। এই সময় গ্রেট ন্যাশনালে কোনো খ্যাতিমান নাট্যকার না থাকায় কর্তৃপক্ষ কিছুদিন গিরিশচন্দ্রকে তাদের দলে আনলেন। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষ'-এর গিরিশ কর্তৃক নাট্যরূপের অভিনয় হল। 'মৃণালিনী' খুবই সাফল্য লাভ করল। এরপর ন্যাশনালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ৭ মার্চ অভিনীত হল 'নবাবের নবরত্না সভা', ১৮ মার্চ দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'। ১৮ এপ্রিল 'হেমলতা'। ৩০ মে 'কুলীনকন্যা' বা 'কমলিনী'। এইভাবে পুরনো ও নতুন নাটকের অভিনয় চালাতে চালাতে ৩০ মে, ১৮৭৪ এর পর চার মাসের জন্য 'গ্রেট ন্যাশনাল ৫জন অভিনেত্রী গ্রহণ করল — কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী। অভিনেত্রী নিয়ে প্রথম অভিনয় 'সতী কি কলঙ্কিনী' (১৮৭৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর)। গ্রেট ন্যাশনালের খ্যাতি তখন গগনচুম্বী, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাদের প্রশংসা বেরোল।

ইতিমধ্যেই, গ্রেট ন্যাশনালে ম্যানেজার বদল হল। আগের ম্যানেজার ধর্মদাস সুরের সঙ্গে ভুবনমোহনের 'আয় ও অর্থ' নিয়ে অনর্থ বাধে, ফলে তাঁকে সরিয়ে ম্যানেজার করা হয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সময় অভিনীত হয় — জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' (৩ অক্টোবর ১৮৭৪), 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'ভারতে যবন' (১০ অক্টোবর), শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বাংলা রূপান্তর 'রুদ্রপাল' (হরলাল রায়), 'আনন্দকানন' (লক্ষ্মীজনার্দন চক্রবর্তী), 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। এই সময়ে অর্ধেন্দুশেখর আবার গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দিয়ে 'আনন্দকাননে' একটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। এরই মধ্যে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা হলে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে দেন। এরপর আবার ধর্মদাস সুরকে ম্যানেজার করা হয়, ১৮৭৫-এর জানুয়ারি। ১৬ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল সাময়িক আঘাত কাটিয়ে 'শত্রুসংহার' নাটক দিকে আবার অভিনয় শুরু করে। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকে দ্রৌপদীর সখীর এক ছোট্টভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন, ১৮৭৪-এর ১২ ডিসেম্বর।

এরপর উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের প্রথম অভিনয় (১৮৭৫ এর ২ জানুয়ারি) হয় এখানে। এই নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হল। এই নাটকে গোলাপসুন্দরী সুকুমারীর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সুকুমারী নামে পরিচিত হন। এরপর 'রাসলীলা, প্রমথনাথ মিত্রের 'নগনলিনী', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। ১৮৭৫-এর মার্চে গ্রেট ন্যাশনাল টাকা উপার্জনের জন্য দিল্লী, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করে। এখানে নৃত্যগীতের অভিনয় চলত ভালো, এরপর প্রচুর অর্থোপার্জন করে ১৮৭৫-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মূল দলে যোগ দিল। জুলাই মাসে মহেন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় দিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় শুরু হয়।

পরবর্তীতে আবার ধর্মদাসের সঙ্গে ভুবনমোহনের গোলমাল বাঁধে। তখন ভুবনমোহন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রঙ্গমঞ্চটি ইজারা দেন, ম্যানেজার হন মহেন্দ্রলাল বসু। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইজারা নিয়ে পুরনো থিয়েটারের নাম পাল্টে করেন — 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'। এখানে 'পদ্মিনী' নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। ১৪ আগস্ট হয় 'শরৎ-সরোজিনী', ২১ আগস্ট 'নীলদর্পণ'। এই সময়ে অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থেকে এসে এখানে যোগ দেন।

তারপর অভিনীত হয় সুকুমারী দত্তের লেখা 'অপূর্বসতী'। এরপর 'ডাক্তারবাবু', 'কনকপদ্ম', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি। এইভাবে টানা চার মাস কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন থিয়েটার চালাতে গিয়ে লাভের পরিবর্তে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তখন ভুবনমোহন বাধ্য হয়ে আবার থিয়েটার নিজের হাতে নিয়ে নেন। আবার পুরনো নামে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' তার অভিনয় চালু করল। এবারে নতুন ম্যানেজার উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৮৭৫-এর ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলালের লেখা 'হীরকচূর্ণ' নাটক দিয়ে এদের অভিনয় শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর এখানে হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের প্রথম অভিনয়।

এরপরের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে ঘটে যায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Act. 1876) । পরাধীন জাতির নাট্য-সংস্কৃতির ওপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি আইনের রূপে দেখা দিল। এই সময় ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা প্রহসনটি ১৮৭৬-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। একই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকটিও অভিনীত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সঙ্গে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' দ্বিতীয়বার এখানে অভিনীত হয়। এরপরই পুলিশ এই নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন এর নাম পাল্টে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়ে অভিনয় করানো হয়। এটিও পুলিশ বন্ধ করে দেয়।

এদিকে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের চাপে পড়ে গ্রেট ন্যাশনাল 'সতী কি কলঙ্গিনী', 'উভয় সংকট' জাতীয় নাটক অভিনয় করতে থাকে। কিন্তু এই সময় থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। পুরনো নাটকগুলিই চালাতে থাকে। ১৮৭৬-এর ৮ এপ্রিল থেকে এখানে অভিনয় বন্ধ থাকে। এরপর ১৮৭৭ এ দু' একটি অভিনয় হয়। এই বছরের ৬ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালের শেষ অভিনয়। এদিকে ভুবনমোহন গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনালের ইজারা দেন। গিরিশের স্বত্বাধিকারী গ্রেট ন্যাশনাল আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে অভিনয় শুরু করল। কিন্তু পারিবারিক কারণে গিরিশ ১৮৭৭-এর ৩০ নভেম্বর এর মালিকানা হস্তান্তরিত করেন। শেষপর্যন্ত ভুবনমোহন থিয়েটারটিকে নিলামে তোলেন। প্রতাপচাঁদ জুহুরি তা কিনে নিয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে অভিনয় চালান, গ্রেট ন্যাশনালের অস্তিত্ব শেষ হয়।

৭.১.৫.৪. মিনার্ভা থিয়েটার

গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে আগে গ্রেট

ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল সেখানে নির্মিত হল এই থিয়েটারের নতুন বাড়ি। অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে ছিলেন গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, তিনকড়ি, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ। গিরিশ ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে মিনার্ভার যাত্রা শুরু হয় (১৮৯৩, ২৮ জানুয়ারি)। শিক্ষিত রুচিশীল দর্শকের কাছে 'ম্যাকবেথ' এর অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু সাধারণ দর্শক এই নাটককে গ্রহণ করতে পারল না। ক্ষুব্ধ গিরিশ এবার নামালেন হাল্কা নাচগানের নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা' এবং 'আবুহোসেন'। আগের নাটকের অর্থক্ষতি সুদে আসলে পুষিয়ে দিল এই দুটি নাটক।

সাফল্যের চূড়ায় উঠে মিনার্ভা পর পর নামাল 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'নল-দময়ন্তী', 'জনা', 'বড়দিনের বখশিস', 'কমলেকামিনী', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। এর মাঝে কয়েকটি পুরনো নাটক 'সধবার একাদশী', 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', প্রভৃতির অভিনয় হয়। এরই ফাঁকে হাল্কা নৃত্যগীতের নাটক 'স্বপ্নের ফুল', 'ফণির মণি', এবং হাল্কা ব্যঙ্গ প্রহসন 'সভ্যতার পান্ডা', 'পাঁচকনে' প্রভৃতি লিখে গিরিশ এখানে অভিনয় করান। তবে এই সবগুলির মধ্যে 'জনা' ও 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস' খুবই মঞ্চসফল হয়েছিল।

১৮৯৬-তে গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে দেন। গিরিশশূন্য মিনার্ভার দুর্দশা শুরু হল। এবার মিনার্ভার দায়িত্ব নেন চুনীলাল দেব। ইনি এখানে 'জুবিলি যজ্ঞ', 'আকবর', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'ফটিকচাঁদ', 'আলিবাবা', 'ল-বাবু' প্রভৃতি নাটক প্রহসনের অভিনয় করান। কিন্তু মিনার্ভার দুর্দশা না ক্রমে ক্রমেই বাড়তে থাকে । শেষ পর্যন্ত মালিক নগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারকে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করে দেন। যারা কেনে তাদের কাছ থেকে ১৮৯৯ তে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা কিনে নেন এবং মালিক ও পরিচালক হয়ে নবউদ্যোমে থিয়েটার চালাতে থাকেন। অর্ধেন্দুশেখর এখানেই থেকে যান। নতুনভাবে মিনার্ভায় দুর্গাদাস দে'র লেখা 'শ্রী' নাটক দিয়ে আবার অভিনয় শুরু হয়। এরপর 'মদালসা' (মালিক নরেন্দ্রনাথের লেখা), 'কিশোরসাধন', 'জুলিয়া', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বসন্তরায়' প্রভৃতির অভিনয় হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু কোনো নাটকই ভালো চলেনি।

এরপর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় মিনার্ভা সাজিয়ে অভিনয় হয় 'রঘুবীর'। এ সময় এখানে ম্যানেজার হন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। মালিক নরেন্দ্রনাথ আবার গিরিশচন্দ্রকেও এখানে নিয়ে আসেন। গিরিশ বঙ্কিমের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করলেন ও জনপ্রিয়তা পেল নাটকটি। এরপর 'মণিহরণ' অভিনীত হল। গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশ আবার মিনার্ভা ছাড়লেন, গিরিশহীন মিনার্ভা না চলায় নরেন্দ্রনাথও থিয়েটার ছাড়লেন। মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। সহযোগী বেণীভূষণ রায়। এদিকে অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মিনার্ভা লীজ নিয়ে একসঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক চালাতে লাগলেন। কিন্তু সফল হলেন না। কাজেই তিনি মিনার্ভার লীজ দিলেন মনোমোহন পাঁড়েকে। তিনি আবার সাবলীজ দিলেন চুনীলাল দেবকে। চুনীলাল কিছু হাল্কাচালের নাটকের অভিনয় ও উপহার প্রথা চালু করে সফল হলেন।

গিরিশ আবার এখানে যোগ দেন, সঙ্গে অপরেশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর। মিনার্ভা আবার নতুন করে জেগে উঠল। অভিনীত হল 'হরগৌরী', 'বলিদান', 'রাণাপ্রতাপ', 'রঘুবীর', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি। ইতিমধ্যেই ১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর লর্ড কার্জন 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণা করেন। তখন গিরিশ রচনা করেন 'সিরাজদৌল্লা, মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫। নাকটটি প্রচন্ড জনপ্রিয় হল। জাতীয় আন্দোলনের দিনে বাংলা মঞ্চ সেদিন তার দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছিল। এই সময়ের আর উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'মীরকাশেম', 'দুর্গাদাস', 'আলিবাবা', 'সংসার' প্রভৃতি।

১৯০৭-এ এখানে অভিনীত হয় 'য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। কিন্তু জুলাই মাসে গিরিশ কোহিনূরে চলে গেলে মিনার্ভা বিপদে পড়ে। অমর দত্তকে তখন আনা হয় এখানে। অভিনীত হয় 'প্রফুল্ল', 'দুর্গাদাস', 'সিরাজদৌল্লা' প্রভৃতি। ১৯০৮-এ 'বলিদান', 'নূরজাহান', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মেবার পতন', 'শাস্তি কি শান্তি', আর সব পুরনো নাটক। ১৯০৯-এর উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'সাজাহান', 'দুর্গাদাস', 'ভগীরথ' প্রভৃতি। ১৯১০-এ 'চন্দ্রশেখর' এর নাট্যরূপ 'অশোক', 'শঙ্করাচার্য, 'হিরন্ময়ী', 'বাঙ্গলার মসনদ' প্রভৃতি। ১৯১১-তে মনোমোহন তাঁর মিনার্ভার এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দেন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে। ১৯১২-তে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে মনোমোহন নিজেকে সম্পূর্ণ মিনার্ভার মালিক বলে ঘোষণা করেন। এই সময় অমৃতলাল বসু স্টার ছেড়ে এখানে আসেন। অভিনীত হয় 'খাসদখল', 'রঙ্গিলা', 'রূপের ডালি' প্রভৃতি।

এদিকে মৃত মহেন্দ্রনাথের ভাই উপেন্দ্রনাথ মিনার্ভার মালিকানা ফিরে পাবার জন্য মামলা করেন। মনোমোহন সেই মামলায় হেরে যাবেন বুঝতে পেরে মিনার্ভা অন্যত্র সরিয়ে নেন (৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে)। সেখানে গিরিশের 'কালাপাহাড়' নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। এদিকে উপেন্দ্রনাথ মামলা জিতে মিনার্ভাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনেন। ম্যানেজার হন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভায় মনোমোহনের যুগ শেষ হল বলা যায়। উপেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্তৃত্বে এখানে অভিনীত হয় — 'সিংহল বিজয়', 'বঙ্গনারী', 'মিশরকুমারী', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'। এই সময়ই (১৯২২) মিনার্ভা আগুনে পুড়ে যায়। তবে তা আবার সারিয়ে নিয়ে অভিনয় শুরু হয় — 'আত্মদর্শন', 'দেবযানী', 'বেহুলা', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি। কিছু নতুন ও কিছু পুরনো নাটক অভিনয় করে মিনার্ভা কাটিয়ে দিল বেশ কয়েক বছর। মাঝখানে স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর নানা কারণে মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ থাকে সাময়িকভাবে।

এরপর ১৯৪৯ থেকে নিয়মিত এখানে অভিনয় হতে থাকে। এই সময়ের সবচেয়ে সফল নাটক ১৯৫৫-তে সন্তোষ সেনগুপ্তের 'এরাও মানুষ'। এরপর 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী এখানে আসে অভিনয় করতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তারপর উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা লীজ নিয়ে ১৯৫৯-১৯৬৯ পর্যন্ত বহু নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় করে। এখানে অভিনয় করতে এসেই উৎপল দত্ত নাট্যকার হয়ে পড়লেন। উৎপল দত্তের দল ১৯৭১-এ মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলে, এখানে অভিনয় প্রায় বন্ধ হতে বসে। এরপর বেশকিছু পেশাদার থিয়েটার ব্যবসায়িক স্বার্থে এই থিয়েটারে কিছু কুরুচিপূর্ণ অভিনয় চালিয়ে যায়। মিনার্ভার কৌলিন্য নষ্ট হতে বসে। এই সময় অভিনীত হয় 'প্রজাপতি', 'ব্যভিচার', 'এক্সজোন', 'শুধু তোমাকে

চাই' নামীয় রুচিহীন বিকৃত সব নাটক। ১৯৭০-এর পর এক প্রকার মিনার্ভা থিয়েটার জীর্ণ ও ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে। এখনও সেভাবেই আছে।

যাইহোক, সবমিলিয়ে বলা যায় মিনার্ভা থিয়েটারকে গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত এই সমস্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব একটি জায়গায় তুলে দিয়েছিলেন। বিচিত্রমুখী অভিনয়ের ইতিহাস বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করেছিল এই মিনার্ভা থিয়েটার। এই দিক দিয়ে এই থিয়েটারের একটি চিরস্থায়ী আসন অবশ্যই থাকবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে।

৭.১.৫.৫ ঃ বেঙ্গল থিয়েটার

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ধনকুবের সতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ৯ নং বিডন স্ট্রিটে বাংলা দেশের তৃতীয় সাধারণ রঙ্গালয়, 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা হয়। এর ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন শরৎচন্দ্র ঘোষ। তারই সহযোগিতায় একটি কমিটি নির্ধারিত হয়, যে কমিটির সভ্যরা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরি বৈষ্ণব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (খ্যাতিমান গিরিশচন্দ্র নন), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা। থিয়েটার হলটি তখন কলকাতায় প্রচলিত লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুকরণে তৈরী করা হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য কলকাতায় বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম রঙ্গালয় যার নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় এবং এই প্রথম বাংলা থিয়েটারে নারী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করে। একসঙ্গে শ্যামা, জগত্তারিনী, এলোকেশী এবং গোলাপ এই চারজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি এই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই রঙ্গালয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ের পর অক্টোবরে রামনারায়ণের 'স্বপ্নধন', এছাড়া বিদ্যাসুন্দর এবং 'যেমন কর্ম তেমন ফল' অভিনীত হয়। কিন্তু কোনো নাটকই সেভাবে দর্শকমনে ছাপ ফেলতে পারেনি। বলাবাহুল্য অভিনেত্রী গ্রহণের বিষয়টি আলোড়ন তুললেও দর্শকানুকুল্য লাভ করতে পারেনি।

১৮৭৩-এর ৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের 'মোহান্তের এই কি কাজ' নাটকটি অভিনীত হয় এবং এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কপাল খুলে গেল। পরপর 'চক্ষুদান', 'রত্নাবলী', বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল থিয়েটার সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছায়। 'পদ্মাবতী' 'পুরুবিক্রম', 'বঙ্গের সুখাবসান' 'মণিমালিনী', 'একেই কি বলে বাঙালী সাহেব', 'প্রভাবতী', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', প্রভৃতি নাটকগুলি জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৮৭৫-এ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মন, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে এসে বেঙ্গলের সঙ্গে

যুক্ত হন এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী' এই গীতিনাট্যটি অভিনয় করে। এছাড়া এই সম্মিলিত দলটি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নাট্যরূপ, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ', 'ভীমসিংহ', 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ, 'বঙ্গবিজেতা', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় করে।

১৮৭৬-এর গোড়ার দিকে বেঙ্গল থিয়েটারের নতুন বাড়ি নির্মিত হয়। ফলে কিছুদিন অভিনয় বন্ধ ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে আবার ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ায়, বেঙ্গল থিয়েটারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ হয় এবং শুরু হয় পৌরাণিক, গীতিনাট্য, অপেরা প্রভৃতির অভিনয়, ১৮৭৭-এ অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি 'আলিবাবা', 'অপূর্বসতী', 'রত্নাবলী'। বঙ্কিমচন্দ্রের অসংখ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে।

১৮৭৮-এ এসে বেঙ্গল থিয়েটারের হাতে কোনো নতুন নাটক না থাকায় পুরোনো নাটকগুলিই অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৮০-তে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাণপুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। এই রকম বিধ্বস্ত অবস্থা সামাল দিতে দায়িত্ব নেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে অভিনীত হয় তাঁরই লেখা নাটক - 'সুভদ্রা হরণ', 'রাবণ বধ', 'প্রভাস মিলন', 'পান্ডব নির্বাসন', 'নন্দবিদায়', প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক। সেক্ষেত্রে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথমভাগ অর্থাৎ ১৮৭৩-১৮৮০ যদি শরৎচন্দ্র ঘোষের হয় তবে এরপর থেকে ১৯০১ পর্যন্ত বিহারীলালের।

১৮৮২-তে বেঙ্গল থিয়েটারে অমৃতলাল বসু যোগ দেন। এই সময় তাঁর কিছু প্রহসনও এখানে অভিনীত হয়েছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের জোয়ার এসেছিল এবং সেই জোয়ারে বেঙ্গল থিয়েটারও অসংখ্য পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছিল। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে 'শকুন্তলা' নাটকটি বৃটিশ যুবরাজের কলকাতায় আগমন ও তাঁর সম্বর্ধনার জন্য অভিনীত হয়। সে কারণে লর্ড লিটনের অনুরোধে বেঙ্গল থিয়েটার ব্রিটিশ রাজভক্তির পুরষ্কার স্বরূপ 'Royal' উপাধি লাভ করে এবং এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মহেন্দ্রলাল বসু, কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি কয়েকজন নট-নটী বেঙ্গলে যোগ দেন। তবে বেঙ্গল থিয়েটার সেই অর্থে কখনোই নতুন নাটক উপস্থাপন করতে পারেনি।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত শেষ পর্যায়ের নাটকগুলি 'বভ্রুবাহন', 'প্রমদরঞ্জন', 'সুকন্যা', 'যমুনা', 'দাওয়াই' প্রভৃতি। এর কোনোটাই দর্শকমনে সাড়া ফেলতে পারে নি। এর মধ্যে ১৯০১ সালে ২০ এপ্রিল বিহারীলালের মৃত্যু হয়। এরপর বেঙ্গল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য ও ব্যর্থতা :

সাফল্য :

১। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম বাংলা থিয়েটার যাদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল।

২। ন্যাশনালের পর যথার্থ সাধারণ রঙ্গালয় হল বেঙ্গল থিয়েটার। এরাই প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করে।

৩। এই থিয়েটারই বিলিতি রঙ্গমঞ্চের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে।

ব্যর্থতা :

১। এই থিয়েটার প্রথমদিকে অনেকটা ধনী বাঙালীর প্রাসাদ মঞ্চের নতুন সংস্করণ ছিল। ফলে তা অনেকের কাছে জাঁকজমকপূর্ণ সৌখিন থিয়েটার ছিল আর এই কারণেই এই থিয়েটারের প্রতি সাধারণ দর্শকদের আগ্রহ হারিয়েছিল।

২। বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সময় দেশপ্রেমমূলক কোনো নাটক অভিনয় করিয়ে জনমত গঠনের কোনো দায়িত্ব পালন করেনি বরং পৌরাণিক-সামাজিক, গীতিনাট্য প্রভৃতির অভিনয় করিয়ে নিরাপদে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। বৃটিশ সরকারের এই কালো আইনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত থিয়েটার সাফল্যের কথা না ভেবে প্রতিরোধ গড়েছিল তারাই বেশি দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

৩। এরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল 'Royal' উপাধি, আর এটাই অন্যের কাছে ব্যঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সবশেষে তাই বলা যায়, সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে নতুন কয়েকটি বিষয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তা পরবর্তী রঙ্গমঞ্চগুলি গ্রহণ করেছিল এবং সমৃদ্ধ হয়েছিল।

৭.১.৫.৬ ঃ স্টার থিয়েটার

কলকাতার ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র গুর্মুখ রায় থিয়েটার প্রমোদের মোহে এবং বিশেষ করে বিনোদিনীর আকর্ষণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গিরিশ তখন প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে নতুন থিয়েটারের আশায় ঘুরছিলেন। এমন সময় গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে প্রস্তাব দেয়, নতুন থিয়েটার খোলার। শর্ত একটাই অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা হতে হবে। গিরিশ ও প্রমুখের অনুরোধে বিনোদিনী এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। ফলে বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখের তত্ত্বাবধানে নতুন 'ইষ্টক নির্মিত' পাকা রঙ্গালয় তৈরী হল এবং 'স্টার থিয়েটার' নামে তা রেজিষ্ট্রি করা হল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শনিবার গিরিশের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে মহাসমারোহে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল। এখানে অভিনয় করেন দক্ষ—গিরিশ, মহাদেব—অমৃতলাল মিত্র, সতী—বিনোদিনী প্রমুখেরা। এই নাটক দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের গৌরবময় যাত্রা শুরু হল।

গুর্মুখ রায় স্টারে মোট ছয় মাস মালিক থাকাকালীন অভিনীত হয় — ১৮৮৩ ঃ 'দক্ষযজ্ঞ' (২১-জুলাই), 'ধ্রুবচরিত' (১১ আগস্ট), 'সীতার বনবাস' (২৬ সেপ্টেম্বর) 'চক্ষুদান' (২৭ অক্টোবর), 'মেঘনাদ

বধ' (২১ নভেম্বর), 'সধবার একাদশী' (৫ ডিসেম্বর) প্রভৃতি নাটক। এই ছয় মাসে দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, অমৃতলালের একটি নাটক, 'মেঘনাদ বধ'-এর নাট্যরূপ ছাড়া আর সবই গিরিশের লেখা নাটক এবং গিরিশের সব নাটকই পৌরাণিক নাটক। 'দক্ষযজ্ঞের' পর 'ধ্রুবচরিত' ও 'নলদময়ন্তী' নাটক দুটি খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের লোকজনের চাপে এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে স্টারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে চান এবং ১৮৮৪-র জানুয়ারি মাসে গুর্মুখ রায় মাত্র এগোরো হাজার টাকায় অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বাবু ও অমৃত লাল বসু — এই চারজনকে স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন। পারিবারিক শর্তের কারণে গিরিশ মালিকানায় অংশ নেননি। তবে গুর্মুখ চলে গেলেও বিনোদিনী স্টারে রয়ে গেলেন।

এই চারজন নতুন মালিকের তত্ত্বাবধানে স্টার আরো চার বছর চলেছিল। ম্যানেজার, অভিনয় শিক্ষক, নাট্যকার হিসেবে গিরিশ রইলেন সর্বেসর্বা হয়ে। এই চার বছরের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য তালিকা এবার দেওয়া যেতে পারে।

১৮৮৪ ঃ পূর্বের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। তাছাড়া 'অভিমন্যুবধ', 'কমলেকামিনী', 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে', 'আদর্শসতী' প্রভৃতি নাটকগুলিও অভিনীত হয় এখানে। এই বছরের বেশির ভাগ নাটকই গিরিশের। তবে এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। নিমাই-বিনোদিনী এবং নিতাই-বনবিহারিনী নৃত্যে, গীতে ও অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। এই নাটকটি পরমহংস রামকৃষ্ণদেব দেখতে আসেন। এরপর এখানে অভিনীত হয় গিরিশের প্রহ্লাদ চরিত্র। তবে তা তেমন জমেনি। বরং অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৮৮৫ ঃ এই বছরেও প্রায় গিরিশের লেখা বেশিরভাগ নাটক এখানে অভিনীত হয়। যেমন - 'চৈতন্যলীলা' (২য় ভাগ), 'দোললীলা', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বুদ্ধদেব চরিত' প্রভৃতি। এই বছরের সবচেয়ে সফল নাটক হল — 'বুদ্ধদেব চরিত'।

১৮৮৬ ঃ আগের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয় এবং 'বিল্লমঙ্গল ঠাকুর', 'বেল্লিক বাজার', 'কমলেকামিনী' প্রভৃতি নতুন নাটকও অভিনয় করা হয়। এ বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা 'বিল্লমঙ্গ ল ঠাকুর'। এছাড়া 'বেল্লিকবাজার'-এর রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ এবং অমৃতলাল বসুর রঙ্গ ও শ্লেষাত্মক অভিনয় নতুন মাত্রা দেয়। তবে 'বেল্লিকবাজার' - নাটকেই বিনোদিনীর মঞ্চে শেষ অভিনয়।

১৮৮৭ ঃ 'রূপসনাতন', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'বেল্লিকবাজার' অভিনীত হয়। নতুন নাটকের মধ্যে রূপ সনাতন খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। এই বছরেরই ৩১ জুলাই স্টারে শেষ অভিনয় হয়। নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার', অমৃতলাল বসু অভিনয় শেষে মর্মস্পর্শী ভাষায় দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানান। এই সালটা স্টারের পক্ষে এমনটিতেই ভালো যাচ্ছিল না, অন্যদিকে ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীল থিয়েটার করার সখে মত্ত হয়ে কৌশলে স্টারের জমি কিনে নিয়ে, সেখানে এমারেল্ড থিয়েটার

প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রায় পাঁচ বছরের ইতিহাস শেষ হল।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্টার থিয়েটারের কার্যাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক —

১. ন্যাশনাল থিয়েটারের ইতিহাসে বেশ কিছু ছেলে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই বলা যায় স্টার আদি ন্যাশনাল (১৮৭২) থিয়েটারেরই ধারাবাহিক উত্তরসুরী। প্রধান শিল্পী ও কর্মীরা একই। পার্থক্য মালিকানায়। ন্যাশনাল ছিল শিল্পী ও কর্মীদের, স্টার হল একজন মালিকের। থিয়েটারে অনাগ্রহী একজন নটীলোলুপ মালিকের। স্টারের মধ্যে পূর্বতন ন্যাশনালের উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাঙালীর অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

২. ১৮৭৬-এর অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে থিয়েটারে নাট্যাভিনয় ও নাটক থেকে জাতীয়তার আবেগ দূরে সরে গেল। সঙ্গে থিয়েটারের নামকরণ থেকেও পূর্বের সেই অনুরাগ ফিকে হয়ে গেল। স্টার থেকেই নামকরণ হতে থাকল অন্যরকম — স্টার, এমারেল্ড, বীণা, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর।

৩. স্টারেই গিরিশ তাঁর নাট্যকার জীবনের সেরা নাটকগুলি রচনা করেন। বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের সেরা সময়ও এই স্টারেই। আবার এখানেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে যায়।

৪. এখানেই 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন, তিনি আসেন মূলত ধর্মভাবের আকর্ষণে। তাতে বাংলা থিয়েটারের লাভ ও ক্ষতি দুটোই হল। লাভ বলতে, তাঁর আগমনে এতোদিন যে থিয়েটার ভদ্র ও ধর্মীয় মানুষের কাছে অপাঙক্তেয় ছিল, রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে তা ধন্য ও পবিত্র হল। অন্যদিকে তাঁর সংস্পর্শে বিনোদিনী, গিরিশের জীবনে পরিবর্তন আসে, তাতে তাঁদের ব্যক্তি জীবনে শান্তি এলেও বাংলা থিয়েটারের অপূরণীয় ক্ষতি হল, বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দিলেন, শৈব গিরিশ 'ভক্ত ভৈরবে' রূপান্তরিত হল।

৭.১.৫.৭ ঃ এমারেল্ড থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের যে বাড়িটি গুর্মুখ রায়ের স্বত্বধিকারে ছিল তা শেষপর্যন্ত নিলামে ওঠে। এই নিলামে ওঠা বাড়ি থিয়েটারের সখ মেটানোর জন্য ধনকুবেব মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল কিনে নেন এবং স্টার থিয়েটার নাম পরিবর্তন করে 'এমারেল্ড থিয়েটার' নাম রাখেন। তবে কেবলমাত্র থিয়েটার হলটির নাম পরিবর্তন নয়, গোপাল শীল পুরোনো এই বাড়িটিতে প্রচুর খরচ

করে ডায়নামা বসিয়ে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করেন। বাংলা রঙ্গালয়ে এই প্রথম বিজলী আলোর প্রবর্তন করা হল। সেই আলো ঝলমলে সাজানো গোছানো পরিবেশে যাত্রা শুরু হল হাতিবাগানে নতুন আরেক থিয়েটার — যার নাম এমারেল্ড থিয়েটার।

নতুন এই হলটির ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন কেদার চৌধুরী। তবে তিনি শুধু ম্যানেজার নন, নাট্যকার, পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিনী, কিরণশশী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁদের নিয়ে ১৮৮৭ সালের ৮ অক্টোবর কেদার চৌধুরীর লেখা 'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটক দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার দায়িত্বে রইলেন জহরলাল ধর এবং সুকুমারী, শশিভূষণ দেব। এরপর এখানে অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের নাটক, ১৮৮৭-র ২৬ অক্টোবর 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজাবসন্তরায়'।

গোপাল শীল তখন কেদার চৌধুরীর পরিবর্তে গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গিরিশ তখন নাট্য পরিচালক ও ম্যানেজার হিসেবে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাটকগুলিও সমাদর পাচ্ছিল। গিরিশকে এনে এমারেল্ডকে নতুন করে চালাবার চেষ্টা করলেন গোপাললাল। গিরিশ এমারেল্ডে যোগ দেন ৫ বছরের চুক্তিতে। ২০ হাজার টাকার বোনাস এবং মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে।

'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে গিরিশ এখানে কাজ শুরু করলেন। তারপর 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'মায়াতরু' প্রভৃতি। গিরিশ ঘোষ এমারেল্ড থিয়েটারে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে কেদার চৌধুরীর পূর্ব অভিনীত নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি একমাত্র তার দায়িত্ব নেওয়ার দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকটি ছাড়া আর কোনো নাটক অভিনয় করাননি। মূলত তাঁর সময়ে বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ, মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নাট্যরূপ ও নীলদর্পণ, 'জামাই বারিক', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শলিখের ঘাড়ে রোঁ, প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে গিরিশ ঘোষের চতুর্বিধ (নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, ম্যানেজার) গুণে এমারেল্ডের ভাগ্যাকাশে নতুন আলোর দেখা মেলে। পাশাপাশি এই সময়ে এখানে অর্ধেন্দুশেখরের উপস্থিতি দর্শক মনে এমারেল্ডের গ্রহণযোগ্যতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এমারেল্ড থিয়েটারের এরূপ অবস্থার মধ্যে মালিক গোপাললালের সখ মিটে যায়। অন্যদিকে অর্ধেন্দুশেখরও এমারেল্ড ছেড়ে চলে যান। গোপাললাল তখন মতিলাল সুর, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ব্রজনাথ মিত্র এদের হাতে থিয়েটার বাড়িটি লিজ দেয়। ঘটনাটি ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারির। এদিকে গিরিশ ঘোষও এই সময় যেহেতু গোপাললালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন সেহেতু তার অবর্তমানে এমারেল্ড ছেড়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন।

নতুন মালিকদের হাতে এমারেল্ডের অবস্থা আবার খারাপ হতে শুরু করে। গোপাললাল এই দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে ১৮৮৯ এর ৮ এপ্রিল পুনরায় এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ২৩

এপ্রিল পর্যন্ত এখানে অভিনয় বন্ধ রেখে রঙ্গমঞ্চের ভেতরকার এবং থিয়েটারের অন্য সমস্ত অবস্থার পুনর্মুদ্রণ করেন। এবার সেখানে নাট্যকার হিসেবে যুক্ত হন অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং ম্যানেজার কেদার চৌধুরী। অর্থাৎ গিরিশের অবর্তমানে ছন্নছাড়া এমারেল্ড থিয়েটারের কিছুদিন অভিনয় বন্ধ রেখে, তার সমস্ত দিকের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে পুনরায় অভিনয় চালু করা হয়। এই সময়ে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল - 'নন্দবিদায়', 'বক্কেশ্বর', 'গাধা ও তুমি', 'গোপী গোষ্ঠ' এবং 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। শেষমেশ এখানে মনমোহন বসুর 'রাসলীলা' নাটকটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে ছিল এবং এভাবেই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের ১৮৮৯ সালটি কেটে যায়।

১৮৯০ এর পর থেকে এমারেল্ডের অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পুরনো নাটকগুলির অভিনয়ের মাধ্যমে থিয়েটার তার অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৮৯৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতুল মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল বাবু 'লেসি' হন। তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে শেষে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে 'লেসি' করা হয়। অর্ধেন্দু শেখর এবার নিজের মালিকানায় এমারেল্ড চালাতে থাকেন। তাঁর সময়ের প্রথম অভিনয় অতুল মিত্রের 'মা'। এই নাটকে আবার এমারেল্ড জেগে ওঠে। এরপর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'মান' (১৮৯৪, ৪ ডিসেম্বর), 'রাজা বসন্ত রায়' (জানুয়ারি, ১৮৯৫), আবুহোসেন (গিরিশ, জানুয়ারি, ১৮৯৫) এমারেল্ডে রমরম করে চলতে থাকে।

অর্ধেন্দুশেখর নাটক বুঝলেও থিয়েটার ব্যবসা বুঝতেন না। তাই কিছু কালের মধ্যেই এমারেল্ডে আর্থিক সংকট দেখা দিল। এরপর এমারেল্ডের মালিকানা হস্তান্তর করা হল — বি. ডি. কোম্পানীর মালিক বেনারসী দাসকে। ১৮৯৫ সালের, ১০ নভেম্বর তিনি দায়িত্ব নিলেন। সেদিন থেকে 'কপালকুন্ডলা' অভিনয় শুরু হল। বেশ ভালো চলল। এই বছরের উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'-র নাট্যরূপ, রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'-র পরিবর্তিত নাম দুকড়ি দত্ত, ক্ষীরোদ প্রসাদের 'ফুলশয্যা' প্রভৃতি।

এমারেল্ডের শেষ অভিনয় ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, 'কপালকুন্ডলা' ও 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' - এ দুটি নাটক। এরপর এমারেল্ডে আর কোনো অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

৭.১.৫.৮ ঃ বীণা থিয়েটার

কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) কলকাতার ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে তাঁর বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থিক সচ্ছলতা তেমন না থাকার কারণে রঙ্গমঞ্চটি খুব সুদৃশ্যভাবে গড়ে তুলতে পারেননি। দৃশ্যপট থেকে শুরু করে বাইরের চাকচিক্য কিছুই খুব ভালো ছিল না। খ্যাতিমান নট-নটীদেরও তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি। কলকাতার সমস্ত রঙ্গালয়গুলিতে তখন নারীর ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই

অবতীর্ণ হচ্ছিল, কিন্তু সেই যুগে অভিনেত্রীদের বাদ দিয়েই রাজকৃষ্ণরায় অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। এটাও ঠিক যে, নাট্যাভিনয়ের পক্ষে তখন অভিনেত্রীদের বাদ দিয়ে থিয়েটার চালানো অসম্ভব ছিল।

'বীণা'-র মালিক, নাট্য পরিচালক, নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা 'চন্দ্রহাস' (বা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটক দিয়ে 'বীণা'র উদ্বোধন হল ১৮৮৭-এর ১০ ডিসেম্বর। এরপর 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'ভন্ড দলপতি দন্ড' অভিনীত হয়। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' খুব প্রশংসিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে ক্রমেই দর্শক সমাগম হ্রাস পেতে থাকে। ফলে রামকৃষ্ণ রায়ের আর্থিক সংকট প্রবলতর আকার ধারণ করে। ঋণগ্রস্ত রাজকৃষ্ণ দেনা শোধের জন্য বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন 'আর্য নাট্যসমাজ'কে। এরা বীণা থিয়েটার অভিনয় শুরু করে ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এরাও ব্যর্থ হল। এই বছরেরই নভেম্বর মাসে তারা অভিনয় বন্ধ করে দিল।

এবারে ঋণগ্রস্থ রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন উপেন্দ্রনাথ দাসকে। উপেন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরে এসে এর দায়িত্ব নিলেন — নাম দিলেন 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার'। শত চেষ্টাতেও তিনিও সাফল্যের মুখ দেখলেন না। ১৮৮৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৯-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি থিয়েটার চালাতে সক্ষম হলেন। এরপর রাজকৃষ্ণ রায় নিজেই দায়িত্ব নিলেন বীণা থিয়েটারের। শুরু হল বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্ব। এবার কিন্তু তিনি তাঁর থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করলেন। তখনকার খ্যাতিময়ী অভিনেত্রীও নেওয়া হল। আর্য নাট্যসমাজের অভিনেতারাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হল ১৮৮৯ সালের ২০ জুলাই, শনিবার। তাঁরই লেখা নাটক 'মীরাবাঈ' দিয়ে উদ্বোধন হল। এই নাটকের গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এখানে সম্ভবত তিনি মাইক্রোফোনে নেপথ্য সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেছিলেন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে (২০-৭-১৮৮৯) রাজকৃষ্ণ রায় জানিয়েছিলেন: 'Special attraction songs by scientific process.' 'মীরাবাঈ' নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল। এরপর ১৮৮৯তে 'লীলাবতী', 'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা', 'সধবার একাদশী', 'চমৎকার', 'ঘোষের পো' ১৮৯০ তে 'ডাক্তারবাবু', 'উভয় সঙ্কট', 'চন্দ্রহাস', 'হরধনুভঙ্গ', 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র' প্রভৃতি নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হল। এই নাটকগুলির মধ্যে সিংহভাগ নাটকই রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা।

আসলে 'বীণা'র দ্বিতীয় পর্বে 'বীণা'কে সাফল্যের শিখরে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ রায়ের চেষ্টাতে কোনো খামতি ছিল না। অভিনেত্রী গ্রহণ, প্রবেশমূল্য কমানো, খ্যাতি পাওয়া নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয়, মঞ্চসজ্জার সৌন্দর্যবৃদ্ধি, একই রাতে একাধিক নাটক দেখাবার ব্যবস্থা সবই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ঋণমুক্তি ঘটল না। তার কারণ হল রাজকৃষ্ণের ব্যবসায়িক বুদ্ধি পাকাপোক্ত না হওয়াতে তিনি দর্শনী মূল্য এত কমিয়ে দিলেন, যে লাভের পরিবর্তে তিনি আরো ঋণী হয়ে পড়লেন। শেষমেশ তাঁর এত আর্থিক সংকট দেখা দিল যে, বাধ্য হয়ে অনুসন্ধান পত্রিকাতে জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। তাতে কোনো সুরাহা হল না। এরপর তিনি স্টার থিয়েটারে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে নাট্যকার হিসেবে যোগ দেন। মাস মাইনে একশো টাকা।

এই সময় বীণা থিয়েটার ছোট ছোট কিছু নাট্যদল ভাড়া নিয়ে অল্প দিন অভিনয় করে। তারপর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার বিক্রি করে দেন। ১৮৯২-এর নভেম্বর মাসে তা কিনে নেন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। তার নাম দেওয়া হল 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস'। প্রিয়নাথও এখানে এসে সর্বসান্ত হন। যাইহোক, রামকৃষ্ণ চালিত বীণা থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১৮৯০ এর ১৬ নভেম্বর। বীণা থিয়েটারের কারণে আর্থিক অনটনে পড়ে রামকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু তরান্বিত হয়। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৮৯৪ এর ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গেই বীণা থিয়েটারের যবনিকা পাত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা থিয়েটার' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। নাট্যকার হিসেবেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হননি। কারণ একদিকে যাত্রাধর্মী মনোমোহন বসু এবং অন্যদিকে নাট্যধর্মী গিরিশ এই দুজনের মাঝখানে পড়ে তিনি তাঁর নাটকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করতে পারেননি। তাঁর নাট্যশালার মতো তাঁর নাটক প্রহসন অপেরাগুলিও সে যুগের মঞ্চের তাৎক্ষণিক চাহিদা মিটিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তবে নাট্যমঞ্চ চালনায় অপরিণামদর্শিতা মালিক ও পরিচালককে কিভাবে সর্বস্বান্ত করে দেয়, তার ঋণাত্মক (Negative) উদাহরণ হিসেবে রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বীণা থিয়েটার পরবর্তী বাংলা থিয়েটার পরিচালনায় শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে সাহায্য করেছে।

৭.১.৫.৯ ঃ কোহিনূর থিয়েটার

১৯০৭-এর এপ্রিলে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার শরৎকুমার রায় নীলামে কিনে, সেখানে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। তারপরে দুজনে মিলে নতুন দল গঠনে নেমে পড়েন। স্টার থেকে ভাঙিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নাট্যকার হিসেবে আনা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন থিয়েটার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও আনা হয়। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে এখানে আনা হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে ১৯০৭ সালের ১১ আগস্ট এখানে উদ্বোধন হল। আহমদনগরের বীরনারী চাঁদবিবি মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য আমৃত্যু লড়েছিলেন। এই গৌরবময় লড়াইয়ের কাহিনী বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে বাংলার দর্শকের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। এই নাটকের সমস্ত কিছুর পাশাপাশি অভিনয়ও দুর্দান্ত হয়েছিল। সবমিলিয়ে 'চাঁদবিবি' অসম্ভব সাফল্য পেল। 'চাঁদবিবি' সফল হওয়াতে কোহিনূর বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপের অভিনয়ের পরেই আরো দুটি ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' এবং 'মীরকাশিম' - এর অভিনয় করল। এই একই সময় মিনার্ভাতে চলছিল 'ছত্রপতি শিবাজী'। তবে কোহিনূরের 'ছত্রপতি শিবাজী'র অভিনয় অনেক বেশী ভালো হল। 'মীরকাশিম' ততটা উচ্চাঙ্গের না হলেও দানীবাবুর অভিনয় দেখার মতো হল।

এরপর ২৫ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' মঞ্চস্থ হল। নাটকটি মোটামুটি সাফল্য পেল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯০৭-এর ৩১ ডিসেম্বর কোহিনূরের স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হল। তখন তাঁর ভাই শিশির কুমার রায় রিসিভার হিসেবে থিয়েটারের দায়িত্ব নিল। ১৯০৮-এর প্রথম ছয় মাসে এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক', 'বরুণা', 'ভূতের বেগার', গিরিশের 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হল।

এই বছরেরই মাঝামাঝি গিরিশের সঙ্গে শিশিরকুমার রায়ের মনোমালিন্য হলে গিরিশ তাঁর পুত্র দানীবাবুকে নিয়ে চলে যান মিনার্ভায়। এরপর এখানে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৯০৮-এর জুলাই মাস)। তিনি একমাস মতো এখানে কাজ করেন। এই সময়ে এখানে অভিনীত হয় 'সংসার', 'জেনানাযুদ্ধ', 'আবুহোসেন', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'নীলদর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি। এখানে অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় উচ্চ প্রশংসতি হল। তারই বদান্যতায় কোহিনূরে আবার স্থিতাবস্থা ফিরে এল। ১৯০৮-এর ৯ আগস্ট, 'নবীন তপস্বিনী' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে অর্ধেন্দু শেখরের শেষ অভিনয়। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে 'পাঞ্জাব গৌরব' নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু সেখানে পাঞ্জাবী দর্শকরা নাটকটি বন্ধ করে দেয়, কারণ তাদের আবেগে আঘাত করে নাটকটি, যাইহোক, উপায়ান্তর না দেখে কোহিনূর কর্তৃপক্ষ নাটকটির নাম পাল্টে 'বীরপূজা' নামে অভিনয় করে। কোহিনূরের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় হিসেবে 'বীরপূজা'র উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে অভিনয়ে মন্মথ পাল হাস্যরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। রঙ্গ নাথের অভিনয়ও ভালো হয়েছিল। এই বছরে হরনাথ বসুর 'ময়ূর সিংহাসন' নাটকটিও অভিনীত হয়।

১৯০৯-এর ৭ জুলাই পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন। তারপর তিনিও তারাসুন্দরী কোহিনূর ত্যাগ করেন। ১৯১০-এর জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূতের বিয়ে' গিরিশের 'চন্ড', 'রাজা অশোক' প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৯১১-তে অভিনীত হয় 'শখের জলপান', 'মধুর মিলন', 'গ্রহের ফের', 'জেনোরিয়া', 'প্রাণের টান' প্রভৃতি। তবে সেরকম সাফল্য আসেনি।

১৯২২-তে কোহিনূরের অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তবুও তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'বলিদান', 'পান্ডব গৌরব', 'শঙ্করাচার্য', 'খাঁজাহান', 'মোহিনীমায়া' প্রভৃতি। এই নাটকগুলির অভিনয়েও কোহিনূরের অবস্থা ভালো হল না। বরং দেনার দায়ে খারাপ হতে থাকল। কোহিনূরের শেষ অভিনয় হল ১৯১২-এর ২১ জুলাই 'বিশ্বামিত্র' ও 'পলিন'। এরপর ২৭ জুলাই কোহিনূর দেনার দায়ে নীলামে উঠলে মনোমোহন পাঁড়ে তা কিনে নেন। মনোমোহন তখন মিনার্ভা থিয়েটারেরও মালিক। তিনি তখন মিনার্ভার দলবল নিয়ে এখানে 'মিনার্ভা' নাম দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর ১৯১৫-এর ১ সেপ্টেম্বর কোহিনূর নাম পাল্টে রাখেন মনোমোহন থিয়েটার।

কোহিনূর থিয়েটার সর্বমোট পাঁচ বৎসর চলেছিল। সে যুগের সমস্ত খ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখানে অভিনয় করেছেন। এখানকার বেশ কিছু নাটক সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু থিয়েটার পরিচালনার ত্রুটি মালিকের পারিবারিক কলহ প্রভৃতির কারণে কোহিনূর বন্ধ হয়ে যায়। প্রধান উদ্যোগী ও মালিক শরৎকুমার রায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। ফলে তাঁর পরিকল্পিত থিয়েটারের যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী

হতে পারেনি। জাঁকজমক ও প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়ে তোলা কোহিনূর থিয়েটার পাঁচ বছরেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রভূত সম্ভাবানার এই ক্ষণস্থায়িত্ব, থিয়েটার অনুরাগীদের বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে।

৭.১.৫.১০ ঃ জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে (৫নম্বর বাড়ি) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ঠাকুর বাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালাটি তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যপ্রযোজনা, নাট্যনির্বাচন ইত্যাদির জন্যে 'কমিটি অফ ফাইভ' নামে পাঁচ জনের কমিটি তৈরী হয়। তাতে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন নাট্যশিক্ষক।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ইংরেজি থিয়েটারের আদলের সঙ্গে দেশীয় রীতির মিশ্রণে নাট্যোপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। পাঁচ নম্বর ঠাকুরবাড়ির দোতলার হল ঘরে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অভিনয় করা হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এর কিছুদিন পরেই অভিনীত হয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন। দুটির অভিনয়ই খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। বাড়ির অনেকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর অভিনয়ের জন্য মনোমত নাটক না পেয়ে উদ্যোক্তারা অভিনয় উপযোগী এবং লোকশিক্ষার উপযুক্ত নাটক অনুসন্ধান করতে থাকেন। অবশেষে, বহুবিবাহ, হিন্দুমহিলার দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারের অত্যাচার বিষয়ে নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। রামনারায়ণ তখন বহুবিবাহ বিষয়ে 'নবনাটক' রচনা করে দেন। 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। নাটকটি এখানে নয় বার অভিনীত হয়। প্রথম বারের অভিনয়ে নাট্যকার রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এরপরই এখানে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশের সখের থিয়েটারের জোয়ারের সময়। ধনী বাঙালির প্রসাদ মঞ্চের সঙ্গে এই নাট্যশালার পার্থক্য হল এখানে বাড়ির সবাই যুক্ত হয়ে অভিনয় করত এবং শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদ বা রাজবাড়ির জৌলুষ দেখানোই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যরীতি এবং বাংলার নিজস্ব দেশজ নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা নতুন নাট্যধারা সৃষ্টির প্রয়াস এখানে লক্ষ করা যায়।

৭.১.৫.১১ ঃ ক্লাসিক থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পরে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এরই মধ্যে বাংলা থিয়েটারের অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। এই সময়কার থিয়েটারগুলির খুবই দুরবস্থা চলছিল। কিছু থিয়েটার জীর্ণ হয়ে পড়েছে। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের বয়স হয়ে গেছে। ঠিক এই সময়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল গুডফ্রাইডের দিন ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' নাটক দিয়ে এখানে অভিনয় শুরু হয়। আগে যেটা এমারেল্ড থিয়েটার ছিল সেই থিয়েটার বাড়ি ভাড়া নিয়ে ক্লাসিক প্রতিষ্ঠিত হল। তরুণ, দীপ্ত, বনেদীঘরের ছেলে অমরেন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারে আসায় দর্শকের রুচি পাল্টাল। দর্শকরা তাকে সাদরে গ্রহণ করল। এইভাবে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আবির্ভাব ঘটে।

১৮৯৭-তে 'নলদময়ন্তী', 'পলাশীর যুদ্ধ' (নবীন সেনের কাব্যের নাট্যরূপ), 'দক্ষযজ্ঞ', 'বিল্লমঙ্গল', 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনীত হল। এগুলি সবই ছিল গিরিশচন্দ্রের। এছাড়া 'দেবী চৌধুরানী'র নাট্যরূপ (অমর দত্ত), হরিরাজ (হ্যামলেট অবলম্বনে) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' প্রভৃতির অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এ নাটকটি দেখতে আসেন। প্রথম বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা 'আলিবাবা'। নাচে গানে অভিনয়ে নাটকটি রেকর্ড সৃষ্টি করল।

১৮৯৮ সালে অভিনীত হয় 'পান্ডবের অজ্ঞাত বাস', 'মেঘনাদ বধ' (গিরিশের নাট্যরূপ), দক্ষযজ্ঞ, 'প্রফুল্ল'। এছাড়া অমরেন্দ্রনাথের 'দোললীলা', 'ইন্দিরা'র নাট্যরূপ (অমর দত্ত) প্রভৃতি। এই বছরের ১৯ মার্চ থেকে ক্লাসিকে প্রথম 'Cinematography' র প্রদর্শন হয়। যদিও এর আগে অন্যান্য থিয়েটারে এই 'Cinematography' চালু হয়েছিল। এই মার্চ মাসেই কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। সেই ভয়ে সব লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে বেশিরভাগ থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অমর দত্ত ক্লাসিক বন্ধ করেন নি।

১৮৯৯-এ গিরিশের পুরনো নাটকগুলি 'প্রফুল্ল', 'সীতার বনবাস', 'আবুহোসেন', 'বুদ্ধদেব চরিত', অমর দত্তের 'নির্মলা', 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদির অভিনয় হয়। এই সময় গিরিশ ক্লাসিকে নাট্যকরা হিসেবে যোগ দেন।

১৯০০-তে 'দেবী চৌধুরানী' 'আলিবাবা' ভ্রমর, 'পান্ডব গৌরব', 'দুটিপ্রাণ' প্রভৃতির অভিনয় হয়। ১৯০১-এ 'চাবুক', 'অশ্রুধারা', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃনালিনী' চৈতন্যলীলা অভিনীত হয়। বাদবাকী সবই পুরনো নাটক। এই সময় অমর দত্তের নাটকগুলির বেশ কিছু অংশ সিনেমায় তুলে রাখলেন হীরালাল সেন।

১৯০২ সালেও সব পুরনো নাটক অভিনীত হয়। আর নতুন নাটকগুলির মধ্যে ছিল গিরিশের 'শান্তি', অমর দত্তের 'শিবাজী' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বহুৎ আচ্ছা' প্রভৃতি।

১৯০৩ এই বছরের প্রথম আটমাস সবই পুরনো নাটক অভিনীত হয়। আর শেষের দিকে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' হারানচন্দ্রের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসের নাট্যরূপ, গীতিনাট্য 'হিরন্ময়ী' অভিনীত হয়। এই সালে ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং তা জানাজানির ফলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখন বাংলা থিয়েটার দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয় করে। অমর দত্তও দেশপ্রেমমূলক নাটক করলেন।

১৯০৪-এ 'বউ ঠাকুরানীর হাট' এর নাট্যরূপ, 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হয়। এই সময় (১৯০৩-০৪) অমর দত্ত ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারের দায়িত্ব (লিজ) নেন এবং গিরিশের নতুন নাটক 'সৎনাম' অভিনীত হলে মুসলমান দর্শকদের আপত্তিতে তা বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর অমর দত্ত মিনার্ভার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর নভেম্বর মাসে ক্লাসিকে 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়। নাটকটি জমে নি।

১৯০৫-এ শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে 'কোনোটা কে' এই নাম দিয়ে নাটক অভিনয় করলেন। ক্লাসিকে মালিক হিসেবে অমর দত্তের শেষ অভিনয় 'হরিরাজ', 'সোনার স্বপন', 'শ্রীকৃষ্ণ' ১৯৯০৫-এর ২ এপ্রিল। এরপর অমর দত্ত 'গ্র্যান্ড থিয়েটার' খুললেন। তবে সেখানে তিনি মালিক না হয়ে পরিচালক হলেন। সেটাও ভালো চলল না। এই সময় ক্লাসিকের মালিক অতুল রায় অমরেন্দ্রনাথকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন। সেখানে মনমোহনের 'পৃথ্বিরাজ', অমর দত্তের 'প্রণয় বা বিষ', 'এস যুবরাজ' অভিনীত হল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রচন্ড উন্মাদনা দেখা যায়। ফলে বেশির ভাগ থিয়েটার দেশপ্রেমমূলক নাটকের অভিনয় করল। অমর দত্ত সেই সময় দুই রকম নাটক লিখলেন — দেশাত্মবোধক নাটক (যেমন—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, হল কি ইত্যাদি) এবং ব্রিটিশ তোষণের নাটক (যেমন—এস যুবরাজ)।

১৯০৬ এ গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হয়। এটিও সফল হয়নি। অমর দত্ত এবার অসুস্থ হয়ে ক্লাসিকের চাকরীও ছেড়ে দেন। এর কিছুদিনের মধ্যে ক্লাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই থিয়েটার বাড়িতে অন্যলোকেরা এসে খুললেন 'কোহিনূর থিয়েটার।'

ক্লাসিক থিয়েটারে অমর দত্তের কর্ম-কুশলতা :

১. ক্লাসিকে অমর দত্ত পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, প্রহসন, নক্সা, পঞ্চ রং, গীতিনাট্য, অপেরা — সব ধরনের নাটকের অভিনয় করেছেন।

২. এই সময় তিনি থিয়েটারের প্রয়োজনে নাট্যকার হয়ে যান। আবার অমর দত্তই সে যুগে রবীন্দ্রনাটক করার সাহস দেখান।

৩. অমর দত্তই প্রথম সচেতন ভাবে দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে দেন এবং প্রপ্‌স ও সেটের ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার দিকে তিনি নজর দেন।

৪. ১৮৯৯ সালে প্রথম কলকাতার বৈদ্যুতিক আলো আসে। অমর দত্ত থিয়েটারে বিদ্যুৎ আলোর সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেন।

৫. আধুনিক ব্যবসার বড় একটি দিক হল বিজ্ঞাপন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ধারাটিকেই আমূল পাল্টে দেন অমর দত্ত। হাতপাখার পেছনে, মুদিখানার ঠোঙার ওপরে তাঁর থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন।

৬. তিনিই প্রথম নাট্যপত্রিকা বের করলেন এবং একটি নয় তিনটি। এই তিনটি পত্রিকাতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লেখা, দেশ-বিদেশের থিয়েটারের ও নট-নটীদের খবর বের হত ছবি সহ। পত্রিকাগুলি ছিল — 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির'।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ভালো অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, নাট্যপরিচালক এবং শেষে নাট্যকারও হন। তিনি সাধারণ মানের নাটক লিখলেও তা জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি জানতেন জনগণকে থিয়েটারমুখী করতে। তাই শুধু নাটক নয়, নাটকের বাইরেও তিনি নানা কাজ করতেন, যা কিনা থিয়েটারের প্রয়োজনে তিনি করতেন। এতবড় প্রতিভা শেষ পর্যন্ত অমিতব্যয়ী হওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। অমরেন্দ্র দত্ত শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যায়।

৭.১.৫.১২ ঃ মনোমোহন থিয়েটার

আমরা আগেই দেখেছি, যে এমারেল্ড থিয়েটার বাড়িতে কোহিনূর থিয়েটার চলছিল। মনমোহন এই থিয়েটারটি কিনে নেয়। সেখানে তিনি মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কোহিনূর নামেই চালু করেন। পরে সেখানে মিনার্ভা মঞ্চের লোকজন নিয়ে গিয়ে মিনার্ভার নামে অভিনয় শুরু করেন। মনোমোহনের উদ্বোধন হল ১৯১৫ এর ১০ সেপ্টেম্বর, গিরিশের 'কালাপাহাড়' এবং সুরেশচন্দ্র রায়ের 'রূপোর ফাঁদ' নাটক দিয়ে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তারাসুন্দরী, দানীবাবু, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'পলিন' ও অতুল মিত্রের 'শির-ফরহাদ' নাটক দিয়ে এর যাত্রা শুরু হল। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নাম রাখা হল মনোমোহন থিয়েটার। সেদিন 'ভীষ্ম', 'ধ্রুবচরিত', 'জন্মাষ্টমী', 'নন্দবিদায়', চতুরালী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এরপর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাদশাজাদী', নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বাপ্পারাও', দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার', হরিনাথ বাবুর 'কবীর', সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল পাঠান', গিরিশের 'চন্ড', বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' এর নাট্যরূপ, ১৯১৭ পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৯১৮-তে এসে 'দেবলা দেবী' খুবই সাফল্য পেল। ১৯১৯-এ 'পারদর্শী', ১৯২০-তে 'হিন্দুবীর' উল্লেখযোগ্য অভিনয়। ১৯২৪ পর্যন্ত এইভাবে মনোমোহন থিয়েটার তার অভিনয় চালিয়ে যায়। এরপর মনোমোহন অসুস্থ হয়ে পড়লে শেষের দিকে এই থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। শেষের দিকে শিশির

ভাদুড়ী এই থিয়েটার লীজ নিয়ে সেখানে খোলেন 'নাট্যমন্দির', ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে। মনোমোহন থিয়েটারের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব প্রবোধচন্দ্র গুহের আমল। ১৯২৮-এর আগস্ট মাস থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ এককভাবে মনোমোহনের পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে 'পথের শেষে', 'গৈরিক পতাকা', 'কারাগার' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় হয়। মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' এখানে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' এখানে প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' এখানে অভিনীত হয়।

৭.১.৫.১৩ ঃ শ্রীরঙ্গম থিয়েটার

প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যনিকেতন (১৬ মার্চ, ১৯৩১)। এটি চলে ১৯৪১-এর অক্টোবর পর্যন্ত। এবার দায়িত্ব নেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তিনি নাট্যনিকেতনের নাম পাল্টে রাখেন শ্রীরঙ্গম। শিশির কুমারের পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম খ্যাতির তুঙ্গে ওঠে। শ্রীরঙ্গম মঞ্চের উদ্বোধন হল ১৯৪১-এর ২৮ নভেম্বর তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটক দিয়ে। শিশির কুমার অভিনয় করলেন নাট্যাচার্য অমরেশের ভূমিকায়। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয় তালিকা এই রকম 'জীবনরঙ্গ', 'উড়োচিঠি', 'দেশবন্ধু', 'মাইকেল', 'বিপ্রদাস', 'তাইতো', 'বন্দনার বিয়ে', 'দুঃখীর ইমান', 'বিন্দুর ছেলে', 'সিরাজদৌল্লা' (গিরিশ ঘোষের) 'পরিচয়', 'ষোড়শী', 'তখত-এ-তাউস, 'আলমগীর' 'প্রশ্ন' (১৯৫৩)।

এরপরে প্রায় তিন বছর শ্রীরঙ্গমে নতুন কোনো নাটকের অভিনয় করেনি। পুরনো নাটকগুলিই এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। শেষের দিকে শিশির কুমার এখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন না, পরিচালনা করতেন। তবে আলমগীরে আলমগীর এবং রাজসিংহ ও সাজাহান নাটকে সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৫৬ এর গোড়াতে নতুন নাটক ধরলেন — 'মিশরকুমারী'। তারপর আবার পুরনো নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল'।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিত্রে, ১৯৫৬-এর ২৪ জানুয়ারি। বাড়িভাড়ার দায়ে মঞ্চ ছেড়ে দিতে হল। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৬ ঐ বাড়িতে তৈরী হল বিশ্বরূপা। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ছিলেন একটানা চৌদ্দ বৎসর। এই সময়ে তিনি চৌদ্দটি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এখানে।

৭.১.৫.১৪ ঃ বিশ্বরূপা থিয়েটার

প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রতিষ্ঠিত নাট্য নিকেতনের দায়িত্ব নিয়ে শিশির কুমার ভাদুড়ি এর নাম দেন শ্রীরঙ্গম। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালিয়ে আদালতের নির্দেশে এর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তখন এর দায়িত্ব পায় মেসার্স সরকার ব্রাদার্স অ্যান্ড প্রপার্টিস (প্রাইভেট) লিমিটেড (২৮-১-৫৬)। নাট্য আগ্রহী নটবর সরকারের

কনিষ্ঠপুত্র রাসবিহারী সরকার কোম্পানীর তরফে উদ্যোগী হয়ে নাট্যমঞ্চ চালাবার দায়িত্ব নিলেন। নানাভাবে সংস্কার করে শ্রীরঙ্গমের ভোল পালটে দেন। নতুন নামকরণ করা হল বিশ্বরূপা। প্রথম নাটক অভিনীত হল তারাশঙ্করের সদ্য প্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন' এর নাট্যরূপের একই নামে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন। তবে এই থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২২ জুলাই।

এখানে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক 'ক্ষুধা' নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা পায়। একটানা ৫৭৩ রাত্রি চলে 'ক্ষুধা' বাংলা মঞ্চাভিনয়ের এতোদিনের সব রেকর্ড ভেঙে দিল। নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি এই থিয়েটার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়ে থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এছাড়া গিরিশ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘে 'গিরিশ থিয়েটার' নামে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমেই সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, ১৯৬০ এর ৩১ জুলাই।

এরপর পুরনো নাটকের আধুনিক মঞ্চায়নের চেষ্টা করা হয় বিশ্বরূপায়। এই প্রকল্পের প্রথম নাটক অপরেশ চন্দ্রের 'কর্ণার্জুন'। এরপর 'সেতু'। 'সেতু'ও অসামান্য সাফল্য পায়। ১০৮২ রাত্রি একটানা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। 'সেতু' নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নায়িকা অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়। এরপর 'লগ্ন' নাটক। তারপর 'রাধা', 'হাসি' প্রভৃতি। পরবর্তীতে হল 'জাগো'। নাটকটি ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার কারণ হল তখন বিধায়ক ভট্টাচার্য নেই, নেই তাপস সেন। সব একা রাসবিহারী। ফলেই সার্বিক ব্যর্থতা। এবারে বিশ্বরূপায় নিয়ে আসা হল তরুণ রায়কে। প্রতাপ চন্দ্রের উপন্যাস 'জব চার্ণকের বিবি' অবলম্বনে নাট্যরূপ দিলেন তরুন রায়। নাম 'রঙ্গিনী'। প্রথম অভিনয় হলে ১৯৬৭-এর ২০ মে এই নাটকটিও ব্যর্থ হল। এরপর 'এক পেয়ালা কফি'। অল্প কিছুদিন চলার পর নাকটটি বন্ধ হয়ে গেল। এবার নামানো হল আগন্তুক। এই নাটকটি খুব সাফল্য লাভ করে।

'আগন্তুক' নাটক চলাকালীন থিয়েটারের সত্ত্বাধিকরণ সরকার পরিবারে মৃত্যুভাঙন পৃথকগন্ন ইত্যাদি কারণে বিশ্বরূপাতেও তার প্রভাব পড়ল। ফলে ১৯৬৮-তে রাসবিহারী সরকার একক্সত্ত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে, যেমন সরকার পরিবারের তরফে দক্ষিণেশ্বর সরকার কিছুদিন বিশ্বরূপা থিয়েটার চালিয়েছিলেন। তাঁরই কর্তৃত্বে ১৯৬৫-র ১৪ এপ্রিল হয়েছিল 'হাসি' নাটক। আর রাসবিহারী সরকারের একক দায়িত্বে প্রযোজিত হল 'ঘর' নাটক। অভিনয় করলেন কালী ব্যানার্জী, অনুপ কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখেরা। নাটকটি তেমন খ্যাতিলাভ করেনি। এরপর 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'কোথায় পাবো তারে' প্রভৃতি।

'চৌরঙ্গী' নাটক অভিনয়ে আবার বিশ্বরূপায় সাফল্য দেখা গেল। ১৯৭১-এর ২৫ সেপ্টেম্বর শঙ্করের লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে এবারে রাসবিহারীর প্রচেষ্টা সার্থক হল। এই নাটকে ক্যাবাকারে নৃত্যের প্রয়োগ দেখা গেল। এরপর 'আসামী হাজির' নাটক। এই নাটকে ক্যাবাকারে নাচের সার্থক প্রয়োগ দেখা গেল। এটিও প্রচন্ড সফল হল। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রাসবিহারী করলেন 'পরস্ত্রী',

তারপর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'জনগণমন', 'সাহেব বিবি গেলাম', 'সব ঠিক হ্যায়' এগুলি সবই বিমল মিত্রের লেখা। তবে এগুলি জনসমর্থন পায়নি। এই সময় বিমল মিত্র থেকে সরে এসে রাসবিহারী করলেন শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ। এটিও ব্যর্থ হল। এবার দ্বারস্থ হলেন আশাপূর্ণা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'সুবর্ণলতা' কাছে। এটিও অসফল হল।

এরপর রাসবিহারী থিয়েটার থেকে সরে এসে তাদের পারিবারিক প্রোমোটারি ব্যবসা শুরু করেন। বিশ্বরূপার লাগোয়া ফাঁকা জমিতে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি করে বিক্রির বন্দোবস্ত করে অগ্রিম টাকাও নেন। কিন্তু থিয়েটারের সত্ত্ব তার হলেও জমির মালিক তিনি নন। এরপর বিভিন্ন মামলায় জেরবার রাসবিহারী থিয়েটার করা ছেড়ে দিলেন। ১৯৮০-র মাঝামাঝি শুক্লা সেনগুপ্ত নামে একজন বিশ্বরূপার লীজ নেন রাসবিহারীর কাছ থেকে। শুক্লা সেনগুপ্ত বিশ্বরূপায় সুস্থ রুচির নাটক প্রযোজনা শুরু করলেন। অভিনীত হল স্বরলিপি, ফেরা, স্বীকারোক্তি, নীলকণ্ঠ। এগুলি লোকসমাদর পেয়েছিল। পরের প্রযোজনা ঘন্টাফটক, ভালো খারাপ মেয়ে, রমাপ্রসাদ বণিককে এনে তিনি নাটক দুটির প্রযোজনা করান।

কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এইভাবে পেশাদার থিয়েটার চালাতে গিয়ে শুক্লা ক্রমে ঋণভারে জড়িয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করলেন। বিশ্বরূপাও রক্ষা পেল না। এরপর থেকে বিশ্বরূপা বন্ধই হয়ে পড়েছিল। ২০০১-এর ১৪ নভেম্বর, কালীপূজোর দিনে রাত দুটোর সময় বিশ্বরূপার মঞ্চে আগুন লাগে।

এবার আমরা দেখব দোষে গুণে মিশ্রিত বিশ্বরূপা বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাস কেন স্মরণীয় —

১. অনেক খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকদের নাট্যরূপ এখানে রীতিমতো অভিনীত হয়েছে।

২. প্রযোজনার আঙ্গিকগত দিক দিয়ে নানা অভিনব প্রয়াস এখানে করা হয়েছিল। যেমন থিয়েটার স্কোপ, স্পিডোস্কোপ প্রভৃতি অভিনব নাট্যোপস্থাপনার প্রয়োগকৌশল এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩. চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরাও এখানে অভিনয় করেছে।

৪. নাট্য উন্নয়নের প্রকল্পে বিশ্বরূপা একটি লাইব্রেরী চালু করেছিল। সেখানে নাট্যবিষয়ক এদেশ বিদেশের গ্রন্থাদি রাখা হয়েছিল এবং উৎসাহী পাঠক-গবেষকদের সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্বরূপার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

৭.১.৫.১৫ ঃ রঙমহল থিয়েটার

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রমোহন রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে 'রঙমহল' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত অন্ধগায়ক ও অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট) ও রবি রায় এর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। অন্যান্য প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নিয়ে আসা হয় প্রচুর টাকা দিয়ে। থিয়েটারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ১ মে, আর ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে রঙমহলের যাত্রা শুরু হয়।

এরপর ১৯৩২-এর ১৭ জানুয়ারি অভিনীত হয় 'বিজয়িনী', ২৫ মার্চ 'রঙের খেলা'। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'বনের পাখী, 'শাদী কি শূল' প্রভৃতি নাটকও এখানে অভিনীত হল। 'বনের পাখী' নাটকটি খুব জমেছিল। ইতিমধ্যেই শিশিরকুমার ভাদুড়ি 'রঙমহল' ছেড়ে চলে গেছেন। আর্থিক কারণে রঙমহলের কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়। ১৯৩৩ থেকে যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক এর দায়িত্ব নেন। এরা প্রযোজনা করল 'দেবদাসী'। এরপর সতু সেন নতুন 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ' তৈরী করেন। বাংলা তথা ভারতে রঙমহল থিয়েটারই প্রথম এই ধরনের মঞ্চ প্রবর্তন করে। এই নতুন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হল অনুরূপা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'মহানিশা' (১৯৩৩-এর ১৫ এপ্রিল)। নাটকটি সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা পায়। এরই সঙ্গে রঙমহলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বর মাসে অভিনীত হল মন্মথ রায়ের 'অশোক,' এরপর 'বাংলার মেয়ে' দুটি নাটকই ভালো সাফল্যলাভ করে।

এদিকে ১৯৩৫-এ শিশির মল্লিক রঙমহলের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। দায়িত্ব নেন অমর ঘোষ। তাঁর নেতৃত্বে অভিনীত হয় চরিত্রহীন। নাট্যরূপ দেন যোগেশ চৌধুরী। নাটকটি একটানা দীর্ঘদিন চলে রঙমহল এর গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। এরপর রঙমহল একটু খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। কারণ পর পর বেশ কিছু নাটক ব্যর্থ হয়। তাই থিয়েটার বন্ধ রাখতে হয়। পরে তা সামলে উঠে আবার নতুন করে অভিনয় শুরু করে রঙমহল। এই সময় নাট্যপরিচালক হিসেবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং নতুন নাট্যকার হিসেবে বিধায়ক ভট্টাচার্য এখানে যোগ দিলেন। নতুন উদ্যোগে এবার অভিনয় শুরু হল ১৯৩৭ এর মাঝামাঝি। প্রথমে নামানো হল 'অভিষেক', 'সর্বহারা' প্রভৃতি নাটক। এরপর শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকটি ভালো চলল। ১৯৩৭-৩৮ এ এখানে যোগ দেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনীত হল 'তটিনীর বিচার'। এটিও সফল হল। এই সময় রঙমহলের আর্থিক অনটন অনেকটা কেটে গেল।

এবার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯)। এই সময় সব থিয়েটারই প্রায় বন্ধ থাকে। জুলাই মাস থেকে আবার অভিনয় শুরু হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'বিশ বছর আগে' দিয়ে। পরপর অভিনীত হতে থাকে 'ঘূর্ণি', 'মালারায়', 'মেঘমুক্তি' প্রভৃতি। শেষেরটি ভালোই চলেছিল। ১৯৮০ এর ডিসেম্বর হল 'রত্নদীপ', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি। সে যুগে রত্নদীপ নাটকটি খুবই সাফল্য পায়।

১৯৪২-এ রঙমহলের 'লেসী' হন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে সময়ের সেরা শিল্পীদের জড়ো করেন এখানে। অভিনীত হল — 'মাকড়শার জাল', 'ডা. মিস কুমুদ', 'আগামীকাল', 'আঁধার শেষে', 'রক্তের ডাক' ইত্যাদি। এই সময় প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক শম্ভু মিত্র যোগ দেন এখানে। অভিনীত হয় 'গোরা'। এরপর প্রায় পাঁচ বছর রঙমহল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরনো নাটক অভিনয় করে এবং নতুন বলতে অয়স্কান্ত বক্সীর অধিকার, তারাশঙ্করের বিংশ শতাব্দী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রাজপথ প্রভৃতি। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বরাত্রে অভিনীত হল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নতুন নাটক বাংলার প্রতাপ। এটি খুবই সাপল্য পেল। ১৯৪৮-এ অভিনীত হল দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, শচীন সেনগুপ্তের 'আবু হোসেন'। এরপর শরৎচন্দ্র ঘোষ দেউলিয়া হয়ে পড়েন। তখন ১৯৪৯ থেকে দায়িত্ব নেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'। পরপর হল পন্ডিত মশাই, নিষ্কৃতি। নিষ্কৃতির অভিনয় সাফল্য পেল ও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হল। তারপর 'চাঁদবিবি', 'জীজাবাঈ', 'রাণাপ্রতাপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিষবহ্নি', 'খুনীর বাড়ি' প্রভৃতি নাটকগুলি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ এর মধ্যে অভিনীত হয়। এর কোনোটিই তেমন চলেনি। এরপরে রঙমহল বন্ধ হয়ে যায়। মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। দায়িত্ব নেন জীতেন বোস ও ভিটল ভাই মানসাটা। পরিচালক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে নানা কারণে মতান্তর দেখা দেওয়ায় দায়িত্ব নেন শম্ভু মিত্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত বহুরূপীর অভিনেতৃবর্গ রঙমহল ছেড়ে দেন। এই সময় কোনোক্রমে 'দূরভাষিনী' মঞ্চস্থ হয়। এরপর নামানো হয় 'উল্কা'।

১৯৫৪-এর ২ অক্টোবর 'উল্কা' নাটক রঙমহলে প্রথম অভিনীত হল। নাটকটি বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা পায়। ৬০০ রজনী অভিনয় হয় উল্কার। এই উল্কাই আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখায় কর্তৃপক্ষকে। এরপর অভিনীত হল 'শেষলগ্ন'। এটিও ভালো চলল। ১৯৫৭-তে মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে রঙমহলে যোগ দেন। তিনি এসে নিজের নাটক 'শতবর্ষ আগে' অভিনয় করেন। তারপর তারাশঙ্করের 'কবি'। 'উল্কা'র মতো 'কবি' ও অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে দীর্ঘরাত্রি অভিনীত হল।

এরপর 'দুইপুরুষ', 'মায়ামৃগ', 'সাহেব বিবি গেলাম', 'একমুঠো আকাশ', 'একপেয়াল কফি', 'অনর্থ', 'চক্র' প্রভৃতি নাটকগুলি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে অভিনীত হয়। ১৯৬২-তে এসে রঙমহলের সংকট ঘনিয়ে আসে। রঙমহলের দুই মালিক জীতেন বোস ও ভিটল ভাই মানসাটা দুটি সিনেমা হলের মালিক ছিলেন। তারা চাইলেন এখানে সিনেমা হল বানাতে। কিন্তু নাট্যকর্মীদের অবরোধের ফলে এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান রায়ের উদ্যোগে রঙমহল পরিলাচনার দায়িত্ব পান কলাকুশলী ও কর্মীরা। অভিনেত্রী সরযূবালা এবং অভিনেতা জহর রায় সমবায় ভিত্তিক (Co-operative) থিয়েটারের তরফে পরিচালনার দায়িত্ব নেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এবার নতুন উদ্যমে অভিনয় শুরু হল। সমবায় প্রথায় প্রথম অভিনয় 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৬২-এর, ৩ ফেব্রুয়ারি)। নাটকটি এর আগেই এখানে সাফল্য পেয়েছিল; এবারও পেল। অভিনয় করলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়ের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সমবায় প্রথায় পরিচালিত

রঙমহল থিয়েটারে পরপর সফলভাবে নাটক অভিনীত হতে থাকল এবং প্রায় সব নাটকই দর্শক আনুকূল্য লাভে সার্থক হল। এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'প্রতিমা', 'ছায়ানায়িকা', 'নহবত', 'বাবাবদল', 'আলিবাবা', 'অনন্যা' প্রভৃতি। এই 'অনন্যা' নাটক থেকে কুরুচিপূর্ণ ক্যাবারে নৃত্যের চল শুরু হয় থিয়েটারে। এই সময় থিয়েটারের ঐতিহ্য নষ্ট হতে থাকে। রঙমহলও অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। সালটা ১৯৭০ এর মাঝামাঝি। সমবায় প্রথা ভেঙে পড়ে। অনেকে চলেও যান। এরপর ১৯৭৭-এ জহর রায়ের মৃত্যু হলে সমবায় প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

এরপর রঙমহলের কর্মাধ্যক্ষ হলেন শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় ভদ্র। রঙমহলের দুর্দিনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫-এর কিছুদিন 'থানা থেকে আসছি' অভিনয় করেন। তাতে শেষ রক্ষা হয় না। ক্যাবারে নৃত্যের অশ্লীলতার মধ্যে দিয়ে রঙমহলের সুনামের ঐতিহ্য বিঘ্নিত হয়। এর বিরুদ্ধে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নামানো হয় 'অমরকন্টক' (১৯৮০তে)। এতে অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। এরমধ্যে অনুপ কুমারের পরিচালনায় 'হঠাৎ নবাব' নাটক অভিনীত হয়। এরপর কয়েক বছর ধরে চলে 'বিবর', 'স্বীকারোক্তি', 'নীলকণ্ঠ' প্রভৃতি।

এরপর অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে রঙমহল এগোল । কিন্তু একসময় আর চলল না। এরপর ১৯৯৯ থেকে রঙমহল বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। এরপর আর কোনো অভিনয় হয়নি এখানে। অবশেষে, ২৮ আগস্ট, মঙ্গলবার। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের মাঝরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে রঙ্গালয়টি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ ঐতিহ্য লালিত রঙমহল থিয়েটারের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়।

তাই আলোচনার উপান্তে এসে বলা যায়। একটানা পঞ্চাশ বছর নানা ভাব, বিষয় ও ভাবনার নানান নাট্যাভিনয় করে। বহু নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমাহার ঘটিয়ে, বিভিন্ন খ্যাতিমান নাট্যপরিচালকের সাহায্য নিয়ে যে নাট্যসম্ভার বাঙালীকে উপহার দিয়েছে তারজন্য রঙমহল বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৭.১.৫.১৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান — শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ।

২. বাংলা নাটকের টেকনিক — শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা, পরিবেশক — পুস্তক বিপণি।

৩. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — দর্শন চৌধুরী, পরিবেশক — পুস্তক বিপণি।

৪. বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক — পুলিন দাস।

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৬. বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার — ড. প্রসূন মুখোপাধ্যায়।

৭. বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

৮. পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রকাশিত নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা '৯৯।

৯. নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

১০. আজকের প্রতিভাস — বিশেষ নাট্য, মার্চ — মে, ২০০৮।

৭.১.৫.১৭ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী

১. অমরেন্দ্র নাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে কি অবদান রেখেছিল তা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

২. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল সে ইতিহাস ব্যক্ত করে, এই থিয়েটারের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩. প্রতাপচাঁদ জুহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার কতটা ন্যাশনাল থিয়েটার হয়ে উঠতে পেরেছিল তা এই থিয়েটারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ব্যাখ্যা করো।

৪. স্টার, এমারেল্ড, বীণা, বেঙ্গল এই থিয়েটারগুলি সম্পর্কে আলাদা, আলাদা করে আলোচনা করো।

৫. বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী থিয়েটার কোন্‌টি? তার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৬. মিনার্ভা থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল - আলোচনা করো।

৭. কোহিনুর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এখানকার অভিনীত নাটক সম্পর্কে আলোচনা করো। এই থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করো।

৮. বিশ্বরূপা থিয়েটার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৯. স্বল্পস্থায়ী নাট্যশালা হিসেবে মনোমোহন থিয়েটার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

১০. সখের নাট্যশালা হিসেবে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অবস্থান নির্ণয় করো।

————

একক-৬

গণনাট্য, নবনাট্য

বিন্যাসক্রম

৭.২.৬.১ গণনাট্য

৭.২.৬.২ নবনাট্য

৭.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.৬.১ : গণনাট্য

গণনাট্যর মূলে রয়েছে বস্তুতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামী জীবনবোধ, গভীর রাজনীতি সচেতনতা, বৃহত্তর অর্থে মার্ক্সীয় জীবনাদর্শ। গণ্যনাট্যের অনুসারী ভাবের নাটকের প্রচলন ইউরোপে ছিল না এমন নয়, তবে স্বতন্ত্র নাট্য প্রকরণ হিসেবে গণনাট্য বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব ও বিকাশের মূলক্ষেত্র বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের কোলকাতা শহর। ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই কোলকাতায় 'প্রভাতি লেখক সংঘ' নামে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তা রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এ'। 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র কোনো কোনো সদস্যের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ সালের ২৫শে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian peaple's Theatre Accociation, IPTA)। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল

মার্ক্সীয় ভাবনা অনুসারে শোষিত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল। আই. পি. এর উদ্দেশ্য ভাবনার সঙ্গে ওই ইস্তাহারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে আই.পি.টি.এ একদল চিন্তাশীল, মানবদরদী মানুষের বহুদিনের চিন্তা চেতনার ফসল। নানা ক্ষেত্র থেকে রসদ সংগ্রহ করে তৈরি হয়েছে এর ভিত্তিভূমি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্যরা যখন কাজ শুরু করেন তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ এক অশান্ত পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল এদের জয়যাত্রা। তবে পরিস্থিতির চাপ রুদ্ধ করতে পারেনি এঁদের চলার পথ। নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তাঁরা অগ্রসর হন দৃঢ়পদে। আর তাঁদের নেতৃত্ব দেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য সহ নানা বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে 'নবান্ন' নাটক রচনা করলে সূত্রপাত হয় বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের।

বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মী বৃন্দ 'নবান্ন' ছাড়াও আরও যেসব নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে গণনাট্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যথা —

ক. সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এক কথায় সর্বহারা মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী এর মূল আশ্রয়।

খ. এখানে থাকে দুটি প্রধান শ্রেণী-বুর্জোয়াও সর্বহারা। দুই শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ নাটকে চূড়ান্ত মাত্রা পায় এবং শেষপর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণী জয়লাভ করে।

গ. সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম করে বলে গণনাট্যের মধ্যে উদ্দেশ্য মুখীনতা প্রাধান্য পায়। 'আর্ট ফর আর্ট সেক' এই নীতি গণনাট্যের শিল্পীরা মোটের উপর অস্বীকার করেছেন। আর্ট যার মেন সেক নীতির বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাঁদের নাটকগুলিকে গড়ে তুলেছেন শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে।

ঘ. শোষিত মানুষের সংগ্রাম ও জয়লাভের কাহিনী নাটকের প্রধান অভিমুখ। অথচ দর্শকের বাস্তব অভিজ্ঞতা তার বিপরীত। এই অবস্থায় গণনাট্যে একটা কৃত্রিমতা আসার সম্ভাবনা থাকে। ওই সীমাবদ্ধতা থেকে নাটককে মুক্ত করার জন্য নাট্যকার সচেতন ভাবে শোষক শ্রেণীর অত্যাচার অবিচারের কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেন। যাতে দর্শকের মনে এই ভাবনা প্রাধান্য পায়, বিষয়টি বাস্তব না হলেও বাস্তবে এমনই হওয়া উচিত। অর্থাৎ যেন নাটকের ইতিবাচক পরিণতি দেখার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ঙ. গণনাট্যের লক্ষ ব্যক্তি নয় সমষ্টি; শোষিত লাঞ্ছিত সর্বহারা সমাজের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মুক্তি। তাই এখানে নায়ক চরিত্র প্রাধান্য পায় না। জনগণই এখানে এক অর্থে নায়ক অন্য অর্থে গণনাট্য নায়কহীন।

চ. গণনাট্য দাঁড়িয়ে থাকে সর্বহারা শ্রেণীর জীবনচিত্র ও জীবনবাস্তবতার ভিত্তির উপর। এদের জীবনের নানা খুঁটিনাটি দিক খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা থাকে এখানে।

ছ. গণনাট্যের ভাষা ও সংলাপ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। সর্বহারা শ্রেণীর জীবনছন্দের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের চেষ্টা থাকে বলে এখানে ভাষাকে যতদূর সম্ভব মানুষের মুখের ভাষায় কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশী, লোকজ, অশ্লীল, সবই সমান গ্রহণ যোগ্যতা পায়।

জ. গণনাট্যের অভিনয়ের নেপথ্যে কোনো বাণিজ্য বুদ্ধি কাজ করে না। তাই দর্শককে অতিরিক্ত চমৎকৃত করার জন্য মঞ্চসজ্জার বাহুল্য থাকেনা। খরচ-খরচা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করার বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।

৭.২.৬.২ **: নবনাট্য**

গণনাট্য সমকালে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর অন্তর্নিহিত একটা ত্রুটির দিক ছিল। এখানে উদ্দেশ্য প্রাণতার দ্বারা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হতেন নাট্যকার। কোনো উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসার পর গণনাট্য কর্মীদের কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা উদ্দেশ্যের পদতলে শিল্পের সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিতে আর উৎসাহ বোধ করেন না। সুতরাং শুরু হয় বিতর্ক। বিতর্ক পরিণত হয় বিরোধে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কঠোর আদর্শ থেকে সরে আসেন একদল শিল্পী। তাঁরা একই সঙ্গে একদিকে যেমন শোষিত নির্যাতিত মানুষের হয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পের সৌন্দর্যকে ও বজায় রাখার শপথ নেন। অর্থাৎ তাঁরা সাহিত্যকে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ততোদূর পর্যন্ত চালিত করেন যতদূর পর্যন্ত চালনায় সাহিত্য-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত হানি না ঘটে। নবনাট্য গণনাট্য সংঘের ওই বিশুদ্ধ কর্মীদের নাট্য-কলমের চূড়ান্ত ফসল।

নবনাট্যের নাট্যাদর্শ নিয়ে সমকালে অনেক আলোচনা হয়েছিল। নাট্যকার কিরণ মৈত্র বলেছিলেন - "এ নাটকের বিষয়বস্তু আর এক নাটকের বিষয়বস্তু হবে না। হলেও বিচার বিশ্লেষণে, বক্তব্যে সে ভিন্ন হবে। চরিত্র সৃষ্টিতে, গঠন পদ্ধতিতে সে একক হবে। আমি তাকেই নবনাট্য বলব যা আমাকে বিস্মিত করে, চমকিত করে, সম্মোহিত করে" বোঝা যাচ্ছে গণনাট্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য নাট্যকাররা কতটা ব্যাকুল হয়েছিলেন। গতানুগতিকতা ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে আপোসহীন অবস্থানে দৃঢ় হয়েছিলেন তাঁরা। আর সে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁদের নাট্যসৃষ্টিতে।

নবনাট্য কর্মীদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার' প্রতিনিধি স্থানীয় নবনাট্য। নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে নবনাট্যের নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে —

ক. নবনাট্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপোস করে না। শিল্পে সৌন্দর্য এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

খ. নাট্যকার সামাজিক মানুষ; মানুষের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা আছে। ওই দায়বদ্ধতার কারণে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেন।

গ. শোষক-শাসিতের সংগ্রাম গণনাট্যের মতো নবনাট্যেরও অন্যতম প্রধান বিষয়। কিন্তু গণনাট্যের মত এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শোষিত শ্রেণীর জয়লাভ দেখান হয় না।

ঘ. কোনো বিশেষ চরিত্র নবনাট্যে নায়ক হয়ে উঠতে পারে, আবার জনগণেরও এখানে নায়ক হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই।

ঙ. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে নবনাট্যে নাট্যকার বাস্তবতার ভিত্তির উপর দৃঢ় থাকতে পারেন। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য বাস্তবতার কোনো অতিরঞ্জিত চিত্রণ এখানে থাকে না।

চ. মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে নবনাট্যে কোনো বাধাধরা নিয়ম অনুসরণ হয় না। প্রয়োজনে নাট্যকার মঞ্চসজ্জার উপর গুরুত্ব দেন, প্রয়োজনে মঞ্চসজ্জার বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন।

ছ. ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে নবনাট্য গণনাট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোনো কৃত্রিম কাব্যভাষা এখানে গ্রাহ্য নয়। সমাজ বাস্তবতার গভীর থেকে তুলে আনা হয় নাট্যভাষার সূত্র।

ঝ. রস পরিণতির দিক থেকে নবনাট্যের বিষাদান্ত বা করুণ রসাত্মক হতে কোনো বাধা নেই। নাট্যঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি যদি বিষাদান্ত হয় তবে নাট্যকার স্বচ্ছন্দে বিষাদের স্রোতে পাত্রপাত্রীকে, সেই সঙ্গে দর্শককে ভাসিয়ে দিতে পারেন।

নবনাট্য, গণনাট্যসহ বর্তমান অধ্যায়ে আরও যে সব নাট্যরূপ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা করা হল তার বাইরেও অনেক নাট্যরূপ প্রচলিত আছে। যেমন — লোকনাট্য, মাক্স, প্যান্টোমাইম, মরালিটিপ্লে, ইন্টার লুড, মিরাক্‌ল প্লে নানা কারনে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ অলোচনা করা গেল না। উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু একটু সংকেত সূত্র তুলে ধরা হল —

৭.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গণনাট্য ও নবনাট্য কী? বাংলা নাট্যজগতে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৭.২.৬. ৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক -৭

গ্রুপ থিয়েটার

বিন্যাসক্রম

৭.২.৭.১ ভূমিকা

৭.২.৭.২ গ্রুপ থিয়েটার কী?

৭.২.৭.৩ আই পি টি এ এবং নবান্ন

৭.২.৭.৪ গ্রুপের ধারণা

৭.২.৭.৫ আইপিটিএ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

৭.২.৭.৬ বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

৭.২.৭.৭ বিশিষ্ট থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

৭.২.৭.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.২.৭.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.২.৭.১ ভূমিকা

নাটক একটি প্রাচীন শিল্প মাধ্যম। সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষের সাথে নিয়তির দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে নাটকের প্রধান উপজীব্য। এরই বিবর্তিত পর্যায়ে নাটকের বিষয়বস্তুতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সাথে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর প্রধানের সাথে অন্যদের দ্বন্দ্ব, রাজার সাথে জনগণের দ্বন্দ্ব, যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব, অসত্যের সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব, সুন্দরের সাথে অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি সর্বহারার সাথে শোষকের দ্বন্দ্ব। বিষয়ের সাথে সাথে এভাবে এসেছে আঙ্গিকগত পরিবর্তন। আজ থেকে প্রায় দুই শত বছরেরও অধিক সময় পূর্বে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাষাবিদ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফ প্রথম বেঙ্গল থিয়েটার (১৭৯৫)প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে বীজ রোপন করেন তা আজ মহীরুহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গদেশে আধুনিক ইউরোপীয় গোছের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রবর্তক হিসেবে তাকে স্মরণ করতেই হবে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, সংস্কৃত পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সক্রিয় উৎসাহে ও অনুবাদে 'উরংমঁরংব' নামক প্রহসনটির মঞ্চায়নের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা মঞ্চ নাটকের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতা হিসেবে বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গরা রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্য চর্চার ধারাকে বিকশিত করে। যদিও সে সময় মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলো মঞ্চায়িত হতো। মৌলিক বাংলা নাটকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রায় অর্ধশত বৎসর। ১৮৫২ সালে ‘কীর্তিবিলাস’ ও ‘ভদ্রার্জুন’ নামক দুটি নাটক রচিত হলেও ১৮৫৪ সালে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’কেই

বাংলার সুধীজনরা প্রথম সার্থক মৌলিক নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা নাটক সূচনা থেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই জীবন ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিকে বুকে ধারণ করেছে তারই পথ ধরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইতিহাস আশ্রিত ট্রাজেডি ও প্রহসন এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর মনমোহন বসু, মীর মোশারফ হোসে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরো অনেকের নাটক সমকালের মঞ্চকে সচল রেখেছিল।

৭.২.৭.২ গ্রুপ থিয়েটার কী?

গ্রুপ থিয়েটার বা সংঘ নাট্যচর্চা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে এবং লাভ করে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ফলে নাটক হয়ে ওঠে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাগরণের মাধ্যম।

গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব মূলত বিদেশে। ১৯৩১ সালে নাটকই নিবেদিত তিন মার্কিন তরুণ হ্যারল্ড ক্লারম্যান, চেরিল ক্রাফোর্ড এবং লী স্ট্রসবার্গ আমেরিকান নাটকের গতানুগতিক চেহারা বদলে দেবার সংকল্প নিয়ে গঠন করেন ‘গ্রুপ থিয়েটার’ নামে একটি নাট্যদল। তখনকার সময়ে সস্তা জনপ্রিয় বিনোদনসর্বস্ব নাটকের বিপরীতে জীবনঘনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় এমন নাটক প্রযোজনা করতে উদ্যোগী হলেন এই নতুন দলের ২৮ জন অভিনয়শিল্পী। তাঁরা এমন মার্কিন নাটক অভিনয় করতে চাইলেন যা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

অভিনয়ে গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠীর আদর্শ ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব স্তানিস্লাভস্কি। তাঁর মেথড অনুসরণ করে এরা নাট্যচর্চা শুরু করেন। দলটির ১০ বছরের জীবনে বাইশটি নাটক সাফল্যের সাথে প্রযোজিত হয় এবং গ্রুপ থিয়েটার সত্যিকার অর্থেই মার্কিন নাট্যচর্চায় নতুন ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ১৯৩২ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি ছোট্ট নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। সাত বছর পর তিনটি অপেশাদার নাট্যদল গ্রুপ থিয়েটার নামই এখানে তাদের নিজ নিজ প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে ১৯৭৮ সালে নাট্যশালাটি নতুন করে উদ্বোধন করা হয় প্রধানত অপেশাদার নাট্যদলগুলোর প্রযোজনার জন্য।

লণ্ডনে ১৯৩৩ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক, অবাণিজ্যিক এবং নিরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য নিয়ে। বেশিরভাগ নাটকই নির্দেশনা করতেন রুপার্ট ডুন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাভরণ মঞ্চে খুব কম দৃশ্যসজ্জা ও প্রপ্স ব্যবহার করে নাটক প্রযোজনা করা। ১৯৫৩ সালে দলটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।

৭.২.৭.৩ আই পি টি এ এবং নবান্ন

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা করে। নবান্ন অনুষ্ঠানপত্রীতে লেখা হয়েছিল:

“বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকার চাহিদা মেটাতে পাচ্ছে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তার সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেলো। সেদিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক। এই সংঘের কাজ হলো যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।’

‘নবান্ন’ নাটকটি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লেখেন। শম্ভু মিত্রের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত করেন। তারা দুজনই বামপন্থী থিয়েটার শিল্পী সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম নাটক ‘আগুন’ বিজন ভট্টাচার্যের রচনা। এই নাটকট১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে লেখা নাটক ‘জবানবন্দী’ এবং ‘নবান্ন’ অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালে ‘বহুরূপী’ নাট্যদলের প্রযোজনায় কুমার রায়ের পরিচালনায় নবান্ন মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তর (ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ)। গণনাট্য সংঘ এই নাটকটিকে ভারতের নানা জায়গায় তাদের ‘ভয়েস অফ বেঙ্গল’ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মঞ্চস্থ করে দুর্ভিক্ষের ত্রাণে লক্ষাধিক টাকা তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার ২০ লক্ষ মানুষ অনাহার, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। তিনি বাংলার এক চাষি। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার অনাহারে কেমন কষ্ট পেয়েছিল তাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবান্ন নাটকে কৃষকদের একটি দলকে দুর্ভিক্ষের শিকার হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে কৃষকদের তাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল এবং তারা বেঁচে থাকার আশায় বড় শহর কলকাতায় চলে আসে। যাই হোক তারা একটি সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে তারা কলকাতার সর্বাধিক অবহেলিত দারিদ্রতা, যেখানে তারা তাদের যন্ত্রণা একটি রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে হয় অভিব্যক্ত হয়।

৭.২.৭.৪ গ্রুপের ধারণা

সাধারণ দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয় সাধারণ রঙ্গশালা। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের। এ সময়ের প্রধান পুরুষ, নট ও নাট্যকার গিরীশ ঘোষ ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন তার নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়, বিদ্রোহ ও জনগণের আন্দোলন নিয়ে নাটক করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদাসীন।

সেইসময় বাংলার নাট্যশালাগুলি সমকালীন সঙ্কট থেকে দূরে গিয়ে দর্শকদের বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারছিল না। সমকালীন সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত তখন মানুষের মন। এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য আন্দোলন

নতুনভাবে সম্পদশালী হয়ে উঠতে চাইল বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের ধারাপথে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতে যে সংকট বাংলায় তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছিল মানুষের তৈরি করা মন্বন্তরে তারই স্বজাতির সগোত্র সাধারণ মানুষের অসহায় করুণ পরিণতি। সেদিন এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি কোনো রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের শপথ নেয় নি। কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্যা ও বিশ্বাসে সচেতনতা সঞ্চার করে বাঙালি তার সংগ্রাম করে তুলতে চেয়েছিল 'সামগ্রিক'। সরকারের এই "অন্তর্দাহ ও অকুণ্ঠ স্বভাবের আর্তি স্বরলিপির মত পড়তে পেরেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন - ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।"

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শুরুতে কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটার জনপ্রিয় তারকা অভিনেতাদের উপর ভিত্তি করে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যেমন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী ও অন্যদের মতো জনপ্রিয় অভিনেতাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। গ্রুপ থিয়েটার এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রস্থান করার চেষ্টা করেছে। খ্যাতিমান অভিনেতৃবর্গের পরিবর্তে গ্রুপ থিয়েটারে জোর দেওয়া হয় গ্রুপে যা সাধারণভাবে অপেশাদার অংশগ্রহণ করেছিল। প্রচেষ্টা ছিল গণনাট্য (জনগণের থিয়েটার) তৈরি । যদিও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংকট ও আদর্শগত কারণে গণনাট্য ভেঙ্গে যায়। একসময় যারা গণনাট্য পতাকা তুলে জড়ো হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বের হয়ে গেলেন গণনাট্য থেকে। এটা সত্য যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চিন্তা ধারা ও বস্তুবাদী চিন্তার কারণেই এই গণনাট্যের এই ভাঙ্গন পরবর্তী সময়ে তারই পথ ধরে শুরু হলো নবনাট্য চর্চা বা আজকের গ্রুপ থিয়েটার।

৭.২.৭.৫ আইপিটিএ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

কলাকুশলীদের দক্ষতা সাংগঠনিক শক্তি ও অসচেতনতার ফলে অভিনয়ে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করলেও গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ ক্রমশ প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে তোলে। নাটক ও নৃত্য এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, সংগঠক প্রধানের সঙ্গে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখদের নিত্য মতান্তর তীব্রভাবে ব্যঘাত সৃষ্টি করল গণনাট্য সংঘের দৈনন্দিন কর্মে। তবে শিল্পী বনাম সংঘটকদের এই বিরোধ কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার অর্থাৎ প্রাদেশিক শাখার নিজস্ব সংকট ছিল না। প্রখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্করের স্মৃতিকথা থেকে এই বিবাদের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে – "...প্রথম প্রথম স্কোয়াডে এসে কাজের স্বাধীনতায় পার্টির ততখানি উপস্থিত বোধ করিনি।।... কিন্তু সেটাই ধরা পড়েছিল আস্তে আস্তে... ক্রমে ক্রমে পার্টির অফিস থেকে নানারকম ফরমায়েশ আসতে শুরু করল....যেখানটায় অসুবিধা দেখা দিলো তা হল ওদের পার্টির হুকুম, অর্ডার নিয়ে। একটা সময় বুঝতেই পারছিলাম বড় বেশি মাপজোকের মধ্যে প্রবেশ করেছি।...ক্রমেপার্টি অফিসের প্রস্তাবগুলো একটু যেন বেশি আসতে লাগল। ... ওদের কালচারাল স্কোয়াডের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গ্রামে শো দেখাবে, মোটর বা লরি নিয়ে গিয়ে লরির পিছনে একটা অস্থায়ী স্টেজের মত করে মানুষকে সচেতন করার জন্য কিছু কিছু নাটক, ট্যাবলো প্রেজেন্ট করবে। জোতদারের অত্যাচার, মজুতদারের স্বার্থপরতা, শঠতা এসবই ওদের বিষয়সূচির মধ্যে ছিল। নিশ্চয়ই খুব ভালো উদ্দেশ্য এবং এতে ওদের জোরটা ক্রমশ বেড়ে গেল। শিল্পের দিকটায় আগ্রহ যেন কমতে লাগলো থাকল। ...স্থায়ী সাহিত্যের সাথে সাংবাদিকতার যে দূরত্ব, এদের কাজ কারবারের সঙ্গে দেখলাম স্থায়ী কোনও শৈল্পিক কাজের সেই দূরত্ব থেকে গেছে। এই হচ্ছে, এই করছি - ভাবখানা মোটের উপর এই। আর তার ওপর সেই পার্টি লেভেলের নির্দেশ - এটা কর, ওটা বাদ দাও। প্রায়ই এই নির্দেশ আমার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল... কিরকম যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠেকতে লাগলো।"

পরাধীন ভারতে গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ তত প্রকট হয়নি, দারুণভাবে তা প্রকট হয়ে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে - এমনকি বাংলা প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ সচিব প্রকাশ ঘোষ তাঁর প্রতিবেদনে নানা বিভেদের স্বরূপ উদঘাটন করে পেশ

করেছিলেন সাত দফা সমাধান সূত্র। এত কিছুর সত্বেও গণনাট্য সংঘের ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। অপরদিকে স্বাধীন বদেশের সরকার যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন তখন গণনাট্যের অনেকেই বিপন্ন বোধ করলেন, বিশেষতঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্যে যুক্ত থাকার ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন ছিলেন না।

সেই সময় সাধারণ রঙ্গশালা সঙে গণনাট্য সংঘের কখোনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। গণনাট্য অভিনীত নবান্নের সাফল্যের পর শঙ্কিত মঞ্চ মালিকরা কেউ গণনাট্যকে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য মঞ্চ রাজি ছিলেন না। জীবিকার প্রয়োজনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (যিনি মহর্ষি নামে পরিচিত) যুক্ত ছিলেন চলচিত্র সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে কিন্তু প্রগতি সংঘের আদর্শে তার অনুরাগ ছিল। এদিকে রংমহল, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা্শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি মঞ্চাভিনয়ে অতৃপ্ত শম্ভু মিত্র আবার বিজন ভট্টাচার্যের আহবানে কলকাতার ধর্মতলার ৪৬ নম্বর বাড়িতে পৌঁছালেন। এখানেই গড়ে ওঠে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এরপর ১৯৪৮এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গণনাট্যের সংঘের এক সভায় জনৈক সভ্য তাচ্ছিল্য করলে, শম্ভু মিত্র এই সংঘ পরিত্যাগ করেন।

এরপর মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বস্ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টচার্য শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কালিম শরাফি, মোহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ শিল্পীগণ যৌথভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন নতুন কিছু করা শুরু করার। এরপর ১৯৪৮এ রঙমহলে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' প্রযোজিত নবান্ন নাটক ১৩, ১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো। অনুপ্রেরণা শম্ভু মিত্রের পরিচালনা এবং কালিম শরাফিসহ তার তিন সহকর্মী অমর গাঙ্গুলী, অশোক মজুমদার এবং মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখের প্রচেষ্টা এবং কালীশংকর, ঋত্বিক ঘটক, সত্য জীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকের সহযোগিতায় উৎকৃষ্ট প্রযোজনার সত্ত্বেও 'নবান্ন' আর্থিক ভাবে সাফল্য পেল না। এরপর সংগঠন থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় –

ক) পেশাদারি পথ ছেড়ে অবলম্বিত হলো পরীক্ষামূলক পথা খ) মাসিক ৮ আনা চাঁদা স্থির হলো। গ) দলে কাজের বিভাজনে অমর গাঙ্গুলী দায়িত্ব পেলেন মহলার এবং মহম্মদ জ্যাকেরিয়া হিসাব রক্ষার। ঘ) অনুশীলনের নির্দিষ্ট সময় স্থির হলো সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে নটা পর্যন্ত।

এরপর তুলসী লাহিড়ীর পরিমার্জিত নাটক 'পথিক' 'রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিটিউট' প্রেক্ষাগৃহে ১৯৪৯এ ১৬ অক্টোবর 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' নিজস্ব প্রযোজনায় মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়, নাম হয় 'বহুরূপী'। মর্ষির ভাবনায় 'দ্যাখ, আমরা তো রংচং মেখে সব নাটক করি, থিয়েটার করি, তা আমরা তো সব বহুরূপীর দল – এক এক নাটকে এক এক রূপ। অতএব বহুরূপী দল নাম দিলে কেমন হয়?'। ৯মে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'বহুরূপী'র জন্মদিন নির্ধারিত হয়।

যদিও উৎপল দত্তের 'লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ' 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা আগেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এঁরা তখন শেক্সপিয়ার ও বার্নার্ড শ এর নাটক ইংরেজি অভিনয় করতেন। তাই মনে করা হয় 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই প্রথম বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত ঘটে। এরপর একে একে রূপকার, গন্ধর্ব, নান্দীকার, থিয়টার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি দলগুলি এসে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করল।

৭.২.৭.৬ বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার অস্তিত্ব রক্ষায় প্রথম পর্বে টিকিট বেচে থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও, তাদের লক্ষ্য কোনদিনই 'কমার্শিয়াল থিয়েটার' ছিল না। ব্যবসাভিত্তিক কমার্শিয়াল থিয়েটারে নাট্যকর্মীদের ওই দলের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। এখানে প্রধান লক্ষ্য মালিকের স্বার্থ। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য সুস্থ ও প্রগতিশীল নাট্যচর্চা। আর গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা অখণ্ডভাবে একটি যৌথ পরিবার। ১৯৪৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এরকম দলগুলি বেশিরভাগই কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার বাইরে গ্রুপ থিয়েটারের ধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক ভিত্তি সর্বত্র একই ধরনের। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা একজনের নেতৃত্বে একত্র দল তৈরি করে। এছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রেই দলের সদস্যদের স্ত্রী বা বোন অথবা বান্ধবী। গ্রুপ থিয়েটারের নেতৃত্ব যিনি, তিনি পরিচালক। তিনি সাধারণত দলের সবথেকে সমর্থ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতা, ফলে একথা অস্বীকার করার উপায় নে, যে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম অবধি পরিচালককেন্দ্রিক কিছুটা একনায়কতন্ত্র চলে আসছে অর্থাৎ যদিও নামে গ্রুপ বা অনেকের দল কিন্তু বাস্তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার মূলত 'ডিরেক্টরস্ থিয়েটার' একাধিকের নেতৃত্বে বা যৌথ নেতৃত্বে দল চলে এমন দল প্রায় নেই বললেই চলে। মনে পড়ে প্রথম পর্যায়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' দলে যৌথ নেতৃত্ব ছিল।

যদি সাল অনুযায়ী সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রুপ থিয়েটারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেখাচিত্র করি তাহলে দেখব ১৯৪৪ - ১৯৬০ (আনুমানিক) নবনাট্য (গণনাট্য) – গণনাট্য, সৎনাট্য। সৎনাট্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েন 'বহুরূপী সম্প্রদায়'। আবার নান্দীকার, রূপকার ইত্যাদ কযয়েকটি দল অরাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (যেমন ব্যাপিকা বিদায়, নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র) ইত্যাদি। নান্দীকার নিজের ইচ্ছা বা দ্বিধার বিরুদ্ধে সৎনাট্য করেন বলে অভিহিত হন। পরে অবশ্য 'নান্দীকার' তার দলের স্লোগানে ঘোষণা করে 'ভালো নাটক করবো, ভালো নাটক ভালো করে করব।'

৭.২.৭.৭ বিশিষ্ট থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ:

∞অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সেপ্টম্বর ৩০,১৯৩৩- অক্টোবর১৪, ১৯৮৩)

ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৫০ থেকে ৫৪-এই পাঁচ বছরে ৯টি নাটকে নির্দেশনা ও অভিনয় সূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ তে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সংঘাত'। ২ বছর পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। এই সংঘে ১৫টি নাটকে অংশ নেন তিনি। ১৯৬০ সালে ২৯ শে জুন প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দীকার'। প্রায় ৪০টি নাটকে নির্দেশক বা অভিনয় অথবা উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। তিন পয়সার পালা নাটকে নির্দেশনা ওসঙ্গীত পরিচালনার জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। সেতু বন্ধন, সওদাগরের নৌকা তার রচিত নাটক। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ এ নান্দীমুখ নামে নামে এক নতুন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের বিখ্যাত নাটক পাপপুণ্য।

∞বাদল সরকার (১৫ জুলাই, ১৯২৫ - ১৩ মে, ২০১১)

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি নাট্যব্যক্তিত্ব। যিনি থার্ড থিয়েটার নামক ভিন্ন ধারার নাটকের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। ৭০ দশকের নকশাল আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠান বিরোধী নাটক রচনার জন্যে তিনি পরিচিত হন, মঞ্চের বাইরে সাধারন মানুষের ভেতর নাটক'কে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কাজ বাদল সরকারের। তার নিজস্ব নাটক দল শতাব্দী গঠিত হয়

১৯৭৬ সালে। ভারতে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে হাবিব তনভীর, বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ এবং গিরিশ কার্নাডের পাশাপাশি বাংলায় বাদল সরকারের নাম উচ্চারিত হয়।

∞শম্ভু মিত্র (২২ অগস্ট, ১৯১৫ – ১৯ মে, ১৯৯৭)

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল: নবান্ন, 'বিভাব' ,ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তার রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তার রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ: নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

∞রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (৩১ জানুয়ারি ১৯৩৫-)

১৯৬১ সালে তিনি কলকাতায় নান্দিকার নামের এক নাট্য গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ১৯৭০ সাল থেকে উনি ঐ নাট্য সংগঠনের পরিচালক হিসেবে অনেক নাটক পরিচালনা করেন ও ওই বছর থেকেই উনি ঐ নাট্য সংগঠনের প্রধান হন। ১৯৮০ সালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার, যা উনি সঙ্গীত নাটক একাদেমি থেকে লাভ করেন। তার স্ত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত - যিনি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ঘরে বাইরে (চলচ্চিত্র)-এ অভিনয় করার জন্য বিখ্যাত।

∞তৃপ্তি মিত্র (ইংরেজি: Tripti Mitra) ডাকনাম তৃপ্তি ভাদুড়ী (২৫ অক্টোবর, ১৯২৫ – ২৪ মে, ১৯৮৯) ছিলেন বাংলা ভাষার থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী এবং শম্ভু মিত্রের স্ত্রী যিনি নাটক পরিচালনার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্যদল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। তিনি যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, ধরতি কে লাল ইত্যাদি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।

এছাড়া এছাড়া আগুন নবান্ন জবানবন্দি রক্তকরবী রাজা ডাকঘর প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় প্রযোজনা ও পরিচালনা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উষা গাঙ্গুলি, ১৯৭৬ সালে রঙ্গকর্মি থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উৎপল দত্ত: উৎপল দত্ত বিভিন্ন নাটক রচনা করেছেন, পরিচালনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন।

কৌশিক সেন: ১৯৯২ সালে স্বপ্নসন্ধানী প্রতিষ্ঠা হয়, গত দুই দশক ধরে তারা ৪০ টিরও বেশি নাটক রচনা করেছে।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাকটিউল থিয়েটার আর্টস-এর (আইএফটিএ) প্রতিষ্ঠাতা দেবাশীষ দত্ত।

অরুণ কুমার সরকার, ১৯৬১ সালে গ্রিন অ্যালবাম গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অরিন্দম সাহা, ২০০২ সালে নাট্যচেতনা'০৩ (গণ শিক্ষা) থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়, আগস্ট, ২০১৩ সালে একেটিও প্রতিষ্ঠা করেন।

নিলকণ্ঠ সেনগুপ্ত: থিয়েটার কমিউন-এর প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়: ২০১৩ সালে দমদম বিশ্বরূপম প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্র গুপ্ত: ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন অগ্রানের নবান্ন।

দীপ-গুঞ্জন (দীপঙ্কর বসু ও গুঞ্জন গাঙ্গুলি) ২০১২ সালে ঘোলা কালমুকুর প্রতিষ্ঠা করেন।

পিঙ্কি ঘোষ দস্তিদার 2011 সালে স্যামপন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

৭.২.৭.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গ্রুপ থিয়েটার কী? আইপিটিএ এফ পুরো নাম কি? এর প্রতিষ্ঠা কবে?

২। গ্রুপ থিয়েটার নবান্নের সম্পর্ক নির্ণয় করো।

৩। গ্রুপ থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখো।

৪। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম লেখো।

৫। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর ধারণা ও স্বরূপ বিস্তারিত আলোচনা করো।

৭.২.৭.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ- পবিত্র সরকার

২। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ - সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৩। নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা -সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক -৮

থার্ড থিয়েটার

বিন্যাসক্রম

৭.২.৮.১ থার্ড থিয়েটার কী?

৭.২.৮.২ থার্ড থিয়েটারের গঠন

৭.২.৮.৩ থার্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য

৭.২.৮.৪ অভিনয় পদ্ধতি

৭.২.৮.৫ বাদল সরকার ও বাংলা থার্ড থিয়েটার

৭.২.৮.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.২.৮.১ থার্ড থিয়েটার কী?

থিয়েটারের ইতিহাসে ষাটের দশকের শেষের দিকে থার্ড থিয়েটার একটি অভিনব ও বিকল্প নাট্যরীতির হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে তৃতীয় থিয়েটার এর ধারণা উপমহাদেশের গণমুখী নাট্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ বাদল সরকার তার মতে তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন একটা দৃষ্টিভঙ্গি একটা ভাবধারা এবং সেই কারণেই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন গবেষণা প্রসূত একটা অভিনয় নাট্যশৈলী নয় মাঠে ঘাটে পরীক্ষিত যুব সমাজের প্রয়োজনের গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের এজন্য তৃতীয় থিয়েটার কে অনেকে পথনাটকের আখ্যা দেয়।

৭.২.৮.২ থার্ড থিয়েটারের গঠন

মার্কিন নাট্য সমালোচক রবার্ট ব্রুসটাইন 'থার্ড থিয়েটার' নামে হাজার ১৯৬৯ সালে একটি বই লেখেন। ঐ নামের মূল প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে । ব্রুসটাইন মূলত বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটারের কথা। সে দেশের নাটকের দুটি ধারা' excessive lightness' আর 'excessive heaviness' এর। একদিকে চিন্তাহীন বক্তব্যহীন ফুর্তি সন্ধানী কমেডি অন্যদিকে মূলত বুদ্ধিজীবী নাট্যগোষ্ঠীগুলির গম্ভীরমুখী বক্তব্যপ্রধান নাটক। ওয়াশিংটনের লিংকন সেন্টারে একদিকে রিঅ্যাকশন পন্থী এবং অন্যদিকে joyপন্থী মার্কিনি নাট্যজগতের দুই warring faction এর সংঘর্ষ লক্ষ্য করে

তিনি বলেছেন যে সরকারি সংস্কৃতির দোকানে অর্থাৎ লিনকন সেন্টারের সংশ্লেষ(সিন্থেসিস)হওয়া সম্ভব নয়। তারপরেই জানাচ্ছেন যে "fortunately American third theatre supported primarily by the young which combines the useful properties of intensity Exuberance and engagement"তিনি বলেছেন জুলিয়ান বেক আর জুডিথ ম্যালিনার লিভিং থিয়েটারের কথা, বলেছেন ভিয়েতনামের 'অসহনীয়' যুদ্ধের বিরোধী তরুণদের সজীব নাট্য কর্মের কথা, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 'ভিয়েটরক ডায়নামাইট টু নাইট' এবং 'ম্যাকবার্ড' নাটকের।

ডেনমার্কের পরিচালক ইউজিনো বারবাও 'থার্ড থিয়েটার' কথাটি কে ব্যবহার করেছেন ১৯৭৭সালে তাঁর 'দ্য থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে 'international theatre institute bulleting' এর শীত সংখ্যায়। তাঁর কাছে প্রথম থিয়েটার হল 'the commercial and subsized theatre' দ্বিতীয় থিয়েটার হল 'The established a vantt grade'; প্রথম থিয়েটার 'blooming but deadly' আর দ্বিতীয় থিয়েটার 'has abandoned the actor for the director'। কিন্তু তাঁর থার্ড থিয়েটার মানুষের অন্তর জীবনের বাণী নিয়ে দর্শকদের আক্রমণ করে। বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে নয় দর্শক এক গভীরতর উপলব্ধি সে বানি কে পায়। বারবা র মতে গ্রটোউস্কি-র কাজেই এই থিয়েটার তার উলঙ্গ মূর্তি লাভ করেছে। পিটার ব্রুকের কাজ ও তার আভাস আছে। সি থার্ড থিয়েটারেরর আরো কিছু লক্ষণ দিয়েছেন বারবা তাঁর 'Rose Evans' বইটিতে। বাদলবাবু ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতায়'এ প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি 'থার্ড থিয়েটার' নামটি বুক স্টাইনের সূত্র থেকে নিয়েছেন শুধু। কারণ বুক স্টাইনের থার্ড থিয়েটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ স্থান ও মুহূর্ত নির্ভর, বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ভারতবদ্ধ।

প্রশ্ন জাগতে পারে বাদল সরকারের নাট্যরীতি তৃতীয় থিয়েটার হয়, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটার কী? গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা লোকনাট্য হলো প্রথম থিয়েটার। আর ভারতীয় শহুরে থিয়েটার, যে থিয়েটার মূলত ইংরেজদের থিয়েটারের অনুসরণে তৈরি হয়েছে এবং ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার এর এবং নাট্য রচনা সমস্ত রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছে, তাই হল দ্বিতীয় থিয়েটার । বাদল সরকারের হাতে এই দুই ধারার থিয়েটারের নিজস্ব শক্তি যেমন আছে তেমনি দুর্বলতাও প্রচুর ।গ্রামীণ থিয়েটারের দুর্বলতা হলো তাতে পশ্চাদমুখী মূল্যবোধের সংরক্ষণ। তাঁর মতে "the ideas and the themes... Remain mostly stagnant and sterile, unconnected with their own problems of emancipation-social, economic and cultural." থিয়েটারের ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন " লোকনাট্য বিষয়বস্তু প্রধানত পিছিয়ে থাকা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধই ভারাক্রান্ত দেবদেবীর রাজার উপাখ্যান দেখানো অর্থাৎ এই জীবনে উপবাস অত্যাচার-অবিচার সবই ঈশ্বরের লীলা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ধরে নিয়েছে মুক্তি আছে, সুখে আছে অথবা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজভক্তি পরমধর্ম।

৭.২.৮.৩ থার্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য

বাদল সরকার নিজে "The third theatre'বই এর 'A thinking process' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে সৌখিন নাট্যশালার স্টেজবদ্ধ নাটকের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা প্রসঙ্গে 'থার্ড থিয়েটার' কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে-

ক) স্বভাববাদী কিংবা বাস্তব বিশ্বের সেট্- সেটিং এর ব্যবহার করে নাটক করার তখন আর কোন অর্থ হয় না, এই ফিল্ম আবিষ্কারের পর। এখন বাস্তবিকতার রস ফিল্ম যেভাবে দিতে পারে, থিয়েটার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনা। কিন্তু থিয়েটারের সুবিধে এই যে থিয়েটারের অভিনয় জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে এখানে "a live person communicates directly to another live person"- ফিল্মে তা সম্ভবই নয়।

খ) ফিটারের যারা দর্শক,তারা প্রত্যাশাও করেনা ওই নিখুঁত বাস্তবিকতা নাটকের কাছে । প্যাকিং বাক্সের স্তুপ পর্বত বোঝানোর চেষ্টা করা হয় নাটকে। তাকে দর্শকেরা শুধু মেনে নেয় তাই নয় তা থেকে তারা একটা বাড়তি মজাও পেয়ে যায়।

গ) অভিনেতার শরীর, স্বর ও ব্যক্তিত্বকে থিয়েটারের শর্ত মেনে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়, ফিল্মে তা যায় না। অর্থাৎ শরীরের একটা যোগ্য ভাষা তৈরি করা যায়।

ঘ) সিনেমার তুলনায় খরচ অনেক কমিয়ে আনা যায় কি তারে সেইসঙ্গে মঞ্চ ভেঙ্গে আলোকিত বৃত্ত তুলে দিয়ে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বটিকেও উধাও করে দেওয়া যায়।

অথচ এইসব সুবর্ণ সম্ভাবনাগুলোকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার এতদিন উপেক্ষা করে এসেছে।

৭.২.৮.৪ অভিনয় পদ্ধতি

ক) ঘরের চার প্রান্তিক দুই তিন সারিতে চেয়ার পাতা। এক দিকে একটু উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। তারও গা ঘেঁষে তিন-চার সারি চেয়ার। মাঝখানে পুরো মেঝে খালি, ওইখানেই অভিনয় হয়।

খ) প্ল্যাটফর্মের আড়াল থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয় ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করে।

গ) অভিনেতাদের পোশাক-আশাক সাধারণ কখনো কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের মতো নয় ।তারা তাদের নিজেদের রূপসজ্জাতেই অবতীর্ণ হয়।

ঘ) কখনো কোনো চরিত্রকে আলাদা করে বুঝাতে কোনো বিশেষ উপকরণ তার গলায় চড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন, 'রূপকথার কেলেঙ্কারি'তে অভিনেতাদের পিঠে তাদের পরিচয় লিখে দেওয়া হয়। কে রাজপুত্র, কে কোটালপুত্র, কেই বা দূত বা জহ্লাদ।

ঙ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন ব্যক্তি চরিত্রের হয়ে নামে না, কোনো ব্যক্তি চরিত্রকে নিয়েও, বা কোনো চরিত্র বিশেষকে নিয়েও কোনো অভিনেতা -অভিনেত্রী নির্দিষ্ট থাকে না। প্রত্যেক নাটকেই থাকে একটা 'থিম' বা ফুটিয়ে তোলা হয় সমাজের নানান চরিত্রের নানান রূপের মধ্য দিয়ে।

চ) অঙ্গন মঞ্চে উপকরণ থাকছে না বলে অভিনয়ের সময় কখনো কাপড়, কখনো ধুতি, শাড়ি কখনো একগাছি দড়ি, বা কখনো একটি ছোট লাঠি ব্যবহার করা হয়।যাদুকরের হাতের দন্ডের মত এগুলি কি ব্যবহার করে দেশ থেকে দেশান্তরে কিংবা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রযোজনায় একটি সাদা কাপড় ব্যবহার করেন বাদল সরকার। এই কাপড়টি চরিত্রদের হাতে ধরা থাকে। সেটা দিয়েই তৈরি হয় কখনো পদ্মা নদীর ঢেউ, নৌকার পাল, ছেলেদের ঘরদোর, কখনো বা পোটলা কিংবা বোঁচকা। প্রত্যেকটি দৃশ্যেই এই কাপড়টিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হতো, যাতে কখনো বোঝা না যায় এই কাপড়টা নাটক থেকে আলাদা। এইভাবে নাটকের সঙ্গে চরিত্রদের সঙ্গে এবং বলতে কি অভিনেতা- অভিনেত্রীর সঙ্গেও কাপড়টা একাকার হয়ে যায়।

ছ) আবহসংগীত নির্ণয় এবং যন্ত্রানুষঙ্গের অভাব পূরণ করা হয় অন্যভাবে । নাটকের চরিত্ররাই একক, কখনো সমবেতভাবে মুখ দিয়ে আওয়াজ তুলে শব্দ তৈরি করে, যেমন- কখনো জলের শব্দ, বাঁধ ভাঙার শব্দ, পাখির আওয়াজ, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম, কারখানার ভোঁ, কোলাহল মুখরিত বাজার।

জ) দৃশ্য নির্মাণ কিংবা মঞ্চোপকরণ সংস্থানে চরিত্রেরাই শারীরিক প্রক্রিয়ায় ইঙ্গিতগুলো গড়ে তোলে। কখনো দুই চরিত্র দাঁড়িয়ে হাত -পা শরীর দিয়ে দরজা বানায়, সুইং ডোর তৈরি করে , এমনকি চেয়ার টেবিলও গড়ে তোলে। শরীর দিয়ে তৈরি হয় টিউবওয়েল। সেই টিউবওয়েলের হাতল ধরে আরেকজন পাম্প করতে থাকে।

থার্ড থিয়েটার নির্মাণকৌশলে মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা কিংবা দৃশ্যসজ্জার বাহুল্য ও অর্থব্যয়কে সহজ নির্মিতিতে নিয়ে এসেছে। কারো কারো কাছে এগুলিকে 'স্টান্ট' বা 'চমক' বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু বিকল্প থিয়েটারে আক্ষরিক অর্থে 'পুওর থিয়েটার' এর অনাড়ম্বর মঞ্চে উপস্থাপনার পক্ষে এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা।

৭.২.৮.৫ বাদল সরকার ও বাংলা থার্ড থিয়েটার

পাশ্চাত্যের থার্ড থিয়েটারকে বাংলায় থিয়েটারে নতুন আঙ্গিক রূপে পরিবেশন করার সর্বাঙ্গীণ কৃতিত্বের শিরোপা যাঁর প্রাপ্তি তিনি হলেন বাদল সরকার। তিনি স্পষ্টতই বলেন 'যদি কেউ কোনো সামাজিক তাগিদে থিয়েটারকে ব্যবহার করতে চান এবং তাঁর কাছেই প্রথম বা দ্বিতীয় থিয়েটারের (বাদল সরকারের চোখে, প্রথম থিয়েটার 'লোকনাট্য' আর দ্বিতীয় থিয়েটার 'নগরনাট্য') কোনটাই সম্পূর্ণভাবে উপযোগী বলে মনে না হয়, তবে তাঁকে অনুসন্ধান করে একটি বিকল্প থিয়েটার তৈরি করতে হয়। যদি আংশিকভাবে তা তৈরি হয়, তবে তাকে 'তৃতীয় থিয়েটার' নাম দেওয়া অযৌক্তিক বোধহয় হবেনা । এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আমাদের থিয়েটারকে তৃতীয় থিয়েটার 'থার্ড থিয়েটার' আখ্যা দিয়েছি।"

বাদল সরকার লোকনাট্য এর সঙ্গে তৃতীয় থিয়েটারের মিল-অমিলের বিষয়টিও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন "থিয়েটার বাহ্যরূপে কিছু ক্ষেত্রে লোকনাট্যে সঙ্গে মিল আছে, কিন্তু পার্থক্য তার তুলনায় অনেক বেশি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তো বটেই, আঙ্গিকেও তৃতীয় থিয়েটার নমনীয় (ফ্লেক্সিবল), বহনীয় (পোর্টেবল)এবং সে কারণেই সুলভ (ইনএক্সপেন্সিভ)। ফলে তৃতীয় থিয়েটার টাকার উপর নির্ভরশীল নয়। টিকিট না বেচে কোনরকম অনুদান গ্রহণ না করে, শুধুমাত্র অভিনয় শেষে দর্শকদের উপর ভিত্তি করে এই থিয়েটার চালানো সম্ভব ...।"

এ প্রসঙ্গে তিনি প্রমাণ হিসেবে নাম করেন 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠীর। এই আন্দোলনের অন্য কয়েকটি দল পথসেনা, আয়না নাট্যগোষ্ঠী, ঋতম, সমিধ, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, তীরন্দাজ ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যদলের নাম উঠে আসে বাদল সরকারের বক্তব্যে।

বাদল সরকার আরও বলেন "তৃতীয় থিয়েটার শুধু থিয়েটারের এক আঙ্গিকগত চেহারা নয় তৃতীয় থিয়েটার একটি দর্শন। এমনকি একে ব্যাপক অর্থে একটি রাজনীতিও বলা চলে। কি বলতে চাই অর্থাৎ বিষয়বস্তু (কনটেন্ট)এখানে প্রথম কথা, কেমন ভাবে বলবো, অর্থাৎ আঙ্গিক (ফর্ম) আসে পরে।" এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বাদল সরকারের অধিকাংশ পথনাটকে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মিছিল, ভোমা, ভানুমতির খেল, চড়ুইভাতি প্রভৃতি।

৭.২.৮.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। থার্ড থিয়েটার কি?

২। থার্ড থিয়েটার বলতে কী বোঝো?

৩। থার্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বাদল সরকারের অবদান লেখো।

৫। বাদল সরকারের দুটি পথনাটকে নাম লেখো।

৬। থার্ড থিয়েটারে অভিনয় পদ্ধতি আলোচনা করো।

৭.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। রূপান্তরিত নাটক - বাদল সরকার

২। পথের নাটক- সীমা সরকার

৩। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা - সাধনকুমার ভট্টাচার্য

একক ৯

নাটক ও নাটকীয়তা

বিন্যাসক্রম

৭.৩.৯.১ ভূমিকা

৭.৩.৯.২ নাট্যলক্ষণ, নাট্যসংজ্ঞা, নাট্যবিচার

৭.৩.৯.৩ নাটকের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যলক্ষণ

৭.৩.৯.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.৯.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৩.৯.১ : ভূমিকা

যেহেতু নাটক দৃশ্য শিল্প ও নাট্যরচনার সময় লেখককে কল্পনায় একটি মঞ্চ রাখতে হয় এবং দর্শকদের উপযোগী করে নাটকের কাহিনীকে উপস্থাপিত করতে হয়। নাট্যকাহিনীর মধ্যে কয়েকটি মূল লক্ষণ, নাটকীয়তা সৃষ্টি, নাট্যঘটনার বিন্যাস, নাট্যগতির সঞ্চার, চরিত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি এবং দর্শকের মনে কৌতূহল বজায় রাখা নাট্যকারের সামনে নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্ত। এখানে আমরা সেই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৮. ৩.৯.২ : নাট্যলক্ষণ, নাট্য সংজ্ঞা, নাট্য বিচার

সাহিত্যের নানা প্রকরণের মধ্যে নাটক অন্যতম। নাটকের ইতিহাস বহু প্রাচীন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন আমাদের প্রপিতামহরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য আকার ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়েছিল সেদিনই উপ্ত হয়েছিল নাটকের বীজ। আর সেই নাট্যবীজই কালের স্রোতে অঙ্কুরিত পল্লবিত হতে হতে একসময় পূর্ণতা পায়। সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা মেলে নাটকরূপ নতুন প্রকরণের।

কারা কবে কোথায় প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন সে নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তবে প্রাচীনতম নাটকের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ভারতবর্ষ ও গ্রীস দেশে। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে নাটক এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। বাংলা তথা বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ক্ষেত্রে নাটক আজ অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যধারায় এখনও পর্যন্ত যেসব নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে 'রাজা ওয়াদিপাউস', 'ইফিজেনিয়া অ্যাটতৌরিস' প্রভৃতি। ভারতীয় সাহিত্যে অনুরূপ নাটক হল ভাসের 'চারুদত্ত', 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' ইত্যাদি।

৮. ৩.৯৩ : নাটকের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যলক্ষণ

বস্তু বা বিষয় মাত্রেরই একটা নিজস্বতা থাকে। নাটকের নিজস্বতা হল তার নাটকত্ব। নাটকত্ব কী? "নাটকের নানা লক্ষণ তা বাহ্যিকই হোক আর, আভ্যন্তরীণ হোক, তা সামান্যই হোক, আর বিশেষই হোক- যে সকলের জন্য নাটক বিশিষ্টতা লাভ করে কাব্য উপন্যাস না বলে তাকে নাটক বলেই বুঝি, তাই নাটকের নাটকত্ব"। নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রাজ্ঞজনের উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। নাটকের নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপই নাটকত্ব। নাটকত্বকে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন নাটকীয়তা, সে যাই হোক নাটকের প্রধান

পরিচয় নাটকত্ব। আবার নাটকত্ব হল কতকগুলি নাট্যবৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ। নাটকের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে তাই ঘুরিয়ে বলা যায় যে সব লক্ষণ দেখে নাট্যতত্ত্বকে চিনে নেওয়া যায় তাই নাটকের বৈশিষ্ট্য বা নাট্যলক্ষণ।

৭.৩.৯.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাটকের সংজ্ঞা দাও।

২। নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩। নাটকের লক্ষণ বিচার করো।

৭.৩.৯.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ১০

নাটকে ঘটনা, গতি

বিন্যাসক্রম

৭.৩.১০.১ নাট্যগতি

৭.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১.০.১ : নাট্যগতি

নাট্যক্রিয়া, নাটকের এই লক্ষণটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল action শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটল যাকে 'action' বলেছেন, তাকে সাধারণভাবে বাংলায় বলা হয় নাট্যক্রিয়া। নাট্যক্রিয়ার অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে গতিবেগ। গতিময়তাই নাটক। ঘটনা ও চরিত্রের গতিশীলতার মধ্যে দিয়েই নাটক ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। অন্য অর্থে নাট্যক্রিয়া গতির মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। নাট্যক্রিয়া নাটকের প্রাণস্বরূপ। অ্যারিস্টটল কথিত action-এর ভাষ্যরচনা করতে গিয়ে শ্লোগল, হেগেল, জোন্‌স প্রমুখ ভাষ্যকাররা নানা কথা বলেছেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিমত এইরকম-ক্রিয়া হল এমন এক কর্ম যা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নাট্যক্রিয়া হল নাটকের পাত্র পাত্রীদের স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্ম। নাটকের পাত্রপাত্রীরা প্রত্যেকে এক সুরে বাঁধা থাকে না। ফলত নাট্যক্রিয়াও সরল, রৈখিক পথে চালিত হয় না। দুই বা ততোধিক পথের দ্বন্দ্বে নাট্যক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তৈরি হয় নাটকীয়তা, কোনো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় নাটকের পাত্রপাত্রীরা যে ক্রিয়া করে তাই বিশেষ অর্থে নাট্যক্রিয়া।

নাট্যক্রিয়া নাটকের প্রকৃতির সঙ্গে অন্বিত। সব নাটকে নাট্যক্রিয়ার মাত্রা সমান নয়। ট্র্যাজেডিতে তা সম্ভবত বেশি। এখানে দর্শক খোলা চোখে নাট্যক্রিয়া দেখতে পায়। কিন্তু তত্ত্বধর্মী নাটকে বিশেষত সংকেত রচনায় এর বাহ্যিক প্রকাশ অনেক কম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এখানে কোনো নাট্যক্রিয়া নেই। আসলে এই সব নাটকে নাট্যক্রিয়া ঘটতে থাকে চোরাপথে। একটা বিশেষ পর্বে তার ক্ষণিক উদ্ভাস চোখে পড়ে মাত্র। যথার্থই সাহিত্য রসিক এই ক্ষণিক উদ্ভাসকে অনুভব করে তার রসাস্বাদন করেন। 'ডাকঘর' নাটকে নাট্যক্রিয়া তৈরি হয়েছে অমলের মৃত্যুদৃশ্যে রাজদূতের প্রবেশের সূত্রে।

নাটকে নাট্যক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মাত্রই নাট্যক্রিয়া সৃষ্টির উপর জোর দেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেমন— রঙ্গমঞ্চে দুজন পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের

মাঝে, সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে তৃতীয় জনের আগমন ঘটান, অভিনেতাদের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দ্রুত চলাচল প্রভৃতি। নাট্যক্রিয়ার জন্য কোনো নাটকে তৈরি হয় নাট্যগতি। অর্থাৎ নাট্যক্রিয়া রূপ কারণটি নাট্যগতি রূপ ফলে পর্যবসিত হয়। নাট্যগতিকে অধ্যাপক লসন বলেছেন— 'নাটকীয় গতি'। (Dramatic movement)। নাটক মাত্রেই নাট্যগতি থাকে; কোথাও তুলনায় বেশি, কোথাও কম। নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্য পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও এই নাট্যগতি চলতেই থাকে। বস্তুত নাট্যগতির পথ অনুসরণ করেই দর্শক নাটকের রস পরিণতিতে উপনীত হয়।

৭.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাটকের সংজ্ঞা দাও।

২। নাটকের ঘটনা ও গতি বিশ্লেষণ করো।

৭.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

বিন্যাসক্রম

৭.৩.১১.১ নাট্যদ্বন্দ্ব : নাট্য সংঘর্ষ
৭.৩.১১.২ নাট্যোৎকণ্ঠা: নাট্যকৌতূহল
৭.৩.১১.৩ দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ
৭.৩.১১.৪ নাট্য ঘটনা : বিভিন্ন পর্যায়
৭.৩.১১.৪.১ প্রাচ্য অভিমত
৭.৩.১১.৪.২ পাশ্চাত্য অভিমত
৭.৩.১১.৫আদর্শ প্রশ্নাবলী
৭.৩.১১.৬সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৩.১১.১ : নাট্যদ্বন্দ্ব : নাট্য সংঘর্ষ

নাট্যদ্বন্দ্ব, নাটকের বিশেষ লক্ষণগুলির মধ্যে আর একটি। অনেকে একে নাটকের প্রাণস্বরূপ বলতে চান। এক অর্থে কথাটি সত্য। অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি তত্ত্বে action-এর অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকৃত। নাট্যদ্বন্দ্ব এই action এর চূড়ান্ত পরিণতি। অ্যারিস্টটল action-এর কথা বললেও নাট্যদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেননি। উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Aesthatices'-এ প্রথম দ্বন্দ্ববাদ বিষয়ক নাট্যলক্ষ্যটির উপস্থাপন করেন, নাট্যদ্বন্দ্ব বিষয়ে এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত এইরকম-নাট্যক্রিয়া সরল ও নিশ্চিত ভাবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের বিষয় নয়। মানুষের ভাবাবেগ এবং চরিত্রের সংঘাতের উপর তা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গতিশীল সমস্ত বস্তু ও গতিমান জীবন দ্বন্দ্বগর্ভ। প্রবাহমান জীবনকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে তা বাইরে থেকে সাধারণভাবে বোঝা নাও যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। এই দ্বন্দ্বের বাহ্যিক প্রকাশ হল নাট্যক্রিয়া এবং তার ফলশ্রুতি নাট্যদ্বন্দ্ব। ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আলোচনায় অ্যারিস্টটল যে action-এর কথা বলেছিলেন, নাট্যদ্বন্দ্বের কথা বলে হেগেল তারই অন্তরতর রূপের সন্ধান দিলেন। নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তাঁর এই বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয়েছে, উইলিয়াম শ্লেগেল, আর্থার জোনস্, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্বের দ্বারা।

কোনো নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি হয় সাধারণত তিনভাবে। প্রথমত, বিরুদ্ধ নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বসূত্রে ; দ্বিতীয়ত, নিয়তি নিরপেক্ষ দুজন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের দ্বারা, তৃতীয়ত, একজন মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘাত থেকে। প্রথম শ্রেণির নাট্যদ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি। 'রাজা ওয়াদি পাউস' নাটকটি নিষ্ঠুর নির্মম নিয়তির বিরুদ্ধে নায়কের আপোসহীন সংগ্রাম এবং শেষপর্যন্ত পরাজয় বরণের সূত্রে আকর্ষণীয় হয়েছে। বাংলায় এই ধরনের নাটক বিশেষ নেই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা স্মরণ করা

যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যদ্বন্দ্বময় নাটকের বিশিষ্ট উদাহরণ শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াসসীজার' বাংলায় 'বিসর্জন' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ঋদ্ধ নাটক। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান', 'সাজাহান', ইত্যাদি। অবশ্য এই তিন প্রধান ধারার বাইরেও আর এক ধরনের নাট্যদ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে প্রবৃত্তির বিপরীত মুখীনতা নয়, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শগত বিরোধের দ্বন্দ্ব মুখ্য।

নাটক দ্বন্দ্বময় । ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন যে কোনো ধারার রচনায় দ্বন্দ্ব থাকবেই। দ্বন্দ্বহীন নাটকের অস্তিত্ব প্রায় চোখে পড়ে না। তবে দ্বন্দ্বহীন নাটক রচিত হওয়া সম্ভব তত্ত্বগতভাবে এমন একটা সিদ্ধান্তকে নাট্যতাত্ত্বিকরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ শতকের ইংরেজ নাট্যসমালোচক উইলিয়াম আর্চার দ্বন্দ্বহীন নাটকের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সরব হন।

৭.৩.১১.২ : নাট্যোৎকণ্ঠা : নাট্যকৌতূহল

নাট্যরস উপলব্ধির ক্ষেত্রে নাট্যোৎকণ্ঠাকে একটা আবশ্যক বিষয় বলে একালের নাট্যতাত্ত্বিকদের মনে হয়েছে। নাট্যোৎকণ্ঠা হল নাটকের অভিনয়কালে দর্শকের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। শ্রেষ্ঠ নাট্যঘটনার দর্শকমাত্র সবসময় একটা কি হয় কি হয় বোধের দ্বারা তাড়িত হয়। ঘটনার অসম্পূর্ণ বর্তমান ও সম্ভাব্য পরিণাম ভাবনা তাকে মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। এই মানসিক চাপই এক অর্থে নাট্যোৎকণ্ঠা। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, মানসিক চাপ রূপ কারণ নাট্যোৎকণ্ঠা রূপ ফলে পর্যবসিত হয়। একজন নাট্যকার সচেতনভাবে তাঁর নাটকে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেন। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে তিনি একদিকে যেমন দর্শকের নাটক দেখার আগ্রহ ও কৌশল বৃদ্ধি করেন অন্যদিকে তেমনি ঐ আগ্রহকে বজায় রাখেন।

নাট্যোৎকণ্ঠা মূলত দুই ধরনের অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা এবং পূর্বভাসের উৎকণ্ঠা। অনিশ্চয়তাজনিত উৎকণ্ঠার মূলে রয়েছে দর্শকের অজ্ঞতা, দর্শক নাট্যঘটনার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ, কি হয় বোধের দ্বারা সর্বদা তাড়িত হতে হতে সে নাট্য ঘটনার অনুসরণ করে। অন্যদিকে পূর্বাভাসাত্মক উৎকণ্ঠার বিষয়টি হল দর্শকের নাট্যঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য জানা আছে যা নাটকের পাত্রপাত্রীরা জানেনা এবং না জানার কারণে তাদের জীবনে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘনিয়ে আসে। এক্ষেত্রে দর্শক উৎকণ্ঠিত হয় এই ভেবে কখন ঘনিয়ে আসবে ওই চূড়ান্ত পরিণতি, যা নায়ককে বিধ্বস্ত করবে। শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে অনিশ্চয়তজনিত উৎকণ্ঠার সুন্দর নিদর্শন আছে। কোনো নাটক তখনই শ্রেষ্ঠ হয় যখন নাট্যোৎকণ্ঠা তীব্রতা পায়। একটি ঘটনার সূত্রে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে তাকে পরিণাম পর্যন্ত ধরে রাখাতেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। যিনি তা পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

প্রচ্ছন্নতা নাট্যোৎকণ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে আলোচিত আর একটি বিষয়। আসলে প্রচ্ছন্নতা হল একটি কৌশল। নাট্যতাত্ত্বিকের ভাষায় - 'নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির জন্য কখনও কখনও নাট্যকার আর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কোনো চরিত্রের পরিচয় গোপন রেখে কিংবা পূর্বের কোনো চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে, এইরকম একটা সংবাদ আভাসিত করে একেবারে নাট্যঘটনার শেষ দিকে সেই চরিত্রের সত্য পরিচয় উদঘাটিত হয় এবং দেখানো হয় যে যার মৃত্যু হয়েছিল সে জীবিত। শেষের এই সত্যকে না জানা পর্যন্ত দর্শকচিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির এই কৌশলকেই বলা হয় প্রচ্ছন্নতা'। প্রচ্ছন্নতা নাট্যোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির একটা সহায়ক উপাদান।

৭.৩.১১.৩ : দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ

নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় নাটকের লক্ষণ হিসেবে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ এই দুই বিষয়ের উপস্থাপন ভারতীয় আলংকারিকদের বিশেষ অবদান। আদিমতম আলংকারিক আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের ১০৬ থেকে ১২২ সংখ্যক শ্লোকে নাটকের নানা লক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগের প্রসঙ্গ। নাটকের লক্ষণ হিসেবে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগকে স্বীকার করে নিতে আমাদের কোনো বাধা নেই। নাটক অবশ্যই দৃশ্যকাব্য। কোনো নাটক হয়তো পাঠ করেই যথেষ্ট রসাস্বাদন করা যায় ; কিন্তু পাঠ করাতেই তার সার্থকতা নয়, নাটকের পূর্ণ পরিণতি অভিনয়ে। আবার জনসংযোগও নাটকের অপরিহার্য শর্ত। দৃশ্যকাব্য হিসেবে নাটককে দাঁড়াতে হয় দর্শকের আদালতে। সেক্ষেত্রে দর্শক যদি কোনো নাটকের নাট্য বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারে তবে সে নাটক মূল্যহীন। একটি নাটক রচনাকালে নাট্যকারকে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় দর্শকের রুচি সম্পর্কে। অনেকসময় আদর্শবোধ বিসর্জন দিয়ে দর্শকের রুচির সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হন তিনি। মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস অন্বেষণ করলে এর অনেক নিদর্শন মেলে, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে পাঠকের রুচিবোধের সঙ্গে সাহিত্যিককে এইভাবে আপোশ করতে হয় না। সেদিক থেকে জনসংযোগের বিষয়টি অবশ্যই নাটকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিকদের আলোচনায় উঠে এসেছে আরও কিছু কিছু বিষয়। থর্নটন উইলডার মনে করেছেন ঘটনার ঘটমানতা নাটকের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক নিকল আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা, আকস্মিকতা ও চমককে নাট্যলক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এইসব বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। ঘটনার ঘটমানতাকে এক অর্থে বলা যেতে পারে নাট্যক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ধারা, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা এই বিষয়গুলি পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে ফিরে এসেছে। স্বভাবত এগুলিকে স্বতন্ত্র নাট্যলক্ষণ হিসেবে না চিহ্নিত করলেও

চলে, তবে এত কথার পরেও স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, নাটক মিশ্র শিল্প ; এর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাঁধনে বাঁধা চলে না। অনেক সম্ভাবনার দ্বারই উন্মোচিত থেকে যায়। স্বভাবত এক্ষেত্রে কোনো বক্তব্যই সম্পূর্ণ অযথার্থ নয় হয়তো।

৭.৩.১১.৪ : নাট্যঘটনা : বিভিন্ন পর্যায়

বিভিন্ন পর্যায় বা অংশে বিভক্ত এই যে নাটকীয় বৃত্ত তার প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিকরা তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত জানিয়েছেন।

৭.৩.১১.৪.১: প্রাচ্য অভিমত

১. একটা নাট্যঘটনায় মূল বৃত্তের পাশাপাশি এক বা একাধিক উপবৃত্ত থাকতেও পারে। তবে উপবৃত্ত কখনই মূল বৃত্তকে আবৃত করবে না, বরং তাকে আরও আলোকিত করতে সহায়তা করবে।

২. মূল বৃত্তের সঙ্গে উপবৃত্তের যোগসূত্রটি জৈবিক হবে। অর্থাৎ একটা কোনো প্রকৃত সম্বন্ধে দুটি বৃত্ত সংযুক্ত থাকবে, পরম্পরার যোগসূত্র শিথিল হলে চলবে না।

৩. উপবৃত্ত তার চলার পথে এক সময় মূল বৃত্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। আবার এর স্বতন্ত্ররস পরিণতিও সম্ভব। তবে, ওই রসপরিণতি মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ মূল কাহিনী করুণ রসাত্মক হলে উপবৃত্তের পরিণতিও করুণ রসাত্মক হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের পথে উপবৃত্ত মূলবৃত্তকে অবলোকিত করে।

৪. উপবৃত্তের পাত্রপাত্রী বা প্রধান প্রধান চরিত্রসমূহ মূল বৃত্তের অধীনস্থ থাকবে। তারা তাদের চারিত্রিক সমুন্নতিতে কখনও মূল বৃত্তের চরিত্র বা নায়ককে ছাপিয়ে যাবে না।

৭.৩.১১.৪.২ : পাশ্চাত্য অভিমত

১. বৃত্ত হবে সরল, স্পষ্ট ও সার্বজনীন। বোধগম্যতা বৃত্তের প্রধান গুণ হওয়া উচিত।

২. বোধগম্যতার সীমায় সীমায়িত রাখার জন্য আয়তনের দিক থেকে বৃত্তকে একটা নির্দিষ্ট পরিসরের করতে হবে, তা অতিরঞ্জিত হবেনা, আবার খুব সংক্ষিপ্ত হবে না।

৩. বৃত্ত হবে সংক্ষিপ্ত ও সংহত। নায়কের জীবনে অনেক ঘটনা থাকতে পারে। এইসব ঘটনার সমস্তই বৃত্তের বিষয় হবে না। নাটকের ঘটমান ঘটনার কোনো এক খণ্ডাংশের নাট্য নির্মিতির সূত্রে জীবনের পূর্ণাঙ্গরূপের আভাস দেওয়া হবে।

৪. একটি বৃত্তের মধ্যে একাধিক নয়, একটিমাত্র কাহিনী থাকবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে একমুখী। একাধিক কাহিনী নাটকের একমুখী উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হানিকর।

৫. কমেডিতে উপকাহিনী থাকলেও থাকতে পারে, এবং মূল কাহিনীর বিপরীতে তার স্বতন্ত্র পরিণতিও সম্ভব। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে মূল কাহিনীর বাহুল্য ও তার স্বতন্ত্ররস পরিণতি সম্পূর্ণ অনুচিত।

৬. বৃত্ত হতে পারে, জটিল বা সরল, যে কোনো রকমের। সরলবৃত্তে ঘটনার বৈপরীত্য বা প্রত্যাভিজ্ঞান থাকবে না, জটিল বৃত্তে এসব থাকতে পারে।

বৃত্ত প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার এই যে পরিচয় তুলে ধরা হল তা অ্যারিস্টটল আচার্য ভরত, আচার্য বিশ্বনাথ প্রমুখের বক্তব্য নির্ভর, আধুনিক আলংকারিকরা সবসময় এইসব বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না।

৭.৩.১১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ -- ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

২। নাট্যতত্ত্ব বিচার -- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৩। নাটকের কথা -- ড. অজিতকুমার ঘোষ

৪। কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার -- ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। বাংলা নাটকের দিক্‌দিগন্ত -- ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

৭.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাটকীয়তা কাকে বলে? নাটকে নাটকীয়তার সঞ্চার করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত কিনা বিচার করো।

২। নাটকের ঘটনা পারম্পর্য নাট্যকার কিভাবে গড়ে তুলবেন।

৩। নাটকের প্রধান সাফল্য নির্ভর করে নাট্যক্রিয়া বা নাট্যগতির উপর আলোচনা করো।

৪। যে-কোন নাটকের নাট্য সংঘর্ষের বারংবার ব্যবহার দর্শক ও পাঠকদের অন্যতম চাহিদা কিনা বিচার করো।

৫। নাট্যকৌতূহল না থাকলে কোনো নাটকেরই মঞ্চ সাফল্য হতে পারে না। —এই মন্তব্যটি যথাযথ কিনা দেখাও।

———

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১২

ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১২.১ ভূমিকা

৭.৪.১২.২ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

৭.৪.১২.৩ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্ম

৭.৪.১২.৪ সংস্কৃত নাটকের গঠন

৭.৪.১২.৫ সংস্কৃত নাটকের শ্রেণিবিচার

৭.৪.১২.৫.১ নাটক

৭.৪.১২.৫.২ প্রকরণ

৭.৪.১২.৫.৩ ভাণ

৭.৪.১২.৫.৪ ব্যায়োগ

৭.৪.১২.৫.৫ সমবকার

৭.৪.১২.৫.৬ ডিম

৭.৪.১২.৫.৭ ঈহামৃগ

৭.৪.১২.৫.৮ অঙ্ক

৭.৪.১২.৫.৯ বীথী

৭.৪.১২.৫.১০ প্রহসন

৭.৪.১২.৬ ইংরেজি নাটক

৭.৪.১২.৭ নাটকের অবয়ব

৭.৪.১২.৮ নাটকের শ্রেণিবিচার

৭.৪.১২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১২.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১২.১ ভূমিকা

ভারতীয় শাস্ত্রকারগণের বিচারে নাটক হলো কাব্যের অঙ্গ।যা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। তাঁদের মতে, নাটক হলো দৃশ্যকাব্য। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য ইত্যাদি যেমন শ্রব্যকাব্য, নাটক তেমনি দৃশ্যকাব্য। তাই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন 'দৃশ্যশ্রব্যভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্।' যে কাব্য অভিনয়্যোগ্য তারই নাম দৃশ্যকাব্য। বিশ্বনাথের ভাষায় 'দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্'। শ্রব্য কাব্যগুলি কেবলমাত্র শ্রবণযোগ্য। কিন্তু দৃশ্যকাব্যগুলি দর্শন ও

শ্রবণযোগ্য উভয়ই। একথা ঠিক যে শ্রব্যকাব্যগুলিকে কবি বা পাঠক যখন পাঠ করেন, তখন সেই পাঠকের রূপ বা অঙ্গীভঙ্গী শ্রোতাদের মূল বিচার্য বিষয় হয় না। তাদের বিচার্য বিষয় হলো কাব্যের কথা, সুর, ছন্দ ইত্যাদি। দৃশ্যকাব্যের যখন অভিনয় হয়, তখন কিন্তু স্বখানে পাত্র-পাত্রীর সাজসজ্জা ও অঙ্গীভঙ্গীর সঙ্গে মুখের কথোপকথন অংশ বিচার্য হয়ে পড়ে। শ্রব্য অংশটি বাচিক অংশ। এই অংশের সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের কোনো পার্থক্য নেই। সংস্কৃত টীকাকারগণের মতে, শব্দার্থময় রসাত্মক বাক্য শ্রব্যকাব্যে যেমন থাকে দৃশ্যকাব্যেও তেমনই থাকে। অথচ শ্রব্যকাব্যের সবটাই শ্রবণযোগ্য এবং দৃশ্যকাব্যের বেশি অংশটাই দর্শনযোগ্য। তাই 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি' এই নিয়মানুসারে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের প্রভেদ মানতেই হবে।

৭.৪.১২.২ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

অন্যান্য সাহিত্যশাখার মতো নাট্যসাহিত্যও প্রাচীন ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আধুনিককালে আমরা সাধারণতঃ যাকে নাটক বলি, সংস্কৃতে তাকেই দৃশ্যকাব্য বলা হতো। আরও বলা হয়, অভিনয়্যোগ্য কাব্যই হলো দৃশ্যকাব্য। অভিনয় শব্দের অর্থ কোনো চরিত্রের প্রকৃত অবস্থার অনুকরণ। টীকাকার শব্দটির ব্যখ্যা করে বলেছেন – 'অবস্থানাং বাস্তবিকরামাদি স্বরূপাণাম্ অনুকারঃ অনুকরণম্ অভিনয়ো ভবেৎ'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ব্যুৎপতিগত র্থ বিচার করে অভিনয় শব্দের অর্থ করা হয়েছে –

অভিপূর্বস্য নীঙ্‌ধাতুঃ পুরা মুখ্যার্থ নির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ।।
বিভাবয়তি যস্মাচ্চ নানার্থান্ হি প্রয়োগতঃ।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ।।

অভিনয়াবস্থা বা অনুকরণকে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক এই চারভাগে বিভক্ত করা হয়। অঙ্গের দ্বারা যা করা হয়, তাকে আঙ্গিক বলে। পৌরাণিক রামচন্দ্র যেভাবে অঙ্গভঙ্গী করতেন বলে লোকবিশ্বাস, সেইভাবেই অঙ্গভঙ্গী করে দর্শক হৃদয়ে ভাবকে সঞ্চারিত করা হয় আঙ্গিক অভিনয়ে। আহার্য শব্দের অর্থ বেশভূষার দ্বারা যা করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে পৌরাণিক রামাদি যেভাবে বেশভূষা পড়তেন, নট-নটী যখন সেইভাবে সাজসজ্জা করে, তখন তাকে বলে আহার্য্য অভিনয়। বাক্যের দ্বারা যা করা হয় তাকে বলে বাচিক। যে চরিত্রের অভিনয় করা হচ্ছে, সেই চরিত্রের অনুরূপ উক্তি বিন্যাসকে বলে বাচিক অভিনয়। অভিনয়ের চতুর্থ অঙ্গটির নাম সাত্ত্বিক। সত্ত্ব শব্দের অর্থ মানসিক অবস্থা। রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রের মনের অবস্থাকে নট যখন মানসিকভাবে অনুকরণ করে, তখন রামের বিভিন্ন অবস্থা, যথা ঘাম দেওয়া, কাঁপুনি ইত্যাদি নটের মধ্যেও দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক ভাবের অভিনয় যথাযথ হলে, তবেই অন্য অভিনয়গুলি পূর্ণতা পায়। চারপ্রকার অভিনয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক নটের ব্যাপার। বাচিক অংশ নটের মুখে উচ্চারিত হলে মূলত কবির ব্যাপার এবং আহার্যশোভা নটে থাকলেও তা মেকাপম্যানের ব্যাপার।

৭.৪.১২.৩ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্ম

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাট্য জিজ্ঞাসা ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'এ রূপ লাভ করেছিল। এই গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দী হলেও ভারতব্ররষে নাটকের প্রথম অঙ্কুরোদগম এখানেই ঘটে মনে করা হয়। নাট্যশাস্ত্রের একটি গল্পে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাই প্রথম নাটক রচনা করে পঞ্চম বেদরূপে তাকে প্রচার করেন। বথমার নাটকে ঋগ্বেদ থেকে সংলাপ, সামবেদ থেকে সংগীত, যর্জুবেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ করে যোজিত করা হয়েছে। ব্রহ্মার রচিত দুটি নাটক হলো 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ'। এই গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক হলেও নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এর মাধ্যে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রয়েছে।

বৈদিক যুগের পর যদি মহাকাব্যের যুগে নাট্যবোধের কিঞ্চিত বিকাশ হতে দেখা যায়। রামায়ণেও 'শৈলূষ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদীকে অভিনেত্রী অর্থে 'শৈলূষী' বলা হয়েছে। এই মহাকাব্যে পুত্তলিকা নামে এক রকমের পুতুল নাচের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে যঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া এই মহাকাব্যে 'নট' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা বলে এই হরিবংশে স্পষ্ট রামায়ণ অভিনয়ের কথা পাওয়া যায়।

ব্যাকরণ রচয়িতা পাণিনির যুগে যে নাটক প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ তা৬র 'অষ্ট্যাধয়ী' ব্যাকরণ থেকে পাওয়া যায়। এই ব্যাকরণে 'নট' ও 'কুশীলব' শব্দের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নাটক সম্পর্কিত 'শৌভিক', 'শৌভিকী' প্রভৃতি শব্দের উল্লেক আছে। এতে যে 'বলিবন্ধ' ও 'কংসবধ' এর উল্লেখ আছে ড. সুশীলকুমার দে'র মতে সেগুলি ছিল নাটক।

প্রাচীন গ্রীসের মতো প্রাচীন ভারতব্ররষেও নাট্যসাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল ধর্মীয় প্রেরণায় – এইরকম মত কেউ কেউ পোষণ করেন। একজন মনীষী বলেছেন, এ দেশে কৃষ্ণপূজার অঙ্গ হিসাবে সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাত হয়। আবার আর একজন বলেছেন – পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাটক যুক্ত ছিল। কিন্তু এসব মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। ধর্ম এদেশের অন্যান্য শিল্পকলার মতো নাটয়সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই এদেশের নাটকের জন্ম হয়েছিল – এই মতবাদের সমর্থনে কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদেশে নাটক যদি ধর্মমূলকই হতো তবে বুদ্ধদেব তা৬র শীষ্যদের নাটয়াভিনয় থেকে বিরত থাকার অনুশাসন দিতেন না। পক্ষান্তরে এদেশে নাটক যে প্রধানত রাজসিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল তার প্রমাণ মগধরাজ বিম্বিসার নগরাধিরাজ মনস্তোষণের জন্য নাটক অভিনয় করেছিলেন। ভারতবর্ষে নাটক মূলতঃ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বসন্ত উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই বিকাশ লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পিশেল বলেন –অবশ্য তারও আগে পুতুল নাচের মধ্যে নাটকের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিলো।

৭.৪.১২.৪ সংস্কৃত নাটকের গঠন

আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের পঞ্চসন্ধির কথা বলা হয়েছে। এই পঞ্চসন্ধি যথাক্রমে – মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি। নাটকের অঙ্কবিভাগ এই পঞ্চসন্ধি অনুযায়ী হয়ে থাকে। ভরতের মতে ইতিবৃত্ত হচ্ছে নাট্যের দেহ বা শরীর; তাঁর কথায় 'ইতিবৃত্তং তু নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্'।নাটকের ইতিবৃত্ত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। 'সন্ধি' অর্থাৎ কার্যের (Action) পরম্পরা বা বিশেষ বিশেষ পর্যায়।

৭.৪.১২.৫ সংস্কৃত নাটকের শ্রেণিবিচার

আচার্য ভরত নাটকের শ্রেণিবিভাগের কথা বলতে গিয়ে নাটকের রসরূপ লক্ষণের কথা বলেছেন। এই রসরূপ যথাক্রমে – নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী, প্রহসন। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এই রূপ রূপের আরোপ করা হয় বলে এর আরেক নাম 'রূপক – 'তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্'। এটি আবার দুপ্রকার – রূপক ও উপরূপক। রূপকের সংখ্যা দশ এবং উপরূপকের সংখ্যা অষ্টাদশ।

৭.৪.১২.৫.১ নাটক

দশরূপকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপ হলো নাটক। নাটকের বিষয় হবে প্রখ্যাত। গায়ক হবেন রাজা, রাজর্ষি, নরাকৃতি দেবতা। প্রধান রস হবে বীর বা শৃঙ্গার। এটি হবে মিলনাত্মক; বিয়োগান্তক বিষয় নিষিদ্ধ, কিন্তু এর কোনো কারণ বলা হয়নি। এর অংকসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ। যেমন –অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মুদ্রারাক্ষস।

৭.৪.১২.৫.২ প্রকরণ

প্রকরণের বিষয়বস্তু লৌকিক কবিকল্পিত। নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী বা বণিক। তিনি হবেন দুরবস্থায় পতিত। এবং ধন, প্রেমাদি লাভে যত্নবান। নায়িকা হতে পারেন গণিকা, কূলবধূ অথবা উভয়েই। এতে প্রধান রস শৃঙ্গার। অংকসংখ্যা এবং অন্যান্য মোটামুটি নাটকের অনুরূপ। যেমন –মৃচ্ছকটিক।

৭.৪.১২.৫.৩ ভাণ

ভাণ রূপকে ধূর্তলোকের চরিত্র বর্ণনীয়রূপে সংগৃহীত হবে এবং নানাপ্রকার অবস্থান্ত বর্ণিত হবে। এখানে একটি মাত্র অঙ্ক থাকবে এবং একজন নিপুণ পণ্ডিত বিট নিজের অনুভূত বা পরের দ্বারা অনুভূত বিষয়কে রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করবে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন 'ভণ্যতে ইতি ভাণঃ অর্থাৎ একটি মাত্র ব্যক্তি তার কথা বলে ভাণে। যেমন –উভয়াভিসারিকা, পদ্মপ্রাভৃতক।

৭.৪.১২.৫.৪ ব্যায়োগ

চতুর্থ শ্রেণির রূপক হল 'ব্যায়োগ'। বহুচরিত্র এখানে থাকে বলেই এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। ধনিক বলেছেন 'বায়ু জ্যন্তে অস্মিন্ বহবঃ পুরুষাঃ ইতি ব্যয়োগঃ'। এখানে পুরাণ বা ইতিহাস খ্যাত কোনো ঘটনা এর ইতিবৃত্তরূপে গৃহীত। পঞ্চসন্ধির মধ্যে গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি এখানে থাকে না। স্ত্রীচরিত্র অত্যন্ত অল্প থাকে। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। নায়ক ধীরোদ্ধত শ্রেণির হবে। নয়প্রকার রসের মধ্যে হাস্য, শৃঙ্গার এবং শান্তরস এখানে থাকবে না। অন্য ৬প্রকার রস অঙ্গীরস হতে পারে। যেমন – মধ্যমব্যায়োগ, কর্ণভার।

৭.৪.১২.৫.৫ সমবকার

এই রূপকের ইতিবৃত্ত প্রসিদ্ধ দেবতা বা অসুর বিষয়ক হবে। এখানে বিমর্ষ সন্ধি থাকবে না। এখানে তিনটি অঙ্ক থাকবে। ধীরোদাত্ত লক্ষণযুক্ত বারটি দেব-মানব এর নায়ক হবে। তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক এক একটি ফল বর্ণিত হবে। এখানে বীর রস হবে প্রধান এবং অন্যান্য রস তার অঙ্গীভূত হয়ে অবস্থান করে। যেমন – পঞ্চাত্র, সমুদ্রমন্থন।

৭.৪.১২.৫.৬ ডিম

এর নাট্যবস্তু পুরাণাদি প্রসিদ্ধ হয়। এই রূপকে ময়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম বা ক্রোধ হেতু উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা অথবা রোগী প্রভৃতির ব্যবহার, চন্দ্রসূর্যের উপরাগ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে বর্ণিত। এখানে রৌদ্র রস হয় অঙ্গী এবং অন্যান্য রস হয় তার অঙ্গ। মোট চারটি অঙ্ক থাকে। যেমন- ত্রিপুরদাহ।

৭.৪.১২.৫.৭ ঈহামৃগ

ঈহামৃগ শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো –'ঈহতে বাঞ্ছতি প্রাপ্তুম্ কাময়তে ইতি ঈহামৃগ'। নায়ক মৃগ বা হরিণীর মত পলায়মানা নায়িকাকে লাভ করা সম্ভব নয় জেনেও, তাকে লাভ করার জন্য ছোটে। ঈহামৃগ মিশ্রবৃত্ত অর্থাৎ এখানকার বৃত্তান্ত কিছুটা বিখ্যায় এবং কিছুটা অবিখ্যাত বা অপ্রসিদ্ধ। চার অঙ্কের এই রূপকে মুখ, প্রতিমুখ এবং নির্বহণ নামক সন্ধি থাকবে। নর এবং দিব্যব্যক্তির মধ্যে একজন হবে নায়ক ও অপর জন হবে প্রতিনায়ক। তবে কে নায়ক অথবা প্রতিনায়ক হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন- কুসুমশেখরবিজয়া।

৭.৪.১২.৫.৮ অঙ্ক

এটি কারিকাতে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক' নামেও পরিচিত। এই শ্রেণির রূপকে একটিমাত্র অঙ্ক থাকে। নায়ক কোনো সাধারণ ব্যক্তি হন। অঙ্কে প্রাকৃত বহু নর নায়ক হবেন এবং করুণরস হবে স্থায়ী রস। এখানে বহু স্ত্রীলোকের বিলাপ থাকবে। বিখ্যাত কোনো ঘটনাকে কবি নিজের বিদ্ধির দ্বারা সুবিস্তৃত করে প্রকাশ করেন। এর রস মূলত করুণরস

এবং এই রসই নাটকের শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এছাড়া এখানে যে যুদ্ধ বর্ণনা হবে, তা অত্রযুদ্ধ নয় বাক্‌যুদ্ধ। বহু নির্বেদ বা আত্মাবমাননা সূচক বাক্য প্রযুক্ত হবে।

৭.৪.১২.৫.৯ বীথী

বীথী শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে 'বীথ্যামিব' ইথাদি। বীথী শব্দের অর্থ দুপাশে বৃক্ষছায়া যুক্ত পথ। পথের দুপাশে যেমন সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষগুলি সাজান থাকে তেমনি এই শ্রেণির রূপকে বিভিন্ন প্রকার রস মালার মত যেন অবস্থান করে সারিবদ্ধভাবে।

এটি একাঙ্ক রূপক এবং নায়কও একজন। নায়ক যে কোনো প্রকার হতে পারেন (উত্তম, মধ্যম, অধম)। বীথিতে মুখ ও নির্বহণ নায়ক নামক দুটি সন্ধি এবং সমস্তপ্রকার অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ দেখানো হয়। যেমন – মালবিকা।

৭.৪.১২.৫.১০ প্রহসন

এটি ভাণ শ্রেণির রুপকের মতোই মিখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে। যেখানে যথাসম্ভব সন্ধ্যঙ্গ ও লাস্যাঙ্গ থাকে এবং একটি মাত্র অঙ্ক থাকে। এখানে নিন্দনীয় ব্যক্তির বিষয়কে অবলম্বন করে কবিকল্পিত বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। তপস্বী, ব্রহ্মাজ্ঞ ও বিপ্র এই শ্রেণির চরিত্রগুলি প্রহসনের নায়ক হন। যেমন – কন্দর্পকেলি, ধূর্ত্তচরিত, নাটকমেলক ইত্যাদি। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে দশরূপ ছাড়াও অষ্টাদশ উপরূপকের কথা বলেছেন। এগুলি যথাক্রমে – নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্প, বিলাসিকা, দুমর্ল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ, ভাণিকা।

৭.৪.১২.৬ ইংরেজি নাটক

পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী জ্ঞান-তাপস এরিস্টটলই প্রথম সার্থক নাট্যশিল্পের ব্যাখ্যাতা। তাঁর ধারণায় শিল্পকলা মাত্রই অনুকৃতি (মাইমেসিস); যাকে ইংরেজি বলে 'modes of imitation'। নাট্যশিল্পের প্রধান গুণ – তার দৃশ্যধর্মীতা; নাটক 'imitation of an action...in the form of action'। এখানে action বলতে সাধারণ লোক্সমাজের জীবনের ক্রিয়া অনুকরণ বলা হয়েছে। নাট্যতত্ত্ববিদ্ সিসেরোর মতে, নাটক হচ্ছে 'A copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth' অর্থাৎ জীবনের প্রতিরূপ, রাজনীতির দর্পণ, সত্যের প্রতিফলন। পাশ্চায়ের আরও অনেক আলংকারিক নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। বিশ শতকের নাট্যতত্ত্ববিদ নিকল নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন "Drama is the art of expressing ideas about life in such a manner as to render their expression capable of interpretation by actors and likely

interest an audience assembled to hear the words and witness the action." বার্ণাড শ নাটককে সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানব চরিত্রের প্রতিফলনের মাধ্যম রূপে বিশেষিত করেছেন। তাঁর মতে 'Drama is the presentation in parable of the conflict between Man's will and his environment in a word of problem."

৭.৪.১২.৭ নাটকের অবয়ব

পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বে ও নাটকের অবয়ব বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। যেখান পাঁচটি অঙ্গ বা অঙ্কের (Art) কথা বলা হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে – Introduction, Rising action, Climax, Falling action, Catastraphe। অয়ারিস্টটল নাটকের সন্ধিভাগ করেছেন – প্রলোগ (প্রস্তাবনা), প্যারোড (প্রবেশ নীতি), এপিসোড (সংলাপ-গ্রথিত কাহিনি), স্ট্যাসিমন (কোরাস), এক্সোড (নিষ্ক্রিয় নীতি)। এভাবে নাটকের অবয়ব সংক্রান্ত আলোচনায় নানান মত পাই। আসলে আমাদের মনে হয় নাটকের বিষয়বস্তু বা ঘটনার প্রকৃতি ও ব্যপ্তি অনুযায়ী নাটকের অঙ্কবিভাগই যুক্তিযুক্ত। তাই নাট্যতত্ত্ববিদগণ কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে অঙ্কবিভাগকে আবদ্ধ রাকেননি। পরব্রতীকালে নানা রীতির নাটক রচিত হতে দেখা গেছে – নাটক কখনো হয়েছে একাঙ্ক, কখনো তিন অঙ্ক বিশিষ্ট, কখনো বা চার অঙ্ক বিশিষ্ট; তবে বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বেশিরভাগ নাটক রচিত হয়েছে পঞ্চাঙ্ক হিসাবে। নাটকের প্রাণ অভিনয়ত্বে এবং অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা অভিনেতা সমাজের সহৃদয় রসপিপাসু দর্শক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন। এই মনোরঞ্জন প্রক্রিয়ার প্রধান কথা -'ব্যক্তিত্বের রূপান্তর' অর্থাৎ অভিনেতা যেন ঐ সময়ের জন্য দেহ ত্যাগ করে অন্যের দেহে প্রবেশ করেন। 'ব্যক্তিত্বের রূপান্তর' কথাটি এখানে লক্ষণীয়।

৭.৪.১২.৮ নাটকের শ্রেণিবিচার

অ্যারিস্টটল যেভাবে নাটকের শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা একটি ছকের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

নাটক - ট্রাজেডি, কমেডি।

ট্রাজেডি – সরল (Simple), জটিল (complex), দুঃখময় (pathetic), নীতিমূলক (Ethical), দৃশ্যসর্বস্ব (Tragedy of spectacales)।

কমেডি – খাঁটি কমেডি (বিশুদ্ধ হাস্যোদ্দীপক), ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ ।

এই বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন শতাব্দীতে নাট্য সমালোচকগণ বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। সকলেই যে অ্যারিস্টটলের কথা মেনে নিয়েছেন, তা বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর নাট্যসমালোচক অধ্যাপক নিকল তাঁর Theory of Drama গ্রন্থে নাটককে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন – ট্রাজেডি, মেলোড্রামা, কমেডি, ফার্স, ট্রাজি-কমেডি। তিনি আবার প্রিটি বিভাগের বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে আরও কতকগুলি উপবিভাগের কথা বলেছেন।

৭.৪.১২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। দৃশ্যকাব্য কাকে বলে?

২। দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা দাও।

৩। 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

৪। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থটির লেখক কে?

৫। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্ম সংক্ষেপ বিবৃত করো।

৬। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 'পঞ্চসন্ধি' বলতে কী বোঝ?

৭। সংস্কৃত নাটকের শ্রেণিবিচার করে তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করো।

৮। ইংরাজি নাটকের সংজ্ঞা দাও।

৯। ইংরেকি নাটকের শ্রেণিবিচার করে দেখাও।

১০। ইংরেজি নাটকের অবয়বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭.৪.১২.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। নাট্যশাস্ত্র – আচার্য ভরত।

২। সাহিত্যদর্পণ – বিশ্বনাথ কবিরাজ।

৩। কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৪। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ – সাধঙ্কুমার ভট্টাচার্য।

পর্যায়গ্রন্থ -৪

একক - ১৩

ট্র্যাজেডি, কমেডি; প্রহসন ও অতিনাটক

বিন্যাস ক্রম :

৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা

৭.৪.১৩.২ : কমেডি ও তার নানা রূপ

৭.৪.১৩.৩ : বাংলা কমেডি

৭.৪.১৩.৪ : কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ

৭.৪.১৩.৫ : ড্রেম ও বিশুদ্ধ কমেডি

৭.৪.১৩.৬ : কমেডি ও সমাজ

৭.৪.১৩.৭ : ট্র্যাজেডি ও কমেডি

৭.৪.১৩.৮ : কমেডির শ্রেণি

৭.৪.১৩.৯ : রোমান্টিক কমেডি

৭.৪.১৩.১০ : ব্যঙ্গার্থক কমেডি

৭.৪.১৩.১১ : আচারমূলক কমেডি

৭.৪.১৩.১২ : মার্জিত বা শোভন কমেডি

৭.৪.১৩.১৩ : ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি

৭.৪.১৩.১৪ : কমেডি ও বাংলা নাটক

৭.৪.১৩.১৫ : ফার্স বা প্রহসন

৭.৪.১৩১৬ : বাংলা ফার্স

৭.৪.১৩.১৭ : ট্রাজি কমেডি

৭.৪.১৩.১৮ : সিদ্ধান্ত

৭.৪.১৩.১৯ : ট্র্যাজেডির উদ্ভব কথা

৭.৪.১৩.২০ : ট্র্যাজেডি ও তার বিভিন্ন দিক

৭.৪.১৩.২১ : ট্র্যাজেডির নায়ক

৭.৪.১৩.২২ : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক

৭.৪.১৩.২৩ : দ্বৈত নায়ক

৭.৪.১৩.২৪ : নায়কবিহীন ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩২৫ : নারী মুখ্য ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩.২৬ : ট্র্যাজেডির ভাব

৭.৪.১৩২৭ : ক্যাথারসিস

৭.৪.১৩২৮ : ট্র্যাজেডির শ্রেণী

৭.৪.১৩.২৯ : ট্র্যাজেডির বিবর্তন : গ্রীক ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৩০ : বাংলা নাটক ও গ্রীক ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৩১ : এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৩২ : বীরত্বমূলক ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩.৩৩ : ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৩৪ : পারিবারিক ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩.৩৫ : নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৩৬ : আধুনিক ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩.৩৭ : ইবসেন

৭.৪.১৩.৩৮ : স্ট্রিন্ডবর্গে ও হাউপ্টম্যান

৭.৪.১৩৩৯ : চেকভ

৭.৪.১৩৪০ : সার্ত্রে

৭.৪.১৩৪১ : নীল

৭.৪.১৩৪২ : বাঙলা ট্র্যাজেডি

৭.৪.১৩৪৩ : মেলোড্রামা বা অতিনাটক

৭.৪.১৩৪৪ : একাঙ্ক নাটক

৭.৪.১৩৪৫ : গণনাট্য

৭.৪.১৩৪৬ : নবনাট্য

৭.৪.১৩৪৭ : লোকনাট্য

৭.৪.১৩৪৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.১৩৪৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা

ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক নাটক ও অন্যান্য দেশের নাটকের ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন ও মেলোড্রামার নানা রূপ আমরা পাই। আবার একাঙ্কিকার এবং একস্ট্রাভাগেঞ্জার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উপরোক্ত রূপগুলি ভিন্ন পরিচিতি বহন করে। একস্ট্রাভাগেঞ্জা ঠিক নাটকের বিচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেবল দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই তার তাৎক্ষণিক ব্যবহার। নাট্যতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় এইসব বিষয়গুলি কিভাবে আসে তার কিছুটা পরিচয় বর্তমান অংশে পাওয়া যাবে।

৭.৪.১৩ .২ : কমেডি ও তার নানা রূপ

মানব জীবন সুখদুঃখের লীলাক্ষেত্র, জীবনে যেমন ব্যথা আছে, দুঃখ আছে; তেমনই আছে হাসি ও আনন্দের প্রফুল্লতা জীবনের এই হাল্কা মেজাজের প্রসন্নতার, সুরটি কমেডিতে ফুটে ওঠে। এখানে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা জীবনের অনিবার্য বিনষ্টি মানুষকে পীড়িত করে না। হাসিখুশির আবরণে জীবন এখানে মোটের উপর স্বপ্নমধুর।

সুদূর অতীতে গ্রীসের অ্যারিস্টোফেনিসের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কমেডির ধারা অব্যাহত হয়েছে। যুগে যুগে কালধর্মে জীবনের মূল্যবোধ ও রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে কমেডির বিবর্তন ঘটছে। তাই মিলনান্ত হলেও জীবনের গুরুগম্ভীর দিককেও সে উপেক্ষা করছে না। এককথায় কমেডির সংজ্ঞা দেওয়া আজ কঠিন। কমেডির জন্ম, লক্ষণ, সংজ্ঞা প্রবণতা, শ্রেণি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করলেই এর জগৎ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হবে।

৭.৪.১৩ .৩ : বাংলা কমেডি

দেশীয় যাত্রা, সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাট্যাদর্শের সম্মিলিত প্রেরণা বাংলা নাটক সৃষ্টির মূল। বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বনে নাটক রচনা সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের রূপরীতির দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। 'প্রণয়' কে মূল উপজীব্য করে তারাচরণ শিকদার সর্বপ্রথম রোমান্টিক ট্রাজি কমেডি 'ভদ্রার্জুন' লেখেন। এটি প্রথম বাঙালি নাট্যকারের কমেডি রচনার প্রয়াস।

৭.৪.১৩.৪ : কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে কমেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন ''As for Comedy it is (as has been observed) an imitation of man worse than the average; Worse however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous, which is a species of the ugly'' অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কমেডির লক্ষণগুলি হল —

ক. কমেডি হল সাধারণ মানুষের থেকে নিম্নতর মন্দ মানুষের জীবনবৃত্তের অনুকরণ।

খ. এখানে 'মন্দ' বলতে মানুষটি যে নানা রকম দোষে দোষী একথা বলা হচ্ছে না।

গ. শুধুমাত্র তার একটি দোষের কথাই বলা হচ্ছে যা হাস্যোদ্দীপক এবং কুৎসিতেরই প্রকারভেদ মাত্র।

ঘ. অ্যারিস্টটল 'Ridiculous' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এর অর্থ ভ্রান্তি বা অঙ্গবিকৃতিও করা যেতে পারে এবং তা কখনই ক্ষতিকারক নয়।

-অ্যারিস্টটল অ্যারিস্টোফেনিস বা তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের কমেডিগুলি দেখেই এ কমেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে অনেকক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন।

অ্যারিস্টটল কমেডির আয়তনকে নির্দিষ্ট করে দেননি। 'পোয়েটিক্স' এ তিনি জানিয়েছেন, কমেডির শেষে কোনো মৃত্যুর ব্যাপার থাকবে না, পরম শত্রুও বন্ধুভাবে মঞ্চ ত্যাগ করবে। কমেডির বৃত্তে যদি বিরোধ ঘনীভূত হয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার পরিমন্ডল সৃষ্টি করে, তাহলেও সেই আবহাওয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে মিলনান্ত সমাপ্তি হয়। সুতরাং ব্যক্তি আক্রমণমুক্ত; অপেক্ষাকৃত নিম্ন চরিত্রাশ্রয়ী, বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক মিলনান্ত বৃত্তের রূপায়নই কমেডি।

অ্যারিস্টোফেনিসের পরে মিনান্ডার ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের কমেডি রচনায় রোমান্টিক প্রেম ধরা দিয়েছে। আরও পরবর্তীকালে রোমের প্লটাস মিনান্ডারের রচনা ও প্রাচীন 'বারলেক্সে'র বিদ্রূপ ও হাস্যকে মিশ্রিত করে কমেডি লেখেন। এর অনেক পরে শেক্সপীয়র তাঁর অপরূপ রোমান্টিক কমেডি ও ট্রাজি কমেডি নিয়ে আবির্ভূত হলেন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে, বেন জনসন এলেন বিদ্রূপাত্মক কমেডি নিয়ে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে এলেন বিশ্বখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের, ইংলন্ডে জন ড্রাইডেন, স্যাডওয়েল, জর্জ এথিরীজ প্রমুখ। ফলে কমেডির রূপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে লাগল। একে একে সৃষ্টি হল হিরোইক কমেডি ও মেলোড্রামার।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের মনোভঙ্গির কথা মনে রেখে রিচার্ড ডুপ্লে সার্থক কমেডির পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে জগৎ সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণের ফল হল কমেডি। কমেডির রচয়িতা হবেন তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের ভুলত্রুটি লক্ষ করবেন। মানুষের এই ভুলত্রুটির জন্যে তাঁর চিত্তে কোনো গভীর বেদনা থাকবে না।

একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থের 'Comedy' অধ্যায়ে কমেডির নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির কথা বলেছেন :

ক. কমেডিতে সাধারণত কোনো নায়ক চরিত্র থাকে না।

খ. কোনোও বিশেষ শ্রেণীর একটি বা কতকগুলি টাইপ চরিত্রই এখানে প্রধান।

গ. সাধারণত একটি বা একাধিক হাস্যস্পদ চরিত্রের পাশাপাশি আরও কয়েকটি সাধারণ চরিত্র থাকে যার ফলে অসঙ্গতিগুলি পরিস্ফুট হয়।

ঘ. কমেডিতে থাকে সমাজের একটা বিশেষ দিকের চিত্র।

ঙ. ফরাসী দার্শনিক বেগর্সর সূত্র অনুসরণ করে নিকল বলেছেন কমেডির দর্শকরা অনুভূতিশীল নয়।

চ. কমেডির সাধারণ বিষয় প্রেম এবং এখানে চিরন্তন পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ দেখানো হয়।

জ. কমেডিতে বাস্তবতার পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

ঝ. এর উপসংহারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার কথা বা মিলনদৃশ্য থাকে।

সার্থক কমেডি রচনা করতে হলে একজন নাট্যকারকে বৃত্ত, চরিত্র ও সংলাপ এই তিনদিকেই সমান নজর দিতে হয়। রোমান্টিক কমেডি ও ট্রাজি কমিডিগুলিতে সুস্পষ্ট ও সংহত বৃত্ত থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর কমেডির বৃত্ত অনেক শিথিল। রোমান্টিক কমেডি গঠনের একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। নাট্যকার্যের সূচনায় নায়ক - নায়িকার অনুরাগের বীজ বপন করা হয়। পরে একটা বাধা তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে এবং বৃত্তটি তখন অনেক দ্বন্দ্বাত্মক রূপ নেয়। বাংলায় মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' অমৃতলালের 'খাসদখল'' রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা' প্রভৃতি কমেডিতে বৃত্ত গঠনের এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। অ্যারিস্টোফেনিসের নাট্যবৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্যঙ্গ, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, বাস্তবতা, হাস্যোদ্দীপকতা প্রভৃতি পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখকদের মধ্যে নানভাবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর প্রয়োগপদ্ধতি এঁদের হাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর হয়েছে, তাঁর বহু উপাদানের মধ্যে এঁরা যে সবগুলি গ্রহণ করেছেন তা নয় — কারও মধ্যে একটি, আবার কারও মধ্যে একাধিক লক্ষণ সূক্ষ্মতর হয়েছে।

৭.৪.১৩.৫ : ড্রেম ও বিশুদ্ধ কমেডি

'ড্রেম' নামে এক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব ঘটে ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। দিদেরোর বুর্জোয়া নাটকের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভিক্টর হুগোর রোমান্টিক ড্রেমের আশ্রয়ে এবং সমকালীন বেশ কিছু নাট্য চর্চার সূত্রে শ্রেণীটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

ফরাসী দার্শনিক বেগর্স ড্রেম ও কমেডির পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মূল্যবান কথাটি বলেছেন, সেকথা স্মরণে রেখে অধ্যাপক নিকল ড্রেমকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন (ক) মিলনান্ত ড্রেম (খ) পুরোপুরি সুখদায়ক উপসংহার নয় এমন ড্রেম (গ) গুরুগম্ভীর বৃত্তের সঙ্গে কমিক উপাদানের মিশ্রণ সম্বলিত 'ড্রেম-কমিডি'। এগুলির দৃষ্টান্ত যথাক্রমে The Road to ruin, The Merchant of Venice ও Secret Love। কিন্তু এগুলিকে যথার্থ কমেডি বলা যায় না।

ইবসেনের A Doll's House বার্নার্ড শ এর 'Widower's Houses' প্রভৃতি আধুনিক কালের ড্রেম, কমেডি নয়। আমাদের মতে ড্রেমকে ট্র্যাজেডি বা কমেডি কোনো 'শ্রেণীভুক্ত' করা যায় না। আধুনিক কালের মানুষের জটিল সমস্যা রূপায়ণে ড্রেমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাভাষায় অনেকেই এই ধরনের সমস্যামূলক নাটক লিখেছেন, এগুলোকে ড্রেম বলা যেতে পারে।

৭.৪.১৩.৬ : কমেডি ও সমাজ

হাস্যরস কখনও একক মানুষের উপভোগ্য বিষয় নয়। বহু মানুষের সাহচর্যে এর সার্থকতা। 'হাসি এক সামাজিক বৃত্তি এবং বহুজন সম্মিলিত আসরই হল তার প্রকৃত ক্ষেত্র। হাসি কোনো এক ব্যক্তি বা টাইপ চরিত্রকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয় অন্যান্যরা উপভোগ করে। সমাজের কোনো সুস্থ কৃতী স্বাভাবিক ও শক্তিশালী মানুষকে কেন্দ্র করে সামাজিক অপর মানুষ হাসে না। সমাজে মানুষের জীবনযাপনের, আচার আচরণের যে সাধারণ বিধি বা আদর্শ প্রযোজ্য আছে তা থেকে চ্যুত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মানুষই হাসির পাত্র হয়। বিশুদ্ধ কমেডিতে এইসব চরিত্র একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সামাজিক হাসি অসামাজিক ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আশ্রয় করে রচিত হয়।

স্যাটায়ারমুখ্য বা ব্যঙ্গাত্মক কমেডিতে হাস্যরসিকের সমাজচেতনা খুব প্রবল। সমাজের সমকালীন দোষ ত্রুটিগুলিকে উৎখাত করবার গূঢ়তর অভীপ্সা অ্যারিস্টোফেনিস, মলিয়ের, বার্নার্ড শ বা প্রমুখ ব্যক্তিদের রচনায় দুর্লক্ষ নয়। বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটকে সমসাময়িক সমাজের নানা দোষত্রুটি, সামাজিক মানুষের স্খলন-পতন সংশোধনের অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যধর্মের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৭.৪.১৩.৭ : ট্র্যাজেডি ও কমেডি

ট্র্যাজেডি ও কমেডি — নাটকের এই দুই প্রধান শ্রেণী জীবনের দুই ভিন্ন অথচ একান্ত সত্যরূপের প্রকাশ। ট্র্যাজেডিতে জীবনের অন্ধকারময় দিক এবং কমেডিতে আলোকিত দিক ফুটে ওঠে। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্যে বিভিন্ন কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে বিভিন্ন ভেদ সূত্র। ট্র্যাজেডি ও কমেডির এই ভেদরেখা নিম্নরূপ :

(ক) প্রাচীন গ্রীসে উর্বরাশক্তির বৃদ্ধিকল্পে ডায়োনিসাস দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুয়েরই সৃষ্টি হয়েছিল। ডায়োনিসাসের মৃত্যুযন্ত্রণা ও মৃত্যুর কাহিনি ট্র্যাজেডির বিষয় ছিল, তাই ট্র্যাজেডিতে ব্যথাহত আশাহীন জীবনের ব্যর্থতার চিত্র প্রাধান্য পেত, আর দেবতার পুনর্জীবন ও বিবাহের বিষয়কে আশ্রয় করা হত কমেডিতে, ফলত আনন্দেই তার পরিণতি। আর এই দুই মিলে জীবনচক্রের পূর্ণতা। অর্থাৎ ট্র্যাজেডিতে যার শেষ, কমেডিতে তার সূচনা।

(খ) ট্র্যাজেডিতে বৃত্তের গতিপথ মোটের উপর সরলরৈখিক; কমেডির এই গতিপথ বৃত্তাকার বা চক্রাকার। একস্থান থেকে শুরু হয়ে পুনরায় সেই স্থানে ফিরে আসে।

(গ) ট্র্যাজেডির আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে, তা সমস্ত অন্তরদেশকে আলোড়িত করে; কিন্তু কমেডির সঙ্গে আমাদের চিত্তদেশের যোগ নিতান্তই ক্ষীণ। এখানকার হাসি-আনন্দ-গান সব কিছুই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার অর্থাৎ ট্র্যাজেডি অনুভূতিগ্রাহ্য, কিন্তু কমেডি বুদ্ধিগ্রাহ্য।

(ঘ) ট্র্যাজেডির নায়ক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করে -- সে কি ছিল, কি করেছে এবং কেন তার এ পরিণতি এ সম্পর্কে সে সচেতনই থাক বা অবচেতনই থাক। তার পরিণাম সম্পর্কে প্রথম থেকেই নাট্যঘটনা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শকদের কৌতূহলী করে রাখে। এই ধরনের উৎকণ্ঠা, মানসিক আলোড়ন, ঘটনার তরঙ্গ ও ঘাত-প্রতিঘাত কমেডিতে নেই। প্রধান পাত্রপাত্রীদের পরিণাম এখানে তেমন অনিশ্চিত নয়।

(ঙ) ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য মূলত অভিজ্ঞতা ও স্বতোলব্ধ জ্ঞানের পার্থক্য। মানুষ ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে কিংবা ব্যক্তিগত স্বপ্নপূরণের জন্য অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা; কিন্তু স্বতোলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের উৎকেন্দ্রিকতা, খেয়ালিপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। বলাবাহুল্য প্রথমটির চিত্র থাকে ট্র্যাজেডিতে আর দ্বিতীয়টির চিত্র ফুটে ওঠে কমেডিতে।

(চ) ট্র্যাজেডিতে থাকে জীবনের চিরন্তন, বিশ্বজনীন রূপ এবং কমেডিতে একটি বিশেষ কালের সামাজিক ও পরিবর্তনশীল রূপ। অবশ্য শ্রেষ্ঠ কমেডিতে মানুষ বা সমাজের যে ত্রুটি তুলে ধরা হয় তারও একটা চিরন্তন আবেদন থাকে।

(ছ) কমেডিতে থাকে বহু চরিত্রের সমাবেশ। ট্র্যাজেডিতে কিন্তু নায়ক চরিত্রেরই সর্বব্যাপী প্রাধান্য। তার বেদনা ও অন্তঃহীন দুঃখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাট্যকার।

(জ) ট্র্যাজেডির গঠন দৃঢ়পিনদ্ধ, কমেডির গঠন তুলনামূলকভাবে শিথিলবদ্ধ। ট্র্যাজেডিতে থাকে ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে শ্রেণীচরিত্রের প্রাধান্য; ট্র্যাজেডিতে কাহিনির রসপরিণাম ভয়ানক ও করুণ। কমেডির লঘুচালের কাহিনির রসপরিনাম হাস্যরসাত্মক এবং মনমুগ্ধকর। ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুয়েতেই নায়ক বাধা বা দ্বন্দ্বের আবর্তে পতিত হয়। কিন্তু ট্র্যাজেডির বাধা দুস্তর ও অনতিক্রম্য, কমেডির বাধা তুলনামূলক ভাবে শক্তিহীন ও সহজেই অতিক্রম্য।

৭.৪.১৩. ৮ : কমেডির শ্রেণী

অধ্যাপক এ. নিকল কমেডিকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন— ক. ফার্স, খ. কমেডি অব রোমান্স, গ. কমেডি অব হিউমার্স, ঘ. কমেডি অব ম্যানার্স, ঙ. কমেডি অব ইন্‌ট্রিগ্। তাঁর কমেডি অব রোমান্সের একটি উপবিভাগ রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি এবং কমেডি অব ম্যানার্সের একটি উপবিভাগ জেন্টল কমেডি। শেক্সপীয়র ও তাঁর পরবর্তী যুগের কমেডিগুলির দিকে লক্ষ রেখে নিকলের এই শ্রেণীবিভাগ। অবশ্য 'World Drama' তে অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিকে 'ওল্ড কমেডি' বা প্রাচীন কমেডি অ্যারিস্টোফেনিস ও মিনান্ডারের মধ্যবর্তীকালের গ্রীক কমেডিকে 'মধ্যবর্তী কমেডি' ও মিনান্ডারের কমেডিকে 'নব কমেডি' বলেছেন, প্লুটাস ও টেরেন্সের রোমান কমেডিগুলিও এক 'নব কমেডি' তবে এগুলিকে 'ক্লাসিকাল কমেডি' ও বলা হয়। মলিয়েরের কমেডিগুলি 'কমেডি অব সোসাইটি' বা 'হিউমান কমেডি', 'কমেডি অব ম্যানারস', 'কমেডি অব ম্যাটায়ার' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এছাড়া আছে ব্রাইট কমেডি, কমিক কমেডি, হিরোয়িক কমেডি, সিরিয়াস কমেডি প্রভৃতির ধারণা।

৭.৪.১৩.৯ : রোমান্টিক কমেডি (Comedy of Romance)

কমেডির সকল শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য ও অভিনয় মূল্যে রোমান্টিক কমেডিই শ্রেষ্ঠ। শেক্সপীয়রের কমেডিগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীর কমেডির লক্ষণ নির্মিত হয়েছে। শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডিতে প্রেক্ষাপটে দৃশ্যসন্নিবেশ প্রবণতা রয়েছে 'Midsummer Night's Dream' এর পটভূমি এথেন্সের

নিকটবর্তী এক অরণ্য। প্রকৃতি চরিত্রচিত্রণেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। কতকগুলো চরিত্র অতিমাত্রায় রোমান্টিক বাকিগুলি বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতা এর প্রধান গুণ। প্রেমই রোমান্টিক কমেডির প্রধান বিষয়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরাগ সঞ্চার, মিলনের পথে বাধা, পরিশেষে সংকট মুক্তি ও মিলন এর মুখ্য উপজীব্য। বস্তুতঃ একটা রোমান্টিক পটভূমি বা রোমান্টিক উপাদান সম্বলিত কোনো কমেডিতে যদি সংবেদনশীল চরিত্র চিত্রণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাহলে তা রোমান্টিক কমেডিতে উন্নীত হয়। অপেক্ষাকৃত এই শিথিল আদর্শে মিনান্ডারের কমেডি, প্লুটাস ও টেরেন্সের কমেডি, রোমান্টিক কমেডি, আরও একটু শিথিল আদর্শে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। তবে ধারাবাহিকভাবে শেক্সপীয়রের আদর্শে এ নাটক লেখা হয়নি।

৭.৪.১৩.১০ : ব্যঙ্গার্থক কমেডি(Comedy of Humours)

কমেডি অব হিউমার্স বা ব্যঙ্গার্থক কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বেন জনসন। মানুষের মেজাজ বা স্বভাব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে দেহস্থ চারপ্রকার রসের সমানুপাতিক মিশ্রণে। এগুলি হল humour, choleric, phlegmatic ও Melanocholic। এদের মিশ্রণ যদি সমানুপাতিক না হয়, তাহলেই মানুষ হবে উৎকেন্দ্রিক। মানুষের এই উৎকেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন করে রচিত যে কমেডি তাকে প্রথম রসটির নাম অনুসারে জনসন নাম দিলেন 'কমেডি অব হিউমার্স'। এই ধরনের কমেডির বৈশিষ্ট্যগুলি হল— ক. এ কমেডিতে উৎকেন্দ্রিক বা ছিটগ্রস্ত মানুষের বিদ্রূপ করা হয়। খ. রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে এর বড় পার্থক্য বাস্তবতায়। অবিশ্বাস্য রোমান্সের রাজ্য থেকে কমেডি সাধারণ মানুষের দরজায় এসে পৌঁছেছে। গ. এ কমেডিতে শ্রেণীচরিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হয় বলে বিদ্রূপের সুবিধে। অধ্যাপক নিকল তাই এগুলিকে ব্যঙ্গাত্মক কমেডি বলেছেন। খ. সাধারণত কৃপণ, ভণ্ড, দাম্ভিক, মনুষ্যদ্বেষী চরিত্রকে এতে আশ্রয় করা হয়। ঙ. এ কমেডি গঠনের একটা রীতি আছে। চরিত্র নিজের কোনো বদ্ মতলবকে হাসিল করার জন্য সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে। আয়োজন যখন সাফল্যের সীমা স্পর্শ করতে যাচ্ছে, তখন অন্য একটি ষড়যন্ত্রের ব্যর্থ কৌশলের সাহায্যে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয় ও স্বস্তিজনক উপসংহার আনা হয়। পাশ্চাত্যের বেন জনসন, মলিয়ের, বার্নার্ড শ ও আমাদের বাংলা সাহিত্যে অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধরনের কমেডি লিখেছেন। অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' ও 'বৌমা' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' এর দৃষ্টান্ত।

৭.৪.১৩.১১ : আচারমূলক কমেডি(Comedy of Manners)

যে কমেডিতে সমকালীন সমাজের আচার আচরণ, রীতিনীতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি হাস্যকরতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত তা কমেডি অব ম্যানার্স। এখানে টাইপ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা দেখানো হয় না-সমাজ থেকে চরিত্র যেসব ত্রুটি, বিচ্যুতি আহরণ করে, তারই জন্য তারা এখানে হাস্যাস্পদ, তাদের ত্রুটি চরিত্রগত নয়। যেমন লোভ মানুষের একটা চরিত্রগত দোষ, তাই এখানে দেখানো হয় না। এই ধরনের কমেডিতে ব্যঙ্গ থাকলেও তা আক্রমণাত্মক নয়, অত্যন্ত মৃদু।

চমৎকার উইট প্রয়োগের সুযোগ আচরণমূলক কমেডিতে বেশি থাকে। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তু ও চরিত্রের কৃত্রিমতা। এতে বাস্তবতা থাকলেও তার চিত্র প্রতিফলিত হয় কৃত্রিমভাবে। অবশ্য বাংলায় কোনো আচরণমূলক কমেডি নেই। তবে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', অমৃতলাল বসুর 'বাবু'তে এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

৭.৪.১৩.১২ : মার্জিত বা শোভন কমেডি (Gentele Comedy)

তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের কৃত্রিম ভাব, চাল চলন ও রীতিনীতিকে নিয়ে পরিহাসমূলক যে রচনা তার নাম মার্জিত বা শোভন কমেডি। আচারমূলক কমেডির পৃষ্ঠপোষকগুলি পরিবর্তিত হয়ে 'শোভন কমেডি'-র জন্ম দেয়। The Modern British Drama তে বলা হয়েছে এখানে মানুষ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম রূপের পরিচয় থাকে। কোনো গ্রাম্যতা থাকে না। সবকিছুকেই ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হয়। কৃত্রিম ভাবপ্রবণতার আবরণে অবৈধ প্রেম আচ্ছাদিত থাকে উইট বা বাক্‌চাতুর্য্যে। সাধারণ মানুষের কোনো প্রবেশাধিকার এখানে নেই। ষড়যন্ত্র থাকবে ভাবাবেগের মোড়কে। অমৃতলালের 'ব্যাপিকাবিদায়' কে এই শ্রেণীর কমেডির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়।

৭.৪.১৩.১৩ : ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি(Comedy of Intrigue)

ফ্লেচারের সময় থেকে অষ্টাদশ শতক জুড়ে ইংলন্ডে এই কমেডির ধারাটি বহমান ছিল। ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র ও বৃত্তের জটিলতা থেকেই এখানে হাসির সৃষ্টি হয়। ঘটনা পরম্পরার নিপুণ সজ্জায় ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় ফ্লেচারের এই শ্রেণীর কয়েকটি কমেডি উল্লেখযোগ্য। ভুলের উপর ভিত্তি করে এর বৃত্ত আকর্ষণীয় হয়। ফার্সের মতো ঘটনানির্ভর হলেও ফার্সের সমগোত্র নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র ও ঘটনার জটিলতা

মিলিয়ে হাসির সৃষ্টি করে। উইট, হিউমার বা স্যাটায়ার - এর প্রয়োগ এখানে নেই বললেই চলে। রামনারায়ণের 'উভয়সঙ্কট', অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' প্রভৃতিকে ষড়যন্ত্রমূলক কমেডির অন্তর্ভূক্ত করা চলে।

৭.৪.১৩.১৪ : কমেডি ও বাংলা নাটক

বাঙালি নাট্যকারগণ হাস্যরসাত্মক রচনায় অধিকতর উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য কমেডি অনুযায়ী বাংলা কমেডিও হাস্যরসাত্মক লঘু কমেডি ও গম্ভীর ভাবের গুরু কমেডি এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। বাংলা ভাষায় পৌরাণিক নাটকগুলি প্রায় সবই গম্ভীর রসাত্মক ও মিলনান্তক। এগুলিকে ট্রাজি কমেডি বলাই শ্রেয়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি বাংলা ভাষায় প্রথম কমেডি। পরবর্তীকালে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক দুটিকে গুরু কমেডি বলা যেতে পারে, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মিশ্র কমেডি।

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী' তিনটিই রোমান্টিক লঘু কমেডি। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক 'মায়াবসান' গুরু কমেডি।

অমৃতলালের 'খাসদখল' ও 'নবযৌবন' লঘু রোমান্টিক কমেডি রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' লঘু কমেডি। রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণংকৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', মনোজ মিত্রের 'অবসন্ন প্রজাপতি' লঘু কমেডি।

৭.৪.১৩.১৫ : ফার্স বা প্রহসন

ফার্সের জন্ম হয় সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্য দেশে; তবে এই সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই। মধ্যযুগে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল এর বীজ। ল্যাটিন শব্দ Farcio শব্দটি থেকে ইংরেজি Farce শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ কোনো কিছু ঠেসে ভর্তি করে স্ফীত করে তোলা। মধ্যযুগের গীর্জায় প্রার্থনামূলক অনুষ্ঠানে কিছু ব্যাখ্যার অতিরিক্ত অংশ সংযোজনকে অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশকেই বলা হত ফার্স। পরে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে দাঁড়াল, 'পূর্ব প্রস্তুতিহীন এক ধরণের ভাঁড়ামি'। আরও পরে হল 'এক শ্রেণীর নাট্যরচনা যাতে নিম্নশ্রেণীর কৌতুক ও অতি রঞ্জিত সংলাপ থাকবে। অধ্যাপক নিকল তিন অঙ্কের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের রচনাগুলিকে 'ফার্স' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ফার্স হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত, হাস্যকর নাট্যরচনা যাতে অতিরঞ্জিত, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ থাকবে। চরিত্র বিশ্লেষণ

এখানে থাকবে না। প্লট বা বৃত্তের সংহত বিন্যাসও থাকবে না। হৈ হুল্লোড় ধ্বস্তাধস্তি চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে অট্টহাস্যের জগৎ সৃষ্ট হবে এতে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রহসনের প্রাচুর্য রয়েছে। সংস্কৃত 'দৃশ্যকাব্য'-এর অন্তর্গত দশ রূপকের অন্যতম হল প্রহসন। ভরত প্রহসনকে শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ 'বিকৃত' প্রহসন নামে আরও একটি বিভাগ করেছেন। ভরতের মতে শুদ্ধ প্রহসনে উচ্চস্তরের চরিত্রই প্রধান হবে, তবে নীচপাত্রও থাকতে পারে। আর সংকীর্ণ প্রহসনে চরিত্র হবে বিট-চেট, বেশ্যা বা ধূর্ত, নপুংসক। বিশ্বনাথের মতে, প্রহসনের বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত। এ হল নিন্দনীয়ের নিন্দাখ্যান। তিনি বলেন, শুদ্ধপ্রহসনে নায়ক হবে 'ধৃষ্ট'। নায়ক ধৃষ্ট না হলে তা হয় সংকীর্ণ প্রহসন। প্রহসনের আয়তন সর্বদা এক অঙ্কের হবে। তবে মতান্তরে সংকীর্ণ প্রহসন দুই অঙ্কেরও হতে পারে।

পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত আলংকারিকদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উভয় দেশের আলংকারিকেরা এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রয়াতন নাট্যকে নিম্নমানের বলেছেন ও হাসিসৃষ্টি এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে পাশ্চাত্য ফার্স ও সংস্কৃত প্রহসনকে এক মনে হলেও এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

৭.৪.১৩.১৬ : বাংলা ফার্স

বাংলা ভাষায় ফার্সের অপ্রতুলতা নেই, তবে অধিকাংশ বাংলা ফার্সই শিল্পের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর, এখানে হাস্যরস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের নানা দোষত্রুটির সমালোচনা করতে নাট্যকার সংযম ও শালীনতার পরিচয় দিতে পারেননি। এত ব্যর্থতার মাঝেও মধুসূদনের সাফল্য কিন্তু ঈর্ষার যোগ্য। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুখানি নাটিকার একটিতে একশ্রেণীর 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের আচরণকে ও অন্যটিতে প্রাচীন সমাজের ভণ্ড জমিদার শ্রেণীর নীচতা, স্বার্থপরতা ও লাম্পট্যকে আক্রমণ করা হয়েছে। তবে রচনার গুণে নাটিকাদুটি ঠিক ফার্সের মধ্যে সীমিত থাকেনি, কমেডিরও কিছু কিছু লক্ষণ এতে প্রাধান্য পেয়েছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'উভয়সংকট', 'চক্ষুদান', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এই তিনখানি প্রহসনে সপত্নীবিদ্বেষ, পুরুষের লাম্পট্য, বহুবিবাহ প্রভৃতিকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে, তবে শিল্প সার্থকতা আসেনি।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাইবারিক' প্রহসন জাতীয় রচনা। এই রচনাগুলি চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে সংলাপ প্রয়োগে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'হঠাৎনবাব', 'দায়েপড়ে দারগ্রহ', হিতেবিপরীত', 'অলীকবাবু' প্রভৃতি উল্লেযোগ্য প্রহসন। এখানে রচনারীতিতে ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের প্রভাব রয়েছে।

বাংলায় প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষত্রুটিগুলিকে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। 'বাবু', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'ডিসমিস' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে না পারলেও তিনি কতকগুলি প্রহসন লিখেছিলেন। 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। গিরিশচন্দ্র ফার্স লেখার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। 'য্যায়সা কি ত্যায়সা', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতিতে সামান্য দক্ষতার পরিচয় আছে।

এছাড়া বাংলা প্রহসনের ধারায় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'টোটকা', 'জুজু', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি' অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'থিয়েটার' 'চাবুক' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলি ভিন্ন জাতের ও আস্বাদনেও ভিন্ন। উত্তর-রবীন্দ্রপর্ব বাংলায় যেসব প্রহসন লেখা হচ্ছে তা থেকে নতুন কোনো সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচন হচ্ছে না।

৭.৪.১৩.১৭ : ট্রাজি কমেডি

মানব জীবনে হাসি এবং কান্না, বিষাদ ও আনন্দ নিত্য সহচর। এক হিসেবে এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। জীবনে কান্না ও বিষাদের তীব্রতা হ্রাস পেলেই হাসি ও আনন্দের রাজ্য শুরু হয়। আবার হাসি ও আনন্দের সীমা পেরিয়ে কান্নার জগত। জীবনে হাসি ও কান্না হাত ধরাধরি করে রয়েছে। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক উপাদান বা কমেডির মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদানের মিশ্রণ হতেই পারে। অতীত থেকেই সৃষ্টি হয় ট্রাজি কমেডির।

রেনেসাঁস যুগে ইতালির নাট্যতত্ত্ববিদরা ট্র্যাজেডির সুখসমাপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে তাই ট্রাজি কমেডিকে একটি স্বতন্ত্র নাট্য শ্রেণীরূপে স্বীকৃতি জানানো হয়। নাট্যকার পিয়েরি কর্নেই এর ''The cid'' নামক নাটকটিকে ফরাসি অ্যাকাডেমি ১৬৩৮-এ 'ট্রাজি কমেডি' বলে ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থে ট্রাজি কমেডির স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে নাট্যকার তাঁর মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনভাবে কমেডির উপাদান মিশ্রিত করতে পারেন :

ক. ট্র্যাজিক চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্য। এখানে কমিক উপাদান হাসির তরঙ্গে আমাদের আন্দোলিত করে না।

খ. কখনো কখনো ট্র্যাজেডিতে কমিক উপাদান সংযোজিত হয় 'রুদ্ধশ্বাস' বেদনাময় ট্র্যাজিক আবহাওয়ার মাঝখানে একটুখানি স্বস্তির অবসর সৃষ্টির জন্য।

গ. ট্র্যাজেডি হল, মূলবৃত্তের সমান্তরাল এবং কখনো বা মূলবৃত্ত নিরপেক্ষ একটি কমিক-বৃত্ত সৃষ্টির জন্য।

অধ্যাপক নিকল ট্রাজি কমেডির তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন—

ক. ট্রাজি কমেডি — যেখানে ট্র্যাজিক ও কমিক উপাদান প্রায় সমান সমান। দৃষ্টান্ত — The Chargeling.

খ. ট্রাজি কমেডি — যেখানে একটি কমিক উপকাহিনি মূল ট্রাজিক কাহিনির অধীন। দৃষ্টান্ত — The English Traveller.

গ. ট্রাজি কমেডি — যেখানে কমিক কাহিনিই মুখ্য এবং ট্র্যাজিক উপাদান বা উপকাহিনি তার অধীন। দৃষ্টান্ত- The Winter's Tale.

৭.৪.১৩.১৮ : সিদ্ধান্ত

ট্রাজি কমেডি অবশ্যই ট্র্যাজেডি ও কমেডির মিশ্রণজাত রচনা। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ট্র্যাজিক বৃত্ত ও একটি সম্পূর্ণ কমিক বৃত্ত জুড়ে দিলেই ট্রাজি কমেডি হয় না। ট্রাজি কমেডিতে দুই ধরনের কাহিনি থাকলেও তা শেষপর্যন্ত একটি কাহিনিতে পরিণত হয় এবং কাহিনিতে নায়ক বা নায়িকার জীবনে ঘোরতর অন্ধকার নেমে এলেও শেষ পর্যন্ত সেই ট্র্যাজিক বেদনা দূরীভূত হয়। বিপদজাল থেকে মুক্ত করে নায়ক-নায়িকাদের এমন একটি স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে দর্শকের মন থেকে ট্র্যাজিক সম্ভাবনার সুরটি মিলিয়ে যায়। মোট কথা ট্রাজি কমেডি হল মূলত কমেডি, তবে কমিক কমেডি নয়। এ আসলে গুরু কমেডি ও ট্র্যাজিক ঘটনার সমন্বয়ে এক নূতন ধরনের প্রজাতি। শেক্সপীয়রের 'The Winter's Tale', 'The Merchant of Venice' ও 'The Tempest' এই জাতীয় রচনা।

সপ্তদশ শতকে ব্লেমন্ট ও ফ্লেচার ট্রাজি কমেডিকে ইংলন্ডে বেশ জনপ্রিয় করে তোলেন, 'বাংলা নাটকে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'- কে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' গুরুগম্ভীর ট্রাজি কমেডির নিদর্শন।

সুতরাং, ট্রাজি কমেডি শ্রেণীর রচনা ট্র্যাজেডি ও কমেডির মিশ্রণে সৃষ্ট হলেও তা দুয়ের সহযোগে জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপার কিছু নয়। এখানেও নাট্যকারকে একটি পরিকল্পনা স্থির করে নিয়ে দুই ভিন্ন উপাদান সমন্বয় করতে হয় যাতে তা ট্র্যাজেডিও না, অবিমিশ্র কমেডিও না, হয় একটি নূতন প্রজাতি।

৭.৪.১৩.১৯ : ট্র্যাজেডির উদ্ভব কথা

প্রাচীন গ্রীসের সুরা, শস্যের ও উর্বরাশক্তির দেবতা হলেন ডায়োনিসাস। ইনি ছাগরূপী বা বৃষরূপী। এই দেবতার বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। এই উৎসবে গ্রামের সমস্ত লোকজন শোভাযাত্রা সহকারে দেবতার কাছে উপস্থিত হয়ে ছাগবলি দেওয়ার পর, কিছুসংখ্যক ভক্ত নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে গান গাইত, তার নাম 'ডিথিরাম্ব'। এই গানে ডায়োনিসাসের মহিমা কীর্তিত হত। "ডিথিরাম্ব" গানই চূড়ান্ত পরিণতি পায় ট্র্যাজেডিতে।

'ট্র্যাজেডি' শব্দটি গ্রীক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ছাগগীতি (goat song)। ডায়োনিসাসের উৎসবে ছাগ বলি দেওয়া হত বলে এবং প্রতিযোগিতায় কৃতী ব্যক্তিকে ছাগ উপহার দেওয়া হত বলে ছাগরূপী দেবতার কথাআশ্রয়ী গান গোটে সং বা 'tragodia' নামে আখ্যাত হয়েছে। এই 'tragodia' শব্দটি থেকে 'tragedy' শব্দটির উৎপত্তি।

গ্রীসে আরিজনেই ট্র্যাজিক রীতির প্রথম প্রবর্তক। ডায়োনিসাসের উৎসব উপলক্ষে যে 'ডিথিরাম্ব গানে' কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। কাহিনি বা সংলাপের প্রবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো উন্নত করেন মেসপিস। মেসপিসের পর খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের দিকে আসেন লেসাস। তিনি আরও কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এরপর একে একে দেখা দিলেন এস্কাইলাস সফোক্লিস, ও ইউরিপিডিস। এঁদের সাধনায় গ্রীক ট্র্যাজেডি সর্বোত্তম রূপ লাভ করল।

৭.৪.১৩.২০ : ট্র্যাজেডি ও তার বিভিন্ন দিক

ট্র্যাজেডি মানব জীবনের এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনি— জীবনের মহা সর্বনাশের এক মর্মান্তিক ইতিবৃত্ত। দৈবের বিরূপতায় বা নিজ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ও চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ প্রবণতার একমুখিনতায় মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা বরণের কাহিনি — তারই নাম 'ট্র্যাজেডি'।

খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা সাহিত্যিক, দার্শনিক ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আসছেন। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন — ''A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself;

in language. With pleasureable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and Fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions."

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা থেকে ট্র্যাজেডির কিছু বৈশিষ্ট্যর সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

ক. ট্র্যাজেডি হল কোনোও গুরুগম্ভীব ঘটনার অনুকরণ, যা দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত করে।

খ. ট্র্যাজেডির যে ঘটনা তা একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ঘটনা আদি-মধ্য ও অন্ত্যসমন্বিত হয়।

গ. এর যে ভাষা তাতে থাকে আনন্দদায়ক ছন্দ ও গান। অর্থাৎ তার কোনো অংশ ছন্দে ও কোনো অংশ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

ঘ. এর প্রকাশভঙ্গিমা হয় উক্তি প্রত্যুক্তি সমন্বিত, নাটকীয়। কখনই তা বর্ণনাত্মক হয় না।

ঙ. ট্র্যাজেডি এমন এক ঘটনাকে রূপায়িত করে যা থেকে দর্শকচিত্তে Pity ও fear অর্থাৎ অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত হয়। অ্যারিস্টটল একে বলেছেন ক্যাথারসিস।

চ. এর লক্ষ হয় অনুকম্পা ও ভয়ের আবেগবাহুল্য থেকে চিত্তের মুক্তি।

প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্বকেই ট্র্যাজেডির প্রাণ বলেছেন। দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে ট্র্যাজেডি নয়, যদি তা নাটকীয় দ্বন্দ্বাত্মক পরিনাম লাভ না করে। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির যে নায়ক, তার আত্মা পরস্পর বিরোধী ভালো বা সত্যের বা ন্যায়ের দাবী মেটাতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার জীবনে দেখা দেয় ট্র্যাজেডি।

অধ্যাপক ব্রাডলে তাঁর 'Hegel's theory of Tragedy' নামক প্রবন্ধে হেগেলের বক্তব্যকেই অপেক্ষাকৃত নরম সুরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে সব ট্র্যাজেডিতে নৈতিক সমস্যা থাকে না। তিনি ট্র্যাজেডির দু-রকম সমাপ্তির কথা বলেছেন— ক. সমন্বয় পরিণাম— নায়কের সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের একটা রফা ও মিলন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আরও মর্মান্তিক খ. বিপত্তি-পরিণাম বিভক্ত আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিদারুণ প্রয়াস কিন্তু পরিণামে দুর্গতি।

বিশ শতকের নাট্যতাত্ত্বিক রাজর ফ্রাইও তাঁর 'Romance and Tragedy' গ্রন্থে হেগেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সর্বজনীন নৈতিক শৃঙ্খলার ট্র্যাজেডিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উনিশ শতকে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নতুন কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে জীবনে ট্র্যাজেডি তিনটি পথে আসতে পারে— ক. মানুষের নিজের অতিরিক্ত শয়তানির ফলে, যেমন-ইয়াগো খ. অন্ধ ও ক্রুর ভাগ্যের চক্রান্তে, দৃষ্টান্ত রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট গ. মানব চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সংঘর্ষে, দৃষ্টান্ত — কতকটা হ্যামলেট।

আধুনিককালের নাট্যকার ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ প্রমুখের হাতে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হল তার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিকলের কথায় এগুলি পুরোপুরি যুগোপযোগী এবং এখানে মৃত্যু ট্র্যাজিক কিছু নয় এবং এখানে নায়কের অন্তরের মহিমাই মুখ্য।

৭.৪.১৩.২১ : ট্র্যাজেডির নায়ক

নাটকের নায়ক সেই চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে নাট্যাবেগ উৎসারিত হয়, যার মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য রূপায়িত হয় এবং যার সংগ্রামী শক্তির ওপর আমাদের গভীর সহানুভূতি থাকে, যাকে আশ্রয় করে নাটকের অঙ্গীরস অভিব্যক্ত হয়, যার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের জীবনদর্শন প্রকাশ পায়। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির আত্মা ও উদ্দেশ্য যাকে আশ্রয় করে রূপ লাভ করে সেই নায়ক। ট্র্যাজেডিতে নায়ক চরিত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা সর্বাধিক।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির নায়কের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ —

ক. ট্র্যাজেডির নায়ক হবে অতিশয় খ্যাতিমান, সমৃদ্ধিশালী, বা বংশমর্যাদার অধিকারী। সে 'above the common level' হবে।

খ. নায়ক চরিত্রটি প্রবল সম্ভাবনাময় চরিত্র হবে।

গ. সে ভালো মন্দের মাঝামাঝি মনের মানুষ হবে।

ঘ. দৈবের কারণে বা চরিত্রের নিজস্ব কোনো দোষত্রুটির জন্য তার চূড়ান্ত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে। অজ্ঞানতাবশত ভুলের উদাহরণ হিসেবে অ্যারিস্টটল সফোক্লিসের 'ইডিপাশ' নাটকের ইডিপাশ চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যে নিজের অজ্ঞাতে পিতৃহত্যা করেছে এবং নিজ মাতাকে বিবাহ করে তাঁর গর্ভে পুত্র কন্যার জনক হয়েছে। আবার যে ইচ্ছে করেই ভুল করে তার উদাহরণ হিসেবে অ্যারিস্টটল ইউরিপিডিসের 'হিপ্পোলাইটাস' নাটকের ফেড্রা চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

ঙ. ট্র্যাজেডির যে নায়ক হবে তার মধ্যে Doing and suffering থাকবে; আর এই Doing and suffering দর্শক পাঠকের চিত্তে Pity and Fear জাগাবে, যার ফলে তারা নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে।

৭.৪.১৩.২২ : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক

ট্র্যাজেডির নায়ক কোথাও উদ্যমশীল কর্মতৎপর ও অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়, আবার কোথাও নিস্ক্রিয় প্রকৃতির হয়। প্রথম শ্রেণীর নায়ক নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মতৎপর হয় এবং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এস্কাইলাসের অরিস্টিস শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান প্রভৃতি চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় প্রকারের নায়কেরা কর্মতৎপর নয়। এদের মানসিক ও আত্মিক সক্রিয়তা নাটকে প্রকাশ পায় না। শেক্সপীয়রের লীয়র, মধুসূদনের ভীমসিংহ, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা একটা আদর্শে অবিচল থাকার চেষ্টা করে এবং শেষপর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়।

৭.৪.১৩.২৩ : দ্বৈতনায়ক

অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডিতে দুজন নায়কের কথা বলেছেন, এলিজাবেথীয় যুগের কিছু কিছু নাটকে দুজন নায়কের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই সব নাটকে ট্র্যাজিক বোধ জাগে, ঐ দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ থেকে। তিনি শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের ওথেলো ও ইয়াগোকে, 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের সীজার ও ব্রুটাসকে নায়ক বলেছেন। তাঁর মতে, ট্র্যাজেডির নায়ক নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে, নাট্যবৃত্তকে অগ্রগতি দান করে এবং নাটকে সে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে দেখা দেয়। বক্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা আছে, আবার নেই। 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগো সক্রিয় চরিত্র হলেও নিষ্ক্রিয় ওথেলোই নায়ক। অন্যদিকে 'জুলিয়াস সীজার'-এ সীজার ও ব্রুটাস দুজনকেই নায়ক বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'— এর রাবণ ও মেঘনাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

৭.৪.১৩.২৪ : নায়কবিহীন ট্র্যাজেডি

অধ্যাপক নিকল কিছু কিছু ট্র্যাজেডির কথা বলেছেন, যেখানে কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি গলসওয়ার্দির Strife, Justice এবং মিঃ ও ক্যাসির 'Silver Tassie'-র উল্লেখ করেছেন।

এই ট্র্যাজেডিগুলি ট্র্যাজিকবোধ জাগ্রত করে অথচ এগুলির মধ্যে এমন কোনো প্রধান চরিত্র নেই যারা দর্শকচিত্তকে অধিকার করে নায়ক আখ্যা লাভ করতে পারে। আসল কথা এই নাটকে নায়কের নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না, সে একটা শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে উপস্থিত হয়। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' এই শ্রেণীর নাটক।

৭.৪.১৩.২৫ : নারী মুখ্য ট্র্যাজেডি

নারী চরিত্রকে অবলম্বন করেও ট্র্যাজেডি রচনা হয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে আমরা ইলেকট্রা, অ্যান্টিগোন, মিডিয়া প্রভৃতি নারী চরিত্র পাই। শ্রেষ্ঠ She Tragedy তে কোমল স্বভাব নারী থাকতে পারে, তারা নাটকের প্লটের বা বৃত্তের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে না। কিন্তু নায়কের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে নায়িকা রূপে উপস্থাপিত করতে গেলে তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও সক্রিয়তা দেখাতে হবে। 'নূরজাহান' (দ্বিজেন্দ্রলালের) নাটকের নূরজাহান নারী নায়িকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'ও নারী-নায়িকা।

৭.৪.১৩.২৬ : ট্র্যাজেডির ভাব

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল শুধুমাত্র গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির উপর নির্ভর করে ট্র্যাজেডির ভাবসম্পর্কিত আলোচনা করেন। তিনি 'Poetics' গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মূল ভাবের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কখনো 'Pity and Fear' কখনো 'Fear and pity' কখনো 'Pity or Fear' আবার কখনো Fear বা Pity শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি 'অনুকম্পা' ও 'ভীতি' এই দুই ভাবকে ট্র্যাজেডি স্থায়ীভাবে বলতে চেয়েছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতেও তিনি এর উল্লেখ করেছেন। বলা যায় দুইয়ের প্রাধান্যেরই জন্য অন্যান্য পরিচ্ছেদেও Pity or Fear বা Fear or pity কথাগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুকম্পা ও ভয় ট্র্যাজেডির এই দুই প্রধান ভাব জাগ্রত হওয়ার প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডি নায়কের জীবনের বিপর্যয় বা শোচনীয় পরিণামকে যখন অনুচিত বলে বোধহয় তখনই জাগে অনুকম্পা, আর ঐ শোচনীয় পরিণামগ্রস্ত নায়কটিকে যখন আমাদের মতো একজন মানুষ মনে করা হয়, তখনই দর্শকচিত্তে জাগে ভয়।

নায়কের বিপত্তির পরিণামে দর্শকের বিচারশীল মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এই বিপর্যয়কে কখনই ন্যায্য বলে মনে করতে পারে না। নায়কের অনুচিত পরিণামে এক অদৃশ্য রহস্যময় অশুভ শক্তির ওপর

দর্শক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে নায়কের জন্য তার সমস্ত চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে — নায়কের অবস্থাই দর্শকলাভ করে বসে। ফলে জাগে অনুকম্পা।

অ্যারিস্টটল ভীতি জাগ্রত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে বিপর্যয় নায়কের জীবনে দেখা দিয়েছে, তা আমাদের মতো মানুষের জীবনেও ঘটতে পারে। নিজের কথা ভেবেই দর্শক তখন ভয় পায়। এখানে দর্শকের আর বিচরণশীল মন কাজ করে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একই নায়কের শোচনীয় পরিণাম দুই ভাব উদ্বোধনেরই কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যকার হেগেল অ্যারিস্টটলের এই মতকে মেনে নিলেন না। তাঁর মতে ট্র্যাজেডিতে দ্বন্দ্ব থাকবেই। আর নায়ককে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হতেই হবে — শাশ্বত বিচারবোধের রাজ্যে পৌঁছাতে হবে। এই শাশ্বত বিচারবোধই হল ট্র্যাজেডির মূলভাব।

সোপেনহাওয়ার হেগেলের এই মতকে অস্বীকার করে বলেছেন, জীবন অনন্ত দুঃখময়, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ জীবনের প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে সচেতন হয়। একটা বৈরাগ্যের শান্তভাবই চিত্তকে অধিকার করে বসে। এটি ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব। দার্শনিক নীৎসে সোপেনহাওয়ারের এই মতবাদকে অস্বীকার করে ট্র্যাজেডিতে মানুষের ব্যক্তিত্বলোপের সুখাবস্থাকেই স্থায়ীভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিশ শতকে অধ্যাপক নিকল অ্যারিস্টটলের ‘Pity’ ও ‘Fear’ কে গ্রহণ করতে চাইলেন না। তাঁর মতে ভাবাবেগ খুব নিম্নস্তরের ব্যাপার। তাই এগুলি ট্র্যাজেডির মূলভাব নয়। কারণ চোখের জল ফেললেই ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ বা পশুর ক্ষেত্রে আমাদের করুণা দেখানো চলে না তাই ট্র্যাজেডির স্থায়ী ভাব Pity’ ও ‘Fear’ নয়।

আলোচ্য দার্শনিকদের অভিমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবনা থেকে কোনো ট্র্যাজেডি কে দেখেছেন এবং একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই কোনো কোনো নাটকের প্রেক্ষিতে এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক সার্থক ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে উক্ত অভিমতগুলি গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হল শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি দর্শনে একই সঙ্গে কতকগুলি ভাব জাগ্রত হয়। ট্র্যাজিক অনুভূতি দর্শকের এক মিশ্র অনুভূতি। ট্র্যাজেডি নায়কের পরিণাম দেখে আমরা নিশ্চয়ই বেদনা বোধ করি। অনুকম্পা, ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, রহস্যময়তা বা দুর্জ্ঞেয়তা বোধ এবং বৈরাগ্য সব কিছু মিলে ট্র্যাজেডির অভিনয় দর্শকের চিত্তে একটা মিশ্রভাবের সৃষ্টি করে। এই রসবাদে একটিমাত্র মূলভাব, তার সহকারী ব্যভিচারী ভাবগুলির দ্বারা পুষ্ট হয়ে একটিমাত্র রসে পর্যাবসান লাভ করে। এখানে অনুকম্পার সূত্র ধরে বেদনা বা

শোকভাবকে মূলভাব মনে করলে অন্য ভাবগুলি সহকারী বা ব্যভিচারী। আর সেক্ষেত্রে করুণ রসকেই ট্র্যাজেডির মূল রস বলতে হয়। কিন্তু আমরা মনে করি ট্র্যাজেডিতে অন্য ভাবগুলি সহকারী বা ব্যভিচারী নয়। সবগুলিরই গুরুত্ব আছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির ভাব হল মিশ্রভাব।

৭.৪.১৩.২৭ : ক্যাথারসিস

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দান কালে বহু বিতর্কিত 'Catharsis' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে ট্র্যাজেডি ঘটনার দ্বারা Pity ও Fear ভাবকে দর্শকচিত্তে জাগ্রত করে এবং যার ফলে 'অনুকম্পা' ও 'ভয়' ভাবের 'ক্যাথারসিস' সম্পন্ন হয় — অর্থাৎ ভাব বিমোক্ষণ হয়। পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। গিলাবার্ট মারি, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ ব্যক্তি 'Catharsis' শব্দটিকে 'Katharsis' এই বানানে লিখেছেন এবং এর আক্ষরিক অর্থ হল বিশুদ্ধিকরণ বা ভাব বিমোক্ষণ। রেনেসাঁস যুগে ইতালিতে রবারতেল্লি মনে করেছিলেন যে ট্র্যাজেডি দেখে আমরা ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত হই — এই অর্থেই অ্যারিস্টটল Katharsis শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। ইতালীয় সমালোচক জিরাল্ডিসিন্টিও মনে করেছিলেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি Pity ও Fear কে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে এ দুয়ের অনুরূপ ভাবসমূহকে।

কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেছেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি, চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং অ্যারিস্টটল সেই বিশেষ শাস্ত্রের শব্দটি একটি উদ্দেশ্য নিয়েই প্রয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক ডাবলিউ. এম. ডিকসন বিষয়টি নিয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করেছেন। 'Politics' ও 'Problem' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল শারীরিক ও মানসিক নানা ব্যাধি ও তাদের চিকিৎসার কথা বলেছেন বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে Kathersis কে বোঝাতে চেয়েছেন বলে তাঁর ধারণা।

অধ্যাপক নিকল কোনোপ্রকার নীতিঘেঁষা মতবাদ গ্রহণ করতে চাননি। তিনি বলেছেন কোনোরূপ মানসিক, ঔষধ সেবনের জন্য আমরা ট্র্যাজেডি নাটক দেখি না। অভিনয় দর্শনকালে Katharsis বা Purgation এর প্রভাবও আমরা অনুভব করি কিনা সন্দেহ।

অধ্যাপক টমসন 'ক্যাথারসিস' এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রীক ট্র্যাজেডির জন্মকথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার মতে অবদমিত আবেগ মোক্ষণের একটি উপায় হল ট্র্যাজেডি সুতরাং খুব সঙ্গতভাবেই তিনি Katharsis শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

দেখা গেল, 'Catharsis' শব্দটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ। তাই এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তবে আমাদের মনে হয়, মানসিক চিকিৎসা বা নীতিকথা বা অন্যকিছু

নয়। ট্র্যাজেডি অভিনয় দর্শককে এই আনন্দানুভূতির মুখোমুখী করে, দর্শকের ওই আনন্দমন চিত্তাবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে 'ক্যাথারসিস' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ট্র্যাজেডি দর্শনান্তে দর্শকের মধ্যে আনন্দময় অনুভূতি জাগরণে প্রক্রিয়া বা তার ফলাফল।

৭.৪.১৩.২৮ : ট্র্যাজেডির শ্রেণী

অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির প্রধান চারটি রূপের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ক. কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি — যা ঘটনার বৈপরীত্য ও প্রত্যাভিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

খ. প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি —যার উদ্দেশ্য কারুণ্য জাগানো। দৃষ্টান্ত Ajaxes ও Ixions.

গ. এথিক্যাল ট্র্যাজেডি — যেখানে উদ্দেশ্য নৈতিক। দৃষ্টান্ত 'Pelus' নাটক ।

ঘ. সিম্পল ট্র্যাজেডি — এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল কোনো মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন দৃশ্যসর্বস্ব ট্র্যাজেডির কথা বাদ দেওয়া হল, যেমন 'Phorcides' ও 'Promethes' নাটকের দৃশ্যাবলি।

অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থের চতুদর্শ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির আরও দুরকম শ্রেণীর কথা বলেছেন -- মেলোড্রামা ও 'হরর ট্র্যাজেডি'! অ্যারিস্টটলের পরেই ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের জন ড্রাইডেনের কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি ট্র্যাজেডিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন — ক. বিস্ময়মুখ্য খ. ভয়মুখ্য গ. শোকমুখ্য।

অষ্টাদশ শতকে বুমারেকাই বলেছেন ট্র্যাজেডির দুটি শ্রেণী — ক. নিয়তিমুখ্য ট্র্যাজেডি ও খ. বীরত্বমূলক ট্র্যাজেডি। উনিশ শতকের শেষে মোল্টন ট্র্যাজেডিকে Classical ও Romantic এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থে Tragedy -র যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. কোরাস ও ঐক্যমুখ্য গ্রীক ট্র্যাজেডি খ. এলিজাবেথান ট্র্যাজেডি গ. হিরোয়িক ট্র্যাজেডি ঘ. হরর ট্র্যাজেডি ও ঙ. ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি।

৭.৪.১৩.২৯ : ট্র্যাজেডি র বিবর্তন : গ্রীক ট্র্যাজেডি

সুদূর অতীতে গ্রীসেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব এবং সেখানেই এর গৌরবময় সমৃদ্ধি। তিনজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার -- এস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের হাতে ট্র্যাজেডি নাটকের অসামান্য পরিণতি। অবশ্য এঁদের পূর্বে খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে মেসপিসই সর্বপ্রথম ডায়েনিসাসের কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সেকালে নাটকের রূপ ছিল গীতাত্মক।

মেসপিসের পরই এলেন এস্কাইলাস। প্রাচীন ট্র্যাজিকজগতের সার্থক রূপকার এস্কাইলাস। অসামান্য তাঁর কল্পনাশক্তি। ভাবজগৎ ও জড়জগৎকে তিনি করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। অতুলনীয় ছিল তাঁর স্টাইল।

এস্কাইলাসের পরেই এলেন সফোক্লিস। ‘Ajax’, ‘Antigone’, 'Oedipus' ইত্যাদি তাঁর রচিত ট্র্যাজেডি। নাটকে তৃতীয় অভিনেতা যুক্ত করে নাট্যক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলার কৃতিত্ব তাঁরই। এস্কাইলাসের তুলনায় তাঁর নাটকে কোরাসের গুরুত্ব কিছু কম। কিন্তু ট্র্যাজেডি সৃষ্টির আঙ্গিকগত কৌশলে সফোক্লিসই শ্রেষ্ঠ। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি নিখুঁত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর রচনায় গীতি কবিতার মৃদু ও স্নিগ্ধ সৌরভ আছে। ট্র্যাজিক আয়রণি বা নাট্যশ্লেষ প্রয়োগে তিনি খুবই নিপুণ।

ইউরিপিডিস প্রথম রিয়ালিস্টিক ও আধুনিক নাট্যকার রূপে খ্যাত। ‘Suppliant’, ‘Women' 'Medes' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি। ইউরিপিডিসের সংশয়বাদ, প্রচলিত ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা; মতবাদের উদারতা, নারীসুলভ কোমলতা প্রভৃতি তাঁর নাট্যচিন্তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তাই, এস্কাইলাস ও সফোক্লিসের থেকে তাঁর রচিত নাটক ভিন্নধর্মী হয়েছে।

৭.৪.১৩.৩০ : বাংলা নাটক ও গ্রীক ট্র্যাজেডি

বাংলা নাটকে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব পড়েছে। এখানে ট্র্যাজেডি সংঘটনের পিছনে দৈবের প্ররোচনাকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন অবিমিশ্রভাবেই, আবার কেউ কেউ দৈবশক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করেছেন। মধুসূদনের ট্র্যাজিকবোধের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে দৈবশক্তির চক্রান্তকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘কৃষ্ণকুমারী’তে কৃষ্ণার মৃত্যুদণ্ড বা ‘পদ্মাবতী’ তে পদ্মবতীর ভাগ্য বিড়ম্বনা দৈব চক্রান্তেরই যেন প্ররোচনা। ‘মায়াকানন’ তো আদ্যন্ত দৈবশক্তির লীলাক্ষেত্র।

‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ নাটকটির ট্র্যাজেডি, গ্রীক ট্র্যাজেডির কথাই স্মরণ করায়। ‘গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ নাটকে জনার জীবনে, ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘নরনারায়ণ’ এর কর্ণের জীবনে, আলমগীরের

জীবনে এই ধরনের ট্র্যাজেডিই এসেছিল -- রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয়ের মৃত্যু, বিসর্জন-এ জয়সিংহের মৃত্যু-এ সকলের পশ্চাতেও দৈবের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রেরই হাত আছে বলে বোধ হয়।

৭.৪.১৩.৩১ : এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডি

এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম পর্বে নাট্যকারদের মনে মধ্যযুগীয় চেতনা ও ষোড়শ শতকীয় রেনেসাঁস উত্তর মানবিক চেতনা দুয়ের মিশ্র প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। এ সময়ে ট্র্যাজেডির ধারণাটিকে সূত্রাকারে বলা যায় — ক. ট্র্যাজেডি কোনো মহৎ ব্যক্তির পতন খ. হোরেস ও সেনেকার প্রভাবে ধারণা হল, নাটক হবে পাঁচ অঙ্কের। গ. নাটক লেখা হবে পদ্যে। ঘ. নাটকে নীতি থাকবে। এছাড়া এই যুগের রোমান্টিক নাট্যকারেরা ক্লাসিক নাট্যকারদের পৃথক বলে ঘোষণা করেছেন। এই যুগের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন —

৭.৪.১৩.৩১.১ : মার্লো

ম্যাকিয়াভিলির আদর্শে 'অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রিস্টোফার মার্লো' 'Tambarlain', 'Dr Faustus' ইত্যাদি নাটক উপহার দিলেন। নাটকগুলিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট এবং পরবর্তীকালে ঠিক এই পথে কেউ অগ্রসর হননি। তাঁর নায়কেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। Faustus একজন সাধারণ ডাক্তার। এছাড়া মার্লো নীতিকথার প্রশ্নটি মানলেন না। তাঁর নাটকের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়— ক. Blank verse - এর সার্থক প্রয়োগ তাঁর পূর্বে কোনোও নাট্যকার করতে পারেননি। খ. ডঃ ফস্টাসের মধ্যে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন তবে মার্লোর নাট্যগঠনও শিথিল। নায়কের একছত্র প্রাধান্য। স্ত্রী চরিত্র থাকলেও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়নি।

৭.৪.১৩.৩১.২ : শেক্সপীয়র

মার্লোর পরেই শেক্সপীয়র। তাঁর ট্র্যাজেডি বলতে প্রধানত 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' ও 'কিং লীয়র' এই চারটি নাটককে বোঝানো হয়। প্রত্যেক ট্র্যাজেডির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করার মতো । 'ওথেলো' ষড়যন্ত্রমূলক, "লীয়র" নিষ্ক্রিয়-চরিত্রের ট্র্যাজেডি। হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ পৃথক ধরনের ট্র্যাজেডিগুলি বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির বা চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুভূতির দ্বন্দ্বে অপরূপ। হ্যামলেটে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও প্রেমের সঙ্গে নৈতিক দ্বিধা, ওথেলোতে অতিতীব্র আবেগময় প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার লীয়রে অহমিকার সঙ্গে কোমলতর বৃত্তির, ম্যাকবেথে উচ্চাশার সঙ্গে বিবেকজাত অনুভূতির দ্বন্দ্ব লক্ষনীয়। অধ্যাপক নিকল শেক্সপীয়রের নাটকের আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন — ক. অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া। খ. পরিবেশের সঙ্গে নায়কের একটা বিশেষ সম্পর্ক।

৭.৪.১৩.৩২ : বীরত্বমূলক (Heroic) ট্র্যাজেডি

রেস্টোরেশন যুগে জন ড্রাইডেন এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডির সূচনা করেন। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলির অতিরঞ্জিত রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। এখানেও ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব আছে। এর নায়ক চরিত্রের মহনীয়তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য — তবে তা কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না।

৭.৪.১৩.৩৩ : ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি (Horror Tragedy)

ওয়েবস্টার ও ফোর্ডের প্রচেষ্টায় 'ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি' একটি নূতন শ্রেণী এক সময় বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক কমেডির মিল লক্ষ করা যায়।

অধ্যাপক নিকল এই ট্র্যাজেডির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক. রঙ্গমঞ্চে চরিত্রের মাধ্যমে নয় ঘটনার মাধ্যমেই আবেদন সৃষ্টি করা হয়। খ. এতে ভয়-ভাবের উপাদান বেশি থাকে গ. বাহ্য উপাদানগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঘ. নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও তা মুখ্য হয়ে ওঠে না। জন ওয়েবস্টারের 'The Dutches of Mulfi' এই ধরণের ট্র্যাজেডি।

৭.৪.১৩.৩৪ : পারিবারিক ট্র্যাজেডি (Domestic Tragedy)

অধ্যাপক নিকল পারিবারিক ট্র্যাজেডিকে উচ্চমূল্য দিতে চান না, কারণ ট্র্যাজেডিতে নায়কের যে সমুন্নত মহিমা তা এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে থাকে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ট্র্যাজেডি প্রচুর লেখা হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগে 'Arden of Feresham' এর নাটক দিয়েই পারিবারিক ট্র্যাজেডি সূচনা হয় এরপর টমাস হে উডের 'The English Traveller' টমাস ডেকারের 'The Shoemaker's Holiday,' প্রভৃতি পারিবারিক ট্র্যাজেডির ধারাকে সমৃদ্ধ করে।

৭.৪.১৩.৩৫ : নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি

অষ্টাদশ শতকে ফরাসী ক্লাসিক্যাল নাটকগুলি রচিত হয়। কর্নেই ও রাসিন ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কর্ণেই-এর নাটক এককালে বাস্তবতা ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধির জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর রচিত

'Horace', 'Cinna' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি। নাট্যকার রাসিন তাঁর যুগের প্রবণতাকে অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্যিক ভাষার সৌন্দর্য, চরিত্রের মুখে যুগোচিত ভাষা, এপিগ্রাম প্রয়োগের নৈপুণ্য। চরিত্রপ্রকাশক পদ্য ভাষা তাঁকে সমকালীন ফ্রান্সে প্রিয় করে তুলেছিল। প্রেমকেই তিনি ট্র্যাজেডির মূল উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর 'Andromache', 'Britannicus' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি।

অষ্টাদশ শতকে ইতালিতে নব্য ক্লাসিক্যাল শ্রেণির নাটক লিখে আলফিয়েরি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর নাটকে রাজনৈতিক উদ্দীপনার অনুপ্রবেশও লক্ষনীয়। 'Cleopatra', 'Antigone' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি।

৭.৪.১৩.৩৬ : আধুনিক ট্র্যাজেডি

এরপরেই আসে আধুনিক ট্র্যাজেডির ধারণা। এ যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্রমোন্নতি মানুষের অনেক অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করল। প্রেম এখন হয়ে উঠেছে যৌনচেতনারই একটু উর্ধ্বায়ন অথবা প্রজাতিরক্ষার একটা জৈব প্রেরণা মাত্র। জোসেফ উড্‌ক্রাচ — 'The Tragic Fallacy'-তে আধুনিক কালের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরে বললেন যে বর্তমান যুগে ট্র্যাজেডি রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও অল্প হলেও এযুগে ট্র্যাজেডি লেখা হচ্ছে। এই ধরণের রচনায় ভগবান ও মানুষের মাহাত্ম্য অবলুপ্ত হচ্ছে। প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে সাধারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তি। এই কালের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন—

৭.৪.১৩.৩৭ : ইবসেন

ইবসেনের মধ্যে 'বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর 'Ghosts' নাটকটি আধুনিক যুগের পত্তন ঘটিয়েছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা -- 'Pillars of Society', 'A Doll's House', 'The Wild Duck' ইত্যাদি। 'Ghosts' নাটকটিতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক মারাত্মক ব্যাধির কারণে একজন পুত্র কিভাবে তার পিতার গুণপ্রাপ্ত হয়েছিল তারই বর্ণনা রয়েছে। তৎপ্রসঙ্গে তার মাতার পুত্রকে নিয়ে তীব্র জীবনযন্ত্রণার পরিচয় রয়েছে।

৭.৪.১৩.৩৮ : স্ট্রিন্ডবার্গ ও হাউপ্ট ম্যান

স্ট্রিন্ডবার্গ ও হাউপ্ট ম্যান দুজনেই অতিবাস্তবধর্মী ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন। চরিত্রের অজ্ঞাত অবচেতন মনের প্রবণতার দিকে স্ট্রিন্ডবার্গ গুরুত্ব দিলেন। 'মিস জুলিয়া'-তে তিনি দেখালেন

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত একটি মেয়ের ট্র্যাজেডি। হাউপ্টম্যানের 'উইভার্স' নাটকের নায়ক আবার একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি।

৭.৪.১৩.৩৯ : চেকভ

চেকভ নাটকের ক্ষেত্রে নিজস্বতা নিয়ে এলেন। তাঁর রচিত ট্র্যাজেডিগুলির নায়ক সবসময় একটি ঐক্যবদ্ধ দল। জীবনের হতাশা, অবক্ষয় বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার চিত্র তিনি ট্র্যাজেডিগুলিতে দেখিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলির উচ্চাশা বা কামনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর কোনো কিছুর ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মনে করতেন আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ দুইই মানুষের ক্ষতি করে। তিনি প্রকৃত অর্থে বাস্তবধর্মী লেখক।

টি.এস. এলিয়ট কাব্যনাট্যের রচয়িতা হলেও কিছু ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। তাঁর 'Murder in the Cathedral' নাটকটি গ্রীক ধর্মীয় পরিবেশে রচিত হলেও আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত।

৭.৪.১৩.৪০ : সার্ত্রে

Existentialist tragedy-র রূপ আমরা দেখতে পেলাম সার্ত্রের মধ্যে। এই মতবাদে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ভগবান বা প্রকৃতি কারুর দ্বারাই মানবিক মূল্য সমর্থিত হয় না। মানুষ যা করে তার পূর্ণদায়িত্ব তারই, সে পরিবেশের দাস নয়। প্রকৃতপক্ষে সার্ত্রের নাটক এই মতবাদের আলোকেই লিখিত এবং তা বাস্তবধর্মী। রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর কতকগুলি নাটক খাঁটি বাস্তবধর্মী। আর কতকগুলিতে উৎকল্পনার (Fantancy) প্রাধান্য থাকলেও সেগুলি রোমান্টিক নয়। তাঁর 'No Exit', 'The Files' ও 'The Victors' প্রসিদ্ধ নাটক।

৭.৪.১৩.৪১ : ও'নীল

আমেরিকার ও'নীলও বাস্তবধর্মী ট্র্যাজেডি লিখেছেন। তাঁর 'The Iceman Cometh' তেমন সফল নয়। কিন্তু ত্রয়ী নাটক 'Mourning becomes Eleotra' তে তিনি গ্রীক কিংবদন্তীকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত করে চমৎকার রূপ দিয়েছেন।

৭.৪.১৩.৪২ : বাঙলা ট্র্যাজেডি

নিকল ট্র্যাজেডির যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন আমাদের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তা ঠিক প্রযোজ্য হবে না। আমাদের মনে হয় বাঙলা ট্র্যাজেডিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা সমীচীন যথা —

ক. ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি

খ. সামাজিক বা পরিবারিক ট্র্যাজেডি

গ. পৌরাণিক ট্র্যাজেডি

ঘ. সমস্যামূলক ট্র্যাজেডি

পাশ্চাত্য ট্র্যাজেজ্ডির তুলনায় আমাদের বাংলা ট্র্যাজেডির বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত অনুজ্জ্বল তবু ট্র্যাজেডিশূন্য নয়। বাঙালি নাট্যকাররা নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করতে গিয়ে বেশকিছু ট্র্যাজেডি নাটক লিখেছেন। পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডির আদর্শে সেগুলির বিচার করলে হয়তো দোষত্রুটির শেষ থাকে না। কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও তার স্বভাব ধর্মের কথা স্মরণে রেখে যদি পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি বিচারের কঠোর আদর্শকে কতকটা শিথিল করে নেওয়া হয়, তাহলে কিছু সার্থক ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত চয়ন করা সম্ভব। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি নাটকে আমরা দেখি চরিত্রই ব্যক্তি বিশেষের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। শেক্সপীয়রের এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের সুনামের প্রতি লোভ, অভিমান ও নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসহীনতাই মূলত তার ট্র্যাজেডির কারণ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'— নাটকে সাজাহানের অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্য, 'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহানের অতিরিক্ত উচ্চাশা; যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' নাটকে রাক্ষস রাবণ ও ব্রাহ্মণ রাবণ — এর দেহ আত্মার প্রবল সংঘর্ষ, বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদনের অপরিমেয় উচ্চাশা ও মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার সংঘাত প্রভৃতি শেক্সপীরীয় ট্র্যাজিডির আদর্শঅনুসারী বিষয়।

৭.৪.১৩.৪৩ : মেলোড্রামা (Melo Drama) বা অতিনাটক

বাংলায় মেলোড্রামার পরিভাষা করা হয়েছে অতিনাটক। পরিভাষাটি ত্রুটিপূর্ণ। অতিনাটক কথাটিতে মেলোড্রামার সব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলেনা। আমরা তাই মেলোড্রামাকে আপাতত মেলোড্রামাই বলছি।

Melos শব্দটির অর্থ হল গান। গ্রীক Song ও ফ্রেঞ্চ drame এ দুটি শব্দ মিশিয়ে Melodrama হয়েছে। মেলোড্রামা বলতে তাই আক্ষরিক অর্থে গানে ভরা বা গীতিময় নাটকই বোঝায়। একটা সময়

ছিল যখন মেলোড্রামা বলতে সঙ্গীত সহযোগে অলঙ্কৃত ও আবৃত্তিযোগ্য কোনো কিছুকেই বোঝানো হত। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে অপেরার উৎপত্তি ও বিকাশ দেখা দিয়েছিল ইতালীতে। অপেরাকেই তখন ইতালীতে বলা হত মেলোড্রামা। প্রায় এক শতাব্দী ধরে সেখানে অপেরার প্রতিশব্দ ছিল মেলোড্রামা। এমন শব্দটির সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ দাঁড়িয়েছে বিশেষ নাট্যপ্রকরণ, অন্য অর্থে ট্র্যাজেডির একটি শ্রেণী।

অধ্যাপক নিকল মনে করেন মেলোড্রামা হল এক ধরনের গুরুগম্ভীর নাটক যাতে বেশ কিছু গীতিকবিতা থাকে এবং যা অনেকটা অপেরার সগোত্র। নিকল মেলোড্রামা সম্পর্কে আরও যে সব কথা বলেছেন তার সার কথা এই রকম —

১. গান, দৃশ্য ও ঘটনার গুরুত্ব এতে প্রাধান্যলাভ করবে।

২. ঘটনার ওপর এতে অনুচিত জোর দেওয়া হবে।

৩. অন্তর্ভেদী বা গভীর চরিত্র বিশ্লেষণ বা গভীর আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস এতে থাকবে না।

৪. চরিত্রগুলিকে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যদান করার কোনো প্রয়াস থাকবে না।

৫. অতিরঞ্জিত উপাদান যথেষ্ট থাকবে।

৬. এতে দর্শকদের মনে ক্রমান্বয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা থাকে এবং আগাগোড়া অভিনয়টি হয় নাটুকেপণাপূর্ণ। মেলোড্রামাকে সাধারণভাবে ট্র্যাজেডির একটি শ্রেণী বলে মনে করা হলেও মেলোড্রামা ঠিক ট্র্যাজেডি নয়। দুই এর মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে —

"মেলোড্রামা হল আকস্মিক দুর্বিপাকমূলক সাহিত্য। (Literature of disaster)। এখানে নায়কের জীবনে যে দুর্ভোগ দেখা যায়, তা আসে সম্পূর্ণ ভাবে বাইরের থেকে; কিন্তু ট্র্যাজেডিতে তা আসে ভিতর থেকে। মেলোড্রামায় মানুষই দুর্ঘটনার শিকার ; কিন্তু ট্র্যাজেডিতে মানুষ নিজেকে অথবা অপরকে দুর্ঘটনার শিকার করে। মেলোড্রামায় মানুষের নৈতিক গুণ একেবারেই গৌণ, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে তা মুখ্য এবং নাট্যঘটনার উৎস। মেলোড্রামাতে মানুষ সমগ্র কিন্তু মহৎ নয় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। ট্র্যাজেডিতে মানুষ বিভক্ত, এখানে দ্বন্দ্ব শুধু বাইরের নয়, ভিতরেও। মেলোড্রামায় দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের বা মানুষের সঙ্গে কোনো বস্তুর মধ্যেই সীমিত। মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা দুইই দেখানো হয় এখানে। মেলোড্রামায় নায়ক জয়ী বা পরাস্ত। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে নায়ক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ী। মেলোড্রামায় নায়ক নিরীহ, শান্ত অথবা দোষী, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে সে একই সঙ্গে নিরীহ ও দোষী। তাছাড়াও মনে রাখতে হবে যে, মেলোড্রামায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় এবং এর ঘটনার যে পরিনাম দেখানো হয় তার মধ্যে ঘটনাগত কার্যকারণ যোগ থাকে না— উত্তেজনাময় ঘটনা বা পরিস্থিতি স্থাপনের জন্য নাট্যকারের খেয়াল খুশির প্রাধান্য থাকে।" [১]

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি রচনার চেষ্টা ব্যর্থ হলে মেলোড্রামার সৃষ্টি হয় কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ট্র্যাজেডি রচনার ব্যর্থতা থেকে মেলোড্রামা সৃষ্টি হতে পারে, আবার মেলোড্রামা রচনার সচেতন অভিপ্রায় থেকেও তা লেখা যেতে পারে। যেমন— কেটাজিবুর 'Misan thropy and Repantance', 'Poverty and Nobleness of Mind'— ব্যর্থ ট্র্যাজেডির সূত্রে মেলোড্রামাসৃষ্টির উদাহরণ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক দুটিকে মেলোড্রামা রচনার সচেতন প্রচেষ্টা থেকে জাত মেলোড্রামা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৭.৪.১৩.৪৪ : একাঙ্ক নাটক

আমাদের বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক একটি নতুনতর নাট্য আঙ্গিক হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি নতুন হলেও কালের বিচারে একাঙ্ক কিন্তু অভিনব কোনো নাট্যআঙ্গিক নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এর বহুল প্রচলন ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যেও এই ধরনের নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রাচীন ওইসব নাটকগুলির তুলনায় আধুনিক একাঙ্ক নাটকের একটা নিজস্বতা নিশ্চয়ই আছে। সংস্কৃতে একাঙ্ক শ্রেণীর নাটকের মুখ্য অভিমুখ ছিল আয়তনের সংক্ষিপ্ততার দিকে। অর্থাৎ ব্যায়োগ মানেই আকারে সংক্ষিপ্ত হবে, সংক্ষিপ্ততাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন ধারণা প্রাধান্য পেত। আধুনিক একাঙ্ক নাটকও আয়তনে সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সংক্ষিপ্ততা এর প্রধান নাট্যবৈশিষ্ট্য নয়। ভাব প্রকাশে, চরিত্র নির্মাণে, ভাষা ব্যবহারে একাঙ্ক নাটকের এমন একটা নিজস্বতা আছে যা দেখে সাধারণ পঞ্চাঙ্ক নাটকের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্যকে সহজে চিনে নেওয়া যায়। একাঙ্ক নাটকের এই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক বৈশিষ্ট্য, যেমন —

- ❑ একটিমাত্র বিষয় বা ঘটনা সংস্থানের সংহত নাট্যরূপায়ণ কাহিনী উপকাহিনীর শাখায়িত বিস্তার এখানে থাকে না।
- ❑ চরিত্রের বিকাশ, চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির বিস্তৃত প্রকাশ দেখানোর সুযোগ এখানে নেই, অথচ তার প্রয়োজন আছে। স্বভাবত নাট্যকার সংহত পরিসর ভাব ও ভাষার তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে চরিত্রকে যতদূর সম্ভব আলোকিত করেন।
- ❑ ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা প্রভৃতির প্রভাবে এখানে ঘনীভূত নাট্যরসের জাগরণ ঘটে। অন্যদিক থেকে বলা যায় সংক্ষিপ্ততা ও বাহুল্যবর্জনের অত্যধিক প্রবণতা এর কেন্দ্রসংহতিকে অনিবার্য করে তোলে, অনেকটা গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের মতো।

- ❑ গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের ভাষা ঠিক সাধারণ সমাজভাষার মত হয় না। সংকেত, প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহারে এর যেমন একটা নিজস্বতা তৈরি হয়, একাঙ্ক নাটকের ভাষাতেও সেই নিজস্বতা থাকে। এ ভাষার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ঘটনা ও চরিত্রের গভীর পর্যন্ত আলোকিত হয়।

- ❑ দ্রুতগতি কাহিনী ও বিকাশশীল চরিত্রের সহযোগে কোনো একাঙ্কিকায় ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণের সূত্রে নাটকীয় শীর্ষবিন্দুকে চূড়ান্ত করে তোলার বিষয়টি অনেকটা 'a monument's of monument'

- ❑ আধুনিক একাঙ্কিকার অন্যতম প্রধান লক্ষ একালের মানুষের চিত্ত সংকট বা ট্র্যাজিক অনুভূতিকে ধরা। আর তার জন্য প্রয়োজন কোনো একটি নির্দিষ্ট মানুষের জীবনবৃত্তের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা মাত্র তাই সাধারণভাবে চরিত্রআশ্রয়ী হয়।

একাঙ্ক নাটকের পরিসর যে একটি অঙ্কের মধ্যে সীমায়িত থাকবে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর সময়সীমা নিয়ে। কতক্ষণ স্থায়ী হবে একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। চল্লিশ মিনিট? এক ঘন্টা? কারও মতে এই সময়সীমা হওয়া উচিত আরও বেশি, কারও মতে আরও কম। আমাদের মনে হয় এইরকম নিক্তিতে সময় মাপার প্রবণতা ঠিক নয়। সংহতপরিসর একাঙ্ক নাটকের অত্যাবশ্যক শর্ত। এই অত্যাবশ্যক শর্ত মেনে রচিত কোনো নাটকে অভিনয়ে যত সময় লাগা প্রয়োজন ঠিক তত সময়ই দিতে হবে। বাইরে থেকে সময় বিষয়ে বাধা নিষেধ আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। তবে যেহেতু অভ্যন্ত সংক্ষিপ্ত আয়তনের সেইহেতু এর অভিনয়ে একঘন্টার বেশি সময় লাগবে না বলে ধরেই নেওয়া যায়।

জার্মান নাট্যকার লেসিড্ এর 'Dil Judan' প্রথম উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। বাংলায় এই ধারার নাটকের মধ্যে রয়েছে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', বনফুলের 'শিককাবাব' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুধু বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাসাহিত্যে এখন একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আর এর মূলে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর মানুষের জীবনানুভূতি।

৭.৪.১৩.৪৫ : গণনাট্য

গণনাট্যর মূলে রয়েছে বস্তুতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামী জীবনবোধ, গভীর রাজনীতি সচেতনতা, বৃহত্তর অর্থে মার্ক্সীয় জীবনাদর্শ। গণ্যনাট্যের অনুসারী ভাবের নাটকের প্রচলন ইউরোপে ছিল না এমন নয়, তবে স্বতন্ত্র নাট্য প্রকরণ হিসেবে গণনাট্য বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব ও বিকাশের মূলক্ষেত্র বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের কোলকাতা শহর। ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই কোলকাতায় 'প্রভাতি লেখক সংঘ' নামে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তা রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এ'। 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র কোনো কোনো সদস্যের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ সালের ২৫শে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian peaple's Theatre Accociation, IPTA)। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল

মার্ক্সীয় ভাবনা অনুসারে শোষিত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল। আই. পি. এর উদ্দেশ্য ভাবনার সঙ্গে ওই ইস্তাহারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে আই.পি.টি.এ একদল চিন্তাশীল, মানবদরদী মানুষের বহুদিনের চিন্তা চেতনার ফসল। নানা ক্ষেত্র থেকে রসদ সংগ্রহ করে তৈরি হয়েছে এর ভিত্তিভূমি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্যরা যখন কাজ শুরু করেন তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ এক অশান্ত পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল এদের জয়যাত্রা। তবে পরিস্থিতির চাপ রুদ্ধ করতে পারেনি এঁদের চলার পথ। নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তাঁরা অগ্রসর হন দৃঢ়পদে। আর তাঁদের নেতৃত্ব দেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য সহ নানা বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে 'নবান্ন' নাটক রচনা করলে সূত্রপাত হয় বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের।

বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মী বৃন্দ 'নবান্ন' ছাড়াও আরও যেসব নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে গণনাট্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যথা —

ক. সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এক কথায় সর্বহারা মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী এর মূল আশ্রয়।

খ. এখানে থাকে দুটি প্রধান শ্রেণী-বুর্জোয়াও সর্বহারা। দুই শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ নাটকে চূড়ান্ত মাত্রা পায় এবং শেষপর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণী জয়লাভ করে।

গ. সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম করে বলে গণনাট্যের মধ্যে উদ্দেশ্য মুখীনতা প্রাধান্য পায়। 'আর্ট ফর আর্ট সেক' এই নীতি গণনাট্যের শিল্পীরা মোটের উপর অস্বীকার করেছেন। আর্ট যার মেন সেক নীতির বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাঁদের নাটকগুলিকে গড়ে তুলেছেন শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে।

ঘ. শোষিত মানুষের সংগ্রাম ও জয়লাভের কাহিনী নাটকের প্রধান অভিমুখ। অথচ দর্শকের বাস্তব অভিজ্ঞতা তার বিপরীত। এই অবস্থায় গণনাট্যে একটা কৃত্রিমতা আসার সম্ভাবনা থাকে। ওই সীমাবদ্ধতা থেকে নাটককে মুক্ত করার জন্য নাট্যকার সচেতন ভাবে শোষক শ্রেণীর অত্যাচার অবিচারের কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেন। যাতে দর্শকের মনে এই ভাবনা প্রাধান্য পায়, বিষয়টি বাস্তব না হলেও বাস্তবে এমনই হওয়া উচিত। অর্থাৎ যেন নাটকের ইতিবাচক পরিণতি দেখার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ঙ. গণনাট্যের লক্ষ ব্যক্তি নয় সমষ্টি; শোষিত লাঞ্ছিত সর্বহারা সমাজের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মুক্তি। তাই এখানে নায়ক চরিত্র প্রাধান্য পায় না। জনগণই এখানে এক অর্থে নায়ক অন্য অর্থে গণনাট্য নায়কহীন।

চ. গণনাট্য দাঁড়িয়ে থাকে সর্বহারা শ্রেণীর জীবনচিত্র ও জীবনবাস্তবতার ভিত্তির উপর। এদের জীবনের নানা খুঁটিনাটি দিক খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা থাকে এখানে।

ছ. গণনাট্যের ভাষা ও সংলাপ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। সর্বহারা শ্রেণীর জীবনছন্দের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের চেষ্টা থাকে বলে এখানে ভাষাকে যতদূর সম্ভব মানুষের মুখের ভাষায় কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশী, লোকজ, অশ্লীল, সবই সমান গ্রহণ যোগ্যতা পায়।

জ. গণনাট্যের অভিনয়ের নেপথ্যে কোনো বাণিজ্য বুদ্ধি কাজ করে না। তাই দর্শককে অতিরিক্ত চমৎকৃত করার জন্য মঞ্চসজ্জার বাহুল্য থাকেনা। খরচ-খরচা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করার বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।

৭.৪.১৩.৪৬ : নবনাট্য

গণনাট্য সমকালে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর অন্তর্নিহিত একটা ত্রুটির দিক ছিল। এখানে উদ্দেশ্য প্রাণতার দ্বারা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হতেন নাট্যকার। কোনো উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসার পর গণনাট্য কর্মীদের কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা উদ্দেশ্যের পদতলে শিল্পের সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিতে আর উৎসাহ বোধ করেন না। সুতরাং শুরু হয় বিতর্ক। বিতর্ক পরিণত হয় বিরোধে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কঠোর আদর্শ থেকে সরে আসেন একদল শিল্পী। তাঁরা একই সঙ্গে একদিকে যেমন শোষিত নির্যাতিত মানুষের হয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পের সৌন্দর্যকে ও বজায় রাখার শপথ নেন। অর্থাৎ তাঁরা সাহিত্যকে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ততোদূর পর্যন্ত চালিত করেন যতদূর পর্যন্ত চালনায় সাহিত্য-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত হানি না ঘটে। নবনাট্য গণনাট্য সংঘের ওই বিশুদ্ধ কর্মীদের নাট্য-কলমের চূড়ান্ত ফসল।

নবনাট্যের নাট্যাদর্শ নিয়ে সমকালে অনেক আলোচনা হয়েছিল। নাট্যকার কিরণ মৈত্র বলেছিলেন - "এ নাটকের বিষয়বস্তু আর এক নাটকের বিষয়বস্তু হবে না। হলেও বিচার বিশ্লেষণে, বক্তব্যে সে ভিন্ন হবে। চরিত্র সৃষ্টিতে, গঠন পদ্ধতিতে সে একক হবে। আমি তাকেই নবনাট্য বলব যা আমাকে বিস্মিত করে, চমকিত করে, সম্মোহিত করে" বোঝা যাচ্ছে গণনাট্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য নাট্যকাররা কতটা ব্যাকুল হয়েছিলেন। গতানুগতিকতা ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে আপোসহীন অবস্থানে দৃঢ় হয়েছিলেন তাঁরা। আর সে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁদের নাট্যসৃষ্টিতে।

নবনাট্য কর্মীদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার' প্রতিনিধি স্থানীয় নবনাট্য। নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে নবনাট্যের নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে —

ক. নবনাট্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপোস করে না। শিল্পে সৌন্দর্য এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

খ. নাট্যকার সামাজিক মানুষ; মানুষের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা আছে। ওই দায়বদ্ধতার কারণে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেন।

গ. শোষক-শাসিতের সংগ্রাম গণনাট্যের মতো নবনাট্যেরও অন্যতম প্রধান বিষয়। কিন্তু গণনাট্যের মত এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শোষিত শ্রেণীর জয়লাভ দেখান হয় না।

ঘ. কোনো বিশেষ চরিত্র নবনাট্যে নায়ক হয়ে উঠতে পারে, আবার জনগণেরও এখানে নায়ক হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই।

ঙ. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে নবনাট্যে নাট্যকার বাস্তবতার ভিত্তির উপর দৃঢ় থাকতে পারেন। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য বাস্তবতার কোনো অতিরঞ্জিত চিত্রণ এখানে থাকে না।

চ. মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে নবনাট্যে কোনো বাধাধরা নিয়ম অনুসরণ হয় না। প্রয়োজনে নাট্যকার মঞ্চসজ্জার উপর গুরুত্ব দেন, প্রয়োজনে মঞ্চসজ্জার বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন।

ছ. ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে নবনাট্য গণনাট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোনো কৃত্রিম কাব্যভাষা এখানে গ্রাহ্য নয়। সমাজ বাস্তবতার গভীর থেকে তুলে আনা হয় নাট্যভাষার সূত্র।

ঝ. রস পরিণতির দিক থেকে নবনাট্যের বিষাদান্ত বা করুণ রসাত্মক হতে কোনো বাধা নেই। নাট্যঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি যদি বিষাদান্ত হয় তবে নাট্যকার স্বচ্ছন্দে বিষাদের স্রোতে পাত্রপাত্রীকে, সেই সঙ্গে দর্শককে ভাসিয়ে দিতে পারেন।

নবনাট্য, গণনাট্যসহ বর্তমান অধ্যায়ে আরও যে সব নাট্যরূপ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা করা হল তার বাইরেও অনেক নাট্যরূপ প্রচলিত আছে। যেমন — লোকনাট্য, মাস্ক, প্যান্টোমাইম, মরালিটিপ্লে, ইন্টার লুড, মিরাক্‌ল প্লে নানা কারনে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ অলোচনা করা গেল না। উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু একটু সংকেত সূত্র তুলে ধরা হল —

৭.৪.১৩.৪৭ : লোকনাট্য

প্রচলিত নাট্যরূপগুলির সবই প্রায় শিষ্ট সমাজের মানুষের সৃষ্টি। লোকনাট্য শিষ্ট সমাজের মানুষের রচনা নয়। গ্রামের লোকসাধারণ তাদের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুখে মুখে নাটকগুলি রচনা করে এবং বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিজেরাই অভিনয় করে।

মাস্ক :

এটি একটি প্রাচীন ধারার নাটক। এখানে পাত্রপাত্রীরা মাস্ক বা মুখোস পরে অভিনয় করতো এবং নাট্যদ্বন্দ্ব অপেক্ষা গীতিধর্মিতা প্রাধান্য পেত।

প্রান্টোমাইম :

অঙ্গভঙ্গি বিশেষত মুখাভিনয় নির্ভর এক ধরনের প্রাচীন ধারার নাটক। এখানে সংলাপের গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে কম; অঙ্গভঙ্গিই ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন।

মিরাক্‌ল প্লে :

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রচলিত সাধু, সন্ত বা এক কথায় ধর্মীয় পুরুষদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। নাটকীয়তা সৃষ্টি অপেক্ষা এখানে ধর্মকথা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি প্রাধান্য পায়।

মরালিটি প্লে :

অনেকটা মিরাক্‌ল প্লের মতো, ধর্ম কথাশ্রিত ও নীতিশিক্ষামূলক। এর চরিত্রগুলি রূপকধর্মী। পাপ, পুণ্য, শুদ্ধ মানবতা প্রভৃতির রূপক হিসেবে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন থাকে।

ইন্টারলুভ :

মিরাক্‌ল প্লে বা মরালিটি প্লের মতো ছোট মাপের নাটক। তবে কোনো ধর্মকথা এখানে থাকে না, থাকে না নীতিশিক্ষা দানের প্রবণতাও। দর্শককে নিছক আনন্দ উপহার দেওয়া এর লক্ষ।

ঠিক নাট্যরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আবার একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ও নয় এমন দুটি নাট্য বিষয় হল গ্রুপ থিয়েটার ও থার্ড থিয়েটার। এগুলি নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের দেশে অভিনয়ের যে প্রাচীনতম রীতিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাকে আজকের পরিভাষায় বলা যেতে পারে ফাস্ট থিয়েটার। ফাস্ট থিয়েটারে নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শক ও অভিনেতা--অভিনেত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না।

অনেকটা বর্তমানে লোক সমাজে প্রচলিত লোকনাট্যের মত। লোকনাট্যের অভিনয়ে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকদের মধ্যে মিশে থাকে। নিজের অভিনয়ের কালে উঠে গিয়ে অভিনয়ে অংশ নেয়, অভিনয় শেষে আবার দর্শকের মধ্যে ফিরে আসে। অভিনয়ের জন্য কোনো বাধা মঞ্চ এখানে থাকে না। খোলা একটা জায়গাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফার্স্ট থিয়েটার পরে বিবর্তিত হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার, সেখানে একটি স্থায়ী সুসজ্জিত মঞ্চ থাকে, দর্শকের বসবার জন্য থাকে নির্দিষ্ট আসন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের থেকে সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। ফার্স্ট থিয়েটারের যে সহজ অভিনয় পদ্ধতি তা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বজায় থাকেনি। একটা কৃত্রিমতা থেকেই যাচ্ছিল। ওই কৃত্রিমতা নাট্যশিল্পের পক্ষে উপযোগী নয়। বিশেষত আধুনিক যুগে নাটককে যখন খুব বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে। এক্ষেত্রে দর্শক ও অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ অত্যন্ত জরুরী। অথচ প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তার বিশেষ সুযোগ নেই। স্বভাবত পরিকল্পনা হয় এক নতুন অভিনয় পদ্ধতির। এই নতুন পদ্ধতিরই অন্যনাম থার্ড থিয়েটার, থার্ড থিয়েটারে কোনো বাধা মঞ্চ থাকে না, অভিনেতা অভিনেত্রী সামান্যতম উপকরণ ব্যবহার করে অস্থায়ী কোনো মঞ্চে (মঞ্চ অবশ্য স্থায়ীও হতে পারে) দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগ বজায় রেখে অভিনয় কর্ম সম্পন্ন করে। যাত্রা বা লোকনাট্য মেকাপের বা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অঙ্গ সজ্জার ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়। থার্ড থিয়েটার এইসব বাহুল্য বর্জিত অভিনয় রীতি। কোনো অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য এখানে মুখ্য নয়। নূন্যতম খরচ-খরচা চালানোর জন্য অভিনয় শেষে দর্শকের উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ্রুপ থিয়েটার ঠিক থার্ড থিয়েটারের মত নয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারও থার্ড থিয়েটারের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রুপ থিয়েটারের অবস্থান। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নেপথ্যে কাজ করে বিরাট বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। লাভের প্রশ্নটি এখানে বড় কথা। গ্রুপ থিয়েটারে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। নাটককে যারা ভালোবাসেন, যারা অভিনয়কে নিজেদের স্বপ্ন ও সাধনার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে পারেন এমন দু-চার জন নাট্যকর্মী প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাণিজ্যিক আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করেন। এঁরা নিছক দর্শক মনোরঞ্জন বা লাভালাভের কাছে নিজেদেরকে বিকিয়ে না দিয়ে নিজেদের রুচি -- বুদ্ধি -- অভিনয় ক্রিয়াকে সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করেন। 'বহুরূপী', 'নান্দনিক' প্রভৃতি বাংলাদেশের বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার।

৭.৪.১৩.৪৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। একশ বছরের বাংলা থিয়েটার -- ড. শিশির বসু

২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস -- ড. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও একশ বছরের নাটক -- ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস -- ড. দর্শন চৌধুরী

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাস -- ড. অজিত কুমার ঘোষ

৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস -- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। নাট্যতত্ত্ব বিচার -- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৮। সংলাপ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ — অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.৪.১৩.৪৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কমেডির সংজ্ঞা দাও। ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য নিরূপণ করো।

২। কমেডির বিভিন্ন শাখার পরিচয় দাও।

৩। প্রহসন কাকে বলে ? বাংলার বিশিষ্ট প্রহসনকারদের নাম ও একটি করে প্রহসনের উল্লেখ করো। প্রসঙ্গত একটি কালজয়ী বাংলা প্রহসনের পরিচয় দাও।

৪। ট্র্যাজেডির নায়ক বিচার কর। দ্বৈত নায়ক, নিষ্ক্রিয় নায়ক সম্পর্কে, উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৫। আধুনিক বিদেশী ট্র্যাজেডি নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বাংলায় রচিত তিনটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডির পরিচয় দাও।

৬। মেলোড্রামা বা অতিনাটক বলতে কি বোঝো, তা জানাও।

৭। গণনাট্য ও নবনাট্যের মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৮। একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণ করে যেকোনো একটি একাঙ্ক নাটকের গঠন শৈলীর উপর আলোকপাত করো।

———

একক - ১৪

প্লট, চরিত্র, দৃশ্য, সংগীত

বিন্যাস ক্রম :

৭.৪.১৪.১ ঃ উদ্দেশ্য

৭.৪.১৪.২ ঃ ভূমিকা

৭.৪.১৪.৩ ঃ প্লট

৭.৪.১৪.৪ ঃ নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ

৭.৪.১৪.৫ ঃ নাট্যচরিত্র

৭.৪.১৪.৬ ঃ নাট্যসংলাপ

৭.৪.১৪.৭ ঃ নাট্যসংগীত

৭.৪.১৪.৮ ঃ ত্রয়ী ঐক্য

৭.৪.১৪.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৭.৪.১৪.১০ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১৪.১ ঃ উদ্দেশ্য

নাটক যৌথ শিল্প (Multiple Art) -- তাই তার রচনার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে নাট্যকারের প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা নাটকের প্লট, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, রস, পরিণতি প্রভৃতির কৌশল সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তার একটাই উদ্দেশ্য, সেগুলি অনুসরণ করে নাট্যকাররা যাতে, সঠিক আঙ্গিকে এমন সৃষ্টি করতে পারেন যাতে পাঠক ও দর্শকরা আকৃষ্ট হতে পারে।

৭.৪.১৪.২ ঃ ভূমিকা

প্রাচ্য নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা সংস্কৃত ভাষায় নাটকের Form বা গঠন, তার রস, Critics, Fallacy সম্পর্কে যা বলেছেন তার অনেকটাই পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্ববিদ্ আরিস্টটল, হুডোল, পিকক্, এগরি, নিকল, ব্রাজল ও লুকাসের নাট্যকৌশল ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মেলে, তাই ভরতমুনি, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ধনঞ্জয় প্রমুখের নাট্যতত্ত্ব জানা জরুরী। এখানে নাট্যবিষয় ভাবনার দিক থেকে নাট্যতাত্ত্বিকদের নির্দেশ আমরা বুঝে নিতে চাই।

৭.৪.১৪৩ ঃ প্লট

নাটকের কাহিনী বিন্যাস বা Plot নির্মাণ নিয়ে অ্যারিস্টটল থেকে নিকল, লুকাস, সাধন কুমার ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখরা নানা মন্তব্য করেছেন। এইসব মতামত একত্র করলে আমরা কয়েকটি গ্রহণযোগ্য সূত্র পাই। সেগুলি হল ঃ

১. নাট্যকাহিনীকে সবসময়ই গতিময় (action) হতে হবে।

২. নাট্যপ্লটে যতবেশি দ্বন্দ্ব (conflict) থাকবে ততই দর্শক খুশি হবে।

৩. নাটকের Plot - এর তিনটি স্তর --- begining, middle এবং end.

৪. প্লটের সাফল্য নির্ভর করে নাট্যপরিণতির যথাযথ উপস্থাপনায়। একে বলা হয় Dramatic excellence.

৫. নাট্যপ্লটের উৎকর্ষতা নির্ভর করে কাহিনীর ত্রয়ী ঐক্যের উপর ঃ Unity of Time, Unity of Place, Unity of Action.

৬. মূল প্লটের সঙ্গে এক বা একাধিক Sub-Plot বা উপকাহিনী থাকতে পারে। Unity of Action বলতে শুধু একমুখীন কাহিনী জরুরী নয়।

পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস ও দেববিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং সংস্কারাগত ধর্মাদর্শ পৌরাণিক নাটকের গঠনকর্মে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নাটকের গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার নয়, কেননা নাটকের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘকালীন ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করতে হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, দর্শকের রসানুভূতিতে ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি আঘাত সৃষ্টি যেন না করে। ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে নাট্যকাহিনী গঠনে অসুবিধা জাগার অবকাশ কম। কেননা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে প্রাপ্ত উপকরণের মধ্যে নাটকীয় জটিলতা সৃষ্টির প্রভূত সুযোগ বর্তমান। পৌরাণিক নাটকে একদিকে যেমন সীমিত উপকরণ অন্যদিকে তেমনি উপকাহিনী - যোজনা এবং নূতন চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সামাজিক নাটকে কাল-ঐক্য (Unity of Time) এবং স্থান-ঐক্য (Unity of Place) প্রায় সর্বত্র রক্ষিত, ঐতিহাসিক নাটকে 'কালাতিক্রমণ' দোষ মাঝে মাঝে ঘটলেও নাটকের তীব্র গতিময় ঘটনা সেই ত্রুটিকে প্রায়শ চাপা দিয়ে দেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এই ত্রুটি ঘটে এবং নাট্যকারের পক্ষে তা অস্বীকার করার পথ থাকে না। পুরাণ-কথিত কাহিনীর এই ত্রুটি এড়িয়ে গেলে আবার পৌরাণিক নাট্যাদর্শের বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

ঐক্যবিধি সম্পর্কে T.S.Elliot বলেছেন — I believe they (unities) will be found highly desirable for the drama of the future., ... The Unities do make for intensity.

— 'Selected Essays', New York, 1932, P - 58.

পুরাতন নাট্যধারায় পঞ্চসন্ধির মধ্য দিয়ে নাট্যপ্লট গঠিত হত। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পৌঁছে দেখা গেলো নাট্যকাহিনী যতোই ব্যপ্ত হোক না কেনো, উপকাহিনী কমল এবং কাহিনী হল একমুখী। প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' কেমন সফল দেখা যাক্।

গ্রামনির্ভর নাটকটির কাহিনীবৃত্তের শুরু অবশ্য শহরের দৃশ্য দিয়ে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, কিছু Flash back -এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই শহরে বন্ধুর গৃহে যখন রহিম প্রবেশ করে তখনই জানা যায় পড়া ছেড়ে চাষের কাজে রহিমের অনিবার্য আত্মনিয়োগের কারণ, তার পারিবারিক সুখ, মহিম ও রহিমের বাল্যের মধুর সম্পর্কের কথা। এ দৃশ্যে মহিম যখন তাকে দিলরুবা উপহার দেয়, তখন রহিমের উক্তি --

'দিলরুবা নামেও ভাল, কামেও ভাল। বাইজের আওয়াজ ঠিক মাইনবেরের মতও।' এই সংলাপের একাংশ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, দারিদ্র্যের কারণেই রহিমের সংগীত আরাধনা এতদিন রুদ্ধ হয়েছিল। নাটকটির নামকরণের যাথার্থ্য বুঝতে হলেও এই দৃশ্যের উদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয়।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। এটিকে আমরা অ্যারিস্টটল অনুসারে Rising action -এর উদারহণ হিসেবে ধরতে পারি। গ্রামে ফিরে এসে রহিম হাকিমের গরু খোঁয়াড়ে পাঠাল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূচনা। বোঝা যাচ্ছে, দুজনের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি হচ্ছে ---

হাকিম ঃ মাথা তোর অনেকদিন হয় গরম হইছে।

রহিম ঃ কিসে গরম দেখিলেন?

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। রহিম ও ফুলজানের মনোরম সংলাপের মধ্যে হাস্যরসের ছোঁয়া লেগেছে রহিমের কিনে আনা ফুলজানের জুতো পরা ঘিরে। এখানে দ্বন্দ্বময় নাটকে কিছুটা Comic relief -এর ছোঁয়া পায় দর্শক। কিন্তু এই পরিবেশের তার অকস্মাৎ ছিঁড়ে যায় যখন হঠাৎ চুরির সাজানো প্রসঙ্গটি জানা যায়। ইতিমধ্যে গোবিন্দ ও শ্রীমন্ত ফিরে এসে রহিমের শক্তি বাড়িয়েছে। দৃশ্যটিতে সাজানো চুরির অভিযোগের বিরুদ্ধে রহিমের প্রতিবাদ লক্ষ করার মত ঃ

রামেশ্বর ঃ ঘরের ভিতর মাচার নীচে মাটির উপর ছিল হুঁজুর ... দেখা যাইতেছিল।

দারোগা ঃ (ভদ্রলোককে) দেখুন তো?

ভদ্রলোক ঃ (দেখে) এটা আমাদের জিনিস।

(রহিমুদ্দী হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে হাকিমুদ্দীর গলা টিপে ধরল)

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী দর্শকদের হাকিমুদ্দীর কাছারিঘরে পৌঁছে দিয়ে তার ভণ্ডামির মুখোশ খুলতে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে অসুস্থতার কারণে রহিম তীব্র অর্থসঙ্কটে পড়েছে, যার ফল অনাহার। দৃশ্যটিতে প্রেসিডেন্ট ও হাকিমের গোপন পরামর্শ সেকালের সামাজিক-রাজনৈতিক জগতে গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধার নগ্নচিত্র রয়েছে। দৃশ্যটি Dramatic crisis -এর পূর্বাভাস।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য। খবর আসে জোতদার হাকিমুদ্দীর ধানকল লুঠের; নাট্যদর্শকরা টান টান উত্তেজনায় আরও দেখে হাকিম-প্রেসিডেন্টের গোপন চুক্তির সর্বনাশা রূপ। এটিকে climax -এর বিন্দুতে পৌঁছানোও বলা যায়। রহিমুদ্দীর স্বপ্নের মতো খণ্ড খণ্ড ভাবনা এবার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিয়ে একটা সম্ভাব্য লড়াই রচনা করবে বলে ভাবা গিয়েছিল।

Climax -এর ধারা চলবে ফুলজান ও বসিরকে ফুলজানের ফুফার বাড়িতে রেখে আসায়। আবার একই দৃশ্যে ফুলজানকে ফিরিয়ে এনে নাট্যপ্লটের গতি দ্রুত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। Climax তখনই শীর্ষচূড়ায় পৌঁছোল যখন (১) ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির বসিরকে কিছুতেই রহিম লঙ্গরখানায় নিয়ে যেতে পারল না (২) ফুলজান একা লঙ্গরখানায় গেল এবং প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে এল। এবার রহিম অন্তর্দ্বন্দ্বে সত্যিই বিপর্যস্ত, ফুলজানের প্রতি বসিরের প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি তার প্রমাণ --

ঘুম গেইছে। ভোখে আউলী গেইছে না তাতেই। জাগি উঠি যখন খাবার চাইবে তখন? --- হা! খোদা!

Climax -এর শেষ পর্যায়ে রহিম হঠাৎ যেন ভ্রান্তির রাজ্যে চলে গেল। সে Error of Judgement -এর শিকার হল। ফুলজানকে তালাক দিয়ে, বসিরকে নিয়ে, সদরের পথে চলল। দর্শকের কানে ফুলজানের আর্তনাদও ঘুরতে লাগল --

ঘর আর মোর তো নয়।

অধিকাংশ গণনাট্যকারই মন্বন্তর -এর সর্বনাশা রূপ কিভাবে গ্রামের গরিব কৃষিজীবী মানুষদের সংসার তছনছ করে দিয়েছিল তার মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। তুলসী লাহিড়ীর বর্তমান নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, Falling action -এর শুরু। রহিম আবার কলকাতায় বাল্যবন্ধু মহিমের বাড়ি এসে একটা চাকরি করছে,

দেখা যাচ্ছে। তবে সে বেশিদিন শহরে থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় দৃশ্যেই তার গ্রামে ফেরা। তবে এই দুই দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিশেষ একটা এগোয়নি। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে হঠাৎ কাহিনী ঘটনার ঘনঘটায় সংঘর্ষমুখী হয়ে উঠল। এই নাট্যপরিণতি বা Cathersis অংশটি এরকম -- বসিরের অসুস্থতা; কানা ফকিরকে সাময়িকভাবে বিয়ে করে রহিমের ঘরে ফুলজানের ফিরে আসার তীব্র কামনা। দুটি বিষয় অতি দ্রুত বর্ণনার পর এল শেষ crisis! রহিম হাদিস-এর নির্দেশ মানতে রাজী নয়। তাই কানা ফকিরের সঙ্গে অর্থ নিয়ে দরকষাকষি। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম একটি প্রতিবাদী মুসলমান যুবককে পেলাম যে হাদিস-এর খেলাপ করে, স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছাড়তে চেয়েছে। গণচরিত্রের এই নতুন ভাবনা নাট্যকারের গভীর আশার প্রকাশ। কিন্তু ফুলজানের আপত্তি ও অনেকটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীর বাস্তব প্রকাশ, যদিও সে ভাবেনি তার এই আপত্তিতে বিপর্যস্ত রহিম শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে।

'ছেঁড়া তার' নাটকের শেষে রহিমের পারিবারিক জীবনের যে তার ছিঁড়ে গেল, তারও একটা শিক্ষা আছে। এর আগেও আর একটি তার ছিঁড়ে ছিল, অনাহারে রহিমের মায়ের মৃত্যুতে। কিন্তু রহিমের এই যে মৃত্যু, তা নিশ্চয়ই হাকিমুদ্দীর সঙ্গে তার পরাজয় বলে নয়, বরং বলা যায় হাকিমদের বিরুদ্ধে সে সব সময়ই প্রতিবাদ করে গেছে। গ্রাম-নগরের মধ্যে একটা সেতু গড়ে, গণচরিত্রের প্রগতিশীল বিকাশের পরিচয় রেখেছে।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ব্রেখটই প্রথম দৃশ্যাঙ্গিকের বদল ঘটালেন, কিন্তু তার ফলে প্লটের বিন্যাস আহত হয়নি। প্লট সম্পর্কে ফ্রেতাগ, লুকাস, ব্রাডলে প্রমুখরা যে সব তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন তা অ্যারিস্টটল-এর বক্তব্য ও সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধি, -- কোথাও নস্যাৎ করা যায়নি।

৭.৪.১৪৪ ঃ নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ

নাটকের অঙ্কবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম এইজন্য, ঘটনার পৌর্বাপর্ব এবং কার্যকারণের যোগ একমাত্র অঙ্কবিভাগের দ্বারাই রক্ষিত হতে পারে। অঙ্কের পর অঙ্ক এগিয়ে যায় আর নাটকীয় কাহিনী দ্রুতি লাভ করে। নাটক যেহেতু কবিতা অথবা উপন্যাসের মত কল্পনার দ্যুতিবিলাস নয় তাই নাটকের কাহিনীকে অঙ্ক এবং দৃশ্যে পর পর সাজিয়ে ঘটনার ধারাকে পর্বে পর্বে ভাগ করতে হয়। নাট্যকারকে যেমন কাহিনীর অগ্রগতির জন্য অঙ্ক বিভাগ করতে হয়, তেমনই প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে ঘটনা স্থাপনের জন্য আবার দৃশ্য (গর্ভাঙ্ক) বিভাগ করতে হয়।

সচরাচর নাটক পঞ্চাঙ্ক হওয়া উচিত বলেই মনে হয়। ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' দেখিয়েছেন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ঘটে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে -- প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ। ইউরোপীয় নাটকেও Exposition, Rising action, climax, falling action এবং Catastrophe --এই পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়ে পঞ্চাঙ্ক সৃষ্টির নীতি অনুসৃত। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই অনুসরণ করে, কারণ গ্রীসের দীক্ষাবিধির অনুষ্ঠানটি পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়েই সম্পন্ন হত। নাট্যকার সেনেকার (খ্রিঃ পূঃ ৪ - খ্রি পর ৬৫) সময় থেকেই পঞ্চাঙ্ক বিভাগরীতি পাকাপাকিভাবে প্রথা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

অ্যারিস্টটল নাটকের যে ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন তার মধ্যে সর্বশেষ তথা ষষ্ঠ উপাদান দৃশ্য। দৃশ্য সম্পর্কে অ্যারিস্টোটল বলেছেন "The spectacle has indeed, an emotional attraction of its own, but of all the parts, it is the least artistic and connected least with the art of poetry' অর্থাৎ তাঁর মতে এই উপাদানটি নিজস্ব একটি আকর্ষণ থাকলেও সব উপাদান গুলির মধ্যে এর শিল্পমূল্য সর্বাপেক্ষা কম এবং কাব্য কলার সঙ্গে এর সম্পর্কটি ও যথেষ্ট দূরবর্তী। তাঁর মতে নাট্যকারের অপেক্ষা মঞ্চতত্ত্বাবধায়কের অধিকার অনেক বেশি। কারণ "the production of spectacular effects depends more on the art of the stage machinist than on that of the poet" অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা দ্বারা উদ্দীপন বিভাব সৃষ্টি করা বা পাত্র-পাত্রীর আকুতি ও অবস্থা নিদর্শন করায়, কবির কৃতিত্ব অপেক্ষা দৃশ্যসজ্জাকারীর কৃতিত্বই বেশি প্রকাশ পায়। এজন্য অধিকাংশ নাট্য সমালোচক দৃশ্যকে বহিরঙ্গ উপাদান বলে মন্তব্য করেছেন। তা সত্বেও আমরা নাটকে দৃশ্য গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ নাট্যকারের পরিকল্পনাটি আসল ভূমিকা নেয়। সেই পরিকল্পনা নাটকের কাহিনী, চরিত্র, ভাবনা, সংলাপ মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়কে প্রভাবিত করতে সহায়তা করে ও প্রণোদিত করে। সেক্ষেত্রে " বিশেষতঃ নাটক যখন দৃশ্য অর্থাৎ অভিনেয় কাব্য - অভিনয় যখন আঙ্গিক বাচক- আহার্য ও সাত্ত্বিক এবং আহার্যাভিনয়ে - মঞ্চ মায়া সৃষ্টির বিশেষ একটি স্থান আছে, তখন নাট্যাভিনয় থেকে দৃশ্য যোজনাকে একেবারে বর্জন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। পরিবেশ সৃষ্টিতে দৃশ্যেরর মর্যাদা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।"

যেকোনো উৎকৃষ্ট শিল্প মাত্রই রসোত্তীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাটকের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম নয়। গ্রীক অভিনয়েও যেমন দৃশ্যসজ্জা ছিল, তেমনি প্রাচ্য নাট্যসাহিত্যেও তা লক্ষণীয়। কিন্তু অ্যারিস্টোটলের মতে শুধু দৃশ্যসজ্জার দ্বারা যে রচনার রস উদ্রিক্ত করা হয় সে রচনার শৈল্পিক মূল্য ও গুরুত্ব অবশ্যি কম। তা মতে যে সব নাটকে ‘Spectacular element’ এর প্রাধান্য, তাদের নগণ্য বলে অভিহিত করেছেন। দৃশ্যাত্মক উপাদানের প্রাধান্য, গান বাদ্যকে রস সঞ্চারের উপায় হিসাবে ব্যবহার অর্থাৎ বাহ্য উপায়ের প্রয়োগ, হেয় নাটকের লক্ষণ বলেই গণ্য হয় এবং

ক্রমে এই জাতীয় দৃশ্যাত্মক উপাদান প্রধান, চমকপ্রদ, পরিস্থিতি সর্বস্ব, বাহ্য উপায় সহায় গভীর জীবন সমালোচনা বিরহিত নাটককে 'মেলোড্রামা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অ্যারিস্টোটলের ট্রাজেডির শ্রেণিবিভাগের মধ্যেই এই ধরণের (মেলোড্রামা) আভাস পাই। যেমন আমরা যদি বাংলা 'নীলদর্পন' নাটকের কথা ধরি। তাহলে দেখব দীনবন্ধুর এই উদ্দেশ্যমূলক নাটকটির পরিণতি অনেকক্ষেত্রেই মেলোড্রামাটিক হয়েছে। বারংবার দৃশ্যায়ন ও তাতে ঘটনার বাহুল্য মৃত্যুর মিছিল করুণ রসের আধিক্য শেষ পর্যন্ত নাটকটিকে মেলোড্রমায় পরিণত করেছে।

গ্রীক নাটকের মতো বাংলাতেও প্রথমে যাত্রা পালাগানের ধারায় উৎসারিত নাটকে অভিনয় থাকলে দৃশ্যভেদ ছিল না। অর্থাৎ সজ্জা থাকলেও দৃশ্যপট ছিল না। অভিনয়ের অনেক পরে দৃশ্য থাকে কিন্তু তা নামেই, বইয়ের পাতায়। বাস্তবে দেখব আসরে থাকা দুটো চেয়ার। পাত্র-পাত্রীর মুখের উল্লেখেই আমরা দেখব খালি –আসর হয়ে যায়প্রাসাদ, পথ-ঘাট, রাজপ্তহ, আর চারিদিকে খুশির বন্যা বয়ে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'চিত্রপট' অপেক্ষা চিত্তপটকেই বেশি পছন্দ করতেন। যে কারণে তাঁর অধিকাংশ নাটকেই দৃশ্যপটের কোনো বাহুল্য নেই, সে শারদোৎসব, কিংবা অচলায়তন, মুক্তধারা, ডাকঘর প্রায় সব নাটকেই। দৃশ্যপটে নয়, চিত্তপটেই উদ্ভাসিত হয় রসালোক। রবীন্দ্র অনুগামী কিংবা রবীন্দ্রানুসারী নাট্যশিল্পীগণ অনেকেই অভিনয়কে দৃশ্যসজ্জা ও যন্ত্রীদের হাত থেকে মুক্তির স্বাদ দিতে আগ্রহী। এ কারণে আমরা দেখব বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে নাটক যেমন নাট্যরীতির নিয়ম নিগঢ়ে বাঁধা থাকত, ধীরে ধীরে তা ক্রমশই শিথিল হয়েছে। যে মধুসূদনের বিশুদ্ধ ট্রাজেডিতেই, অথবা গিরিশচন্দ্র কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলিতেও আমরা যে শেক্সপীয়রীয় পঞ্চমাঙ্কের দৃশ্যসজ্জা দেখি, তা কিন্তু গণনাট্য, নবনাট্য কিংবা গ্রুপ থিয়েটার, থার্ড থিয়েটারের প্রভৃতি নাট্যকলায় তার অনেকটাই শ্লথ গতি লক্ষণীয়।

আসলে বাংলা নাটকের সূচনাপরবে মূলত সমাজকে জীবন্ত করার প্রয়াসে যে অনুকরণ হয়েছিল সেখানে অভিনয়ে থেকে আনুষাঙ্গিক বিষয়ের আতিশয্য ছিল অনেক বেশি। তাই দৃশ্যে দৃশ্যে সজ্জা বদল, পটবদল এগুলো আমাদের চোখে পড়ে অনেক বেশি। যেটা প্রয়োজনীয়ও ছিল সে সময়। আস্তে আস্তে দর্শক ও শ্রোতা যখন এই শিল্পেত সঙ্গে পরিচিত হল তাদের আত্মিক সংযোগ ঘটল, তখন উঁচু পাটাতনের দৃশ্য পথে নেমে এল। তাই আমরা দেখি বর্তমানে নাটক অনেকবেশি মননশীল জায়গায় পৌঁছে গেছে। সঙ্গে এর দৃশ্যসংখ্যাও স্বল্প স্বল্পত্র হয়েছে। তাই

মুহূর্তের মধ্যে কোনো বাহুল্যছাড়াই অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত হয় বিকল্প ধারার থার্ড থিয়েটারের নাটকগুলি এবং ইন্দ্রজিৎ, ভানুমতীর খেল, লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী প্রভৃতি। যা নাট্যধারার সবথেকে আধুনিক চিন্তাপ্রসূত শিল্প নিদর্শন। উৎপল দত্ত, বাদল সরকার প্রমুখ এই ধারার অনন্য পথপ্রদর্শক।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে তাহলে দৃশ্য –কল্পনা কি অনাবশ্যক? আসলে ক্ষেত্র বিশেষে এর লঘু গুরু বিচার করা সম্ভব। যেমন বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন, দেবীগর্জন এসব নাটকগুউলি হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ মননের ফসল। সমকালীন সামাজিক সমস্যা যেমন দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালো-বাজারি, মুনাফাদার, জোতদার, প্রভৃতি সংকটকে প্রতিরোধের জন্য সংঘবদ্ধ হোয়ার যে আহ্বান তাই নাটকগুলির উপজীব্য। যেকারনে দৃশ্যপট খুব সাধারণ বলা যায় একেবারেই বাহুল্যহীন, কখনো গ্রামের রাস্তা, কখনো জোতদারের আঙ্গিনা, কখনোবা কলকাতার রাজপথের ডাস্টবিন। এইসব জীবন্ত বাস্তব ছবিকে নাট্যকার নাটকে দৃশ্যায়িত করার জন্য কোনো অতিরঞ্জন এবং আতিশয্যের প্রয়োজন ছিল না। কারণ সেইসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ মিশে ছিল এসবের সঙ্গে। যেকারণে দৃশ্যসজ্জা প্রায় ব্যতিরেকেই এগুলি ছিল সফল নাটক।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে সূত্রধরের প্রবেশ ও প্রস্থানের পর নাটকের মূল কাহিনীর সূচনার নির্দেশ একাধিক বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুসৃত হয়েছে। সামাজিক নাটকেও রামনারায়ণ এই নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। তবে পঞ্চাঙ্ক রীতির কথা 'নাট্যশাস্ত্রে' জোর দিয়ে বলা হয়নি -- পাঁচটির কম বা বেশী অঙ্কও থাকতে পারে। এই বিষয়টি নির্ভর করে নাটকীয় ঘটনার 'সন্ধি'র উপর।

অঙ্কবিভাগের দিকে সংস্কৃত নাট্যকারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলনা। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' পঞ্চাঙ্ক নাটক, কিন্তু 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে' আছে সাতটি অঙ্ক। ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধনারায়ণ' চার অঙ্কের নাটক কিন্তু 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' ছটি অঙ্ক আছে। ভবভূতির 'মালতীমাধবে' দশটি অঙ্ক, 'মহাবীর চরিত' এবং 'উত্তর রামচরিতে' সাতটি করে অঙ্ক। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (দশটি অঙ্ক), ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (ছ-টি অঙ্ক), শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' (ছ-টি অঙ্ক) এবং শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (চার অঙ্ক) পঞ্চাঙ্ক রীতি-অনুসারী নয়। একমাত্র ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' পঞ্চাঙ্ক নাটক।

পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক নাটকের অন্যতম স্তম্ভ এসকিলাসের প্রথম নাটকে (The suppliants) পঞ্চসন্ধি পরিকল্পনা দেখা যায় না। সফোক্লিসের নাটকে প্রলোগ, প্যারোড, এপিসোড এবং একসোডাস্-এর দ্বারা চারটি অঙ্কসদৃশ বিভাগ প্রথম দেখা যায়। সেনেকার নাটকেই প্রথম অঙ্কবিভাগ শুরু হয় এমন দাবী উঠলেও বলা যায় তাঁর পূর্বে অঙ্কপরিচ্ছন্ন নাটক ছিল। আলেকজান্দার - সমকালীন কমেডি রচয়িতা মিনান্দার পঞ্চাঙ্ক রীতি অনুসরণ করতেন।

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁর সন্তান মার্লোর 'Dr. Faustus' নাটকে অঙ্ক বিভাগ নেই, এই রীতি পরবর্তীকালে টমাস হার্ডি, বার্নার্ড শ' এবং গলসওয়ার্দির নাটকে দেখি। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এঁদের নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে। অন্যদিকে অনন্যপ্রতিভা শেক্সপীয়রের অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাগ রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই (১৬০৬ -- ৮৪) ও রাসিনের (১৮৩৯ --৯৯) নাটকেও দেখি। এঁদের নাটকগুলি প্রধানত পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই বিন্যস্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে নাটকীয় আঙ্গিক নিয়ে বহুমুখী গবেষণা চলতে থাকে। নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮ -- ১৯০৬) যেমন দশ অঙ্কের নাটক (Emperor and Galiban --১৮৭৩) লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন একাঙ্ক (The Warrior's Barrow ১৮৫০-এ অভিনীত) নাটক। তিন, চার এবং পাঁচ অঙ্কের নাটকও তিনি লিখেছিলেন। সুইডেনের নাট্যকার আগষ্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯ - ১৯১২) চমৎকার একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য পরিকল্পনায় নতুন নতুন দিক্‌নির্দেশ দেখা দিতে থাকে। অস্কারওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) যেমন একাঙ্ক ট্র্যাজেডি ('Salome') লেখেন, তেমনি লেখেন দৃশ্যবিহীন চার অঙ্কের নাটক 'The Ideal Husband' । এর আগেই টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯১৮) লিখেছিলেন -- ১৯ টি অঙ্ক এবং ১৩০ টি দৃশ্য বিভক্ত দুইখণ্ডে ধৃত 'The Dynasts' নামক মহানাটক।

বলা ভাল যে প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় কাহিনীর বিষয়বস্তুর উত্থান এবং পতনের প্রতি তাকিয়ে নাটকের অঙ্ক এবং দৃশ্যসজ্জা করে থাকেন। তাই একাঙ্ক থেকে শুরু করে পঞ্চাঙ্ক নাটক সাধারণত দেখা

যায়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের অবয়ব গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই রীতি প্রায়শ দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্ক নাটক, 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দ্ব্যঙ্ক নাটক, 'বৃষকেতু' একাঙ্ক নাটক, আবার 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকটি মাত্র ন-টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ।

বাংলা যাত্রার অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের কোনো প্রয়োজন যাত্রা রচয়িতাগণ অনুভব করতেন না। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রাগুলিতে অঙ্ক ও দৃশ্যসজ্জা নেই। কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদ যাত্রা'র শুরুতে একটি গৌরচন্দ্রিকা ও একটি প্রস্তাবনা মাত্র আছে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় নাটকের মত অঙ্ক নির্দেশ রচয়িতা নিজে করেননি, তাঁর পালাগুলির সম্পাদক পাঁচকড়ি দে এই অঙ্কবিভাজন করেছেন। ব্রজমোহনের অনেকগুলি যাত্রার নাটকের ন্যায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক - বিন্যাস আছে, কিন্তু তাঁর রামাভিষেক, শতস্কন্ধ-রাবণবধ ইত্যাদি পালায় এই রীতি অনুপস্থিত। তাঁর যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্যনির্দেশও সম্ভবত তাঁর যাত্রা-সংকলয়িতার ইচ্ছা-সঞ্জাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যাত্রার ভিতরে গীতাভিনয়ের শিল্পশৈলী অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মতিলাল রায়, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ বসু, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রমুখের যাত্রাপালায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক অথবা দৃশ্যবিভাগ ব্যবহৃত। কিন্তু এ কথা সত্য, নাটকের মত যাত্রায় জীবনদ্বন্দ্ব তত তীব্র নয়। নাটকে ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে 'সন্ধি' থাকে তার চিহ্নিতকরণের জন্য অঙ্ক - দৃশ্য বিভাগ থাকা চাই -- এই 'সন্ধি' যাত্রার কাহিনীতে থাকে না। সেইজন্যই যাত্রায় অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কম।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'ভদ্রার্জুন' লিখতে গিয়ে নাট্যকার তারাচরণ ভূমিকায় লিখেছিলেন -- "..সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) অ্যাক্ট কহে, কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে।"..... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকে সুপণ্ডিত তারাচরণ দৃশ্যের পর দৃশ্য ব্যবহারের মধ্যদিয়ে মহাভারতীয় কাহিনীর গভীরে গতি সঞ্চারে সফল হয়েছিলেন। দৃশ্যগুলির সংক্ষিপ্ততা নাটকের উৎকর্ষ বাড়িয়েছিল। 'মনে হয়, তারাচরণ নাটকখানি অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন; কারণ, ব্যবহারতঃ অভিনয়ের অনুপযোগী কোনো দৃশ্যেরই তিনি ইহাতে সমাবেশ করেন নাই। সেইজন্যই মনে হয়, একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' অবশ্য নাটকটির কোনো অভিনয়ের সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায়নি।

তারাচরণের নাটকে যেমন 'Scene' শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' ব্যবহৃত, জি.সি.গুপ্তও তেমনি তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকে 'Scene' এর পরিবর্তে 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে 'Scene' এর নামকরণ করেছেন -- অঙ্গ। যেমন প্রথম অঙ্ক, প্রথম অঙ্গ; দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্গ ইত্যাদি। মধুসূদন কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়ই পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক বিভাগ করেছেন। রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে এইভাবে ঘটনাসজ্জা না করলেও পরবর্তী নাটক 'নবনাটকে' একই রীতি মেনে নিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রারম্ভ যুগের সামাজিক নাটকেও নান্দী ও সূত্রধর রীতি, প্রস্তাবনা ইত্যাদি রক্ষিত। গীতাভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক রীতিকে মনোমোহন অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তিনি 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নামক সামাজিক নাটকেও 'প্রস্তাবনা' যুক্ত করে নট ও নটীর মধ্যস্থতায় নাট্যকাহিনীর সূচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে আঙ্গিককে কখনোই প্রাধান্য দেননি। তাঁর 'সীতার বিবাহ' তিন অঙ্কের নাটক, মোট গর্ভাঙ্ক সংখ্যা কুড়ি। একটি 'সূচনা' দৃশ্যও আছে। 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্গ নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা বারো। তৃতীয় অঙ্কে একটির বেশী গর্ভাঙ্ক নেই। 'পাণ্ডবগৌরব' পঞ্চাঙ্ক নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা তিরিশ। নাটকের শেষে 'পট-পরিবর্তন' নামে একটি ক্রোড় অংক যুক্ত করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের লক্ষ ছিল অংকের পর অংক সাজিয়ে নাটকীয় কাহিনীস্থলে দ্রুতিসঞ্চার করা। সেক্ষেত্রে তিনি প্রায়শ সফল।

আধুনিক নাট্যমঞ্চরীতির সূচনা রুশ স্তালিস্কাভাস্কির সময় থেকে। নাটকের অঙ্কদৃশ্যের প্রথাবদ্ধতা তখন থেকেই অস্বীকার শুরু হল। এলো একাঙ্ক, তিন অঙ্কের নাটক। এমন নাটকও পেলাম যেখানে কেবল দৃশ্য আছে, অঙ্ক নেই। আসলে রোঁমা রোলার Peoples Theatre এবং ব্রেখটের Epic Theatre -এর আদর্শে অঙ্কদৃশ্যের এই বদল সবচেয়ে প্রভাবিত করে গণনাট্যকারদের।

বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' নাটকের গঠন সম্পর্কে তৎকালীন গণনাট্যের অভিনেতা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

প্রথাসিদ্ধ পাঁচ অঙ্ক রীতি এখানে মানা হয়েছে, যদিও অঙ্কের সংখ্যা চার। নাট্যপ্লটের মধ্যে অ্যারিস্টটল কথিত পাঁচটি বাঁক আছে। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য Introduction। ঘটনাস্থল আমিনপুর। অঙ্কের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বন্যা-মন্বন্তর-দাঙ্গা প্রসঙ্গ এসেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য Rising action! ঘটনাস্থল স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতায়; রাজপথে গ্রামের কৃষকদের দুরবস্থার নাট্যচিত্র। তৃতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য -- এখানেই climax! শহরের অভিজ্ঞতালব্ধ আমিনপুরের কৃষকদের আবার গ্রামে ফেরার তৎপরতা। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য -- Falling action এবং Catastrophe! সকলে আবার আমিনপুর গ্রামে ফিরে এল। প্রাঙ্গণ নবান্ন উৎসবকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এবার থেকে কৃষকরা সম্মিলিতভাবে চাষ করার শপথ নিল। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সঙ্কল্পও নিল।

এই নাটকের দৃশ্যগুলি পর পর সাজানো বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। কিন্তু নাট্যকাহিনী যে ক্রমপরম্পরায় অগ্রসর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আসলে প্রথাসিদ্ধ ভাবে নাটকটির গঠন বা আঙ্গিক বিচার করতে গেলে ভুল হবে। বরং কাল-গণচেতনা, চরিত্রগুলির নাটকীয় অভিব্যক্তি, ঘটনার নাটকীয়তা এবং সংলাপের অভিনবত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে 'নবান্ন' নাটকের শিল্পশৈলীর সাফল্য অনুভব করা যাবে।

৭.৪.১৪৫ ঃ নাট্যচরিত্র

সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন ধারায় গঠনশৈলীর তুলনায় নাট্যধারার গঠনশৈলী যথেষ্ট জটিল। ঔপন্যাসিক, কবি অথবা প্রাবন্ধিক তাঁদের বর্ণিত বিষয়কে নিজ মননের আলোকস্পর্শে বর্ণনা করে যান, কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব-রীতি অনুসরণ তাঁদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নাটক রচনার সময় অঙ্কদৃশ্যসজ্জা, সংগীত, সংলাপ এবং রসের প্রতিষ্ঠায় যেমন নাট্যকারকে সদা সচেতন থাকতে হয় তেমনই কাহিনী এবং চরিত্রকে দুটি সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নাটকের কাহিনী এবং চরিত্রই প্রাণ — নাট্যকার আমাদের

মত সম্মুখ সারির দর্শকমাত্র। যে নাটকের কাহিনী যত বেশী জটিল এবং চরিত্রসমূহ যত বেশী দ্বন্দ্বদীর্ণ, সেই নাটক ততবেশী প্রাণবন্ত। নাট্যকাহিনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, চমৎকারিত্বে এবং আবেগে নাট্যচরিত্র যতবেশী দোলায়িত হয়, উপন্যাস অথবা আখ্যানকাব্যে চরিত্রের বিকাশের সে সুযোগ থাকেনা। নিরবচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ধীরে ধীরে তার মনের অন্দরমহলের দ্বারটি উন্মুক্ত করে দেয় এবং কখনও মহৎ, কখনও অসৎ কখনও বা ভাল-মন্দ মিশ্রিত চরিত্রের নাট্যপরিণতি দেখে দর্শক তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকার সুন্দর কাহিনী নির্বাচন করেছেন, গভীর নাট্যরসের জন্য সুন্দর সংলাপও ব্যবহার করেছেন কিন্তু চরিত্রের বিকাশ সমভাবে না হওয়ায় নাটকটি কাম্য পরিণতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় নাটকে কাহিনীর যেমন স্থান, চরিত্রেরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কাহিনী এবং চরিত্র --- নাটকে এই দুটি মুখ্য উপাদানের ভিতর কোনোটির স্থান উচ্চে এ নিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক এবং নাট্যকারগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকের নায়কের স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেও কাহিনী এবং চরিত্রের ভিতর কোনোটির গুরুত্ব বেশী সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো অভিমত দেননি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারে দেখা যায়, কাহিনীই এই নাটকগুলিতে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সক্রিয় এবং চরিত্রগুলি কাহিনীর আবর্তে পড়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। সেজন্য এই শ্রেণীর নাটকে কি অতিমানব, কি ব্যক্তিচরিত্র — এর কোনোটিরই একটি নিটোল নাট্যচরিত্র রূপে বিবর্তন সম্ভব হয়নি। অবশ্য ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সম্পর্কে এই উক্তি সর্বত্র সম্ভব নয়।

নাট্যশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত অ্যারিস্টটল কাহিনীকেই নাটকের আত্মা বলেছেন। তাঁর মতে জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটক হাজির হয় এবং সেইজীবনের আগাগোড়াই ঘটনাময়। জীবনেরই সূত্র ধরে আসে চরিত্র (''Character comes in a subsidiary to the actions.'')। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, একমাত্র সুচারু কাহিনীই ভাল ট্র্যাজেডির জন্ম দিতে পারে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, চরিত্রের অভাবে ভাল করুণ-রসাত্মক নাটক লেখা যায় কিন্তু করুণ-রসাত্মক কাহিনীর অনুপস্থিতিতে ভাল চরিত্রের সাহায্যেও ট্র্যাজেডির ঘনীভূত রসসৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল -- ''Again if you string together a set of speeches, expresive of character and well finished in point of diction and thought you will not produce essential tragic effects nearly so well as with a play, which however, deficient in these respects, yes has a plot and artistically constructed incidents.'' গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত রচিত নাটকে ঘটনার স্থানটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান।

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যসমালোচক জন ড্রাইডেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমালোচক হেনরি আর্থার জোনস্ --- এঁরা দুজনেই অ্যারিস্টটলের মত থেকে দূরে সরে গিয়ে বলেছেন নাটকের প্রধান উপকরণ হল চরিত্র। নাটকে ঘটনার বর্ণনা আড়ম্বরের সঙ্গে করা হল কিন্তু চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি নেই -- সেক্ষেত্রে নাটকটিতে অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। হাডসনও বলেছেন -- ''Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.''

প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাহিনীর রসের বিকাশ ঘটে কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং বক্তব্য অথবা ভাবের বিকাশ ঘটে চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ঘটনাহীন চরিত্র যেমন নাটকে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনা তেমনই চরিত্রহীন ঘটনাও প্রকৃত রসমোক্ষণে অসার্থক। শেক্সপীয়রের নাটকের প্রকৃত প্রাণবস্তু লুকিয়ে আছে অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতার উপর। জুলিয়াস সীজারের ঐতিহাসিক কাহিনীর অগ্রগমনের পাশাপাশি ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যালপূর্ণিয়া, অ্যাণ্টনি ইত্যাদি চরিত্রের নানা মানসিকতার চমৎকার বর্ণনাই নাটকটিকে উচ্চমূল্য দিয়েছে। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শাইলকের জিঘাংসা, ডেসডিমনার নিকষিত হেম প্রেম, ইয়াগোর চক্রান্ত নানা নাটকের কাহিনীকে জটিল ঘুর্ণির মুখে পৌঁছে দেয় এবং দর্শকের রসবোধ এক অনির্বচনীয় সুখস্বাদে ভরপুর হয়ে ওঠে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সার্থক নাটকের জন্য প্রয়োজন কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন।

নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনায় পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁর 'Romantic imagination' অধিকারের সাহায্যে ঐতিহাসিক চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কল্পনার তুলি টানতে পারেন। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সেই অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করায় তাঁদের সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের চরিত্র হয়ে থাকেনি, নাটকের জীবন্ত চরিত্রের সত্যমূল্যও অর্জন করেছে। সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টির সময় নাট্যকার স্বেচ্ছাবিহার করে থাকেন। তাঁরা খুশীমত চরিত্রগুলিকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেন, ইচ্ছামত তাদের মুখে সংলাপ বসান -- চরিত্রগুলির পরিণতিও নাট্যকারদের ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে যদি অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির কোনো সুযোগ নাট্যকার না নেন তা হলে সমালোচকদের আর কিছুই বলার সুযোগ থাকে না।

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা চরিত্রসৃষ্টির সময় কল্পনার স্বাধীনতা-প্রয়োগে কোনো সুযোগ দিতে রাজী নন। পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি একান্তই সিদ্ধ চরিত্র -- কয়েক হাজার বছরের একনিষ্ঠ চর্চায় পুরাণের চরিত্রগুলি তাঁদের নির্দিষ্ট স্বভাব নিয়ে পুরাণপ্রিয় মানুষদের মনে জাগরূক। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী অথবা রাবণ, বিভীষণ, সাবিত্রী, সত্যবান, নল, দময়ন্তী, শ্রীবৎস, চিন্তা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র -- প্রভৃতি অজস্র চরিত্রের ভিতর যে চরিত্রটিকেই স্মরণ করা যাক না কেন সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই চরিত্রগুলি তাঁদের সকল দোষ-গুণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠেন। আজন্মলালিত আমাদের সংস্কার এ চরিত্রগুলির সিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কোনো বিচ্যুতি দেখলে তাই আহত হয়।

অপরদিকে নাটক উপহার দেয় রিক্ত এবং অসম্পূর্ণ চরিত্রকে, যে চরিত্র জীবনে অপ্রাপ্তি, দৈন্য এবং গ্লানির সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে কখনও জয়ী হয়, কখনও পরাজয়ের সমুদ্র-আবর্তে ঘুরে মরে। এই চিরকালের চাঁদ সদাগরের দল জীবনের অতলস্পর্শে গভীরতার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। পুরাণের মায়াকাজল চোখে দিয়ে নয়, বাস্তব জগতের দুঃখ-কষ্টের অনুভবশক্তি দিয়েই নাট্যদর্শকরা চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন। পুরাণের চরিত্রের সঙ্গে নাটকের চরিত্রের এখানেই প্রকৃত দূরত্ব।

৭.৪.১৪৬ ঃ নাট্য সংলাপ

নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতা নাট্যকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ একটি নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে সংলাপের ভূমিকা কম নয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের সাফল্যের পিছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে। ঊর্ধ্বমুখী দ্বন্দ্বই ভাল সংলাপের সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অবশ্য নাটকে সংলাপের প্রাধান্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সমালোচক Lajos Egri বলেছেন — ''Do not overemphasize dialogue. Remember that it is the medium of the play, but not greater than whole''.

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যথা উপন্যাস, কাব্য অথবা প্রবন্ধে সংলাপ কোনো নিশ্চিত উপাদান নয়; ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক তাঁদের স্বাধীন গতিময় বর্ণনায় সবকিছু প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু নাটকই একমাত্র শিল্পকর্ম যার প্রতিটি গতিপ্রকৃতিই নির্ভর করে সংলাপের উপর। উপন্যাস এবং কাব্যে যেমন ঔপন্যাসিক এবং কবি মুখর, নাটকে নাট্যকার তেমনি নীরব। নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ এবং সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত দর্শক-পাঠকমনে ঔৎসুক্য সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপের। সংলাপের উপর এই অপরিমেয় দায়িত্ব থাকে বলেই কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারকে দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

সংলাপ সৃষ্টির সময় নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয় সতর্করূপে মেনে চলতে হয়। প্রথমত নাট্যকারকে লক্ষ রাখতে হয় একটি দৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যে অগ্রসর-সময় সংলাপ যেন নাটকীয় ঔৎসুক্য বজায় রাখতে পারে। নাটকীয় সংলাপে কাহিনীর ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত যদি আগেই প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে নাটকের কৌতূহল কমে যেতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত ঔপন্যাসিক ইচ্ছামত যত্রতত্র 'flash back' প্রক্রিয়ায় অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু নাটকে চলমান সংলাপের মধ্য দিয়েই অতীত, বর্তমান ও ভাবী ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হয়। নাট্যকার অসতর্ক হলে সংলাপে সেই ফাঁক থেকে যায় এবং নাটকীয় ঘটনায় বিচ্ছিন্নতা আসে। তৃতীয়ত কাহিনীর মত বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার ভঙ্গীতেও সংলাপে একটি সাধারণ ধর্ম অনুসৃত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে এবং পরস্পর বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে সংলাপ রচনা করতে হয়। চতুর্থত সামাজিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে জীবন্ত বাস্তবের চিত্রণ হয় বলে এই জাতীয় নাটকে যেমন গদ্য সংলাপ কাম্য তেমন পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকে না। ঐতিহাসিক নাটকেও পদ্য সংলাপ আসতে পারে কিন্তু এই পদ্য সংলাপে ভারসাম্যের প্রায়শ অভাব ঘটায় পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কাব্যনাট্যে'র দিকে চলে যায়। নাটক কাব্য নয়, এই ধারণাটি সর্বত্র সজাগ থাকলে নাট্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পদ্য সংলাপও ভাল সংলাপের জন্ম দিতে পারে। পৌরাণিক নাটকের আলোচনার সময়ও এই সূত্রগুলিকে অবশ্যই মনে রাখতে হয়।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের 'গৈরিকছন্দ'কে অনেকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ধরেন। একথা সত্য গিরিশচন্দ্রই পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন এবং সমকালীন

বহু নাট্যকার তাঁর প্রচলিত ছন্দের উপর নির্ভর করেই নাট্যসংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'গৈরিশছন্দে'র জন্মের পিছনে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী নাট্যসংলাপের প্রভাব কম নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন ঃ "পয়ারের অনুরূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচনা ব্যতীতও তিনি অন্য এক রীতির অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে যতি স্থানে চরণ-ছেদ হইত, পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অনুরূপ ছন্দ তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাই 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে।" মধুসূদন বিশ্বাস করতেন ..... 'no real improvement in the Bengali drama could be expected untill Blank verse was introduced into it.' তিনি পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা না গেলেও তাঁর পৌরাণিক নাটক 'পদ্মাবতী'তেই যে এই ভাষা কেবলমাত্র আংশিক ব্যবহৃত তা বলা যায়। 'পদ্মাবতী' রচনার একবছর পরে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন --- 'I am of opinion that our drama should be in Blank Verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.' কিন্তু পরবর্তী নাটক সমূহে মধুসূদন এই কাব্যসংলাপ ব্যবহার না করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' অংশে। তিনি লিখেছেন ঃ 'এ কাব্যেও আমি সংগীতে ব্যতীত পদ্যরচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।' ..... পদ্য সংলাপের প্রতি যে তৎকালীন জনসাধারণের একান্ত আকর্ষণ ছিল না তার পরিচয় তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং হরচন্দ্র ঘোষের নাটক। তাঁরা সংলাপের ক্ষেত্রে পদ্য ও গদ্য ভাষার মধ্যে কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে একই নাটকে উভয় ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে তারাচরণের পদ্য সংলাপে পয়ার এবং ত্রিপদী সংলাপে দীর্ঘ আকর্ষণহীন বিকাশ দেখি, তেমনি সাধু গদ্য ভাষায় রচিত সংলাপে আড়ষ্টতা চোখে পড়ে।

নাট্যসংলাপের বিবর্তন ঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত -----

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ করুণ রসাত্মক প্রহসন

দীনবন্ধু মিত্র দেখেছিলেন, একদিকে একঝাঁক উনিশ শতকীয় তরুণ যুবক নিজের চারিত্রিক অধঃপতনের মুখে দাম্পত্যপ্রেমকে ধ্বংস করেছে। ধনী জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারী কেবলই বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপান করে। আর তার স্ত্রী কুমুদিনী সধবা হয়েও বিধবার মত স্বামীহীনা। এর ফলে সৌদামিনীর সঙ্গে কুমুদিনী যখন কথাবার্তা বলে, তাও হয়ে ওঠে অশ্লীল। কিন্তু দীনবন্ধু যেহেতু প্রহসনটিকে করেছেন নিমচাঁদ-অভিমুখী তাই সে বেশ্যা কাঞ্চনের সঙ্গে রসালাপ করে, কিন্তু কাঞ্চনের সঙ্গে সহবাস করে না। সে বন্ধুদের মাঝে নারী বিষয়ে আলোচনা করে কিন্তু তার স্ত্রীর কথা উঠলে সে তীব্র আহত হয়। কাজেই নিমচাঁদের মুখের অশ্লীল সংলাপ দিয়ে তার চরিত্রকে সর্বাঙ্গীন বোঝা যাবে না।

বিপরীত দিক থেকে বলা যেতে পারে এমনকি মদ্যপ অবস্থাতেও নিমচাঁদ এমন সব ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার করে যার মধ্য দিয়ে তার পরিণত জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকে গোকুল, জীবনচন্দ্র,

অটল -- কেউ বাংলার সামাজিক অধঃপতনের কথা ভাবেনি। কিন্তু অধঃপতিত নিমচাঁদ তা ভেবেছে। মদ্যপ অবস্থাতেও নিমচাঁদ তার অতীতকে স্মরণ করে ---

রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জামানমর্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে কি হয়েছ।

এই ভাষাই নিমচাঁদের প্রাণের ভাষা। তৎসমবহুল সংলাপটি কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। তার কারণ তৎকালীন সামাজিক সঙ্কটই এই সংলাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিমচাঁদ হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, ডন জুয়ান এবং ওথেলোর নির্ভুল সংলাপ বলে। সেই সংলাপ কত হৃদয়গ্রাহী এবং তার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাবাহী! অটল তাকে বলেছে -- তুই তোর মেগের কাছে যা। তা শুনে নিমচাঁদ তীব্র আহত হয়েছে। শেক্সপীয়রের অসামান্য সংলাপ তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে। প্রহসনের আদর্শ সংলাপ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটক 'নুরজাহান' নাটকের এক বছর পরে লেখা হলেও এই নাটকে সাজাহান চরিত্রের সংলাপের আবেগকম্পিত গদ্যে গভীরতা বেশী। জাহানারার সংলাপে তেজ, দৃঢ়তা, তীব্রতা নুরজাহানের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের গদ্যে পার্থক্য আসবেই। তবুও গদ্যের গঠনে সমধর্মিতা আছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান, জাহানারা প্রমুখের সংলাপের মূল ভিত্তি উপমা সৃষ্টি। তবে গতানুগতিক উপমা নয়। ক্লাইম্যাক্স-ধর্মিতাও এখানে প্রধান ফর্ম। কিন্তু সাজাহানের সংলাপে তৎসম শব্দ থাকলেও বাক্যগঠন খানিকটা চলিত রীতির কাছাকাছি পৌঁছেছে। আর সেই কারণেই জাহানারার সঙ্গে তার সংলাপে আন্তরিক প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় ---

> **জাহানারা ঃ** বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পঙ্গুর মত বসে দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না।

'সাজাহান' নাটকের কোনোও কোনোও সংলাপ বাঙালী দর্শকদের মুখে মুখে পরবর্তীকালে প্রবাদের মত ফিরত। এই সংলাপ-প্রশংসা আর কোনোও বাঙালী নাট্যকারের ঝুলিতে নেই। যেমন --

ক. "এতো বড় দুঃসংবাদ দারা!"

খ. "শীর্ণ হয়ে গিয়েছে সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

গ. "যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।"

ঘ. "প্রাণের চেয়ে মান বড়।"

ঙ. "কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নেই।"

তৃতীয়, আধুনিক পুরাণ-নির্ভর নাটকের সংলাপ

লক্ষ্মণের তীব্র বিরোধিতা রামকে বিচলিত করতে পারেনি। অগত্যা লক্ষ্মণ যখন সীতাকে ঘটনাপ্রবাহ জানায় তখন উর্মিলাও বিস্ময়ে বিমুখ, সীতার প্রতি এই তার অশ্রুসজল, স্বপ্নঘোর সংবাদ পরিবেশনে অসহায়ের মতো উদ্যোগী করেছে। কেবল লক্ষ্মণের উর্মিলা নয়, সীতা সম্পর্কে ভরতেরও স্পষ্ট উক্তি -- 'অসম্ভব'।

পৌরাণিক নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ অত্যন্ত কম, বিশেষত রামের ন্যায় চরিত্রে, পুরাণে যে চরিত্র পুরোপুরি দ্বন্দ্বহীন, সরলরেখ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'য় সেটাই আমরা লক্ষ করেছি। ভবভূতির রামচন্দ্রের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্রের মতো তার হৃদয় প্রথম থেকে উচ্ছ্বসিত। দুর্মুখের মুখে সীতার চরিত্র সম্পর্কে লোক অপবাদ শুনে রাম রাজ্যের উপর, অযোধ্যাপুরীর উপর আস্থা কামনা করে, জনমতকে দ্রুত মেনে নেয়। এদিকে যোগেশচন্দ্র দেখালেন রামের মুখ থেকে নাটকীয় ভঙ্গিসুলভ কথাগুলি শুনে সীতার উক্তির একটি অংশ, যা তাকে আধুনিক প্রতিবাদী চরিত্ররূপে স্থাপিত করেছে।

যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটকের প্রথম অঙ্কে অযোধ্যা প্রাসাদের একাংশে রামের জানুদেশে মাথা রেখে সীতার গভীর নিদ্রা। কিন্তু নাটকের crisis সূচিত হয়েছে অষ্টাবক্র ঋষির অনুরোধক্রমে রামের সেই অযাচিত উক্তিতে ---

দুর্মুখ, দুর্মুখ। মোর জানকীরে। এই দণ্ডে বিসর্জন দিতে পারি।

নাট্যতত্ত্ববিদরা এই ধরনের সংলাপকে নাটকের ট্র্যাজেডি বীজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই বীজ রোপিত হয়েছিল বাল্মীকি রামায়ণেই যেখানে রাম সীতাকে 'অগ্নিসমা পরিশুদ্ধ' জেনেও, কেবল প্রজানুরঞ্জনের জন্য নির্বাসন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

যোগেশচন্দ্র সচেতন ছিলেন বলেই জনকনন্দিনীকে কলঙ্কিত হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে রামের মধ্যে দোলাচলচিত্ত নায়কের বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। অন্যদিক থেকে যোগেশচন্দ্র জানেন, পৌরাণিক নাটকের প্রধান শর্ত পুরাণের মূলসত্য রক্ষা করা। অন্যথায় 'সীতা' পৌরাণিক নাটক হতে পারে না। এ জন্য তিনি রামের মুখে আরোপ করেছেন কয়েকটি টুকরো টুকরো উক্তি ---

ক. কর্তব্য করেছি স্থির, জানকিরে দেব বিসর্জন --- সত্যরক্ষা অবশ্য করিব।

খ. নিরুপায় আমি অন্য পথ নাহি আর জানকির নির্বাসন বিনা।

চতুর্থ ঃ কাব্যনাট্যের ভাষা

এলিয়ট যেমন বিশ্বাস করতেন গদ্যসলাপের চেয়ে কাব্যসংলাপই জীবনের অত্যন্ত গভীর, সংঘর্ষময় উত্তেজক রূপ তুলে ধরতে পারে, বুদ্ধদেব বসুও সেই মত পোষণ করতেন। এ নিয়ে যত বিতর্কই দেশ বিদেশে হয়ে থাকুক, এর সমর্থন মেলে এলিয়ট এবং বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের জনপ্রিয়তায়। আর বুদ্ধদেব তো নিজেই দাবি করেছেন---

সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের (তপস্বী ও তরঙ্গিনী) অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত।

বুদ্ধদেব 'কাব্যনাট্য' না বলে 'নাটক' বললেন কেন? তার কারণ এ নাটকে কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা সমান্তরাল। 'কালসন্ধ্যা'তেও একই পদ্ধতি নিয়েছেন নাট্যকার। এবং তার ফলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র চরিত্রগুলির সংলাপে নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে ---

নাট্যাবেগ সমৃদ্ধ সংলাপ

ঋষ্যশৃঙ্গ ঃ ....নারী। ....নূতন এক জগৎ। ..... মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার। ...আমি অস্নাত থাকব। তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোথায় বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী, আর কোথায় কামজয়ী ঋষিকুমার! কিন্তু হেরে গেল তরঙ্গিনী। বহু রজনীর বহু পুরুষের কামনিবৃত্তকারিনী নারীটি নিজ জীবিকাধর্ম থেকে চ্যুত হল। আসলে 'অন্য এক স্বপ্ন' দেখল দুজনেই। সংযমী ঋষ্যশৃঙ্গ কিভাবে কামজর্জরিত হল তা তার কাব্যময় গদ্যসংলাপ থেকে আগেই জেনে গেছি। কিন্তু বারাঙ্গনা চিন্তামণির সংলাপে গিরিশচন্দ্রও যেখানে প্রথম পুরুষপ্রেমিক বিল্বমঙ্গলের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেননি, সেখানে বুদ্ধদেবের পতিতা তরঙ্গিনী প্রথম পুরুষকে বরণ করল। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হতে পরামর্শ দিল, আর জননী লোলাপাঙ্গীর শতবাধা সত্ত্বেও, লোকসংস্কার, অর্থবাসনা ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে প্রেমিকের প্রতি আত্মনিবেদনে উজাড় হল তরঙ্গিনী। তার সংলাপ, রোমান্টিক প্রেমিকার সংলাপ —

অ. কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

আ. তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ই. তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

ঈ. এসো প্রেমিক, এসো দেবতা -- আমাকে উদ্ধার করো।

বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের সংলাপ অন্যান্য কাব্যনাট্যকারদের প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশেষ করে গদ্যসংলাপের মধ্যে কবিতার প্রবাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

৭.৪.১৪৭ ঃ নাট্যসংগীত

"Most discussions about the music of poetry seem to assume tacitly that the music lies in the language. This is an error. The music lies in the voice, with language – considered as a spoken phenomenon – providing certain corditions within which the voice, operates. It is essential to emphasize the fact that the voice being the natural organ of feeling, has its own purely auditory expressiveness."

— Peacock, Ronald : The Art of Drama, London, 1960, PP. 121-22.

নাটক রচনার বহু পূর্ব থেকেই সংগীত তার রূপমাধুরী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে যুগে সভ্যতার সামান্যমাত্র বিকাশ হয়নি, আদিম মানুষ যখন প্রকৃতির বুকে ঘর বেঁধে আরণ্যক জীবনের সুখানুভব করত — সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের বুকেই সংগীতের জন্ম। এমনকি যখন কথার প্রয়োগ পর্যন্ত অভাবিত ছিল তখনও মানুষ সুরের গভীরে অনুভূতির দ্যোতনায় বিস্ময়ভরা পুলকে কম্পিত হয়েছে। সুরের অনুভূতিতেই যে সুখ-

দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক প্রকাশ সম্ভব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে সুরের সঙ্গে কথার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হয়েছে, সংগীতের সম্ভাবনা সফল হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর "The origin and function of music" নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন যে, মানুষের মনোভাব গাঢ়তম ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবার জন্যই সংগীতের উৎপত্তি। তাঁর মতে সংগীত হল নিজের উত্তেজনা প্রকাশ এবং অপরকে উত্তেজিত করার সূক্ষ্মতম মাধ্যম।

সংগীত শ্রোতার দৃষ্টির সামনে একটি মায়ালোকের পর্দা তুলে ধরে এবং সমস্ত হৃদয়ের কোণে অনির্বচনীয় আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। স্পেন্সারের এই প্রবন্ধটি আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামক রচনায় লিখেছেন ঃ

স্পেন্সারের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে, যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুগ্ন, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিতভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাবসকল অসঙ্কোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে।

সংগীতের জন্মের ইতিহাস এবং অগ্রগতি আলোচনা করলে দেখা যায় আদিম স্তরে সুরই ছিল সংগীতের একমাত্র অবলম্বন, পরবর্তী স্তরে সংগীত কাব্যমূল্য অর্জন করে। সুরের সঙ্গে কথার মিলনে যে গাথা-গীতের আবির্ভাব ঘটেছিল তার সাঙ্গীতিক মূল্য যেমন ছিল অপরিসীম সঙ্গে সঙ্গে কাব্যমূল্যও কম ছিল না। সুরের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হল এই যে, মানবমনের অন্তরতম কেন্দ্রে তার সহজ অনুপ্রবেশ সম্ভব। সুর এবং কথার সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সংগীতের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। কাব্যসংগীতের সুরধারা নাটকেও তার অনুপ্রবেশকে সম্ভব করল। নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সমবেত সংগীত বা কোরাস বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন নাট্যসংগীতে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র দর্শকদের মনে আনন্দসৃষ্টির জন্যই নাটকে সংগীতের ব্যবহার করা হয় না, নাট্যকাহিনীর স্বার্থেও সংগীতের ব্যবহার কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। নাটকের উৎপত্তির কালে সংগীতই ছিল প্রধান অবলম্বন, কিন্তু নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে সংলাপ। সংলাপের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব শুধু কমেইনি, কোনো কোনো নাটকের ক্ষেত্রে সংগীত অবাঞ্ছনীয় রূপে পরিগণিত হয়েছে।

যাত্রা, গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে সংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকলেও সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে সংগীতের ভূমিকা প্রায় উপেক্ষণীয়। তবে গান থাকলেই নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন অভিমত ঠিক নয়। নাট্যকারকে স্থান - কাল এবং পাত্র বিচার করে গান ব্যবহার করতে হয়। এই বিচারে কোনো ফাঁক থাকলে নাটকে সংগীত ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সংগীত এবং নাটক --

দুটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। নাট্যরচনার পূর্বেই সংগীতের জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী যুগে নাট্যকার তাঁর প্রয়োজনে নাটকের মধ্যে সংগীতের স্থাপনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সংগীতকে আশ্রয় করেই নাটকের জন্ম।

হোমারের গ্রীসে যে সংগীতের বীজ রোপিত হয় তাই পরবর্তীকালে ডিথ্যাইর‍্যাম্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীক নাটকে রূপান্তরিত হয়। গ্রীক কোরাসের নায়ক থেসপিস্‌ই প্রথম সংগীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত করে নাটকের সংলাপ সৃষ্টি করেন। ইংল্যান্ডের মাটিতেও (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে) খ্রিস্টজীবনকে অবলম্বন করে আগে গান এবং পরে নাটক এসেছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নায়করা দেবতার বেদীকে ঘিরে প্রথম মৃত্য-গীত করত। এই কোরাস গান ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়ে সংলাপে পরিণত হল। কোরাস নাটকের অঙ্গ হিসেবেই গৃহীত হল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে সংগীতের আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকে একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সূত্রে তিনি বহির্গীত দেবতার বন্দনাগীত, নান্দী এবং সূত্রধারের প্রবেশ ও গীতের কথা উল্লেখ করেছেন। নাটকের প্রস্তাবনায়, কোনো অঙ্কের শেষে, রস থেকে রসান্তরে উপনীত হওয়ার সময় ধ্রুবাগীত ব্যবহৃত হত। এই ধ্রুবাগীতের ভাষা ছিল শূরসেনী। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ধ্রুবাগান সংস্কৃত নাটকে প্রায় নেইই। ভরত নির্দিষ্ট চৌষট্টি রকমের ধ্রুবাগান (যেগুলি নেপথ্যে গীত) সংস্কৃত নাটকে পাত্রপাত্রীর মুখের গানে এবং সংলাপের প্রাধান্যে বর্জিত হয়েছিল।

সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ 'নান্দী' গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে ভরত-নির্দেশিত ঋতু-বিষয়ক গান নান্দীতে সর্বত্র গীত নয়। কালিদাসের এবং ভাসের পুরাণনির্ভর দুটি নাটক যথাক্রমে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং 'প্রতিমা' নাটকে গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু-বিষয়ক নান্দীগীত থাকলেও, অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকে নান্দীর পর ঋতু-বিষয়ক গান কদাচিৎ চোখে পড়ে। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত গান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। ক্ল্যাসিকাল যুগের গানই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক গীতে রূপান্তরিত হয়।

সংস্কৃত নাটকে যেমন গান প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, পাশ্চাত্য নাটকে তা ছিল না। অপেরা বা লঘু নাটক ছাড়া পাশ্চাত্য নাটকে গান ব্যবহারের প্রয়োজন নাট্যকারগণ তেমন অনুভব করেননি। সে দেশের নাটকে বাস্তব জীবন-সমস্যাই প্রধান, গানের রসমাধুরীর চেয়ে সংলাপের তীব্রতাই যে জীবন-কথাকে অধিক প্রকাশ করতে পারে। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে চরিত্রের বিকাশের জন্য এবং ঘটনার দ্বন্দ্বময়তাকে মুখর করবার জন্য গান ব্যবহার করেছেন। এলিজাবেথীয় যুগের পর নাটক থেকে সংগীত একেবারে বাদ যায়নি সত্য কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা নাটকের মত গানের স্রোত সেখানে দুর্বার নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক সংগীতময়। ভাবাবেগ সংগীতের মুখ্য অবলম্বন, --- চিরভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তমুকুরে সংগীতের আসনটি সর্বদাই উচ্চে। পাশ্চাত্য নাটকে এবং সংস্কৃত নাটকে যেমন সংগীতের মধ্য দিয়ে নাটকের জন্ম ঘটেছে তেমনই বাংলা নাটকেরও জন্ম সংগীতের সিঁড়ি বেয়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাটগীত, ঝুমুর, ধামালি, কথকতা ইত্যাদি লোক-নাটগীত, পাঁচালী, কবিগান এবং যাত্রা বাঙালীর কয়েক শতাব্দীর সংগীতপ্রিয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস। বাংলা নাটক যদিও পাঁচালী, কবিগান অথবা যাত্রা থেকে উদ্ভূত হয়নি কিন্তু এগুলির গীতরস বাংলা নাটকের মর্মকোষে সঞ্চারিত হয়েছিল।

অ্যারিস্টটল 'Poetics' এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ট্রাজেডির সংজ্ঞা দেওয়ার পর, তার ছয়টি উপাদান এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি হলো - প্লট বা বৃত্ত, চরিত্র, চিন্তা, বাচন, সংগীত, দৃশ্য। কাব্যতত্ত্ববিদ অ্যারিস্টোটলের মতে 'the greatest pleasurable accessories of Tragedy'। অ্যারিস্টোটল মূলত সমকালীন গ্রীক নাটককে মাথায় রেখে তাঁর কাব্যতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্বে সূত্রায়িতভাবে বিভিন্ন শিল্প উপাদানকে বিশ্লেষণ করেছেন। যা অবশ্যই আমাদের কাছে একান্তভাবে গৃহীত। কিন্তু বিবর্তনের পথে সাহিত্য রূপ-রীতি সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতীয় সাহিত্যে বদল ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই শিল্প উপদানগুলির গুরুত্বেও এসেছে রদবদল।

ভারতীয় সাহিত্যে বরাবরই 'সংগীত' একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাচ্য সাহিত্য বলতে আমাদের প্রথমেই মাথায় আসে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। যেখানে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য এই দুই কাব্যভদে সংস্কৃত সাহিত্য বিভাজিত। সেখানেও নাট্যকারগণ সংগীতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে সংগীত যে শুধু বিনোদন বা শ্রুতি মাধুর্যের উপকরণ নয় তা আমরা নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সংগীত প্রয়োগ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব।

গ্রীক নাটকে 'কোরাস' এর প্রচলন ছিল। একদল মানুষ যারা মুখোশ পরে গান গাইত ও কবিতা আওড়াত কোনো ধর্মীয় উৎসব নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে। গ্রীকদেবতা ডায়োনিসাস হলেন মদ্য ও অন্নের দেবতা। এই দেবতার মন্দিরের চারপাশে একদল পূজারী দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্যের সঙ্গে গান গাইত। পরে কথোপকথন শুরু হলো এবং দু-তিনজন ডায়োনিসাসের গুণাবলী কীর্তন করত। যারা ডায়োনিসাসের মন্দিরের চারপাশে নৃত্যসহ গান করত – তাদের বলা হত 'কোরাস' (chorus)। ইস্কাইলাস ও সফোক্লিসের নাটকে এই স্মবেত গায়কের দল (কোরাস) নাট্যক্রিয়ার ঘটনার ভাষয়কার হিসেবে কাজ করত। এরা প্রথাগত নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মনোভঙ্গী প্রকাশ করত। নাটকের অভিনয়ের সময় সম্বেত গায়কের দল রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ স্থানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের সাক্ষ্যরূপে কিংবা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে উপস্থিত থাকত। তাদের সামনেই অভিনীত নাট্য ঘটনা অগ্রসর উপস্থিত থাকত। তাদের সামনেই অভিনীত নাট্য ঘটনা অগ্রসর হত। 'Poetics' গ্রন্থের অষ্টাদশক পরিচ্ছেদে নাটকে 'কোরাসে' এর ভূমিকা সম্পর্কে অ্যারিস্টোটল বলেছেন " The chorus too should be regarded as one of the actors, it should be an integral part of the whole and take a share in the action –

that which it has in Sophocles rather than in Euripides" (The Art of Poetry : By water, page 66)

পরবর্তীকালে সংলাপের প্রাধান্য যত বেড়েছে সংগীতের গুরুত্ব কমেছে। গ্রীক নাটকেও আমরা দেখব ইস্কাইলাসের নাটকে বা সফোক্লিসের নাটকে কোরাসের গুরুত্ব থাকলেও ইউরিপিডিসের নাটকে তার স্থান সংকুচিত হয়েছে। আসলে 'ডিথিরাম্ব' বা 'ফ্যালিক গীতি' থেকে নাটকের উদ্ভব। তাও হলো সমবেত গান বা কোরাস। পরে নাট্যসংলাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গুরুত্ব কমলেও আমরা দেখব ইউরিপিডিসের নাটকে 'ওড' এর মাধ্যমে এর অস্তিত্ব রয়ে গেছে।

বাংলা নাটকের সূচনাকালে সংস্কৃত নাট্যরীতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। পরব্রতীকালে সময়োপযোগী করে পাশ্চাত্যরীতি গৃহীত হয়েছে। কালিদাস প্রমুখের ক্ল্যাসিক্যাল নাটক কিংবা লোকনাট্যের প্রাদেশিক নানা আঙ্গিক, সেখানেও গান বাদ দিয়ে নাটক প্রায় ভাবাই যায় না। বাংলা নাটকের সঙ্গে গানের সম্পর্কও অনুরূপ। সূচনাকাল থেকেই যাত্রা, পাঁচালি গানের পথ বেয়ে বাংলা নাটকে গানের প্রবেশাধিকার অব্যবহিতভাবেই চলে এসেছে। রামনারয়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র মনোমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল এবং পরব্রতীকালের নাট্যচর্চাতেও দেখা যায় গান বাদ দিয়ে নাটক লেখার কথা নাট্যকাররা কল্পনাও করতে পারতেন না। পেশাদার মনগচে তো বটেই শখের থিয়েটারেও নাটক গান সমান্তরালভাবেই চলে এসেছে। একসময় অপরিহার্য বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে নাটকে গান ব্যবহৃত হয়েছে। 'রত্নাবলী' নাটকের বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ ঘোষণা করেন "যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনোই নয়। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পর্ক নিতান্ত পরিবর্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের হানির সম্ভাবনা।" ফলেপৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে পালায় তো বটেই, সামাজিক নাটক – প্রহসনেও গান গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সে কারণে সে কালে যাঁরা নাটকে বা যাত্রার মঞ্চাবতরণ করতেন, তাঁদের প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই গান গাইতে জানতে হতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধারার পরিপন্থী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি মুখর আবহাওয়ায় ছিল গান ও নাটকের দ্বৈতচর্চা। বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গান ও নাটক উভয়ের চর্চা করতেন প্রথমাবধি। ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী নাট্যচর্চায় গান যে অন্যতম বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে সেটা

স্বাভাবিক ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুরুবিক্রম’, অশ্রুমতি প্রভৃতি নাটকে প্রযুক্ত হয়েছিলো রবীন্দ্র রচিত গান। পরে কবি নিজে যখন নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন, গান সেখানে গ্রহণ করল এক অনন্য ভূমিকা। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য প্রভৃতি সমস্ত রকম নাটকের গানের স্বতন্ত্র ব্যবহার করে ‘রক্তকরবী’তে গানকে উত্তরণ করলেন বিশ্বের অমৃতধারাতে। যেখানে গান আর নাটকের অলঙ্কার হয়ে রিল না। তা হয়ে উঠেছে নাটকের মূল ভাবের অপরিহার্য অনুষঙ্গী। এ বিষয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক আলপনা রায়ের মন্তব্যে আলোকপাত করব। তিনি বিশুর নন্দিনীকে নিয়ে সেশ গান শোনাবার প্রসঙ্গে বলেছেনে “ ব্যথার সাধনায় নিজেকে রাঙিয়ে তুলে যেমন জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ হয়ে ওঠে রক্তকরবী তেমনি মনে হয় ব্যথার সংগ্রামের শেষেও হয়ত অপেক্ষা করে আছে কোনো গীতসৌন্দর্যময় জীবন, জীবনএর মুক্তি, যা ইঙ্গিত আছে নাটকের অন্ত্যগীতিটির সমবেত প্রয়োগে।”

নাটকে সংগীত উপস্থাপনার কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাকে সূত্রাকারে নিবন্ধ করা যায় –

প্রথমত, কোনো সশ্বাসরুদ্ধকারী বাট্রাজিক ঘটনার পর বিরতির জন্য (Dramatic relief) বা দর্শকের মানসিকতাকে চিন্তা করবার অর্থাৎ দম নেবার কিছু অবকাশ দেবার জন্য নাটকে সংগীতের প্রয়োজন পড়ে। এ ধরণের গান অনেকক্ষেত্রেই নিছক প্রমোদমূলক হয়।

দ্বিতীয়ত, নাটকীয় চরিত্রের অন্তনির্হিত অনেক তাৎপর্য সংগীতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয়ত, সংগীতের সাহায্যে নাটকীয় পরিস্থিতি ও ঘটনাকেও ব্যক্ত করা সম্ভব।

চতুর্থত, নাটকের মধ্যবর্তী অনেক ঘটনাবলী যার উপস্থাপনা নাটকএ হয়ত নেই, নাট্যকার সংগীতের মধ্য দিয়ে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলী জানিয়ে দেব বা পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখ এই সংগীতের দ্বারাও সাধিত হতে পারে।

পঞ্চমত, পাত্র-পাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব, আবেগ- উচ্ছ্বাস, আনন্দ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি যা স্বগত উক্তির দ্বারা কিছুটা প্রকাশিত হতে পারত, তা আরও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় সংগীতের মাধ্যমে।

৭.৪.১৪৮ ঃ ত্রয়ী ঐক্য

নাটকের প্লট-সম্পর্কিত আলোচনায় ত্রয়ী ঐক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে। কিন্তু যেহেতু নাটকের কাহিনীর পারম্পর্য বজায় রাখার জন্য, ঘটনাসমূহের স্থান-পারম্পর্য ঠিকমত করার জন্য, এবং নাট্যক্রিয়া সুসংহত রক্ষার জন্য ত্রয়ী ঐক্যের প্রয়োজন জরুরী, তাই পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাটকের ত্রয়ী ঐক্য বিধি সম্পর্কে আলাদা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের ঐক্যবিধি ঃ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ----

১. অ্যারিস্টটল স্থান ঐক্য সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট মন্তব্য করেননি, তবে তাঁর পোয়েটিক্সের টীকা লিখতে গিয়ে Maggi বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ফরাসী নাট্যকার কর্ণেই, রাসিন প্রমুখরা এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

২. বিপরীতে ড্রাইডেন ঐক্যবিধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন --- 'What has been said to The Unity of Place may easily be applied to that of time ..... for as place, so time relating to a play is either imaginary or real; The real is comprehended in those three hours more or less.

৩. এফ. এল. লুকাস, এলারডাইস নিকল এবং টি. এস. এলিয়ট স্থান ঐক্য ও কাল ঐক্য রক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন।

৪. সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ববিদরা ঘটনার উপস্থাপনের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। কাল ঐক্যের প্রসঙ্গে তাঁরা এইভাবে বলেছেন --- 'একদিবস প্রবৃত্ত কার্যস্ত্বঙ্কো'। বড়জোর প্রবেশককে ব্যবহার করার মধ্যদিয়ে তা বাড়ানো যেতে পারে।

৫. নাট্যকার ভাস তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলিতে একটা ঘটনা, একটা দৃশ্য ব্যবহার করে ত্রয়ী ঐক্যের নিদর্শন রেখেছেন।

একাঙ্ক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য ঃ

বনফুলের 'শিককাবাব' নাটক --

বিশিষ্ট ছোটগল্পকার, নাট্যকার বনফুলের একাঙ্ক নাটকগুলির নিজস্ব একটি প্যাটার্ন আছে। সেই রীতি অ্যারিস্টটলীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্যনির্দেশ মেনেছে এমন কথা বলা যাবে না। কেননা পঞ্চাঙ্ক নাটকের আয়তন দীর্ঘ, আর একাঙ্ক নাটকের আয়তন সংহত। একমুখী দ্রুতগামী সম্পূর্ণ স্বল্পচরিত্রের বিবর্তন-সম্বলিত কাহিনী হল একাঙ্ক নাটক। যাই হোক, একাঙ্ক নাটকের ত্রয়ী-ঐক্যগত বিচার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেমন, একাঙ্ক নাটকেও তেমনি ত্রয়ী - ঐক্য রক্ষিত হলে রচনার নাট্যধর্ম যথাযথ ও বর্ণাঢ্য গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ত্রয়ী ঐক্যগুলির পরিচয় এই রকম--

১. ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of action)

২. কালগত ঐক্য (Unity of time)

৩. স্থানগত ঐক্য (Unity of place)

সার্থক সিদ্ধনাট্যশিল্পী বনফুল তাঁর 'শিককাবাব' একাঙ্কিকাতে সীমাবদ্ধ পরিসরে এই ত্রয়ী ঐক্যবিধান করে নাটকের আকর্ষণীয়তা ও উপভোগ্যতা বাড়িয়েছেন।

১. ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of action)

একাঙ্ক নাটকে নাট্যকার নাটকের মূল ভাববস্তু ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেন। এই ক্রিয়ার প্রথম ভাগে থাকে জটিলতা, দ্বিতীয় ভাগে থাকে জটিলতামোচন। নাট্যবৃত্তের আদি (begining), মধ্য (middle) এবং অন্ত্য (end) --- এই তিনটি স্তরে বিন্যাস হয় ঐ দুটি অংশে। এদের মধ্যে আদি স্তরে নাট্যসমস্যা উপস্থিত করা হয়। মধ্যস্তরে স্থান পায় এই সমস্যার বিবর্তন ও জটিলতা। এবং অন্ত্যস্তরে সমস্যার রুক্ষময় অথবা প্রীতিকর পরিণতি দেখানো হয়। এই গোটা বিষয়কে অ্যারিস্টটল বলেছেন — Unity of action. পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা থাকা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের জেনে নিতে হয়, তা হল একাঙ্ক নাটক একটি তত্ত্বে সীমাবদ্ধ এবং এর মধ্যেই থাকে সূচনা (introduction), ঘটনার আরোহন (rising action), চরমবিন্দু (climax), ঘটনার অবরোহণ (Falling action) এবং পরিসমাপ্তি (catastrophe)—এই পাঁচটি নাট্যসন্ধি । তবে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো 'শিককাবাবে' এই Unity of action-এর মধ্যে কোনোও বিস্তারের সুযোগ নেই। ঘটনা অনুসারে দ্রুতগামী একাঙ্ক কিভাবে এই Unity of action কে রক্ষা করেছে, তা নাটকটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে বোঝা যাবে।

'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় ক্রিয়াগত ঐক্য একটি মূল ঘটনার বিন্দুতে আবর্তিত। সেটি হল জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার অসহায় তরুণী সৌদামিনীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। আধুনিক নাট্যকারদের স্বাধীনতা অনুযায়ী বনফুল প্রথমেই জমিদারের গৃহবর্ণনা দিয়েছেন এবং শিবু ও করিমের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনার অবতরণিকা ঘটিয়েছেন। অতঃপর, বহুভোগী জমিদারের বাস্তব মাংস লোলুপতা ও নারীমাংস ভোগের লালসা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, তেমনি স্বয়ং জমিদার ও তার প্রধান মোসাহেব পান্নালালের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে জমিদারের কামাসক্তি ও সৌদামিনীর ভাগ্য বিপর্যয় স্তরে স্তরে স্পষ্ট হয়েছে। নাট্যমধ্যে রোগা গোছের গোঁফ-দাড়ি কামানো পান্নালালের হাজির হওয়ায় Unity of action দ্রুত ঘটেছে। গ্রামের মেয়ে সৌদামিনীর প্রেমিকসহ কাশী যাওয়া -- সেখান থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও জমিদারের বাগান বাড়িতে পৌঁছানো, এসব অবরোহণ পদ্ধতিতে নাট্যকার আমাদের জানিয়েছেন। এখানে Unity of action-এর রীতি রক্ষিত। তবে মদ ও সিগার খেতে খেতে জমিদারের ক্লান্ত হয়ে পড়া এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌদামিনীকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশের বিষয়টি নাট্যশেষে climax-এর আগেই সেরেছেন। অর্থাৎ Unity of action-এর ঐক্য এখানে রক্ষিত হয়েছে।

২. কালগত ঐক্য (Unity of time)

একাঙ্ক নাটকের কোনোও উপকাহিনী বা Sub plot থাকে না। চরিত্র থাকে চার-পাঁচটি। শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি হয় না। কাজেই অতি স্বল্পকালের মধ্যে একাঙ্কিকার মুন্সিয়ানা ঘটনা ও দ্রুততার মধ্য

দিয়ে উত্তেজনার চরম বিন্দুতে পৌঁছে যায়। আমরা দেখি 'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় সময়ের অস্তিত্ব চমৎকারভাবে রক্ষিত হয়েছে। 'শিককাবাবে'র সময়কালে পুরোপুরি একটি রাত নয়, একটি রাতেরও দুই-তিনটি প্রহর। নাটকের সূচনায় জমিদারের ভৃত্য শিবু ও খানসামা করিমের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে হল ঘরে একটি 'নতুন চিড়িয়া'র আগমনবার্তা জানা যায়। তাদের কথোপকথনের সামান্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জমিদার ও তার মোসাহেব প্রবেশ করে। অন্য দিকে রান্না ঘরে পশু মাংসের শিককাবাব তৈরির আয়োজন চলছে। এই অবসরে মদ খেতে খেতে ও সিগার টানতে টানতে জমিদার সৌদামিনীর জীবনের পূর্ব কাহিনী ভালোভাবে জেনেছেন। এর মধ্যে জমিদারের ইয়ারবন্ধু জীবনধনের আগমন ঘটায় পরিবেশটা একটু রঙিন হয়ে উঠেছে। সৌদামিনীর পূর্ব প্রেমিকদের কার্য জানার পর জমিদার তাকে ভোগ করতে অস্বীকার করেছেন। তবু অপ্সরাটিকে একটু চোখে দেখার আগ্রহ মেটাতে যখন পর্দা ফাঁক করা হয়েছে; তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সৌদামিনীর মৃতদেহটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি ঘটতে বড়জোর তিরিশ চল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে। অবশ্য তার মধ্যে পান্নালাল ও জমিদারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সৌদামিনীর প্রথম যৌবন থেকে বার বার প্রতারিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নাটক যখন শেষের দিকে তখনও রাতের প্রহর এগিয়ে চলে। যখন নাটকের অন্ত্যযবনিকা ঘনিয়ে এল তখন রাত শেষ হয়নি। সুতরাং নাটকের মূল ঘটনা ত্রিশ, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সমাধা হয়েছে। কাজেই একাঙ্কিকার যে আদর্শ সময় লাগার কথা সেই স্বল্পাধিক এক ঘন্টার মধ্যে 'শিককাবাব' একাঙ্কিকার ঘটনাধারা সংঘটিত হয়েছে। অতএব এই একাঙ্কিকার কালগত ঐক্য বা Unity of time যে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয়েছে তা আমরা বলতে পারি। আর একাজে সফল হয়েছেন সার্থক একাঙ্ক নাট্যকার বনফুল।

৩. স্থানগত ঐক্য (Unity of place)

ত্রয়ী ঐক্যের ধারায় Unity of place বা স্থানগত ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে দেখা যায় বিশ্বের সেরা একাঙ্ক নাটকগুলিতে নাট্যস্থানের পরিবর্তন প্রায় ঘটেই না। কেননা যেহেতু এখানে একটি মাত্র অঙ্ক এবং একটিমাত্র দৃশ্য থাকে। আমাদের আলোচ্য 'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় সেই Unity of place-এর শর্ত পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। নাটকের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে মফস্বলের এক জমিদারের প্রমোদকুঞ্জ বাগানবাড়ির হলঘরে। সেখানে কামনালোভী পুরুষের প্রতারণায় শিকে গাঁথা ও লালসার আগুনে ঝলসানো শিককাবাবের স্বরূপে ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবতী সৌদামিনীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। জমিদারের হলঘরটি এই একাঙ্কিকার রঙ্গস্থল ও সমস্ত ঘটনার আশ্রয়স্থল। নাটিকার সব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে আদ্যন্ত এখানেই ঘটেছে। আর সব সংলাপও এখানেই বলা হয়েছে। এই হল ঘরটির সঙ্গে সৌদামিনীর করুণ নিয়তি যুক্ত বলে নাট্যকার নাটিকার সূচনাতেই হলঘরটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ---

প্রকাণ্ড একটি হলঘর। ছাদ পাকা নয়। একটি বড় বরগা ঘরের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়েছে, দেখা যাইতেছে। পর্দা টাঙাইয়া হল ঘরটিকে দু ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দা একটি নয় , দুইটি -- পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দার ওপারে কি আছে তা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে ঘরের দুদিকে দুটি দরজা আছে।

পর্দার এপারেই সব দৃশ্যগুলি ঘটেছে। কাজেই বলা যায় যে পান্নালালের বর্ণনায় নাট্যস্থান যদিও কখনও সৌদামিনীর গ্রাম, কখনও বাঙালির চিরপরিচিত বারাণসী তীর্থ, শিয়ালদহ স্টেশন --- কিন্তু মূল স্থান জমিদারের হলঘর।

৭.৪.১৪.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ --- ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

২। নাট্যতত্ত্ব বিচার --- ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৩। নাটকের কথা --- ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

৪। কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার --- ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। সাহিত্য বিবেক --- ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। সংলাপ ও ভিন্নপ্রসঙ্গ --- ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.৪.১৪.১০ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্লটের সংজ্ঞা নিরূপণ করো। প্রসঙ্গক্রমে একটি নাটকের প্লট বিন্যাস আলোচনা করো।

২। নাটকে প্লট ও চরিত্রের মধ্যে কোনোটির ভূমিকা বেশি তা দেখাও।

৩। দেশ-বিদেশের নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের বিবর্তনের পরিচয় দাও।

৪। নাট্যসংলাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে যে কোনো একটি শ্রেণীর নাট্যসংলাপ নিয়ে আলোচনা করো।

৫। নাটকে সংগীত প্রয়োগের ইতিহাস বর্ণনা করো।

৬। ত্রয়ী ঐক্য বলতে বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ববিদ্ কি বুঝিয়েছেন? একাঙ্ক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে কিনা সংক্ষেপে দেখাও।

– – – – – –

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক

বিন্যাস ক্রম :

৭.৪.১৫.১ ঃ উদ্দেশ্য

৭.৪.১৫.২ ঃ ভূমিকা

৭.৪.১৫.৩ ঃ পৌরাণিক নাটক

৭.৪.১৫.৪ ঃ সামাজিক নাটক

৭.৪.১৫.৫ ঃ প্রহসন

৭.৪.১৫.৬ ঃ ঐতিহাসিক নাটক

৭.৪.১৫.৭ ঃ রাজনৈতিক নাটক

৭.৪.১৫.৮ ঃ উদ্ভট নাটক

৭.৪.১৫.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৭.৪.১৫.১০ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.৪.১৫.১ ঃ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককে নাট্যবিষয়কে কোনো কোনো মাধ্যমে পরিণতি দেওয়া উচিত, সেই উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে নানা শ্রেণীর নাটকের বৈচিত্র্য নির্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

৭.৪.১৫.২ ঃ ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, রোমান্স ইত্যাদি প্রতিটি দিক সম্পর্কে নাট্যকারের শুধু ওয়াকিবহাল থাকাই জরুরী নয় তাকে আলাদা আলাদা আঙ্গিকে পরিবেশন করাও তাঁর দায়িত্ব। দেখা যায়, এক-এক শ্রেণীর নাটকে নাট্যরস এক-এক জাতীয়।

৭.৪.১৫.৩ ঃ পৌরাণিক নাটক

পুরাণ পরোক্ষে আধিদৈবিক চিন্তনের সাহিত্যিক প্রকাশ। বাস্তবের মানদণ্ডে যা কিছু অলৌকিক, অবিশ্বাস্য এবং স্বাভাবিকভাবেই অচিন্তনীয়, তাকেই পুরাণ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশেচ্ছু। একথা ঠিক, ঐশ্বরিক শক্তির অসীম প্রকাশ চলমান বস্তুজগতে কিছুতেই বিশ্বাস্য হতে পারে না। তাই বোধহয় স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে স্থানিক গুরুত্ব এত বেশী। পুরাণ-রচয়িতারা এই দুই মেরুর মধ্যে মিলন ঘটাতে চাননি সত্য কিন্তু একথাও সত্য তাঁদের কল্পনায় মর্ত্য মানুষের কাছে স্বর্গের ঈশ্বরকে, নানা দেবদেবী এবং ঊর্ধ্বজগতের অপরিচিত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করার ব্যাকুল ইচ্ছা ছিল। পৌরাণিক চরিত্রগুলির সমকক্ষ না হলেও এবং পৌরাণিক রীতিনীতিকে সর্বাংশে গ্রহণে অপারগ হলেও পরবর্তী কালের মানুষ হয়ত এ জন্যই পৌরাণিক কাহিনী আদ্যন্ত পড়েছে, সুযোগমত ব্যবহারিক জীবনে যেমন পুরাণ-উচ্চারিত আদর্শ কথাকে গ্রহণ করেছে তেমনই সাহিত্যের নানা শাখাতেও পৌরাণিক কাহিনী নিপুণভাবে পুনরুত্থাপিত করেছে।

পুরাণে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয়ের কথা সর্বত্র উচ্চারিত। এর কারণ প্রথমত দেবনির্ভর কাহিনীতে ঈশ্বরের বিধানই চূড়ান্ত; দ্বিতীয়ত পাপের জয় হলে বক্তব্য ট্র্যাজেডির পথ ধরে চলে -- ভারতীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যের যা আপাতবিরুদ্ধ লক্ষণ। পাপ এবং পুণ্যের এই ভারসাম্যহীন চেহারাটির পরিচয় রেনেসাঁস-পূর্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর মানবতার উজ্জীবনে যুক্তিতর্কের বিকাশে পাপের নতুন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়। পুরাণের নীতিমূলক চিন্তা আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারার কাছে তার পুরাতন শক্তি ও স্বরূপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি।

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণ-কথাশ্রয়ী নাটকগুলিতে কিছু কিছু কৌতুকময় চরিত্র আছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকেও এমন চরিত্র বিরল নয়। মনোমোহন বসুর 'পার্থ পরাজয়' নাটকের ঘনো, রনো হয়গ্রীব, লম্বোদর, প্রভৃতি চরিত্রে হাস্যরসের খোরাক আছে। কিন্তু এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। এরপর আসে গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের কথা। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক লোভী, ভীরু, কৌতুকময় চরিত্র -- অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের নলদময়ন্তী এবং জনা নাটকের বিদূষক চরিত্রে হাস্যরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনরস। আবার 'পাণ্ডব গৌরবে' নারদ চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক রসিক নারদে পরিণত। অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রোহিতাশ্ব চরিত্রটি 'ডেঁপোমি'তে পূর্ণ। এই চরিত্র পৌরাণিক নাটকের ভাবরস ক্ষুণ্ণ করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দর্শনারাজ এবং দ্রুপদের আলাপে লঘু হাস্যরসের অবতারণার ফলে চরিত্র দুটির রাজোচিত গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে।

পৌরাণিক নাটকের এবং প্রহসনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় পৌরাণিক নাটকে প্রহসনের হাস্যরস প্রবিষ্ট করালে তার রসহানি ঘটে। এই দুটি নাট্যধারার মধ্যে আদর্শগত মিল না থাকায় রসগত মিলও থাকতে পারে না।

অন্যান্য নাট্যধারার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ তা হল পৌরাণিক নাটক তত্ত্বমূলক রচনা, লোকশিক্ষামূলক নাট্যকর্ম। এই শ্রেণীর সকল চরিত্রই এক একটি তত্ত্বের প্রকাশক -- জীবনরসের চেয়ে ধর্মদর্শনের সঙ্গেই তাদের বেশী সখ্যতা। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে যদিও তত্ত্বের কথা কখনও কখনও থাকে কিন্তু নাটকগুলির চরিত্রসমূহ তত্ত্বের অঙ্গুলিহেলনে চলাফেরা করে না। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জীবনতত্ত্ব জেগে ওঠে কিন্তু পৌরাণিক নাটকে ঘটনা ও চরিত্র প্রথম থেকেই তত্ত্বের কাছে নতশির হয়ে যাওয়ায় সেগুলির বিকাশ নিটোল হতে পারে না।

এই সূত্রে নাটকে ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ যত সীমিত, সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ ততই বিস্তৃত। সেন্ট এভারমণ্ড কর্ণেই রচিত Polyeucte নাটকের সমালোচনায়, আই. এ. রিচার্ড তাঁর Principles of Literary criticism (1925) গ্রন্থে, অধ্যাপক কার্ল জেসপারস তাঁর Tragedy is not enough (1953) পুস্তকে এই মন্তব্যই করেছেন। সমাজজীবনে মানুষ সর্বাংশে ধর্মবিশ্বাসী নয় বলেই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেডি-সাফল্যের পথ প্রশস্ত এবং ভিন্ন কারণেই পৌরাণিক নাটকে সে সুযোগ প্রায়শঃ নেই। আবার এঁদের মন্তব্য (যা প্রায়শই অ্যারিস্টটল-অনুসারী) মেনে নিলে যেন কটি গ্রীক ট্র্যাজেডি, সেনেকান ট্র্যাজেডি, শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি নাটক, রাসিন কর্ণেই রচিত নিওক্লাসিক ট্র্যাজেডিগুলি এবং উত্তরকালের নাট্যকার ইবসেন, পিরাণদেল্লো, গলসওয়ার্দি প্রমুখের নাটকগুলিও সর্বাঙ্গসুন্দর ট্র্যাজেডি

নয়। সুতরাং পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অসুবিধা এবং সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুবিধার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হয়।

প্রথম কথা, পৌরাণিক কাহিনীতে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্বল্প -- পরলোক এবং দেবলোকে যাতায়াত অনায়াসসাধ্য। যখন অভিশপ্ত দেবতা বিপর্যয়ে পড়েন তখন আমরা বুঝি এ বিপর্যয় সাময়িক, যখন মানুষের উপর নিয়তির অমোঘ আক্রোশ নেমে আসে তখনও আমরা নিশ্চিত থাকি এই ভেবে যে সেই মানুষটির শোক সাময়িক, কেননা দৈবনির্ভর মানুষ দৈবের করুণা শেষ পর্যন্ত পাবেই এবং দুঃখের হাত থেকেও তার পরিত্রাণ ঘটবে। সাময়িক দুঃখই পরিণতিতে সুখে পৌঁছায় এবং পৌরাণিক নাটককে ট্র্যাজেডির পথ থেকে সরিয়ে আনে। দ্বিতীয় কথা, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর মতই দার্শনিক সত্যকে বড় করে দেখান হয়। সেখানে ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্দশা মায়াবাদী কুসংস্কারের চাপে হারিয়ে যায়। স্বভাবতই পৌরাণিক নাটকের সূচনায় বিবাদের বীজ রোপিত হলেও নাটকের অন্তিমে তা একটি হর্ষাপ্লুত মহীরুহে পরিণত হয়।

৭.৪.১৫.৪ ঃ সামাজিক নাটক

পাশ্চাত্যে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', ইবসেনের 'A doll's house', চেকভের দি চেরি অর্চাড কিংবা আর্থার মিলার, বার্ণাড শ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট প্রমুখের সমাজভিত্তিক নাটকগুলি যে শাশ্বতমূল্য লাভ করেছে তার কারণ কিছু নারী-পুরুষের সামাজিক সমস্যা সর্বদেশ ও সর্বকালে মিলে যায়। আর নাটকই সেগুলিকে চিরন্তনত্ব দান করে।

প্রায় সর্বদেশ সর্বকালে জনসমাজ পরিচালিত হয় সামাজিক নীতিনিয়ম এবং সঙ্গতি অসঙ্গতিকে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অনুসরণের ব্যাকুল কামনায়। নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস জাতির অস্থিমজ্জায় এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে; কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সেই প্রথার পরিধি থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত হয়ে বার হয়ে আসা সম্ভব নয়। মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস যেমন বাঙালী সমাজকে মনেপ্রাণে দৈবনির্ভর হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল অপরদিকে তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজেও একটি ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি নাড়ীর টান আর একদিকে নবীন জীবনসৃষ্টির বন্ধনহীন উল্লাস -- এই দুটি প্রেরণাই পাশাপাশি চলছিল। ইংরাজ জাতির ইতিহাসেও দেখি মধ্যযুগের 'শিভালরি' অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় আর পূর্বের মত উদ্দীপ্ত নেশায় গতিবান নয়। সমাজের নতুন ধারাপাত এইরূপে কেবলমাত্র সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে না, সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর-বিকাশ ঘটায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুরাণচর্চার নবোদ্যমের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলছিল অন্ধ সমাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে সামাজিক ব্যাধিগুলির জরাতুর রূপ দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে সেই ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি-উন্মাদনাও প্রবল হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের আশেপাশে ভাগীরথীর তীরে এক অভিজাত সমাজ শ্রেণী হিসাবে জন্ম নেয়। ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষ হয় গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী। অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে শুরু করে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতার সুযোগে সমাজে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রসার দেখা দেয়। মদ্যপান, নারীহরণ, হত্যা, জুয়াচুরি, জালিয়াতি ইত্যাদি সামাজিক বিকৃতি সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে এই অন্ধকারের বুকেই অনেকে সূর্যোদয়ের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সমাজের সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার মূক অশ্রুপাতকে তাঁরা উদাসীনভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। এরই ফল সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গঠন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নবসমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন করে অনেক নাটক লেখা হয়েছিল ঠিক কিন্তু সেগুলির মধ্যে সমাজ-সমস্যার প্রতিফলন এবং তার সমাধানের কথা তেমন সফলভাবে উপস্থিত নয়। তার কারণ সম্ভবত নবজাগরণের প্রভাব সমাজের শিক্ষিত মানুষদের বিপুলভাবে নাড়া দিলেও বৃহত্তর জনসমাজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন তার দিকে যাননি। সামাজিক নাটক প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সমকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বহন করে থাকে। সামাজিক উপন্যাসে হয়ত বা রোমান্সের স্পর্শ কিছু পরিমাণে থাকে (যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' এবং শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসে) কিন্তু সামাজিক নাটকে রোমান্সের স্থান এত বেশী নয়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), বার্ণার্ড শ (১৮৭৬-১৯৫০), প্রমুখ নাট্যকারগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিলেন, বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ সেই পরিমাণে সচেতন ছিলেন না। এর কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাট্যকারের সত্তা থেকে বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মপ্রবণতা হারিয়ে যায়নি। সেকালের সকল সামাজিক নাট্যকারই সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন কিন্তু আধ্যাত্মিক সংস্কার থেকে তাঁরা অনেকেই নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি।

বাংলা সামাজিক নাটকের নায়ক ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, সামাজিক নাটকের কাহিনী শতাব্দীর জ্বলন্ত সমাজের বুক থেকে চয়িত। পাশ্চাত্যে এই পথ ধরেই নাট্যকারগণ সার্থক ট্র্যাজেডি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রভূত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি দূরের কথা, সার্থক ট্র্যাজেডিও সংখ্যায় নগন্য। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮); দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) এবং রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ'কে (১৯২৫) ট্র্যাজেডির রসাশ্রয়ী বলা হলেও সেগুলির ভিতর যে মাঝে মাঝে রসের বিচ্যুতি ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ চরিত্রে ট্র্যাজেডির প্রকাশ-সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল, ব্যাঙ্ক ফেলের মর্মান্তিক ঘটনা এবং মদ্যাসক্তির বিষয়টিও সঙ্গত। কিন্তু নাটক যত দৃশ্যের পর দৃশ্যে এগিয়েছে ততই কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য জটিলতাজাল ট্র্যাজেডির মহিমাকে মেলোড্রামার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। রমেশ, কাঙ্গালী এবং জগমণির অস্বাভাবিক কূটকৌশল এবং চক্রান্তের প্রেতভূমিতে যোগেশ নিষ্ক্রিয়, নির্বাক দর্শক মাত্র। উপবাসী পুত্রের হাত মুচড়ে পয়সা নিয়ে যোগেশের মদ খাওয়া, স্ত্রীকে প্রহার, রমেশ কর্তৃক নারী ও শিশুহত্যার চক্রান্ত, রমেশের কুকর্মে কাঙ্গালী ডাক্তার এবং জগমণির অহেতুক সহযোগিতা নাটকটির ট্র্যাজেডি-রসকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করেছে। মায়াবসান নাটকের মূলেও পারিবারিক স্বার্থজনিত মামলা মোকদ্দমা, ঋণ-ডিক্রিজারী, উইল ইত্যাদির পরিকল্পনা সবই আছে কিন্তু নাটকটির গভীরে রয়েছে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার। বলিদান এবং শাস্তি কি শান্তি নাটকের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে করুণাময় ও প্রসন্নকুমারের জীবনে সমস্ত রকমের দুঃখ ও বিপর্যয় নেমে এসে ট্র্যাজেডির মহিমা সৃষ্টি করেছিল। একজনের মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ বা হয় চরিত্রহীনা, কেউ লম্পট স্বামীর হাতে হয় নির্যাতিতা। আর এরই মাঝে হঠাৎ খুন, ছুরিকাঘাত, পুলিশ, আইন ইত্যাদির অকস্মাৎ প্লাবন নাটক দুটিকে ট্রাজিক গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে নাটকটিতে রোমাঞ্চকর মৃত্যুর শোভাযাত্রা। করুণাময়ীর মৃত্যু, সরযূর শিশুপুত্রের মৃত্যু, সরযূর মৃত্যু নাটকটিকে বাস্তবের জগৎ থেকে এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। তাঁর 'বঙ্গনারী' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসরণের ফলে ট্র্যাজেডি হতে পারেনি, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) এবং যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সামাজিক নাটক দ্বন্দ্বমুখর সজীবতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ তৎকালীন সামাজিক অস্থিরতা এবং যন্ত্রণার প্রকৃত চেহারাটি নাটকে তেমনভাবে অঙ্কন করতে পারেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ নাট্যকার সমাজের অপমৃত্যুকে সহ্য করেননি বলেই তাঁদের নাটকের চরিত্রগুলি পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে গিয়েছে। জীবনের নীচের মহলের ধুমায়িত বিক্ষোভকে তাঁরা বিপুল দ্বন্দ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাটকে সংহত করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীলবিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে সত্য কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগজনিত সামাজিক অবক্ষয়ের মত ঘটনা সেদিন ঘটেনি। ফলে বিগত শতাব্দীর নাটকে ধর্মভীরু মানুষ মৃত্যুকে সেদিন স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটকের নায়করা প্রায় নিঃসঙ্গভাবে সংগ্রাম করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। এই শতাব্দীর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ভূমিহীন মানুষ রেশনিং কালোবাজার ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসে শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু রেলস্টেশনে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ঘর বাঁধে, মন্বন্তর এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শবের মিছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ পূর্বসুরী ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের মত তাঁদের নাট্যচরিত্রকে আর জীবনবিমুখ ও দৈবনির্ভর করে রাখলেন না, কোনো একক নায়ককে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন না। সামাজিক নাটকে দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। এই যুগ পুরাণের স্মৃতিমন্থনের যুগ নয়, সমাজের প্রতি তীব্র অভিমান

এবং সামাজিক অন্যায়ের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্রোহের যুগ। সেকারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের জয়জয়কার সম্ভব হয়েছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীর দর্শকচিত্তে সামাজিক নাটকগুলি তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।

৭.৪.১৫.৫ ঃ প্রহসন

সার্থক প্রহসন রচয়িতাকে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কৌতুক-প্রবণতার সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির যথাযথ মিলন যদি ঘটে যায় তাহলে সার্থক প্রহসন সৃষ্টি হবার পথে আর কোনো বাধা থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রায় হাস্যরসের প্রচুর ব্যবহার ছিল; কিন্তু নারদ, হনুমান,এবং বড়াই চরিত্রের বহু ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংলাপের উপরই নির্ভর করতে হত। কবিগান এবং তর্জা গানে অকারণ গালাগালিতে সাময়িক হাসির ঝলকানিটুকু মাত্র দেখা দিত, রসসৃষ্টি হত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে হাস্যরস একটি পরিশীলিত রূপের দ্বার খুঁজে পেল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৭৮৩-১৮৭০) প্রমুখ লেখকরা হাস্যরস পরিবেশনে নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। মধুসূদনের পথ ধরে এলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮০ বঙ্গাব্দ)। প্রহসন রচনায় ব্রতী হয়েও অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) সাফল্যলাভ করতে পরেননি। এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসনও চরম সফল হয়নি। এর কারণ যে ভারসাম্য থাকলে সার্থক প্রহসন লেখা যায় সেই হাসি ও অশ্রুর মধ্যে সেতু সৃষ্টির মানসিক ধৈর্য তাঁদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'বুড়ো শলিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' (১৮৯৭), এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)-এ প্রহসনের বিদ্যুৎচমক লক্ষ করা যায়।

প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে -- 'সমাজপ্রচলিত কোনো দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট; ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধহয় প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।' এই অভিমত গ্রহণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রহসন যেমন ব্যক্তিচরিত্রের দোষত্রুটি নির্দেশ করে তেমনি পৌরাণিক নাটকেও অ-মর্ত্য চরিত্রে দোষত্রুটির পরিচয় দেওয়া হয়। অবশ্য প্রহসন এবং পৌরাণিক নাটকে পরিণতি একরকম হয় না। তার কারণ পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনের রসজগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে প্রহসনের প্রধান উপাদান হল চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে প্রহসন মূলতঃ ঘটনামুখ্য, দু-একজন প্রধান রচয়িতা ব্যতীত কেউই ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের একত্রীকরণ করতে পারেন না বলে সার্থক প্রহসন বাংলা সাহিত্যে খুবই কম।

৭.৪.১৫.৬ ঃ ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাস এবং নাটক যখন সমশক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই সার্থক ঐতিহাসিক নাটক জন্ম নেয়। শেক্সপীয়রের হেনরি ও রিচার্ড রাজবংশ-নির্ভর নাটকগুলি এবং 'জুলিয়াস সিজার' নাটক যে চিরায়ত গৌরব অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ তিনি ইতিহাসের তথ্য বা historical fact-এর সঙ্গে কাব্যিক সত্য বা poetic truth-এর হরগৌরী মিলন ঘটিয়েছিলেন। Historical Imagination বা 'ঐতিহাসিক কল্পনাবোধ' না থাকলে সার্থক ঐতিহাসিক নাট্যকার হওয়া যায় না। তার সঙ্গে আবার থাকা চাই ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং ফার্স-এর রস নাটকে সঞ্চারিত করার শক্তি। ইতিহাসের ব্যক্তিত্বদের চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহারের দক্ষতাও গড়ে তুলতে হয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাহিনী ও চরিত্রানুযায়ী সংগীত রচনার ক্ষমতাও এই শ্রেণীর নাট্যকারের থাকা চাই। সর্বোপরি নাট্যকারের ভালো পড়াশুনা থাকা চাই অ্যারিস্টটলের নাট্যপ্লট সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি সম্পর্কে। আমরা নিঃসন্দেহে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথের যথেষ্ট অধিকার ছিল। সেজন্যই তাঁদের সিরাজনির্ভর নাটক দুটি কালজয়ী হতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনায় যে ঘটনার গতিশক্তির প্রয়োজনের কথা বলেছেন তা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই গতিশক্তি ইতিহাস ও মানবজীবনকে এক তারে বেঁধে এমন দুর্বার গতিতে শেষ যবনিকাপাত পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে উৎসারিত হয় 'ঐতিহাসিক রস'। তথ্যসর্বস্ব ইতিহাসের মধ্যে মানবজীবনঘন এই রসসৃষ্টি সব নাট্যকার করতে পারেননি বলেই ইতিহাসকে নিয়ে লেখা অজস্র বাংলা নাটক কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। আবার 'কৃষ্ণকুমারী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সাজাহান', 'টিপুসুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি বিভিন্ন নাট্যকারের এসব নাটক আজও সমান জনপ্রিয়। কোনোটি অনন্ত ট্র্যাজেডি, কোনোটি ক্ষমা, কোনোটি ঈর্ষার চিত্রাঙ্কনে।

গিরিশচন্দ্র

ক. প্রথম যৌবনে সিরাজ উদ্ধত ও ব্যভিচারী ছিল একথা সে ঐতিহাসিকদের মতো নিজেই স্বীকার করেছে। কিন্তু নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ থেকে নবম দৃশ্যে সৌকতজঙের বিরুদ্ধে অভিযান, কাশিমবাজার অবরোধ, ফোর্ট উইলিয়াম জয়ের ঘটনায় তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সিরাজ তার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখেছে। অন্ধকূপ হত্যার ট্র্যাজেডির দুঃখে সে কাতর হয়ে বলেছে -- 'এ কার্যে রাজ্য কলঙ্কিত।' এ কাজ সিরাজের, এবং এর জন্য তার জীবনে ট্র্যাজেডি এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করলেও V.D.Mahajan, জানিয়েছেন মুতক্ষরীণ-এ এই ঘটনার উল্লেখই নেই।

খ. ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন অমাত্যবর্গের প্রতি সিরাজের অমার্জিত ব্যবহার ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সিরাজের ট্র্যাজেডির কারণ। এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির সুর সিরাজের কণ্ঠে— জগদীশ্বর, আমার পাপের কি মার্জনা আছে? প্রভু আমি অন্ধ চৈতন্যহীন নবাবী গর্বে গর্বিত --- বহু অপরাধে অপরাধী। (মহম্মদী বেগ অস্ত্রাঘাত করে) আর না, আর না--- হোসেন কুলী তুমি কি তৃপ্ত?

এই হল, Moral flow জনিত ট্র্যাজেডি।

Hamartia বা Error of Judgement জনিত ট্র্যাজেডি কিভাবে এসেছিল তার দৃষ্টান্ত সিরাজ সম্পর্কে করিমচাচার উক্তি --

নবাব মদ ছেড়ে দিয়ে খালি ভাবছেন এ করি -- কি ও করি। এই দু নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছেন।

সিরাজের ট্র্যাজেডির যে সব ঘটনাদৃশ্য পরম্পরায় এসেছে সেগুলি হল ঃ

- সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র (১/১)
- সিরাজ ও ইংরেজের সন্ধি -- ট্র্যাজেডির বীজ (২/৬)
- যুদ্ধের সংবাদে সিরাজের প্রীত হওয়া (৪/২)
- সিরাজ-হত্যা (৫/৬)
- জহরার প্রতিশোধস্পৃহা

সিংহাসনে না বসলে সিরাজের এমন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি নাও হতে পারত। একই কথা শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কে সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য সকলকে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃত ইতিহাস, তথ্যনির্ভর ইতিহাস। কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও ইতিহাসের ভ্রান্তি এবং ইংরেজ-ভক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল। এর জবাব খুঁজতে হলে গিরিশচন্দ্রকে লেখা, 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের (১৮৭৫) বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধার করা বিশেষ জরুরী---

> তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই একমাত্র অবলম্বন ছিল।
>
> (রেঙ্গুন থেকে লেখা ২৫.২.১৯০৬-এর চিঠি।)

গিরিশচন্দ্রকে লেখা নবীনচন্দ্রের চিঠিটির বয়স প্রায় একশ' হতে চলল। এই একশ বছরে ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। গিরিশ-শচীন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' পেশাদার-অপেশাদার অভিনেতা-নেত্রী দ্বারা অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। তাঁদের নাটক দুটি যেমন ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্ষুশূল হয়েছিল, পাশাপাশি সংখ্যাতীত বাঙালিকে এই দুটি নাটক স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

এখন প্রশ্ন হল, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে দুই নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বেছে নিয়ে দুটি জনপ্রিয় নাটক লিখলেন? বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে যে দেশ পরাধীন অবস্থায় ছিল, সেই সেই দেশের নাট্যকাররা পাঠক ও দর্শকদের সামনে এমন সব দেশীয় ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র উপহার দিতেন যা থেকে দেশের মানুষ জানতে পারে তাদের অতীত ছিল শৌর্য-বীর্যের, ছিল বাহুবলের প্রবল প্রাধান্য। তাদেরও এমন বীরপুরুষ ছিলেন যাঁরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অথবা বিদেশীদের অত্যাচার থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে জীবনপণ করেছিলেন। মধুসূদন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-অমরেন্দ্রনাথ-মণ্মথ রায়-শচীন্দ্রনাথ-মহেন্দ্র গুপ্ত-নিশিকান্ত প্রমুখরা দেশাত্মবোধ সঞ্চারের জন্যই ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল। ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারী হওয়ার ফলে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যও নাট্যকারদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন সমকালীন দেশীয় আন্দোলনগুলি এর দ্বারা পুষ্ট হবে, অথচ ঐতিহাসিক কাহিনী বলে ইংরাজ রাজশক্তি এগুলি নিষিদ্ধ করবে না। বাস্তবে কিন্তু উল্টোটাই হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল

ইতিহাসে নুরজাহান একটি বিস্ময়কর নারী চরিত্র। তার উপর নাটক রচনার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন মুঘল ইতিহাস ভালো করে পড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি 'ঐতিহাসিক রস' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিশ্চয়ই তাঁর পড়া ছিল। শেক্সপীয়রের একাধিক নাট্যচরিত্র নুরজাহান চরিত্র অঙ্কনে সাহায্য করে, সর্বোপরি দুই ঐতিহাসিক চরিত্র ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তাঁর সুবেদার শের খাঁর জীবনবৃত্তও পড়ে নিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৯০৮-এ 'নুরজাহান' রচনার পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ জাহাঙ্গীর-পুত্র সাজাহান তাঁর নাট্যবিষয় হয়।

ইতিহাসের বেশ কিছু অধ্যায় 'নুরজাহান' নাটকে অনুসৃত হয়েছে। শের খাঁর সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিবাহ ও তার পরবর্তী পর্যায়ে তাদের বর্ধমান-জীবন ইতিহাসাশ্রয়ী; নাটকের প্রথম অঙ্কের কেন্দ্রীয় বিষয়। অতঃপর শের খাঁর ইচ্ছামৃত্যু এবং মেহেরুন্নিসার দিল্লিতে উপস্থিতি। সেখানে বেশ কিছুকাল অপেক্ষান্তে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিয়ে হয়ে গেল। ইতিহাস বলে এবং নাটকও জানায় যে বিবাহোত্তর কালে জাহাঙ্গীর নুরজাহান বা মেহেরুন্নিসার রূপে একান্ত মুগ্ধ। ফলত, সেই দুর্বলতার সুযোগে নুরজাহান ভারত সাম্রাজ্যের সব ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করল। ইতিহাসে খসরু হত্যা, খুরম হত্যার চক্রান্ত ইত্যাদি সমর্থিত।

এমনকি নিজের জামাতা লায়লার স্বামী শারিয়ারকে সিংহাসনে বসাবার জন্য নুরজাহানের প্রচেষ্টার কথাও কিছু কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্বেই মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ এবং সাজাহানের মহাবৎ-আনুগত্য ইতিহাসানুগ। এরপর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ইতিহাসে আছে, নাটকেও আছে। কিন্তু নুরজাহানের ব্যর্থতা এবং তার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত কতটা ইতিহাস-ঘনিষ্ঠ এ নিয়ে যে প্রশ্ন বহুকাল ধরে চলছে তার বোধহয় সমাপ্তির প্রয়োজন আছে।

৭.৪.১৫.৭ ঃ রাজনৈতিক নাটক

বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে উৎপল দত্ত কালজয়ী। 'টিনের তলোয়ার' সেই শ্রেণীর নাটক। ভারতে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে বাংলা নাট্যশালার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় দিয়ে এর সূচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটকে রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী' রোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ সামাজিক নাটক হলেও সমকালীন বিষয় নিয়ে সরাসরি ইংরেজ-বিরোধিতা দুটি নাটকেই দেখানো হয়েছে। আইনজ্ঞ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজতোষণ দেশে সমকালীন পরিস্থিতিতে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে গ্রেট ন্যাশনাল 'গজদানন্দ' নাটকের অভিনয় করে। তাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার রঙ্গমঞ্চ । তাদের কণ্ঠরোধ করতে ইংরেজ সরকাব 'Dramatic Performance Act' (১৮৭৬) জারি করে। সেদিনের উত্তেজিত রাজনৈতিক আবহের প্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি রচিত। অন্তরঙ্গভাবে নাটকের প্লটবিন্যাস, চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন রাজনীতি। সুতরাং রাজনৈতিক মতাদর্শ এই নাটকে নিশ্চিতভাবে উপস্থিত।

৭.৪.১৫.৮ ঃ উদ্ভট নাটক

পাশ্চাত্যে Absurd Drama বলতে যেমন নাট্যঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা, সংলাপে অবিশ্বাস্য ভাবাবেগ ইত্যাদি অনাটকীয় ঘটনা বোঝায় তেমনি বাংলায় লেখা কিছু এধরনের বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত নাটককে উদ্ভট নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার এজাতীয় নাটকের রচয়িতারা তাঁদের সৃষ্টিকে উদ্ভট নাটক (ভিন্ননামে কিমিতি নাটক বা ব-নাটক বলায় আপত্তি করেন) বিষয়টি বিতর্কমূলক।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাদল সরকার এই শ্রেণীর নাটকের পথিকৃত নাট্যকার। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি সামনে রেখে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি।

সাধারণভাবে প্রথাসিদ্ধ নাটকে প্লট এবং Sub-plot-এর যে বিভাজন পাশ্চাত্য আলংকারিকরা করে থাকেন-অ্যাবসার্ড নাটক বা উদ্ভট নাটকের ক্ষেত্রে সেভাবে করা যায় না। প্রথমত, উদ্ভট নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত একটি নিটোল কাহিনীর ধারাবাহিকতা কখনওই দর্শকরা পান না। আর যদি সরল বা জটিল Main plot-ই না থাকে, তা হলে Sub-plot বা উপকাহিনীর সুযোগ নেই। যাকে আমরা বলি Unity of Place, বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ইন্দ্রজিৎদের বাড়ি, একটি ছোটখাট পার্ক অথবা অমল-বিমল-কমলের তাসের আড্ডা -- কোনোও স্থানঐক্যই চিহ্নিত করে না। Unity of Time ও এ নাটকে রক্ষিত হয়নি। কেননা এটি হচ্ছে যাত্রার নাটক -- তীর্থযাত্রার নাটক। আবার এ নাটক গ্রীক নাটকের সিসিফাসের ক্রমাগত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আর নামার অভিশপ্ত ঘটনার মতো।

> **ইন্দ্রজিৎ ঃ** দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়োয় তোলে। যেই চূড়োয় পৌঁছোয়, আবার গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার তোলে।
>
> **লেখক ঃ** আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোনো মানে নেই।

স্বভাবতই অ্যাবসার্ড নাটকে ঐতিহাসিক নাটক বা সামাজিক নাটকের মতো Unity of action ও আশা করা যায় না।

এসব সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করেছেন যে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' উদ্ভট নাটকটি একটি Sub-plot-কেন্দ্রিক -- যা মানসী ও ইন্দ্রজিতের একটি রোমান্টিক জীবনবৃত্তের পরিচয়বাহী। সাধারণভাবে নাটকের Sub-plot কোনোও মূল (Main) plot-কে জড়িয়ে অবস্থান করে এবং একটি পর্যায়ে Sub-plot ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং Main plot তার জায়গাটি সুদৃঢ় করে। এ জন্যই কারও কারও কাছে ইন্দ্রজিৎ-মানসী কাহিনী অংশটিকে Sub-plot রূপে গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধা হয়।

পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকে রোমান্টিক প্রণয়লীলা একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ তা অবিন্যস্ত একটি উপকাহিনীর জায়গা ছেড়ে মূলকাহিনীর জায়গায় পৌঁছোতে চাইছিল না। যেমন, ধরা যাক -- আয়নেস্কোর একটি নাটক -- 'এমীভী'। সেখানে দেখা যায় মধ্যম বয়সের স্বামী-স্ত্রী একটি ফ্লাটে বহুদিন ধরে বাস করছে। স্ত্রী একটি টেলিফোন অফিসে যুক্ত থেকে কিছু আয় করে। স্বামী একটি নাটকের কয়েকটা লাইন লিখছে, কিন্তু তার লেখাও আর এগোয় না এবং একটি পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আয়নেস্কোর 'রাইনেসোর' নাটকেও একমাত্র বেরেঞ্জা মানুষ হয়ে রইল। কিন্তু

এমন কি তার প্রেমিকাও গণ্ডারে পরিণত হল। বাদল সরকার সেই ধরনের উদ্ভটত্বে মানসী ও ইন্দ্রজিৎ-এর প্রেমকে আহত করেননি। বরং আমাদের মনে হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজে এই প্রথাভঙ্গকারী দুটি চরিত্র অনেকটাই বাস্তব। তাদের অপূর্ণতার মধ্যে মজা আছে, হয়তো কোথাও কোথাও উদ্ভটত্বও আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি সদর্থক ইঙ্গিতও আছে। একটি দৃষ্টান্ত --

মানসী ঃ এ রকম করে কদিন ভেসে বেড়াবে?

ইন্দ্রজিৎ ঃ যতো দিন চলে।

মানসী ঃ ভালো লাগছে?

ইন্দ্রজিৎ ঃ না।

মানসী ঃ তবে?

ইন্দ্রজিৎ ঃ তবে কী?

মানসী ঃ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসো না কেন?

ইন্দ্রজিৎ ঃ তা হলেই ভাল লাগবে?

মানসী ঃ জানি না।

ইন্দ্রজিৎ ঃ আমিও জানি না। আসলে ভালো লাগা কথাটারই কোনো মানে হয় না। ভালো লাগবার কথা নয়।

মানসী ঃ (অল্প থেমে) ইন্দ্র!

নাটকের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে নাট্যসংলাপ ও নাট্যসংগীত -- দুটি পরিচিত মাধ্যম। তবে গতানুগতিক নাট্যশৈলী থেকে যেহেতু অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকে, তাই বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'য়, আদমভের 'দি প্যারোডি'-নামক অ্যাবসার্ড নাটকে কিম্বা বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নামক অভিনব নাটকে ব্যবহৃত গান ও সংলাপ থেকে স্বতন্ত্র। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর পাঠক ও দর্শকরা নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি গানের ব্যবহার পেয়েছেন। দৃশ্যাংশে আছে, ইন্দ্রজিৎ ও মাসীমার কথোপকথনের পর পরই নেপথ্য থেকে একটি সমবেত সংগীত ভেসে আসে। পুরো সংগীতটিই সংখ্যাবাচক -- দশটি চরণে এক-দুই-তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার অসংলগ্ন ব্যবহার থেকে এই গানের সৃষ্টি। অতঃপর নাট্যসংলাপের মাঝে মাঝেই কবিতার ব্যবহার এই শ্রেণীর নাটকে অপরিচিত অধরা একটি বস্তুজগৎকে তুলে ধরে। সুতরাং বলা যায় যে, 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ব্যবহৃত গান, গদ্য সংলাপ এবং কবিতাধর্মী সংলাপ -- সবকিছুই যেন একটা বিমূর্ত বিষয়।

বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' আপাতদৃষ্টিতে Absurd Drama-র চৌহদ্দিতে পড়লেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতা এই নাটকে সরাসরি উপস্থিত। উনিশ শতকের সুবিধাবাদী সেই সব মধ্যবিত্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সমাজে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে বাধা পেতে পেতে অমল-বিমল-কমল ও ইন্দ্রজিৎ-এর গোলোক ধাঁধাঁয় পড়ে যায় এবং যুবশক্তির যাবতীয় আশার মৃত্যু অনুভব করে। এর ভেতর থেকে যা দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে -- তা হল তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যা অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তরা এক একটা কেরাণীতে পরিণত হতে চায়। তারা কলেজে ক্লাস করে, যান্ত্রিকভাবে ক্রিকেট-সিনেমা-রাজনীতি-সাহিত্য ইত্যাদি সবকিছু মিশ্রিত করে আড্ডা মারে এবং যন্ত্রের মতই জীবন নির্বাহের পরিচয় তুলে ধরে এক-দুই-তিন গানে। এই গানটির মধ্যে সংখ্যার অতিরিক্ত আর কোনোও শব্দ না থাকায় বোঝাই যায় নাট্যকার তাদের বারংবার ঘুরেফেরা নৈরাশ্যময় জীবনকে ঐ গানটির বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হল, যা ছিল নেপথ্যগীতি, গানের শেষ লাইনটি গাইতে গাইতে লেখকের প্রবেশের মধ্য দিয়ে বোঝা গেল, গায়ক, লেখকও হতে পারে।

এবার আসা যাক, আলোচ্য নাটকের সংলাপে কাব্যিক উপাদানের প্রচুর প্রয়োগের প্রশ্নে। এই এক বিশেষ রীতি, যা কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক ছাড়া অন্যান্য নাটকে দুর্লভ। নির্মল গদ্যের পাশে কবিতার রং উদ্ভট নাটকের একটি নিজস্ব শক্তি। আমরা লেখকের একই বর্ণনা থেকে সংলাপের প্রাত্যহিকতা ও সংলাপের কাব্যধর্মিতা -- বিশ্লিষ্ট করছি।

লেখক ঃ অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে। তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ছেলে কমল চাকরি করে এবং ইন্দ্রজিৎ এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ঐখানে ফুটপাতে একটা সাত বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে।

(রূঢ় বাস্তবধর্মী প্রাত্যহিক সংলাপ)

ঐখানে ফুটপাতে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার নাম লীলা। ঐ দিকে আকাশে সিঁদুরে রং। তার নিচে বসে মানসী জীবনকে ভালোবাসতে চায়।

৭.৪.১৫.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ --- ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

২। নাট্যতত্ত্ব বিচার --- ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৩। নাটকের কথা --- ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

৪। কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার --- ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। সাহিত্য বিবেক --- ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। সংলাপ ও ভিন্নপ্রসঙ্গ --- ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। বাংলা নাটকের দিক্‌দিগন্ত -- ডঃ তরুণ মুখোপাধ্যায়

৭.৪.১৫.১০ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যতত্ত্বের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানাও -- পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন।

২। দৃষ্টান্ত সহযোগে ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক নাটকের পরিচয় দাও।

৩। প্লটের সংজ্ঞা নিরুপণ করো। প্রসঙ্গক্রমে একটি নাটকের প্লট বিন্যাস আলোচনা করো।

৪। নাটকে প্লট ও চরিত্রের মধ্যে কোনোটির ভূমিকা বেশি তা দেখাও।

৫। দেশ-বিদেশের নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের বিবর্তনের পরিচয় দাও।

৬। নাট্যসংলাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে যে কোনো একটি শ্রেণীর নাট্যসংলাপ নিয়ে আলোচনা করো।

৭। নাটকে সংগীত প্রয়োগের ইতিহাস বর্ণনা করো।

৮। এয়ী ঐক্য বলতে বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ববিদ্ কি বুঝিয়েছেন? একাঙ্ক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে কিনা সংক্ষেপে দেখাও।

– – – – – –

একক ১৬

ক্ল্যাসিক ও রোমাণ্টিক নাটক, রূপক ও সাংকেতিক নাটক, একাঙ্ক নাটক

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৬.১ ক্ল্যাসিক ও রোমাণ্টিক নাটক
৭.৪.১৬.২ রূপক ও সাংকেতিক নাটক
৭.৪.১৬.৩ একাঙ্ক নাটক
৭.৪.১৬.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৪.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৬.১ ক্লাসিক ও রোমান্টিক নাটক

ক্লাসিসিজম

ক্লাসিসিজম হল একটি সাহিত্যিক মতবাদ , একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি । লোকে যাকে বলে ‘ধ্রুপদী সাহিত্য’ । সাধারণতঃ যে সাহিত্যে থাকে সুসংযত রীতি , গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, ঐতিহ্যের অনুবর্তন – তাকেই বলে ‘ক্লাসিক সাহিত্য’ । আর সাহিত্য সৃষ্টিতে এই ভাব , ভাষা, রীতি ও

আদর্শকে গ্রহণ করার নামই হল ‘ক্লাসিসিজম’ । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন , ক্লাসিক মানে একটি সর্বাঙ্গসুন্দরতার পারফেকসনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা ।
“সাহিত্যসন্দর্শন” প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র দাস বলেছেন, কবি যখন জগৎ ও জীবনের ভাব চিন্তাকে নিয়মের মধ্যে ধীর স্থির ভাবে প্রত্যক্ষ করেন – তখন তাঁর দৃষ্টি “ক্লাসিক্যাল” ।
উদাহরণ :-
ভারতীয় – রামায়ণ , মহাভারত , মেঘনাদবধ কাব্য , বৃত্রসংহার (হেমচন্দ্র) ।
পাশ্চাত্য – ইলিয়াড , ওডিসি , ভার্জিলের ‘ইনিভ’ , মিলটনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’ ।
উদ্ভব :-
ক্লাসিক সাহিত্যের উপর নির্ভর করেই এর জন্ম । সাহিত্যতত্ত্ববিদদের মতে , ক্লাসিসিজমের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন রোমে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক কাব্যের ভাবনা প্রথম ধরা পড়ে – পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রদমদিকে বড়ু চন্ডিদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে” । আর প্রথম ক্লাসিক কাব্য রচনা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের কবি মাইকেল মধুসূদন দও । কাব্যটি ছিল – “মেঘনাদবধ” ।
বৈশিষ্ট্য
ক) সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকে আগ্রহ
খ) মানব জীবনের গভীর ও সর্বোচ্চ প্রকাশ
গ) প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতা বজায় রেখে ঘটনাবিন্যাস
ঘ) যুক্তিবাদী মননশীলতা ও সামাজিক তীক্ষ্ণতা
ঙ) শব্দের প্রচলিত অর্থ যথাযথ রাখা ।

রোমান্টিসিজম

সংজ্ঞা :- রোমান্টিসিজম হলো একটি সাহিত্যিক ভাবানুভূতি ।এর সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত দিয়েছেন ,
1) অধ্যাপক হারফোর্ড বলেছেন – Romanticism is an extraordinary development of imaginative sensibility. অর্থাৎ , কল্পনার প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই হল রোমান্টিসিজম ।
2) হ্যামিলটন বাকল বলেছেন – Romanticism has already passed into the realm of the unknowable.

3) ওয়ালটার পেটার বলেছেন – সৌন্দর্য অনুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতুহল বোধের সংযোগটি হল রোমান্টিসিজম ।

(এছাড়া আরো রয়েছে)

এগুলির মধ্যে সমালোচকেরা হারফোর্ডের সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করেছেন। ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে রোমান্টিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হলেন কোলরীজ , ওয়ার্ডসওয়ার্থ , উইলিয়াম ব্লেক প্রমূখ । রোমান্টিক শব্দটির উৎস ফরাসি ভাষায় "রোমাঞ্চ" শব্দ যার অর্থ লাতিন শব্দের পরিবর্তে রচনায় গ্রাম্য কথ্য শব্দ প্রয়োগের সাহস । রোমান্টিক সাহিত্যের প্রথম সার্থক নিদর্শন হল কোলরীজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিলিত রচনা "লিরিক্যার ব্যালাডস" (1798) ।

উদ্ভব :- রোমান্টিসিজমের উদ্ভব ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে , ইংল্যান্ডে ।

বৈশিষ্ট্য :- ব্যক্তিনিষ্ঠতা , স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা , কথ্য ভাষার প্রতি আগ্রহ , নতুন শব্দের ব্যবহার আগ্রহ , আবেগ প্রবণতা , কল্পনা বিলাস , গতিশীলতা , প্রকৃতিপ্রীতি , মানবতাবাদ ইত্যাদি ।

ট্র্যাজেডি

সংজ্ঞা :- ট্র্যাজেডি হল সেই নাটক , যাতে গূরুগম্ভীর , পূর্ণাঙ্গ , আকর্ষণীয় ঘটনার অনুকরণ থাকে ; যার বিষয় শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের উদ্রেক ঘটায় ।

আবার , অ্যারিস্টটলের মতে , " Tragedy is an imitation , not of men, but of an action , and of life. " (Poetics)

উৎস ও অর্থ :- গ্রীক শব্দ ট্রাগোস। যার অর্থ – ছাগ ।

ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ তিনটি । যথা – দৃশ্য , গীথ , কথা এবং অন্তরঙ্গ তিনটি । যথা – প্লট , চরিত্র , ভাবনা ।

ট্র্যাজেডি সাহিত্যের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা –

ক. গ্রীক ট্র্যাজেডি

খ. শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি

গ. ইবসেনীয় বা আধুনিক ট্র্যাজেডি ।

অ্যারিস্টটলের মতে , ট্র্যাজেডির উপাদান :- ছয়টি । যথা –

ক. কাহিনী (Plot)

খ. চরিত্র (Character)

গ. ভাবনা (Thought)
ঘ. রচনারীতি (Diction)
ঙ. সংগীত (Melody)
চ. দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) ।
অ্যারিস্টটলের মতে , ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ :- চারটি । যথা –
ক. জটিল ট্র্যাজেডি (Complex)
খ. যন্ত্রণার ট্র্যাজেডি (Pathetic)
গ. নৈতিক ট্র্যাজেডি (Ethical)
ঘ. সরল ট্র্যাজেডি (Simple) ।
ট্র্যাজেডির সাম্প্রতিক শ্রেণীবিভাগ :- ছয় প্রকার । যথা –
ক. ক্লাসিক্যাল / Classial
খ. রোমান্টিক / Romantic (শেক্সপীয়রের "রোমিও জুলেয়ট")
গ. ডোমেস্টিক / Domestic (হেনরিক ইবসেনের "A Doll's House")
ঘ. হিরোয়িক / Heroic (ড্রাইভেনের "All for Love")
ঙ. সোস্যাল / Social (গলসওয়ার্দির "Strike")
চ. পোয়েটিক / Poetic . (জন ড্রিঙ্কওয়াটারের "The God of Quaite")
বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত কিছু ট্র্যাজেডির উদাহরণ :-মধুসূদন দত্তের "কৃষ্ণকুমারী" ।
গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" , "বলিদান" ।
রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" , "বিসর্জন" , "মালিনী" ।
দ্বিজেন্দ্রলালের "নূরজাহন" , "সাজাহান" ।
মন্মথ রায়ের "জীবনটাই নাটক" , "কারাগার" ।
তুলসী লাহিড়ির "ছেঁড়া
তার" । — ইত্যাদি ।
গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রথম লেখক কে হলেন থেসপিস ।
ষোড়শ শতকে বিখ্যাত কিছু ট্র্যাজেডিকার হলেন – মারলো , টমাস কীড , শেক্সপীয়র , চ্যাপম্যান , ফ্লেচার , জনফোর্ড প্রমুখ ।

৭.৪.১৬.২ রূপক ও সাংকেতিক নাটক

রূপকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Allegory'। 'Allegorical Drama' বা রূপক নাটক বলতে বোঝায় বিশেষ ধরনের একরূপ রচনা যাতে কাহিনি, ঘটনা , চরিত্র প্রভৃতি উপায় বা উপলক্ষ মাত্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে কোন ভাব বা তত্ত্ব । আপাত কাহিনিটির সমান্তরালে অন্তর্নির্হিত ভাবার্থটিকে ব্যক্ত করা হয় এখানে ।

Symbol – এর বাংলা প্রতিশব্দ হল সংকেত । কিন্তু Symbolical Drama – এর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিৎ প্রতীক নাটক । কারন সংকেত ও প্রতীক সমার্থক নয় । দুয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুব কঠিন । এককথায় পণ্ডশ্রম মাত্র । প্রসিদ্ধ সমালোচক Comte প্রতীকের বৈশিস্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,-

"Symbol means every conventional representation of the idea by the forms of the unseen by the visible."

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে – "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে ।"

অথবা

"আমি চঞ্চল হে , আমি সুদূরের পিয়াসী ।"

-"ডাকঘর" নাটকে এই সুদূরের সংকেত , অজানার ইঙ্গিত সকরুণ গীতিমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । অমল, সুধা, ঠাকুরদাদা, ডাকহরকরা, অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করে এমন সুন্দর করুন একটি রহস্য ঘনীভূত হয়েছে এবং এমন সুকৌশলে শেষপর্যন্ত সেই রহস্যটিকে ধরে রাখা হয়েছে যার তুলনা অন্য সাংকেতিক রহস্যময় নাটকগুলিতে নেই ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক / প্রতীক নাটকগুলি যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী একথা অনস্বীকার্য । বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের নাটক আগে রচিত হয়নি বললেই চলে । 'ডাকঘর'

নাটকটি রবীন্দ্রনাথের অরূপ সাধনার যুগের রচনা । নাট্যসমালোচকেরা 'ডাকঘর' নাটকটিকে রূপক সাংকেতিক নাটক বা রূপক-সংকেতমিশ্র নাটকের অন্তভুক্ত করেছেন

ডাকঘর নাটকের চরিত্রগুলি অধিকাংশই রূপক বা সাংকেতিক । নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'অমল' ; যার অর্থ অমলিন । রুগ্ন বালক অমল অভিজ্ঞ বিষয়ী মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র ; সম্পর্কে তিনি অমলের পিসামশায় । অসীম মমতা বশত মাধব দত্ত রুগ্ন, অসুস্থ অমলকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করে দেন কারন কবিরাজের মতে –

" শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিসবৎ -"

অমলের যে অসুখ, তাও প্রকৃত বাস্তব ব্যাধি নয় আত্মার বন্ধনপীড়নের ব্যাধি । শাসনের চাপে ক্লান্ত পীড়িত আত্মার ক্রন্দন ও তার মুক্তির ইঙ্গিত নাটকে তুলে ধরা হয়েছে । লৌকিক কবিরাজের চিকিৎসাশাস্ত্র জ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেয় যে অমল মৃত্যুপথেই চলছে । তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন , -

" ডাকঘরের অমল মরছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী – রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না , কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে ।"

-তাই রাজকবিরাজ এসে অমলের ঘরের সব দরজা জানালাগুলি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থবোধ করে । তার ব্যাথা-বেদনার অবসান ঘটে এবং অমল ঘুমিয়ে পড়ে । তাই রাজকবিরাজের মুখে শোনা যায় –

"এলো , এলো , ওর ঘুম এলো । ...আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক , ওর ঘুম এসেছে। "

প্রসঙ্গত অমলের এই ঘুমিয়ে পরার সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের অনুসঙ্গ আমাদের মনে পরে –"এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ।।"

এই নাটকের নায়ক অমল চরিত্রের বৈশিস্ট মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যাতে পারে । প্রথম স্তরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় আর দ্বিতীয় স্তরে রাজার বা অরূপের জন্য উদ্বেগ । দ্বিতীয়টি যে প্রথমটির পরিণাম তা কবি সুস্পস্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন । কবি লিখেছেন –

" Amal represents the man whose soul has received the call of the open road..."

অমলের বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে এই কথাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সে পণ্ডিত হতে চায় না । সে বলেছে ,-

" আমি যা আছে সব দেখব – কেবলই দেখে বেড়াব।"

" আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই – যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে ।"

অমলের নানা উক্তির মধ্যে সেই অচীনপুরের ইশারা রয়েছে। যারা বিষয়ী, সংসারী তথা মাধব দত্ত বা পঞ্চানন মোড়ল – এর মত লোকেরা সুদূরের আহ্বান, আজানার ইঙ্গিত শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না । তাই রাজার কাছ থেকে চিঠি আসবে শুনে মাধব দত্ত আতঙ্কিত হয় । তার দৃষ্টি সংকীর্ন ও সীমিত । অমল যে লোক-কল্পনাতীতের ডাকঘর থেকে চিঠি পেতে পারে একথা বিশ্বাস করতে না পেরে মোড়ল তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলে –

" রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে ! তা লিখবে বৈকি ! তুমি যে তার পরম বন্ধু ! ..."

নাটকের গূঢ় তত্ত্বের ভাষ্যকার হলেন ঠাকুরদাদা । তার দৃস্টি স্বচ্ছ । তিনিও অনুভব করতে পারেন সুদূরের আহ্বান । ঠাকুরদাদার কল্পনাশক্তিও অমলের কাছে হার মেনেছে ,-

"অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি ।"

অমলের সঙ্গে আরো তিনটি চরিত্রের যোগবেশ নিবিড় । দইওয়ালা , প্রহরী ও সুধা । দইওয়ালার দই বেচার সুর ও নানা জায়গায় তার ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা অমলকে মুগ্ধ করে । প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে অমলকে না ভালবেসে পারে না দইওয়ালা । দই বেচারও যে কত সুখ সে অমলের সঙ্গে আলাপে বুঝতে পারে,-

" ... আমার কোন লোকসান হয় নি । দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম ।"

অন্যদিকে প্রহরী যেন এখানে সময় তথা কালের প্রতীক হয়ে উঠেছে ;"ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে , সময় বসে নেই , সময় কেবলই চলে যাচ্ছে ।" সময় কোথায় যায় ? অমলের শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় – " সে দেশে সবাইকে যেতে হবে ।" প্রহরী এখানে কালের যাত্রার ব্যাখ্যায় মৃত্যুর দেশের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে জানায় " সময় হলে তবে ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।"

রাজার ডাকহরকরাদের নামটিও লক্ষ্য করার মতো । একজনের নাম বাদল ও আরেকজনের নাম শরৎ । এই নামদুটি যেন ঋতুর প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে । প্রকৃতিও এই নাটকে বিশিস্ট স্থান পেয়েছে ।

বস্তুত 'ডাকঘর' নাটকে মানবচিত্তের যেটুকু পার্থিব রস ও রহস্য তা সুধাকে কেন্দ্র করেই । " অমল যে শুধু প্রতীক হইয়া ওঠে নাই তাহা সুধার জন্যই ।" নাটকের শেষে দেখা যায় সুধা অমলের জন্য ফুল এনেছে কিন্তু তখন অমল ঘুমের অতলে ডুব দিয়েছে । তাই সে রাজকবিরাজকে বলেছে – " বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলে নি ।" এই কথাটিতে যেন মানব রসের সঞ্চার করেছে । সুধার হাতের ফুল মূলত প্রেমের প্রতীক । শেষ মুহূর্তে মানবীয় প্রেমের করুন সজল স্পর্শ দ্বারা কবি তার শিল্পসৃস্টির Tragic মাধুর্য দান করেছে ।

অমল এখানে হয়ে উঠেছে মানবাত্মার প্রতীক । আত্মা চায় মুক্তি । সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাজা বা অরূপের সাথে মেলার জন্য । এখানে ঘুম হয়ে উঠেছে মৃত্যু তথা মুক্তির প্রতীক । এই মৃত্যু জীবনের শেষ নয় , তা নবজীবন লাভের মাধ্যম মাত্র । মৃত্যু পূর্নতায় পৌছানোর সোপান । মৃত্যুর মধ্যেই মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটে । সুতরাং ঘুম এখানে প্রতীক নিদ্রা হয়ে উঠেছে । পাশাপাশি দেখা যায় যে নাটকের নামকরণেও একটি রূপকের ব্যবহার রয়েছে । এখানে 'ডাকঘর' হল বিপুল বিচিত্র পৃথিবী তথা বিশ্বপ্রকৃতি । চিঠি যেন সৌন্দর্য্য ও আনন্দ রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমস্ত নাটকেই রূপক – সংকেতের মাধ্যমে তিনি মূলত রুদ্ধ ও বদ্ধ জীবন থেকে আনন্দ – সৌন্দর্য্য – মুক্তির বানী পৌছে দিতে চেয়েছেন অমলের মাধ্যমে । রূপকের স্পর্শে নাটকটি যথার্থই রূপক নাটক হয়ে উঠেছে ।

সীমার মাঝে অসীমের আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন কবিগুরু যার স্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় অমলের মধ্যে । অমলের নিদ্রা তথা আরোগ্য লাভ তাকে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল যা একাধারে চিরকালীন মুক্তিকামী মানুষেরও আকাঙ্ক্ষা । শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্ধকাররাজ্য থেকে বেড়িয়ে আসা মুক্তির পথযাত্রী মানুষের অদ্বিতীয় রুপ অমল ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রূপক-সাংকেতিক নাটক :

১৯০৮	শারদোৎসব
১৯১০	রাজা
১৯১২	ডাকঘর
১৯১২	অচলায়তন

১৯১৬	ফাল্গুনী
১৯১৮	গুরু
১৯১৯	অরূপরতন
১৯২২	মুক্তধারা
১৯২৬	রক্তকরবী
১৯৩২	কালের যাত্রা

৭.৪.১৬.৩ : একাঙ্ক নাটক

আমাদের বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক একটি নতুনতর নাট্য আঙ্গিক হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি নতুন হলেও কালের বিচারে একাঙ্ক কিন্তু অভিনব কোনো নাট্যআঙ্গিক নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এর বহুল প্রচলন ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যেও এই ধরনের নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রাচীন ওইসব নাটকগুলির তুলনায় আধুনিক একাঙ্ক নাটকের একটা নিজস্বতা নিশ্চয়ই আছে। সংস্কৃতে একাঙ্ক শ্রেণীর নাটকের মুখ্য অভিমুখ ছিল আয়তনের সংক্ষিপ্ততার দিকে। অর্থাৎ ব্যায়োগ মানেই আকারে সংক্ষিপ্ত হবে, সংক্ষিপ্ততাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন ধারণা প্রাধান্য পেত। আধুনিক একাঙ্ক নাটকও আয়তনে সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সংক্ষিপ্ততা এর প্রধান নাট্যবৈশিষ্ট্য নয়। ভাব প্রকাশে, চরিত্র নির্মাণে, ভাষা ব্যবহারে একাঙ্ক নাটকের এমন একটা নিজস্বতা আছে যা দেখে সাধারণ পঞ্চাঙ্ক নাটকের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্যকে সহজে চিনে নেওয়া যায়। একাঙ্ক নাটকের এই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক বৈশিষ্ট্য, যেমন —

- একটিমাত্র বিষয় বা ঘটনা সংস্থানের সংহত নাট্যরূপায়ণ কাহিনী উপকাহিনীর শাখায়িত বিস্তার এখানে থাকে না।

- চরিত্রের বিকাশ, চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির বিস্তৃত প্রকাশ দেখানোর সুযোগ এখানে নেই, অথচ তার প্রয়োজন আছে। স্বভাবত নাট্যকার সংহত পরিসর ভাব ও ভাষার তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে চরিত্রকে যতদূর সম্ভব আলোকিত করেন।

- ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা প্রভৃতির প্রভাবে এখানে ঘনীভূত নাট্যরসের জাগরণ ঘটে। অন্যদিক থেকে বলা যায় সংক্ষিপ্ততা ও বাহুল্যবর্জনের অত্যধিক প্রবণতা এর কেন্দ্রসংহতিকে অনিবার্য করে তোলে, অনেকটা গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের মতো।

- ❑ গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের ভাষা ঠিক সাধারণ সমাজভাষার মত হয় না। সংকেত, প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহারে এর যেমন একটা নিজস্বতা তৈরি হয়, একাঙ্ক নাটকের ভাষাতেও সেই নিজস্বতা থাকে। এ ভাষার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ঘটনা ও চরিত্রের গভীর পর্যন্ত আলোকিত হয়।

- ❑ দ্রুতগতি কাহিনী ও বিকাশশীল চরিত্রের সহযোগে কোনো একাঙ্কিকায় ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণের সূত্রে নাটকীয় শীর্ষবিন্দুকে চূড়ান্ত করে তোলার বিষয়টি অনেকটা 'a monument's of monument'

- ❑ আধুনিক একাঙ্কিকার অন্যতম প্রধান লক্ষ একালের মানুষের চিত্ত সংকট বা ট্র্যাজিক অনুভূতিকে ধরা। আর তার জন্য প্রয়োজন কোনো একটি নির্দিষ্ট মানুষের জীবনবৃত্তের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা মাত্র তাই সাধারণভাবে চরিত্রআশ্রয়ী হয়।

একাঙ্ক নাটকের পরিসর যে একটি অঙ্কের মধ্যে সীমায়িত থাকবে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর সময়সীমা নিয়ে। কতক্ষণ স্থায়ী হবে একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। চল্লিশ মিনিট? এক ঘন্টা? কারও মতে এই সময়সীমা হওয়া উচিত আরও বেশি, কারও মতে আরও কম। আমাদের মনে হয় এইরকম নিক্তিতে সময় মাপার প্রবণতা ঠিক নয়। সংহতপরিসর একাঙ্ক নাটকের অত্যাবশ্যক শর্ত। এই অত্যাবশ্যক শর্ত মেনে রচিত কোনো নাটকে অভিনয়ে যত সময় লাগা প্রয়োজন ঠিক তত সময়ই দিতে হবে। বাইরে থেকে সময় বিষয়ে বাধা নিষেধ আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। তবে যেহেতু অভ্যন্ত সংক্ষিপ্ত আয়তনের সেইহেতু এর অভিনয়ে একঘন্টার বেশি সময় লাগবে না বলে ধরেই নেওয়া যায়।

জার্মান নাট্যকার লেসিড্ এর 'Dil Judan' প্রথম উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। বাংলায় এই ধারার নাটকের মধ্যে রয়েছে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', বনফুলের 'শিককাবাব' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুধু বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাসাহিত্যে এখন একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আর এর মূলে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর মানুষের জীবনানুভূতি।

৭.৪.১৬.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ক্লাসিক ও রোমান্টিক নাটক বলতে কী বোঝো?

২। রূপক ও সাংকেতিক নাটক বলতে কী বোঝো? যেকোনো একটি নাটকের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। একাঙ্ক নাটক কী?

৭.৪.১৬. ৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

অষ্টম পত্র

বিশেষ পত্র –ভাষাবিজ্ঞান

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ডক্টর সুখেন বিশ্বাস - অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

চতুর্থ ষাণ্মাসিক বা চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পাঠক্রম

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

একক ১. প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ২. বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ৩. সত্যজিতের গদ্যভাষা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৫ ঘণ্টা)

একক ৪. সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

একক ৫. বিশ্বভাষা

একক ৬. বইয়ের ভাষা

একক ৭. সংবাদপত্রের ভাষা

একক ৮. সম্প্রচারের ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. বিজ্ঞাপনের ভাষা

একক ১০. অভিধানের ভাষা

একক ১১. পরিভাষা

একক ১২. সমাজ ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. অন্তর্জালের ভাষা

একক ১৪. শব্দার্থতত্ত্ব

একক ১৫. অভিধানতত্ত্ব

একক ১৬. বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি

চতুর্থ ষাণ্মাসিক বা চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

সূচিপত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১		
একক ১. প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**১-৯**
একক ২. বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**১০-১৬**
একক ৩. সত্যজিতের গদ্যভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**১৭-২৭**
পর্যায় গ্রন্থ : ২		
একক ৪. সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্ব চর্চা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**২৮-৩৪**
একক ৫. বিশ্বভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**৩৫-৭৬**
একক ৬. বইয়ের ভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	**৭৭-৭৮**
একক ৭. সংবাদপত্রের ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	**৭৮-৯০**
একক ৮. সম্প্রচারের ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	৯১-৯৮
পর্যায় গ্রন্থ : ৩		৯৯-১১০
একক ৯. বিজ্ঞাপনের ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	১১০-১১৮
একক ১০. অভিধানের ভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১১৯ ১২৫
একক ১১. পরিভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১২৬- ১৩৮
একক ১২. সমাজ ভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৩৯- ১৪৮
পর্যায় গ্রন্থ : ৪		
একক ১৩. অন্তর্জালের ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	১৪৯-১৫৮
একক ১৪. শব্দার্থতত্ত্ব	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৫৯-১৬৮
একক ১৫. অভিধানতত্ত্ব	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৬৯-১৭৫
একক ১৬. বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৭৬-১৮৫

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৮.১.১.১ প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৮.১.১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.১.১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১.১.১ : প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

প্রাচীন ভারত ভাষাতত্ত্ব চর্চায় প্রাচীন পৃথিবীতে সর্বাগ্রে গণ্য। পৃথিবীর ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসের ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করেছে গ্রীক, রোম, জার্মান ও ভারতবর্ষ। গ্রিস, রোম এবং জার্মানের মতোই ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' পৃথিবীর প্রথম এবং প্রাচীনতম ভাষাচর্চার ফসল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে তিনটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—প্রাক্ পাণিনি যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা, পাণিনির সময়কালীন ভাষাতত্ত্ব চর্চা, পাণিনি উত্তর সময়ের ভাষাতত্ত্ব চর্চা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যের সাথে এর পার্থক্য ছিল মূলত এই যে পাশ্চাত্যে যা ছিল দর্শননির্ভর এদেশে তা বর্ণনামূলক এবং সাহিত্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্বচর্চায় পাণিনি আকাশ থেকে পড়ে বিখ্যাত হয়ে যাননি। তাঁর বিকাশ পূর্বেকার যা নিদর্শন এবং যাঁরা পূর্বেকার ভাষাচর্চাকারী তাঁদের আলোচনার ভিত্তিস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। পাণিনি নিজেও তাঁর পূর্বসূরী অনেকের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন— কাশ্যপ, শৌনক, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, গালব, শাকটায়ন প্রমুখ। আর যেসব গ্রন্থে ভাষাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল—বেদ এবং বেদ পরবর্তী উপনিষদ, শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, প্রতিশাখ্য ইত্যাদি।

বেদ হল চারটি। যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ। ঋগ্বেদ হল পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন (খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে)। এই ঋগ্বেদেই প্রথম 'বাক্' কথাটির প্রাপ্তি ঘটে। এই বাক্ চার প্রকার। ব্রাহ্মণ মনীষীরা তা জানেন, তিন প্রকার বাক্ গুহায় নিহিত চতুর্থ প্রকার বাকে মানুষেরা বলে। আবার পরবর্তীকালে 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ'-এ বলা হয়েছে বাক্ প্রথমে অপ্রত্যক্ষ ও অব্যাকৃত বা অখণ্ড ছিল। ইন্দ্র প্রথম দেবতাদের অনুরোধে বাক্-এর মধ্যভাগ বিশ্লিষ্ট করে তাকে ব্যাকৃত করেন, তাই তাকে বাক্ বলা হয়। ব্যাকরণের বিশ্লেষণেও এই অর্থে পাওয়া যায়—ব্যাকরণ = বি + আ + $\sqrt{}$ কৃ + অনট্। এইভাবে বেদের মুনি, ঋষিরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভাষাচর্চা করেছেন। তবে এই গ্রন্থে ভাষাবিশ্লেষণের উল্লেখ থাকলেও বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণের নীতি পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনা করা হয়েছিল বৈদিক সংহিতার নানা সূত্রের ব্যাখ্যা ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে। এই 'ব্রাহ্মণ' অংশে সর্বপ্রথম বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বগত দিক শর্তাল্লেখ্য রূপ পায়। ব্রাহ্মণে মূলত ভাষার যে সকল দিক আলোচনা করা হত, সেগুলি হল—ধ্বনির উচ্চারণ, স্বরাঘাত বিধি, সন্ধির বিধান, সমাসের নিয়ম, পদ বিভাগ, বিভক্তি, বচন ও ক্রিয়ার কাল।

প্রাক্ পাণিনি যুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসের ক্ষেত্রে বেদাঙ্গ সবথেকে উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। বেদাঙ্গ ছিল মূলত বেদকে সম্পূর্ণ রূপে জানার জন্যে একটি ব্যাকরণগত বা ভাষাগত পাঠবিশেষ।

এই বেদাঙ্গ পাঠের মাধ্যমে বেদের সূত্র, অধ্যায়কে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব হত। বেদাঙ্গ ছ-টি বিভাগে বিভক্ত। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

বৈদিক মন্ত্র নির্ভুলভাবে পাঠ করার জন্য শিক্ষাগ্রন্থ রচনা করা হয়। শিক্ষা বলতে যে ব্যাপক অর্থে Education-কে বোঝায়, সে যুগে শিক্ষার অর্থ অনেক সংকীর্ণ ছিল এবং তা রচিত হত বেদশিক্ষার পরিপূরক হিসেবে, বেদ পাঠের উপযুক্ত মননস্তর তৈরি করতে। এখানে ধ্বনির প্রকৃতি, ধ্বনির দীর্ঘতা, ধ্বনির মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হত। চারটি বেদের শিক্ষাগ্রন্থগুলি হল—

ঋগ্বেদের — পাণিনীয় ব্যাকরণ

সামবেদের — নারদীয় শিক্ষা

শুক্ল-যজুর্বেদের শিক্ষা — যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা

অথর্ববেদের শিক্ষা — মাণ্ডকী শিক্ষা।

ঋগ্বেদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রন্থটি হারিয়ে যায়। পরে পাণিনির লেখা শিক্ষাগ্রন্থটি ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ হিসেবে যুক্ত হয়। আবার মূল শিক্ষাগ্রন্থগুলি হারিয়ে গেলে পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি হয় 'প্রাতিশাখ্য'। যেমন—

ঋগ্বেদ — ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য

সামবেদ — সাম প্রাতিশাখ্য

যজুর্বেদ — কাত্যায়ন রচিত শুক্ল প্রাতিশাখ্য

অথর্ববেদ — অথর্ব প্রাতিশাখ্য।

এই প্রাতিশাখ্য গ্রন্থদুটির মূলত দুটি গুরুত্ব ছিল। যথা—বেদের ধ্বনিতত্ত্বের মূল নীতি নির্ধারণ ও উক্ত নীতিগুলি সূত্র বিশ্লেষণের দ্বারা বেদের মন্ত্র বিশ্লেষণ। অধিকাংশ প্রাতিশাখ্যই এখনও পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে বেদের 'পদপাঠ' সম্পর্কে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা দেওয়া হত।

প্রাচীন ভারতের শব্দার্থ নির্ণয়ের শাস্ত্র হল 'নিরুক্ত'। ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র এটি। বৈয়াকরণ দুর্গার মতে ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের জন্য সূত্র রচনা করা হচ্ছে ব্যাকরণের কাজ আর শব্দার্থ নির্ণয়ের কাজ হল ব্যুৎপত্তি শিক্ষা। ব্যুৎপত্তি আলোচনায় পাণিনি, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির মতে শব্দ ও অর্থ অনাদি অবিনশ্বর ও শাশ্বত সম্পর্কে আবদ্ধ। এঁরা প্রত্যেকেই স্বভাববাদী। আর প্রথাবাদীদের মতে শব্দের সঙ্গে বস্তুর অর্থাৎ শব্দনির্দেশিত বস্তুর কোনো 'সংযোগ নেই' কোনো 'সমবায়'ও নেই। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক হচ্ছে প্রথাগত।

আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী ও পণ্ডিত ভগবৎ দত্তের মতে যাস্কই 'নিরুক্ত' রচয়িতা। এর আগে বৈদিক ভাষার দুর্বোধ্য একটি শব্দের তালিকা 'নিঘন্টু' ছিল। প্রজাপতি কশ্যপ-এর রচনাকার। যাস্ক এই 'নিঘন্টু'-র ভাষা রচনা করেন, তার নামই 'নিরুক্ত'। এতে নাম বা বিশেষ্য, সর্বনাম আখ্যাত বা ক্রিয়া, উপসর্গ, নিপাত প্রভৃতি সমালোচিত হয়েছে।

ছন্দ বিষয়ক যেসব গ্রন্থের উদ্ভব প্রাক্ পাণিনির যুগে হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র'। এখানে বেদের সাতটি ছন্দের (গায়ত্রী, বৃহতী, জদাতী, ত্রিস্টুপ, অনুষ্টুপ, পুংক্তি, ঊষিতক) বর্ণনা বর্তমান। এছাড়াও ছন্দবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল—কেদার ভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' নারায়ণের 'বৃত্ত রত্নাকর' ইত্যাদি।

ইতিপূর্বে কৃষ্ণ যজুর্বেদ ভাষাকে প্রথম 'ব্যাকৃত' করার কথা জানা যায়। আর ব্যাকরণ কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় 'গোপথ ব্রাহ্মণে'। এখানে ব্যাকরণের রূপ ও ধ্বনিগত আলোচনা গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু 'বেদাঙ্গ' অন্তর্গত প্রাচীন ব্যাকরণ পুরোটাই লুপ্ত হয়েছে।

এরপর প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রটি হয়ে যায় অনুর্বর। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনির আবির্ভাব প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পশ্চিম পঞ্জাবের শিয়ালকুট অঞ্চলের শালাতুর গ্রামে পাণিনির জন্ম হয়। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের মতে পাণিনি হচ্ছেন মানব মনীষার পরম উৎকর্ষের নিদর্শন। তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী'-র ভাষ্য-উপভাষ্য-মহাভাষ্যই হচ্ছে পরবর্তীকালের বৈয়াকরণদের বিচারক্ষেত্র। পাণিনিকে বলা হয় দাক্ষী পুত্র। কারণ তার মায়ের নাম ছিল দাক্ষী।

ভাষাতত্ত্ব চর্চার ঠিক কোন্ সময়ে পাণিনির আবির্ভাব, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নানা যুক্তি অনুমান, প্রমাণে তা নির্ণয় করা হয়। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রয়ী বলেছেন, পাণিনি ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ছিলেন। ম্যাক্সমুলারের মতে ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুনীতিকুমার বলেছেন খ্রি: পূ: পঞ্চম শতাব্দী। O.B.D.L. গ্রন্থে সুনীতিবাবুর বক্তব্য—

> "In the 5th century B.C. the great grammarian Panini wrote, his 'Astadhyayi".

পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় রয়েছে, যা চার হাজার সূত্রের সমষ্টি। শব্দের গঠন প্রণালীর নির্দেশ ওই সূত্রে পাওয়া যায়। প্রতিটি অধ্যায় মূলতঃ চারটি পদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ থেকে অষ্টম অধ্যায় প্রথম পাদ একটি অংশ এবং অষ্টম অধ্যায়ের ২য় পাদ থেকে ৪র্থ পাদ পর্যন্ত আর এক অংশ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বৈয়াকরণ কাত্যায়ন তাঁর বার্তিকে পাণিনির চার হাজার শ্লোকের মধ্যে পনেরশো শ্লোকের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। ওই সময়ে পতঞ্জলিও অষ্টাধ্যয়ীর এক 'মহাভাষ্য' রচনা

করেছিলেন। তিনি পাণিনির সমস্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেননি। কাত্যায়ন পাণিনির যেসব সূত্রের ত্রুটি দেখিয়েছিলেন কিংবা তিনি নিজের যেসব সূত্র সংশোধনযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন, পতঞ্জলি কেবল সেইসব সূত্রেরই ভাষ্য রচনা করেন। এছাড়াও আর একজন বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণের আলোচনা হলেও এটি ছন্দোবদ্ধ রচনা। তাঁর তত্ত্বের সারকথা হল বাক্যের অবিভাজ্যতা। এই গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়—ব্রহ্ম, বাক্যকাণ্ড ও প্রকীর্ণ কাণ্ড। বোঝা যায় পাণিনির স্থানটি যেন কেন্দ্রেই।

যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থে বৈদিক শব্দগুলি সুশৃঙ্খলিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে. আর পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী'-তে রূপতত্ত্বের পরম বিকাশ দেখা গেছে। কিন্তু পাণিনি সম্পর্কে অভিযোগ তিনি রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বকে একত্রে মিলিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন—তিনি প্রথম অধ্যায়ের স্বরাঘাত বিধির (ধ্বনিতত্ত্ব) সাথে ক্রিয়াপদের (রূপতত্ত্ব) আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমালোচনা ঠিক নয়। কেননা, তিনি একজন মহৎ ব্যাকরণবিদ ছিলেন এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের একত্র আলোচনা করেছেন, যা বর্তমানেও বহুভাষাতাত্ত্বিক করে থাকেন।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়।—প্রথম অধ্যায়ে আছে ভাষার সংজ্ঞা ও পরবর্তী অধ্যায়গুলির সূত্রসমূহ ব্যাখ্যার নিয়ম বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাস, কারক-বিভক্তি আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কৃৎ প্রত্যয়, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়, পঞ্চম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্বরাঘাত, সপ্তম অধ্যায়ে ধ্বনি পরিবর্তন ও অষ্টম অধ্যায়ে স্বরাঘাত বিধি ও সন্ধির নিয়ম।

অষ্টাধ্যয়ী চার হাজার সূত্রকে আটটি অধ্যায়ের বিন্যাসকে এইভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) প্রত্যাহার, (২) অনুবন্ধ, (৩) গণ (সম প্রক্রিয়ায় রূপান্তর লাভ করবে এমন শব্দের তালিকা), (৪) অনুবৃত্তি (বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে শব্দ সংখ্যা কমানো), (৫) সূত্রক্রম (কোন্ সূত্র কীভাবে প্রযুক্ত, কী ক্রমে বসানো হবে, তা ঠিক করা)। পাণিনির সূত্র, বার্তিক সূত্র ছাড়াও-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও সাত রকমের সূত্র। যেমন—সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অধিকার, অতিদেশ ও অপবাদ। সংজ্ঞা বিষয়ক সূত্রগুলি হচ্ছে লক্ষণ বর্ণনা আর পরিভাষা হচ্ছে বিশদ ব্যাখ্যা। বিধি হল সাধারণত নিয়ম আর নিয়ম বলতে বোঝানো হয়েছে বিশেষ নিয়মকে। অধিকার হল নিয়ন্ত্রক নিয়ম, আর অতিদেশ হচ্ছে নিয়মের বিস্তার। এছাড়া অপবাদের অর্থ হল ব্যতিক্রমী নিয়ম। তবে পাণিনির সূত্রের দুটি প্রধান ভাগ—(১) প্রধান সূত্র বা অধিকার সূত্র ও (২) উপসূত্র বা অধীনস্থ সূত্র। অধিকার সূত্রগুলি উপসূত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রতিটি উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্র পাঠ করতে হবে। যেমন—পদ কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান সূত্র বলছে 'সুপতিংন্তমপদম্' অর্থাৎ কারক ও ক্রিয়ার দ্বারা পদ গঠিত। তবে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় 'সুপ্' ও 'তিঙ' বিভক্তিযুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়। আবার পদ সম্পর্কে উপসূত্রে বলা হয়েছে 'ন' ক্যে' (পদম্) অর্থাৎ যেসব শব্দের শেষে 'ন' আছে যেসব শব্দের সঙ্গে 'ক্য' অর্থাৎ ক্যচ্, ক্যঙ, ক্যশ্ জাতীয় বিভক্তি যোগ করলে সেগুলি হয় পদ। সুতরাং বোঝা গেল উপসূত্র মূলসূত্রকে অনুসরণ করছে।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে ধ্বনিবিষয়ক কিছু আলোচনা আছে। তবে প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা পাণিনির আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। আবার পাণিনি সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার না করে কেবলমাত্র বর্ণের দ্বারা বাক্যসূত্র নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত নেন এভাবে ১৪টি সূত্র রচনা করেন যা 'প্রত্যাহার সূত্র' নামে পরিচিত। এগুলি হল—(১) অ ই উ ন্, (২) ঋ ন্ ক্, (৩) এ ত্ত ঙ্, (৪) ঐ ঔ চ্, (৫) হ য় ব র ট্, (৬) ল ন্, (৭) ঞ ম ঙ ন ন ম্, (৮) ঝ ঙ ঞ্, (৯) ঘ ট ধ স্, (১০) জ ব গ ড় দ শ্, (১১) খ ফ ছ ঠ চ ট ত ব্, (১২) ক প য্, (১৩) শ ষ স র্, (১৪) হ ল্ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটি সূত্র বিশ্লেষণ করলেই এর অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা যায়। যেমন—কপয্ সূত্রটি থেকে ক্, প্, য্, এভাবে ক্রমে মূল বিষয়টিতে আসা যাবে 'ইৎ' যাবে য্ থাকবে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত বর্ণ এই সূত্রে।

পাণিনি দলবিন্যাসের দ্বারা শব্দকে বর্গীকরণ করেছেন। এই ১০টি দল হল ভ্বাদি, তুদাদি, ধাঁদি, ক্রুপাদি, দিবাদি, চুরাদি, অদণদি, হবাদি, ঝর্বাদি, তনাদি ইত্যাদি। দল সম্পর্কে বিশ্লেষণ পাণিনির দলপাঠ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া পাণিনি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে শব্দ এবং তার সাথে ধাতুকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ক্রিয়ার মূল রূপ হিসেবে 'ধাতু'-কে তো পেয়েছেনই, আবার তিনি বলেছেন শব্দের মূলেও একটি করে ক্রিয়ার ধাতু রয়েছে। অর্থাৎ সব শব্দই এমনকি নামশব্দও ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। পাণিনির এইসব পদের মূলে 'ধাতু' থাকার তত্ত্বকে অনেকেই বলেছেন পাণিনির 'Root Theory'।

পাণিনি এককালিক বা বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতে প্রথম ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন। নোয়াম চমস্কিও তাঁর 'বর্ণনামূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ' গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্বীকার করেছেন যে তিনি পাণিনিকে বহুক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছেন। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' গ্রন্থে বলেছেন—

> "The grammar of panini .... is one of the greatest manuments of human intellegence."

অন্যদিকে Dr. S. S. Misra বলেছেন—

> "Sanskrit laid, the foundation of comperatiuc philosophy .... being the Sanskrit Grammar of panini".

পাণিনির ধারণা ছিল বেদের ভাষা দেবভাষা। সেই ভাষায় শুধু দেবতারই কথা বলবে। সেই ভাষা যাতে বিকৃত না হয়, সেজন্য তিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করলেন।

এবারে পাণিনি উত্তরযুগের ভাষাতত্ত্ব চর্চা আলোচনা করলে দেখা যাবে পাণিনির পর প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে আবার এক অনিশ্চয়তা এবং অনর্বরতার যুগ। প্রায় ১০০-২০০ বছর এই যুগ জীবিত ছিল। এরপর একে একে আসলেন কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি প্রমুখ।

পাণিনির পর প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বচর্চার অনুর্বর পর্বকে দূর করার জন্য প্রথম সচেষ্ট হন কাত্যায়ন। বেলভারকরের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতাব্দী। তাঁর গ্রন্থগুলি হল—বার্তিক সূত্র ও বাজসেনয়ি প্রাতিশাখ্য। 'বার্তিক সূত্রে' পাণিনি বর্ণিত ১৫০০ সূত্রের যুগগত উৎকর্ষ এবং গুরুত্ব ফুরিয়েছে। এই সূত্রকে তিনি নতুন পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংস্কার ইত্যাদি করেন। আর 'বাজসেনয়ী প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থটি বেদাঙ্গ গ্রন্থের শুক্ল যজুর্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ এবং এই গ্রন্থটি বেদের মন্ত্রোচ্চারণ রীতি ব্যাকরণ শিক্ষার একটি বেদমাল্য গ্রন্থ। এখানে যজুর্বেদের ভাষার ধ্বনি, বানান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কাত্যায়নের পর প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন পতঞ্জলি। কাত্যায়নের সঙ্গে তাঁর সময়ের ব্যবধান অনেক। পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন।

'মহাভাষ্য' পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থের ভাষ্য বা সমালোচনা। কাত্যায়ন তাঁর 'বার্তিকসূত্র'-এ পাণিনির যে সব সূত্রের বিরোধিতা করেন, পতঞ্জলি উক্ত সূত্রগুলিকে পুনরায় তার যথাযোগ্যতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা বিচার করেন। এই গ্রন্থে পাণিনির সূত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তিনি 'মহাভাষ্য'-এ পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী'-র ভাষ্যজাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকে পাণিনির মতো আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়কে চারটি পাদে। বিভিন্ন পাদ আবার বিভিন্ন আহ্নিকে বিভক্ত। সাধারণত ব্যাকরণ গ্রন্থ নীরস হলেও পতঞ্জলির 'মহাভাষে'-এর রচনারীতি আকর্ষণীয় প্রাঞ্জল।

পতঞ্জলির পর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেন চন্দ্রগোমী। ৪৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি পাণিনি, পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন মুনিত্রয়কে নিয়ে টীকা রচনা করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের রচয়িতাও তিনি।

চন্দ্রগোমী বিশেষভাবে খ্যাতিমান না হলেও তাঁর পরবর্তীকালের ভর্তৃহরি ভাষাতত্ত্ব চর্চায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবত ৪৯৫-৫৪১ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর অন্যতম রচিত গ্রন্থ—'রাবণবধ' ও 'বাক্যপদীয়'। তবে অনেকে 'রাবণবধ'-এর ভর্তৃহরি ও 'বাক্যপদীয়'-এর ভর্তৃহরিকে পৃথক মনে করেন। রাম-রাবণের যুদ্ধকেন্দ্রিক কাব্য রাবণবধ, আর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। 'রাবণবধ' একটি দীপতুল্য গ্রন্থ। 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থটির দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—এটি পদ্যে রচিত। এখানে ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণের চেয়ে দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা বেশি।

ভর্তৃহরির প্রায় সমসাময়িক ছিলেন জয়াদিত্য ও বামন। তাঁদের লেখা 'বৃত্তিসূত্র' বা 'কাশিকাবৃত্তি' (৬৫০ খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া হরিদত্তের 'রত্নমালা' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। এরপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে এই ধারার আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব দেখা যায়নি। তবে এরপর আবার পাণিনিয় ব্যাকরণের ধারায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

পাণিনির ধারায় সমাপ্তি এর মাধ্যমেই। এরপরেও আরও নানা বৈয়াকরণ সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যেমন—ইন্দ্র সম্প্রদায়, চাম্প্র সম্প্রদায়, হেমচন্দ্র সম্প্রদায়, মুগ্ধবোধ সম্প্রদায় ও ঐতরেয় সম্প্রদায়।

পাণিনি ও পতঞ্জলি বাক্যে পাঁচটি উপকরণ লক্ষ করেছিলেন। তবে অনেকের কাছে পদক্রম ও পদসমষ্টির গুরুত্ব সর্বাধিক। তন্বিতাভিধানবাদীরা জোর দিতেন আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার ওপর। আর কাত্যায়নের মতে অব্যয়, কারক এবং ক্রিয়া বিশেষণসহ বাক্য রচিত হয়। প্রতিটি বাক্যে থাকবে একটি ক্রিয়া ও এক বা একাধিক বিশেষ্য পদ, যার সঙ্গে অন্বয় থাকবে ক্রিয়াপদটির—ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্। পতঞ্জলিরও এই মত। আর শাকটায়ন ভাষার সমস্ত শব্দকে ধাতু 'জ' বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এবং মনে করতেন যে বাক্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রিয়াপদ। শাকটায়নের মতে উপসর্গের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু যাস্কের মতে উপসর্গের 'অর্থদ্যোতকত্ব' আছে. ভাষাতত্ত্ব চর্চার এঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর যেসব দেশে প্রাচীনকালে ভাষাতত্ত্ব চর্চা চলত ভারত তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। নানা আলোচনায় খুঁটিনাটি ও বিস্তৃতিমূলক ভাষাচর্চায় প্রাচীন ভারত প্রাচীন গ্রিস ও রোমের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। বরং কখনও কখনও রোম গ্রিসকে অনায়াসে অতিক্রম করে গেছে। আর বর্ণনামূলক ভাষাচর্চার আদিম পীঠস্থান প্রাচীন ভারত পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' রচনার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। তবে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চায় প্রাচীন ভারত আর তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার পরিচয় মেলে। মূলত বৈয়াকরনিক ভাষাচর্চাই প্রাচীন ভারতে হয়েছিল। এই জাতীয় ব্যাকরণকেন্দ্রিক ভাষাচর্চা সংকীর্ণ হয়েছে যখন ব্যাকরণ কেবলমাত্র নির্দেশ করার কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ে ক্রমশ। তবু বিশ্ববাসী এক বাক্যে স্বীকার করবে প্রাচীন ভারত ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ছিল কলমুখর আর নিত্যবহ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় O.B.D.L. গ্রন্থে বলেছেন—

> "Panini game this new literacy language a finily for all time .... the latter is become an artificial language. .... It a grammar grew hide bound, and prenented only change or growth that in characteristics of a living language".

উপসংহারে বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে প্রাক্-পাণিনি, পাণিনিসম সাময়িক এবং পাণিনি পরবর্তী ক্ষেত্র সূক্ষ্ম-মননগ্রাহী বিচার বিশ্লেষণী ভাবনার মাধ্যমে হয়েছিল। তাঁর ভারতের ভাষাতত্ত্ব চর্চাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছিলেন গুণগত দিক থেকে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৮.১.১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্ব চর্চার পটভূমি আলোচনা করো।

৮.১.১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

একক - ২

বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৮.১.২.১ বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৮.১.২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.১.২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১.২.১ : বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা / পূর্ব বাংলার ভাষা

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই ভাষার আলোচনা বা ভাষাতত্ত্ব চর্চা সর্বাগ্রে গণ্য। ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ভারত বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই।

বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চার শুরু হয় ১৯২১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এবং তা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগকেন্দ্রিক। সেই সময় বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ইনি নেপালের রাজদরবার থেকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন ১৯০৭ সালে। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্ভবত হরপ্রসাদবাবুর অনুপ্রেরণাতেই বৌদ্ধগান ও দোঁহা বা চর্যাপদ নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র ছিলেন, তাই আগে থেকেই ভাষাতত্ত্বে তাঁর দারুণ দখল ছিল। শুধু তাই নয় ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে ভাষাবিদ জ্যুঁল ব্লকের সাহচার্য পান তিনি। ফলে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব চর্চার অগ্রণী হলেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তবে সেটা শুধু ফরাসি বা ইংরেজিতেই নয়—বাংলাতেও। ভাষাতত্ত্বের কালানুক্রমিক, তুলনামূলক ও বর্ণনাক্রম তিনটি পদ্ধতিতেই শহীদুল্লাহ বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরাও তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।

সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রে উৎসাহী হওয়ার আগেই শহীদুল্লাহ্ ভাষাতত্ত্ব চর্চা করে আসছেন। সুনীতিবাবুর ভাষাচর্চা মূলত ইংরেজি ভাষাতেই বেশি। আর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কালক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', যা সুনীতিবাবুর 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ। এখানে বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হিন্দু-য়ুরোপায়ন থেকে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত ক্রমিক ধারা, ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত, নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা, বাংলা ভাষায় মুণ্ডা বা অনার্য প্রভাব, বৈদেশিক প্রভাব, ক্রিয়া, লিঙ্গ ও উপভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আছে 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে। মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন 'সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বাংলা ভাষার পূর্বরূপ হিসেবে অপভ্রংশ, প্রাকৃত, অশোক অনুশাসন, পালি ও আদিম প্রাকৃতকে নির্দেশ করেছেন। গ্রীয়ারসন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাগধী প্রাকৃত এবং মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের মতকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন বাংলা ভাষা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত। শব্দের বা বিভক্তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েও তিনি অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের দেওয়া বিভিন্ন বাংলা শব্দ বা পদ বা বিভক্তির ব্যুৎপত্তি গ্রহণ না করে নিজস্ব যুক্তি সহকারে ব্যুৎপত্তি প্রদান করেন। শুধু তাই নয় শহীদুল্লাহ্ বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

সুনীতিকুমার অবিভক্ত বাংলায় চারটি উপভাষার কথা বলেছিলেন। যথা—(১) রাঢ়ী, যা বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত ও মধ্যভাগ—কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। এই রাঢ়ীকে কেন্দ্র করেই চলিত ভাষা বা মান্য কথিত ভাষা গড়ে উঠেছে। (২) বরেন্দ্রী, যা উত্তরবঙ্গে অবস্থান করছে। (৩) কামরূপী, যা উত্তর-পূর্ব বাংলায় অবস্থিত। (৪) বঙ্গালী—যার মধ্যে আছে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ।

১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলির অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) আওতায় চলে যায়। পূর্ববাংলার উপভাষাগুলিকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হয়। যেমন—**প্রথম পর্ব**—ঢাকা ও

পূর্ববাংলার মধ্যভাগ। এর অন্তর্গত জেলাগুলি হল ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি। ঢাকার উপভাষা নিজস্ব। ময়মনসিংহকে উপভাষার নিরিখে দুটি বা তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। **দ্বিতীয় পর্ব**—পূর্ব ময়মনসিংহ ও পশ্চিম সিলেট। ভোট ব্রহ্মভাষী হাজং জনগোষ্ঠী এখানকার হাজংদের উপভাষা ব্যবহার করে। **তৃতীয় পর্ব**—সিলেট ও পূর্ববাংলার উত্তর-পূর্ব ভাগ। মায়াং বা বিষ্ণুপুরিয়া ভাষা এই বিভাগের অন্তর্গত। **চতুর্থ পর্ব**—চট্টগ্রাম-নোয়াখালি বা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ। চাকমা ভাষা এই অঞ্চলের মানুষ ব্যবহার করে। শহীদুল্লাহ্ হাজং, মায়াং ও চাকমা ভাষাকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা বলতে চাননি।

শহীদুল্লাহ্ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে দারুণ ভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উপভাষার মধ্যে **'প'** স্থানে **'F'** এবং প্রথম পুরুষের সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ভিন্ন আর কোনো সাধারণ লক্ষণ নেই। চট্টগ্রামী উপভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়—(১) ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ রক্ষিত আছে। যেমন—ঘর, ঝর, ধান, ভাত ইত্যাদি। (২) পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই লোপ বা বিকৃত হয়। যথা—তঅন (তখন), ডাই (ডাকিয়া), মিডা (মিঠা), বোগা (বোকা) ইত্যাদি। (৩) আদিতে 'ই' রক্ষিত থাকে। যেমন—হাত, হাতী ইত্যাদি। (৪) পদমধ্যবর্তী 'ম' অনুনাসিক হয়। যথা—'আঁই' (আমি), 'আঁর' (আমার), 'কুঁআর' (কুমার) ইত্যাদি। ড. মহম্মদ এনামল হকের মতে চট্টগ্রামী উপভাষায় চ ছ ধ্বনি রক্ষিত। যথা—ছাঅল (ছাগল), চাঅর (চাকর) ইত্যাদি।

রূপতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়—(১) নিষেধাত্মক অব্যয় 'ন' ক্রিয়ার আগে বসে। যথা—ন যাই, ন আসিল ইত্যাদি। (২) সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ তেই, তাই, হিতি আছে।

বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নির্দিষ্ট আর একজন ব্যক্তিত্ব হলেন—মহম্মদ আবদুল হাই। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ফোনিম সমূহের বিচ্ছিন্ন ধ্বনি সনাক্তকরণকে আলোচনা করেন। তিনি দেখান যে এই ধ্বনিমূলগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। জে. আর ফার্থের তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলার নাসিক্যধ্বনি ও নাসিক্যীভবন সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি standard বা শিষ্ট কথ্য বাংলা ভাষার ধ্বনি এবং ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণে ব্রতী হন এবং তাঁর গবেষণা লব্ধগ্রন্থের নাম 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৫)। এই গ্রন্থে বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা, দ্বিস্বর এবং অর্ধস্বরের গঠন, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়, ধ্বনির রূপ, সন্ধি, স্বরতরঙ্গ নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বাঙালির মুখের ভাষার standard বা শিষ্টরূপের প্রথম বিস্তৃত ফোনেটিক বিশ্লেষণ। তিনিই প্রথম বাংলা ধ্বনিগুলির ধ্বনিগুণের পরিমাপক।

এরপর অধ্যাপক আবদুল হাই ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেন। তাঁরা সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক ব্লুমফিল্ডের পদ্ধতি অনুসরণে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে নতুনভাবে বাংলা অর্ধস্বর ধ্বনি নির্ধারণ ও বিশ্লেষিত। তিনি 'বাংলা একাডেমি' পত্রিকায় সাহিত্য, সংখ্যাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন।

বাংলাদেশের অপর একজন ভাষাবিজ্ঞানী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা 'some supra-segmental phonological features of Bengali' ইংরেজিতে লেখা। আর রফিকুল ইসলামের 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৭০) গ্রন্থে সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কথ্য বাংলার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। এই গ্রন্থে কথ্য বাংলার ধ্বনি গঠন ও রূপ সংগঠন বিশ্লেষিত। ধ্বনিমূল, সহধ্বনিমূল, রূপমূল, সহরূপ মূল ধারণা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। 'Language' গ্রন্থে ব্লুমফিল্ডকে তিনি অনুসরণ করে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা বিশাল আকার ধারণ করে সত্তরের দশকে। আবদুল কালাম মন্‌জুর মোরশেদের আবির্ভাবে। তিনি কলম্বিয়া থেকে ভাষাতত্ত্বে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব' (১৯৭৫)। এই গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় সাংগঠনিক পদ্ধতি আরোপ করেন তিনি এবং শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচনায় চমস্কির প্রবর্তিত পদ্ধতি আরোপ করেন। তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সম্পর্কে একটি গবেষণাও তিনি করেন। এটি ১৯৮৬ সালে 'Relativization in Bengali' নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৮৫) নামে একটি বড় গ্রন্থ লেখেন। এখানে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা ও পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভাষার শ্রেণিবিন্যাস, উপভাষা, লিখনরীতি, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। তিনি প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব ও গঠনমূলক ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব পৃথকভাবে দেখিয়েছেন। আর 'বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম' গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বমান, সর্বনামের বাক্যাংশ, বাচনকর্তা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থে দুটি পর্যায় আছে। এক—বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনের নানাদিক ও দুই—সম্বন্ধবাচক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তির তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করেছেন। রূপান্তরমূলক সূত্র প্রয়োগ করেছেন এক্ষেত্রে। এছাড়া তিনি standard ভাষা বা চলতি বাংলার সঙ্গে নোয়াখালি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যগঠনগত পার্থক্য নিরুপণ করেন। বাংলা ভাষার বাক্য বিশ্লেষণের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা তিনি উল্লেখ করেছেন 'A study of standard Bengali and the Noakhali Diatect' (1985)' গ্রন্থে।

বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব চর্চায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ। তিনি ভাষাতত্ব অধ্যয়ন করেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চমস্কি প্রবর্তিত 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল' ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা তিনি। আজাদের গবেষণার বিষয় ছিল—'Pronominalisation in Bengali' (১৯৮৩)। এটি ইংরেজিতে লেখা। ঢাকা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি ফিল্‌মো ও চমস্কির মডেলের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সর্বনাম প্রধান বাক্যগঠনের প্রক্রিয়া তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষাতেও তিনি 'বাক্যতত্ত্ব' (১৯৮৫) নামে একখানি বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে বাক্য, বাক্যতত্ত্ব ও সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে বাংলা বিশেষ্যপদ ও সর্বনাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ক্রিয়াপদ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।

বাংলাদেশে আর যারা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নিয়োজিত থেকেছেন তাঁরা কাজী দীন মহম্মদ, মনিরুজ্জামান, মনসুর মুসা, রাজীব হুমায়ুনস দানিউল হক, আজিজুল হক প্রমুখ। কাজী দীন মহম্মদ ষাটের দশকে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। বাংলা ব্যাকরণের ক্রিয়াবাচক পদের সংগঠনে ধ্বনিমূলক সূত্র আরোপ করেন। ইংরেজি ভাষা রচিত গ্রন্থটির নাম 'The verbal structure in colloquial Bengali'। বাংলা ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ তিনি বর্ণনা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। তিনি মহিত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর গবেষণা করেন। তাঁর বিষয় হল 'Controlled Historical Reconstruction based on five Bengali Dialects'। তিনি পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি প্রধান উপভাষার উপাদানের ভিত্তিতে ভাষার রূপ ও ভূচিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থটি হল 'ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন'। এই সংকলনে ভাষা ও উপভাষার আলোচনা, কুমিলা উপভাষার বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত ও রুশ ভাষা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি একটি গবেষণা কর্মও সম্পন্ন করেন, যার নাম 'Diglossia in Bangladesh and Language Planning' (1983)। ইংরেজিতে লেখা এই সংকলনটি।

অধ্যাপক মনসুর মুসার ভাষাতত্ত্ব চর্চায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখান। তিনি অনেকদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেছেন। তার ভাষাতত্ত্ব চর্চা সমাজ ভাষাতত্ত্ব ও বিশেষভাবে ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিংহলের ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করেন। আর ইস্ট ও ওয়েস্টে সেন্টারে সমাজভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাজভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর দুটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যথা—'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮৪) এবং দ্বিতীয়টি 'বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা' (১৯৮৫)। গ্রন্থটিতে ভাষানীতি, ভাষা পরিকল্পনা, বাংলা ভাষার প্রশাসনিক নির্দেশ, বাংলা প্রচলন সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর 'বাঙলা পরিভাষা' গ্রন্থে পরিভাষার ইতিহাস ও সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার পরিভাষা প্রণেতাদের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষাতত্ত্বে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রাজীব হুমায়ুন, ডেকান কলেজ থেকে। সেখানে 'Descriptive Analysis of Sandipi in its Socio-Cultural Context' নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। এরই একটি বাংলা সংস্করণ 'সাহিত্য পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হয়। তিনি শিষ্ট কথ্য বাংলার সঙ্গে সন্দীপের উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন। উপভাষা বর্ণনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করেছেন।

বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন আর এক জন, যিনি হলেন দানিউল হক্। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ 'ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯০)। ভাষার নানা আলোচনা এখানে আছে। আর অধ্যাপক আজিজুল হকও ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়া তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। 'ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত' (১৯৯০) নামে একটি গ্রন্থও তিনি লেখেন। এ গ্রন্থে তিনি ভাষা, ভাষাতত্ত্ব,

ভাষাতত্ত্বের কালান্তর সীমিত সূত্র, বাক্যাংশ সংগঠন ব্যাকরণ, রূপান্তরিক ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

বোঝা যায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ এই কুড়ি বৎসর ধরে বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ও নানা গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তবে সেগুলির রচিয়তাগণ বাংলাদেশী হলেও তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যেমন—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফ্রান্স ও জার্মানিতে ধ্বনিতত্ত্বে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বিলেতে জে. আর. ফার্থের তত্ত্বাবধানে ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের পদ্ধতির অনুসরণ করেন। রফিকুল ইসলাম ব্লুমফিল্ডের ছাত্র চার্লস এফ. হকেটের কাছে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া হুমায়ুন আজাদ ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপক মনিরুজ্জামন মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। আর এর ফলেই বাংলাদেশে বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তাঁরা মূলত বাংলা ভাষাতেই ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন। বিদেশি ভাষাতত্ত্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলেও স্বদেশে এসে যথার্থ ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক বা পদ্ধতিক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পেরেছেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণত্ত রচনা করতে পারেননি বা বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে কোনো গবেষণা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটাতে পারেননি। তবে বাংলা ভাষার যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। বাংলা ভাষার উৎস সম্পর্কে নতুন মত, উপভাষা বিশ্লেষণ, বাক্যরীতি, লিঙ্গ, কারক, শব্দতত্ত্ব সমস্ত দিকই বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয় সর্বনামের আলোচনা, বাক্যতত্ত্ব ব্যাকরণ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তাঁরা হয়তো আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি, কিন্তু তাঁদের অন্যতম কৃতিত্ব ভাষাতত্ত্বের প্রতিটি শাখায় গবেষণা কর্ম চালানো। বাংলাভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চায় এঁদের অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

৮.১.২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

৮.১.২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

একক - ৩

সত্যজিতের গদ্যভাষা

বিন্যাসক্রম

৮.১.৩.১ সত্যজিতের গদ্যভাষা

৮.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১.৩.১: সত্যজিতের গদ্যভাষা

সাহিত্য মাত্রেই আছে কিছু অনুভূতি আবিষ্কারের গন্ধ। আর এই গন্ধ যাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা গেছে, তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। চলচ্চিত্র পরিচালনা, সংগীতচর্চা, গল্পের বাঁকে বাঁকে আবিষ্কার, পত্রিকা পরিচালনা সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ সার্থক শিল্পী।

প্রধানতঃ 'সন্দেশ' পত্রিকার হাত ধরে বাংলা সাহিত্য ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন সত্যজিৎ। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে ছড়ি ঘোরালেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রেও তিনি গল্প লিখেছিলেন। প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে সায়েন্স ফিকশন। ফেলুদা এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে গোয়েন্দা কাহিনি ও নিত্যনতুন চেতনার আলোকে ছোটগল্প। তাঁর ওইসব রচনা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠককে কৌতূহলী হতে হয়, সেটা হল তাঁর গদ্যভাষা। গদ্যের বাক্যে তিনি শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অন্য এক শিল্পী।

গান-গল্প চিত্র সমস্ত দিকেই ভাষা স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ। শব্দ, সুর, রেখা ও চলমান অজস্র খণ্ডের এক অখণ্ড বিগ্রহ রচনা। কোনোটির সঙ্গেই অন্য আর একটি মেলে না। কিন্তু শিল্পী যখন এগুলিতে প্রভাব ফেলেন, তখন শব্দে সুরের গতি, রেখায় লেখার সংবেগ অথবা লেখায় রেখার বৈচিত্র্য এসে যেতে পারে অনায়াসে।

পিতা-পিতামহের ধারায় গল্প লিখিয়ে সত্যজিৎ

বংশ সূত্রে সত্যজিৎ ছিলেন সাহিত্যিক বংশের সন্তান। পিতামহ—উপন্দ্রেকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। তিনি লিখেছিলেন 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির গল্প' আজও পাঠকদের বিস্মিত করে। আর সত্যজিৎ-এর পিতা সুকুমার রায় ছিলেন একজন নাম করা শিশু সাহিত্যিক। তাঁর 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'পাগলা দাশু', 'হয়বরল' ইত্যাদি অন্যতম শিশুসাহিত্য রূপে পরিচিত। এঁদের কাছ থেকেই যে সত্যজিতের সাহিত্য রচনার প্রেরণা এসেছিল, তা বলা যেতেই পারে।

বলাবাহুল্য শিশু সত্যজিৎ মাঝে মাঝেই কাগজে হিজিবিজি এঁকে প্রেস কর্মী (সন্দেশ) রামদাহিনকে দিতেন 'সন্দেশে' বের করার জন্য। রামদাহিন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়াতেন। ছোটবেলা থেকেই এই সাহিত্য পরিসরে বড় হয়েছিলেন সত্যজিৎ। বাপ-ঠাকুরদার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া 'সন্দেশ' পুনরায় পরিচালনা করেন। এই থেকেই সাহিত্যের প্রতি সত্যজিতের অনুরক্ততা স্পষ্ট। তবে এটা জন্মেছিল মূলত পারিবারিক সূত্রেই।

গোয়েন্দা কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান, গপ্পো আর অনুবাদের ধারায় সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রচিত সাহিত্যের বিষয় একেবারে সাধারণ। সেখানে জটিল মনস্তত্ত্ব, ধর্ম, রাজনীতি, সেক্স বা নারী কিছুই নেই। যা আছে তা হল—গোয়েন্দাগিরি, কল্পবিজ্ঞান, ভূত-প্রেত, অলৌকিকতা এবং সায়েন্স ফিকশন। সেগুলি সংখ্যায় প্রচুর। তাঁর রচিত গল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন—(১) সায়েন্স ফিকশন, (২) গোয়েন্দা কাহিনি, (৩) ভৌতিক, (৪) বাস্তবনিষ্ঠ, (৫) মনস্তাত্ত্বিক, (৬) কল্পবিজ্ঞান, (৭) অলৌকিক ও (৮) রূপকথা। এখানে আমাদের আলোচ্য এই সমস্ত গল্পে সত্যজিতের গদ্যের অনন্যতা খুঁজে নেওয়া।

শঙ্কুর গল্পের গদ্যবৈশিষ্ট্য

সত্যজিৎ শঙ্কু বিষয়ক কাহিনি লিখেছেন মোট ৪০টি। এদের মধ্যে রয়েছে 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রী', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়', 'প্রোফেসর শঙ্কুর চী-চিং', 'স্বপ্নদ্বীপ', 'আশ্চর্য প্রাণী', 'মরু রহস্য', 'হিপনো জেন', 'নকুরবাবু ও এল ডোরাডো', 'মহাকাশের দূত' ইত্যাদি। এই সমস্ত গল্পেই তাঁর সায়েন্স ফিকশন কাজ করেছে। তবে প্রতিটি গল্পই ডায়রী আকারে লেখা। আর ডায়রীর গদ্যে সরলতা একটি মৌলিক লক্ষণ। এমনিতেই

তাঁর গদ্য এক করবে হ্রস্ব। আর 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রী' তো এর কৌলিন্য স্তম্ভ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখায় কাহিনিকে ধরতে গেলে শব্দ ব্যবহারে সংযম ও বাক্য গঠনে পরিমিতিবোধ একান্ত প্রয়োজন। সেটা সত্যজিতের ছিল। তরল গদ্য এবং লজিক গদ্য যে-কোনো একদিকে প্রাণতা সমান ক্ষতিকর। সত্যজিতের কলমে সংযম এক্ষেত্রে ঈর্ষনীয়—

"আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।
দলি পাহাড়ের দিক থেকে সরতে পারছি না।
অবাক বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে, কারণ
আমি ক্রমে বুঝতে পারছি যে আকাশের দিকে
মাথা উচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা,
সেটা আসলে আমার চেনা।" (মরুরহস্য)

এর পরের বাক্যটা দীর্ঘ চিহ্নের ব্যবহার করে ধরে রেখেছেন। শুধু তাই নয় Tension-টাও ধরে রাখা হয়েছে।

"গহ্বরগুলো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের তালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দু'পাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভুরু আর তার নীচের প্রশস্ত ঢিপিটা হচ্ছে বন্ধ হওয়া চোখ।" (মরুরহস্য)

তারপর উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে কিছু তৎসম শব্দের দ্বারা গঠিত ধীর লয়ের একটি বাক্য দিয়ে—

"সামারভিলের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্না প্লাবিত দিগন্তবিস্তৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি হতে লাগল—ডিমেট্রিয়াস। ..... ডিমেট্রিয়াস। ....."

'নকুরবাবু ও এল ডোরাডো' গল্পে তাঁর গদ্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাঁর গল্পে সাধারণ বাংলার বাক্ রীতির নিয়ম (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) বর্জিত হয়েছে। যেমন—

"উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে।"

(নকুরবাবু ও এল ডোরাডো)

বাক্যগুলির pattern ইংরেজি গদ্যানুসারী।

আবার 'কর্ভাস' গল্পে দেখা যায় শব্দবিন্যাসের দ্বারা বাক্য climax-এর দিকে গেছে। এক্ষেত্রে পরপর একাধিক বাক্য গঠন করা হয়। যেমন—

> "বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক, হতবম্ব। কর্ভাস ঘরের বাতি নিভিয়ে তার মনের সে গর্ব প্রকাশ করল সেটা আর্গাসের বুঝতে বাকি নেই।"

গোয়েন্দা গল্পের গঠনবৈশিষ্ট্য

ফেলু মিত্তিরকে কেন্দ্র করে সত্যজিতের গোয়েন্দা কাহিনির সংখ্যা ৩৯টি। তার মধ্যে চারটি অসম্পূর্ণ। এদের মধ্যে অন্যতম—'সোনার কেল্লা', 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' প্রভৃতি গল্প। এই সমস্ত গল্পের মূল চরিত্রগুলিই সমস্ত সমস্যার জট খুলে দিয়েছে। সব গল্পেই আছে ধাঁধা, শব্দবন্ধ আর সংকেতের মজা।

ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারের যুগ থেকে ইংরেজি শব্দ মিলিয়ে বাংলার কথা বলার প্রচলন ছিল। সত্যজিতের গল্পে তা আছে—

"বাই দা ওয়ে—আপনার পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না"। (সোনার কেল্লা)

সত্যজিতের এইসব গল্পের গদ্যের বৈশিষ্ট্য চালের দ্রুততা। যেমন—

> "একজন লোক। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নীচে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় পাগড়ি। খুব বেশি বড় না—মাঝারি। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো।" (সোনার কেল্লা)

ছোট ছোট বাক্যে ও বাক্যাংশে সুন্দর একটি ছবি বতুলে ধরার চেষ্টা এখানে স্পষ্ট।

রহস্য, অ্যাডভেঞ্চারে সত্যজিতের প্রাঞ্জল বর্ণনা সরস, ঋজু অথচ লাবণ্যময়। উপমার রং চালানো ভাষাচিত্র তাঁর রচনায় বেশি মেলে না। যেমন—

> "মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মত ছুটি নিলেন।" (ছিন্নমস্তার অভিশাপ)

আবার কোথাও রহস্য উন্মোচন করেই ফেলুদার স্ট্রেট সংলাপ বলা, ঘটনাকে করেছে জীবন্ত।

> "খুন হয়েছে আপনার ভণ্ডামি, আপনার শয়তানী, আপনার লোভ। এর কোনোটাই আর কোনোদিনও মাথা তুলতে পারবে না।" (গোসাঁইপুর সরগরম)

রহস্য ঘটনার সঙ্গে ভাষার অসাধারণ নিপুণতা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে 'দার্জিলিং জমজমাট' গল্পে।

> "সূর্যের গোলাপি রং, লাল টালির ছাদওয়ালা মাঠের বাংলো বাড়ী, ঘন ঝাউবন, খাড়াই পাহাড় আর সুন্দর বাগান।" (দার্জিলিং জমজমাট)

ফেলুদাকে দিয়ে শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন সত্যজিৎ। ধাঁধা বা শব্দ সেখানে আছে। যেমন—'সমাদ্দারের চাবি' গল্পে 'আমার নামে চাবি' অর্থাৎ ('রে—ধা-রে-মা-নি-সা-স-মা-দা-দা-রে) বেশ উপভোগ্য। এই সুর বাজাতেই যন্ত্রটা খুলে গেছে ও গচ্ছিত টাকা পাওয়া গেছে। এই রহস্য উন্মোচনে ফেলুদাকে রিভলভার চালাতে হয়নি। ছদ্মবেশও নিতে হয়নি। ধাঁধার সমস্যা সমাধানেই হয়েছে রহস্যের সমাধান। 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' গল্পেও ধাঁধা আছে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। এখানে টিয়াপাখির কথা বলা ধাঁধার প্রধান আকর্ষণ। মৃত্যুর আগে কালীকিঙ্করবাবু বাড়ির টিয়াপাখিকে ধাঁধার ঢঙে একটা সংখ্যা 'ত্রিনয়ন' শিখিয়েছেন। বলেছিলেন 'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো'। এটাই ছিল সিন্দুকের তালার কম্বিনেশন। অর্থাৎ 'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো' কথাটিতে আছে 'আটটি রাশির সংখ্যা—যেমন, থ্রি নাইন জিরো থ্রি নাইন এইট টু জিরো'।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পে যে শুধু গোয়েন্দাগিরিই আছে তা নয়, অনেক মজার মজার ঘটনা, সেই সঙ্গে শব্দমজাও আছে। যেমন—'বাদশাহী আংটি' গল্পে বনবিহারী তৈরি করেছেন শব্দজব্দ। যেমন—Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম। ইংরেজি বাংলা অর্থ মিলিয়ে এই শব্দজব্দের উপস্থাপন বড়ই সুন্দর।

হেঁয়ালী, ধাঁধা, শব্দজব্দের বিচিত্র মজা 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' গল্পেও আছে। গল্পের শুরু এক অদ্ভুত ছড়া দিয়ে। যেমন—

"মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁইফোড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।"

'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ'-এর অর্থ বুড়ো গাছের গোড়া হল অশ্বত্থ। হাত গোন ভাত পাঁচ-কে ফেলুদা উদ্ধার করেছেন 'পঞ্চান্ন হাত'। দিক পাও ঠিক ঠিক জবাব অর্থাৎ 'উত্তর দিকটাই হল ঠিক দিক'। ফাল্গুন তাল জোড় এর অর্থ 'একটা অর্জুন গাছ আর জোড়া তাল গাছ' ও দুই মাঝে ভুঁইফোড় অর্থাৎ 'তাদের মাঝখানে জমি খুঁড়তে হবে।' অর্থাৎ এইভাবে গুপ্তধন পাওয়া যাবে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এও 'Key' হল কী' শব্দের প্রকৃত অর্থ। আবার 'LOKC' শব্দকে তোপসে বললেন 'এল ওকে শী', 'OKAHA' অর্থাৎ 'ও কে এয়েচে'। 'সোনার কেল্লা'-য় দেখা যায় সিধু জ্যাঠা 'Exhibition'-কে বলেন 'ইস কি ভীষণ', 'Impossible' 'আম পচে বেল', 'Dictionary' 'দেখ না নাড়ী', আর 'Governor' রূপান্তরিত 'গোবর নাড়ুতে।'

কল্পবিজ্ঞানের গল্পের গদ্যবৈশিষ্ট্য

কল্পবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সত্যজিৎ গল্প লিখেছেন মোট ১০টি। তার মধ্যে আছে 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'টেরোড্যাকটিলের ডিম', 'প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্', 'বৃহচঞ্চু', 'সবুজ মানুষ' ইত্যাদি।

'সেপ্টোপাসের খিদে' গল্পটিতে ঘটনার বিবরণ, বর্ণনা, সাসপেন্স ও নাটকীয়তা তুলনাহীন। আর গল্পের শিরোনামে 'খিদে' শব্দটার এমনি বিশেষ 'Leitratit' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গাছটির যখন মৃত্যু হয়, তা সত্যজিতের ভাষায়—

> "পরিমলের বন্দুক গর্জে ওঠার পর মনে আছে, ফিন্‌কি দিয়ে
> গাছের মাথা থেকে লাল রঙের ফোয়ারা"।

এ থেকে এমনি জিনিস মনে হয় সেপ্টোপাস একটা উদ্ভিদ বা প্রাণী।

'টোরোড্যাকটিলের ডিম' গল্পটিতে বদনবাবু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং তার মালিকানাটা খোয়া যায়। 'প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্' গল্পটিতে বাস্তব আর কল্পনার মিলন ঘটাতে পারেননি। ভাষা, শৈলীর নিপুণতা এবং রচনাভঙ্গির মুন্সিয়ানা গল্পটির মধ্যে যথেষ্ট আছে। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রোফেসরের কার্যকলাপ রহস্যই ফেলে গেছে। এই পর্বের 'ময়ূরকণ্ঠি জেলি' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। বিজ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়ে আশ্চর্যভাবে গল্পে লেখক বিস্ময় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন, যা অভিনব। যেমন—

> "..... দৃষ্টিকোণের সামান্য পরিবর্তনেই জেলির রং বদলাচ্ছে।
> নীলই প্রধান। কিন্তু সবুজ ও লালের আভাসই পাওয়া যায়।
> এ রংকে ময়ূরকণ্ঠি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ..... একি
> ড্রাগ, না অন্য কিছু? জীব রসায়নের ইতিহাসেই কি এর স্থান,
> না প্রাতরাশের মেনুতে।"

এই পর্বের 'বৃহচঞ্চু' গল্পটিতেও লেখকের যে ভাষা দেখতে পাওয়া যায়, তা সাধারণ বাক্‌রীতির (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া) নিয়ম মানেনি।—"বাকী রাতটা ঘুম হল না তুলসীবাবুর।"

সত্যজিতের গপ্‌পের গঠনবৈশিষ্ট্য

সত্যজিতের গল্পের সংখ্যা একাধিক। এর মধ্যে রয়েছে ভৌতিক গল্প ১৬টি, বাস্তবনিষ্ঠ গল্প ৩৪টি, মনস্তাত্ত্বিক গল্প ৯টি, অলৌকিক গল্প ৪টি, হাস্য-রসাত্মক গল্প ১টি, আর আছে বৈঠকী ও তরিণী খুড়োর গল্প এবং রূপকথা।

১৬টি ভৌতিক গল্পের মধ্যে 'অনাথবাবুর ভয়' গল্পটিতে সত্যজিত অপূর্ব শিল্পকৌশলে অনাথবাবুর ভূত হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়েছেন। গল্পের কথক সীতেশবাবুর কথায়—"মরে কি হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি

জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে গায়ে-কালো কোট, পায়ে বুট জুতো-হালদার বাড়ির পূব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে—আসছেন।"

এই বিভাগের অন্য গল্পে তদ্ভব ও তৎসব শব্দের অপূর্ব সমন্বয়ে গদ্যে এসেছে অপূর্ব সুষমা। বাংলা কথ্য ভাষার বিরোধিতা তিনি করেননি, বরং গদ্যগুলিকে শিল্পসম্মত করেছেন। যেমন—

> "গতকাল খুব ..... রতনবাবু গ্রহণের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারেননি। ..... বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না"।

(রতনবাবু আর সেই লোকটা)

বাস্তবনিষ্ঠ গল্পের মধ্যে 'পটলবাবু ফিল্মস্টার' গল্পে গদ্য ভিন্ন রসে জারিত। ক্রিয়াপদবর্জিত বাক্যগঠন এখানে আছে—"গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার।" এছাড়া 'অতিথি', 'অপদার্থ', 'লাখপতি' প্রভৃতি গল্পেও গদ্যভাষার বিভিন্ন style লক্ষ করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক গল্পের মধ্যে 'পিকুর ডায়েরী'-তে দেখা যায় ভাষার অপূর্ব ভঙ্গিমা। যেমন—"কাল মা এ আর গান দিলেন, নিউ মারকেট থেকে সেটা হিতেশকাকু দিল বল্ল পিকুবাবু আমি এটা দিলাম, কিন্তু তোমার মা কিন্তু না।"

সত্যজিতের হাস্যরসাত্মক গল্পটি হল 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর'। এখানে রচনার কৌশলে ও ভাষা ব্যবহার গুণে চলতি পথে গল্পটি সুন্দরভাবে মোড় নিয়েছে। অসমঞ্জবাবু তাঁর কুকুর ব্রাউনীকে বোঝেন, বোঝেন তার তাৎপর্যপূর্ণ হাসির মর্মার্থ। বিস্ময়কর ব্রাউনির হাসিতে মুগ্ধ সাহেব তাকে কিনে নিতে চাইলেন—

> "ব্রাউনি হাসছে
>
> এ হাসি আগের কোনো হাসির মতো নয়,
>
> এ একেবারে নতুন হাসি।
>
> বাঁট হিঁ ইঁজ ল্যাফিং।"

মার্কিন মুলুকের ধনী ব্যবসায়ীর সানুনাসিক ইংরেজি উচ্চারণ বাঙালি পাঠকের কৌতুক যখন জমিয়ে তুলেছে তখন ব্রাউনির হাসির কারণ ব্যাখ্যায় অসমঞ্জবাবু যা বললেন তা আর কৌতুকের রইল না, serious হয়ে গেল—

> "ব্রাউনির হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায় তাই শুনে কুকুর হাসছে"।

আজ্ঞে হ্যাঁ। তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না?

আজ্ঞে না।"

সাহেব ও শ্যামল নন্দী চলে গেলে অসমঞ্জবাবুর প্রশ্ন ও উত্তরে ব্রাউনীর হাসি একেবারে পরশুরামের prose style-এর মতো—

"তোর হাসির কারণটা ঠিক বলিনি রে, ব্রাউনী?

ব্রাউনী ছোট্ট করে হেসে দিল—ফিক্। অর্থাৎ ঠিক।"

তারিণী খুড়োর গল্পসমূহের সংখ্যা ১৩টি। সেগুলির মধ্যে সহজ, সরল প্রাঞ্জলতা খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে অলৌকিকতাও আছে। যেমন 'ডুমনিগড়ের মানুষ খেকো' গল্পটিতে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু ঘটনার বিবরণে অলৌকিকতার ছাপ স্পষ্ট। এছাড়া 'গঙ্গারামের ধনদৌলত' গল্পে কৌতূহল ও বুদ্ধিকৌশল বিস্ময়কর। 'লখনৌর ডুয়েল' গল্পটি style আর ভঙ্গির মেজাজে সুউচ্চ শিল্পমাত্রা পেয়েছে। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বর্জিত বাক্যও এখানে আছে। যেমন—'ক্রমে এগিয়ে এল ষোলই অক্টোবর'। 'তরিণী খুড়ো ও বেতাল' গল্পে এসেছে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ। যেমন—

"এ ভেরি অর্ডিনারি গুণ্ডা বললেন ভোজরাজ।"

সত্যজিতের রূপকথার গল্প 'সুজন হরবোলা'। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এটি। গল্পটিতে ঝরঝরে ভাষায় রূপকথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে রাজকন্যা, রাজা, রাক্ষস প্রত্যেকে এসেছে। সুজন যে কালের ছেলে যে কালের রাজা, রাজকন্যা (বিহঙ্গভুক) 'রাক্ষস' সবাই অবাস্তব।

> "সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল। তার কাজ মাঠে বনবাদাড়ে ঘোরা। আর পাখির ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা। এই কাজে আর ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে।"

গল্পটিতে সত্যজিৎ যেন সুকুমারের মতোই 'রূপকথা' বানিয়েছেন।

এছাড়া অন্যান্য গল্পেও সত্যজিৎ আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা কাহিনিতে নতুন মাত্রা এনেছে। তাঁর গল্পে অফিস হয়েছে 'আপিস', বিদ্যা হয়েছে 'বিদ্যে'। সপ্তাহ হপ্তা হয়েছে। আর এ সবই গল্পকে করেছে UP TO DATE।

অনুবাদ গল্পের গঠনবৈশিষ্ট্য

অনুবাদের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ অপরাজিত ও দারুণভাবে সফল। তাঁর লেখা অনুবাদ গল্পগ্রন্থগুলি হল (১) মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প (২) তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম (৩) ব্রেজিলের কলো বাঘ ও অন্যান্য।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের যে গল্প তিনি অনুবাদ করেছেন, তাকে 'Translation' না বলে 'transmigration' বলাই যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ গল্পে ভাষারীতি, রচনাশৈলীর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, ১৬ নং গল্পে দেখা যায় পায়ে জখম মোল্লার চিঠি লেখায় আপত্তি। এর কারণ জানতে চাইলে চাষাকে মোল্লা বলে—"আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে জখম পায়ে সেটা হবে কি করে শুনি?"

ব্যঙ্গ কৌতুক ও পরিহাস আশ্চর্য তীব্রতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে ৩৫ নং গল্পে। খিদের মুখে রাজা একদিন বেগুন ভাজা খেয়ে নাসিরুদ্দিনকে বলে—"বেগুনের মতো এমন সুখাদ্য আর আছে কি?" উত্তরে নাসিরুদ্দিন বলে—'বেগুনের জবাব নেই।'

রাজার হুকুম—"এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।"

'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' গ্রন্থের অনুবাদে সত্যজিৎ ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ যেন মৌলিক সৃষ্টি।

সত্যজিতের তৃতীয় অনুবাদ গ্রন্থ 'ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য'। এই গল্পগুলিতে বর্ণনায় ভাষা অত্যন্ত জীবন্তবর্ণনাত্মক, গদ্যের ভাষা অভিনব। যেমন—

> "তারাহীন আকাশের নীচে দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। পাহাড়ের ফাটলে কোথায় যেন একটা প্যাঁচা জেগে উঠল।" (ব্লু জন গহ্বরের বিভীষিকা)

আর অনুবাদের শেষ গল্প 'মঙ্গলই স্বর্গ' গল্পের সংলাপ বাংলারীতি ভাবাপন্ন।—

"কোথায় যাচ্ছ দাদা?

কী বললে?

এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?

জল খেতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু তোমার তো তেষ্টা পায়নি।

হ্যাঁ পেয়েছে।

আমি জানি পায়নি।"

তবে অনুবাদ কর্মের গল্পগুলিতে তাঁর পথচলা যে স্বচ্ছন্দ তা বলা যেতেই পারে।

সামগ্রিকভাবে অন্য গল্পকারদের গদ্যভাষার সঙ্গে সত্যজিতের তুলনা করলে এ কথাই মনে হবে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ প্রমুখের ভাষার সঙ্গে সত্যজিতের ভাষার পার্থক্য ব্যাপক।

অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা শব্দের মায়াজালে অনেক ঘটনাকে অকথিত রেখেছেন, বহু রূপক ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক গঠনরীতির সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে সত্যজিৎ সর্বদা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, স্ট্রেইট কাট। আর তাঁর লেখা সর্বদা বাস্তব জীবনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

বিদ্যার বিভিন্ন প্রদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী সত্যজিৎ একটানা ত্রিশ বৎসর বাংলা গল্পসাহিত্যের সাধনা করেছেন। গল্পে-গদ্যে সত্যজিৎ যেন অসম্ভবকে সম্ভব, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য ও অলৌকিককে লৌকিক করে তুলেছেন। তাঁর সমস্ত লেখাগুলিই যেন সরস, উপভোগ্য ও ইনফরমেটিক। আর তাঁর সাহিত্যসাধনার সিদ্ধির সুফলটুকু কেবলমাত্র 'সন্দেশ'-এর পাঠকরাই লাভ করেনি, বাঙালি সাহিত্যিকরাও লাভ করেছেন। তিনি পরিণত মনের খোরাক যেমন জুগিয়েছেন, তেমনি শিশুদেরও মানসিক খোরাক মিটিয়েছেন। তুচ্ছ বলে গণ্য করেননি শিশুসাহিত্যকে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলা ভাষাকে অনেক চলিত সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যজিৎ বিদগ্ধজনের লেখ্যভাষার সঙ্গে চারুকথ্য ভাষার ভারসাম্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাইতো আগামী কয়েক প্রজন্মের রসিকদের অভিনন্দন তিনি লাভ করবেন তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি রূপেই।

৮.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘সত্যজিতের গদ্যভাষা’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৮.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

পর্যায় গ্রন্থ -২

একক - ৪

সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

বিন্যাসক্রম

৮.২.৪.১ সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

৮.২.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৪.১: সুকুমার সেনের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অগ্রগণ্য ছিলেন বাঙালি ও মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত মহল। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা বাঙালিদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা গেছে। তাঁদেরই অন্যতম হলেন ড. সুকুমার সেন।

বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমারের পরেই ড. সুকুমার সেনের অবদান স্মরণীয়। তাঁর জন্ম হয় ১৯০১ সালে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী তিনি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সস্নেহ অভিভাবকত্বে ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষীকৃত এলাকায় তাঁর গবেষণা ও নিরন্তর চর্চার সূচনা ঘটে। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে তিনি ভাষাবিজ্ঞানসহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি, অভিধান প্রণয়ন বহুবিধ ক্ষেত্রে তিনি নিবিষ্ট থেকেছেন। আর জীবনের পরিণত পর্বে এসে তিনি রসসাহিত্যের আঙিনাতেও অনায়াসে বিচরণ করেছেন।

উনিশ শতকে বাঙালি মনীষার যে নিদর্শন পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যে, কিন্তু বিশ শতকে ততটা দেখা যায়নি। ব্যতিক্রম সুকুমার সেন। বর্ধমান জেলার রায়না থানায় দামোদরের নবীন ধারায় পূর্ব-দক্ষিণ তীরের অদূরে গোতান গ্রামটি বর্ধমানের মহারাজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুকুমার সেনের পূর্বপুরুষ এই রাজবাড়িতেই কাজ করতেন। সুকুমার সেন এই গোতানে মাইনর স্কুলে অল্পদিন পড়েছেন। এরপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত বর্ধমানের বহিলা পাড়ায় বসবাস করতে থাকেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন।

কৃতী চাত্র হিসেবে তিনি পেলেন মোহিনীমোহন মিশ্র পদক। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস ক্লাসে ভর্তি হন। আই.এ পরীক্ষায় সুকুমার ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলেন। এই সময় Algebra নিয়ে কিছু কিছু গবেষণাও করেছেন। ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিষ্কৃত থিয়োরি পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯১৯-এ তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ সালের বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ই তিনি 'পঞ্চ জনা' নামক প্রবন্ধ লেখেন। এম.এ. ক্লাসে সংস্কৃত নিয়ে পড়তে শুরু করলেন এরপর। ক্লাস নিতেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই সাহচার্যে সুকুমার সেন সাহিত্যে, ভাষাবিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করলেন।

সুকুমার সেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর চিন্তাচেতনায় দেখা যায় তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক চেতনা। প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তাচেতনায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ওপর আগ্রহ দেখা যায়। মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবনা নিয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি ও অবিসম্বাদিত স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে সুকুমার সেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ইন্দো-ইরানীয় ভাষা, প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থের উপর অনেকটা নির্ভর করলেও বঙ্গবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর মনীষা অভাবনীয়।

অল্প বয়সেই বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যজীবনীর সঙ্গে সুকুমারের পরিচয় ঘটে। ১৯৫৩ সালে সাহিত্য একাডেমির কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি বাংলা ভাষার প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন, একই সঙ্গে বাংলা অ্যাডভাইসরি কমিটির কনভেনার। সাহিত্য একাডেমির জন্য তিনি অনেকগুলি বই রচনা করেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন এবং চৈতন্য চরিতামৃত সম্পাদনা। এছাড়া তাঁর বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস' ও 'সাহিত্যের ইতিহাস'। প্রথমে এটি আকারে কৃশকায় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সংস্করণে সংশোধিত হয়ে বইটি নতুন আকার ধারণ করে।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে লেখা তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হল—

(১) The use of cases in the vedic prose (1929)

(২) ভাষার ইতিবৃত্ত (1939)

(৩) বাংলা সাহিত্যে গদ্য (1934)

(৪) Old persian Inscription (1944)

(৫) An outline syntax of Middle India Aryan (1953)

(৬) History and pre-history of Sanskrit (1958)

(৭) A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan (1960)

(৮) An Etymalogical Dictionary of Bengali (1971)

তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'The use of cases in the vedic prose' গ্রন্থটি। এখানে তিনি বেদের বাক্যগঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে আছে। তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যগঠন প্রায় অবহেলিত ছিল। ড. সেনই Syntax নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। আর 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে তিনি বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ ভাষা বিশ্লেষণের আলোকে আলোচনা করেছেন। এখানে ধারাবাহিকভাবে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'The origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত'। এই গ্রন্থে তিনি ভাষাবিদ্যা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ইন্দো ইউরোপীয় বা আর্য ভাষার সামগ্রিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন অপভ্রংশ থেকেই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভব-এর সময়ে ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল, সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ..... এই কাল্পনিক ভাষাটিকে বলা হইল প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য (protno—New India Aryan) বা অপভ্রংশের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্ননব্য ভারতীয়।"

'প্রাচীন পার্সী লেখচিত্র' গ্রন্থে সুকুমার সেন প্রাচীন শিলালেখের ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। এই আলোচনা আর্যভাষার চর্চার ক্ষেত্রে তাঁকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পৌঁছে দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে তিনি 'An outline syntax of Middle India Aryan' গ্রন্থে পালি ও প্রাকৃত ভাষার বাক্য গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের প্রাক্-ইতিহাস, প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব, পালি, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ ভাষা, পালির সঙ্গে পৈশাচী প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন এ গ্রন্থে। 'History and pre-History of Sanskrit গ্রন্থে সুকুমার সেন মূলত ইন্দো ইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার জন্মকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে সৃষ্টি একথা বলেছেন এবং মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কেও গবেষণা চালিয়েছেন।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পালি ও প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরের রূপবৈচিত্র্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণ আলোচতি হয়েছে 'A Comparative Grammar of Middle India Aryan' গ্রন্থটিতে। এখানে তাঁর গবেষণামূলক মানসিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তিমূলক তাঁর অভিধান গ্রন্থটি হল 'An Etymological Dictionary of Bengali'. এখানে তিনি প্রায় ২০,০০০ বাংলা

শব্দের ঐতিহাসিক উৎস ও বিবর্তন নির্ধারণ করেছেন। কোন্ শব্দ কোন্ শব্দ থেকে জন্ম নিল, কিভাবে তা পরিবর্তিত হল, পরিবর্তিত হতে হতে কিভাবে তা বর্তমানের রূপ নিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পথরেখা তিনি নির্ণয় করেছেন।

আর সুকুমার সেনের বড় কীর্তি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।' বইটিতে দীর্ঘ আলোচনা আছে, তা বহু খণ্ডে বিভক্ত। তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে পূর্ণ এই বইটি গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস' সহজপাঠ্য ছিল না। তার জন্যই তিনি লিখেছিলেন 'ভাষার বিভক্ত'। আর এরই পরিপূরক হিসেবে এল 'বাঙ্গালা সহিত্যের ইতিহাস'। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে পরিগণিত হত। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে সুকুমার সেনের ইতিহাসের ধারা মেলে না যুগবিভাগের সময় যুগের নামকরণেই পার্থক্য আছে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০) গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—

> "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি .....।"

এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ও objective ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসের ধারণা যথার্থই এখানে আছে। দেশের ইতিহাসের ধারণার পরিচয় মেলে 'বঙ্গভূমিকা' গ্রন্থে। মিথলজি চর্চার সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই তিনি লেখেন 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' ও 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন'।

বলাবাহুল্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার জন্য সুকুমার সেন কয়েক হাজার পুঁথি পরীক্ষা করেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস নতুন করে লিখতে গিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইসলামি বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করতে হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইয়ের প্রথম খণ্ডে যে ত্রুটি ছিল তা পরিপূরক গ্রন্থে অনেকটাই দূর হয়েছে। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার রসের বৈচিত্র্য ও রসিকের ভিন্নরুচিত্ব মেনে নিয়ে সহৃদয় যাঁরা অখণ্ড ইতিহাসের বৃহৎ ভূমিতে বাঙালির মন চিনতে ও জানতে চান তাঁদের কাছে হয়তো আমার এই বিগত দিনের নামহারা ফুলে গাঁথা মালার বার্তা ব্যর্থ হবে না।" (ইসলামি বাংলা সাহিত্য)

লোকসাহিত্য চর্চাও তাঁর মনে গেঁথেছিল। তিনি মনে করতেন লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। তাই 'লোক সাহিত্য গাথা' থেকে শুরু করে 'লোক সাহিত্য রূপকথা', 'মঙ্গল যাত্রা', 'নাটগীত' ও পাঁচালী কীর্তন থেকে 'ছেলে ভুলানো ছড়া', প্রবাদ প্রবচন থেকে নেটো গান বিচিত্র বিষয়ে তাঁর সন্ধান চলেছে। তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লোকসাহিত্য স্থান পায়নি ঠিকই, কিন্তু 'নেটো'র দৃষ্টান্ত

সংগ্রহ করে লোকসাহিত্যের নিদর্শনকে তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও সুকুমার সেন একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে সমগ্র একটি খণ্ড রবীন্দ্রসাহিত্য বৃত্তান্ত। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'আদিকর্মিক' বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্র মনীষার সর্বস্ব তিনি বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ছাড়াও সাহিত্য একাডেমির জন্য তিনি অনেকগুলি বই রচনা ও সম্পাদনা করেন। যেমন—'বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' সম্পাদনা। 'বৈষ্ণব পদাবলী' (১৯৫৭) সংকলনটি সুনির্বাচন ও সুলিখিত ভূমিকার জন্য প্রশংসা পায়। বইটি বিদ্যা ব্যবসায়ীদের কাছে নয়, প্রকৃত সাহিত্যরসিকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণে তিনি কবিতা সংখ্যা বাড়িয়ে (প্রায় দেড়শো) দিলেন, যাতে বৈষ্ণব পদাবলীর সমগ্র রূপটা ধরা পড়েছিল।

ভাষাতত্ত্ব থেকে সমাজ, সমাজ থেকে সাহিত্যে সাবলীল বিবরণ এমনটি আগে ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের জন্য তিনি দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি' ও 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি', 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি' (১৯৪৩) পুস্তিকায় তিনি পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংসারের পরিচয় দিয়েছেন। আর 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি' (১৯৪৫) সাহিত্যভিত্তিক রচনা হলেও তিনি মোগল শাসনের ফলে বাংলাদেশের আর্থিক অবনতির চিত্র দারুণভাবে তুলে ধরেছিলেন।

সুকুমার সেনকে ভাষাবিজ্ঞানী, মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাকর্তা, ঐতিহাসিক ও তথ্যসন্ধানী বলা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা ও রবীন্দ্রচর্চার জন্য তিনি যেমন স্মরণীয়, তেমনি রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও তাঁর অবদান কম নয়। যার নিদর্শন—'বনফুলের ফুলবন' বা 'শরদিন্দু অমনিবাস' প্রথম খণ্ডের ভূমিকা। আসলে গণিতশাস্ত্র এবং ব্যাকরণে আগ্রহের সঙ্গে সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোভাসা ছিল সুকুমারের জীবনচর্যার অঙ্গ। জীবনসায়াহ্নে কিছুটা স্মৃতি ও কিছুটা গবেষণা মিলিয়ে তাই তো তিনি লিখলেন 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি'। এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন গোয়েন্দা কাহিনি এক হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। শুধু তথ্য দিয়ে ডিকেটিভ কাহিনি বা 'হুনরি' কাহিনির বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেননি, নিজেই লেখা শুরু করলেন 'হুনরি' কাহিনি। কালিদাস তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। তাই কালিদাসের কাব্য ও দেশকাল সম্পর্কে নানা তথ্য জেনে কালিদাস আখ্যানমালা গড়ে তুললেন। পাঁচটি গল্পগ্রন্থে মোট পঞ্চাশটি গল্প সুপরিকল্পিতভাবে লেখা হল। অধিকাংশ গল্পেই রহস্যের পুর আছে। গোয়েন্দা গল্পের ছায়াপাত বলা যায় গল্পগুলিকে। গোয়েন্দা গল্পের মতো ভূতুরে গল্পেরও তিনি সমালোচনা করেছেন। ভূতের গল্প নিয়ে আলোচনাগ্রন্থে মানব সংস্কৃতির ঐতিহাসিকদের অনুধাবনযোগ্য তথ্য ও বিশ্লেষণ আছে। কালিদাসী কড়চাতে আছে অতিলৌকিক গল্প। স্বতন্ত্রভাবে ভূতের গল্পের বই না লিখলেও সুকুমার সেন তাঁর আত্মকথা 'দিনের পরে দিন যে গেল' বইতে স্মৃতিচারণের ঢঙে বেশ কয়েকটি ভূতের গল্প উপহার দিয়েছেন। শুধু ভূতের গল্প নয়, নানা ধরনের রূপকথা, লোককথাও স্থান পেয়েছে তাঁর 'আত্মকথায়'।

সংবর্ধনা পুরস্কার একাধিক বার পান সুকুমার সেন। পি-এইচ. ডি উপাধি পাওয়ার পরে ছাত্ররা সংবর্ধনা জানায়। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, সাহিত্য পরিষদ

থেকে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার, দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ পুরস্কারও তিনি পান। তবে জীবনে কোনো পুরস্কার বা তিরস্কারে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

সবশেষে বলতে হয় সুকুমার সেনের নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল ভাষা ও সাহিত্য। তাই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসা বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছে। ইন্দো ইউরোপীয় বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষপটে এদেশের ভাষার ঐতিহাসিক অধ্যাপনা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সূক্ষ্মভাবে পাণ্ডিত্য ধারার সূত্রপাত ঘটান ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই ধারার পূর্ণতা দেন ড. সুকুমার সেন। ভাষা সম্পর্কে ড. সেনের ছিল অগাধ দখল। তিনি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের ভাষা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবীয় সহিত্য, ইসলামীয় গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে যেমন মাতামাতি করেছেন, তেমনি বর্ধমানের মুচিদের ভাষার দেশেও তাঁর অবাধ যাতায়াত। ভাষার ক্ষেত্রে বেদ থেকে বটতলা পর্যন্ত তাঁর অবাধ যাতায়াত তাঁর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রিয়নাথ মুখুজ্জে বা পাঁচকড়ি। তবে সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কারও কাছে 'তথ্য ভারাক্রান্ত', 'পাণ্ডিত্য কন্টকিত' বা 'সাহিত্যর সহীন' মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রসস্বাদন ক্ষমতার পরিচয় অসংখ্য প্রবন্ধে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও পাওয়া যায়। অমলেন্দু বসু শতমুখে সুকুমারের ইংরেজি ও বাংলা ভাষাশৈলীর প্রশংসা করেছেন—

> "সুকুমার সেন চমৎকার বাংলা লেখেন, চমৎকার ইংরেজিও লেখেন। পণ্ডিতেরা সবসময়েই ভাষামাধুরীর অধিকারী হন না। কিন্তু সুকুমার সেনের ইংরেজি যে কতটা সাবলীল বহুধা শক্তিসম্পন্ন সেকথা বুঝতে পারি তাঁর রচিত History of Bengali Literature পড়লে এবং আমার বিশ্বাস জওহরলাল নেহরু যে ঐ গ্রন্থ পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন তার অন্যতম একটি কারণ সুন্দর শৈলীসম্পন্ন এক ব্যক্তি সুন্দর শৈলীসম্পন্ন আর এক ব্যক্তির রচনায় অচিরেই আকৃষ্ট হন। ঐ শৈলীগুণ সুকুমার সেনের প্রতিটি বাংলা রচনায় বিদ্যমান এমনকি ভারতকোষ অন্তর্গত utility stanted, উপযোগিতাব্যঞ্জক গদ্যেও। ভাষার সঙ্গে রচনাশক্তির এমন পণ্ডিতজনমহলে বিরল।" (জ্ঞানপথিক সুকুমার সেন)

এই গভীর জ্ঞান ও পণ্ডিত লেখক সুকুমার সেন ১৯৯২ সালের ৩ মার্চ মারা যান। পরিণত বয়সে চলে গেলেন, তবুও এটাকে অকাল মৃত্যু মনে হয়। কেননা, বিরানব্বই বছর বয়সেও তিনি থেমে যাননি— চলেছেন আগের মতোই।

৮.২.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘সুকুমার সেনের গদ্যভাষা’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৮.২.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

পর্যায় গ্রন্থ :২

একক ৫

বিশ্বভাষা

বিন্যাসক্রম :

৮.২.৫.১ বিশ্বভাষা
৮.২.৫.২ বাংলা ভাষা ও উপভাষা
৮.২.৫.৩ চমস্কি ও তার ব্যাকরণ
৮.২.৫.৪ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাষাতত্ত্ব চর্চা
৮.২.৫.৫ শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান
৮.২.৫.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৮.২.৫.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.২.৫.১: বিশ্বভাষা

বর্তমানে পৃথিবীতে চলতি ভাষার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের মতো। আর এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীতে অজস্র ভাষাগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর ভাষাও আলাদা। তাই, মানুষের ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তার আবেগ অনুভূতি, ভাবনাচিন্তা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারে না। কেননা সব ভাষা কেউ জানে না। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই একটি বা দুটি ভাষা জানে মাত্র। তাই সকলের ভাষা সকলে জানবার ব্যবস্থা করার দরকার হল। সে কারণেই মানুষের চেতনায় এল 'কৃত্রিম ভাষা'র প্রসঙ্গ। শুরু হল স্বাভাবিক ভাষার পাশাপিশ সর্বজনীন কৃত্রিম 'বিশ্বভাষা'-র সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

ভাষাবিজ্ঞানী সাপির ভাষাকে দুভাগে ভাগ করেছেন। জাতীয় ভাষা ও কৃত্রিম ভাষা। তাঁর মতে একটি সর্বজনীন আন্তর্জাতিক ভাষার যে সব গুণাবলী থাকা দরকার, পৃথিবীর কোনো জাতীয় ভাষার তা নেই। সাপিরের মতে সর্বজনগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক ভাষাটি হবে সহজ-সরল, নিয়মিত ও যুক্তিভিত্তিক। এরই সঙ্গে সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল একটি ভাষার (ইংরেজি) নানা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজি আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল মনে হলেও তা বেশ জটিল। ইংরেজি ভাষার মধ্যে নিয়মের (উচ্চারণের) নানা বিশৃঙ্খলা আছে। অনেক নিয়ম যুক্তিভিত্তিক নয়। কারণ একই শব্দের একাধিক অর্থ আছে। বিভিন্ন ব্যতিক্রমী নিয়মও আছে। নির্মিত বা কৃত্রিম ভাষা প্রসঙ্গে সাপির বলেছেন এই ভাষাকে সহজ-সরল হতেই হবে। গণিত বা প্রতীকী ন্যায়শাস্ত্রের চিহ্নগুলো নির্মিত ভাষাতে ঠিক ততটা নিখুঁত না হলেও চলবে। কিন্তু মানবিক ভাষার নানা বিশৃঙ্খলা ও অসম্পূর্ণতা তাকে দূর করতে হবে। এই ভাষাকে হতে হবে 'Logical'। পৃথিবীর সকল মানুষকে কম সময়ে এই ভাষা শেখানোর জন্য এর ব্যাকরণ হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল। এই ভাষার ব্যাকরণের কোনো নিয়মে ব্যতিক্রম, অর্থপ্রয়োগ বা নিপাতনে সিদ্ধ বিধান থাকলে চলবে না। একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকবে না।

বলাবাহুল্য 'বিশ্বভাষা' তৈরির আধুনিক ইতিহাস শুরু হয়েছে সপ্তদশ শতক থেকে। কিন্তু বিশ্ব ভাষার কথা প্রথম পাওয়া যায় বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' উপাখ্যানে। এছাড়া এ ব্যাপারে মার্কিন সাংবাদিক ওয়েনডেল উইলকি একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম 'ওয়ান ওয়ারলড' বা 'একবিশ্ব'। তাঁর বইয়ের মূল বক্তব্য দেশে দেশে, জাতিতে-জাতিতে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু ভাই ভাই উচ্ছ্বাসের বড় বাধা হল ভাষার। এই ভাষার বাধা দূর করার লক্ষ্যেই ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক ভাষা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। মানুষের সচেতন পরিকল্পনায় সব জাতির জন্য একটিমাত্র ভাষা গড়ে তোলার চেষ্টা হল কৃত্রিম বিশ্বভাষার উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে কৃত্রিমভাবে বিশ্বভাষা তৈরির প্রথম প্রস্তাব দেন ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত। তিনি ১৬২৯ সালে এই কাজের খানিকটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি দুটি বিশ্বভাষা তৈরির প্রয়োজনের কথা

বলেন। যথা—(১) দার্শনিক ভাষা অর্থাৎ এই ভাষা হবে সুশৃঙ্খল, বিজ্ঞানসম্মত, সুবিন্যস্ত। দেকার্তের মতে এই ভাষায় অভিজাত শ্রেণির মানুষরা সাধারণত কথা বলবে। (২) সাধারণ ভাষা অর্থাৎ এই ভাষা হবে অবিন্যস্ত, আগোছালো সাধারণ মানের। এই ভাষার সাধারণ শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। তবে বিশ্বভাষা সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তাভাবনা তিনি কাজে লাগাতে পারেননি।

কৃত্রিম বিশ্বভাষা সৃষ্টিতে দেকার্তের পরে ব্রতী হলেন স্যার টমাস আরকুইর্ট (১৬৫৩) এবং কেভ বেক (১৬৫৭)। এঁরা দুজনেই প্রথম সাফল্য লাভ করলেন। কেভ বেক সৃষ্টি করলেন 'ইয়নিভার্সাল ক্যারেকটর' বা 'সর্বজনীন বর্ণমালা'। এরপর ১৬৬১ সালে অ্যাবারডিন-এর স্কুলশিক্ষক ডালগারনো যে বিশ্বভাষার সৃষ্টি করলেন, তা 'Univeral Character and Philosophical Language' বা 'সর্বজনীন বর্ণমালা ও দার্শনিক ভাষা'। এখানে তিনি মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জগৎকে ১৭টা ভাগে ভাগ করেছিলেন। আর প্রত্যেকটা ভাগকে এক একটা ব্যঞ্জন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। যেমন—K = রাজনৈতিক সম্পর্কিত ধারণা, Ke = রাজনৈতিক সম্পর্কিত বিচার, N = প্রাকৃতিক সম্পর্কিত ধারণা, Ku = যুদ্ধ সম্পর্কিত ইত্যাদি। ডালগারনোর সৃষ্ট বিশ্বভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—তিনি খবরের কাগজের হেড লাইনের মতো বাক্য থেকে ক্রিয়াপদকে তুলে দিলেন। এই ভাষার কারক স্থান পেল না। এবং '*i*' বর্ণ দিয়ে বহুবচন তৈরির বিধান দিলেন। বাইবেলের জেনেসিসের প্রথম বাক্য—

"In the begining God created the heaven and the earth." তার সৃষ্ট বিশ্বভাষার ডালগারনো রূপান্তরিত করলেন—"Dam Semu Sava Samesa Nam—tnn Nam."

১৬৬৮ সালে আংলিকান চার্চের বিশপ জন্ উইলকিনস 'Real character and philosophical language' ভাষাটির উদ্ভাবন করলেন। ডালগারনোর মতো তাঁর ভাষাও চিনা লিপির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। রয়্যাল সোসাইটির সমর্থনও পেয়েছিল এই ভাষা। তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল, চিনা লিপির পদ্ধতির ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে তিনি তাঁর ভাষার বর্ণমালা সৃষ্ট করেছিলেন। অর্থ অনুযায়ী বিষয়ভাগে এখানে কিছু বিশৃঙ্খলা ছিল। আর সাধারণ ভাষার ওপর অভিজ্ঞতা কম ছিল। উইলকিনসের সমসাময়িক ছিলেন লাইবনিৎস। তিনি ডালগারনো ও উলিকিনসের উদ্ভাবনকে বাতিল করে দেন। তিনি একটি বিশ্বভাষা রচনার কথা ভেবেছিলেন। যেটি হল 'অ্যান অ্যালজেবরা অফ থট' বা 'চিন্তার বীজগণিত'। তিনি এসপেরান্ত বা ভোলাপ্যুকের চেয়েও অগ্রসর ছিলেন। তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়ে—ভাষার ব্যাকরণে লিঙ্গ থাকবে না, পুরুষ বিভক্তি থাকবেন না, শব্দরূপ, ধাতুরূপ থাকবে না। ভাষা সহজ সরল হবে, ব্যাকরণের জটিলতা বিশেষ থাকবে না। তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পিনো ১৯০৩ সালে লাতিন ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সৃষ্টি করলেন একটি বিশ্বভাষা, যার নাম 'ইন্টারলিঙ্গুয়া'। এখানে দেখা গেল, এটি মূলত ল্যাটিন ভাষারই সংস্করণ এবং এই ভাষা থেকে বিভক্তি উৎখাত করা হয়েছে।

ফ্রান্সের কোষাধ্যক্ষ ফেইগে 'নুভেল লাং' বা 'নতুন ভাষা' সৃষ্টি করেন। তিনি ফরাসি ভাষা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন। তাঁর ভাষায় দেখা যায় লিঙ্গ বাদ গেছে, আর্টিকেল নেই। ফরাসি ভাষার বিশেষণ,

বিশেষ্যের লিঙ্গ কারক অনুযায়ী বদলায়। তাও ফেইগে বাতিল করেন। জার্মান মনীষী শ্লেইয়ার 'ভোলাপ্যুক' ভাষার সৃষ্টিকর্তা। এই কৃত্রিম ভাষাটি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি হয়। 'vol' শব্দের অর্থে 'পৃথিবী' আর 'puk' হল 'কথা বলা'। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে কথা বলার উপযোগী একটি কৃত্রিম বিশ্বভাষার সৃষ্টি করেছিলেন শ্লেইয়ার। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—তিনটি স্বরধ্বনি নিয়েছিলেন, 'ch'-এর মত কঠিন ব্যঞ্জন নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ শিশু ও চিনা-জাপানিদের প্রতি করুণাবশত তিনি r (র) ধ্বনিটিকে বর্জন করেন। পরিবর্তে L (ল) ধ্বনি রাখেন। ব্যাকরণগত লিঙ্গকে তিনি বাদ দিলেন। পুরুষবাচক শব্দের আগে ji উপসর্গ বসালেন। শব্দভাণ্ডারের বিশেষণের আগে ik ব্যবহার করতে বললেন। ক্রিয়ার কাল ল্যাটিনের মতো এখানেও ছয়-টাই ছিল। ৮-৯ বছরের মধ্যেই ভোলাপ্যুক আগুনের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন দেশে এর অনুরাগী ছিল সুপ্রচুর। ১৮৯০ সালে 'ভোলাপ্যুক কংগ্রেস' থেকে এই ভাষার দুর্দিন শুরু হয়। শ্লেইয়ারের প্রধান শিষ্য অধ্যাপক কেরকফস দাবি জানান ধাতুরূপে জটিলতা কমানোর জন্য। শ্লেইয়ার এতে আপত্তি জানান। ফলে ভোলাপ্যুক ভাষার অচিরেই হারিয়ে যায়।

এরপর রচিত হল পৃথিবীর সফলতম ভাষা এসপেয়াণ্ডো। পোল্যান্ডের চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন ডা. এল. এল জামেন হফ। তিনি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এসপেরান্তো ভাষার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। ফলে শিক্ষার্থী হিসেবে ভাষার দুর্বলতা তিনি ধরতে পারেন। উদ্ভাবনের কয়েক বছর পরে এর অনুরাগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজারের মতো। ১৯২৬ সালে ১০০টা দেশে প্রায় সাত হাজার এসপেরান্তা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৭-এ 'কৃত্রিম বিশ্বভাষা' বিষয়ক একটি গ্রন্থে লেখক এইচ. জেকব এই ভাষার প্রশংসা করেন। 'এসপেরান্তো' আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের জন্য অতিরিক্ত একটি সহজ ভাষা। এসপেরান্তো বিশেষজ্ঞ John Cresswell তাঁর 'Esperanto' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Esperanto is intended as a simple second language for all mankind. So that each of us may have it within his power to speak to, and to understand, any of his fellow men through out the world. It is in no way opposed to the national languages. On the contrary, it creates in these who learn it an interest in the whole matter, and this vert often leads to their larning one or more of the national language."

এই এসপেরান্তো ভাষার সংস্কার করতে গিয়ে লুই দ্য ব্রোঁফস (১৯০৭ সালে) নতুন ভাষা 'ইদো'র জন্ম দেন। পাশাপাশি সৎ দ্য মাস এর 'বোপাল' (১৮৮৭), বার্ডয়ের ফিডেগের 'ডিল্' (১৮৯৩), ডরময়-এর 'বাল্তা' (১৮৯৩), অবনিমের 'ভেল্টপার্ল' (১৮৯৬)। বোলক-এর 'লাংম্যু' (১৮৯৯), এডগার ডি ভাল

১৯২২ সালে 'অকসিডেন্টাল' নামে একটি বিশ্বভাষার প্রবর্তন করেন। তিনি এই ভাষাকে কৃত্রিম ভাষার স্বরূপ সহজ, সরল করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি, ল্যাটিন ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করার ফলে তিনি ব্যর্থ হন। ১৯২৮ সালে অটো ইয়েসপার্সেন 'নোভিয়াল' নামে একটি নতুন ভাষার সৃষ্টি করেন। এর আগে যে ভাষাগুলি পাই, তাতে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর সাহায্যের হাত ছিল। তিনি একক প্রচেষ্টায় এই নতুন ভাষার সৃষ্টি করেন। এসপেরান্তো ভাষার সংস্কারসাধন করলেন। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায়—বহুবচনের চিহ্ন এই ভাষায় 'j', বিশেষ্যের চিহ্ন 'O', বিশেষণের চিহ্ন 'a' ও কর্মকারকের চিহ্ন 'n'। এসপেরান্তোয় মূলের সঙ্গে 't' যোগ করলেই তা ক্রিয়া হয়ে যায়। মূল শব্দের সঙ্গে 'e' বসিয়ে ক্রিয়া বিশেষণ সৃষ্টি করা হয়। সর্বনামের শেষে বিশেষণ 'a' বসিয়ে সম্বন্ধ পদ গঠিত হয়। এই ভাষায় তিনটি কাল। বর্তমান কালের শেষে 'as' ভবিষ্যতে 'os' এবং অতীতকালে 'is' প্রত্যয় যোগ করা হয়। এসপেরান্তোয় একটিমাত্র 'আর্টিকল' ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার শব্দভাণ্ডার ল্যাটিন, জার্মান আর ইংরেজি শব্দভাণ্ডারকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এর বানান খুব বিধিবদ্ধ ও উচ্চারণ অনুযায়ী।

পৃথিবীর সমস্ত নির্মিত ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল এসপেরান্তা। জামেনহাফ ড. এসপেরান্তা ছদ্মনামে 'Lingvo Intennelia of Inliernationat Language' নামে একটি নতুন ভাষার উদ্ভাবন করেন। ফলে তার ছদ্মনাম অনুসারে ভাষার নাম হয় 'Esperanto', 'The word', Esperanto is derived from French and Spanish words meaning 'the hoping one' and 'hope' [Dictionary of Literary Terms—Henry Show]

"Esperanto is a plannet language derigned for the whole mankind taking the root words of various classical language which enables it to break through the barriers of national, geographical and regional boundaries [Syam Sumdar Paul—Some Facts and Figards about Speranto. The International Language] আর 'The language is based on the commonest word in the most important European Language'.

যেমন—রোমান, জার্মান, গ্রীক প্রভৃতি। ফলে এই ভাষা হয়ে উঠেছে অতি সহজ সাবলীল অথচ সমৃদ্ধ ও উন্নতশীল। এর ব্যাকরণ যেমন সরল, তেমনি সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল ও যুক্তিভিত্তিক, এর নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

Esperanto ভাষায় রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা হলেও Q, W, X, Y-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং যুক্ত হয়েছে $\hat{e}, \hat{G}, \hat{H}, \hat{S}$ এবং Y। অতএব এর মোট বর্ণ ২৬টি—২১টি ব্যঞ্জন, ৫টি স্বর ও দুটি অর্ধস্বর। এর ৫টি স্বরবর্ণ অর্ধস্বর দুটি যুক্ত হয়ে 'Many medial cluslirs' গঠিত হয়। এর ৫টি স্বরবর্ণ অর্ধস্বর দুটির যুক্ত হয়ে Dipthongs গঠন করে ej, aj, aũ ।

এসপেরান্তো ভাষার orthography is phonetic, all words being spelled as pronounced। যেমন—knab = ক্লাব, Libr = লিব্র। উচ্চারণ নেই এমন কোনো বর্ণ এ ভাষায় নেই। আর আশেপাশের কোনো বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের উচ্চারণে প্রভাব ফেলে না। যেমন—Boato = বোয়াতো (বোতো নয়)।

এসপেরান্তো ভাষায় উচ্চারণের ঝোঁক সবসময়ই শেষ অক্ষরের আগের স্বরের উপর পড়ে। যেমন—Espera nto Hejwo ইত্যাদি। এখানে সব শব্দ মৌলিক। অর্থাৎ একটি root-এর সাথে 'at least one affix' যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়। যেমন—Patroto = patro আর এই ভাষায় ১৫৮টি ধাতু affixes ছাড়াই শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—mi = আমি, tri = তিনি, kaj = এবং। এই ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সোজা। আমরা জানি, সংস্কৃত শব্দরূপও ধাতুরূপে, লিঙ্গ ও বচনে জটিলতা আছে। কিন্তু এসপেরান্তো ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র ১৬টি নিয়মেই শেষ। যেমন—একটা নিয়ম হল, পুরুষ ও বচন অনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন না হয়ে একই থাকা। যেমন—

Mi **dormas** noktE = আমি রাতে ঘুমাই।

Li **dormas** noktE = সে রাতে ঘুমায়।

বাংলায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়া হল 'ঘুমাই'। কিন্তু প্রথম পুরুষের ক্রিয়া 'ঘুমায়', কিন্তু এসপেরান্তো ভাষায় সব পুরুষে ক্রিয়ার একই রূপ থাকে। যেমন—উপরের উদাহরণে 'dormas' শব্দটি। এই ভাষায় বিশেষ্যের চিহ্ন 'O' এবং এই বিশেষ্যের সঙ্গে 'a' যোগ করলেই বিশেষণ করা যায়। যেমন—সৌন্দর্য = bel = 0, সৌন্দর্য = bel^{-a}। আবার মূলের সঙ্গে 'l' যোগ করলেই এই ভাষায় তা ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যেমন—$mortel^{-o}$ = হাতুড়ি, কিন্তু $mortel^{-i}$ = হাতুড়ি ঠোকা।

এসপেরান্তো ভাষার বানান উচ্চারণভিত্তিক হয়। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, পৃথিবীর সব ভাষার বানান ও উচ্চারণে কিছু বৈষম্য আছে। বানান লেখা হয় একরকম, উচ্চারণ হয় অন্য। যেমন—বাংলায় 'পদ্ম' শব্দের বানানে 'ম' আছে। কিন্তু বাংলায় আমরা 'ম' উচ্চারণ করি না। এসপেরান্তো ভাষায় এই বৈষম্য একদম নেই। যেমন—am = আম = ভালবাসা, art = আর্ট = শিল্প। knab = ক্লাব = বালক, Libr' = লিব্র = বই। জামেনহাফ গোড়ায় ৯২১টি ধাতু বা রুট খাড়া করেছিলেন। সেগুলোর সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করে পুরো শব্দ তৈরি হত। এখন সরকারিভাবে স্বীকৃত রুটের সংখ্যা ছয় হাজার। কিন্তু অনুমোদন বহির্ভূত রুটের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতো।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, পৃথিবীর অনেক ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে 'এসপেরান্তো' সৃষ্ট। অন্য বিশ্বভাষার তুলনায় এই ভাষা অনেক বেশি সহজ সরল। এই ভাষা প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে 'Esperanto Association' গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন—'Universala Esperanto Association', 'Federacio-Espernto de Bharato' ইত্যাদি। জামেনহাফ তাঁর উদ্ভাবিত ভাষার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। তাই পৃথিবীর অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই ভাষার শিক্ষা নিয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, ১৯০৫-এ ফ্রান্সে এসপেরান্তো প্রেমীদের প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশ্বসভায় সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার আগে কোনোরকম পরিবর্তন করার ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু 'লা এসপেরান্তিস্তো' পত্রিকায় টলস্টয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফলস্বরূপ তখনকার রুশ সম্রাট এসপেরান্তো ভাষাকে ওই দেশে নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯০৫-এ ফরাসি সরকার এবং ১৯০৯-এ স্পেন সরকারের দ্বারা জামেনহাফ্ সংবর্ধিন হন। ১৯৩০ সালে এই ভাষায় চার হাজার বই প্রকাশিত হয়। আলবেনিয়ার স্কুলে এই ভাষা অবশ্য পাঠ্য হয়। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতে থাকে এই ভাষা। জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগালের পুলিশ শিক্ষণকেন্দ্র ও 'লেবার কলেজ'গুলিতে এই ভাষা শেখানো হতে থাকে। বিশেষ করে জার্মানির ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পাঁচটি শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ভাষা অবশ্য পাঠ্য হয়। ইংল্যান্ডে লর্ড ব্রাইস, এইচ. জি. ওয়েলস এই ভাষার প্রতি আনুকূল্য দেখান। কিন্তু ১৯৩৫ সালে জার্মানিতে হিটলারের 'থার্ড রাইখ্' সে দেশে এসপেরান্তোর প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, এ ভাষা জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষায় অনেক গবেষণাপত্র লেখা হচ্ছে বলে খবর আছে। একসময় রবীন্দ্রনাথ 'Esperanto Bureau and Inst semarango' (1926) পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"ইহা অসাধারণ ক্ষমতাপ্রসূত একটি বিশাল আবিষ্কার। এবং আশা রাখি যে এটি ধীরে ধীরে জীবনমুখী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উর্বরতা অর্জন করবে।" বলাবাহুল্য, এসপেরান্তো ভাষাকে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত সমাদর করেছে। কিন্তু কখনোই কোনো দেশ এই ভাষাকে 'বিশ্বভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়নি। তবুও বর্তমানে কোরান-বাইবেলের পাশাপাশি হোমার, ভার্জিল, দান্তে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তিগুলি এই ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের মনীষীরা বিশ্ব ভাষা সৃষ্টি করেছেন সত্য। কিন্তু তার মধ্যে অবশ্যই সফলতম হল এসপেরান্তো। ইংরেজি ভাষাও 'বিশ্বভাষার' মর্যাদা পায়নি। কারণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণে অসঙ্গতি ও সমস্যা আছে। ইংরেজি শব্দের একাধিক অর্থ প্রচলিত আছে। ভাষার বানানে ও বচনে নানা সমস্যা আছে। আবার ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডারও বড় হওয়ায়, তা 'বিশ্বভাষা' হতে পারেনি। কিন্তু 'এসপেরান্তো' বিশ্বভাষা হওয়ার শর্তাবলী পালন করেছে। মূলত 'বিশ্বভাষা' হতে গেলে যে শর্তাবলী থাকে তা হল—বিশ্বভাষাকে হতে হবে সহজ-সরল প্রাঞ্জল। গণিত বা ন্যায়শাস্ত্রের মতো নিয়মনীতি পালন করতে হবে। এর নিয়মনীতিগুলি হবে Logical। বিশ্বভাষার ব্যাকরণের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রমী নিয়মনীতি থাকবে না। বানানের সমস্যা থাকবে না। উচ্চারণরীতির তারতম্য হবে না। বাক্য যথাসম্ভব ছোট হবে, শব্দভাণ্ডারও বড় করা চলবে না। তাছাড়া বিশ্বভাষার ব্যাকরণ হবে সহজ-সরল, যাতে সকল শ্রেণির শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত সকলেই এই ভাষা বুঝতে পারে। তাইতো ইংরেজি 'বিশ্বভাষা'র মর্যাদা পায়নি। কিন্তু 'এসপেরান্তো' ভাষা 'বিশ্বভাষা'র মর্যাদা পেতেই পারে।

'এসপেরান্তো' সহ কয়েকটি বিশ্বভাষার আলোচনা থেকে ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী জে. আর. ফার্থ গঠন অনুযায়ী এই ভাষাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে কৃত্রিম বিশ্বভাষা (পৃথিবীর সব) মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত। যেমন—(১) পৃথিবীর কোনো ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ কল্পিত একটি ভাষা। ফার্থ এই ধরনের কৃত্রিম বিশ্বভাষাকে বলেছেন 'আ প্রায়োরি সিস্টেম'। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত উদ্ভাবিত এইরকম ভাষার সংখ্যা ১৭। দেকার্ত, ডালগারনো ও ড্রিটিশ-এর উদ্ভাবিত ভাষাগুলি এই শ্রেণিতে পড়ে। (২) এখানে স্বাভাবিক মানবভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে এই ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এই মিশ্রভাষার নাম 'নুভেল লাং', এসপেরান্তো, ইদো, অকসিডেনটাল, নোভিয়াল ইত্যাদি। (৩) তৃতীয় এই পর্যায়ে ভাষাটি গড়ে উঠেছে প্রথম ও দ্বিতীয়ের মিশ্রণে। এইসব ভাষার খানিকটা দার্শনিক, আর খানিকটা স্বাভাবিক মানবভাষা মিশ্রিত। ফার্থের মতে এইরকম বিশ্বভাষার সংখ্যা এক ডজনের মতো। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভোলাপ্যুক'। এছাড়া ফার্থ ও বডমারের মতে দুটি যোগাযোগের ফলেই সপ্তদশ শতকে বিশ্বভাষা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সে দুটি হল—(ক) মানব জগতের মধ্যে একতার চেতনা সৃষ্টি, (খ) নতুন ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মিলন।

এ কথা ঠিক, আরও অনেক বিশ্বভাষা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—ইউনিভার্সাল, বোপাল, ডিল, বালতা ইত্যাদি। এদিক থেকে বিচার করলে 'এসপেরান্তা' অনেক বেশি কার্যকরী ও সফল। তবুও এই ভাষার প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। সেই দৃষ্টান্ত যথার্থ বুঝিয়েছেন বিশ্বভাষার জন্ম দেয় বিশ্বশক্তি। এই শক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। তাইতো নিয়মের অজস্র অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'ইংরেজি' আজও সবচেয়ে কার্যকরী বিশ্বভাষা। সবশেষে বলতেই হয় কোনো কৃত্রিম ভাষাকে যদি 'বিশ্বভাষা' করতেই হয়, তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ভাষাকে ভাববিনিময়ের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই ভাষার সাহায্য ছাড়াও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা, তুলনামূলক সাহিত্যপাঠে প্রীতি এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চায় উৎসাহী হতে হবে। তবেই আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটবে। তবেই একটি 'কৃত্রিম ভাষা' আন্তর্জাতিক স্তরে মানব ঐক্য গড়ে তুলতে পারবে সেটি যথার্থ 'বিশ্বভাষা'র মর্যাদা পাবে।

৮.২.৫.২: বাংলা ভাষা ও উপভাষা

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষা সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেছেন—"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে ঘোরে মানুষের চতুর্দিকে।" এই ভাষা কবে থেকে এল সে সম্পর্কে আজও কোনো স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি। তবে একটা অনুমান করেছেন বিজ্ঞানী হারভার। তাঁর মতে ভাষা মানুষের সৃষ্টি। ঈশ্বর ভাষা সৃষ্টি করেননি। সমাজ তৈরি হলে কাজের ভিত্তিতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ভাষা সৃষ্টি করেছেন। মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন—

"Language like conciousness, only arises from the need the necessity of intercourse of the man."

গ্যেটে বলেছেন—

"Language make people of more than people language."

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"কণ্ঠের ধ্বনি দিয়ে মানুষ যে অর্থবান ভাষা সৃষ্টি করেছে, সেই ভাষাকেই সে করে তুলেছে জীবনযাত্রার প্রধান হাতিয়ার।"

আচার্য ড. সুকুমার সেন ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন—

"মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ ব্যঞ্জনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।"

তিনি আরও বলেছেন একজন মানুষের স্পৃহা বা উত্তেজনা আর একজন মানুষের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করিয়ে সেইরূপ স্পৃহা বা উত্তেজনার অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ভাষার প্রথম ও প্রধান কাজ।

ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট ভাষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা অনেক বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগৃহীত—

"A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact."

অতএব বলা যেতে পারে ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত প্রণালিবদ্ধ ধ্বনি সংকেত, যা দিয়ে এক একটি বিশিষ্ট সমাজ পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করে। যেমন বাংলা ভাষায় রাম 'মাকে বলল—'মা খিদে পেয়েছে'। মা বললেন 'চল দিচ্ছি'। এই যে রামের কথার উত্তরে মা তার মনের ভাব জানাতে পারলেন।

ভাষার সংজ্ঞাগুলি থেকে এর কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—ভাষা কতগুলি ধ্বনির সমষ্টি। এই ধ্বনিগুলি অবশ্য মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত। কিন্তু ভাষার ধ্বনিগুলি শুধু বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেই চলবে না, ধ্বনিগুলিকে কোনো বিশেষ বস্তু বা প্রাণীর প্রতীক হতে হবে। তবে ধ্বনি কখনওই কার্যকরাণ সূত্রের কোনো বস্তু বা প্রাণীর প্রতীক নয়। মানুষ তার খেয়ালখুশি মত তাদের ব্যবহার করে। যেমন 'জল' দ্বারা বাংলায় যে তরল বস্তুকে নির্দেশ করা হয় ইংরেজিতে তাকে 'ওয়াটার', হিন্দিতে 'পাণি', লাতিনে 'অ্যাকোয়া' বলা হয়। তাই ভাষাকে বলা হয় arbitrary vocal symbols। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগত প্রতীকগুলি প্রথমে খেয়ালখুশিতে নির্বাচন করা হলেও সমাজে তা স্বীকৃত হয়ে গেলে শব্দমধ্যে বা বাক্য মধ্যে এদের আর খেয়ালখুশি মত ব্যবহার করা চলে না। তখন এদের ব্যবহারে একটি প্রণালীবদ্ধ নিয়ম থাকে।

সমাজই পরোক্ষভাবে ভাষা সৃষ্টি করে। একটি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেও ভাষা কখনওই একটি মানুষ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমই ভাষা।

ভাষার মাধ্যমে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে। কিন্তু একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। তাই সৃষ্টি হয়েছে ভাষা সম্প্রদায়ের। কিন্তু ওই ভাষা সম্প্রদায় কথিত ভাষার রূপও সর্বত্র একরকম নয়। যেমন—পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিমবাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি সম্পূর্ণ একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একেই বলে আঞ্চলিক উপভাষা। অর্থাৎ একটি ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে গড়া ভাষাগুচ্ছকে উপভাষা বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে উপভাষা সম্পর্কিত ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না। তখন উপভাষা বা গ্রাম্যভাষাকে শিষ্ট বা সাধুভাষার বিকৃত ও ভ্রান্তরূপ বলে বিবেচনা করা হত। ১৮৭৫-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস স্থির করতে গিয়ে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন স্টান্ডার্ড বা শিষ্ট ভাষাবিশেষ ঐতিহাসিক রূপ থেকেই উদ্ভূত এবং উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা সাধুভাষার বিকৃত রূপ নয়। উপভাষা তত্ত্বে অগ্রণী ফরাসিরা। আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বে ইতালিয়ানদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

উপভাষার মানচিত্র প্রথম প্রণয়ন করেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ ওয়েংকার। তিনি তাঁর উপভাষা-প্রশ্নমালার উত্তর ভাষাতত্ত্ব প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকদের সহায়তায় সংগ্রহ করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল শাস্ত্রের উদ্ভাবক ফরাসি পণ্ডিত জুল গিলিয়েগাঁ, তিনি ফরাসি উপভাষা জরিপে দুই হাজার প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করেন। এই প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহে তিনি ই. এডমন্ট নামে একজন দক্ষ কর্মীকে নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি ফরাসি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহ করেন। ফরাসি 'লাত্‌লাস লিঙ্গুইসতিক দ্য ফ্রাঁন্স' ১৮৯৭ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে ১৯০২-১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। সমসাময়িককালে ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রিয়ার্সন ভাষা জরিপ করেন। এরপর গ্রিয়ার্সন বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তাঁর বিশ্লেষণ কয়েক খণ্ডে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশ করেন।

উপভাষাতত্ত্ব শব্দের বিশ্লেষণ কেন্দ্রীভূত ছিল উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে। মুখের ভাষায় প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উপভাষাতাত্ত্বিকেরা শব্দার্থ, বিকিরণ ও বাক্যে তাঁদের ভূমিকা অনুযায়ী শব্দের ইতিহাস নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। উপভাষা বিশ্লেষণে একটি ভাষা উদ্ভব ও বিকাশে যেসব উপাদানের সংস্পর্শে আসে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ ও প্রথমদিকে ভাষাতাত্ত্বিকদের ভূগোলের তত্ত্বগত ধারণা ছিল। একটি ভাষার উপভাষাগত পার্থক্য প্রধানত শব্দ ও ধ্বনি সংগঠনে পাওয়া যায় বেশি, কিন্তু রূপ, বাক্ বা ব্যাকরণে পার্থক্য কম।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য সৃষ্টি করে ভৌগোলিক কারণও। সমতলভূমির থেকে পার্বত্যভূমি প্রান্তিক অঞ্চল হওয়ায় ভাষার পার্থক্য দৃঢ় হয়।

উপভাষা নির্ণয়ে ফরাসিরা শব্দের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফরাসি উপভাষাবিদ গিলিয়েগাঁ শব্দের আগমের দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন—একই ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দের সংঘাত ও শব্দ সংগঠনের অনুপযোগিতা। সমধ্বন্যাত্মক—শব্দের আলাদা পরিবেশের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ একই পরিবেশে ব্যবহৃত হলে তার তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু একটি নতুন শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থের একটিকে গ্রহণ করে, ফলে অভিন্ন ধ্বনি বিশিষ্ট ভিন্নার্থক পরিবেশের অবসান ঘটে। আবার সময়ের বিবর্তনে একটি শব্দের ধ্বনি সংগঠন বদলে যেতে পারে। এই শব্দ সংগঠন ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দ অনেক সময় নতুন শব্দের সৃষ্ট করে। উপভাষারও জন্ম হয় এখান থেকে এভাবেই।

ইতালির নব্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের উপভাষাতত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল জার্মান ও ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল তত্ত্ব। তাদের মতে একটি ভাষার বিবর্তন প্রধানত ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাঁরা উপভাষা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে একটি ভাষার উপভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রতি তারা খুবই মনোযোগ দেন। এভাবেই 'এরিয়েল লিঙ্গুইস্টিক্স' বা আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিরুপণের জন্যে 'সেন্ট্রাল' এবং 'পেরিফেরাল' বা কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের যে পার্থক্য তারা নির্দেশ করেন, তা উপভাষার সীমানা নির্ধারণে সহায়ক।

জার্মান, ফরাসি ও ইতালিয়ান উপভাষাবিদ্‌রা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহকে উপভাষা মানচিত্রেও তুলে ধরেছেন। উপভাষা মানচিত্রে একটি বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অবস্থানও সীমা সমশব্দ রেখা 'আইসোগ্লস'-এর সাহায্যে নির্দেশ করা হয়। কোনো ভাষারই আঞ্চলিক বৈচিত্রসমূহ এক প্রকার নয়। তবে উপভাষা মানচিত্রে সমশব্দ রেখা কম অঞ্চলকে ওই ভাষার বিভিন্ন উপভাষার 'কেন্দ্র অঞ্চল' বলা হয়। উপভাষা অঞ্চলের প্রান্ত বা সীমান্তকে উপভাষা বৈশিষ্ট্যের সন্ধি অঞ্চল বলা হয়। ইতালির নব ভাষাতাত্ত্বিকেরাই ভাষার 'উপস্তর' তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, যদি কোনো জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে অন্য ভাষা গ্রহণ করে, তাহলে পূর্ববর্তী ভাষার প্রভাবে পরবর্তী ভাষাটি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ভাষাতাত্ত্বিক উপস্তরের উদ্ভব হয়। যেমন—বাংলাদেশে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে আর্যভাষা বিস্তারের আগে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডা ও অন্যান্য অনার্য ভাষা প্রচলিত ছিল। এই অনার্য ভাষাসমূহের প্রভাবে আর্যভাষার পরিবর্তন হয়। ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার পূর্ববঙ্গীয় ছাপ থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, এই কারণেই বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির অভাব, স্পৃষ্ট ও তালব্যধ্বনির পরিবর্তে ঘৃষ্ট, উষ্ম ও দন্ত্যধ্বনির প্রাধান্য, স্বরধ্বনিতে সানুনাসিকতার অভাব ও তাড়নজাত মূর্ধন্য ধ্বনির অনুপস্থিতি দেখা যায়।

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের পরে অধিকতর সংখ্যায় বিভিন্ন উপভাষার সংগঠনের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপভাষার সমান্তরাল ব্যবস্থাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বিভিন্ন উপভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচিত হয়েছে। 'ডায়াসিস্টেম' গ্রাফের সাহায্যে দুটি ভাষা বা উপভাষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে প্রদর্শিত করা হয়। আর 'ইডিয়লেক্ট'—একজন ভাষাভাষীর বাক্‌বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা হয়। সোয়াবিয়ান উপভাষাবিদ্ ফিশার আবিষ্কার করেন দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানির আঞ্চলিক উপভাষার সীমানা। যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সীমারেখার সঙ্গে যুক্ত। জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির উপভাষা সীমানাগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে জাবের্গ দেখিয়েছেন ওইসব দেশের উপভাষা বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফল। ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ওইসব দেশে কেন্দ্রীয় শক্তিশাসিত নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল বলে বিভিন্ন উপভাষার সীমারেখাও স্পষ্ট। আর জার্মানির উপভাষা রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা ও অতীতের আঞ্চলিক পটপরিবর্তনের ফল।

লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডের মতে সামাজিক কাঠামো ভাষাকে প্রভাবিত করে। মানব সমাজের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য জনবসতি গভীরতার সঙ্গে জড়িত। আবার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষার জরিপ চালানো হলে দেখা গেছে নাগরিক পরিবেশের শিক্ষার হার খুব বেশি। সেখানে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষারও সহাবস্থান ঘটেছে। কিন্তু আমেরিকায় ভাষাতাত্ত্বিক উইলিয়ম লেবভ এক একটি অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য উপভাষাভাষী বেছে নিয়ে ভাষার সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ পর্তুগীজ ধর্মযাজক মনোএল দ্য আস্‌সুম্পাসাঁও ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভোকাবুলারিও এমন ইদিত্তমা বেনগ্াল্লা এ পর্তুগীজ' নামক বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেন।

পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষাতেই আছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক উপভাষা। সেইরকম বাংলা ভাষাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও গ্রীয়ার্সন তার 'Linguistics Survey of India' গ্রন্থে বাংলা ভাষায় চল্লিশটি উপভাষার কথা বলেছেন। কিন্তু তা কমিয়ে পাঁচটির কথা বলা যেতে পারে। যেমন—রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী।

রাঢ়ী উপভাষা মধ্য পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করছে।

বঙ্গালী উপভাষার অবস্থান পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে।

বরেন্দ্রী উপভাষা উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনাতে এবং ঝাড়খণ্ডী উপভাষা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও দক্ষিণ-পশ্চিম

মেদিনীপুরে অবস্থিত। এছাড়া কামরূপী উপভাষা উত্তর-পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরাতে অবস্থিত।

রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় 'অ' স্থলে 'ও'-কার প্রবণতা। যেমন—পাগল > পাগোল, অপু > ওপু ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রবণতা সবক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন দল > দোল উচ্চারিত হয় না।

নাসিক্যভবন ও স্বতোনাসিক্যভবনের প্রাধান্য এই উপভাষায় আছে। যেমন—চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ।

অপিহিনিতি এখানে সম্পূর্ণ বর্জিত। সেক্ষেত্রে অতিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—করিয়া > কইর‍্যা > করে, দেশি > দিশি ইত্যাদি। এছাড়া 'ল' কোথাও কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। লুচি > নুচি। শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্ত্যে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়। দুধ > দুদ্ ইত্যাদি। শব্দের অন্ত্যে অঘোষ ধ্বনি কখনও সঘোষ হয়ে যায়। কাক > কাগ ইত্যাদি।

রাঢ়ীর রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় কর্তৃকারক বাদে অন্য সব কারকের বহুবচনের ক্ষেত্রে 'দের' বিভক্তি যোগ। যেমন—আমাদের খেতে দাও। গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি (আমাকে দাও), অধিকরণ কারকে 'এ' ও তে বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—'ঘরে যাও', 'বাড়িতে থেকো'।

সদ্য অতীতকালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি 'ল' (সে গেল) ও সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি 'লে' (সে বললে)। এছাড়া উত্তম পুরুষের বিভক্তি অতীতকালে 'লুম' (আমি বললুম)।

মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই 'আছ্' ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান (কর্ + ছি = করছি) ও ঘটনাম অতীতের রূপ (কর্ + ছিল = করছিল) গঠন করা যায়।

বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে প্রথমেই দেখা যায় অপিনিহিতির প্রাধান্য। যেমন—করিয়া > কইর‍্যা। আবার 'য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন, 'ঞ্জ', ও 'ক্ষ' এর আগে একটি ইকারের আগম হয়। যেমন—বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ > যইগ্‌গ। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় না। ফলে এই লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবনের প্রক্রিয়া বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র > চন্দ।

বঙ্গালীতে উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—দেশ > দ্যাশ। এছাড়া চ, ছ, জ ইত্যাদি ঘৃষ্টধ্বনি উষ্মধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—খেয়েছে > খাইসে। 'স' ও 'শ' এর স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন—শাক > হাগ। তাড়িতধ্বনি 'ড়' কম্পিতধ্বনি 'র' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি।

বঙ্গালীর রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয় (রামে খায়)। গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ‘রে’ বিভক্তি (আমারে দাও) যোগ হয়। অধিকরণের বিভক্তি ‘ত’ (বাড়িত থাকুম) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তি হয় (আমাগো বই দাও)।

বঙ্গালীতে সদ্য অতীত কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল ‘লাম’ (আইম খাইলাম)। মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল ‘বা’ (তুমি খাবা না?)। উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি ‘উম’ ও ‘মু’ (আমি যামু, খেলুম না)। বঙ্গালীতে নঞর্থক অব্যয় ‘নাই’, গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়া এখানে পরে বসে। যেমন—রাম গ্যাসে গিয়া।

বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে প্রথমেই দেখা যায় রাঢ়ীর মতোই স্বরধ্বনি। অনুনাসিক স্বরধ্বনি এখানেও রক্ষিত। তবে রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নেই। এছাড়া বরেন্দ্রীতে সঘোষ মহাপ্রাণ। ধ্বনি শুধু শব্দের আদিতে বজায় থাকে। শব্দের মধ্য ও অন্ত্যে অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। যেমন—বাঘ > বাগ্। এখানে ‘জ’ (J) প্রায়ই জ্ (Z) রূপে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া পদের আদিতে ‘র’ এর লোপ ও আগম এই উপভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যেখানে ‘র’ থাকার নয়, সেখানে ‘র’ এর উপস্থিতি ও যেখানে ‘র’ এর থাকার কথা, সেখানে ‘র’ এর অনুপস্থিতি দেখা যায়। যেমন—আম > রাম, আবার রস > অস। স্বরধ্বনি অনুনাসিকতা বজায় আছে চাঁদ কাঁটা ইত্যাদিতে।

বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে ‘ত’ বিভক্তি (ঘরত = ঘরে) দেখা যায়। উত্তম পুরুষের বিভক্তিতে বঙ্গালীর প্রভাব আছে। ভবিষ্যৎকালে ‘ম’ ‘মু’ (যাম, যামু) এবং অতীত কালে ‘লাম’ (খেলাম) বিভক্তি যুক্ত হয়।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—চাঁ, হইঁছে, আঁটা ইত্যাদি। ‘ও’ কারের ‘অ’ কার প্রবণতাও ব্যাপক। যেমন—লোক > লক, চোর > চর। অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয় (দূর > ধূর)। অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ লোপ বা পরিবর্তন হয় না (রাতি > রইত)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অস্ত্যর্থক ‘বট্’ ধাতুর ব্যবহার ‘আছ্’ ধাতুর স্থলে হয়। যেমন—করিয়াছে > করি বটে। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সঙ্গে ‘ক’ প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—করলেক, হবেক ইত্যাদি। বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষের ‘উ’ বিভক্তি (তু চলু) এবং অতীত কালে উত্তম পুরুষে ‘ই’ বিভক্তি (আমি জাতেছিলি)। নাম ধাতুর বহুল ব্যবহার এখানে দেখা যায়। এখানে সম্বন্ধ পদ ও অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। (ঘাটশিলা শাড়ি—সম্বন্ধপদ রাইত (রাতে) ছিলি—অধিকরণ)। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয় নু, লে, রু (মায়েরলে মাউসির দরদ)। এছাড়া

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই বসে। যেমন—চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না?), নাই যাব, নাই হয় ইত্যাদি।

কামরূপী উপভাষার সঙ্গে বঙ্গালী উপভাষার সাদৃশ্য বেশি। কামরূপী হল কামরূপের নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর। কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে পড়ে। সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (সম্ঝা-সম্ঝি > সম্জা—সম্জি) এখানে 'ও' কখনও কখনও 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। (কোন্ > কুন) তবে এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। চ্, জ্, স্, শ্ হয়েছে যথাক্রমে ৎ, স্, জ্, হ্। তবে এই বৈশিষ্ট্যও সর্বত্র সুলভ নয়।

কামরূপীর রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়—উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল—মুই, হাম ইত্যাদি গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি (বাপক), সম্বন্ধ পদে 'র' ও 'ক' বিভক্তি (বাপোক, ছাগলের ইত্যাদি) এবং অধিকরণে 'ত' বিভক্তি (পাছত = পশ্চাতে) দেখা যায় কামরূপীতে। এছাড়া এই উপভাষায় সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে 'নু' এবং প্রথম পুরুষে 'ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কন্নু (সেবা করলাম)।

৮.২.৫.৩: চমস্কি ও তাঁর ব্যাকরণ

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মূলত বিংশ শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানী। তাই তাঁর চিন্তাভাবনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি একদিকে ভাষা জিজ্ঞাসার আসল লক্ষ্য নিরূপণ করেন, অন্যদিকে ভাষার সৃজনী দিকের ওপরেও গুরুত্ব দেন।

চমস্কি ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইহুদী ছিলেন। শিক্ষাগ্রহণ করেন আমেরিকায়। কিন্তু তাঁর চিন্তাচেতনায় আমেরিকার প্রতি বিরূপ ভাব দেখা যায়। কারণ তিনি আমেরিকার মানবতা বিরোধী রাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করেননি। তাঁর রচনা "American power and the New Mandarins" গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। তিনি ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হল—

1. Syntatic Structures (1957)
2. Current Issue in Linguitic Theory (1964)
3. Aspects of the Theory of Syntax (1965)
4. Topics in the Theory of Generative Grammar (1966)
5. Cartesian Linguistics : A chapter in the History of Rationali of Thought (1966)
6. Language and Mind (1968)

উল্লেখ্য চমস্কির পর থেকেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। তাঁর লেখা 'Syntactic Structures' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সম্পর্কে নতুন ভাবনার পরিচয় পান। 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে চমস্কির মতবাদ কিছুটা সংশোধিত হয়। তিনি মনে করেন, মানুষের ভাষার প্রকাশরূপের অন্তরে আছে যে অর্থসম্পদ, তার বাহ্যগঠনের তলে রয়েছে যে গভীরতর গঠন এবং বাহ্যব্যবহারের অন্তরে নিহিত আছে ভাবকেন্দ্র স্বরূপ যে মন, তাকে আবিষ্কার করাই হল ভাষাজিজ্ঞাসার আসল লক্ষ্য। আবার ভাষার সৃজনী দিকের (creative aspect) উপরে জোর দিয়ে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছেন—

> "..... One of the qualities that all language have in their creative aspect. The grammar of a particular language then, is to be supplemented by a universal grammar that accomodates the creative aspect of language use".

সুতরাং আমরা মনে করি, ভাষার দুই রূপ—সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষা। দুইই ভাষাবিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থান পেতে পারে। চমস্কির 'Syntactic Structure' গ্রন্থ থেকেই Transformational and Generative Grammar' উদ্ভুত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় ড. পবিত্র সরকার এরই প্রতিশব্দ করেছেন 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ'। 'Syntactic Structure' বইটিতে চমস্কি দেখিয়েছেন যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বাক্যই মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন বাক্যের চেহারা যেহেতু নানারকম হতে পারে, সেইজন্য বাক্যের process বা operation বা কার্যপদ্ধতি শেখানোই ভাষাবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চমস্কির রূপান্তরী প্রজনন ব্যাকরণ শুরু হচ্ছে এই কথা থেকে বোঝা যায় সে সীমাবদ্ধ বাক্য উপাদান থেকে অগণিত বাক্যের সৃষ্টি বা generation কিভাবে হয়? বা বাক্যগঠনের নীতিগুলি সীমাবদ্ধ হলেও প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বাক্য তৈরি হচ্ছে কিভাবে? তার উত্তরে চমস্কি বলেন এটা সম্ভব হচ্ছে Transformation বা রূপান্তর বা সংবর্তনেরদ্বা। চমস্কির মতে ভাষায় Kernel Sentence বীজবাক্য থাকে। সংবর্তনের ফলে সেগুলি থেকে নতুন নতুন বাক্য সঞ্জনন করার যায়।

কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী যেমন—গ্লীসন, হকেট প্রমুখ চমস্কির মতবাদকে সরাসরি আক্রমণ করে নিজের মতবাত প্রচেষ্টার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশে-বিদেশে চমস্কির তত্ত্বের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। শুধু তাই নয় ভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে চিন্তাজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে চমস্কির দৃষ্টিভঙ্গি। চমস্কির মতবাদের এই ব্যাপক স্বীকৃতির কারণ ভাষাবিজ্ঞানে যুগগত চাহিদার সঙ্গে চমস্কির তত্ত্বের ইতিহাস নির্দিষ্ট সাদৃশ্য। ভাষাবিজ্ঞানের বিবর্তন ধারায় একটি বিশেষ সঙ্কটলগ্নে তিনি এমন একটি মতবাদ নিয়ে এলেন, যার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন যান্ত্রিক মতবাদে মানুষের সৃজনশীল চিত্ত যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, তখনই চমস্কি নিয়ে এসেছিলেন রূপান্তরমূলক, সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব। যার প্রথম কথাই হল ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তা একটা সৃজনমূলক ব্যাপার। সেটা মানুষের সৃজনী চেতনার (creative consciousness) সঙ্গে যুক্ত।

ব্লুমফিল্ড গোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যেখানে ভাষার বাহ্যগঠন অর্থাৎ দেহসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাষার ভাগবত অর্থগত দিকটি উপেক্ষা করেছেন, সেখানে চমস্কি তার বিপরীত তত্ত্বের কথা বলেছেন। তিনি ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভাষার মনোগত দিকটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। এই জন্যই চমস্কির তত্ত্বকে মনস্তত্ত্ব প্রধান তত্ত্ব (Mentalistic Theory) বলে। ভাষা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সৃজনমূলক তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি দেখেন ভাষা শুধুমাত্র যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন মানুষ যখন মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাকে বহুপ্রকারের বহু সংখ্যক বাক্য ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ সারাজীবনই তাকে অসংখ্য নতুন নতুন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে অসংখ্য নতুন বাক্য বলতে হয়। প্রশ্ন হল এত সব বাক্য কি মানুষ পৃথিবীতে জন্মাবার পরই পিতা-মাতা বা সমাজের কাছ থেকে শিখে রেখেছে? মানুষের মন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কল্পনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য আগেই সমাজের কাছ থেকে শিখে নেয় টেপ রেকর্ডারের মতো। এবং ভাষাও কোনোরকম যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। মাতৃভাষাভাষী মানুষের মন ভাষার মূল নীতিটুকু নিজের সহজবোধ ও বোধির সাহায্যে আয়ত্ত্ব করে থাকে। তারপর সেই মূল নীতিটুকু প্রয়োগ করে ভাষার সীমাবদ্ধ উপকরণকে নিজের সৃজনী ক্ষমতা দিয়ে নিত্যনতুন করে সাজিয়ে নতুন নতুন বাক্য সৃজন করে থাকে। এই বাক্য সৃজনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন বলেই চমস্কির ব্যাকরণকে সৃজনমূলক ব্যাকরণ (generative grammar) বলে। চমস্কির এই মূল তত্ত্বটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী Manfred Bierwisch। তিনি তাঁর 'Modern Linguistics' (1971) গ্রন্থে লিখেছেন—

> "The Theory centres on the following simple but essential observation. Who ever speaks a natural language does not simply carry around in his head a long list of words or sentences which he has stored, but is able to form new sentences and to understand utterances he has never heard before. The command of language is thua a productive capacity not merely the knowledge, of an extensive nomenclature ..... The theory ..... is, then, mianly concerned with accounting for how sentences are generated, and is appropriately called 'generative' grammar".

ভাষার সৃজনশীল ধর্ম চমস্কি প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করলেও এর পূর্ব সূচনা তিনি দেখেছিলেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ হুমবোল্টের মধ্যে। তিনিই প্রথম বলেছিলেন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাষা উপাদানের অধিকারী হলেও এর সাহায্যে অসংখ্য বাক্য সৃজন করতে পারে।

"Die sprahe muns von endtichen
Mitteln einen unendlichen machen".

এ প্রসঙ্গে একালের একজন বিশিষ্ট মনীষী অধ্যাপক বলেছেন—"..... that the work of year and Panini anticipated the methodologs of Descriptive Linguistics"। কিন্তু চমস্কিও বহুপূর্বেই Synchronic Descriptive Analyses বা এককালিক বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

মাতৃভাষাভাষী বক্তার মধ্যে যে সৃজনী ক্ষমতা আছে, তার দুটি দিক আছে। যথা—বাস্তব ব্যবহারের দিক ও আদর্শ সম্ভাবনার দিক। প্রথমটিকে চমস্কি বলেছেন performance এবং দ্বিতীয়টিকে বলেছেন competence। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কথাবার্তায় ভাষাকে আমরা যেভাবে প্রয়োগ করি তাতে ভাষা ব্যবহারের সমস্ত সম্ভাবনাই কাজে লাগে না। ফলে অন্তর্নিহিত সব সম্ভাব্য পরিস্থিতি বর্তমানে শেষ করা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার খানিকটা সবসময়ই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই সম্ভাবনায় ভাষার আদর্শ রূপ থাকে। ভাষায় পরিপূর্ণতায় সেই আদর্শ রূপের সবটার বাস্তব প্রকাশ ঘটে না। যেটুকু বাস্তব ঘটে, বক্তার প্রয়োগের সেই বাস্তব ব্যবহারকে বলে performance। আর ভাষার পরিপূর্ণতার যেটুকু আদর্শ (ideal) রূপে থেকে যায়, তাকে বলে সম্ভাবনা বা competence। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কিন্তু ভাষার বাস্তবরূপ (performance) বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু ভাষার আদর্শ সম্ভাবনা (competence) সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধমূলক (normative / prescriptive) যান্ত্রিক ব্যাকরণ রচনা পারেন না। তাই চমস্কি নিজেই তার 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছেন—

> "When we speak of a grammar as generating a sentence with a certain structural description, we mean simply that the grammar assigns this structural description to the sentence ..... this generative grammar does not, in itself, prescribe the character or functioning of a perceptual model or a model of speach production".

অর্থাৎ ভাষা যেমন সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ব্যাকরণও তেমনি সৃজনশীল উদ্‌ঘাটন। ব্যাকরণ হল বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, কিন্তু তা কখনওই কোনো যান্ত্রিক বিধান নয়।

ভাষার পারঙ্গমতাবোধ হল ব্যক্তির অন্তর্গত মাতৃভাষা সম্পর্কিত ধারণা। চমস্কির মতে আদর্শ বক্তা শ্রোতার ওপরই ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। এই আদর্শ বক্তা-শ্রোতা একই ভাষা সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এই আদর্শ বক্তা-শ্রোতা ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞানপ্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অপ্রয়োজনীয় শর্ত স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা, ছড়িয়ে বলা, আকর্ষণ ও মনোযোগ বদলানো ও ভুল বলাতে আক্রান্ত হবে না। তবেই তাকে প্রকৃত ভাষা ব্যবহার বলা যাবে। এ ক্ষেত্রে চমস্কি সঞ্জননী পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে আদর্শ বক্তা শ্রোতার ভাষার পারঙ্গমতাবোধ একটি ভাষার ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করবে। যদি ব্যাকরণ

নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যামূলক হয় এবং তা বক্তা-শ্রোতার ভাষা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করে, তবে তাকে সঞ্জননী ব্যাকরণ বলা যাবে। চমস্কি নিজেও বলেছেন—

> "By a generative grammar I mean simply a system of rules that is same explicit and well defined way assigns structural descriptions to sentences".

সুতরাং সঞ্জননী ব্যাকরণ হল সূত্রগত পদ্ধতি, যা বাক্য বিশ্লেষণে গঠনগত ভাবে যুক্ত থাকে। একটি ভাষার বক্তারা অবশ্যই এই সঞ্জননী ব্যাকরণে দক্ষ থাকে ও সেই ব্যাকরণ আয়ত্ব করে ধারনায় রেখে দেয়। আর সেই ধারণাই ভাষাগত জ্ঞানকে প্রকাশ করে—একেই বলে competence বা পারঙ্গমতাবোধ।

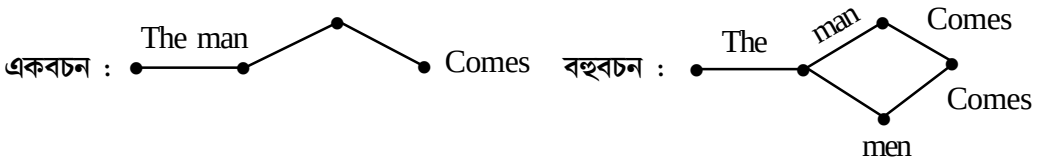
সাধারণভাবে Transformation-এর বাংলা পরিভাষা 'রূপান্তর বা পরিবর্তন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কি যে Transformation-এর কথা বলেছেন, তা ঠিক রূপান্তর বা পরিবর্তন নয়, তা সংবর্তন। 'সংবর্তন' এর অর্থ বিশেষভাবে স্থাপন বা নিষ্পাদন। অর্থাৎ Transformation হল সংবর্তনী। সংবর্তনী ব্যাকরণে চমস্কি কতগুলি প্রতীক সূত্রের সাহায্যে বাক্য বিশ্লেষণ করেন। কারণ তাঁর মূলতত্ত্ব যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি। এটাকে বোঝানোর জন্য বাক্যকে ভাঙার দরকার। গঠন সর্বস্বতাবাদী জেলিগ হ্যারিস সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্বের বিভাজন পদ্ধতির প্রতীকের সাহায্যে রূপমূল ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন। আর চমস্কির মতে সংবর্তন প্রক্রিয়ায় পরিণাম হল সঞ্জনন। তাঁর মতে প্রত্যেক ভাষায় Kernel Sentence থাকে। সংবর্তনের ফলে সেগুলি থেকে নতুন নতুন বাক্য সঞ্জনন করা যায়। পবিত্র সরকারের মতে সংবর্তন তিনটি—১। প্রশ্ন সংবর্তন, ২। নেতি সংবর্তন, ৩। প্রশ্ন সংবর্তন। এ তিনটিকে তিনি নাম দিয়েছেন ঐক্য সংবর্তন বা Singular Transformation। এরপর যৌথ সংবর্তন যা থেকে যৌগিক বা জটিল বাক্য আছে। আর চমস্কির মতে বাক্যগঠনের অন্তরালে একটি কর্মকাণ্ড আছে। তিনি সেই কর্মকাণ্ডটিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখালেন। যেমন—অঙ্গন্যাসের নিয়মাবলী—সংবর্তনের নিয়মাবলী—ধ্বনিগত পরিবর্তনের নিয়মাবলী—প্রকাশিত বাক্য। এটি আসলে বাক্যগঠনের নিয়মাবলী। যার দ্বারা একটি বীজবাক্য তৈরি হয়। এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় Constituent Structure বা Phrase Structure rules। এরই ওপরে ভিত্তি করে যে বীজবাক্যটি তৈরি হয় তার উপরে সংবর্তনের নিয়মগুলিকে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ অনুযায়ী আরোপ করে নতুন করে বাক্য তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতেও বাক্যটি পুরোপুরি প্রকাশিত হবে না। তখন তাতে তৃতীয় আর একটি ধাপ জুড়তে হয়, যাকে বলা হয় ধ্বনিগত পরিবর্তনের বা সংবর্তনের নিয়মাবলী। পরপর এই তিনধাপ নিয়মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রকাশিত বাক্যটি পূর্ণ চেহারা পায়। সর্বনিম্নে থাকে অঙ্গন্যাসের নিয়মাবলী, দ্বিতীয় ধাপে বাক্য সংবর্তনের নিয়মাবলী, তৃতীয় ধাপে ধ্বনিগত সংবর্তনের নিয়মাবলী। তারপর চতুর্থ ধাপে পাওয়া যাবে প্রকাশিত বাক্য অর্থাৎ বাক্যের পুরো চেহারা। তবে এই সব সংবর্তনের কিছু স্বাধীন বা optional এবং কিছু আবশ্যিক বা obligatory। আবশ্যিক সংবর্তন ব্যাকরণের আইন মানতে বাধ্য। আর স্বাধীন সংবর্তন বক্তার আয়ত্তাধীন হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে হ্যারিস ধ্বনিতত্ত্ব থেকে শুরু করেন। আর তাঁর শিষ্য চমস্কি প্রথমে বাক্যতত্ত্ব এবং ক্রমপর্যায়ে শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চমস্কি, গুরু হ্যারিসের পদ্ধতির বিপরীত প্রান্ত থেকে শুরু করেন। তবে বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চমস্কি প্রথমার্ধের গঠন সর্বস্বতাবাদীদের মতো কেবলমাত্র বহিরঙ্গের গঠনকে গুরুত্ব দিলেন না, পাশাপাশি বহিরঙ্গ গঠনের অন্তরে যে গভীর অর্থগত দিক রয়েছে তাকেও উপযুক্ত গুরুত্ব দিলেন। তাই তাঁর ভাষা জ্ঞান বলতে এক ভিন্নতর বোধ সহজাত হয়—

> "Knowledge of a language involves the ability to assign deep and surface structure to a infinite range of sentences to relate this structures appropriatily and to assign semantic interpretation and a phonetic interpretation to the paried deep and surface structure".

অর্থাৎ চমস্কির ভাষাবিজ্ঞান বলতে বোঝায় অসংখ্য বাক্যের ভাষার অধোগঠনে বা Deep Structure এবং অধিগঠন বা Surface Structure। ভাষার অধিগঠনটি আমাদের ধ্বনিপ্রবাহ দিয়ে গঠিত। আর অধোগঠনটির সঙ্গে রয়েছে ভাষার অর্থের যোগ।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Syntactic Structure' এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'Aspect of the theory of Syntax' গ্রন্থে চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণের বেশ কয়েকটি মডেল দিয়েছেন। যেমন—Model Finite state grammar। এখানে তিনি ব্যাকরণের সহজতম গঠনের কথা বললেন। ব্যাকরণ কোনো যন্ত্র নয়—পুনর্গঠন তত্ত্বের মাধ্যমে এটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে এগিয়ে যায়। এটি শুরু হয় সূচনা অংশ—start থেকে, আর শেষ হয় stop-এ। পুনর্গঠন তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা সূচনা থেকে একাধিক বাক্য পাই। যেমন—



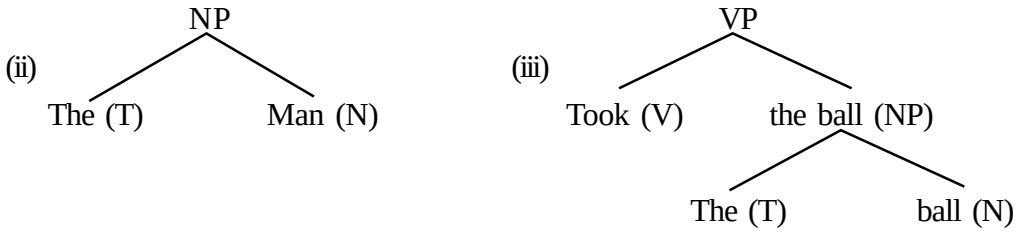
'phrase structure Grammar'-এ চমস্কি জানালেন আন্তরিক স্তরে ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ হয়। এই সূত্রকে প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে বললেন—

(1) Sentence → NP (Noun phrase) + VP (Verb phrase)

(2) NP → T (the) + N (Noun, Man, ball)

(3) VP → Verb + NP (Noun phrase)

উদাহরণ : (1) The man took the ball



Phrase Structure-এর মাধ্যমে শুধু বাক্য বিশ্লেষণের গঠনই জানতে পারা গেল না, সেই সঙ্গে বাক্যের অর্থের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক সূত্রটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। ফলত চমস্কির নতুন পদ্ধতি ভাষার অস্পষ্টতাকে মুছে দিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক একটি বাক্য—রামমোহন প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন—এই বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট। অর্থাৎ এর একাধিক অর্থ হতে পারে—

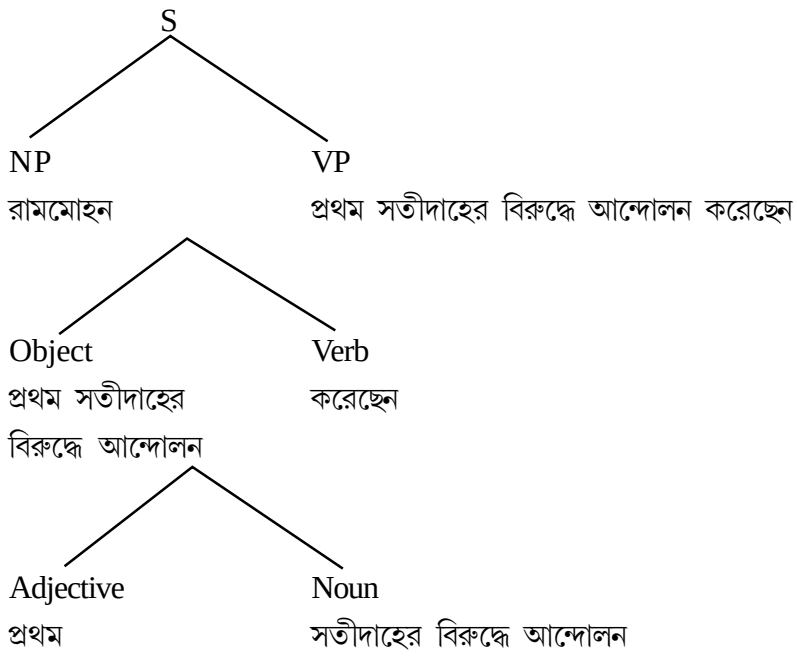
(১) সতীদাহের বিরুদ্ধে অনেকেই আন্দোলন করেছেন, প্রথম যিনি করেন, তিনি রামমোহন।

(২) সতীদাহের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আগে হয়নি, রামমোহনই প্রথম করেছেন।

বাক্যটির এই একাধিক অর্থ হবার কারণ 'প্রথম' শব্দটির সঙ্গে বাক্যের কোনো শব্দের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু চমস্কির এই নতুন সূত্র প্রতীকের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই জেনে নিতে পারি—'প্রথম'টির সঙ্গে কোন শব্দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যদি সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন এর সঙ্গে 'প্রথম'-এর সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক হয়, তবে ১নং অর্থটি পাওয়া যায়। আর যদি আন্দোলন করার সঙ্গে 'প্রথম'-এর সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক হয়, তবে ২নং অর্থটি পাওয়া যায়। এই বাক্যে 'প্রথম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। এর অভিধানিক অর্থ দিয়ে বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না। 'প্রথম' শব্দটি বিশেষণ, কি ক্রিয়ার বিশেষণ তা বোঝা যাচ্ছে না। পদ পরিচয় (part of speech) ধরা যাচ্ছে না বলে প্রচলিত ব্যাকরণ (traditional grammar) এই বাক্যের অর্থ নির্ণয় করতে ব্যর্থ। শব্দটির গঠনগত এমন কোনো চিহ্ন নেই (বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি) বা বাক্যগঠনে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যাতে এই শব্দের অর্থটি ধরা যায়। এবং বাক্যের অর্থগত শৈথিল্যকে উদ্‌ঘাটন করা যায়। এখানে গঠন সর্বস্বতাবাদীদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। এখানে উপায় হচ্ছে পূর্বোক্ত প্রকারে নির্ণয় করা যে বাক্যের অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে 'প্রথম' শব্দটির সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি বাক্যে শব্দগুলি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য আছে। আর সেটা চমস্কি একটি বাক্যের পদসমূহকে পারম্পর্যের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন। একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক কত দূরের বা কত কাছের সেটা বিশ্লেষণ করেছেন। এই রীতিতে যদি বাক্যটির অর্থের বিশ্লেষণ করা যায় তবে এর অর্থের অস্পষ্টতা বোঝা যাবে। এতে 'প্রথম' শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝা যাবে। চমস্কি পরিকল্পিত পরম্পরা বিন্যাসর (helrar chical arrangement) চিত্রে

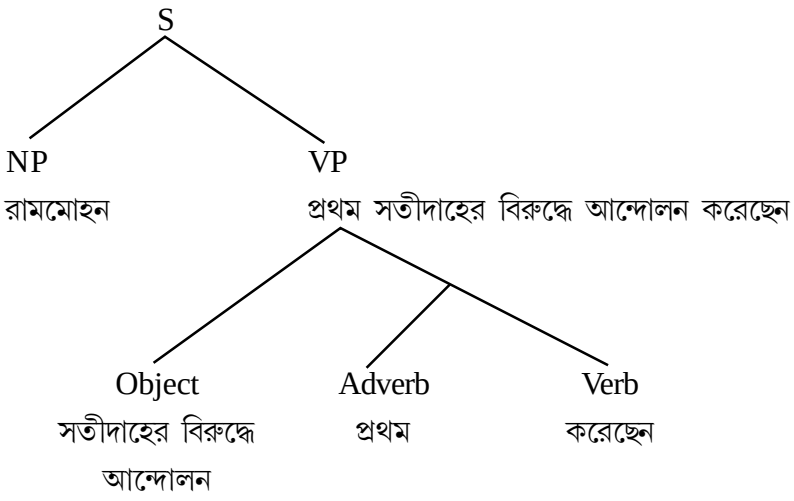
বাক্যটিকে সাজানো। এই বাক্যের (রামমোহন প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন) দুটি অর্থ এবং তার গঠনগত কারণ ধরা পড়তে পারে। যেমন—

১নং অর্থ :



(চিত্র নং ২)

২নং অর্থ :



এবারে চমস্কির ব্যাকরণের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ভাষাগত বিশ্বজনীনতা-র (Linguistic Universal) তত্ত্ব। তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের স্বনিম সংখ্যা আলাদা। স্বনিমের ক্রিয়াপদ্ধতি আলাদা। এমনকি শব্দরূপ ধাতুরূপের বিধান এবং বাক্যগঠনের রীতিও পৃথক। তবুও সব ভাষার মধ্যে এমন কিছু সাধারণ ধর্ম আছে, তেমনি ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে কিছু মূলীভূত ঐক্যও আছে। বিভিন্ন ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যে মূলীভূত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের মূল ঐক্য যে মনুষ্য প্রকৃতি তার ওপরে। জাতিতে জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক মানুষ সর্বত্র এক। তার রক্তমাংসের দেহ তার দেহযন্ত্র বাগ্‌যন্ত্র থেকে শুরু করে তার গভীর মানবিক চাহিদা এবং তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এর ফলে সব জাতির ভাষা প্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূল সর্বগত ঐক্য আছে।

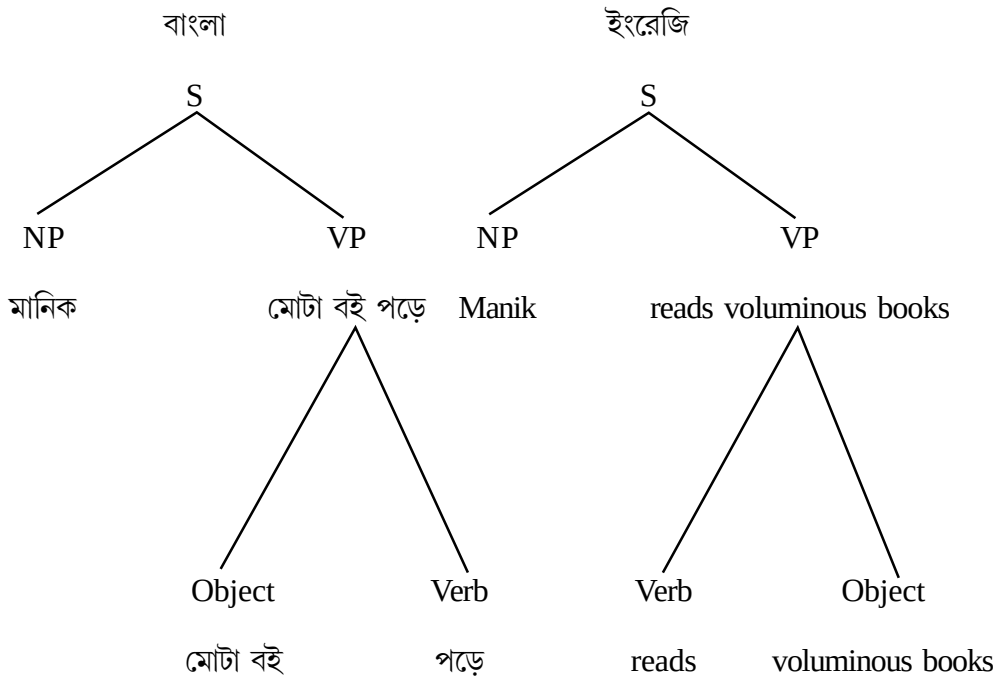
উল্লেখ্য, এই বিরাট মানবিক ঐক্যের উপরেই বিশ্বজনীনতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এর উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানে যে মূল ঐক্য থাকে, তাকে বলা হয় Substantive Universals।

একটি ভাষার বাক্যগঠনের বাহ্যরূপে অন্য ভাষার বাক্যগঠনের কিছু থাকতে পারে। কিন্তু দুই ভাষার বাক্যগঠনের গভীর স্তর (deep structure) তলিয়ে দেখলে একটা অন্তরালগামী ঐক্য ধরা পড়বে। যেমন ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা দুটি বাক্যে বিশ্লেষণ করা যাক—

বাংলা—মানিক মোটা বই পড়ে।

ইংরেজি—Manik reads voluminous books.

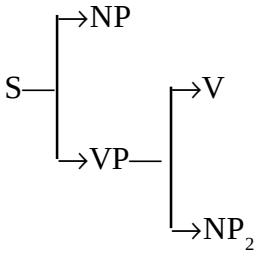
বাক্যদুটির গঠন বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—



উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে Object (মোটা বই) Verb (পড়ে) এর আগে বসেছে। আবার ইংরেজিতে Verb (reads)-ই Object (books)-এর আগে বসেছে। সুতরাং দুই ভাষার মধ্যে বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, দুই ভাষার বাক্যেই NP ও VP আছে এবং দুই ভাষার বাক্যেই Verb ও Object আছে। এই NP, VP, Verb ও Object-এর ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নতা সব ভাষাতেই থাকে। এই মূলীভূত ধারণাগুলিই হল Linguistic Universal। কিন্তু অনেক সময় ভাষার বাহ্যগঠনে সবসময় NP, VP ইত্যাদি ধরা পড়ে না। কিন্তু তার আন্তরগঠনে সেগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন 'বেরিয়ে যাও'। এ বাক্যে শুধু VP আছে। কিন্তু NP (তুমি) উহ্য আছে। Linguistic Universal-গুলি সবসময় ধরা পড়ে না। কিন্তু এগুলি হল ভাষার আন্তরগঠনের মূল সত্য। সহজ করে এটাই হল চমস্কির Linguistic Universal-এর তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে Manfred Bierwisch তাঁর 'Modern Linguistics' গ্রন্থে চমস্কির তত্ত্ব-র সমর্থন করে বলেছেন—

> "The analysis of various language types has show that the deep structures, despite differences between structural types, have essential properties in comnmon. Even without any knowledge of chinese or Mohawk one could understand the semantio structure of their sentences if one knew the meaning of their morphemes and their deep structure. This lods of the assumption that the basic syntactic categories and functions such as subject predicate, object, verb, adverb, noun etc. are substantive universals. Corresponding to the basic in ventory of phonological and semantic features there is then a set of syntactic categories from which each language makes a characteristics selection".

তবে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি যে পদ্ধতি খাড়া করেছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। যেমন চমস্কির ছাত্র রম ও লেকভ। চমস্কির মতে Deep Structure গড়ে ওঠে মানুষের বোধের মধ্যে এবং তা থেকে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের বাক্য সংবর্তন এর ফলে। কিন্তু রম ও লেকভের মতে এই নিয়মাবলী প্রধানত অর্থ নির্ভর। অর্থ বুঝতে সাহায্য করে চমস্কির ছক—

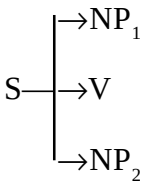


NP = Noun phrase

VP = Verb phrase

V = Verb

S = Sentence



রম ও লেবভের ছক

তবে চমস্কির তত্ত্ব বিতর্কিত হলে তিনি দেখালেন যে কতরকমের সংবর্তন হতে পারে আর বাক্যের generation বা সঞ্জনন কি কি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা Rule governed এবং নিয়মগুলি কেমনভাবে প্রযুক্ত হয়। এরপর এই Rule লেখার জন্য Notations ও উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। এরপর সংবর্তনেরও সঞ্জননের প্রক্রিয়াগুলির কথা বলেছেন। যদিও সেগুলি ইংরেজি ভাষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সবগুলি প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চমস্কির এই তত্ত্বের আলোচনা খুবই উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় এটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ।

৮.২.৫.৪: প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ভাষাতত্ত্ব চর্চা

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। ভাষার সাহায্যেই মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। ব্যক্তি সম্পর্ক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা সার্বিক সম্পর্কের মূলেই আছে ভাষা। এই ভাষার চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। অতীতে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা আর বর্তমানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভাষাচর্চা।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নবজাগরণ হয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে। ফলে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে ভাষা সম্পর্কেও সচেতনতা আসে। ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারাবাহিকতাকে ধরে রেখেছিল মূলত পাঁচটি প্রাচীন দেশ—প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন চিন, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রিস ও প্রাচীন রোম। এই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রিস ও রোম।

পৃথিবীর সবদেশেই সহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে ধর্মের চর্চার ভিতরে। ভাষাচর্চাও এই ধর্মের আশ্রয়েই জন্মলাভ করেছে। পাশ্চাত্য দেশে ভাষার আলোচনা আছে বাইবেলের Old Testament-এর First

'Book of Moses'-এ। এখানে বলা হয়েছে আদিতে একটিমাত্র মানবজাতি ছিল এবং তাদের ভাষাও ছিল একটি। কিন্তু পরবর্তীতে জনসম্পদ বৃদ্ধির ফলে এক ভাষা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে নানা ভাষার সৃষ্টি হয়। আর বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ের 'Tower of Bable'-এও ভাষাতত্ত্ব চর্চা হয়েছে। এখানে দোভাষীদের কথা বলা হয়েছে। এই সময়ের রাজারা ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এবং তাই অন্যদেশে যাবার সময় সেই দেশের ভাষা যাতে বোঝেন, সেজন্য দোভাষী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আবার প্রাচীন ইহুদিরা বিভিন্ন ব্যক্তি নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। এইসব থেকে প্রাচীন কালের ভাষাতত্ত্ব চর্চা সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকালে হেরোডেটাসের 'History' গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরের রাজা সাম্মোটিকাস পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা নির্ণয়ের জন্যে একটি পরীক্ষা করেন। আবার ফের্দিনা দা স্যোসুর উন্মেষ লগ্নকালীন ভাষাতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—ব্যাকরণচর্চার পর্ব, বাঙ্ মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বচর্চার পর্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পর্ব, যথার্থ ভাষাবিজ্ঞানের পর্ব।

গভীর ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রিসের ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে। তবে গ্রিসের ভাষাতত্ত্ব চর্চা কয়েকটি সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ। যেমন—সফিস্ট (Sophiot) সম্প্রদায়, স্টোইক (Stoic) সম্প্রদায়, আলেকজান্দ্রিয় সম্প্রদায় ইত্যাদি।

প্রাচীন গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সফিস্ট সম্প্রদায়। গ্রিস ভাষায় যারা জ্ঞানী বা পণ্ডিত তাদেরই বলা হয় সফিস্ট। এঁরা সক্রেটিসের সমসাময়িক বলে অনেকে মনে করেন। ভাষাতত্ত্ব চর্চায় এদের অবদানগুলি হল—

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় এঁরা সর্বপ্রথম শব্দের প্রয়োগ রীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া শব্দ বা ভাষায় সাদৃশ্য, রূপক প্রভৃতি অলংকার নিয়েও তারা আলোচনা করেন। বাক্যে একটি শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করে তার কারণ কী, তা নিয়েও তারা আলোচনা করেন।

ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বাক্যের (প্রশ্নবোধক, প্রার্থনা, নির্দেশক, বিবরণ) রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। এছাড়া শব্দবিশ্লেষণ, ধ্বনিবিশ্লেষণ ও শব্দের অর্থগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দে ব্যবহৃত অক্ষর বা Syllable বিন্যাস নিয়েও আলোচনা করেন।

তবে সফিস্টদের ভাষাতত্ত্ব চর্চায় সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ তাদের আলোচনা মূলত তাঁদের মধ্যেই ছিল। বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। বিশেষ করে প্রোটোগরেস, জর্জিয়াস প্রমুখের আলোচনা বিশেষ রূপ পায়নি।

গ্রিসে পঞ্চম শতাব্দীতে হেরোডোটাসের জন্ম হয়। তাঁর 'History' গ্রন্থে পৃথিবীর আদিম বা প্রথম ভাষা নির্ণয়ের জন্যে মিশরের রাজা সাম্মোটিকাস দুটি সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে যে পরীক্ষা করেন, সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এখানে দেখা যায় মানুষের কাছ থেকে ভাষা শেখার আগে একটি শিশু 'Bekos' শব্দ উচ্চারণ করে, যার অর্থ 'রুটি'। 'Bekos' শব্দটি দেখা যায় ফ্রিজিয় ভাষার। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হয়

পৃথিবীর আদি ভাষা ফ্রিজিয় ভাষা। কিন্তু এই পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক। মিশরের রাজার এই পরীক্ষা নেওয়ার গল্প হেরোডোটাসের গ্রন্থে আছে।

প্রাচীন গ্রিসের একজন সফল দার্শনিক প্লেটো। তিনি ভাষাতত্ত্বগত কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তাঁর 'Dialogues' বা 'কথোপকথন' গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বগত আলোচনা পাই। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎস ও ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনি এখানে আলোচিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে দুই দল ভাষাবিজ্ঞানী গড়ে ওঠে। সাদৃশ্যবাদী (Analogist) ও বৈসাদৃশ্যবাদী বা খেয়ালখুশিবাদী (Anomalist)। সাদৃশ্যবাদীরা বলেন শব্দের সাদৃশ্য (Analogy) আছে। আর বৈসাদৃশ্যবাদীরা বলেন বস্তুর সঙ্গে অর্থের সাদৃশ্য নেই। মানুষ খেয়ালখুশিমত বস্তুর নামকরণ করেছেন।

সাদৃশ্যবাদীরা তাদের বক্তব্যের অনুকূলে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এভাবে।

রাম = রাম্ + ঘঞ

অর্থাৎ যার সঙ্গে রমন করা যায়। আনন্দ পাওয়া যায়। যিনি শান্তির প্রতীক। রামায়ণে এই রামকেই পাওয়া যায়।

কিন্তু—রু + নিচ্ + অন্ = রাবণ।

'রাবণ' চিৎকার চেঁচামেচি এবং ধ্বংসের প্রতীক। রামায়ণে এই রাবণই পাওয়া যায়।

খেয়ালখুশিবাদীদের মতে এমনতর সাদৃশ্য সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন একই অর্থবোধক শব্দ নানা ভাষায় নানা নামে পরিচিত হতে পারে। যেমন—

জল—সংস্কৃত / বাংলা

ওয়াটার—ইংরেজি

পানি—হিন্দি

অ্যাকোয়া—ফরাসি

হ্রদর—গ্রিক

আব—কাশ্মীরি

এদের ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে নামের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্লেটোর রচিত গ্রন্থটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা। গ্রন্থটি কতটা প্লেটোর লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়—ক্রাতুলোস ও সফিস্ট। ক্রাতুলোস অধ্যায়ে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভাষায় যে সব ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য নানা ধ্বনি বা নামশব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলির সঙ্গে ওই ভাষার ভাব বা বস্তুর কোনো অপরিহার্য

সম্পর্ক আছে কিনা, তা আলোচিত হয়েছে। আর 'সফিস্ট' অধ্যায়ে প্লেটো ভাষা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে তিনি মানুষের চিন্তাশক্তির (dionomia) সঙ্গে ভাষার অপরিহার্য সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—মানুষ যে কথা বলে তার দুটি রূপ। যখন মানুষ মনে মনে বলে বা নিজে নিজেই কথা বলে তখন সেটি হয় চিন্তা বা Thought আর যখন মুখপথে উচ্চারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে বলে ভাষা বা Logos।

এছাড়া প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বগত যেসব তথ্য আছে সেগুলি হল—ভাষার বহিরঙ্গ গঠন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ও গ্রীক ধ্বনিগুলির নানা শ্রেণিবিভাগ। ভাষার মূল সমস্যার উদ্‌ঘাটন ও উদ্দেশ্য। বিধেয় এবং ব্যুৎপত্তি বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। তবে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্লেটোর বিপরীত। প্লেটো ভাববাদী, কিন্তু অ্যারিস্টটল যুক্তিবাদী বিশ্লেষণাত্মক মনোভাবাপন্ন বস্তুবাদী ভাষাবিজ্ঞানী। বহুশাস্ত্রবিদ এই ভাষাবিজ্ঞানী বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর চিকিৎসক পিতার কাছ থেকে।

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে নানা বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত 'পেরিপোইএডিকেস' বা 'Poetics' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে তিনি ভাষা বিষয়ক বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। Letter বা বর্ণ বলতে বুঝিয়েছেন ভাষার মূল ক্ষুদ্রতম উপাদানকে। এই বর্ণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা স্বরবর্ণ (Vowel), অর্ধ:স্বর (Semi-vowel) ও ব্যঞ্জন (Mute)। বর্ণের চেয়ে বৃহত্তম একক হল অক্ষর বা Syllable। তার থেকে বৃহত্তম একক শব্দ বা পদ। এর মধ্যে ফেলেছেন noun, verb, case ও speech-কে। ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগরীতির মূলতত্ত্ব তিনি আলোচনা করেছেন। ভাষার প্রয়োগরীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "..... the Diction becomes diation guished and nonprosaic by the use of unfamiliar terms, i.e., stange words, metaphars, lenghtened fors, and everything that deriates the ordinary modes of speech".

আসলে ভাষার প্রয়োগরীতি সম্পর্কিত এই তত্ত্বে তিনি ভাষার শৈলী বা style-এর কথা বলতে চেয়েছেন। শব্দের স্বরাঘাত নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। কারক বিভক্তি সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এবং পদ বিভাজন, সেখানে তিনি noun-এর সঙ্গে verb-এর পার্থক্য নির্ণয় করেন।

অ্যারিস্টটলের পরে প্রাচীন গ্রিসের ভাষা বিভাজন চর্চায় যে লেখকগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্টোয়িক গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ। এঁরা ভাষার চর্চা করেছিলেন দার্শনিক ও কাব্যিক দিক থেকে। এঁরাই সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্বকে স্বতন্ত্রবিদ্যার মর্যাদা দেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা হলেন জিনো। তিনি খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হন। জিনোর নেতৃত্বেই ভাষা স্বতন্ত্রবিদ্যার মর্যাদা লাভ করে। এই গোষ্ঠী ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র আলোচনা করেন। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ নিয়ে

আলোচনা করেন। ভাষার ধন্যাত্মক উদ্ভব তত্ত্ব প্রয়োগগত পরিভাষা, পদ পরিবর্তনের ধারণা, কারক সম্পর্কে আলোচনা ও ভাষার অন্তরঙ্গ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রাচীন গ্রিসের ভাষাতত্ত্বচর্চার ধারাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন এই আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী। এই সম্প্রদায়ের ভাষাচর্চাকারীদের মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর মানুষ দিত্তনুসিত্তস থ্রাকস্। প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর ব্যাকরণ 'তেকনে গ্রামাতিকে' উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর ব্যবহৃত এই 'গ্রামাতিকে' শব্দ থেকেই পরে গ্রামার (Grammar) শব্দের উৎপত্তি ঘটে। তবে বাক্যতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে 'Syntaxis' শব্দটা ব্যবহার করলেও বাক্যতত্ত্ব বা Syntax সম্পর্কে আলোচনা করেননি।

থ্রাক্সের বই থেকে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হল, ব্যাকরণ সম্পর্কে ভাষার প্রায়োগিক জ্ঞান ও বর্ণ বিষয়ে আলোচনা। তিনি আলফা, বিটা, গামা, মেগা ইত্যাদি ২৪টি বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেন। অক্ষর নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁর মতে অক্ষর তিন প্রকার। যথা স্বরবর্ণ দিয়ে গঠিত অক্ষর, ব্যঞ্জন ও স্বর নিয়ে গঠিত অক্ষর এবং স্বরের অর্ধেক নিয়ে গঠিত অক্ষর। পদ বিভাজন নিয়ে আলোচনাও এতে আছে। আট প্রকার পদ noun, pronoun, verb, adverb, perticipale, preposition, conjunction, article ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে। থ্রাক্সের বইয়ে বিশেষ্য বলতে ব্যক্তির নাম বোঝানো হয়েছে। বচনের আলোচনা এতে আছে। কারককে ছ-টি ভাগে ভাগ করে এখানে আলোচিত হয়েছে। যথা কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্বন্ধ পদ, সম্বোধন ইত্যাদি। সর্বমান পদকে বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটলের আলোচনায় যে ঘাটতি ছিল তার অনেকটাই থ্রাক্স পূরণ করেন। তাছাড়া ব্যাকরণের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তিনিই প্রথম রচনা করেন।

দুস্কোলোস্ খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তীদের ব্যাকরণচর্চাকে আরও উন্নীত করেন। থ্রাক্স কেবলমাত্র বাক্যতত্ত্ব বা Syntaxis-এর কথা বলেন। কিন্তু তিনি প্রথম Syntax সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। জানা যায় তিনি ব্যাকরণ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

আপেলোনিওসের পুত্র হেরোদিয়ানুস। তিনি গ্রীক ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্‌ঘাটন করেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে যাকে অবিভাজ্য স্বনিম বলে তার বিশেষ একটি দিক স্বরাঘাত এবং ধ্বনির ছন্দোগত গুণ সম্পর্কে অসাধারণ আলোচনা করেন। গ্রীক ভাষার স্বরাঘাতবিধি এবং বিরাম বিধি নিয়ে আলোচনাও তিনি করেছেন।

কিন্তু গ্রীকদের ভাষাতত্ত্ব চর্চায় সীমাবদ্ধতাও ছিল। কেননা, মূলত দার্শনিক দৃষ্টিতে কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব ভাষারই আলোচনা করেছেন। কাব্যিক এবং দার্শনিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করলেও মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেননি। আধুনিক কালের মতো তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। ছিল দার্শনিক ও কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া তাঁরা বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি এবং কোন্ পদ্ধতি সঠিক সে সম্পর্কেও যথার্থ ধারণা তাঁর ছিল না।

গ্রীকদের এই ব্যাকরণচর্চার মূল কাঠামো অনুসরণ করেন লাতিন (Latin) ভাষার ব্যাকরণবিদ্‌রা। তাঁদের মাধ্যমে এই কাঠামো দীর্ঘকাল পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণচর্চায় রসদ হিসেবে অনুসৃত হয়।

প্রাচীন গ্রিসের ভাষাচর্চা চরম পর্যায়ে উঠলেও যুদ্ধবাজ রোমদের দ্বারা গ্রিস পরাজিত ও বিপর্যস্ত হলে রোমের ভাষাচর্চার সুযোগ আসে গ্রীক পণ্ডিতদের সাহচর্যে। রোমনরা ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন। দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা মত্ত ছিল। হিব্রু ভাষাকে তারা শ্রেষ্ঠ ভাষা মনে করত। অবশ্য পরবর্তীতে তারা লাতিন ভাষাকে শিল্প সাহিত্যের ধারক বলে মনে করে। সমৃদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ গ্রীক জীবনদর্শনের সংস্পর্শে এসে রোমানরা এত বেশি প্রভাবিত হয় যে সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা গ্রীকদের পথই অনুসরণ করে। ভাষাজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও ব্যাকরণ রচনায় গ্রীক মনীষীদের কাঠামো অনুসৃত হয়।

শোনা যায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এক বিশিষ্ট গ্রীক ভাষাতাত্ত্বিক বৈয়াকরণ ক্রাতেস (Krates) রোমে ভ্রমণে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেকারণে দীর্ঘকাল রোমে থেকে যান। এই সময় তিনি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। তাতে রোমানরা গ্রীক ভাষাদর্শনের মান সম্পর্কে অবহিত হন এবং গ্রীক ব্যাকরণের আদর্শে লাতিন ব্যাকরণ রচিত হয়।

লাতিন ভাষায় প্রথম ব্যাকরণচর্চা করেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ব্যাকরণবিদ ভারো। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা' (De Lingua Latina) লাতিন ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে গ্রীকদের বিতর্কের মতোই। অর্থযুক্ত শব্দ বিভক্তি, প্রত্যয় সম্পর্কিত আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

কুইন্তিলিয়ানুস খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের ভাষাচর্চাকারী। তাঁর লেখা গ্রন্থে গ্রীক প্রভাব বর্তমান। গ্রন্থের নাম 'ইন্সতিতুতিও ওরাতোরিও' (Instutio Oratoria)। এখানে বক্তৃতা বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে মৌলিকতা বিশেষ নেই।

দোনাতুসই প্রথম মৌলিক লাতিন ব্যাকরণ রচনা করেন খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে। গ্রন্থটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। তার প্রতিটি অক্ষর রোমবাসীরা কাঠে খোদাই করে রেখেছিল।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রিস্কিয়ানুস ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনির ব্যাকরণ যেমন প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, তেমনি প্রিস্কিয়ানুসের আদর্শ লাতিন ব্যাকরণ ছিল ক্লাসিক্যাল লাতিনের শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণ। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'ইন্সতিতুতিওনেস গ্রামাতিকাএ'। গ্রন্থটিতে গ্রীক অনুসরণে লেখা ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল। এখানে ১৮টি পর্ব আছে। পর্বগুলিতে ভাষার শব্দ ও বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রিস্কিয়ানুস এই গ্রন্থে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদি তিন দিকেরই আলোচনা করেছেন। তিনি গ্রীক ব্যাকরণবিদ্ থ্রাক্সকে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাক্যতত্ত্ব বিষয়ে থ্রাক্সকে অতিক্রম করে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

রূপতত্ত্ব বিষয়ে থ্রাক্সের ব্যাকরণে যে কিছু কিছু ঘাটতি ছিল প্রিস্কিয়ানুস তা পূরণ করে দিয়েছেন। প্রিস্কিয়ানুস আট প্রকার পদের কথা বলেছেন। যথা—noun, pronoun, verb, participle, adverb, preposition, interjection ও conjunction। পদের ক্ষেত্রে থ্রাক্স Interjection-এর কথা বলেননি প্রথম বললেন প্রিস্কিয়ানুস। আর থ্রাক্স article-কে পদ হিসেবে ধরলেও প্রিস্কিয়ানুস বাদ দিয়েছেন। এভাবেই প্রিস্কিয়ানুস তাঁর ব্যাকরণে পূর্ণতা এনেছেন। যার প্রভাব রোম ছাড়িয়ে সমগ্র পাশ্চাত্য ভাষায় এমনকি আধুনিক বহু ভাষার ব্যাকরণকে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আভিজাত্যের পরিচয় ছিল ক্লাসিক্যাল ল্যাটিনের চর্চা করা। আর এই চর্চার মূল সহায়ক ছিল প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণ। পরবর্তীকালের ব্যাকরণবিদ্ যারা ল্যাটিন ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেছেন, তাঁরা কখনওই প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের প্রভাব কাটাতে পারেননি। প্রিস্কিয়ানুস ব্যাকরণের সংজ্ঞায় বলেছেন—কোনো ভাষাকে সঠিকভাবে বা বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করার জন্যে সূত্র ও তত্ত্ব দ্বারা গঠিত গ্রন্থ হল ব্যাকরণ। ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের পার্থক্য বিষয়ে তিনি বলেছেন ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ। ধ্বনি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে তার শ্রেণিবিভাগ করে বলেছেন ধ্বনি হচ্ছে চার রকম—প্রথম শ্রেণির ধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুলির অর্থগত সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিতীয় শ্রেণির ধ্বনির অর্থের জন্য উচ্চারিত নয়। তৃতীয় শ্রেণির ধ্বনি শুধু লেখার প্রয়োজনে ব্যবহৃত। চতুর্থ শ্রেণির ধ্বনি কোনো লিখিত রূপ নেই। এছাড়া অক্ষর সম্পর্কে বলেছেন অক্ষর হল নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত একক স্বরাঘাত যুক্ত এবং একে লিখিতরূপে ব্যবহার করা সম্ভব। গ্রীক বৈয়াকরণ অ্যারিস্টটল বা থ্রাক্সের মতো তিনিও পদক্রম নির্ণয় করেছেন বাংলা বাক্যের। তবে শুধু পদক্রম নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হননি তিনি একাধিক পদ নিয়েও আলোচনা করেছেন। ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াল কাল নিয়েও আলোচনা করেছেন। বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর সমস্ত তত্ত্বই সমীক্ষা অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আলোচনা ক্ষেত্রে তিনি রূপগত অভিধা প্রয়োগ করেন। তবে বাক্যতত্ত্ব বিচারে তিনি অর্থের উল্লেখ করলেও অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।

প্রিস্কিয়ানুসের পথই অনুসরণ করে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে আয়েলফ্রিক ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ‘কোলোকুইয়াম’ নামের একটি গ্রন্থ লেখেন। প্রিস্কিয়ানুসের ভাবধারা কাটিয়ে ওঠা আয়েলফ্রিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি তা চেষ্টাও করেননি। তবে সবচেয়ে উল্লেখ্য তিনিই প্রথম চলিত ভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে চলিত লাতিন ভাষায় কথোপকথন শিক্ষা বিষয়ক ব্যবহারিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রীক ব্যাকরণবিদ্ অ্যারিস্টটল তাঁর ‘De-Interpretion’ গ্রন্থে যে চলিত রীতিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তা তিনি অস্বীকার করেননি। বরং তা স্বীকার করে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। প্রিস্কিয়ানুসের এই নির্দেশমূলক ব্যাকরণটিতে ‘দিওনুসিত্তস থ্রাক্সের’ নির্ধারিত ভাষার উপাদানগুলিকেই আরও শৃঙ্খলতি ও উন্নততর হয়েছে। যেমন—

গ্রিস	পরবর্তী রূপ	রোম
দিওনিসিত্তস	→ →	প্রিস্কিয়ানুস
১. Noun		১. Noun
২. Pronoun		২. Pronoun
৩. Verb		৩. Verb
৪. Adverb		৪. Adverb
৫. Participle		৫. Participle
৬. Article		৬. Preposition
৭. Preposition		৭. Conjunction
৮. Conjunction		৮. Interjunction

মোটামুটিভাবে 'ইন্সতিতুতিওনেস গ্রামাতিকাএ' গ্রন্থে প্রিস্কিয়ানুস ভাষার ব্যবহৃত শব্দের উপাদানের যেগুলি বলেছেন, সেগুলিই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মূল কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে নয়, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের অবদান কম নয়।

প্রিস্কিয়ানুসের লাতিন ব্যাকরণ রোমান ভাষাতত্ত্ব চর্চায় এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই প্রথম আয়েলফ্রিকের 'কোলোকুইয়াম' (Colloquiam) কে আমরা নতুন রূপে পাচ্ছি। প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণকে সামনে রেখে তিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করলেও একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার সন্ধান দেন। তিনি প্রথম বইয়ের ভাষাকে ত্যাগ করে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই ভাষাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভিলে দ্য আলেকজাণ্ডার 'দক্তিনেল' নামের একটি ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ পদ্যবন্ধে রচনা করেন। তবে বিশেষ মৌলিকতা দেখাতে পারেননি।

সুতরাং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল রোমান ভাষাতত্ত্ব চর্চর সূত্রপাত, তার অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতির ধাপ। গ্রীক বৈয়াকরণ 'ক্রাতেস'-এর অনুপ্রেরণায় রোমে যে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় জোয়ার এসেছিল, তাই একটু একটু করে পরিণতিতে পৌঁছেছে। এবং পরবর্তীতে কন্সট্যান্টিনোপোল অধিকারের পর এই ভাষাতত্ত্ব চর্চা উন্নতির শিখরে উঠে যায় এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় উন্নীত হয়।

৮.২.৫.৫: শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান

ইংরেজি Stylistics শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ শৈলীবিজ্ঞান। তবে বাংলা ভাষায় অনেকদিন আগে থেকেই শৈলী অর্থে রচনারীতিকে বোঝাচ্ছে। ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ 'স্টিলোস'। এই 'স্টিলোস' থেকে এসেছে 'স্টাইল'। এই 'Style' শব্দটারই অর্থ শৈলী। উল্লেখ্য 'Style' কথাটির অর্থ একাধিক। কারও মতে 'রীতি' আবার কারও মতে 'শৈলী'। তবে বর্তমান রীতির চেয়ে 'শৈলী'-র অবদানই বেশি। 'Style' সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক ব্রুফোঁর বিখ্যাত উক্তি—

'Le Style c'est I' homme meme

(Style is the man himself)

অর্থাৎ 'শৈলী' হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। দার্শনিক প্লুস্ত-এর মতকে মেনে অনেকেই বলেছেন—শিল্পীর কাছে রঙের যে ভূমিকা, কবি সাহিত্যিকদের কাছে 'শৈলী'-র সেই একই ভূমিকা। অর্থাৎ 'শৈলী' হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অচেতনভাবে নিয়োজিত সেইসব ভাষাগত উপায়, যার দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন।

'শৈলী' বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুটি স্থানিক বিভাগ সেখানে আছে। ভারতীয় রীতিবাদ ও পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারা। ভারতীয় রীতিবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দণ্ডী, রুদ্রট, ভামহ, বামন, রাজশেখর, ক্ষেমেন্দ্র, কুন্তক প্রমুখ। ভারতীয় রীতিবাদের মূল কথা 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অর্থাৎ রীতিই কাব্যের আত্মা। বিশেষত গুণাত্মক রীতি বা শৈলীকেই বামন কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। বামনের মতে বিশিষ্ট পদ রচনাই রীতি। এক্ষেত্রে তিনি তিনটি রীতির কথা বলেছেন। যথা—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। আর 'সাহিত্য দপর্ণ-এ বিশ্বনাথ বলেছেন—'রীতিয়ঃ অবয়ব সংস্থান বিশেষবৎ'। অর্থাৎ তিনি রীতিকে দেখেছেন কাব্যের বিশিষ্ট অবয়ব সংস্থানের বিষয় হিসেবে।

প্রাচীন ভারতের কাব্যতত্ত্বের মতো, ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বেও 'শৈলী' সম্পর্কিত অনেক ধারণা আছে। পাশ্চাত্যে যে সমালোচনার ধারা 'শৈলী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার সূত্রপাত দেখা গেছে মনীষী প্লেটোর রচনায়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল 'স্টাইল'-কে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে 'স্টাইল' হল একটি মৌলিক গুণ, যার ওপর সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে। আর অ্যারিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্বের কয়েকটি অধ্যায়ে শৈলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'রেটরিক' অধ্যায়ে বাগ্মিতা শৈলীর প্রথম সিদ্ধান্তগুলি দেখা যায়। অ্যারিস্টটল সম্প্রদায়ের মতে শৈলী হল কোনো রচনার বাহ্যিক বস্তুগত উপাদান। অনেকেই তত্ত্বের সাহায্যে হোমারীয় স্টাইল, মধ্যযুগীয় স্টাইল, ফরাসি স্টাইল ইত্যাদির প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। এরপর ইংল্যান্ডের জোনাথান সুইফট্, ওয়াল্টার পেটার এবং বেনিসেন গ্রে শৈলী বা 'স্টাইল' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকালের মতো আধুনিক ইউরোপেও স্টাইল সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। শোপেন হাওয়ার স্টাইলকে বলেছেন 'Physiogromy of the mind'। নিউম্যান বলেছেন 'Style is a thinking out into

language'। আবার ওয়ালটার পেটারের মতে স্টাইল হল ".... the finner accommodation of speech to that vision withing"। কিন্তু সবার মতবাদকে ছাপিয়ে গেছে দার্শনিক ব্রুফোঁর মত—'Style is the man himself'. তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের 'শৈলী' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 'শৈলী' হল লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের নিজস্ব রীতি যা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব।

আকর্ষণীয় শৈলীর প্রাণবিন্দু প্রাঞ্জলতা, সাধারণত কবিতায় বা গদ্যে লেখক সবসময় ভেবে চিন্তে রীতির বিভিন্ন উপাদানগুলি নির্বাচন করেন, তা নয়। অনেক সময় নির্বাচন ব্যাপারটা আসে 'After thought' হিসেবে। যেমন—কিটস্ কবিতা লিখতে গিয়ে 'blue' এর চেয়ে 'আরও নীল' কোনো শব্দের খোঁজ করছেন। অথবা রবীন্দ্রনাথ 'গগনে' শব্দটা কেটে গিয়ে 'অম্বরে' বসাচ্ছেন। কিটসের 'আরও নীল' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'অম্বরে' নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই সচেতন। যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে 'After thought'। লেখক ঠিক কোন্ শব্দটি বসাবেন, কোন্ ধরনের বাগ্ভঙ্গি ব্যবহার করবেন, কীভাবে অনুচ্ছেদ সাজাবেন, কীভাবে রচনার পরম্পরা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেগুলি নানা উপলক্ষ্য বা Context-এর ওপর নির্ভরশীল। এই যে রচনাগত ভিন্নতা বা 'শৈলী' সেই সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনাকে বলা হয় 'শৈলীবিজ্ঞান' বা 'Stylistics'।

সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান'-কে নানাদিক থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। জিওফ্রে এন.লিচ তাঁর 'A Linguistic Guide to British poetry' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানকে বলেছেন সাহিত্যের শৈলী বিষয়ক আলোচনা। বিশেষভাবে সাহিত্যের ভাষা বিষয়ক ব্যবহারের অনুশীলন। 'Theory of Literature' গ্রন্থে রেনে ওয়েলাস বলেছেন যে স্টাইলিসটিক্স হচ্ছে সাহিত্যের ভাষার আলোচনা। এছাড়া অনেক সমালোচকই স্বীকার করেছেন, শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য সাহিত্যের ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন। এই প্রসঙ্গে G.W. Turner বক্তব্য—

> "..... Stylistics is that part of Linguistics which concentrates on variation in the use of language. Often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses of language in literature. .... Stylistics means the study of style, with a suggestion, from the form of the word, of a scientific or at least a methodical study".

জিনজান্ফ, জিরমুনস্কি, আইসেনরাউম আববাকুম, রোমান ইয়াকব্সন্ এবং ভিনোগ্রাদফের চিন্তায় শৈলীবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ লক্ষ করা গেছে। ভিনোগ্রাদফ শৈলীবিজ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যথা—ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর শৈলীবিজ্ঞান, বাচনভঙ্গি শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞান। ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস এবং ভলদিমির পপ সাহিত্যিক গঠনবাদী শৈলীবিজ্ঞানীদের কথা বলেছেন।

বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক 'শৈলীবিজ্ঞান'-কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা থেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান' এর একটা সাধারণ ধর্ম অনুভব করা যায়। সেটা হল, শৈলীবিজ্ঞান মূলত সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলন। এবং তার ভিতর দিয়েই সাহিত্যের শৈলীপ্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে, শৈলীবিজ্ঞান কিন্তু নিছক ভাষাবিশ্লেষণের ব্যাপার নয়—তারও একটা নন্দনতাত্ত্বিক দিক আছে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই 'শৈলী' সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও ইউরোপে নানা ধরনের চিন্তা-চেতনার পরিচয় মিললেও 'শৈলীবিজ্ঞান' এর ধারণা একান্ত ভাবেই ইউরোপের। শৈলীর বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শৈলীবিজ্ঞানের জন্ম। মূলত ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করে সাহিত্যের শৈলীকে নতুন পথে যাচাই করার প্রবণতা দেখা দিতেই জন্ম হল শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞানের। স্টাইল থেকে স্টাইলিস্‌টিক্‌সের। শৈলীবিজ্ঞান ভাষাচর্চার পথ ধরে শৈলীর চর্চা করা হয়। এর মূল কথাই হল সাহিত্যকর্মের ভাষাবৈচিত্র্য খুঁজে বার করা। এটি শব্দের সজ্জা বা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে। G.W. Turner বলেছেন—"The Study of style, stylistics must like other branches of linguistics, generalize".

সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে যে শিল্প সৌন্দর্য লাভ করে, সেই সৌন্দর্যবিচারকেও বুঝতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান।

বিংশ শতকে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছিল। কারণ সকল সমালোচক ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী। এরপর সাহিত্যকেন্দ্রিক আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছে। ফরাসিদের আলোচনা ইংরেজ ও মার্কিন সমালোচকদের তুলনায় গভীর হয়েছে। সে সময় শৈলীবিজ্ঞানের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিষয়গুলি হল—বাক্‌প্রতিমা, রূপক, প্রতীক প্রত্নপ্রতিমা ইত্যাদি। আর চমস্কির 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব' আবিষ্কারের পর ভাষাগত দিক দিয়ে শৈলীবিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। মূলত দুটি বিষয় এখানে প্রাধান্য পেল 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব' ও 'বাক্য ও শব্দের অর্থ'।

শৈলীবিজ্ঞানের আদিস্তরে শৈলীবিজ্ঞান ছিল অলঙ্কার শাস্ত্রের অঙ্গীভূত আর ইউরোপে তা ছিল 'রেটরিখ' বা বাগ্মিতা চর্চার অঙ্গ। কিন্তু ক্রমে তা Rheme (মন্তব্য) এবং Theme (বিষয়)-এই যুগল চিন্তার ক্ষেত্র হল।

সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে গদ্য ও পদ্য দু-জাতীয় রচনারই বিশ্লেষণ করা হয়। একে বলা হয় শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালী তত্ত্ব। গ্রাহাম হগ, স্টিফেন উপম্যান, রেনে ওয়েলস, চমস্কি প্রমুখ সমালোচক শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালীতত্ত্বের কথা বলেছেন। কেউ শব্দার্থতত্ত্ব, কেউ বাক্যগঠন, কেউ শব্দগঠন, কেউ বা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ থেকে শৈলীবিজ্ঞানের একটা প্রণালীতত্ত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন—বাক্যনির্মিতি, শব্দনির্মিতি, বাক্যবিন্যাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে ১৫২ সংখ্যক পত্র লিখেছেন—

> "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে, ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে প্রদক্ষিণ করে আসছে।"

অনুভূতিতে এই ভাষার ঐশ্বর্য সুদূরপ্রসারী। প্রতিটি শব্দ বেদনাময় সঙ্গীতের সুরে গঠিত। নীল, আকাশ, ধূসর, সঙ্গীহীন, ম্লাননেত্র, মৌনমুখ, সোনার চেলি ইত্যাদি শব্দ সুরসঙ্গতিতে সমৃদ্ধ। শব্দসজ্জায় বিশেষণ নির্বাচনেও শিল্পী সার্থক। 'কোমল গান্ধার'-এর বিষাদময় ব্যঞ্জনার নিবিড়তা সৃষ্টিতে একাকিনী, ম্লাননেত্র, অসীম সন্ধ্যা শব্দগুলোর ব্যবহার অসাধারণ। তাছাড়া একটি কমা, একটি সেমিকোলন আর একটি পূর্ণচ্ছেদও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছে। শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্বে এই ভাষা বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার মাধ্যমে এখানে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। শৈলীবিজ্ঞানে কোনো লেখক বা যুগের শৈলী খুঁজতে হলে সেই লেখক বা সেই যুগের নিজস্ব রচনা লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে হয়। সেগুলি ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, রচনার শুরু ও শেষ ইত্যাদি। আমরা জানি, ভাষার বিভিন্ন উপকরণ আছে। যেমন—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। তাদের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্য প্রচলিত ব্যাকরণে কিছু নিয়মনীতি আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ভাষা ব্যবহারকারী সব সময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক নিয়মনীতি মেনে চলে না। প্রচলিত নিয়মনীতি থেকে এই যে সরে আসা, এটা অনেক সময় বিশেষ ভাব প্রকাশে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং অপরিহার্য হয়। বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে আমরা ব্যাকরণের এই নিয়ম লঙ্ঘনকে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। একেই বলা হয় ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য। এর দ্বারাই লেখক বা যুগের শৈলী ধরা পড়ে। এবারে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য নিয়ে পৃথক আলোচনা করলে দেখা যাবে—শৈলীবিজ্ঞানে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। কোনো শব্দের ধ্বনিগত, রূপগত ও অর্থগত দিকগুলিই শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধ্বনিগত আলোচনায় ধ্বনির অনুকারক শব্দ ও ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ নিয়েও আলোচনা করা হয়। বাংলা ভাষাতে এই ধন্যাত্মক শব্দ অনেক আছে। যেমন অনুকার শব্দ হল—

১। বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর (ছেলেভোলানো ছড়া)

২। শনশন বনবীথিকা (বর্ষামঙ্গল)

আর অনুকারক নয় এমন শব্দ—

১। টনটন করে বুকের ভিতরটা (শেষ সপ্তক)

২। চারিদিকে তীক্ষ্ণ আলো মকমক করে (নবজাতক)

উল্লেখ্য প্রথম শ্রেণির ধ্বনিগুলোর আবেদন পাঠকের শ্রুতির কাছে। এটি পাঠকের মনে 'গতিশীল বাক্ প্রতিমা' সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয়টির আবেদন মানুষের মনোলোকে। পাঠকের মনে এটি 'স্থিতিশীল বাক্প্রতিমা' সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যে সাধারণত এগুলি সংকেতের কাজ করে। আর বিষয়ভেদে এই সংকেতের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই হল ধ্বনির শৈলীচর্চা।

ভারতীয় সনাতন ভাবনায় শব্দমাত্রই ব্রহ্ম। এই শব্দগুলো নতুন নতুন ইশারা, কৌশল, নতুন ভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের রাজ্যে নতুন নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই শব্দ রচনার মধ্যে দুই ধরনের শৈলী গড়ে উঠেছে। যথা—স্বাভাবিক বাগ্ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রচলিত রূপকায়িত প্রসারিত শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে অস্বাভাবিক শৈলী এবং প্রচলিত ও যথার্থ শব্দের দ্বারা গঠিত হয় স্বচ্ছতম শৈলী। শৈলীবিজ্ঞানে শব্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে শব্দের অভিধানিক অর্থ অপেক্ষা প্রসঙ্গাধীন অর্থই বেশি গুরুত্ব পায়। ব্যাকরণের নিয়মকানুন সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'-র উদাহরণ দিলে দেখা যাবে—

"ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে উপরের ছড়াটির অংশবিশেষ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ। এখানে পুংলিঙ্গবাচক 'ভাই' শব্দটির আগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষণ 'গুণবতী' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'ভাই'-এর প্রতি দিদির স্নেহমমতার ভাব 'গুণবতী'-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই যে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম, একে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। বরঞ্চ ওই বিশেষ ভাবটি প্রকাশের পক্ষে এই প্রত্যয়টি অপরিহার্য। এই 'অপরিহার্য ব্যতিক্রম' হল শৈলীর মূল পরিচয়। সুতরাং বোঝা গেল প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকা যেখানে শেষ, শৈলীবিজ্ঞানের এলাকা সেখান থেকে শুরু। এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা, যাকে সাহিত্যিক শৈলী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—Idiosyncrasy.

প্রত্যেকটি শব্দের যেমন আভিধানিক অর্থ আছে, তেমনি বাক্যের অন্তর্গত গঠন সাপেক্ষ অর্থ আছে। কিন্তু বাক্যগুলো যখন বিভিন্ন বাক্যে পরিবেশিত হয়, তখন বাক্যের রূপসজ্জা অনুসারে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। যেমন—'বালিকারা কুকুরটি ভালোবাসিত'। আবার 'কুকুরটি বালিকাদের ভালোবাসিত'। আবার অনেক সময় দেখা যায় কবি বা সাহিত্যিকদের সমগ্র রচনায় অনেক সময় একটি শব্দ বহুবার আবর্তিত হয়। ফলে শব্দমধ্যে আভিধানিক অর্থের সীমা ছেড়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। যেমন—জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কোনো শব্দকে বারবার ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ—'শিশির'।

১। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা নামে। (বনলতা সেন)

২। হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু শিশিরের জল, (পেঁচা)

৩। চোখের উপরে নীল মৃত্যু উজাগর বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের—ঘ্রাণ। (রূপসী বাংলা)

এখানে দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ 'শিশির' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। কবির শৈলীসত্তার গুণে শব্দটি অভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অনবদ্য চিররূপময়ী দ্যোতনা প্রকাশ করেছে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেক শব্দ তাদের সামান্য অর্থের সীমাতিশায়ী হয়ে বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন—শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—

"শালবনের মধ্যে সুঁড়িপথ

লুটিয়ে চলেছে কাপড়ের মতো।"

সুতরাং 'শৈলীবিজ্ঞানে' 'শব্দ' কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় উপরোক্ত আলোচনা থেকেই।

শৈলীচর্চায় শব্দ ও ধ্বনির পাশাপাশি বাক্যগঠনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি হয় বাক্য। চমস্কি তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছেন বাক্যের দুটি রূপ—অন্তরঙ্গ রূপ ও বহিরঙ্গ রূপ। চমস্কি বলেছেন লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থাকে বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ, তার প্রকাশ ঘটে বহিরঙ্গ রূপে। তবে শুধু বাক্যের নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, বাক্য নির্মিতির নানা প্রকরণে (বাক্যের দৈর্ঘ্য, বাক্যের জটিলতা বিধান, বাক্যে ক্রিয়াপদের অবস্থান)। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের গদ্যে ক্রিয়াপদের পূর্বাগম ইত্যাদিও শৈলীবিজ্ঞানে বিচার্য। অনেক সময় ইংরেজি বাক্যের বহিরঙ্গ রূপ অনুসরণে বাংলা বাক্যে নিত্য সম্বন্ধী অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও বা ইংরেজি বাক্য অনুসারে বাংলায় যখন (When) ও তখন (Then) শব্দদুটির প্রথমটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ইংরেজি বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ অনুসরণে 'তখন' উহ্য রাখা হয়। এটাও এক ধরনের বাক্য গঠনগত শৈলী। আবার বাংলা বাক্যে সাধারণত ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের পরে। কিন্তু ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের মাঝখানে। বিশ্বের ভাষাসজ্জার চিত্র লক্ষ করলে প্রথম তিনটি সজ্জার প্রাধান্যই দেখা যায়। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার সজ্জা বৈচিত্র্যেরই বিষয়টি শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সজ্জাবৈচিত্র্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্য সম্পর্কায়িত।

এবার বিভিন্ন প্রকার শৈলীর আলোচনা করা হবে। কারণ সাহিত্যের মাধ্যম অনেক। যেমন—গদ্যশৈলীর মধ্যে ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। রচনাগত ভিন্নতার জন্য এক একটির শৈলী এক একরকম। গদ্য পদের বিপরীত। তাই যা পদ্য নয়, তাই গদ্য। ভাষার যেমন জ্ঞানমূলক এবং সৃষ্টিমূলক দিক আছে গদ্যেরও তাই। গদ্যের আওতায় পড়ে লিখিত ভাষণ, চিঠি, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। তবে

ছোটগল্প ও উপন্যাসের গদ্যশৈলী আলোচনা করলে দেখা যাবে—কোনো ছোটগল্পের প্রাণ হল প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একতা। কারও কাছে ছোটগল্প সহজ সরল, আবার কারও কাছে তা কঠিন। উপন্যাসের মতো চরিত্রের ভীড় থাকে না। লেখকের একটা দায় এখানে থাকে যে গল্পটাকে সংকটের কাছাকাছি আনার। সরল বা জটিল থেকে জটিলতর প্রান্তে দ্রুততালে উপসংহারে নিয়ে যাবার। এই দায়বদ্ধতার ওপরেই লেখকের নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী ধরা পড়ে। ছোটগল্পের ক্ষুদ্রায়তনও কখনও কখনও উপন্যাসের চেয়ে উঁচুদরের প্রত্যক্ষতা দান করে। আর এখানেই ছোটগল্পকারের শৈলীগত ভিন্নতা। যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে অভিযুক্ত হয়েছে চন্দরা। দয়ালু সিভিল সার্জন তাকে বলে স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু চন্দরার সংক্ষিপ্ত জবাব 'মরণ'। অর্থাৎ মৃত্যুও ভালো। মাত্র একটা শব্দের (মরণ) মধ্য দিয়েই স্বামীর প্রতি চন্দরার ঘৃণামিশ্রিত অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। আর এখানেই ধরা পড়েছে ছোটগল্পে রবীন্দ্রশৈলী।

আর উপন্যাসের মতো বিমিশ্র সাহিত্য মাধ্যম খুবই কম আছে। ছোটগল্পের তীক্ষ্ণতা, কবিতা, নাটকীয় সংলাপ, চিঠিপত্র, বর্ণনাত্মক গদ্য, জ্ঞানমূলক গদ্য সবই উপন্যাসে আছে। চরিত্র, সংলাপ, ভাষা, উপলক্ষ্য, আলোচনা সব মিলেই উপন্যাসের শিল্পজগৎ। বিভিন্ন ঔপন্যাসিক এগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই সেখানেই উপন্যাসের শৈলী বিভিন্ন হয়ে যায়। ক্রিয়ার কালের প্রয়োগ পার্থক্যের সঙ্গে বাক্যের রূপগত ও অর্থগত পরিবর্তন শৈলীচর্চার অন্তর্গত। আর উপন্যাসের কাহিনীসজ্জায় কালের ব্যবহারে দুটি দৃষ্টিকোণ অনুসৃত হয়। পাঠকের সময়সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল ও লেখকের সময়সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল। বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা সাধারণত পাঠকের সময়সাপেক্ষে ক্রিয়ার অতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন—'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন।' ইংরেজি বাক্যে—

> "The unusual events described in the chronicle occured in 1947, at Oran. Everyone agreed that considering their some what extraordinary character, they were out of place there". [The Plague, Albert Camus]

আবার কখনও লেখকের সময়সাপেক্ষে ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে।" আবার ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাক্যে প্রথমে ক্রিয়ার অতীত রূপ ব্যবহৃত, পরক্ষণেই ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে—

> "..... and which I shall describe in its proper place".
> (The brothers Karamazov, Dostoyevsky']

আবার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়া বর্তমানকাল ব্যবহার করেছেন—

> "অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে।"

ঠিক এরপরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ—"অমিত বলে ....."/লিসি বলে ....." ধরনের বর্তমান কালাশ্রয়ী বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর এখানে ধরা পড়েছে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথেরও শৈলীচর্চা।

গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৈলীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তাই 'শৈলী' বা স্টাইলের 'লোকমান্য' সংজ্ঞাদান করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ লেখক, বিষয়, পাঠক, উদ্দেশ্য, শ্রেণি ইত্যাদি ভেদে স্টাইল পরিবর্তন হয়ে যায়। এর কোনোটিতেই আলাদা করে এককথায় স্টাইলের ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন—প্রত্যেক লেখকের চিন্তাভাবনা বিভিন্ন। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, স্তবক রচনা, রচনার শুরু ও শেষে ওই পৃথকত্ব ধরা পড়ে। লেখক ভেদে চিন্তাভাবনা আলাদা হবার ফলেই শৈলীও বিভিন্ন হয়। যেমন বঙ্কিমের উপন্যাস মনে হয় যেন পুরোটাই আগে থেকে নেওয়া, যেমন স্থপতিরা করে থাকেন। পুরো ব্যাপারটা আগে একটা নক্সার মধ্যে এনে তারপর তাকে গড়ে তোলেন। আবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মনে হয় বলতে বলতে উপন্যাসটি একটি কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। আগে থেকে ভাবনা-চিন্তা থাকলেও, শৈলী-নক্সা থাকে না। ভাস্কররা সাধারণত এই ভাবেই কাজ করে থাকে। এই যে অবয়ব গঠনের মধ্যে স্থপতি সুলভ প্রবণতা এবং ভাস্কর সুলভ প্রবণতা তা তো শৈলীবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিষয়ই লেখকের ভাষারীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলেই গবেষণা পত্রের ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ভাষা আলাদা হয়ে যায়। এই জন্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাসের শৈলী আলদা। লেখকের রচনা আবার পাঠকের রুচি অনুযায়ী ভিন্ন শৈলীর হয়ে যায়। আবার কারও উদ্দেশ্য সাহিত্যবোধ জাগানো, কারও আনন্দ, কারও দেশপ্রেম জাগানো, কারও দেশের লুপ্ত সংস্কৃতি জাগিয়ে দেওয়া, কারও বা উদ্দেশ্য প্রচলিত প্রথা ভেঙে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠিত করা—এই ভিন্ন মাত্রার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই লেখকের শৈলী এক হতে পারে না, ভিন্ন হয়ে যায়। আরও দেখা যায় সাহিত্যের শ্রেণি অনুযায়ী শৈলীও আলাদা হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ভাব অনুযায়ী শব্দচয়নই এর মূলকথা। ফলে প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটকের শৈলী আলাদা।

শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের আওতায় কীভাবে এসে পড়ে এবং তা কীভাবে সাহিত্য সমালোচনার পরিপূরক হয়েছে সেটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। জার্মান সমালোচক Leo Spitzer-এর মতে একজন লেখকের লেখার সময় বার বার কোনো বিশেষ শব্দ, বাগ্‌ধারা বা বাক্যবন্ধ ব্যবহার যেমন তাঁকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে, তেমনি রচনার মধ্যে লেখকের নানা প্রবণতা অন্য লেখক থেকে তাঁকে আলাদা করে। শৈলীবিজ্ঞানের বক্তব্য প্রতিটি লেখকের ভাষাগত প্রবণতা, পছন্দ, নির্বাচন এবং গ্রহণ বর্জনের সূত্রগুলিকে চিহ্নিত করা। গত কয়েক শতাব্দীতে শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছে। রেটরিখ প্রভাবিত শৈলীর মূল বক্তব্য ছিল আদর্শ শৈলীতে আছে prescribed style বা Norm আছে, যা প্রত্যেক লেখককে চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ব করা অবশ্য প্রয়োজন। এরই অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায় Middletion Murray প্রমুখের উৎকৃষ্ট রচনারীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে। Murray ভাল Style-এর লক্ষণ বোঝাতে Clarity, Urbanity ইত্যাদি আটটি গুণের উল্লেখ করেছেন। Sir Arther Quiller Couch এবং আরও কয়েকজন একটি আদর্শ

শৈলীকেই অনুসরণযোগ্য বলে নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে শৈলীতত্ত্ব মূলত একটি Norm বা আদর্শ শৈলী অনুসরণ ও অনুসন্ধান করেছে যে, শৈলী নির্দিষ্ট কিছু গুণ আয়ত্ব করবে এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি দোষ পরিহার করবে।

উইলিয়াম কেরী থেকে আধুনিক কালের লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ করলে দুধরনের শৈলীর প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণ ওইসব লেখকের সবচেয়ে পরিচিত রচনার পরিসংখ্যাগত লক্ষণ দেখেই ধরা যায় লেখকদের শৈলী। রচনারীতির মধ্যে লেখককে কোনো না কোনো ভাবে চিনিয়ে দেয়। তাই অনেক সময় নাম না দেওয়া রচনা দেখেই বলা যায়, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, প্রমথ চৌধুরী বা সমরেশ বসুর লেখা। অনেক সময় লেখকের নিজস্ব রচনা লক্ষণগুলো খুবই সুস্পষ্ট থাকে। যার জন্য পান প্রবণতামূলক গল্পগুলো শিবরাম চক্রবর্তীর মনে হয়। আবার বিষয়ের সামঞ্জস্য রেখে 'তথ্যমূলক' রচনা মানেই সত্যজিৎ রায়ের লেখা। কোনো রচনায় 'দয়া নাই', 'মমতা নাই', 'স্নেহ নাই' ইত্যাদি শব্দ বা উদিপুরী, হাস্যময়ী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চিনিয়ে দেয় এটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। আর এর থেকেই উদ্ভব হয়েছে বঙ্কিমী রীতি, বিদ্যাসাগরীয় রীতি, হুতোমী রীতি বা রবীন্দ্র রীতির। এইসব লেখকের অনুগামী লেখকদের রচনায় বিভিন্ন সময় সৃষ্টি করেছে যুগশৈলী।

শব্দের রূপগত দিক বিচার করলে ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী উদ্‌ঘাটন করা যায়। কেরী থেকে বিদ্যাসাগরের রচনায় ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎকালে রূপের সঙ্গে 'ক'-এর অতিরিক্ত সংযোগ লক্ষ করা যায়। যেমন—অতীত কালে করিলেক, ভবিষ্যতে—জন্মিবেক ইত্যাদি। বাক্‌সজ্জার দিক থেকেও ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর ধারণা স্পষ্ট হয়। যেমন—উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে খণ্ড বাক্‌সজ্জার রীতি হল প্রধান খণ্ড বাক্য অধীন + খণ্ডবাক্য অথবা অধীন খণ্ডবাক্য + প্রধান খণ্ডবাক্যের ব্যবহার। বর্তমানকালে বাক্যের অন্বয়ীরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ছোট ছোট সরল বাক্য, তার সঙ্গে সহজ-সরল আটপৌরে শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণ মানুষ হয়তো লিখবেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং .....' আর কালিদাস লিখবেন 'নীরসং তরুবর' .....। এই পার্থক্যই ব্যক্তিশৈলীর মূল কথা। আর, ভাষা প্রয়োগের তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি বা যুগের শৈলী সন্ধানই শৈলীবিজ্ঞানের উপজীব্য।

শৈলীর ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম ঘটে তার মৌল কারণ কী? শৈলীর নিয়ন্ত্রক শক্তি কী? শৈলীর যে বিশেষ প্রকাশ রূপ, তার প্রকৃতি কী? ধ্বনি, শব্দ বাক্যগঠনের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা প্রকাশ রূপ গড়ে তোলে। কীভাবে গড়ে তোলে? এই গুলোর পরিমিতি ও পরিসংখ্যান আলোচনা করলেই কি শৈলীবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে ভাষাবিজ্ঞানে একটাই। তবে সাহিত্য যেহেতু ভাষাতাত্ত্বিক শিল্পকলা, সেহেতু শিল্পের স্বরূপটিকে কেবল ভাষার দিক থেকে বুঝলেই চলে না, তাকে ভাবের দিক থেকে রসের দিক থেকেও বুঝতে হয়। আর এই ভাবের দিক থেকে, রসের দিক থেকে, শিল্পগুণের দিক থেকে যে বোঝা বা বিচার বিশ্লেষণ, তা হল সৌন্দর্য শাস্ত্র বা সাহিত্যিক নন্দনতত্ত্বের কাজ। শৈলীবিজ্ঞান এই নন্দনশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেনি। কিন্তু যেহেতু শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং

ভাষাবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞান, তাই তা পরিমিতি ও পরিসংখ্যানকে বেশি মূল্য দেয়। 'Statistical Measurement' শৈলীবিজ্ঞানের আবশ্যিক অঙ্গ। তাছাড়া predictability বা পূর্ব অনুমান যোগ্যতার কথাও এক্ষেত্রে এসে পড়তেই পারে। শৈলীবিজ্ঞান বা Stylistitics এক গণিত নির্ভর বিজ্ঞান, অন্যদিকে তা সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলে যে দার্শনিক চিন্তা কাজ করে তার সঙ্গেও যুক্ত। Enkvist প্রমুখ শৈলীবিজ্ঞানী অনেককাল আগে এ কথাই বলেছেন। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞানের মধ্যে আছে স্পষ্টত দুটি দিক। একটি হচ্ছে ভাষার ব্যবহারিক দিক বা প্রায়োগিক দিক, আরেকটি হচ্ছে শৈল্পিক প্রকরণগত দিক। যেমন—উপন্যাসের ভাষার ব্যাপারটা শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়, তেমনি আবার উপন্যাসের শিল্প প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আছে তার বিচারও শৈলীবিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে। এটাকেই বলা হয় শিল্প প্রকরণের বিচার। NORM থেকে DEVIATION ভাষায় কী ভাবে এসেছে তার ওপর বিশেষ জোর পড়েনি। বরং বলা যায় শিল্প প্রকরণগত শৈলীবিচারের ওপরেই জোর পড়েছে বেশি।

সবশেষে বলা যায়, ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতিকে আলোচনা করাই শৈলীবিজ্ঞানের কাজ। এর ফলে সাহিত্য সমালোচনা হয়ে ওঠে তন্ময় ও বৈজ্ঞানিক। শৈলীবিজ্ঞান একদিকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় বাক্যের রূপগত ও অর্থগত দিকটি আলোকিত করে তোলে। অন্যদিকে পরিসংখ্যানের সহায়তায় শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এটা ঠিক, লেখকের বিষয় ও রচনাভেদে শৈলী বিভিন্ন প্রকার হয় বলে 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটি সর্বজনসম্মত নয়। যদিও সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা বাংলায় বেশি দেখা যায় না। তবুও বিতর্ক আভাস সম্ভাব্য জেনেও 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। আমাদের এই প্রশ্নে মীমাংসা তখনই হবে যখন 'শৈলীবিজ্ঞান' নিত্য অনুশীলন সাপেক্ষ একটি শৃঙ্খলায় পরিণত হবে।

৮.২.৫.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘বিশ্বভাষা’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৮.২.৫.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক : ৬ : বইয়ের ভাষা

বিন্যাসক্রম :

৮.২.৬.১ ভাষা হলো ছন্দোময়

৮.২.৬.২ বইয়ের ভাষা

৮.২.৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৬.১ : ভাষা হলো ছন্দোময়

পৃথিবীর সব সাহিত্যেরই শুরু ধর্ম দিয়ে। এবং তার ভাষাও ছিল পদ্যকেন্দ্রিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে এই সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছিল পদ্য দিয়ে। তবে তখনকার ভাষা ছিল ছন্দোময়। অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দ ও অলঙ্কারময়। মূলত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনা উপমা, রূপক ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে চর্যাপদে উন্নীত হয়েছিল। ফলে তান্ত্রিকদের ভাব, পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা রূপ পেয়েছিল কাব্যে। মধ্যযুগে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদসাহিত্য, জীবনীকাব্য, পদাবলী ইত্যাদিতে লক্ষ করা গেল ভাষাশিক্ষার সহজাত রূপ। এ যেন সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেই সাহিত্য রচনা। এই যুগের কবিরা সচেতন ভাবেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে শব্দ ব্যবহার, বাক্যনির্মাণ, চিত্রকল্প সৃজন সবক্ষেত্রেই কবিদের সচেষ্ট ভাবনা লক্ষণীয়। কিন্তু প্রাচীনযুগে চর্যাপদ রচনায় বৌদ্ধ কবিদের এই দিকে বিশেষ নজর ছিল না। তবুও চর্যাপদ সাহিত্যের রূপ পেয়েছিল। উল্লেখ্য চর্যার সঙ্গে প্রাচীন যুগের সাহিত্যসম্ভার তুলনা করলে ভাষার সরলীকরণের ব্যাপারটি সহজেই চোখে পড়ে। শুধু বাংলা নয়, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সরলীকরণের ধারা অব্যাহত।

৮.২.৬.২ : বইয়ের ভাষা

আধুনিক বাংলা ভাষা প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে পদ্য ভাষার পাশাপাশি গদ্যরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাও দুই রীতির গদ্য। সাধু ও চলতি। সাধু গদ্যে একসময় উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য রচনা হলেও এখন তা প্রায় ব্রাত্য। চলিত গদ্যই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে প্রসারিত। বলে রাখা ভাল, চলিত গদ্যও বর্তমানে বিষয় ও ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বইয়ে একধরনের চলিত ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, সংবাদপত্রে আর এক ধরনের চলিত। আবার বিজ্ঞাপনে অন্য ধরনের চলিত। তবে সবক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের মুখের ভাষা। লোকায়েত আটপৌরে শব্দ, একই শব্দের একাধিক অর্থ করে ব্যবহার, নিত্যনতুন শব্দ বা শৈলী সৃষ্টি করে সাহিত্য রচনাই এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রবণতা।

শিল্প সৃজন করা এই ভাষার একটি বিশেষ দিক। আঞ্চলিক স্তরে নিবদ্ধ না থেকে এই ভাষা বহুদূর বিস্তৃত।

দেশকালের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সর্বজনীন। শিল্প সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্যে কথা বলে আসছে। কথা বলার পাশাপাশি একদল মানুষ সাহিত্য সৃজন করে চলেছে। আজও এই ধারা অব্যাহত। একটু চোখ খুলে তাকালেই বোঝা যাবে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে প্রতিদিনের কথোপকথনের ভাষা অনেকটাই আলাদা। সেগুলি এইরকম —

কোনও লেখক যখন উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য আগ্রহী হন তখন তাঁর নজর থাকে সেই ভাষার সকল শ্রেণির মানুষের দিকে। তার চারদিকে উপস্থিত, অনুপস্থিত সকলের কথাই তাকে মাথায় রাখতে হয়। ফলে সেই ভাষার বিস্তৃত শব্দভাণ্ডার তিনি কাজে লাগান। অভিজাত, অনভিজাত, লৌকিক, আঞ্চলিক সব ধরনের শব্দই তিনি ব্যবহার করেন। এবং তা ব্যাকরণের নিয়মনীতি মেনেই।

বইয়ের ভাষায় একটি পূর্বাগত আদর্শকে অনুসরণ করা হয়। অনেক সময় তাই বইয়ের ভাষাকে অনেকেই বলেন প্রাচীনপন্থী। কিন্তু লেখকদের কাজ প্রাচীনতা মুক্ত হয়ে ভাষার অত্যাধুনিক বা সাম্প্রতিক রূপটাকে তুলে ধরা। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে অত্যাধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটানো। সেখানে লেখক মানব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ধরার চেষ্টা করেন।

সাহিত্যের ভাষা গোছালো, সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত। উৎকৃষ্ট সাহিত্যে চটলতা, অগোছালো, অপরিকল্পিত ভাষার কোনও স্থান নেই। শব্দ ব্যবহার, বাক্যসৃজন সবক্ষেত্রেই একটা রুচিশীলতার পরিচয় লক্ষণীয়।

শব্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আনন্দ। সাহিত্যে শব্দের মাধ্যমেই ভাবের সৃষ্টি হয়। আর এই ভাব যখন মানব জীবনের রূপবৈচিত্রকে প্রকাশ করে তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। একটি উৎকৃষ্ট বইয়ের ভাষা শিল্পেরই ভাষা। এই ভাষার একটি নির্দিষ্ট বাঁধন আছে। একটি নিয়মও আছে। এখানে বিভিন্ন বিরতি চিহ্ন ভাবানুযায়ী বসে। বইয়ের ভাষার একটি নির্দিষ্ট পদক্রম আছে। কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম ইত্যাদি নির্দিষ্ট সজ্জা আছে। উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প ইত্যাদির বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়।

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হলে ভাষার সমৃদ্ধি দরকার। অর্থাৎ যথাযথ ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা অভিজাত হওয়া প্রয়োজন। আধুনিককালে ইংরেজিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিজাত ভাষা বলা হয়। কেননা যে কোনও ভাব প্রকাশ করার জন্যে এই ভাষায় উপাদান আছে। শব্দগত, ধ্বনিগত, বাক্যগত, ছন্দ-অলঙ্কারগত, শৈলগত সবই। আধুনিক কালে বা এই সময়ে সাহিত্যে অনেক নতুন নতুন বিষয় এসেছে। অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তববাদ, স্বপ্নময়তা, নব্যবাস্তবতা, সংকেতময়তা ইত্যাদি। এইসব বিষয় প্রকাশ করার জন্যে সব ভাষায় যথেষ্ট উপাদান নেই। গ্রন্থকারকে প্রতিনিয়ত ভাষার এই নবরূপকে গবেষণা করতে হয়। সেটা প্রাচীনকালের সাহিত্য ভাষায় একদমই অনুপস্থিত।

গদ্য ভাষার একটি অলিখিত নিয়মই হল নতুন করে সৃজন। বিষয় পুরনো হলেও তাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা। বাংলা উপন্যাস, গল্পের অনেক ঘটনাই আছে যা অনেক প্রাচীনকালের। লেখকরা বেদ, পুরাণ বা ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লিখলেও তা ভাষার নবীনতার গুণেই বিখ্যাত হয়েছে। অর্থাৎ বিষয় পুরাতন হয়েও উপস্থাপন, ভাবনায় ও ভাষার গুণে তা নতুন।

আগেকার দিনে যে কোনও বইয়ের ভাষাই ছিল কঠিন। বিষয় বা ভাব ছিল সহজ সরল। কিন্তু বর্তমানকালের সাহিত্যে ভাষা সহজ সরল প্রাঞ্জল। কিন্তু বিষয় বা ভাবনা জটিল। মানব জীবনের জটিলতাই বিষয়কে জটিল করেছে, কিন্তু ভাষাকে করেছে সহজ সরল।

সাহিত্যের ভাষায় কাব্যিকতা, নাটকীয়তা ইত্যাদি লক্ষণীয়। সাহিত্য উন্নত চিন্তা, উন্নত কল্পনা, উন্নত অনুভূতির প্রকাশক। সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সেই কাব্যিকতা বা নাটকীয়তাকে সহজেই বোঝা যায়। কোনও বিষয় বা ভাবনার

যথার্থ উপস্থাপনে এগুলি অবশ্যই প্রয়োজন।

শৈলী বা রীতির সৃজন করে চলা বইয়ের ভাষার একটি বড় দিক। আধুনিক কালে বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তার উপস্থাপন রীতির ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে নিত্যনতুন শৈলীর সৃষ্টিকর্তা তিনি বেশি বিখ্যাত। সাধারণত ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যকে নিয়ে লেখক শৈলী সৃষ্টি করেন। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ তা করতে পেরেছেন বলেই তাঁরা ব্যতিক্রমী।

সাহিত্যের ভাষায় পুনরুক্তি একদমই নেই।

আধুনিককালে অবশ্য মানুষের মুখের ভাষাই সাহিত্যে রূপ পাচ্ছে। মূলত ভদ্র, শিক্ষিত সমাজের মৌখিক ভাষাই এই ধরনের সাহিত্যের মূলে রয়েছে। তবে সবসময়েই বইয়ের ভাষাতে আছে উন্নত কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদির লিখিত রূপ।

৮.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বইয়ের ভাষার স্বরূপ আলোচনা করে এর বৈশিষ্টগুলি বুঝিয়ে দাও

৮.২.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ'

৪। প্রসঙ্গ: বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) - সুখেন বিশ্বাস

৫। ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ - সুখেন বিশ্বাস

একক : ৭
সংবাদপত্রের ভাষা

বিন্যাসক্রম :

৮.২.৭.১ ভূমিকা
৮.২.৭.২ সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ইতিহাস
৮.২.৭.৩ পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি
৮.২.৭.৪ সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি
৮.২.৭.৫ মূল্যায়ন
৮.২.৭.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৮.২.৭.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.২.৭.১ ভূমিকা

ভাষা হলো আমাদের আত্ম প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ভাষার প্রধান কাজ ভাবনাকে একজনের নিকট হতে অন্যের নিকট পৌছে দেয়া। তবে ভাষা দুই ধরনের: ক(মুখেরভাষা ও খ(লেখারভাষা। কথা বলার সময় অসম্পূর্ণ ভাষার ব্যবহার করেও অন্যকে অর্থ বোঝানো সম্ভব। কিন্তু ভাষা লিখিত আকারে প্রকাশ করতে হলে তার সাথে যোগ হয় সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ বাক্য, আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ না করা, বানান ও ব্যাকরণের শুদ্ধতা, যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারের তাগিদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখিত ভাষার একটা অসাধারণ সুবিধা আছে, এর মাধ্যম যেহেতু লিখিত তাই এর ভিত্তিতে ভাষার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। আমাদের এই চলিষ্ণু জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস হলো সংবাদপত্র। এটি সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এখানে আমরা সামাজিক যোগাযোগের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাষার প্রয়োগ করে থাকি। সংবাদপত্র হলো খবরের বাহন, আর এই খবরের বাহন হলো ভাষা ও ছবি। সংবাদপত্রের ভাষা লেখ্যভাষার জগৎ থেকে আগত ভাষা। এই লেখ্য ভাষার মাধ্যমে সংবাদপত্রে বিভিন্ন ঘটনার খবর বাণীবদ্ধ থাকে। তবে সংবাদপত্রের ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে। যেমন, সংবাদপত্রের ভাষা হবে সহজ, সরল ,স্বচ্ছ যেন পাঠক ও শ্রোতা তা সহজেই বুঝতে পারেন। যেহেতু পাঠক-শ্রোতার মধ্যে যেমন সুপণ্ডিত আছে, তেমনি রয়েছেন নামমাত্র সাক্ষর ব্যক্তি তাই এতে ব্যবহৃত ভাষা হবে সহজ যেন সকলেই তা বুঝতে পারেন।

৮.২.৭.২ সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ইতিহাস

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয় বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হবার সময় থেকে, তবে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবকালে বাংলা গদ্যের অবস্থা ছিল অনেকখানি বিশৃঙ্খল। তারপর ও বাংলা সংবাদপত্র এই বিশৃঙ্খলার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। বরং বিশঙ্খলা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল। এ সম্পর্কে সুকুমার সেনেরমন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ- "সাধারণ পাঠকের অপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা সাময়িকপত্রে বাঙ্গালা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া ইহাকে প্রতিদিনের কাজ কর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণের উপভোগ্য রস সৃষ্টির বাহন করিয়া তোলে।" (বাঙ্গালী সাহিত্যে গদ্য তৃতীয় সংখ্যা,কলিকাতা ১৩৫৬ পৃ (৪৭ :১৮০১ ১৮১৭-খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা বই যা করতে পারেনি ১৮১৮সালের মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্র তা পেরেছিল। ১৮৩৫- পরবর্তীকালে দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাবের সাথে সাথে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। রসংবাদপত্রের আগের দায়িত্বের সাথে তা কাজের ধারায় যুক্ত হয় দ্রুততা । এছাড়া আন্তর্জাতিক সংবাদ বিনিময়ের ব্যবস্থায় ও বিস্ময়কর অগ্রগতি আসে। এতসব চাহিদা মেটাতে সংবাদপত্রের ভাষায় আসে অসমৃণ বৈচিত্র্য। তবে সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে একটি অভিযোগও পাওয়া যায়, তা হলো সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ব্যকরণ অগ্রাহ্য করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে।
প্রথমত, বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পর ১৮১৭ সালে বাংলা সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৮১৮-"দিকদর্শন" ও "সমাচার দর্পন" এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে "সংবাদ কৈমুদী" 'জ্ঞান অন্বেষণ' এর আবির্ভাব হয়। ১৮৩৩ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করে "সম্বাদ প্রভাকর"। ১৯৩৯ সালে বাংলা "দৈনিক সম্বাদপ্রভাকর"এরঅভিযাত্রাশুরু। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলো বিট্রিশ শোষকদের অত্যাচার অবিচার এবং সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সংবাদ প্রচার করলে পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হলো সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কারের ভাষা। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সংবাদপত্রে স্থান পেতে শুরু করল সাহিত্যের ভাষা।

৮.২.৭.৩ পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি

বাংলায় সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট রূপান্তরে ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাটাইজার। প্রথম দিকে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রণযন্ত্র, বর্ণের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ ওই সময় যাঁরা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা কেউ কোম্পানির চাকুরে ছিলেন না। কোম্পানির সঙ্গে ছিল তাঁদের স্বার্থগত এবং নীতিগত বিরোধ। এ কারণেই লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তন করেন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার এবং হেস্টিংসের আমলেও এ নিয়মের পরিবর্তন হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৬৮ সালে ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত ইউলিয়াম বোল্টস কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি তাঁকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, উল্লিখিত বেঙ্গল গেজেটএর মালিক ও সম্পাদক জেমস -

অগাস্টাস হিকিকেও বারবার কোম্পানির রোষানলে পড়তে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বাংলা সংবাদসালে ১৮১৮সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা। -র্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্মিশনের পক্ষে জন ক্লারকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিগ্দর্শন। এর ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে ইংরেজি প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো। ১৮২১ সালের পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

দিগ্দর্শন প্রকাশিত হওয়ার একমাস পর মে ২৩), ১৮১৮(মার্শম্যান প্রকাশ করেন সমাচার দর্পণ। এর সম্পাদনা কাজে সহায়তা করেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ। পত্রিকাটির ফারসি এবং ইংরেজি--১৮৩২বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। ৩৪ পর্যন্ত পত্রিকাটি ছিল দ্বিসাল পর্যন্ত এর ১৮৪১সাপ্তাহিক এবং -প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

বাঙালি সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক বাঙ্গাল গেজেটিও প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে (জুন/মে)। সম্পাদক ও মালিক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। বছর খানেক পত্রিকাটি চলেছিল। এর কোনো কপি পাওয়া যায়নি। এ ধরনের পত্রিকাবিজ্ঞানের আলোচনা করা-সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত সংবাদ পরিবেশন ও জ্ঞান/; তবে এর মাধ্যমে বাংলা গদ্যেরও অনেক উন্নতি হয়।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বাংলা সংবাদসাময়িকপত্র -কাশিত হয়প্র; যদিও সেগুলি তেমন উলেখযোগ্য ছিল না। বলা যেতে পারে, বাঙালির কাছে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে ১৮৩১ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের ফলে। এটি বাংলা সাময়িকপত্রে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে, কারণ তখন থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা দেয়। এছাড়া তখন বাংলা গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন নতুন লেখকেরও আবির্ভাব ঘটে। ওই একই বছর প্রকাশিত হয় মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সমাচার সভারাজেন্দ্র ৭) মার্চ, ১৮৩১পরে শুরু হয় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক ।(, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপ্রকাশ। বাংলার পাশাপাশি তখন যথেষ্ট ইংরেজি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয় সাময়িকপত্রের-; তবে ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন এবং দ্বিতীয়টির সমাজদপত্রও প্রকাশিত সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার। ওই সময় বেশ কয়েকটি উর্দু ও ফারসি সংবা-হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র ব্যতীত ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ৭৬টি সংবাদপত্র ও ১৬২টি সাময়িকপত্র টি২৩৮মোট); বিজ্ঞাপিত সংবাদ ১৮৫৭সাময়িকপত্র এবং -(২৫২ট সংখ্যা হয় সালের আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র ধরলে মো। একই সময়ে অখন্ড বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৯০৫টি বাংলা সংবাদসংস্ক-সাময়িকপত্র। এ পরিসংখ্যান পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-ৃতির অবস্থা তুলে ধরে। তবে নানা দিক থেকে পশ্চাৎপদ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়।

বাংলাদেশে প্রকাশিত ২৫২টি সংবাদসাময়িকপত্রের অনেকগুলিই ছিল সাপ্তাহিক ও নিয়মিত-, যেমন ঢাকা প্রকাশ, বেঙ্গল টাইমস, বান্ধব ইত্যাদি। প্রথম দুটি টিকে ছিল দীর্ঘদিন। ঢাকা প্রকাশের আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় একশ বছর। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য মাসিক বান্ধবকে তখন দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন বলে আখ্যায়িত করা হতো।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকাল শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের জন্যই নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যও উল্লেখযোগ্য। এ সময় কলকাতা থেকে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হতে থাকে নভেম্বর ১৫), ১৮৫৮(, যার প্রভাব পড়ে তৎকালীন প্রায় সকল পত্রিকার ওপর। সোমপ্রকাশের প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর আগে বাংলা সাময়িক সংবাদপত্রে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে তেমন আলোচনা হতো না; সোমপ্রকাশেই ব্যাপকভাবে এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কারণ ১৮৫৭ সালের পরে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।-

পূর্ববঙ্গের সংবাদসাময়িকপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে উনিশ শতকের বাংলাদে-শে মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি কোথায় এবং কখন স্থাপিত হয় তা সঠিক জানা যায় না; তবে অনুমান করা হয়, ১৮৪৭ সালে রঙ্গপুর বার্তাবহ প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটিই পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। এর এক বছর পর ১৮৪৮ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় একটি ইংরেজি মুদ্রণযন্ত্র এবং ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় ঢাকা নিউজ প্রেস, যেখান থেকে ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয়।

১৮৬০ সালে ঢাকার বাবু বাজারে স্থাপিত 'বাঙ্গালা যন্ত্র' শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এছাড়া বাঙ্গালা যন্ত্র ঢাকার সমাজজীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আর কোনো মুদ্রণযন্ত্র করতে পারেনি। এই যন্ত্র থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক। ষাটের দশক থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে সংবাদসাময়িকপত্র বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের।- ব্রাহ্ম আন্দোলন যদিও এখানে শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে, কিন্তু ষাটের দশকের আগে তা পূর্ববঙ্গে তেমন গুরুত্ব পায়নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে উনিশ শতকে বাংলাদেশে গঠিত হয় বেশ কিছু সভাসমিতি-, যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজসমিতিগুলির কর্ণ-সংস্কার। সভা-ধাররা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। উনিশ শতকের - প্রভাবশালী সংবাদপত্র ঢাকা প্রকাশ ব্রাহ্মরাই প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মবিরোধীরাও নিজেদের কথা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার আশ্রয় নিয়েছিল। তখন ব্রাহ্ম-, রক্ষণশীল হিন্দু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকলের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র; সারণি ১, ২ ও ৩-১৮৪৭খিত এ উল্লি-১৯০৫ সালের সংবাদসাময়িকপত্র-ের উৎপত্তিই এর প্রমাণ।

সারণি তিনটি থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সংবাদসাময়িকপত্র সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের ধারণা নেওয়া - -১৮৬১যায়। ৭০এর উপাত্ত থেকে অনুমান করা যায় যে-, পূর্ববঙ্গে তখন একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং তাঁরা সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন; তবে সবকিছু আবর্তিত হয়েছিল ঢাকাকে কেন্দ্র করেই।

১৮৭১-এ বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে সংবাদ ৯০-সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বলে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম এলাকায়ও। ওই সময় প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়; সেগুলিতে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হতো। ঢাকা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব্যবিষয়ক সাময়িকী কবিতাকুসুমাবলী। নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক বালারঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কিত মাসিক ঋষিতত্ত্ব। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক কৌমুদী। শিল্প ও কৃষি বিষয়ক পত্রিকা বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল রাজশাহী থেকে। কিশোরদের জন্য সুখীপাখী প্রকাশিত

হয়েছিল যশোর থেকে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল মহাপাপ বাল্যবিবাহ। ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক রামধনুও ছিল বেশ জনপ্রিয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল তা বিকশিত হয়েছিল সত্তর থেকে নববই দশকের মধ্যে এবং পত্রিকার পাঠক যেহেতু ছিলেন পেশাজীবীশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী/, সেহেতু অনুমান করা যায় যে, পেশাজীবীহ্রাস পত্রিকা প্রকাশের হার-মধ্যশ্রেণীও ওই সময় বিকশিত হয়েছিল। নববই দশকের পরে অবশ্য পত্র/ পায়। এর কারণ সম্ভবত ব্রাহ্ম আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া এবং এক সময় এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী তথা সমাজজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্তিমিত হয়ে পড়া।

বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে। প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৮৫৬ সালে। প্রথম সাময়িকপত্র কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে। তবে যে দুটি পত্রিকা দীর্ঘকাল টিকেছিল এবং পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে দুটি হলো ঢাকা প্রকাশ ও বেঙ্গল টাইমস।

আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কারণ হয়তো এই যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে অবকাঠামো, যেমন প্রেস, দক্ষ কম্পোজিটর, সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদির প্রয়োজন, তার অভাব ছিল। ফলে সংবাদভিত্তিক পত্রিকার চাহিদা থাকলেও তার সংখ্যা যেমন বাড়েনি এবং যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেসবের অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এসময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরোটি এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। এর কারণ সম্ভবত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা।

উনিশ শতকে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল সীমিত; এর কারণ বাঙালিদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। ধনীরা সংবাদপত্রকে সাহায্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজিগত লগ্নী করেননি; কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনে অধস্তন শ্রেণী হিসেবে বাঙালি ধনীরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চেয়ে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। ১৮৭০সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষ ৮০-ায় প্রকাশিত একুশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরোটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত এবং চারটি যৌথ উদ্যেগে।

পশ্চিমবঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী অনেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু এ অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলি ওভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকতেন; নব্য ধনীরাও সময় কাটাতে ভালোবাসতেন রাজধানী কলকাতায়। ফলে উনিশ শতকে বাংলাদেশে অনেক পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যেগে বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে। জমিদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। বাংলাদেশে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন স্বল্প আয়ের উকিল-, সমাজসেবী, ব্রাহ্ম প্রচারক বা শিক্ষক। একই ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক সবকিছু। তাই দেখা যায়, যতদিন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা উদ্যম টিকে ছিল, পত্রিকাও ততদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকা প্রকাশের এই অন্তরায়ের প্রধান কারণ ছিল জনগণের নিরক্ষতা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে (১৯৭৭), ওই সময়ে বাংলায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল

মাত্র শতকরা তিনভাগ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোনো গ্রামে হয়ত একটিমাত্র খবরের কাগজ যেত এবং সেটি একজন পড়তেন, অন্যরা শুনত।

পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যার স্বল্পতার আরেকটি কারণ ছিল ব্যয়বাহুল্য। ওই আমলে অন্যান্য খরচের তুলনায় মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ খুব একটা কম ছিল না। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় তো ছিলই। ঢাকা প্রকাশে ১৮৬৩ সালের এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, পাইকা টাইপে প্রতি ফর্মার মুদ্রণ খরচ ছিল ছয় টাকা। পল্লী বিজ্ঞান পত্রিকার মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯ টাকা ও ২২ টাকা ৬ আনা। অন্য দিকে ডাকমাশুলের ব্যয় ছিল ৪০ টাকা। সাধারণত একটি পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস তার প্রচার ও বিজ্ঞাপন। প্রচারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশের বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রায় থাকত- না বললেই চলে ব্যতিক্রম বেঙ্গল) (টাইমস। এ থেকে বাংলাদেশের শহর ও শহরকেন্দ্রিক ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে-, এর কোনোটিরই তখন বিকাশ ঘটেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার দাম কম হলে কাটতি বাড়ত। যেমন ঢাকার এক পয়সার দুটি কাগজ শুভসাধিনী ও হিতকরীর প্রচার সংখ্যা ছিল গড়ে ৫০০-কপি। কিন্তু গ্রাহক ৬০০/স্বল্পতা, জনগণের নিরক্ষরতা ও ক্রয়ক্ষমতার কারণে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সবসময় কাগজের দাম কমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদ সাময়িকপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ- করে মাত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদসাময়িকপত্রই - বিশেষ একটি দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সমর্থন করত। যেমন, ঢাকা নিউজ সমর্থন করত নীলকরদের; ঢাকা প্রকাশ প্রথমে ব্রাহ্ম এবং পরে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র ছিল; বঙ্গবন্ধু ছিল ব্রাহ্মদের মুখপত্র; গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বিরোধিতা করেছিল জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের; আবার বেঙ্গল টাইমস সমর্থন করত ইংরেজদের।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল প্রধানত রচনাভিত্তিক। অর্থাৎ ছোটখাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যেকোনো একটি সংবাদ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত ছাপা হতো। খবরের মধ্যে বেশির ভাগ থাকত স্থানীয় খবর, আর কিছু থাকত বিদেশী কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর। মাঝে মাঝে ছাপা হতো মফস্বল থেকে প্রেরিত পত্রিকার সংবাদপাঠকদে-; চিঠিপত্রের কলামও ছিল। সম্পাদকরা বিষয়ভিত্তিক রচনা বা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরতেন।

প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের নিজস্ব মতামত থাকত। তবে তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় বিষয় ছিল জমিদাররায়ত-, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সমাজসংস্কার-; ইংরেজ শাসন নিয়েও প্রায়শই মন্তব্য করা হতো। সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো; কারণ তখন সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম, হিন্দু বা মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। ইংরেজি পত্রিকাগুলি ছিল সংস্কারমূলক, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাই ছিল রক্ষণশীল, যা সেই সময়কার সামাজিক প্রবণতাকে তুলে ধরে। রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদীদের এই দ্বন্দ্বে শেষোক্তরা জয়লাভ করে, যদিও রক্ষণশীলদের পক্ষও কম শক্তিশালী ছিল না। এই পটভূমিকায়ই পূর্ববঙ্গের পত্রিকাগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল। এখানকার পত্রপত্রিকাসমূহের প্রধান বিষয় ছিল আঞ্চলিকতা, কৃষক, জমিদার, নীলকর, চাকর-, সিভিল সার্ভিস, শিক্ষা, সমাজসংস্কার-, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক।

৮.২.৭.৪ সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি

একথা অস্বীকার করা যায় না যে ,দেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক ,সাপ্তাহিক , পাক্ষিক ,মাসিক পত্রিকার সংখ্যা অগণিত ,এগুলো প্রকাশে আমাদের মাতৃভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে । কিন্তু সংবাদপত্রের ভাষায় নানাবিধ পরিবর্তন আসলেও সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারে কিছু নিয়ম রয়েছে, যার কারণে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের জন্য 'বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউট' প্রায় প্রতি বছরই সাংবাদিকদেরবিশেষপ্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে।

ক:শব্দেরসঠিকব্যবহার(

সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের জন্য সঠিক স্থানে সঠিক শব্দটি বসানো প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদের বসু বলেন- "ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বসানোতেই লেখকের বিশেষত্ব" (লেখার ইস্কুল(সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহৃত হলে ব্যবহৃত ভাষায় প্রাঞ্চলতা আসে।

'খ' বাহুল্যশব্দ প্রয়োগ :

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার হলো বাহুল্য দোষ। সংবাদপত্রকে যথাসম্ভব এই দোষ পরিহার করা উচিত, তা না হলে সংবাদটি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে । যেমন :

"উচ্ছেদ অভিযান টিমের উপস্থিতিতে দোকানীদের অবৈধ দোকান সরানোর চেষ্টা করবে দেখা গেলেও টিম চলে যাবার পরক্ষণেই পূর্বাবস্থা দেখা গেছে।" (দৈনিক ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ১৩(৯৭.৪. এর পরবর্তীতে যদি লেখা হতো, "উচ্ছেদ টিমের উপস্থিতিকালে অবৈধ দোকান সরানোতে দোকানীদের ব্যস্তভাবে দেখা গেলেও টিম চলে যাওয়া মাত্রই পূর্বাবস্থা দেখা গেছে।তবে ভাবটি আরো প্রাঞ্চল হতো।

"যে কথা বললেন পাঠকরা নিজেরাই" (প্রথম আলো,২০০৪ (; এটি লেখা যেত Ñযে কথা বললেন পাঠক নিজেরাই , বা যে কথা বললেন পাঠকরা নিজে ।

গ শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধতা :

সংবাদপত্র অনেকের জন্য ভাষা শিক্ষার প্রধান বাহন। তাই সাংবাদিকের শুদ্ধ শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সচেতন থাকা প্রয়োজন । তাই বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানানের নিয়ম ;প্রয়োজন।যেমন অনুসরন করা (১৯৯২)"এই প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন..."

কিন্তু শব্দটি হবে পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রেক্ষাপটে। সংবাদপত্রের পাতার এমন ভুল বানানের অনুপ্রবেশ পাঠকে পীড়া দেয় । " প্রথম আলো " - তে ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন জন্য পরিচ্ছতা কর্মীর ছবি ছেপেছে । চিত্র পরিচিতিতে লিখেছে ;পরিচ্ছন্ন কর্মী ।যা একটি ভুল শব্দ। এছাড়া ও বাংলা সংবাদপত্রে যে সকল শব্দের বানান সমূহ প্রায়ই ভুল ছাপানো হয়। তা হলো; মোহ্যমান,পঙক্তি, আকাঙ্ক্ষা, গণ্ডার,আবিষ্কার,

রূগণ ,উর্ধ্ব, বুদ্ধিজীবি, গড্ডলিকা, দুর্বিষহ, নিয়ন্ত্রণ পুরস্কার, পোশাক, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবসা, ব্যয়, ব্যর্থ বিদ্যুৎ, অত্যধিক ।

ঘ (সরল বাক্যের প্রয়োগ :

জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহার না করে ছোট ও সরল বাক্যের ব্যবহার অর্থকে সহজবোধ্য করে, ভাষাতে আসে গতিশীলতা। গবেষনায় দেখা গেছে, একেকটি বাক্যে পনেরটির বেশি শব্দ ব্যবহৃত হলে তা আর সহজবোধ্য থাকে না, এতে পাঠকের অসুবিধা হয়। উদাহরণ :

"আম বাংলাদেশের এমন জনপ্রিয় ফল যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছেও পছন্দসই খাবার হিসেবেবিবেচিত।" বাক্যটি হতে পারতো এমন-
"বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফল আম যা বিশ্বেও পছন্দসই খাবার হিসেবে বিবেচিত।"

ঙ (বাক্যের পদ বিন্যাস :

বাংলা বাক্যের প্রথমে কতৃপদও সর্বশেষ ক্রিয়াপদ বলে যা অনেক সময় সংবাদপত্রে অনুসৃত হয় না। যেমনপ্রথম আলো : জুন ২৮পত্রিকায় ,২০০৯ এ ছাপানো হয় "আকালে ঝরে গেল মেধাবী ছাত্রী নিতা" নিয়ম অনুসরনে বাক্যটি হওয়া প্রয়োজন ছিলো "মেধাবী ছাত্রী নিতা অকালে ঝরে গেল ।"

চ (বহুবচনের সঠিক প্রয়োগ :
বাংলায় আমরা এক সাথে একাধিক বহুবচন চিহ্নের ব্যবহার করি না। তাই সংবাদপত্র কখনো এমন শব্দ লেখা উচিত নয় যে, "পাঁচজন লোকেরা"

ছ (বিভক্তির প্রয়োগ :

বচনের পাশাপাশি বিভক্তির ব্যবহারেও সাংবাদিকের সচেতনতার প্রয়োজন। উদাহরণ ঃ "১০ জন ছাত্র বহিস্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছে" (দৈনিক খবর, ১৯ যেখানে বিভক্তির- (৮৭-০৯-ব্যবহারে ভুল হয়েছে যার কারণে বাক্যের অর্থ দ্যর্থবোধক মনে হয়। পুরো খবর পড়ে বোঝা যায় এখানে একটি অনুচ্চারিত কর্তা আছে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ জন ছাত্রকে বহিস্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জ (অর্থ: দ্বৈততা-

সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অর্থ দ্বৈততা। "অসাংবিধানিক পত্রিকায় নির্বাচিত সরকারকে সরানো যাবে নাঃ প্রধানমন্ত্র ী"(ইত্তোফাক, ১১ এপ্রিল,২০০৮(এই শিরোনামে ভাবের ও অর্থের অসম্পূর্ণ বিদ্যমান। সংবাদটি হওয়া প্রয়োজন ছিলো :
"নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সরানো যাবে না।"
যথাযথ শব্দ প্রয়োগ না করলেও বাক্যের অর্থ বিপর্যক ঘটে। যেমন:
"যৌতুকের টাকা না পেয়ে পাষান্ড স্বামীর স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা।" (ইত্তোফাক ১১, এপ্রিল, ২০০৮(

-এই শিরোনামে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যার বিষয়টি প্রথমেই স্পষ্ট নয়।

ঝ (শব্দ:পুনিকতা :প্রত্যয় ব্যবহারের পৌন/

সুন্দর ও গতিশীল গদ্য সংবাদপত্রের প্রাণ। আর এই সৌন্দর্য ও গতিশীলতা নিকতা বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। যেমন: "কিন্তু তার আগেই দেশজুড়ে চলছে একুশে কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠান। দিন দিনই বাড়ছে এই অনুষ্ঠান । সোমবার হরতালের দিনও অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী সব জায়গাতেই হয়েছে অনুষ্ঠান। শহীদ মিনারকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জনকণ্ঠ), ১৫,ফেব্র"য়ারী, ২০০৫(এই সংবাদে অনুষ্ঠান শব্দটি সাত স্থানে ধ্বনিজাত হয়েছে যা অত্যন্ত শ্র"তিকটু ও পঠন কষ্টসাধ্য ।

ঞ (একাধিক বিশেষণ :

যথেচ্ছ বিশেষণ ব্যবহার প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা কমায় । "সাবেক স্বৈরশাসক", 'দুর্নীতিবাজ' , 'সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ' ইত্যাদি আরো অনেক বিশেষণ এক সাথে পাঠকের সাথে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই বিশেষণ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ট (পরিভাষার ব্যবহার :

বিদেশী সংবাদসমূহ আমরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পাই। এই সংবাদ অনুবাদ করে লেখার সময় বিদেশী বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের প্রতি দুর্বলতা সংবাদপত্রের লেখকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ঐ বিদেশী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে তা ব্যবহার করা উচিৎ। যেমন, সিডর শব্দটি ব্যবহারের আগে যেমন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; তেমনি সুনামি, আইলা এ সব শব্দ ব্যবহারের শুরুতে তার ব্যাখ্যা প্রদত্ত করা হয়েছে ।এছাড়া প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্ট, আইটেম,কমান্ডো, গার্মেন্টস, টিম, ডায়রিয়া, প্রাইভেটকার, ফ্যাক্টরী, ভিসি, ব্রিজ, মার্কেট, রিলিফ, শোকজ-, নোটিশ, সাবলেট এসব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা । এসব শব্দ বাংলা শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তবে অপ্রচলিত বিদেশি শব্দ ব্যবহারের আগে তার ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যক।

ঠ (যতি ও বিরামচিহ্ন :

লেখার সময় আরেকটি বিষয়ে বাংলা সংবাপত্রে বিশেষ নজর দেয়া উচিত তাহলো যতি চিহ্ন বিরামচিহ্ন। সোজা বাংলায়/ "থামবার সংকেত" ;যেখানে থামার দরকার সেখানে যদি তা না হয় তাহলে যেমন শ্রুতিমধুর হয় না, তেমনি যেখানে বিরামচিহ্নের প্রয়োজন সেখানে তা না দেয়া হলে বা ভুল দেয়া হলে পাঠক অসুবিধায় পড়েন। তাই সাংবাদিকদের বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করা প্রয়োজন। উদাহরণ-: "মেয়েরা স্বাধীন তবে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় :" (বাংলা, ২১(৮৭-৮- এখানে ভুল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে হবেমেয়েরা স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। -

ড (জার্নালিজ শব্দ :

সংবাদপত্রে কিছু শব্দ ব্যবহার করতে করতে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এগুলোকে জার্নালিজ শব্দ বলে। এরকমই লিখতে লিখতে

কিছু বানান আমরা চালু করে ফেলি এবং বলি , “যা চালু তাই শুদ্ধ” ; যেমনফলশ্রুতি :, পদক্ষেপ, সহসা, ইতিমধ্যে, পৃথকীকরণ , বক্তব্য রাখেন, উদ্বেগ প্রকাশ, তৎপরতা, আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আইনের চোখকে ফাঁকি দেয়া ইত্যাদি । এসব শব্দের ব্যবহার পরিহার করলে সংবাদপত্রের ভাষা আরো শ্রুতিমধুর হয়।

ঢ (ব্যক্তি: বইয়ের নাম/
কোন বিখ্যাত মানুষের নাম, বইয়ের নাম লেখার সময় সচেতনতা ও সতর্কতা জরুরি, যেমনতলস্তয়/রুশ লেখক টলস্তয় :, গ্রীক নাটক ইডিপাসএ্যাডিওপাস ইত্যাদি ভিন্ন বানানে দেয়া যায় কারণ এগুলো/অদিউপাস/ বিদেশী ভাষার শব্দ। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরে বইরে’ , নজরুল ইসলাামের ‘অগ্নিবীনা’ ইত্যাদি গ্রন্থনামে হাইফেন ব্যবহার আবশ্যক। দৈনিক প্রথম আলো ফেব্র ২০সালের ২০০৬)“য়ারি : ছাপায় (
“ ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্র“য়ারি রাতে ছাত্রদের মনোভাব বুঝতে পেরে কমিনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সার এসেছিলেন মেডিকেল হোস্টেলে ।”
কিন্তু এখানে শহীদুল্লা নামটির ব্যবহার ভুল হয়েছে ।

ণ (সাহিত্যের ভাষা ও সংবাদপত্রের ভাষার মধ্যে পার্থক্য :

সংবাদপত্রের ভাষা আলোচনায় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলো, সংবাদপত্রের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এক নয়। প্রথম চৌধুরীর মতে :“ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়” (নিরীক্ষা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা(২৯ :
বর্তমানে কিছু সংবাদপত্রে গদ্য স্টাইলে নতুন ধারা এসেছে কিন্তু গুরু সংবাদের ক্ষেত্রে তা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। সাহিত্যের ভাষা কাব্যিক, তথ্য ভিত্তিক বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষনাত্মক হতে পারে। কিন্তু সংবাদের ভাষা অবশ্যই তথ্য ভিত্তিক হবে। তবে বর্তমানে ফিচার ধর্মী সংবাদগুলো বিশ্লেষণাত্মক।

ত (শিরোনাম কৌশল :

শিরোনাম হলো সম্পূর্ণ ঘটনার সার সংক্ষেপ। তাই সাংবাদিককে শিরোনাম নির্ধারনে সতর্কতা-অবলম্বন করা প্রয়োজন। বেশ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছাপানো হলে ঃ
“ইটালী মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান।” (দৈনিক বাংলা, ২(৮৭-৯-

যা একটি ভুল শিরোনাম , হওয়া প্রয়োজন ছিল :চ্যাম্পিয়ান। আবার অনেক সময় থাকে যে ইটালীয় মেয়েরা - “পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ”- শিরোনাম হিসেবে এটি চমৎকার হলেও ব্যাকরণবিদগণ মনে করেন; “খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে”- এই শিরোনামই সঠিক। তবে শিরোনামে কম শব্দে মূল ভাবটি প্রকাশ পেলে এবং তা পাঠককে আকৃষ্ট করলে তা হবে যথার্থ শিরোনাম।

থ (অনুবাদ প্রসঙ্গ :

বিশ্বায়নের এই যুগে আমরা অনেক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম হতে সংবাদ সংগ্রহ করি, যা আমাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই প্রাপ্ত সংবাদগুলো বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় রচিত। ইংরেজি ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদের সময়

সতর্কতার প্রয়োজন। কখনো কখনো সাংবাদিকরা ইংরেজির ধাঁচে বাংলা লেখে যার কারণে বিভ্রান্তি বেড়ে যায়। যেমন : "রোববার এখানে ফাইনেলে ইটালি ৯৭পয়েন্টে চীনকে হারিয়ে ফরাসি উন্মুক্ত মহিলা বাস্কেট বলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ৮৯-"

যা অতি বিভ্রান্তিকর সংবাদ, এটা অনুবাদের সমস্যা। ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি ও অন্বয় অক্ষুন্ন রেখে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বলে সংবাদটি অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। তাই অনুবাদের সময় লেখা পড়ে বুঝে নিয়ে তা কিভাবে বাংলায় প্রকাশ সম্ভব তা ঠিক করে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৮.২.৭.৫ মূল্যায়ন

লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সংবাদপত্রে ,তাই ভাষার গতিপ্রকৃতি নির্ধারনে সংবাদপত্র বিশাল - ভূমিকা পালন করে । তবে আবুল কাসেম ফজলুল হক এর মতে, "সন্দর্ভ , প্রবন্ধ ,রচনা ,কবিতা , গল্প , উপন্যাস ,নাটক, সম্পাদকীয় , উপসম্পাদকীয়-, সংবাদ সব ধরনের লেখাতেই বেশকিছু ভাষাগত সমস্যা আছে যা সকল লেখককেই মোকাবিলা করতে হয় । এতে লেখকদের অনেক চিন্তাশক্তি ও শ্রম ব্যয় হয় । বাংলা ভাষার মূল উপাদানগুলোকে কেন্দ্র করে আসে হয় এ সমস্যা । সমস্যাকে কেন্দ্র করে আসে ভাষাগত জটিলতা ও ত্র"টিবিচ্যুতি । সমস্যার ও ত্র"টি বিচ্যুতির রূপ সবচেয়ে প্রকট সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতে।-" কিন্তু বাংলা ভাষার স্বার্থ রক্ষায় সংবাদপত্রের ভাষাকে হওয়া উচিত নির্ভুল ও নির্ভেজাল। সংবাদপত্রের ভাষা নিয়ে গুনীজনের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রকাশনা উৎসব হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, যেখানে তৎকালীন সংবাদপত্র "দৈনিক বাংলা"-র সম্পাদক সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন বলেছিলেন ; "সংবাদ পৌছানোর পদ্ধতি খুব সরাসরি, খুব প্রাঞ্চল ও মানুষকে চট করে ধরবে এরকম হওয়া প্রয়োজন এবং সেরকম একটা নিরাভরন গদ্য যদি আমরা এখানে তৈরি করতে পারি তাহলে মানুষের সাথে সংবাদপত্রের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে হবে বলে আমি মনে করি এবং এ গদ্য তৈরী করার প্রয়োজন আছে।" তাই সংবাদপত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের আগে তার উপযুক্তশিক্ষা, সচেতনতা এবং ব্যবহার বা প্রয়োগ অভিজ্ঞতা ভূলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি দূর করতে পারে।

৮.২.৭.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করো।
২. পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।
৩. সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।
৪. বাংলা ভাষার আগ্রগতিতে পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

৮.২.৭.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১.সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র - (খন্ড ৫)বিনয় ঘোষ
২. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র : আনিসুজ্জামান।

৩ .বাংলা সাময়িকপত্র - (খন্ড ২)ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪ .বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। -

একক ৮
সম্প্রচারের ভাষা

বিন্যাসক্রম

৮.২.৮.১ ভূমিকা
৮.২.৮.২ সম্প্রচারের স্বরূপ
৮.২.৮.৩ সামাজিক মাধ্যমে বাংলা ভাষা
৮.২.৮.৩.১ ব্যাকরণ
৮.২.৮.৩.২ নিরপেক্ষ ভাষা
৮.২.৮.৩.৩ সহজ ভাষা
৮.২.৮.৩.৪ অনুবাদ
৮.২.৮.৪ উপসংহার

৮.২.৮.১ ভূমিকা

সম্প্রচার মাধ্যম যা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নামে পরিচিত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের তথ্যাবলী প্রেরণ করে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও বা বেতার, সিডি, ডিভিডি এবং অন্যান্য সুবিধাজনক ছোট ও সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমনঃ ক্যামেরা বা ভিডিওচিত্রের সাহায্যে ধারণ করা হয়। পাশাপাশি মুদ্রিত মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র, সাময়িকী, ব্রোশিওর, নিউজলেটার, বই, লিফলেট, পাম্পলেটে বাহ্য বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। এতে ফটোগ্রাফী বা স্থিরচিত্রও দৃশ্যমান উপস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। টেলিভিশন কেন্দ্রে অথবা পাবলিশিং কোম্পানী গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে সংগঠনরূপে আধুনিক প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে থাকে। মোবাইল বা সেল ফোন, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটকেও অনেক সময় নতুন-যুগের গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্টারনেট স্বীয় ক্ষমতাবলে ইতোমধ্যেই অন্যতম গণমাধ্যম হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ মাধ্যমে অনেক প্রকার সেবা - বিশেষ করে ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ব্লগিং, ইন্টারনেট এবং টেলিভিশনের প্রচারকার্য পরিচালনা করছে। এ কারণে অনেক গণমাধ্যমের পদচারণা ওয়েব সাইটে দেখা যায়। টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্রকে ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে কিংবা খেলাধূলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদেরকে তাদের ওয়েবসাইট দেখতে উদ্বুদ্ধকরণে

ঠিকানা প্রকাশ করে। বাইরের মাধ্যম হিসেবে বিলবোর্ড, সাইন, প্লাকার্ডকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবনের ভিতরে ও বাইরে যেখানে অধিক দোকান-পাট/বাসের ব্যস্তমূখর পরিবেশে উপস্থাপন করা হয়। জনসভা এবং বিশেষ ঘটনায় সমবেত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানও গণমাধ্যমের একটি ধরন।

৮.২.৮.২ সম্প্রচারের স্বরূপ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গণমাধ্যমকে প্রধান ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো - **বই, সংবাদপত্র, সাময়িকী, ধারণ যন্ত্র, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট**। বিংশ শতকের শেষ এবং একবিংশ শতকের শুরুতে গণমাধ্যমের প্রকারভেদ নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, গণমাধ্যমের বিভাজন সুস্পষ্টভাবে আরও বৃদ্ধি পাবে। **ইতোমধ্যেই সেল ফোন, ভিডিও গেম এবং কম্পিউটার গেমসকে গণমাধ্যম** হিসেবে উপস্থাপনা করায় বিতর্ক চলছে। বিংশ শতাব্দীতে *সেভেন মাস মিডিয়া* নামে গণমাধ্যম পরিচিত ছিল। সে ধারায় বর্তমান ৭টি গণমাধ্যম হলো -

1. মুদ্রিত (বই, পাম্পলেট বা ক্ষুদ্র পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি) মাধ্যম যা পঞ্চদশ শতক থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।
2. ধারণ যন্ত্র বা রেকর্ডিং (গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাগনেটিক ট্যাপ, ক্যাসেট, কার্ট্রিজ, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি) মাধ্যম যা ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে প্রচলিত।
3. সিনেমা যা ঊনবিংশ শতক থেকে প্রচলিত।
4. রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে যা ১৯১০ সাল থেকে প্রচলিত।
5. টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা যা ১৯৫০ সাল থেকে প্রচলিত।
6. ইন্টারনেট ব্যবস্থা যা ১৯৯০ সাল থেকে প্রচলিত।
7. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যা ২০০০ সাল থেকে গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রত্যেকটি গণমাধ্যমই তাদের স্বতন্ত্রতা, সৃষ্টিশীলতা, প্রযুক্তিকৌশলসহ নিজস্ব ব্যবসায়িক গুরুত্ব ও আবেদন প্রয়োগ করেছে। যেমন: ইন্টারনেট ব্যবস্থায় ওয়েবসাইট, ব্লগ, পডকাস্টসহ আরো নানাবিধ প্রযুক্তিকৌশল প্রয়োগ করায় সাধারণভাবে নেটওয়ার্কিং জগতে শীর্ষস্থান দখল করেছে।

৬ষ্ঠ এবং ৭ম মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট এবং মোবাইলকে প্রায়শঃই ডিজিটাল মিডিয়ারূপে আখ্যায়িত করা হয়। ৪র্থ এবং ৫ম মাধ্যম হিসেবে যথাক্রমে রেডিও ও টেলিভিশনকে ব্রডকাস্ট মিডিয়া বা সম্প্রচার মাধ্যমরূপে বিবেচিত। কেউ কেউ ভিডিও গেমসকেও গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছেন।

৮.২.৮.৩ সামাজিক মাধ্যমে বাংলা ভাষা

সামাজিক মাধ্যমের ভাষায় এখন প্রায়শই ইংরেজি সহ বিভিন্ন বিদেশি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষাও ব্যবহার হচ্ছে অন্যভাবে। সামাজিক মাধ্যম এখন গোটা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক মাধ্যমে বাংলা এখন আর শুধু কথ্য ভাষার গণ্ডিতেই নেই, এখন তা অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষার পর্যায়েও চলে গেছে। ইংরেজি, এমনকী অন্যান্য বিদেশি শব্দও ঢুকে পড়েছে বাংলায়। সাংবাদিকদের এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত?

তারা কি এসব নতুন শব্দকে তাদের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করবেন নাকি এসব শব্দ বাংলায় অনুবাদ করে তা ব্যবহার করবেন?

অধিকাংশ সম্প্রচারকগণের মতে বাংলার অনলাইন, রেডিও সম্প্রচার বা সামাজিক মাধ্যম সবই বাংলা ভাষায়, তাই এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বাংলাতে লেখাই ভাল।

“তবে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ আছে, যেগুলো বহুল প্রচলিত, যেগুলো চলে আসছে। সেরকম শব্দের ব্যবহার আমরা সামাজিক মাধ্যমে ‘অ্যালাউ’ করছি।”

আসল কথা হল, সামাজিক মাধ্যমে কিছু লেখার ক্ষেত্রে যেটা বিবেচনায় নিতে হবে সেটা হল, মানুষ কীধরনের ইংরেজি শব্দ সহজে গ্রহণ করতে পারবে। যেসব শব্দ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাষার অংশ নয়, সেসব শব্দ সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

৮.২.৮.৩.১ ব্যাকরণ

যারা অনলাইনের জন্য সাংবাদিকতা করেন নির্ভুলভাবে খবর পৌঁছে দেবার জন্য তাদের ব্যাকরণের জ্ঞান যেমন জরুরি, তেমনই রেডিওতে যারা সাংবাদিকতা করেন ব্যাকরণের অনেক বিধি তাদের কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক ব্যাকরণের ব্যবহার সংবাদের সঠিক পরিবেশনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। লেখার জন্য কাল, ক্রিয়া, যতিচিহ্ন, প্রশ্নবোধক বাক্য এবং কারো উক্তির ব্যবহার এগুলো খবর সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ,

তেমনই রেডিওতেও কীভাবে বাক্য গঠন করছেন, কীভাবে তা বলছেন তা জরুরি। বিবিসি বাংলার প্রযোজক মিজানুর রহমান খান বলছেন কেন ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান সাংবাদিকতার জন্য অত্যাবশ্যক।

অনেক সময় মনে হতে পারে বেতার সাংবাদিকতার জন্য ব্যাকরণ না জানলেও চলে । কিন্তু কথা বলার সময়ও কীভাবে বাক্য তৈরি করবেন, বলার সময় কোন্ শব্দের ওপর জোর দেবেন তা জানলে আপনি শ্রোতাকে আপনার পাশে রাখতে পারবেন।

“ধরুন কোনো মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। আপনার প্রশ্ন করার ভঙ্গী অর্থাৎ ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেবে আপনি তার কাছে কিছু জানতে চাইছেন কীনা অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্নকে আপনার কণ্ঠে নিয়ে আসতে হবে।”

মূল কথা, ব্যাকরণ ঠিক থাকলে কোনো খবর সহজ করে পড়া যায়, বলা যায় এবং তা মানুষের কাছে বোধগম্য ও নির্ভুলভাবে পৌঁছে দেয়া যায়।

ইংরেজি আর বাংলা দুই ভাষার ব্যাকরণ আলাদা। ইংরেজিতে যেভাবে বাক্যগঠন করা হয়, বাংলায় সেভাবে আমরা বাক্য গঠন করি না। কাজেই বাক্য গঠন, বাক্যরীতি, বাক্যের কাঠামো, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার এবং ইংরেজি ইডিয়াম বা ‘শব্দবন্ধ’ বাংলায় ভাষান্তরের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো জানাও অনুবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এক কথায় নির্ভুল ও নিখুঁত অনুবাদের জন্য ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই পুরোপুরি দখল থাকাটা খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিশেষত এফএম রেডিও ও বেসরকারি টেলিভিশনে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলায় উদ্বেগ জানিয়ে লিখেছিলেন, ভাষাদূষণ হচ্ছে প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে: উচ্চারণে ও শব্দব্যবহারে।

এই অভিযোগ অনেকদিনের। কারও কারও অভিমত এমন যে, এসব দূষণ ঠেকাতে দেশে একটি ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বেতার বা টেলিভিশনে আমরা যে বাক্য লিখি বা বলি তা যে ভাষায় কবিতা বা সাহিত্য লেখা হয়, যে ভাষায় সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লেখা হয়, সেই ভাষা নয়। সম্প্রচার সাংবাদিকতার সময় এই ভাষা এড়িয়ে চলতে হয়, কারণ ওই ভাষা এই ধরনের সংবাদমাধ্যমে প্রয়োগ করলে দর্শক বা শ্রোতা বুঝবেনা। কঠিন ও জটিল ভাষা প্রয়োগ হলে তা সাধারণত জনমানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। আমরা বলি আমাদের ভাষা একদম আলাপের ভাষা, তবে ব্যাকরণে সিদ্ধ। সহজ করে বলা, কিন্তু ব্যাকরণের বাইরে গিয়ে নয়।

বাংলাদেশের সম্প্রচার জগতে গত দুই দশকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্প্রচার জগত বলতে ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার। একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে বেসরকারি সম্প্রচার জগতের যে যাত্রা শুরু হয় তা এখন অনেক বিকশিত। আমাদের জনগণ ব্যাপক হারে ভারতীয় চ্যানেল দেখে। তবুও, বাংলা অনুষ্ঠান, সিনেমা, নাটক ও সংবাদ সম্প্রচার দেখতে আমাদের চ্যানেল তাদের পছন্দ। বর্তমানে

আছে তিরিশটিরও বেশি চ্যানেল। আছে অনেকগুলো এফএম রেডিও। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশে আমাদের চ্যানেলগুলো সম্প্রচারিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে লন্ডনে কয়েকটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮.২.৮.৩.২ নিরপেক্ষ ভাষা

খবর ও বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে করার পাশাপাশি সংবাদের ভাষা নিরপেক্ষ হওয়াও অত্যাবশ্যক। খবরের ভাষা নিরপেক্ষ না হলে যে খবরটি প্রচার করছেন তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নিরপেক্ষ এবং নির্ভুল সংবাদ প্রচার বিবিসির নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার মূল স্তম্ভ। সাংবাদিকতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে ভাষার ব্যবহার। কাজেই নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের জন্য প্রতিটা শব্দ ব্যবহারের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

বেশ কিছু শব্দ যেমন 'ইসলামী রাজনীতি', 'ইসলামপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠি', ইসলামী মৌলবাদ এগুলোর ব্যবহার নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে বিচার করতে হবে।

"শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহারের কারণে আমরা আমাদের নিরপেক্ষতা হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না।"

ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে উপাধি যোগ করা যা বিশেষণ ব্যবহারের সমতুল্য, অথবা কোনো ঘটনার বর্ণনায় 'বিশাল' 'ব্যাপক' এধরনের বিশেষণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই উচিত। কারণ কোন কিছুর বিশালতা, ব্যাপ্তি, বা ভয়াবহতা ঘটনার রিপোর্টেই বেরিয়ে আসবে, তার জন্য বিশেষণের অলংকার ব্যবহার গোটা খবরের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করতে পারে।

৮.২.৮.৩.৩ সহজ ভাষা

রেডিওতে মানুষ খবর শুনবে একবারই। ভাষা কঠিন ও প্যাঁচানো হলে একবার শুনে সে খবর বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অনলাইন আর টেলিভিশনেও একই কথা প্রযোজ্য।.

বিবিসির অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক থেকে শুরু করে গৃহিণী সবাই। কাজেই সব মাধ্যমে সবার কাছে সহজে পৌঁছনর একমাত্র উপায় হল রিপোর্টে সহজ ভাষার ব্যবহার।

বিবিসি বাংলার সম্পাদক সাবির মুস্তাফা বলছেন প্রতিবেদন তা সে বেতার, টিভি বা অনলাইনের জন্য হোক্, সহজ এবং সোজাসুজি ভাষা ব্যবহার করলে তা শ্রোতা, দর্শক বা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হবে।

“আমরা সবসময় বলি একে অপরের সাথে আমরা যেভাবে আলাপচারিতা করি- কথ্য ভাষায়- সেই ভাষায় আমরা যেন রেডিও, টেলিভিশন এবং অনলাইনের স্ক্রিপ্ট লিখি।”

তিনি বলছেন যে ভাষায় কবিতা বা সাহিত্য লেখা হয়, যে ভাষায় সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লেখা হয়, সেই ভাষা আমরা সাংবাদিকতার সময় এড়িয়ে চলি, কারণ ওই ভাষা এইধরনের সংবাদমাধ্যমে কাজ করবে না।

কঠিন ও জটিল ভাষায় লিখলে তা সাধারণত জনমানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

৮.২.৮.৩.৪ অনুবাদ

সংবাদ অনুবাদের ক্ষেত্রে সময়ের চাপ, খবর মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাওয়ার চাপ, এগুলো সামলে নির্ভুল অনুবাদ করাটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। একইসঙ্গে ভাষা ও ব্যাকরণগত নানা জটিলতার দিকে খেয়াল রাখাও জরুরি।

দিনের খবরগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে, সেগুলোর প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা খবর দ্রুত ও নির্ভুলভাবে অনুবাদ করার জন্য সহায়ক হতে পারে।

অনেক সময় খবর শেষ মুহূর্তে খুব দ্রুত বদলাতে পারে। বুলেটিনে যেহেতু এমন কিছু খবর থাকে যেগুলো সম্প্রচারের আগে বদলানোর সম্ভাবনা কম অথবা কোনো হাল্কা খবর যদি থাকে, তাহলে সেগুলো আগে অনুবাদ করে ফেললে শেষ মুহূর্তের চাপ কমানো সম্ভব হয়।

অনুবাদের সময় সংবাদ কতটা অর্থবহ হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট পত্রিকা সম্পাদকের মতে “আপনি মূল খবরটা পুরোটা – প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগে একবার পড়ে নিন। পুরো খবরটা পড়ে নিলে আপনার কাছে খবরটা বুঝতে সুবিধে হবে।”

খবর অন্যকে বোঝানোর জন্য আগে তা নিজে বোঝা খুব দরকার। এছাড়াও অনুবাদের ভাষা হওয়া উচিত প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য । ছোট বাক্য মানুষের কাছে খবর সহজে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও অপ্রয়োজনীয় কোন্ তথ্য আপনি বাদ দিতে পারেন বা শ্রোতার বোঝার জন্য খবরের কোন্ অংশ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন সেগুলোও মাথায় রাখতে হবে।

৮.২.৮.৪ উপসংহার

পৃথিবী জুড়ে রকমারি কাণ্ডকারখানা ঘটছে, বিজ্ঞান ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসরমাণ, নিত্য-নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের সূত্রে অনেক নতুন নতুন শব্দের ভিড়। বাংলাও ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ভূমিকায়। প্রতিনিয়তই অনেক নতুন বিদেশি শব্দের মুখোমুখি হচ্ছি। সেই ভাষা কতটুকু প্রয়োগ করব নিজের ভাষার সাথে সে এক বড় জিজ্ঞাসা। কিন্তু ভাষা ব্যবহারে সম্প্রচার মাধ্যমের কর্মীদের অসাবধানতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আছে। আলাপের ভাষা ব্যবহার করতে হয়, সহজ করে বলতে হয়, কিন্তু ঠিক করে বলতে হবে। এই চ্যালেঞ্জটা একজন সম্প্রচার মাধ্যমের কর্মীর প্রতিদিনের। মুখের ভাষা আর লেখার ভাষা প্রায়ই একরকম হয় না। সম্প্রচার মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি মনে রাখা লাগে তাহলো সহজ করে বলা যেন যারা শুনছে বা দেখছে, তারা যে শ্রেণিরই হোক, যে শিক্ষাগত যোগ্যতাই থাকুক, যেন বুঝতে পারে। দ্রুত সহজ করে বলতে হবে বিধায় সবকিছুই করতে হয় একদম সংক্ষেপে। বাক্য আর শব্দ, সবই শোনার জন্য, তাই আলাপের মত করে লিখতে হয় যেন বলতে সুবিধা হয়।

গত দশকে সম্প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক বিকাশের সাথে সাথে এই মাধ্যমে উচ্চারিত ভাষা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে বেসরকারি এফএম রেডিওগুলোর আরজে নামের উপস্থাপকরা যে উচ্চারণে, যে টানে বাংলা বলেন তা ঠিক বাংলা ভাষা নয়। কিছু কিছু টেলিভিশন অনুষ্ঠানেও সেই ভাষা প্রয়োগ হতে দেখছি। যারা এটি করছেন বা এই টানকে গ্রহণ করছেন, তারা হয়তো বলবেন তারা নতুন একটি ভাষা নির্মাণের চেষ্টা করছেন। তারা হয়তো বলবেন এটি নাগরিক জীবনের ভাষা। বিতর্ক না করে শুধু এটুকুই বলা যে, ভাষা এগোবে, এগিয়ে যাবে, তবে তার শুদ্ধ রূপ নিশ্চয়ই হারিয়ে যাবেনা।

সম্প্রচার মাধ্যমে প্রমিত বাংলার চর্চা একটু কঠিনই হয়ে যায় অভ্যাস না থাকলে, কারণ এই মাধ্যমে সংবাদ বা যেকোন তথ্য মুখে বলতে হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা দর্শক বা শ্রোতার সামনে নিয়ে আসতে হয়। এই তাৎক্ষণিকতায় শুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতেই হয়, সম্প্রচার মাধ্যমে শুদ্ধতার কোন বিকল্প নেই।

গণমাধ্যম অনেক বেশি মানুষের দোরগোড়ায়। তাই এর ভাষা অবশ্যই প্রভাব ফেলছে মানুষের কথা বলায়। অনেকের সাথে একমত হয়েই বলতে হচ্ছে প্রকৃতির মত ভাষা বদলাবে ঠিকই, তবে তার মধ্যেও একটা স্বাভাবিকতা থাকতে হবে। ভাষার পথ চলাটি যেন মানুষকে, সমাজের অনেকদিন ধরে চলা উচ্চারণকে আঘাত না করে। সম্প্রচার মাধ্যম গণমানুষের মুখের কথাই বলে, তবে শুদ্ধতার সাথে। মানুষকে তথ্য আর বিনোদন দিয়ে দিয়ে সম্পচার মাধ্যম হয়ে উঠছে মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম অংশ এখন।

যেহেতু সংখ্যায় বেড়েছে, তাই মানুষের কথা বলায় এর প্রভাবও পড়ছে অনেক। তাই আমাদের সম্পচার মাধ্যম নিজস্ব সংস্কৃতি জেনে বোঝে ভাষার ব্যবহার করবে এটা প্রত্যাশিত। জগাখিচুড়ি বা শঙ্কর ভাষা আমরা

শুনতে চাইনা সম্প্রচার মাধ্যমে। আইতাছি, যাইতাছি বলে যে ভাষা ব্যবহার করে একটা ভাষা তৈরি করলেন কিছু নাট্যকার, তারা সেই ভাষা সাধারণ মানুষ থেকে নেননি। ইচ্ছে মতো তৈরি করা সেই ভাষা আজ চেপে বসেছে সমাজে।

আমাদের সম্প্রচার মাধ্যমে সবচেয়ে খারাপ ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞাপনে আর কিছু কমেডি নাটকে। প্রমিত, আঞ্চলিক, দেশি, বিদেশি সব এক করে যা উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিদিন তা এক কথায় অতি নিম্নমানের ভাষা।

আমরা নিশ্চয়ই বিদেশি ভাষা শিখব, তবে প্রাণের ভাষা মাতৃভাষা বাংলাকে আমাদের বিকাশ আর উন্নয়নের ভাষা হিসেবে সাথে করে এগুতে চাই। সম্পোচার মাধ্যম দ্রুততার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাই এখানে সম্প্রচার মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারে যত্নবান না হলে ভাষার সৌন্দর্য হারায়। শুদ্ধতার মাধ্যমে শুদ্ধ থাকাটাই প্রত্যাশিত

পর্যায় গ্রন্থ : ৩
একক : ৯
বিজ্ঞাপনের ভাষা

বিন্যাসক্রম

৮.৩.৯.১ ভূমিকা

৮.৩.৯.২ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম

৮.৩.৯.৩ বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৮.৩.৯.৪ বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

৮.৩.৯.৫ বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপন

৮.৩.৯.৬ বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮.৩.৯.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.৯.৮ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৩.৭.১ ভূমিকা

ইংরেজি শব্দ Advertising এর বাংলা অর্থ বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন একটি Marketing বা বিপণন কৌশল যা যেকোন পণ্য বা সেবা সম্ভাব্য গ্রাহকের নিকট প্রচার করার মাধ্যম। প্রচারমূলক বার্তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য হল এমন ব্যক্তিদের কাছে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য পৌঁছানো যার ফলে সম্ভাব্য গ্রাহকশ্রেণি তৈরী হয়। বিজ্ঞাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য পণ্য বা সেবা সম্পর্কে জানান দেওয়া ও গ্রাহকের চাহিদাকে বৃদ্ধি করা।তাই বলা যায় যে, বিজ্ঞাপন একটি পণ্য বা সেবার সাথে ব্যবহারকারীদের যোগাযোগ মাধ্যম।রোজকার সংবাদ পত্র খুললেই আমাদের চোখে নানা রঙের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। প্রচারেই প্রসার এই কথাকে সামনে রেখে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দেখা যায় মিডিয়ায়। বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা চলছে, কার আগে কে টিকে থাকবে। তাই কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। হোক সে বিজ্ঞাপনটি সুশ্রী বা কুশ্রী, পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয়, ভাল বা মন্দ, শিক্ষণীয় বা বর্জনীয়, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক।

সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, কোল্ড ড্রিংক্স-হট ড্রিংক্স, শাড়ি-কাপড়, জমি-জমা, কাগজ-কলম, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, টয়লেট ক্লিনার-বডি ক্লিনার, আলতা-স্নো, প্লাস্টিক-রড; এমন কোনো জিনিস নেই যেটার বিজ্ঞাপন দেয়া হয় না। এমনকি পত্রিকার বিশেষ কিছু পাতা খুললে বর-কনের বিজ্ঞাপন ও চোখে পড়ে। পাত্র চাই/পাত্রী চাই শিরোনামে নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করে দেয়া হয় পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক ও শারীরিক গঠনের বিবরণ।

৮.৩.৯.২ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের সব থেকে বড় ও প্রচলিত মাধ্যম টেলিভিশন। সাধারণত বড় বড় কোম্পানি টেলিভিশনকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়ে থাকে। ব্যয় বহুল মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন বড় অনুষ্ঠান আয়োজন, স্পোর্টস টিমস্পন্সরশীপ পরিচিত। তাছাড়া যেসব মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা নিম্নরূপ:

অনলাইন বিজ্ঞাপন মাধ্যম-ফেসবুক, গুগল, টুইটার, সহ সোসাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ব্যানার এড ইত্যাদি বেশ পরিচিত। তাছাড়ও আরো যেসব মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় তা হলো, মিডিয়া ডট কম, টেবুলা ডট কম, এমজিইড ডট কম ইত্যাদি। আমাদের দেশের পেক্ষাপটে গুগল এড ওয়াড ও ফেসবুক বেশ কার্যকারী।
অফলাইন বিজ্ঞাপন মাধ্যম- নিউজপেপার, বিলবোড, দেওয়াল পোস্টার, লিফলেট, মাইকিং ইত্যাদি প্রচলিত। উদাহরণ, কোরবানির পশুর হাটের মাইকিং এক ধরনের অফলাইন

বিজ্ঞাপন কখন কোথায় কিভাবে দেওয়া হবে তা নির্ভর করে গ্রাহক ও পণ্যের চাহিদার উপর। যেমন বিটিভিতে সাধারনত টিনের বিজ্ঞাপন দেখা গেলেও অন্য মাধ্যমে টিনের বিজ্ঞাপন খুব কমই চোখে পড়ে। আবার চালডাল ডট কম বা দারাজের বিজ্ঞাপন ফেসবুক বা গুগলে বেশি দেখা যায় যা বি টিভিতে দেখা যায় না।মূলকথা গ্রাহক শ্রেণি যে মাধ্যম ব্যবহার করে তার সাথে পণ্যের মিল রেখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

৮.৩.৯.৩ বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিভিন্ন সূত্র থেকে যায় যে, মিশরীয়রা প্রথম দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে বিজ্ঞাপনের যাএা শুরু করে। ইংল্যান্ডের থমাস জেবারটাকে "আধুনিক বিজ্ঞাপনের পিতা" বলা হয়ে থাকে। PearsSoap নামে একটি কোম্পানি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তখন তিনি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, প্রাচীন মিশরীয়রা পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের বিস্তারিত তথ্য ও গুণাগুণ জানাতে প্যাপিরাস ব্যবহার করত। প্রাচীন আরব ও ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান নগর পম্পেইতেও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের নমুনা পাওয়া যায়। ইনান (Tsinan) বর্তমান পূর্ব চীনের এক পরিচিত শহর ভ্রমণপিপাসুদের কাছে। এই ইনান শহর সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত। এই শহর ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে তাদের সভ্যতা, পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। এই ইনান শহর থেকেই খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ বছর আগে গঠনমূলক বিজ্ঞাপনের যাত্রা শুরু। সেখানকার 'নিও ফ্যামিলি নিডল শপ' তাদের তৈরিকৃত সুই বিক্রয়ের জন্য ব্রোঞ্জের প্লেটে খোদাই করে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন দেয়। এমনকি সেই বিজ্ঞাপনের ভাষার সাথে বর্তমান বিজ্ঞাপনের ভাষার অনেক মিলও রয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো,

"We buy high quality steel rods and make fine quality needles, to be ready for use at home in no time."

২০১৭ সালের একটি জরিপে দেখাযায় যে, সারা বিশ্বে যত টাকা বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয় করা হয় তার মধ্যে ৩৪.৮% ব্যয় হয় টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে। মোবাইলও কম্পিউটার বিজ্ঞাপনে প্রায় ৩৪%, সংবাদপত্রে ১০% ম্যাগাজিনে প্রায় ৫%, বিলবোড বিজ্ঞাপনে ৬%, রেডিওতে প্রায় ৫% ও সিনেমায় ১%টাকা খরচ হয়।

৮.৩.৯.৪ বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

প্রথম বাংলা হরফে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় ১৭৭৮ সালে '*Calcutta Chronicle*' ইংরেজি পত্রিকায়। পঞ্চানন কর্মকার প্রকাশ করেন এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি ছিলো বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এক বইয়ের। এরপর ধীরে ধীরে বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন। কেমন ছিলো সেসময়কার সাদা-কালো যুগের বাংলা বিজ্ঞাপন?



সেসসময়কার পুরনো সাদা কালো বাংলা বিজ্ঞাপন; image source: Ananda Bazar

এখনকার মতো সেসময়কার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনও ছিল অনেক ক্ষেত্রে সত্য বর্জিত। এখন যেমন বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মিথ্যা নানা গুণের কথা বলা হয়, সেসময়ও এমনই ছিলো। যেমন- নীচে শ্রী মতিলাল বসু এণ্ড কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনে "লক্ষ্মীবিলাস তেল" এ যাবতীয়

শীরঃপীড়া

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে এক মাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০, বোতল ২৲; প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গোলাপ সার।

বিলাতী সেণ্ট বা পুষ্পসার হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং স্বদেশজাত দেশীয় গোলাপফুলের মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন ?.আমাদের গোলাপ-সার ব্যবহার করুন। সৌরভে বিমুগ্ধ হইবেন। মস্তিষ্ক শীতল হইবে, আসল ও নকলের প্রভেদ সহজে বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিত রূপে সেবনে হ্যাবা, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দ্বিকালীন ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন বর্জ্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

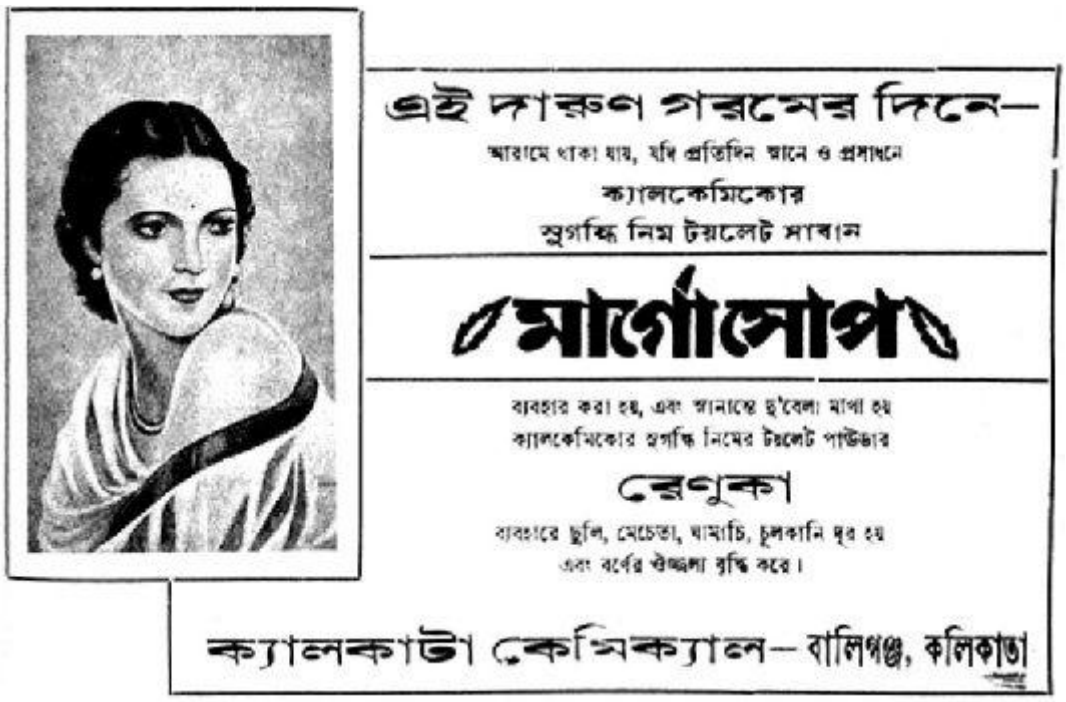
বাতরাজতৈল।

এই তৈল ব্যবহারে গেঁটে বাত, কোমরের বাত, চলিত বাত, ঝিন্ ঝিনে বাত, চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত-রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৲; ছোট শিশি ॥০ আনা। ডজন—বড় শিশি ১০॥০ টাকা, ছোট শিশি ৫।০ টাকা প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীমতিলাল বসু এণ্ড কোং
ড্রগিষ্ট্স্ এণ্ড জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্,
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

হাতপা

জ্বালা বন্ধ হওয়া, সুগন্ধী ‘গোলাপ সার’-এর সুগন্ধে মাথা ঠাণ্ডা হওয়া, গাছগাছড়ায় প্রস্তুত কুইনাইন বর্জিত 'সুধাসিন্ধু রসে' প্লীহা ও যকৃত সংক্রান্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করা ইত্যাদি দাবি করা হয়েছে! অবশ্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। এ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিলো বাংলা ১৩১৫ সনে। অর্থাৎ আজ থেকে ১১০ বছর আগে!



ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর মার্গো সোপ এর বিজ্ঞাপন; Image Source: দীপক সেন গুপ্ত

উপরের বিজ্ঞাপনটি ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো সোপ এর। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল আনুমানিক বংলা ১৩৪৪ সনে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৮১ বছর আগে। শুরু থেকেই নিম গাছের উপকারিতা উপলব্ধি করে এই কোম্পানি অনেক সামগ্রীতেই (মার্গো সাবান, নিম টুথপেস্ট, রেণুকা টয়লেট পাউডার) নিমকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিলেতি সাবান ও টুথপেস্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগুলোর বিক্রিও মন্দ হতো না। মার্গো সাবান ও নিম টুথপেস্ট পরে একসময়ে হেঙ্কেল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কিনে নেয়। সেই হেঙ্কেল ইণ্ডিয়া এখন জ্যোতি ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানি নামে পরিচিত ।



নিম টুথ পেস্টের বিজ্ঞাপন; Image Source: আনন্দবাজার

এটিও ক্যালকাটা কেমিকোর আরেকটি বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে তাদের 'নিম টুথপেস্ট' এর গুণাগুণ উল্লেখ করেছে। বিজ্ঞাপনে সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই দাঁতের সুরক্ষার জন্য নিম টুথপেস্ট ব্যবহার শেখাতে বলছে। এখনকার টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ভাষার সাথে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই।

৮.৩.৯.৫ বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন যোগাযোগের একটি বিশেষ ধরণ। বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারক ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ তৈরী করে। অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মত এটারও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাজনীতিবীদেরা ও রেস্তোরাঁর মালিকেরা বহু প্রাচীনকালেও বিজ্ঞাপন দিত। বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় শব্দমালা ব্যবহার করা হয়। কেননা বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য হল একটি পরিকল্পিত যোগাযোগ। যেখানে আমরা যারা ক্রেতা তাদেরকে সচেতন করা হয় এবং আমাদের চাহিদার উদ্রেক করা হয়। যেন আমরা পণ্যটির চাহিদা অনুভব করি এবং কিনি। এই জন্যই বিজ্ঞাপনের ভাষা খুব সহজ ও বোধগম্য হয়। অল্প কিছু শব্দ আর স্লোগান দিয়ে বিজ্ঞাপন সাজানো হয়। এরকম বিষয় আমাদের মস্তিষ্ক ভালোভাবে

মনে রাখে। কিছু কিছু শব্দ যেমন অব্যয়, পণ্যটিকে উপকারী হিসেবে বর্ণনা করে। তাই, বিজ্ঞাপনের ভাষা সবসময় ইতিবাচক হয়।

মজার ব্যাপার হল, বিজ্ঞাপনের ভাষা সবসময় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলা যায়, বিজ্ঞাপনের ভাষা আমাদের সমাজের প্রতিফলন। বর্তমানে, ''সৌন্দর্য্য'' ও ''তারুণ্য'' শব্দদুটি অনেক দেশে খুবই জনপ্রিয়। ''ভবিষৎ'' ও ''নিরাপত্তা'' শব্দদুটোও সমান জনপ্রিয়। পশ্চিমা সমাজে ইংরেজি জনপ্রিয় ভাষা। ইংরেজিকে গণ্য করা হয় আধুনিক ও সার্বজনীন ভাষা হিসেবে। তাই প্রযুক্তিগত পণ্যে ইংরেজি নাম সবচেয়ে মানানসই। রোমান ভাষা- পূরণ ও আবেগ। এটা ব্যবহার করা হয় সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী গোষ্ঠীর অন্যতম উপাদান হল ইচ্ছা সামগ্রীতে। যারা উপভাষায় কথা বলেন তারা নিজ স্থান ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেন। পণ্যের নাম প্রায়শই নতুন শব্দের হয়। অনেক সময় এসব শব্দের কোনঅর্থ থাকেনা কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু কিছু নাম শব্দভান্ডারে নিজের নাম যুক্ত করে নেয়। যেমন, ভ্যাকুয়াম ইংরেজি শব্দটি একটি ক্রিয়া হয়ে গেছেযার অর্থ পরিষ্কার করা। -

৫.৩.৯.৬বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্তমানে যেমন বিভিন্ন চিত্রনায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড় ও তারকারা বিজ্ঞাপন করেন, সেসময়ও তেমনি বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখক, অভিনেতা, তারকাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করানো হতো।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুন্তলীন কেশ তেলের বিজ্ঞাপন; Image Source: দীপক সেন গুপ্ত

উপরের বিজ্ঞাপনটি 'কুন্তলীন' নামক কেশ-তেলের। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিজ্ঞাপনটি লিখেছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "*কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :- কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে।*"এমনকি সেই সাথে কুন্তলীন কেশ তেল নিয়ে কবির লেখা একটি গানের অংশ বিশেষ ও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞাপনে।

কুন্তলীনের এই বিজ্ঞাপনটি আজ থেকে প্রায় ৭৬ বছর আগে প্রকাশিত হয়। 'কুন্তলীন' তেলের জনক হেমেন্দ্র মোহন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই বলে বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুন্তলীনের গুণগান নিছক বন্ধুপ্রীতির জন্য মনে করা হলে ভুল করা হবে। বিজ্ঞাপনজগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম অকাতরে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।



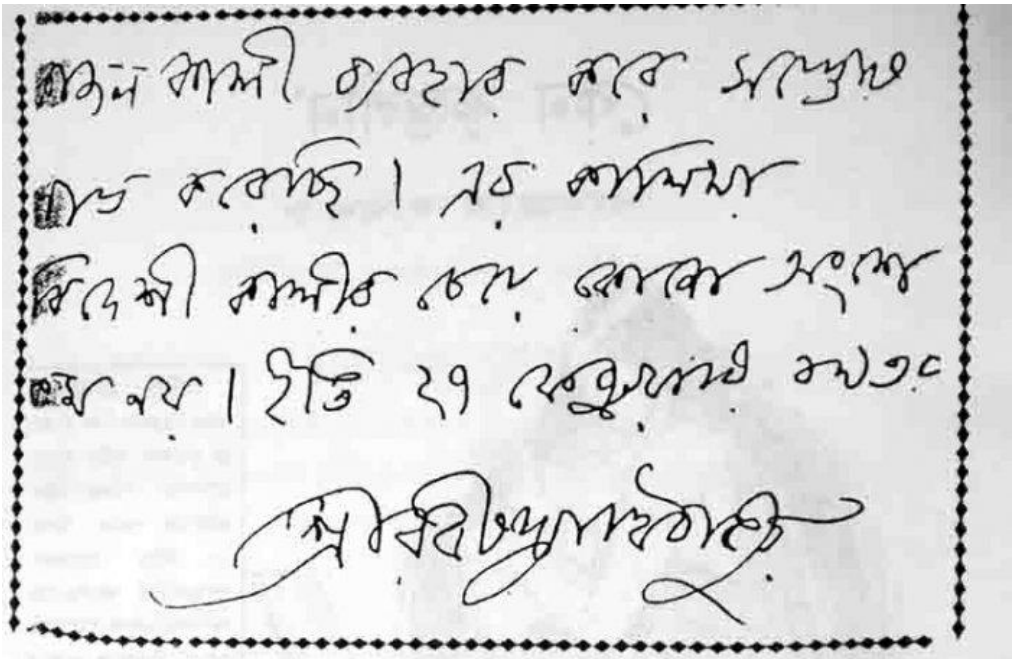
রেডিয়ম ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞাপন; Image Source: getty image

উপরের বিজ্ঞাপনটি কলকাতার রেডিয়ম ল্যাবটরী কর্তৃক প্রকাশিত তাদের স্নো, ক্রিম, কেশ তেল, লাইম জুস, তিল তেল ও গ্লিসারিনের বিজ্ঞাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেডিয়ম ল্যাবটরীর বিজ্ঞাপনও করেছেন। রেডিয়াম ক্রিম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "*রুপচর্চার জন্য স্নো ও ক্রিমজাতীয় প্রসাধন যারা ব্যবহার করেন, তারা রেডিয়াম ফ্যাক্টরির তৈরি ক্রিম ব্যবহার করে দেখুন, বিদেশি পণ্যের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবেন না।*"

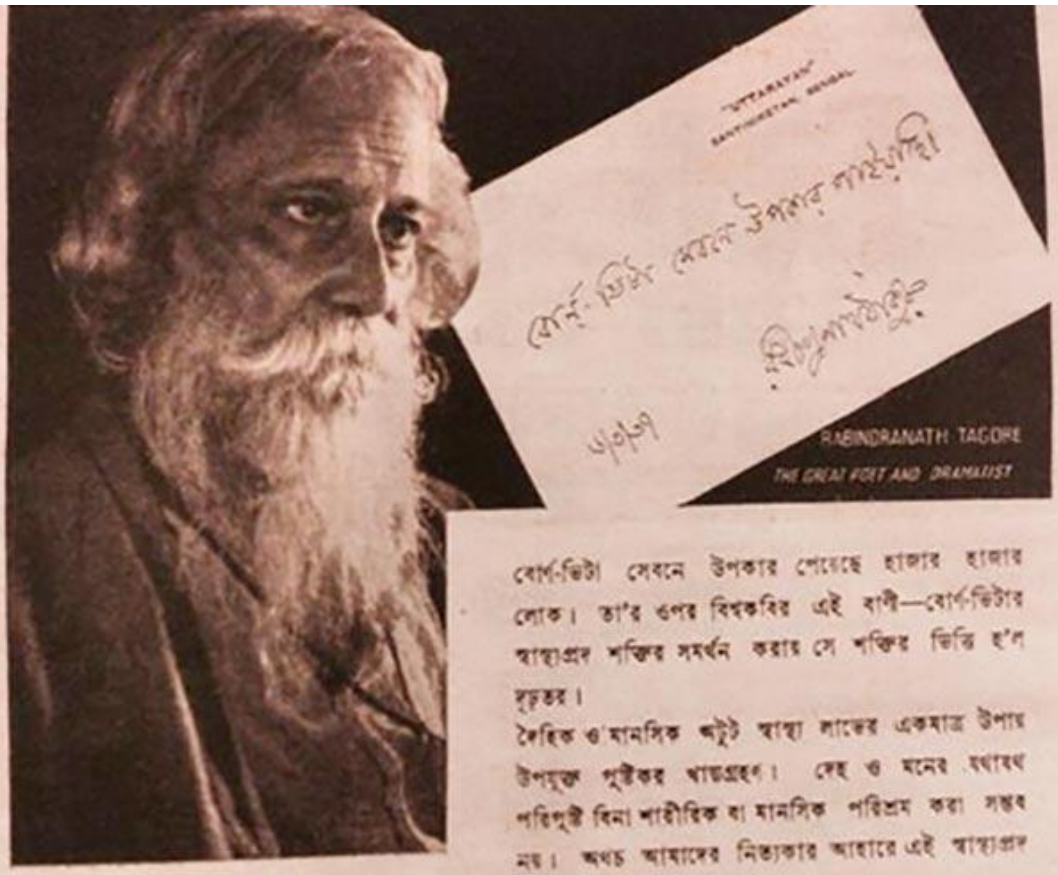
ঘি থেকে শুরু করে স্নো-পাউডার, এমনকি হারমোনিয়াম পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের লিখিত বাণী দেখা যায়। সেই সময় লেখার জন্য বাজারে পাওয়া যেত সুলেখা কালি। ডট পেন, জেল পেন ইত্যাদি তখনও বাজারে আসেনি। ঝর্ণা কলম বা ফাউন্টেন পেনে এই কালি ভরে লোকে লিখতো। সুলেখা কালির বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "*সুলেখা কালি। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।*"

অল্প কথায়, এরকম আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এখন আর চোখে পড়ে না। বিদেশি কোম্পানি পার্কারের Quinkএবং শেফার্সের Skripএর সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল সুলেখাকে। ফাউন্টেন পেনের ভালো কালি বানানো সহজসাধ্য ছিল না। কালি যেন শুকিয়ে গিয়ে নিব দিয়ে কালি ঝরা বন্ধ না করে- কালির উপাদান নির্বাচনে সেটি ছিল মস্ত বড় বিষয়। তাছাড়া লেখা যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে না হয়, সহজে উৎপাদন করা যায়– সবই ছিল বিবেচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের এই ঢালাও সুখ্যাতি সুলেখা কালিকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলো– সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

১৯৬০ সালে 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা' থেকে আরেকটি বিজ্ঞাপনের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি হলো 'কাজলকালী'র বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ভাষাটি ছিলো, "*কাজলকালী ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি, এর কালিমা বিদেশী কালীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়- ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*"



রবীন্দ্রনাথের কাজল কালী'র বিজ্ঞাপন; Image Source: মুক্তচিন্তা ব্লগ



বোর্ণ-ভিটা সেবনে উপকার পেয়েছে হাজার হাজার লোক। তা'র ওপর বিশ্বকবির এই বাণী—বোর্ণ-ভিটার স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তির সমর্থন করায় সে শক্তির ভিত্তি হ'ল দৃঢ়তর।

দৈহিক ও মানসিক অটুট স্বাস্থ্য লাভের একমাত্র উপায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ। দেহ ও মনের যথাযথ পরিপুষ্টি বিনা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের নিত্যকার আহারে এই স্বাস্থ্যপ্রদ পুষ্টিকর অংশের অভাব অত্যন্ত বেশী।

বোর্ণ-ভিটা সব দিক থেকেই পুষ্টিকর খাদ্য। স্বাস্থ্যপ্রদ যত ভিটামিন আর খনিজ লবণ, বোর্ণ-ভিটায় তা'দের উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে। তাই বোর্ণ-ভিটার নিয়মিত সেবনে পাওয়া যায় অসীম কর্মশক্তি আর অফুরন্ত জীবনীশক্তি।



Cadbury's

BOURN-VITA

সমস্ত দিনের কর্মশক্তির জন্য

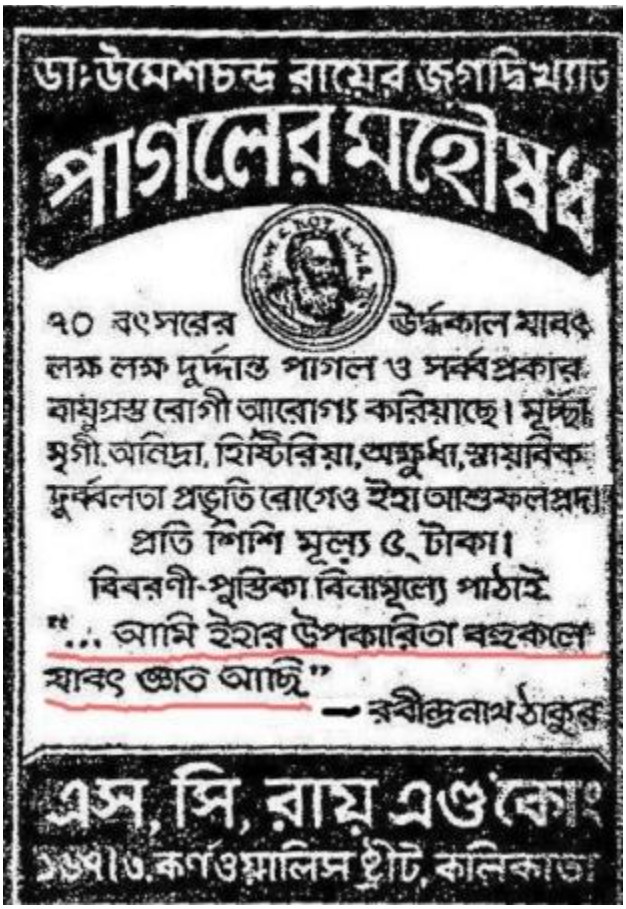
বড় বড় দোকানে বা ডাক্তারখানায় এক পাউণ্ড বা আধ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়। বৈদেশিক মাল হাতে ঠোঙা হয় না।

বোর্ণভিল্‌এ ক্যাড্‌বারী কোম্পানী তৈরী ক'রেছেন

বোর্ন ভিটার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; Image Source: pinterest

উপরের বিজ্ঞাপনটি বোর্ন-ভিটার। এ বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে কবির স্বহস্তে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন, *"বোর্ন-ভিটা সেবনে উপকার পাইয়াছি।"*
রবীন্দ্রনাথের আরেকটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন ছিল 'জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' এর জন্য। ঐ বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, *"জলযোগের বানানো মিষ্টান্ন আমি চেখে দেখেছি। এটা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। এর আলাদা স্বাদ আছে।"* জলযোগ সে যুগে কেকের জন্য বিখ্যাত হলেও রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের সুবাদে মিষ্টান্ন জগতেও প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

সেসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন। তাঁকে লিখতে হয়েছিলো, তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর শান্তিনিকেতনের জন্য! এমনকি এস সি রায় এন্ড কোং এর ড. উমেশচন্দ্র রায়ের কথিত পাগলের মহৌষধের বিজ্ঞাপনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন।

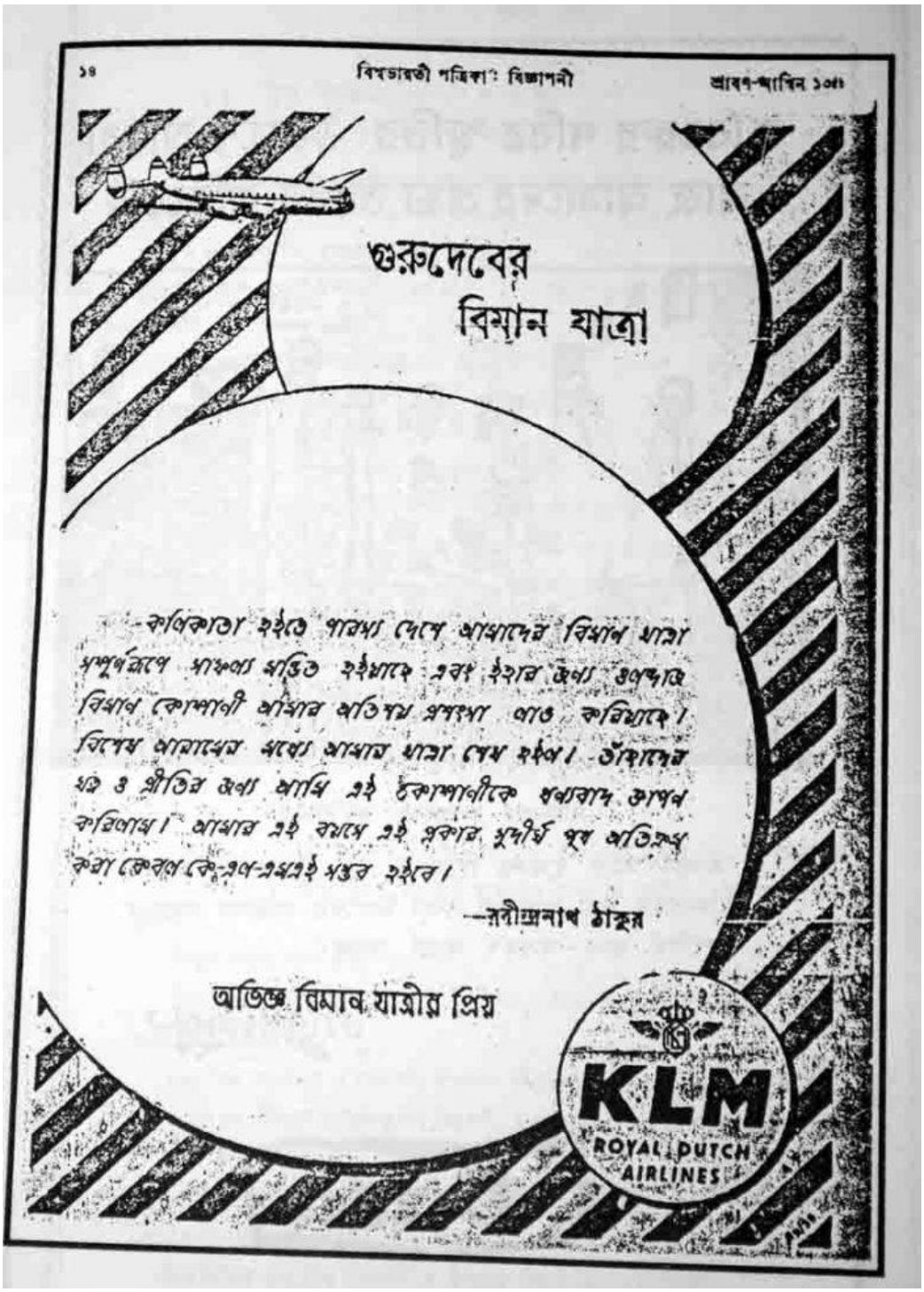


পাগলের মহৌষধ কথিত এক ওষুধের বিজ্ঞাপন; Image Source: pinterest



পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা; Image Source: আনন্দবাজার

উপরের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনে কবির 'হঠাৎ দেখা' কবিতার দু'লাইন তুলে দেয়া হয়েছে। এয়ারলাইন্সের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের লেখা পাওয়া যায়। কবি 'কে এল এম রয়াল ডাচ' এয়ারলাইন্সের জন্য বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন। রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ সেই বিজ্ঞাপন 'গুরুদেবের বিমান যাত্রা' শিরোনামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল।



এয়ারলাইন্সের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা; Image Source: বিশ্বভারতী পত্রিকা

৮.৩.৯.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপনের সম্পর্কটি নিজের ভাষায় লেখো।

২. বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৩. বিজ্ঞাপন কী? বিজ্ঞাপনের ইতিবৃত্ত লেখো।

৪. বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।

৮.৩.৯.৮. সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন

৩. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড) - পরেশচন্দ্র মজুমদার

৪. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ

৫. বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান – অলিভা দাক্ষী

৬. ভাষা : প্রয়োগে ব্যবহারে – সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক : ১০ : অভিধানের ভাষা

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.১০.১ অভিধান হলো তথ্যমূলক গ্রন্থ

৮.৩.১০.২ অভিধানের ভাষা

৮.৩.১০.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১০.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৩.১০.১ : অভিধানের ভাষা ও অভিধানচর্চা

অভিধান সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় এটি একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যে কোনও ভাষার শব্দ সম্পর্কে আলোচনা থাকে। মূলত শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, প্রয়োগ ইত্যাদি। মানুষ অভিধান পড়ে না, দেখে। প্রয়োজনে অর্থাৎ কোনও শব্দের অর্থ জানতে, কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উচ্চারণ জানতে মানুষ অভিধানের পাতা উলটায়। অভিধান আসলে কোনও শব্দের ব্যবহারগত পার্থক্যকে ভালোভাবে দেখিয়ে থাকে। অনেক সময় আমরা কোনও শব্দের ভুল ব্যবহার করে থাকি। তার যথার্থ বা সঠিক ব্যবহার কী হবে তা অভিধান আমাদের দেখিয়ে দেয়।

৮.৩.১০.২ : অভিধানের ভাষা

যে কোনও ভাষায় অভিধানকে বলা হয় শব্দভাণ্ডার। অভিধান সাধারণত ভাষাতে জ্ঞানভাণ্ডারের ভূমিকা পালন করে। অভিধান বিজ্ঞাপিত তথ্যাবলীর প্রয়োগ দেখিয়ে থাকে। ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে যেসব শব্দ স্থিরীকৃত হয় সেসব শব্দ অভিধানে জায়গা পায়। সেই অনুযায়ী মুখ্য শব্দের বিচার করে অভিধান। শব্দের অর্থ নির্দেশ করে উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তির স্বরূপ দেখিয়ে কীভাবে ভাষায় প্রয়োগ করা যায় তার নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য আজ যে আমরা dictionary শব্দটি ব্যবহার করি সেটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন থমাস এলিয়ট। এই হিসেবে তার লেখা গ্রন্থটি ছিল ল্যাটিন-ইংরেজি অভিধান (১৫৩৮)। তবে ত্রয়োদশ শতকে জন গারল্যান্ডই প্রথম 'Dictionarius' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর চতুর্দশ সালে সেটি পরিবর্তিত হয় 'Dictionarium'-এ। অবশেষে Dictionary শব্দটি। অভিধান একসঙ্গে পাঠকদের অনেক প্রয়োজন মেটায়। পদ বা শব্দ শুদ্ধতার শেষ কথা অভিধান। 'Oxford English Dictionary'-তে অভিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> " Dictionary is a book dealing with the individual words of a language (or certain specified class of them). So as to set forth their orthography, pronounciation, signification and use, their synonyms, derivation and history, or at least some of these facts for convenience of reference the words are arranged in some stated order; now in most

language, alphabetical, and in larger dictionaries the information given is illustrated by quotations from literature."

অভিধান ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা অনেক হতে পারে। শব্দ তালিকায় সাধারণ শব্দ যেমন আছে তেমনই বিশেষ শব্দও আছে। অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত বা ব্যবহৃত বহু শব্দই অভিধানে আছে। যেসব মুখ্য শব্দ দিয়ে অভিধান লেখা হয় তা এককালিক হতে পারে, কালক্রমিকও হতে পারে। অভিধান রচনা করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য কাজ। দীর্ঘদিন ধরে একটি পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজকে সম্পন্ন করতে হয়। অভিধান তৈরির বিভিন্ন পর্ব আছে। যেমন প্রথম পর্বে রয়েছে ভাবনাচিন্তার পালা এবং এখানে ঠিক হয়ে যায় কীভাবে শব্দগুলি বাছাই করা হবে। কীভাবে তথ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে মুখ্য শব্দগুলি সাজানোর পালা। তার সঙ্গে রয়েছে সেইসব কাজের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ নিরূপণ ইত্যাদি। তৃতীয় পর্বে মুখ্য শব্দ ও তার অর্থের বিন্যাস ঘটানো। এ ছাড়াও ধ্বনি বা শব্দের উচ্চারণ, ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা, ভূমিকা লেখা ইত্যাদি। তারপর অভিধান প্রণয়ন করা সম্ভব।

অভিধানকে অনেকে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেন। ধর্মগ্রন্থ যেমন সবসময়ই মানুষের প্রয়োজনে লাগে তেমনই অভিধানও মানুষের কখন কোন প্রয়োজনে লাগবে তা হঠাৎ করে বলা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সবসময় কাজে লাগে অনুশাসনিক অভিধান। এই ধরনের অভিধানেই শব্দের শুদ্ধ বানান, উচ্চারণ, অর্থ নির্দেশ ইত্যাদি থাকে। ওইগুলি সম্পর্কে শেষ কথা এই ধরনের অভিধানে লক্ষণীয়। এই ধরনের অভিধান যেহেতু সর্বসাধারণের, তাই এই অভিধানের ভাষা হয় সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, তার উচ্চারণ, তার অর্থবৈচিত্র্য, তার ক্রমবিন্যাস সবই সহজভাবে হয়ে থাকে। যা দেখে বা পড়ে সকলেই একবাক্যে বুঝতে পারে। এক লহমায় অনুভব করতে পারে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না অভিধান একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। যথার্থ অভিধানের ব্যাপারে ভাষাশিক্ষার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় জাতীয় জীবনের অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এককথায় ভাষার শব্দভাণ্ডারই হল অভিধান। আধুনিককালে বহু ধরনের অভিধান লক্ষ করা যাচ্ছে। সেগুলি মূলত বানান অভিধান, আঞ্চলিক অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, শব্দার্থ অভিধান, প্রয়োগমূলক অভিধান, শব্দসৃজন মূলক অভিধান, শব্দসঙ্কেত অভিধান, চরিতাভিধান, কৃতঋণ শব্দাভিধান। তবে অভিধানে সাধারণত কোনও ভাষার প্রচলিত শব্দাবলী, বর্ণনাক্রমে সাজানো থাকে। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে থাকে তার সঠিক উচ্চারণ রীতি। তারপর থাকে তার পদপরিচয়, বিবর্তনের ধারা। এরপর লুপ্ত ও প্রচলিত অর্থ, তার তাৎপর্য, সমশব্দ, প্রতিশব্দ, প্রয়োগরীতির দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। এ ছাড়া নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনী, ঘটনাবলী ইত্যাদিও অভিধানের শেষে লিপিবদ্ধ থাকে।

বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান রচনার কৃতিত্ব দেওয়া হয় মনোএল দা আসসুম্পসাঁত্তকে। তিনি রচনা করেছিলেন বাংলা-পর্তুগিজ, পর্তুগিজ-বাংলা ব্যাকরণ। নাম — 'Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez dividedo im duas Partes'. এই গ্রন্থে ব্যাকরণ অংশের পৃষ্ঠা ছিল ৪০, আর শব্দকোষের সংখ্যা ছিল ৫২৯। এটি লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও কিন্তু তিনিই লিখেছিলেন। ইংরেজি-বাংলা অভিধানপ্রণেতা হিসাবে প্রথম যার নাম আসে তিনি হলেন Mr. A. Up John। তাঁর ব্যাকরণটির নাম ছিল 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' (১৭৯৩)। এর পরের অভিধানপ্রণেতা ছিলেন হেনরি পিটার ফরস্টার। তিনিই বাঙালিদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা চর্চার বিষয়টা বুঝেছিলেন। ফরস্টারের অভিধানের নাম 'A Vocabulary in two parts, English and Bongalee and Vice Versa' (১ম খণ্ড ১৭৯৯, ২য় খণ্ড ১৮০২)। এই অভিধানের শব্দ সংখ্যা ছিল

১৮,০০০। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ফরস্টারের অভিধানই ছিল বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান।

এরপর বাংলা অভিধান রচনায় যাঁর নাম উঠে আসে তিনি হলেন উইলিয়ম কেরি। তাঁর অভিধানটির নাম ছিল 'A Dictionary of the Bengali Language' (১ম খণ্ড ১৮১৫, ২য় খণ্ড ১৮২৫)। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬১৬, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৪৪। দীর্ঘ পনের বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি এই অভিধানটি রচনা করেছিলেন। এই অভিধানটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কেরি সাহেবের নির্দেশক্রমে ক্লার্ক মার্শম্যান কেরির অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম খণ্ডে ছিল ২৬,০০০ শব্দ। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ২৪,০০০ শব্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮২৮ ও ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর লণ্ডন শহর থেকে প্রকাশিত হটন সাহেবের অভিধানটি উল্লেখ্য। এর নাম 'Glossary Bengalee and English' (১৮৩৩)। এখানে আছে ২,৫০০ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ। তিনি মূলত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যগ্রন্থ থেকে এইসব শব্দ নিয়েছিলেন। হন্টন সাহেবের আরও একটি অভিধান ১৮৩৩ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। নাম — 'A Bengalee English Dictionary'।

এরই মধ্যে ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মিলার সাহেবের অভিধান। আট খণ্ডে বিভক্ত অভিধানটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০০। শ্রীরামপুর Vernacular School Society থেকে 'বীতজ শব্দ' (১৮১৭) নামে একটি শব্দকোষ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ১০০০ শব্দের সংস্কৃত ধাতুরূপ ছিল। এরপর জন মেণ্ডিস 'Johnson's Dictionary'-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। ১ম খণ্ডের (১৮২২) শব্দ সংখ্যা ছিল ৩০,০০০, ২য় খণ্ডের ২৮,০০০। এটি ছিল ইংরেজি বাংলা অভিধান। মর্টন সাহেব ১৮২৮ সালে একটি অভিধান প্রকাশ করেছিলেন। ৬০০ পাতার এই গ্রন্থে শব্দ ছিল ১০,৭০০টি। ল্যাবাণ্ডার সাহেব ১৮২৪ সালে 'Mylius School Dictionary'-এর ইংরেজি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এই অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০০। পিয়ার্সন সাহেব স্কুল বুক সোসাইটির জন্যে একটি শব্দকোষ লিখেছিলেন। নাম ছিল 'A School Dictionary, English and Bengalee' (১৮২৯)। সুইফট সাহেব ১৮৩১ সালে 'Walkers'Dictionary'-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজি ও বাংলায়। এই সংস্করণে ছিল ২৪,০০০ শব্দ। রোমান পদ্ধতিতে রোজারিওর সংকলন করেছিলেন একটি অভিধান। নাম 'English, Bengalee and Hindustance Dictionary'। এর বাংলা অংশ রচনা করেছিলেন মর্টন। প্রকাশকাল ১৮৩৭। এতে ছিল ২,০০০ শব্দ। মর্টন সাহেবের আরও একটা Dictionary-এর নাম 'Biblical Tecological Vocabulary' (১৮৪৫)। এতে ছিল ৮০০ সমার্থক বাংলা শব্দ। প্রণেতাহীন অনেক অভিধানের পরিচয় পাওয়া যায় এই সময়। যেমন — 'Anglo-Bengalee Vocabulary' (১৮৫০), 'ইঙ্গরাজি-বাঙ্গালা-অভিধান (১৮৫৩), 'Law Terms' (১৮৫৪) ইত্যাদি। এইসব অভিধানে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া গেছে।

দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বাংলার অভিধান লিখেছিলেন তার নাম হল মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। উইলিয়ম কেরির অনুরোধেই তিনি লিখেছিলেন 'A Vocabulary Bengalee and English' (১৮১০)। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০২। অভিধানটি তিনি ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষার্থীদের জন্যে রচনা করেছিলেন। এর পরের শব্দকোষ রচয়িতা ছিলেন রামচন্দ্র। তাঁর লেখা গ্রন্থটি হল 'Vocabulary of Bengalee Language' (১৮১৮)। এই অভিধানে ৬,৬০০টি কঠিন শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রামকৃষ্ণের 'শব্দকোষ' (১৮২১), তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'ইংরেজি বাংলা-অভিধান' (১৮২৭) ইত্যাদি। দ্বিতীয় অভিধানে শব্দসংখ্যা ছিল ৭৫,০০০। এ ছাড়াও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রামকমল সেনের নাম। তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিধানটির নাম — 'A Dictionary in En-

glish and Bengalee' (১৮৩৪)। দীর্ঘ পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি ৬০,০০০ শব্দের এই অভিধানটি প্রস্তুত করেছিলেন।

বাংলা অভিধান বা শব্দকোষ রচনার বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে। যেমন—জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, জগন্নারায়ণ শর্মা প্রমুখ। জগন্নাথপ্রসাদের অভিধানের নাম 'শব্দকল্পতরঙ্গিনী', জগন্নারায়ণ শর্ম্মার 'নূতন অভিধান' (১৮৩৮) ইত্যাদি।

১৮৩৯ সালে জয়গোপাল শর্ম্মা লেখেন 'বঙ্গাভিধান'। বাংলায় প্রচলিত ৬২৬৪টি সংস্কৃত শব্দ এই অভিধানে সংকলিত হয়। এটি শ্রীরামপুর প্রেস থেকে সংকলিত হয়েছিল। ১৮৫০ সালে রাধানাথ দে এন্ড কোং থেকে শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। নাম 'Anglo-Bengali Dictionary' (১৮৫১)। এর পৃষ্ঠা ছিল ৯৮। ১৮৫২ সালে দিগম্বর ভট্টাচার্য লেখেন 'শব্দার্থ-প্রকাশাভিধান'। এর শব্দ সংখ্যা ছিল ৯০০। 'Johnson's English Dictionary' ও মার্শম্যানের 'বাংলা অভিধান'কে সামনে রেখে অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য প্রকাশ করেছিলেন 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' (১৮৫৪)। এতে ছিল ২৩,০০০ শব্দ। এ ছাড়াও তিনি ওই সনেই আরও একটি অভিধান লিখেছিলেন। যার নাম 'শব্দাম্বুধি'। এই অভিধানটি সেই সময়ের একটি স্মরণীয় অভিধান। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০৪, শব্দ সংখ্যা ২৮,০০০। প্রথম বছরেই অভিধানটি ২,০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। এর আগে দুটি বাংলা-পার্সি অভিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি নীলকমল মোস্তাফির 'পারসী-অভিধান' (১৮৩৮)। এই অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। আর পারসি শব্দসংখ্যা ২,৮০০। অন্যটি জয়গোপাল ভট্টাচার্যের 'পারসী-অভিধান' (১৮৩৮)
।

বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অভিধানের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ শতকে। এই হিসাবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' (১৯১১)। ইংরেজি এনসাই-ক্লোপিডিয়ার অনুরূপ হয়েছিল এই অভিধানটি। বলা যায় বাংলা শব্দের বিশ্বকোষ। এরপর তিন খণ্ডে অভিধান লিখেছিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯৩২)। দীর্ঘ ষোল বছর পরিশ্রম করে এই অভিধানটির কাজ শেষ করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই শব্দকোষ তৈরির কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ১৯১৬ সালে। এর আগেই অবশ্য সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (১৯০৫), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' (১৯১৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'সংসদ বাংলা অভিধান' (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই নাম করতে হয় রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৯৩০)-কে। এটি সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত সবসময়ের ব্যবহার উপযোগী। এই অভিধানটির শব্দসংখ্যা ৩০,০০০-এরও বেশি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জ্ঞানেন্দ্রেমোহন দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিধানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৮.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অভিধান বলতে কী বোঝ? অভিধানের ভাষাগত দিকগুলি আলোচনা করো।

২। অভিধানের ভাষাস্বরূপ বুঝিয়ে অভিধানচর্চার গতিপ্রকৃতি আলোচনা করো।

৮.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ'

২. বাংলা ভাষা: রূপে প্রয়োগে - শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত

৩. ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ - সুখেন বিশ্বাস

পর্যায় গ্রন্থ :৩

একক ১১

পরিভাষা

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.১১.১ পরিভাষা

৮.৩.১১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.১১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৩.১১.১: পরিভাষা ও বানান

'পরিভাষা' শব্দটি ইংরেজি 'terminology' থেকে এসেছে। ইংরেজি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন—শব্দ কথাটির অর্থ sound, ধ্বনি কথার অর্থও sound। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দ ও ধ্বনির জন্য দুটি পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন—শব্দ বলতে word আর ধ্বনি বলতে phone বোঝানো হয়। ফলে ভাষাবিজ্ঞানে শব্দ ও ধ্বনি কথাটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে দুভাবেই ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, ভাষা ও পরিভাষা অনেক দিক থেকেই পৃথক। ভাষা সকলের জন্য ব্যবহার্য, কিন্তু পরিভাষা বিশেষ বিশেষ শাখার জন্যেই। ভাষা একটা অর্থে ব্যবহৃত। সেই অর্থের প্রবর্তন কে করেছিলেন, তা জানা যায় না। কিন্তু পরিভাষায় কোন্ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হবে, তা কেউ না কেউ ঠিক করে দেবেন। সাধারণ ভাষা অর্থ বদলে বদলে যেতে পারে। কিন্তু পরিভাষাতে অর্থ নির্দিষ্ট, তা বদলে যায় না।

বাংলা পরিভাষার উদ্ভাবনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারীরা পরিভাষা প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। এই সময়ে কিছু পারিভাষিক শব্দ তৈরিও হয়। প্রাচীনকালেও আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত, যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কিত প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার উল্লেখ আছে। আর বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলি নতুনভাবে প্রয়োগ করা হয়। মিশনারীরা ইচ্ছেমতো পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিভাষা উদ্বোধনের সুসংগঠিত প্রয়াস দেখিয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এমনকী রবীন্দ্রনাথও পরিভাষা উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে পরিভাষার উদ্বোধন হল। সাধারণ মানুষকেও এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে দেখা যায়। এইভাবে পরিভাষার ব্যবহার বেড়েই চলল।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে পারিভাষিক এই সকল শব্দকে কিন্তু দেশের লোক শ্রদ্ধাভরে মেনে নেয়নি, নিন্দা করেছে। সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে যে সব পরিভাষা, সেগুলি সম্পর্কেও দেশের লোক বিরূপ মনোভাবাপন্ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এমনকী সাধারণ মানুষও পরিভাষা মেনে নেয়নি, নিন্দা করেছে। কেননা খাঁটি ভাষাকে বর্জন করে তার পরিবর্তে পরিভাষা ব্যবহার সকলের কাছেই যেন নিন্দনীয়। এটাকে পরিভাষার দোষ বলা হয়েছে। তবে এ দেশের প্রতিকার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। দেশের সাধারণ লোক পরিভাষা সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখায়নি, সংবাদপত্র বা সভা-সমিতিতেও পরিভাষা জায়গা পায়নি। তাই পরিভাষার দোষত্রুটি দূর করার উপায়ও জানা যায়নি।

পরিভাষা সম্পর্কে নানা সূত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই; অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।"

সে কারণেই বর্তমানে পরিভাষার জন্য নতুন শব্দ গঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধি এবং অর্থের দিকে তাকানো হচ্ছে। সহজবোধ্য শব্দগ্রহণ করা দরকার পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে। তবে সহজবোধ্যতার আগে শব্দটির প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকানো দরকার। এছাড়া পরিভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব থাকতে হবে। কারণ বাংলা সাহিত্যের বিস্তার হলেও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিতে হয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দ বানানো সম্ভব নয়। সংস্কৃতের দ্বারস্থ এক্ষেত্রে হতেই হয়। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দের প্রয়োজন হলেও সংস্কৃতের আশ্রয় নেওয়া হয়। তাই পরিভাষায় নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে অবলম্বন করা অপরিহার্য। তবে প্রচলিত শব্দের বদলে নতুন অপরিচিত শব্দ গঠন করলে হবে না। ধারণাগত যোগাযোগগত শব্দের মধ্যে থাকতে হবে। যেমন—'Chancellor' শব্দের অর্থ - 'আচার্য' ও 'Vice-Chancellor' শব্দের অর্থ 'উপাচার্য'। ধারণাগত দিক থেকে শব্দটির পৃথক অর্থ হয়। আবার সংস্কৃত ভাষায় আচার্য হলেন শিক্ষক আর উপাচার্য তার সহকারী। সুতরাং ধারণাগত যোগাযোগ পরিভাষা গঠনের অন্যতম একটি শব্দ। শুধু তাই নয় পরিভাষার যিনি উদ্ভাবন, প্রয়োগ করবেন, তিনি ভাষাবিজ্ঞানে অবশ্যই অধিকারী হবেন।

এই পরিভাষার উদ্ভব নানাভাবে হতে পারে। মোটামুটিভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী চারটি পদ্ধতিতে পরিভাষার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ হতে পারে। যেমন—প্রত্যক্ষ ঋণ, অনূদিত ঋণ, নব উদ্ভাবন ও লোক নিরুক্তি। বিভিন্ন বিদেশি ভাষা ও ইংরেজি ফার্সি থেকে ঋণ নিয়ে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে পরিভাষার উদ্বোধন ঘটে প্রত্যক্ষ ঋণ পদ্ধতিতে। সংস্কৃত থেকেও ঋণ নেওয়া হয়। অনুবাদ প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাইরেও লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ দেশীয় ভাষায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন—'স্কুল' শব্দটি দেশীয় ভাষা থেকে নেওয়া হলেও 'বিদ্যালয়' অনুবাদাত্মক শব্দটি ব্যবহারের দিকেও মানুষের ঝোঁক কিন্তু কম নয়। তবে পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের অনুবাদ প্রয়োজন পারিভাষিক পুরনো প্রচলিত বাংলা বা সংস্কৃত শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করে বা সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের সহযোগে নতুন ধারণা গঠন করে কিংবা সংস্কৃত ধাতু, প্রত্যয় বা ক্রিয়া ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠনের দ্বারা ইংরেজি শব্দের অনুবাদ করা যায়। আর এই নতুন শব্দই পরিভাষা উদ্ভাবনের সহায়ক। শুধু তাই নয় নব উদ্বোধনেও পরিভাষার সৃষ্টি হতে পারে। নতুন একটি ধারণা প্রকাশের জন্যে নতুন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে ইংরেজি, সংস্কৃত বা পুরনো প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ থেকে ঋণ নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে পুরনো বাংলা ও সংস্কৃত শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সংস্কৃত ধাতু, প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। লোক নিরুক্তি থেকেও পারিভাষিক শব্দের উদ্ভব হচ্ছে। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকের মুখে অনেক শব্দ পাল্টে যেতে পারে। যেমন—স্কুলকে বলা হচ্ছে ইস্কুল ইত্যাদি। কথ্য ভাষায় প্রচলিত শব্দের নতুন অর্থ দিয়েও পারিভাষিক শব্দ গঠিত হচ্ছে। যেমন—'টিউবওয়েল' অর্থে 'টিপকল' ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে উচ্চারণ বা অর্থের ফলেই নতুন পারিভাষিক শব্দের উদ্ভব হচ্ছে।

তবে পরিভাষা বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় ঐক্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুসলমান শাসন বা ইংরেজ শাসনের সময় ভারতবর্ষে মোটামুটি একটা ঐক্য ছিল। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার জন্য শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সব জায়গায় একই শব্দ ব্যবহৃত হত। দূরের লোকসমাজের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ না থাকলওে এই ঐক্য সেখানেও ছিল। আধুনিক যুগে ঘনিষ্ঠতা দ্রুত বৃদ্ধি পেল পরস্পরের মধ্যে। ফলে ঐক্যের

প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ল। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা যাই হোক না কেন, ভাষার মধ্যে সংহতি স্থাপনের চেষ্টা দেখা গেল। ফলে শাসন সংক্রান্ত বা অন্যবিষয়ক পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে সমতা রক্ষিত ছিল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়ে পণ্ডিত সমাজ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তবে সফল তাঁরা হননি, তা বলা যেতেই পারে।

পরিভাষার আলোচনায় বাংলা বানান প্রসঙ্গ আনা অবশ্যই দরকার। 'বানান' শব্দের অর্থ হল বিশ্লেষণ। বর্ণবিন্যাস করে শব্দ তৈরি করা হয়, তা বর্ণনা করে বানান। অর্থ শব্দের প্রাণ আর বানান শব্দের দেহ। কিন্তু ভাষার দুটি রূপ লেখায় ও কথ্যতে বানানের ভুল দেখা যায়। বিশেষ করে লেখ্য ভাষায় বানান ভুলের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর এর ফলে শব্দের অর্থ বা ভাব প্রকাশে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সে কারণে বানান ভুল সমস্যার সমাধান আগে দরকার। তার আগে জানতে হবে বানান ভুলের কারণ। অনেক কারণে বানান ভুল হতে পারে। আমাদের চারপাশের সামাজিক পরিবেশে যদি ভুল বানান থাকে অর্থাৎ হাটে বাজারে, বিজ্ঞাপন, যাত্রা, সিনেমা এমনকী বিভিন্ন পোস্টারে ভুল বানান থাকে, তাহলে লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যরা সেই ভুল বানানই ব্যবহার করে। আবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বোর্ডে অনেক সময় ভুল বানান লিখে থাকেন, এর থেকেও শিক্ষার্থীরা ভুল বানান শেখে। পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণেও ভুল বানান থাকে। এছাড়া আঞ্চলিকতার প্রভাব তো আছেই। যেমন পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'স', 'চ' হয় (আকাশ-আকাচ্)। এর ফলে বানান ভুল হয়। এগুলি গেল প্রত্যক্ষ কারণ। এছাড়াও বানান সমস্যার অনেক কারণ আছে। যেমন— শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই বানান শিখতে আগ্রহী হয় না। আবার অনেক শিক্ষার্থী অমনোযোগী হয়। ফলে ভুল বানান লেখে। অনেকে খাতায় কোনো বানান না লিখে বই মুখস্থ করে। আবার অনেক পত্র-পত্রিকার বানান দেখেও নিজেদের বানান সম্পর্কে সংশয়িত হয় ছেলেমেয়েরা। কোন্‌টা সঠিক তা বুঝতে পারে না। এর ফলেও তারা বানান ভুল করে।

এ সব কারণ ছাড়াও বানান সমস্যার মূল কতগুলি কারণ আছে। যেমন—বর্ণ ব্যবহারে সচেতনতা থাকছে না অর্থাৎ কোন্ বর্ণ কোথায় বসাতে হবে তার জ্ঞান শিক্ষার্থীর নেই। ফলে তারা বানান ভুল করছে। আবার বাংলা বর্ণমালা উচ্চারণভিত্তিক হয়নি। প্রত্যেকটি বর্ণকে ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না আমরা। 'হ্রস্ব' কে 'হস্যই' বলছি, 'উ' কে বলছি 'হস্‌সোউ'। এর ফলে বানান বিকৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন বর্ণের একই রকম উচ্চারণ করছি আমরা। 'ন' ও 'ন', শ, স, ষ এদের উচ্চারণ একই হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'ণ' কে 'ন' বলছি। শ, স, ষ কে 'শ' উচ্চারণ করছি। ফলে বানান ভুল বেড়েই চলেছে। আবার সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দেও বানান ভুল হচ্ছে। মুখ = বদন, মূক = বোবা। এক্ষেত্রে একটির প্রয়োগের স্থানে অন্যটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে বানান ভুল হচ্ছে। সমোচ্চারিত শব্দে বানান সমস্যা আরও প্রবল। কেননা 'ডাল' মানে 'গাছের শাখা' হতে পারে আবার 'খাদ্য'ও হতে পারে। অনেক সময় উচ্চারণের ত্রুটির ফলেও বানান ভুল হয়। যেমন 'হাসি' কে কেউ লিখছে 'হাঁসি' বা 'কাচ' কে 'কাঁচ'। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষায় তো বানান ভুলের সমস্যা অত্যধিক। সুতরাং এই বানান সমস্যা আগে দূর করা প্রয়োজন। তবে দেখা যাচ্ছে বানান সমস্যার মূল কারণ দুটি হচ্ছে বাংলা ধ্বনিগুলির মধ্যে গ্রহণ ও বর্জন এবং উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে পার্থক্য। ধ্বনি সমস্যা আগে দূর করতে হবে।

বানান সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই দরকার বর্ণক্রম পদ্ধতির পরিবর্তন করা। বানান শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দের বানান ভালো করে শিখিয়ে অপরিচিত শব্দের বানান পরে শেখাতে হবে। তারা যে সমস্ত বই পড়বে, সেই বইয়ে সঠিক বানান থাকতে হবে, ভুল থাকবে না। প্রতিদিন বানান লেখার অভ্যাস করবে শিক্ষার্থীরা। বই, সাইনবোর্ড বা পোস্টারে ভুল বানান থাকবে না। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীরা নতুন শেখা বানানগুলি বারবার অনুশীলন করবে। উচ্চারণভিত্তিক বানান হতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে 'র' ও 'ড়'-এর পার্থক্য ঠিক করে দিতে হবে। সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থগুলি ঠিকভাবে লিখতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি শব্দ শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারে, তার দিকে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সঠিক বানান ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা পড়াবার সময় ব্ল্যাকবোর্ডে সঠিক বানান লিখবেন। সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ বা বানান শিক্ষার্থীকে শিক্ষিকা বা শিক্ষক ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বাংলা বানানের নিয়ম শেখাবেন। শিক্ষার্থীদেরকে বানান সম্পর্কে মনোযোগী হতে হবে। তবেই বানান সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

বাংলা বানান সংস্কার ও বানান প্রমিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বানানের সংস্কার ও সমতাবিধানের চেষ্টা ২০০ বছরে ধরে চলে আসছে। কেননা, এটা অত্যন্ত জরুরী। যেমন—ইংরেজিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ২৬, কিন্তু বাংলাতে ৫০টি। বারবার সংস্কার করলেও বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা কমেনি। কিন্তু বর্ণের সংখ্যাল্পতা উচ্চারণের পথে কোনো বাধা হয় না। তাহলে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা কমানো দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে 'বাংলা বানানের নিয়ম' স্থির করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬-এ বাংলা বানান সম্পর্কে প্রথম পুস্তক বের করেন। দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এখানে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না বলা হয়। অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। শব্দের শেষে হসন্ত চিহ্ন হবে না। মূল সংস্কৃতে ঈ বা ঊ তদ্ভব বা অনুরূপ শব্দে 'ঈ' বা 'ঊ' অথবা বিকল্পে 'ই' বা 'উ' হবে।

মূল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহৃত শ, ষ, স তদ্ভব শব্দে একই থাকবে। সংস্কৃত শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না (যশ, মন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের এই সমস্ত নিয়মাবলী প্রকাশের পর বাংলা বানানের সমতাবিধান ও প্রমিতকরণের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলা বানানের বিকল্প পরিহার, সমতাবিধান ও প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানানে সংস্কার করেছেন। এবং অর্ধতৎসম শব্দের বানানকে যথাসম্ভব ধ্বনিসংবাদী (বাংলা) করার পদক্ষেপ নিয়েছে। যে সমস্ত শব্দের বানান দীর্ঘ ঈ / দীর্ঘ ঈ-কার এবং হ্রস্ব ই / হ্রস্ব ই-কারের মধ্যে বিকল্প আছে, সেক্ষেত্রে প্রচলিত বানানটি গ্রাহ্য হবে বলেছে বাংলা একাডেমি। ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে হ্রস্ব ই-কারের প্রয়োজন নেই। শব্দান্তে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। ক্ষ, জ্ঞ শব্দের শুরুতে খ, গ ও শব্দের মাঝখানে ক্, খ ও গ্ দিয়ে লেখা চলবে। মূলের মূর্ধণ্য 'ণ' স্থলে সর্বত্রই 'ন' হবে (বর্ণ > বরণ) স্ত্রীবাচক শব্দের প্রত্যয়ে 'ই'কার হবে (ইনি, আনি)। জাতিবাচক শব্দেও 'ই' কার হবে (জাপানি)। বিদেশি শব্দে কেবল দন্ত্য 'ন' ব্যবহৃত হবে।

এছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী ও বানান সংস্কারেরর প্রয়াস চালিয়েছে। সেখানে বর্ণসংখ্যা কমানোর কথা বলা হয়নি, সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে হস্ চিহ্নের ব্যবহার না করেই বিযুক্তভাবে পাশাপাশি বসিয়ে বানানকে সরল করার চেষ্টা হয়। যেমন—যত্ন > যতন। তবে এতে বাংলা ব্যাকরণ বিপন্ন হয়েছে। তাই সুনীতিকুমার রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা বলেছেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতে, আনুনাসিক বর্ণের ক্ষেত্রে হিন্দির মতো 'বিন্দু' (.) ব্যবহার করতে বলেছেন।

বাংলা বানান সমস্যা শিক্ষার্থীদের সমস্যায় ফেলে। তাদের লেখার মান নষ্ট করে। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম উচ্চারণ সমস্যা। কারণ আমরা কথা বলার সময় উচ্চারণ করি একরকম আর লিখবার সময় লিখি অন্যরকম। যেমন—'যক্ষ' শব্দটি বলবার সময় উচ্চারণ করি 'যক্‌খ'। এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে। বাংলা বানানে এই বৈষম্য থাকা উচিৎ কিনা, তা ভাবা দরকার। বানান সংস্কার করা যেমন দরকার, তেমনি উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী বর্ণমালাকে সাজানোও দরকার। এজন্য অপ্রয়োজনীয় অক্ষর যেগুলি উচ্চারণ করা যায় না, সেগুলি বাদ দেওয়া দরকার। যেমন—স্বরবর্ণে 'দীর্ঘস্বর' আমাদের উচ্চারণে আসে না। তাহলে 'ঈ' ও 'ঋ' এর উচ্চারণ হয় না, 'র' বলতে বা উচ্চারণ করতে হয়। যেমন ঋণকে উচ্চারণ করা হয়নি। আবার 'তৃণ' তে 'ঋ' কার ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে 'র' এর উচ্চারণই বেশি। সুতরাং আদ্যক্ষরে 'ঋ' 'র' হয় বলে 'র' উচ্চারণই বাঞ্ছনীয়। আবার ঐ কারকে ও-ই লেখা যায়। কিন্তু তাতে বেশি সময় ও পরিসর লাগবে। সুতরাং 'ঐ' কারের ব্যবহারই হবে (বই > বওই)। অনুরূপভাবে 'ঔ' কারকেও 'ওউ' ব্যবহার করার দরকার নেই। কেননা, 'ওউ' এর চেয়ে 'ঔ' ব্যবহারের উপযোগিতাই বেশি। এতে সময় ও পরিসর কম লাগবে (বউ > বওউ)।

স্বরবর্ণের মতো বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী বেশ কয়েকটি অক্ষর বাদ দিয়ে বর্ণমালা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। যেমন—'ক' থেকে 'ম'-এর মধ্যে ঙ, ঞ, ণ বাদ দেওয়া যায়। 'য' এর উচ্চারণ 'জ' হয়েছে। সুতরাং 'য' বাদ যেতে পারে। শুধু প্রত্যয়জাত বাংলা বানানের জন্য 'য' কে রাখতে হবে। 'শ', 'স' ও 'ষ' এই শিস ধ্বনিগুলির মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে 'ষ' ও 'স' লুপ্ত হতে পারে। কেবল 'শ' এরই উচ্চারণ হবে। 'ৎ' এরও ব্যবহার নেই। এর বদলে 'ত' ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং 'ৎ' অনায়াসে বাদ যেতে পারে এবং 'ত'-এর ব্যবহার সচেষ্ট হতে পারে। এতে বাংলা বানানের সমস্যা কমবে। বাংলা বানানের সমস্যা হল যুক্তাক্ষরের ব্যবহার। যেমন পত্রিকার 'নার্স' শব্দটিকে বানানে লেখা হচ্ছে নারস্। শিশু উচ্চারণ করছে না-রস ফলে বর্ণ ও অর্থের বিপর্যয় ঘটছে। যেজন্য সর্বত্র যুক্তাক্ষরের স্বরবিভক্ত রূপ গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার করতে হবে। বাংলা ভাষায় সরলীকরণের ঝোঁক ও উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী বানান লিখতে হবে। তবে স্থান ও সময় দেখতে হবে। তাই 'যুক্তি' কে 'যুক্‌তি' লেখার দরাকর নেই। অনুরূপভাবে বাংলা বানানে হসন্ত ব্যবহারেরও দরকার নেই। বাংলা বানানের দুই 'ব' এর মধ্যে 'ব' (ওয় বা wa) অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বর্গীয় 'ব' দিয়েই সব কাজ চালাতে হবে। আসলে দুই 'ব' এর উচ্চারণ এক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চারণ ভিত্তিক বাংলা বানান হলে বানান সমস্যা অনেক কম হবে। আর বানান সমস্যা না থাকলে তবেই পরিভাষার ব্যবহারও সঠিক হবে। পারিভাষিক শব্দে সমস্যা কম হবে।

পরিভাষা জোর করে ব্যবহৃত হয় না। পরিভাষা ব্যবহার প্রয়োজনভিত্তিক। তবে পরিভাষা ব্যবহার করতে পারেন শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে নিরক্ষর মানুষও। সকলের ব্যবহারের জন্য সবরকম পরিভাষার সৃষ্টি হতে প্রাচুর্যই পরিভাষার সার্থকতা এনে দেয়। লোকে বুঝতে অক্ষম বা অপ্রয়োজনীয় পরিভাষা বর্জিত হওয়া দরকার। শব্দকে সহজবোধ্য হতে হবেই পরিভাষা হতে গেলে। পরিভাষার প্রত্যক্ষ ঋণ পদ্ধতিতে দেখা যায় সংস্কৃত আর বিদেশি শব্দ বা ইংরেজি শব্দ থেকে নতুন অর্থের শব্দ গঠন করা হয়। ইংরেজি ছাড়া বিদেশি ভাষা থেকে কমই পারিভাষিক শব্দ বাংলাতে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন কালের ধর্ম, সংস্কৃতি আচার-বিচার, আইন-কানুন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবি ফার্সি থেকে বহু পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্রবণতা কমে যাচ্ছে। সংস্কৃত থেকেই এই প্রত্যক্ষ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারটি যেন বেড়েই চলেছে। তবে সব সংস্কৃত শব্দ কিন্তু গ্রহণীয় হবে না। প্রশাসন, আইন-আদালত, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাধারণ ভাষায় কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন সাধারণ মানুষ যদি সেই পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করে, তবেই তা ভাষায় স্থায়ী আসন পায়, আর যদি সাধারণ মানুষ সেই পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ না করে, তবে তা একেবারেই হারিয়ে যায়। যেমন— Flyover শব্দের প্রতিশব্দ 'উড়াল পুল' লোকে মেনে নিলেও 'Hospital' শব্দের প্রতিশব্দ 'হাসপাতাল' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ লোক গ্রহণ করতে পারেনি।

মনে রাখতে হবে ভাষার সঙ্গে পরিভাষার সম্পর্ক গভীর। পরিভাষা ভাষার থেকে আলাদা কোনো ব্যবস্থা নয়। এটি ভাষারই একটি অংশ। ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত উপাদান যা, পরিভাষারও তাই-ই। তবে অর্থগত দিক থেকে ভাষা ও পরিভাষা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আলাদা হয়।

পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি বিভাগের বহু সমস্যা আছে। যেমন—বাংলায় পদার্থবিদ্যা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। বিশেষ করে স্নাতক স্তরে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্র ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনে বা বই পড়ে। কিন্তু পড়ানোর সময় শিক্ষক নিজের অভিরুচি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম এই ভাষা ব্যবহারে থাকে না। কিন্তু বইতে নির্দিষ্ট নিয়ম এই ভাষা ব্যবহারে থাকে না। কিন্তু বইতে নির্দিষ্ট ভাষা থাকে। ফলে বিজ্ঞানের ছাত্রকে বই পড়তে গেলে ও শিক্ষকের আলোচনা শুনতে গেলে দুটি ভাষার সামনে এসে পড়তে হচ্ছে বইয়ের ভাষা তার মাতৃভাষা নয়। ইংরেজি বর্জনও পরিভাষা ব্যবহারের ফলে অপরিচিত ভাষা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আবার দীর্ঘদিন ছাত্র শিক্ষকের মৌখিক ভাষা শুনে আসছে, এটিও মাতৃভাষা নয় বা বাংলাও নয়। ইংরেজির প্রয়োগ এ ভাষায় যথেষ্ট হচ্ছে। ইংরেজির এই অনাবশ্যক ব্যবহার কানকে পীড়ন করছে। তাই এটিও গ্রহণযোগ নয়। সবার আগে মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার ব্যবধান কমাতে হবে। লেখার সময়ে ইংরেজি বা বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন—শক্তিকে এনার্জি বা তন্ত্রের পরিবর্তে সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। এতে ছাত্রের অনেক সুবিধা হবে, বাংলা ভাষার কোনো ক্ষতি হবে না। পদার্থ বিজ্ঞানের বইগুলিতেও দুর্বোধ্য বাক্যগঠন না করে বাক্যগঠনে সাবলীলতা আনতে হবে। ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও এখানে থাকবে। তবে স্বচ্ছন্দ গদ্যের ব্যবহার এতে থাকবে, যা পাঠককে পড়তে আগ্রহী করবে

পরিভাষার ব্যবহার থাকলেও সুবিন্যস্ত বাক্যগঠন ও ক্রিয়াপদের পরিচ্ছন্নতা বিষয়কে রসাগ্রহী করবে। আর এর ফলেই লেখার ভাষা ও মৌখিক ভাষা একেবারে কাছাকাছি আসবে।

পরিভাষা সমস্যা দেখা যায় অর্থনীতিতেও। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় যে অর্থনীতি রচিত হয়েছিল, তা কোনো বইভিত্তিক নয়। সাময়িক পত্রিকাতেই অর্থনীতি বিষয়ক রচনা প্রথম প্রকাশিত হল। অর্থনীতির পরিভাষা সমস্যা দূর করতে গেলে সংবাদপত্রে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা করতে হবে। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়কে লেখার ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি শেখান। ফলে নৃসিংহবাবু 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার' নামে একটি বই লেখেন। সাধারণ চলতি অনেক কথা এই বইয়ে ছিল। এখানে পরিভাষার আলোচনা ছিল। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার কৃষক' ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' বই দুটিও পরিভাষার আলোচনা পাওয়া যায় অর্থনীতি বিষয়ে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' নামক বইতে পরিভাষা তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"চালু পরিভাষা অনেক ক্ষেত্রেই আমার কাছে পরিহার্য বলে মনে হয়েছে।... অনেক সময় ইংরেজি শব্দের বহুবিধ অর্থ একবিধ করা হয় গায়ের জোরে। এসব কারণে পরিভাষা চয়নের জায়গায় প্রায়ই দরকার হয়েছে পরিভাষা নির্মাণের।"

আবার রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অনেক বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা ও পরিভাষার ব্যবহার ও সমস্যা সম্পর্কে নানা আলোচনা আছে। তিনি বাংলায় গৃহীত ইংরেজি শব্দ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজতত্ত্বেও পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মাতৃভাষার স্থান সর্বগণ্য। বাংলা ভাষা মাতৃভাষার স্থান লাভ করেছে অনেক সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের অবসানের পরও ইংরেজি রয়ে গেছে। ফলে মাতৃভাষা বাংলা খানিকটা বঞ্চিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইংরেজি প্রবেশ করেছে। এর জন্য যদিও পাঠ্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় করা উচিত ছিল, কিন্তু উচ্চশিক্ষায় দেখা গেছে ইংরেজিরই প্রাধান্য বেশি। সমাজ বিজ্ঞানেও বাংলা প্রায় নিষিদ্ধ, ইংরেজির ব্যবহার অত্যধিক। কিন্তু যে ছাত্র ইংরেজি জানে না তার অসুবিধা হবে। আবার যে শিক্ষক ভালো ইংরেজি জানে না, সেও পড়াতে পারবে না। এই সব কারণেই ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্বলিত একটি বই প্রকাশ করেন। সেখানে শব্দচয়ন ও পরিভাষা নির্ণয় করাও রয়েছে বিধিবদ্ধ উপায়ে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পরিভাষা সংক্রান্ত নানা বইও প্রকাশ করেছে। সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, মনোবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পরিভাষা ও পারিভাষিক শব্দাবলী সম্পর্কিত বইও প্রকাশ পেয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও পরিভাষার নানা সমস্যা রয়েছে। যেমন—সমাজতত্ত্বে মোট বই ছিল ৭ থেকে ৮টি। সবগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ করা হয় তখনই, যখন সেটি ইংরেজি আশ্রিত হয়। কিন্তু বিষয়গত ধারণার জন্য পরিভাষা অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা হয় না, ফলে ভুল থেকেই যায়। যেমন—'Institution'-এর বাংলা অর্থ 'প্রতিষ্ঠান'। সমাজতত্ত্বেও বলা হল 'Marriage is an Institution' অর্থাৎ অর্থ দাঁড়াল 'বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান।' কিন্তু তা হতে পারে না। সুতরাং 'Institution'-এর সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা হওয়া দরকার 'আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান'। সুতরাং বোঝা যায় সমাজতত্ত্বে পরিভাষা সমস্যা প্রবল।

এই সমস্যা দূর করতে গেলে সমাজতত্ত্বের বই লিখতে হবে বাংলা ভাষায় ও পরিভাষাকে কেন্দ্র না করে। বই লিখতে লিখতেই সমাজতত্ত্বের ভাষা তৈরি হয়ে যাবে। আর পরিভাষা বইতে কেন্দ্র করেই নির্ণয় করতে হবে। তাহলে সমাজতত্ত্বে পরিভাষা সমস্যা দূরীভূত হবে।

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের মতো লোকসংস্কৃতিতেও পরিভাষা সমস্যা আছে। লোকসংস্কৃতির যেসব ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, সেখানে সমস্যা হয়নি। কিন্তু যেখানে বিদেশি শব্দের পরিভাষাকে কম মাত্রাই গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন—ইংরেজি 'Folklore'-শব্দের বাংলা করা হয়েছে লোকসংস্কৃতি। কিন্তু এখানেই মূল সমস্যা। কেননা, কোনোমতেই 'Folklore'-এর প্রতিশব্দ 'লোকসংস্কৃতি' হয় না। কারণ 'Folk Culture'-এরও বাংলা প্রতিশব্দ 'লোকসংস্কৃতি'। শুধু এটিই নয় আরও অনেক শব্দে সমস্যা আছে। যেমন—'Folk song'-এর বাংলা অর্থ 'লোকসঙ্গীত'। কিন্তু 'Folk music' কেও 'লোকসঙ্গীত' বলা হয়। এ রকমটা তো হতে পারে না। আবার 'work songs'-এর বাংলা প্রতিশব্দ যদি 'কর্মসঙ্গীত' হয় তাহলে 'Labour songs'-এর পরিভাষা হওয়া উচিত 'শ্রমসঙ্গীত'। কিন্তু তা হয়নি। আবার 'Ballad' হল 'গীতিকা' বা 'গাথা' যা পালাগানেরই সদৃশ। কিন্তু গীতিকা বা 'Ballad'-এর অনেক বৈশিষ্ট্য পালাগানে নেই। তাছাড়া পালাগানের রচয়িতাকে পদকর্তা বলা হলেও গীতিকার রচয়িতার পারিভাষিক শব্দ 'গায়ক' বা গায়েন। Mime-কেও লোকনাটক বলার চেয়ে মূকাভিনয় বলা উচিত। আবার 'Fables' এর পরিভাষা বাংলাতেও হয়েছে 'গীতিবাচক লোককাহিনী'। সুতরাং লোকসংস্কৃতিতে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার নিয়ে সমস্যা আছে।

অনুরূপভাবে প্রাণীবিদ্যা বা বাণিজ্য শাখায়ও পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ নিয়ে নানা সমস্যা আছে। প্রাণীবিদ্যার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বেশিরভাগ বই-ই অন্যভাষা থেকে বিশেষ করে ইংরেজিকে অনুকরণ করে লেখা হয়েছে। ফলে এখানে পরিভাষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু এখানেও পরিভাষা সমস্যা আছে। একই শব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন আলাদা আলাদা পরিভাষা নির্মাণ করছেন। যেমন—জাতি কথাটাকে বোঝানো যেতে পারে 'Nation', 'tribes', 'caste', 'genus', 'species' ইত্যাদি নিয়ে। অর্থাৎ এই ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা অর্থ একই। এতে ভাষা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিভাষা নির্মাণ করতে গেলে প্রত্যেকটি শব্দের একটিমাত্র অর্থ থাকা প্রয়োজন। প্রাণীবিদ্যায় তাই পরিভাষা নির্মাণের সমস্যা দূর করার জন্য 'লিপ্যন্তর' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা কমেনি। কারণ লিপ্যন্তর উচ্চারণভিত্তিক হয়। ফলে ইংরেজি থেকে নেওয়া শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যেমন 'Lepus' 'স্তন্যপায়ী প্রাণী' আর 'Lepas' 'সন্ধিপদী প্রাণী'। কিন্তু উচ্চারণ এদের একই। ফলে উচ্চারণভিত্তিক লিপ্যন্তরের সাহায্য নিলে পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় আরও সমস্যা হবে। এই সমস্যা দূর করতে গেলে লিপ্যন্তর সব জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না। বৈজ্ঞানিক নামের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তর করা উচিত হবে না। প্রাণীবিদ্যার বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় পরিবেশনে ইংরেজি বা অন্যভাষার সাহায্যে না নিয়ে 'বাংলা পারিভাষিক অভিধান' রচনা করতে হবে। এর জন্য ভাষাবিদ্‌দের নিয়ে একটা সংস্থাও গড়ে তুলতে হবে। একই বিদেশি শব্দের বিভিন্ন পরিভাষা নির্মাণ করে নির্দিষ্ট একটি পরিভাষা নির্ণয় করতে হবে। শুধু তাই নয় পরিভাষা নির্মাণ করলেও প্রাণীবিদ্যার

বিষয়বস্তু অধিক বাংলা ভাষাতেই লিখতে হবে। এরই মাধ্যমে প্রাণীবিদ্যার পরিভাষা নির্মাণ ও ভাষা সমস্যার সমাধান হবে।

বাণিজ্য শাখায় অধ্যয়ন, গবেষণা ও চর্চাতেও পরিভাষা সমস্যা অনেক। ইংরেজিতে বাণিজ্য বিষয়ের পরিভাষা হল 'debit', 'credit', 'bank' বাংলাতে বলা হচ্ছে, 'জাবেদা', 'হিসাব', 'নগদান বই'। আর দুটো মিলিয়ে বলা হচ্ছে ব্যাংক ঋণ, ক্যাশ বই ইত্যাদি। আবার 'Account'-এর বাংলা পরিভাষা বিভিন্ন। যেমন— 'হিসাব', 'খাত', 'হিসাব খাত' ইত্যাদি। আবার ইংরেজিতে 'খাত'-এর প্রতিশব্দ 'head'। ডেবিট ও ক্রেডিট এর পরিভাষা এখনও সৃষ্টি হয়নি। তবে এতে ছাত্র বা শিক্ষকের কোনো সমস্যা হয়নি। আবার 'Trial Balance' এর উদ্দেশ্য 'হিসেবের গরমিল পরীক্ষা করা', তাহলে এর বাংলা পরিভাষা 'হিসাবমিল' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 'Trial Balance'-এর বাংলা করার হয়েছে 'রেওয়ামিল'। সুতরাং পরিভাষা নির্মাণে নানা সমস্যা রয়েছে এই বিভাগেও।

আলোচনার শেষে একথা বলতেই হয় পরিভাষা নির্মাণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে এ বিষয়ে নানা সমস্যা আছে। পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি সমস্ত বিভাগে পরিভাষা নির্মাণ করা অনিবার্য। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় যেভাবে ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তার জন্য তো বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু একই শব্দের পরিভাষা নানা জনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে পরিভাষা নির্মাণ করা যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম দাখিল করা উচিত। প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষাবিদ্‌দের নিয়ে একটা সমিতি গড়ে তোলা দরকার। সেখানে একটি শব্দের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা নির্মাণ করা হবে। তাহলেই সব বিভাগে এমনকী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পারিভাষিক শব্দ নির্মাণে কোনো সমস্যা থাকবে না। পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলাও ভালোভাবে ব্যবহৃত হবে। ইংরেজি বা বিদেশি ভাষার অনুকরণ থাকলেও স্নাতকোত্তর ও স্নাতক স্তরের গ্রন্থগুলিতে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার বেশি করা হবে।

৮.৩.১১.২: আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। পূর্ব বাংলার ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

৩। সত্যজিতের গদ্যভাষার বিবরণ দাও।

৪। বাংলা ভাষাবিজ্ঞানে সুকুমার সেনের অবদান লেখো।

৫। বিশ্বভাষা বলতে কী বোঝো? বিশ্বভাষা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

৬। বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবদান লেখো।

৭। বাংলা ভাষা ও তার উপভাষা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

৮। চমস্কি কে ছিলেন? বিংশ শতকের ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় চমস্কির অবদান লেখো।

৯। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ভাষাতত্ত্বচর্চা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

১০। 'শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান' বলতে কী বোঝো? উদাহরণসহ বিষয়টির ওপর বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করো।

১১। সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝো? এই বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

১২। পরিভাষা কাকে বলে? পরিভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

৮.৩.১১.৩: সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশোদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, ১৪০৫।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

১৭। 'সুকুমার সেন' (২০০২)—অলোক রায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

১৮। 'আলোচনা সার সংগ্রহ' (২০০০)—শতঞ্জীব রাহা সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

একক-১২

সমাজ ভাষা

বিন্যাসক্রম

৮.৩.৪.১ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

৮.৩.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৩.১২.১: সমাজভাষাবিজ্ঞান

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক। আর এই সম্পর্ক স্থাপনের মুখ্য অবলম্বন হল ভাষা। প্রাচীনকালে ভাষাকে কেন্দ্র করে গবেষকদের মধ্যে তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা যায়নি। কিন্তু আধুনিককালে সমাজভাষাকে নিয়ে গবেষকরা নানা তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করেই উদ্ভব হয়েছে সমাজভাষাবিজ্ঞানের (Sociolinguistics)।

অনেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটি পছন্দ করেন না। বরং তার পরিবর্তে Sociology of Language নামটি বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটিই বহুল প্রচলিত। ফিশম্যান একটিকে আর একটির পরিপূরক বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে—

> "The sociology of language focusses upon the entire gamut of topics related to social organization of language

> behaviour, including not only language usuage per se but also language attitude, over behaviour towards language users."

আসলে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্কই হল সমাজভাষাবিজ্ঞান। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য হল—সমাজে ব্যবহৃত যে সব ভাষা আছে, তার বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, সমাজে তার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণ। সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics শব্দটি বিংশ শতকের একটি শব্দ। এর আগে শব্দটি ছিল না। সমাজের সঙ্গে ভাষার যোগকে স্বীকার করেই ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজভাষাবিজ্ঞান কথাটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক স্বীকার করেছেন পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট। সমাজ ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি 'Social group'-এর কথা বলেছেন। তাঁর মতে ভাষার সৃষ্টি 'Social group' থেকেই। আর হুইটনি তো বলেই দিয়েছেন 'Language is a social institution' অর্থাৎ 'ভাষা হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।'

সামাজিক উপযোগিতাই ভাষার পরোক্ষ স্রষ্টা। তাই বিশেষ বিশেষ ভাষার উপযোগিতা বিশেষ বিশেষ সমাজেই মুখ্য। এই জন্যে সাধারণত এক একটি জাতির বা জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক ভাষা থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সামাজিক দিকটির উপরেই জোর দিয়েছেন—

> "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

এই সমস্ত ভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সমাজের আদিবাসী মানুষদের ভাষা নিয়ে প্রথম সমাজভাষাবিজ্ঞান স্পর্কে গবেষণা শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে যেসব ভাষাবিজ্ঞানী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁরা হলেন—ফ্রান্স বোয়েস, ম্যাকডেভিড, উইলিয়াম লেবভ, ফিশম্যান প্রমুখ। ফ্রান্স বোয়েস প্রথম মার্কিন দেশে আদিবাসী সমাজের মানুষদের ভাষা নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য তখনও সমাজভাষাবিজ্ঞান কথাটি আসেনি। ম্যাকডেভিড চারের দশকের মাঝামাঝি গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঞ্চলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনের ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু করে সেই অঞ্চলের উপভাষার 'Social analysis' করেছিলেন। তবে সমাজভাষাবিজ্ঞান কথাটির উদ্ভব তখনও হল না। ১৯৫২ সালে এ. কুরি সর্বপ্রথম Sociolinguistics শব্দটি ব্যবহার করেন। আর ১৯৫২ সালেই ব্রাইট প্রথম সমাজভাষাকে তাত্ত্বিকতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করেন নবম আন্তর্জাতিক ভাষা সম্মেলন। এরপর ১৯৬৪-তে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Sociolinguistics বিষয়ে সম্মেলন হয়। সেখানে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দেশ করে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে একটি আলাদা ভাষাবিজ্ঞান হিসেবে

চিহ্নিত কর হয়। তবে উইলিয়াম ব্রাইটই সর্বপ্রথম সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর সম্পাদিত Sociolinguistics বইতে—

> ".... linguistics DIVERSITY is precisely the subject .... matter of Sociolinguistics".

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উইলিয়াম লেবভ ১৯৭২ সালে 'Sociolinguistics pattern' নামে একটি বই লেখেন, তাতে Sociolinguistics নামটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তাঁর মতে এ এক অবান্তর নামকরণ। ভাষা মাত্রেই সামাজিক। সমাজ ছাড়া ভাষা সম্ভব নয়। কাজেই linguistics মানেই Sociolinguistics, তবে লেবভ বিকল্প নাম খুঁজতে গিয়ে 'The sociology of language' ইত্যাদি নামের উল্লেখ করেছেন। আর ফিশম্যান তো বলেই দিয়েছেন ভাষা সমাজেরই সঙ্গে যুক্ত, সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞান, (২) সচল বা পরিবর্তনশীল সমাজভাষাবিজ্ঞান ও (৩) প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

বর্ণাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞান সমাজ ভাষার একটি বর্ণনাত্মক দিক। ব্রাইটের মতে এই ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল ভাষা বৈচিত্র্যের বর্ণনা। ব্রাইটের মতো ফিশম্যানও সাতটি 'dimension'-এ ভাগ করেছেন—বক্তা, শ্রোতা, উদ্দেশ্য, ভাষার রূপ, Extent of Diversity, ও Situation। ভাষার বৈচিত্র্য নির্ভর করে বক্তার ওপর। আর বক্তা কেমন হবে তা নির্ভর করে সমাজের কোন্ স্তরের মানুষ, তার শিক্ষাদীক্ষা, তার কাজ, সে নারী না পুরুষ, তার বয়স, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর ও বক্তার condition factor-এর সাহায্যে।

সমাজের মধ্যে যে সব স্তর রয়েছে, তাকে উল্লম্বভাবে ভাগ করে দেখানো যায়। সমাজের সবচেয়ে উঁচু তলায় থাকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, ধনী, মার্জিত মানুষ। আর একেবারে নীচতলায় নিরক্ষর, গৃহহীন, আশ্রয়হীন, দরিদ্রতম মানুষেরা। মাঝখানে ক-টি তলা থাকবে সেটা এক দেশে এক রকমের পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এদের প্রত্যেকেরই ভাষার একটা আলাদা চেহারা আছে। আবার একই আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণিতে ভাষার বিভিন্নতাও প্রচুর। তবে শ্রেণিচরিত্র সবসময় ভাষার চরিত্রের নির্ভুল নির্ণায়ক নয়। যেমন—ভারতে গ্রামবাসী এবং শহরবাসীর মধ্যে বেশ বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। তাদের কথাবার্তা, চাল চলন সবই আলাদা। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালির ছেলে বাড়িতে বা শিক্ষকদের সঙ্গে একরকম কথা বলে, আবার বন্ধুদের মধ্যে বা রকের আড্ডায় অন্যরকম ভাষার ব্যবহার করে। সুতরাং এক এক সামাজিক স্তরে বক্তা এক এক রকম ভাষা ব্যবহার করে।

সমাজভাষার বৈচিত্র্য বক্তার ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি শ্রোতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে শ্রোতাকে আগে বিচার করে নিতে হবে। ফিশম্যানও স্বীকার করেছেন When প্রশ্নটির গুরুত্ব। শ্রোতা অনুযায়ী সমাজের মানুষ তার বক্তব্যের রীতি নির্ণয় করে। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের তৃতীয় মাত্রা

হল উদ্দেশ্য বা Setting। বক্তা কখন কি বলবে সেটি শুধু শ্রোতার ওপরই নির্ভর করে না, উদ্দেশ্য বা পরিপ্রেক্ষিতের ওপরও নির্ভর করে। যেমন—সভা-সমিতিতে একধরনের ভাষা, ঝগড়ায় অন্য ভাষা আবার আইনের সাংবাদিকতায় আর এক ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন—উপভাষা অঞ্চলের জার্মান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহার করে শিষ্ট হাই জার্মান ভাষা, কিন্তু বাড়িতে নিজের উপভাষাতেই কথা বলে। ভাষা ব্যবহারের এই সামাজিক বৈচিত্র্যকেই Functional variety বলা হয়। উপলক্ষ্য অনুযায়ী এই যে ভাষার বা উপভাষার Shifting হয়, যাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা Code Switching বলেন, তা সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি বড়ো আলোচনার বিষয়। ফিশম্যানের মতে শুধু ভাষারীতির বদল ঘটে না, বহুভাষী দেশে ভাষারও বদল ঘটে।

আমেরিকান ভাষা বিজ্ঞানীরা তো উদ্দেশ্যের দিক থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখতে চান। প্রথম হল যা আছে তার বর্ণনা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে একই ভাষার যেসব ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তার নাম দিয়েছেন তাঁরা Register (রেজিস্টার)। এই রেজিস্টারের নমুনা সংগ্রহ করে ভাষাগত লক্ষণ-গুলিকে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠভাবে বুঝে নেওয়ার যে চেষ্টা, বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের সেটাই প্রধান কাজ হওয়া উচিত বলে মনে করেন আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানীরা। আবার বাঙালিরা যখন নিজেদের সঙ্গে কথা বলে, তখন বাংলায় কথা বলে। এই মানুষই অফিসে গিয়ে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা বলে। আবার ধর্মস্থানে গিয়ে হিন্দুরা সংস্কৃত এবং মুসলমানরা আরবিতে কথা বলার চেষ্টা করবে। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ এই উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তনের বৈচিত্র্যকে খুঁজে বের করা।

আমাদের বাঙালি সমাজে দুটি ভাষা প্রচলিত আছে—আদর্শ সাধু বাংলা ও আদর্শ চলিত বাংলা। ১৯৫০ পর্যন্ত এই দুই ভাষা পাশাপাশি চলেছে। কিন্তু ১৯৫০-এর পর চলিত ভাষার প্রয়োগ বেড়ে যায়। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে চলিত ভাষা সংবাদপত্রে গৃহীত হওয়ায় সাধুভাষার সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচটি উপভাষার সৃষ্টি হয়। যথা—রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী। সুতরাং বক্তা কী উপলক্ষ্যে কোন্ ভাষা বা উপভাষা বলছে, এর Systematic nature পর্যবেক্ষণমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আদর্শ বক্তব্য।

সমাজের স্তরগুলিকে সাধারণত বহুতল বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়। সবচেয়ে উপরের তলায় থাকে সবচেয়ে শিক্ষিত, সম্পন্ন ও মার্জিত মানুষ। আর নীচতলায় নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের দল। এদের প্রত্যেকেরই ভাষার আলাদা চেহারা আছে। তবে একই আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণিতে ভাষার বিভিন্নতা প্রচুর দেখা যায়। অর্থাৎ শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়ম লেবভ দেখিয়েছেন যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিত্ত, জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির কারণে শিষ্ট কথ্য ভাষাও নানা রকম হয়ে পড়ে। ভাষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকাশব্যবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে। যে ভাষা যত উন্নত, তার প্রকাশ ব্যবস্থাটি ততই ব্যাপক। অনেকেই মনে করেন যে ভাষার প্রতিটি রকমফেরই

হচ্ছে তার একটি করে উপভাষা এবং বাংলা ভাষার মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথাবার্তা বলেন, তা পুরুষদের কথাবার্তার ভাষা থেকে কিছুটা আলাদা। বাংলা ভাষার এই মেয়েলি কথ্যরীতি আছে তাকে সুকুমার সেন বলেছেন—'Women's Dialect' বা 'মেয়েলি উপভাষা'।

সমাজে নির্দিষ্ট ভাষাবৈচিত্র্যের পরিমাণ ও প্রকার ব্রাইট যার নাম দিয়েছেন Eutent of Diversity সেটিও বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। যেমন—কিছু মানুষ কলকাতায় বসবাস করছে, তাদের ভাষার একটা বিশেষ রূপ আছে। সেখানে কাজের সূত্রে গ্রাম্য মানুষ এলে তাদের ভাষার রূপ অন্যরকম হবে। ফলে একই জায়গায় বসবাস করলেও তাদের ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। সবাই সবার ভাষা গ্রহণ না করলেও বুঝতে পারছে। এইভাবে একটি গোলমাল পাকানো ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ সেই দুই ভাষার মধ্যের বৈচিত্র্যকে খুঁজে বের করা।

ফিশম্যান এর কোনো নাম দেননি। তবে তিনি বলেছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দুটি ভিন্ন ভাষার সংযোগের ফলে ক্রয়োল (Creole) বা পিজিন (pidgin) জাতীয় মিশ্র ভাষার জন্ম হয়। তার সংগঠনও বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 'পিজিন' কথাটির উদ্ভব ইংরেজি 'business' কথাটি থেকে। চিনাদের মুখে কথাটি ওইরকম দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শহরে-বন্দরে বিভিন্ন ভাষার লোকেরা একত্র হলে তারা অনেকক্ষেত্রে নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে এই মিশ্রভাষায় কথা বলে। এটি মূলত দ্বিতীয় ভাষা এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য। এই মিশ্র ভাষা নিয়ে কাজ করাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আরেকটি এলাকা ইদানীং কালে গবেষকদের কাছে অধিকতর তাত্ত্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। সেটি হল Situational Shifting, ফিশম্যান যার নাম দিয়েছেন Situation। এখানকার সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ধরেই নেন যে একটি ব্যক্তি যে শুধু একটি বিশুদ্ধ অবিমিশ্র ভাষা আয়ত্ত করে তা নয়, সে একাধিক ভাষা বলতে পারে। কিংবা সে একই ভাষার একাধিক রীতি উপভাষা বা সমাজভাষাও ব্যবহার করতে পারে। যেমন—একজন মানুষ নিজেদের সঙ্গে একরকম ভাষায় কথা বলে, কিন্তু সে যদি চাকরিসূত্রে বা অন্য কোনো কারণে অন্যস্থানে যায় সেখানে সে অন্যরকম ভাষা বলেছে। ফলে একটি মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই নয় সে আগের ভাষা প্রায় ভুলে যাচ্ছে। ফিশম্যান বলেছেন Situation অনুযায়ী মানুষ আগের ভাষার ভুলে নতুন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। Situation অনুযায়ী মানুষের ভাষার পরিবর্তনের বৈচিত্র্য যেমন বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনারও বিষয়, তেমনি নতুন জায়গায় ভাষা নিয়েও বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

ফিশম্যান তাত্ত্বিকতার দিক থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে যে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হল পরিবর্তনশীল বা সচল ভাষাবিজ্ঞান (Dynamic Sociolinguistics)। সমাজ ভাষার উৎসের বিবর্তন, বিস্তার লাভ, সংকোচন ঐতিহাসিক দিক থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। উইলিয়াম

লেবভ এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা দ্বীপে বাস করে অনেক মানুষ। এর মধ্যে অল্প ও বেশি বয়সী ছেলেমেয়েও আছে। এরপর ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সেখানে বসবাস করতে গেলে স্থানীয় অল্প ছেলেমেয়েরা আগত মানুষদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু বেশি বয়স্করা স্থানীয় উচ্চারণ ও সংস্কৃতির গর্বকে আঁকড়ে ধরে থাকার ফলে সেই পরিবর্তনে তারা যোগ দিল না। এর ফলে যারা সাধারণ মানুষ তারা কোন্ ভাষা গ্রহণ করবে তা নিয়ে ধন্দে পড়ল। এই যে ভাষার পরিবর্তনশীলতা, একেই লেবভ বলেছেন—Dynamic Sociolinguistics। আবার একভাষার জনগোষ্ঠী যখন অন্য ভাষার দেশে কাজ বা বসবাস করতে যায়, তখন তাদের ভাষা ভাণ্ডারের সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় দ্বিভাষিকতার উদ্ভব হয়। ফিশম্যান দুই ধরনের দ্বিভাষিকতার কথা বলেছেন— স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা ও অস্থির দ্বিভাষিকতা। অনেক মানুষ কাজের সূত্রে কোনো জায়গায় গেলে গোষ্ঠী বিশেষে তারা দুটি করে ভাষাই বলতে থাকে। অনেকে একসঙ্গে নিজের ভাষাভাষী লোক থাকলে নিজের ভাষায় কথা বলে। আবার পাশাপাশি নতুন সমাজের ভাষাতেও তারা কথা বলে। এইভাবে তারা দুটি ভাষাকেই পাশাপাশি রাখে। ফিশম্যান এর নাম দিয়েছেন স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা। আর যদি গোষ্ঠীবদ্ধ না হয়ে ব্যক্তি অল্প কয়েকজনের সাথে কোনো জায়গায় যায়, তাহলে পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানকার ভাষাতেই তারা কথা বলে। ফলে নিজেদের মাতৃভাষা হারিয়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিকে বলেছেন অস্থির দ্বিভাষিকতা। মূলত একভাষী দেশে অস্থির দ্বিভাষিকতা যতটা সহজলভ্য, বহুভাষীদেশে আবার স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা ততটাই লক্ষণীয়। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ভাষার অনুকরণ এবং নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি মমতা ও গর্ববোধের মধ্যে কী বিচিত্র টানাপোড়েন চলে এবং তার ফলে ভাষার পরিবর্তন কতভাবে প্রভাবিত হতে পারে লেবভ তা দেখিয়েছেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের তৃতীয় বিষয়টি হল applied বা প্রায়োগিক বা ফলিত সমাজভাষাবিজ্ঞান। এক্ষেত্রে কে বলছে, কাকে বলছে, কখন বলছে, কী বলছে, উদ্দেশ্য কী তার ওপর নির্ভর করে যে ভাষারূপটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার চরিত্র। যেমন সরকারি বিজ্ঞপ্তি সর্বসাধারণের জন্য, এক্ষেত্রে ভাষারূপটি সরলতম ও সহজবোধ্য হওয়া চাই। যেন নিরক্ষর মানুষও শুনে বুঝতে পারে কী বলা হচ্ছে। আবার একজন বিশেষজ্ঞ যখন তাঁর নিজের বিষয়ে অন্য আর এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেন, তখন পরিভাষা ব্যবহারে তিনি সতর্ক থাকেন। যেন তাঁর বিষয়টি সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে ভাষার সৌন্দর্য, কাব্যিকতা, আলংকারিকতা কোনোটিই কাম্য নয়। তাই দেখা যায় ফলিত ভাষাবিজ্ঞানে কাম্যভাষার আলোচনা মুখ্য।

ব্রাইট ও ফিশম্যানের আলোচনায় কিছু বক্তব্যে মিল ও কিছু বক্তব্যে অমিলও আছে। কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ব্রাইট সেই ভাষার মানুষদের জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের কথা বলেছেন। এর নাম নির্ণায়ক বা diagnotic প্রয়োগ। কিন্তু ফিশম্যান Application বলতে মূলত পরিকল্পিত প্রয়োগ বোঝেন। এ প্রয়োগ নিয়ামক এবং এটি সামাজিক কল্যাণসাধনের সঙ্গে যুক্ত। যেমন—মাতৃভাষা শেখানোর

পদ্ধতির সংশোধন ও উন্নয়ন। কোনো কোনো প্রক্রিয়ায় মাতৃভাষা যেখানে হবে তার নীতি নির্ধারণ, অনুবাদের নীতি কি হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করবে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। কোনো সাহিত্যের নান্দনিক সুখকে সহজ অনুবাদের মাধ্যমে ফোটানো যায় না। সেজন্য আগে সেই ভাষার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জানতে হবে। ভাষার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করাও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। বিদ্যাসাগরকে আমরা বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে জানি, তার হাত ধরে বাংলা ভাষার যে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়েছে, তাও এই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিষয় অনুযায়ী ভাষার পর্যায় নির্ধারণ ও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ। আবার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার বাহন বা মিডিয়াম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধারাটিকে গুরুত্ব দিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলি হল— বানান সংস্কার, লেখ্য প্রণালীর উদ্ভাবন অর্থাৎ লেখার ভিন্ন স্টাইল সৃষ্টি করা, ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্ব দান ও জাতীয় ভাষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে যে ভাষা হয় তার মূলে আছে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

সুতরাং বোঝা যায় বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রয়োগমূলক সমাজে ভাষাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে। ফিশম্যানের সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই সরল শ্রেণিবিন্যাস তাত্ত্বিকভাবে সংগত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অত স্পষ্ট থাকে না। তাই বর্ণনামূলক ও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান জায়গায় জায়গায় এক হয়ে যায়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পাওয়া যায়, তা হল সমাজে বিত্তের বিচারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরভেদ আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বিত্তীয় স্তরে ভাষা অভ্যাসও কিছু আলাদা। বিত্ত, জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মান্য বা শিষ্ট কথ্যভাষাও কিছু পরিবর্তিত হয়। সামাজিক স্তরসূচক যে ভাষা অভ্যাস তার পরিবর্তন ঘটতে পারে উল্বম্বভাবে, মানে আর্থিক উন্নতির ফলে সামাজিক স্তরেও উন্নতি ঘটে। সেই সঙ্গে ভাষা অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। Horizontal বা সমান্তরাল ভাষিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় ভাষিক প্রকাশ যা গোষ্ঠীগত বা স্থানগতভাবে পরিবর্তন হয়। যেমন বাড়ির ভাষা আর শহরে এসে আর একরকম ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাষিক স্তরভেদের সম্পর্কে ব্লুমফিল্ড বলেছিলেন পাঁচ রকমের পার্থক্য থাকেত পারে। যেমন—সাহিত্যিক আদর্শ বা literay standard আদর্শ চালিত বা Colloquial Standard প্রাদেশিক আদর্শ বা Provincial Standard, আদর্শেতর বা Sub Standard এবং স্থানীয় উপভাষার Local Standard। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।

ভাষা কথা বলে অভ্যাস মানুষ অর্জন করে মাতৃক্রোড়ে, আপন পরিবারে, আপন গ্রামে বা মহল্লায়। আপন সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। কাজেই আমাদের দেশে ভাষা অভ্যাসের মূলে বাসস্থান গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তারপর শিক্ষক ও শিক্ষাস্তরের ভূমিকাও আছে। গ্রামীণ মানুষ যারা দরিদ্র, তারা শিক্ষার মধ্য দিয়েই মান্যভাষাটি অর্জন করে। তবে ভাষা অভ্যাস যে সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, সে

সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ অল্প। অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে আমাদের দেশের ভাষা পরিস্থিতির যোগ অস্বীকার করা চলে না। তবে বিস্তৃত অনুসন্ধান না করে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তেও আসা যায় না। কারণ স্থানীয় উপভাষার প্রভাব আমাদের দেশের গ্রামীণ মানুষদের ওপর এখনও প্রবল এবং তারই ফলে ভাষা অভ্যাসের পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং তালগোল পাকানো।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবদান

ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল প্রাচীন যুগে। প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার জগৎ ছিল পাণিনি এবং অন্যান্য বৈয়াকরণদের কেন্দ্র করে। মধ্যযুগে বাংলা ভাষাচর্চার প্রায় অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল। মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগে বাংলা ভাষাচর্চার পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্তি হয়েছিল, সেখানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান হোতা।

উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ অর্থাৎ ১৮৯০-তে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। তবে তিনি মূলতঃ বিশ শতকেরই ভাষাতত্ত্ববিদ্। আর এই কারণেই উনবিংশ শতকের অন্ধকুসংস্কার, ধর্মীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমস্ত কিছুকে তিনি যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে বিচার করেছেন।

সুনীতিবাবু ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি পাঠশালায় পর্ব শেষ করে প্রথমে ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিকে পড়লেও শেষপর্যন্ত ভর্তি হন মোতিলাল শীল প্রতিষ্ঠিত ফ্রি স্কুলে। ১৯০৭ সালে ওই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। স্কটিশ চার্চেস কলেজে ফার্স্ট অফ আর্টস পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৯০৯-এ এফ. এ পাস করে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওখানেই ১৯১১-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। এম. এ ক্লাসে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেও ১৯১৩-তে হলেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ছাত্রজীবনেই অনেক প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপককে তিনি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় কলেজজীবন থেকেই তিনি বাংলা, ইংরেজি বা সংস্কৃত নয় গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। আবার শুধু ভাষা ও সাহিত্য নয়—ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য—দর্শন-ভূগোল ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তবে ভাষা ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে আগ্রাসী ক্ষুধা তাঁর ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়াকালীনই তিনি মাতৃভাষা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেন। তবে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা মূলতঃ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যেমন—

(ক) জীবনের প্রথম দিকে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে বৈদিক সংস্কৃত পড়তে গিয়ে।

(খ) শিক্ষাকালীন দেশ-বিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের সাহায্য পেয়েছিলেন। যেমন—ড. আর্কুহার্ট, ড. স্টিভন্, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এইচ. এম. পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ,

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। ফলে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটে। লন্ডনে পড়ার সময় গুরু হিসেবে সুনীতিকুমার পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি. এল. বার্নেট ও পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যুল ব্লক এবং আঁতোয়ান মেইয়েকে।

(গ) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানসিক হৃদয়বৃত্তি ও বিশ্বমানবতাবোধ সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত হয়। বলতে দ্বিধা নেই এসব কারণেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞানতৃষ্ণা বিশ্বতোমুখী রূপ পায়। ফলে ভাষাতত্ত্বচর্চার নতুন দিগ্‌নির্ণয় স্বরূপ নানা গ্রন্থ তিনি লেখেন।

ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় সুনীতিকুমার অনেকগুলি ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ লিখেছেন। এদের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর লিখিত বক্তৃতার সংকলন। ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) The Origin and Development of the Bengali Language (1926)

(২) A Brief sketch of Bengali phonetics (1921)

(৩) Bengali self Taught (1927)

(৪) A Bengali phonetic Reader (1928)

(৫) Indo-Aryan and Hindi (1942)

(৬) Languages and Linguistic problems (1943)

(৭) Scientific and Technical Terms in Modern Indian Language (1953)

(৮) Dravidian (1965)

(৯) The people, Language and Culture of Orissa (1966)

(১০) Phonetics in the Study of Classical Languages in the East (1967)

(১১) Balts and Aryan (1967)

(১২) One the Development of Middle Indo-Aryan (1963)

বাংলা গ্রন্থ—

(১) বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—(১৯২৯)

(২) ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ— (১৯৪৫)

(৩) সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—(১৯৫৫)

(৪) ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা—(১৯৪৪)

(৫) সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)—(১৯৬১ ১ম) ও (১৯৬৫ ২য়)

(৬) বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গ—(১৯৭৫)

সুনীতিকুমারের 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটিই প্রথম ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' প্রকাশিত হলে, তার ভাষা যে বাংলা তা বিচার সাপেক্ষ ছিল। সেই বিচার সুনীতিবাবু করলেন O.D.B.L গ্রন্থে। তিনি এখানে প্রমাণ করেছেন চর্যার ভাষা বাংলা দোঁহার ভাষা বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষা। গ্রন্থটিতে তিনি বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে তিনি চারটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যথা—প্রথম পর্ব, উৎক্রান্তি পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব ও তৃতীয় পর্ব। এখানে তিনি 'Fortunavo's Law' এর কথা বলেছেন। বলেছেন মাগধী প্রাকৃতে 'র' এর উচ্চারণ 'ল' এর মতো হয়। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিত, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি প্রভৃতির আলোচনায় সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের পঠন-পাঠনে সহজ পথ খুলে দিয়েছেন। শব্দবিদ্যা, বানান সমস্যা, উচ্চারণ, অভিধান, ক্রিয়া, বাচ্য, পরিভাষা, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বাংলা ভাষার বিচিত্র দিক O.D.B.L গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন।

O.D.B.L গ্রন্থটির বর্ণনা বা বিশ্লেষণে সুনীতিবাবুর তিনটি বৈশিষ্ট্য কাজ করেছিল। যথা—(ক) প্রাচ্য বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। (খ) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের (ডানিয়েল জোনস), জ্যুল ব্লক প্রমুখ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (গ) রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ। গ্রন্থটিতে মূলত আলোচিত হয়েছে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব। কিন্তু শব্দার্থতত্ত্ব ও বাক্যগঠনতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। তবে এরও কারণ আছে। শব্দতত্ত্ব মানুষের খেয়াল অনুযায়ী বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শব্দের অর্থগত দিকের রূপান্তর হয় বলে তিনি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি। আর বাক্যতত্ত্বের অনেক রীতি রূপতত্ত্বে আলোচিত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ এড়াবার উদ্দেশ্যে আলোচিত হয়নি।

O.D.B.L রচনার পর সুনীতিকুমার তাঁর অন্যান্য রচনায় যে যে গ্রন্থগুলির প্রেরণা স্বীকার করেছেন, সেগুলি হল—

১। পাণ্ডুরঙ্গ দামোদর রচিত—An Introduction of comperative Bengali Language

২। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর রচিত—'Widson philological Lectures'

৩। আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের—'Linguistic Servey of India'

৪। ও. এস. এইচ. কেলগ এর—'A Grammar of the Hindi Language'

৫। হর্ণলেন—'A Comparative Grammar of the Gaudian Languages'

৬। সুভদ্র ঝাঁ রচিত—'Formation of the Maithali'

৭। ড. উদয় নারায়ণ তেওয়ারী রচিত—'The origin and Development of Bhojpuri'

সুনীতিবাবুর রচনায় প্রধান দুটি দিক—

(i) বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও

(ii) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি

এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

সাধারণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে নব্যভারতীয় আর্যাভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায় ড. গুণের লেখা 'An Introduction to comparative philology' তে। তারপর সাতটি প্রধান নব্য ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায় বীমসের 'A comparative Grammar of the Modern Aryan Language of India' গ্রন্থে। কিন্তু একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (বাংলা) বিবর্তন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা সুনীতিকুমারই প্রথম করেছেন।

অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীর মতো সুনীতিকুমারও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে 'সতম' ও 'কেন্তম' ভাষাগুচ্ছে ভাগ করেছেন। কিন্তু এর মূলে যে জাতিভিত্তিক ভৌগোলিক পার্থক্য আছে, সেটি সুনীতিকুমার বুঝতে পেরেছিলেন। 'কেন্তম'-কে তিনি বলেছেন পশ্চিমী গুচ্ছ। তাঁর মতে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনসাধারণ খাঁটি অবিমিশ্র আর্যজাতি। ভাষাচার্য তাঁর 'The origin and Development of the Bengali Language' (1970) গ্রন্থে বলেছেন—

"There is again, no proof that primitive unmind race"

পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সেখানেও বাঙালি জাতির মূল জাতিগত উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে বাঙালি কোনো একটি মাত্র জাতি নয়; এই জাতি চারটি জাতির মিশ্রণে গঠিত। O.B.D.L গ্রন্থ তিনি বলেছেন—

> "Four tribes, pundra, vanga, radha and sumna, were the important ones who gave their names to the various tracts they inhabited"

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সুনীতিকুমার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেরও চর্চা করেছেন। এই হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'A Brief Sketch of Bengali phonetics' গ্রন্থে। এখানে তিনি আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলির এককালিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। সুনীতিকুমার এই কাজটি করেছিলেন পাশ্চাত্য সোস্যুর ও ব্লুমফিল্ডের বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার আগেই। তবে এ গ্রন্থে তিনি

আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের পরিভাষা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি, কোথাও কোথাও সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেকেক্ষেত্রেই বর্ণনামূলক।

সুনীতিকুমার যখন ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই শব্দের উচ্চারণ ও তার লিখিত রূপ তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৯১৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য যে গবেষণা প্রকল্পটি তিনি জমা দেন, তার সঙ্গে নমুনা হিসেবে দেন বাংলা ধ্বনি সম্পর্কিত 'The sounds of Modern Bengali' নামে অভিসন্দর্ভটি। ১৯১৮ সালে 'Bengali Phonetics' নামে তাঁর একটি রচনা 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২১ সালে বুলেটিন অভ দ্য স্কুল অভ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের দ্বিতীয় ভল্যুমের পার্ট সংখ্যায় Bengali phonetics প্রকাশিত হয়। পুস্তিকা আকারে যখন এটি প্রকাশ পায়, তখন এর নাম হয় 'A Brief sketch of Bengal phonetics' এরপরই একে একে বের হয় ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার বই 'Bengali self taught' ও 'A Bengali phonetic Reader' বইটি। এই বই দুটির অংশে সুনীতিবাবু বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ বর্ণ ও ধ্বনির সম্পর্ক, ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত ও সুরতরঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফলিত বা প্রয়োগিক ধ্বনিবিজ্ঞানে সুনীতিকুমারের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

প্রথমে তাঁর ধারণা ছিল শব্দে প্রথম অক্ষরের (Syllable) স্বর দীর্ঘ হয়। পরে লন্ডনে ফলিত ধ্বনিবিজ্ঞানজাত অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্তে আসেন যে, একাক্ষর শব্দে বাঙ্গালা 'আ' দীর্ঘ (রাম, ধার - রা - ম্) কিন্তু একাধিক অক্ষরের শব্দ হলে 'আ' হ্রস্ব হয়ে যায় (রামা - রাম - মা)। ভাষায় ধ্বনির পৌনঃপুনিক ব্যবহারের শতকরা হিসেবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সুনীতিকুমার অবহিত ছিলেন। O.B.D.L গ্রন্থে তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এখানে তিনি সংস্কৃত স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনের একটি পরিসংখ্যানগত তুলনা করেছেন। তবে সুনীতিবাবুর ধ্বনিবিজ্ঞান শুধুমাত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তারও আগে সংস্কৃতধ্বনির উচ্চারণ কেমন ছিল বা পাণিনির সময় বা তার পরবর্তী শতকগুলোতে সংস্কৃত ধ্বনির উচ্চারণের পরিবর্তন সম্পর্কে নানা আলোচনা তিনি করেছেন। O.B.D.L গ্রন্থেও তিনি সংস্কৃত ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সুনীতিকুমার ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনসের ছাত্র ছিলেন। জোনস ধ্বনিমূলকে ভৌত বা Physical দিক থেকে বিচার করেছেন। সুনীতিকুমারও একই রকমভাবে ধ্বনিমূল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। Bengali phonetics বইটি এবং A Bengali phonetics Reader বইটির অংশবিশেষে তিনি ধ্বনিমূল ধারণা প্রয়োগ করে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় ধ্বনিবিজ্ঞান। আর এই ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়েই সুনীতিকুমার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। স্বরধ্বনির দুটি ভাগ—মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি। আর এই যৌগিক স্বরধ্বনিই একটি ভাগ দ্বিস্বরধ্বনি। এই দ্বিস্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনাও সুনীতিকুমার করেছেন। দ্বিস্বর গঠনের প্রাথমিক শর্ত হল একই প্রয়াসে একটি বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি উচ্চারিত হবে। দ্বিস্বরের

সংখ্যা নির্ণয়ে নানা সমালোচক নানা মত দিলেও সুনীতিকুমারের মতে দ্বিস্বরের সংখ্যা মোট ২৫টি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বাংলা ভাষিক পরিবেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ২৫টি দ্বিস্বরের কথা বলেছেন—

"Of Bengali dipthongs, only two have special letters for them, namely (oi) = ঐ and (ou) = ঔ In the N.B. standard colloquial, as many as 25 vowel combinations and dipthongs are found : [ie,ia, io, iu, ei, ea, eo,eu, aee, aeo, ai, ae, ao, aui, ce, ca, co, oi, oe, oa, ou, ui, ue, ua, uo]"

দ্বিস্বরগুলি উচ্চারণ অনুযায়ী এইরকম হতে পারে। যেমন—

(১) ই এ - দিয়ে

(২) ই আ - দিয়া

(৩) ই ও - নিও

(৪) ইউ - শিউলি

(৫) এ আ - খেয়া

(৬) এও - যেও

(৭) এউ - কেউ

(৮) এই - নেই

(৯) এ্যা - ন্যায়

(১০) এ্যাও - ম্যাও

(১১) অ্যাও - খাও

(১২) আউ - লাউ

(১৩) আই - খাই

(১৪) আএ - আয়

(১৫) অও - হও

(১৬) অএ - ভয়ে

(১৭) অআ - হয়া

(১৮) ওউ - মউ

(১৯) ওই - বই

(২০) ওএ - লয়ে

(২১) ওআ - শোয়া

(২২) উই - ধুই

(২৩) উএ - শুয়ে

(২৪) উআ - শুয়া

(২৫) উও - শুয়ো

তবে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার অর্ধস্বর (ই, উ, ও, এ) গুলিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁর তালিকায় ইঅ, এআ, এও, অএ, উআ এই দ্বিস্বরগুলির অন্বয় খুব কম ও অনিয়মিত। তাই সুনীতিবাবুর সব দ্বিস্বরগুলির গ্রহণযোগ্য নয়।

O.B.D.L গ্রন্থের মতো 'Indo-Aryan and Hindi' গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করেছেন। আবার, 'Language and Literatures of modern India' গ্রন্থে তিনি সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন। 'Dravidian' গ্রন্থে ভারতীয় আর্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্বদিকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 'The people Language and Culture of Orissa' গ্রন্থে সুনীতিকুমার শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে উড়িয়া ক্রম বিস্তারিত রূপ আলোচনা করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে 'স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ও মহাপ্রাণ বর্ণ' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রথমটিতে স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি প্রভৃতির উচ্চারণরীতি আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'হ' ধ্বনি ও মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির উচ্চারণরীতি ও তাদের উচ্চারণে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রভাব ও পরিবর্তন আলোচিত হয়েছে।

একটি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ লেখার উদ্দেশ্যে সুনীতিকুমার লিখেছেন 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালার নিজস্ব রীতির বর্ণনা এখানে যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যাকরণ বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৪০ সালে গুজরাট ভারনাকুলার সোসাইটি গবেষণা ও স্নাতকোত্তর বিভাগের আমন্ত্রণের জন্য দুটি কোর্স লেকচার সুনীতিবাবুকে দিতে হয়। যথা—ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও হিন্দি ভাষার বিকাশ ও বর্তমানে হিন্দি ভাষার অবস্থান। এই বক্তৃতামালাই কিন্তু পুস্তকাকারে 'Indo-Aryan and Hindi' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয়, দ্রাবিড় নিষাদ, কিরাত ভাষীদের কথা, ভারতীয় আর্য জাতির আদি, মধ্য ও আধুনিক ভাষার পর্যালোচনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সাহিত্য, সংস্কৃতি,

ব্যাকরণও এখানে আলোচিত হয়েছে। বইটির শেষার্ধে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইরানীয় ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করেছেন। 'Language and Literatures of modern India' বইটিতেও তিনি ভারতীয় আর্য ভাষা ছাড়া অন্য আর্যেতর ভাষার বর্ণনা করেছেন। তেমনি আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে নানা তথ্য সম্বলিত বর্ণনা আছে। 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' গ্রন্থে তিনি ভারতের আধুনিক আর্য ভাষাসমূহ এবং দ্রাবিড়, কিরাত ও নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনার পটভূমিকায় হিন্দি, হিন্দুস্তানী, খড়ী, বোলী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার অবস্থান, মান, সমস্যা ও ভারতে ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন। আর 'বাঙলা ভাষার কুলজী' প্রবন্ধে তিনি ভাষাচর্চায় বাংলার নিজস্ব রীতির সন্ধান করেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার শুধুমাত্র ভাষিক বিশ্লেষণ ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যই বর্ণনা করেননি। তিনি ভাষা ছাড়া ভারতীয় জাতি, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছেন। যেমন— 'Kirata-Jana-Kriti' বইয়ে তিনি ভারতে আগন্তুক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। 'The Indo Mongoloids' গ্রন্থে ভোট চিনীয় ভাষা বা মোঙ্গলয়েড ভাষার উৎস ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৬৫ সালে অতমবপু শর্মার তিরোধানের এক বছর পরে এক বক্তৃতাসভায় সুনীতিবাবু ভারতের জাতীয় ঐক্য ও হিন্দু সংস্কৃতি এবং মণিপুরী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবার 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩) গ্রন্থে দেশ-বিদেশের প্রচলিত ইতিকথা আছে। বিশ্বমানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এখানে আছে। আয়ারল্যান্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কাহিনি 'দেরদিউ' ও জার্মান জাতির প্রচলিত উপাখ্যান 'ব্রুনহিল্ড' এবং চিনীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৭ সালে সুনীতিকুমার মালয়, সুমাত্রা, জাভা, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে যান। ১৯৪০ সালে 'দ্বীপময় ভারত' ও ১৯৬৫ সালে 'রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ' নামে সেই ভ্রমণের বর্ণনা প্রকাশিত হয়। আবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধমালার সংকলন 'মনীষী স্মরণে' গ্রন্থে বিভিন্ন সাহিত্যিক, ব্যাকরণকার, অভিধান রচয়িতা, ভাষাতাত্ত্বিক, অভিনেতা ও প্রবন্ধকারের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে সুনীতিবাবু আলোচনা করেছেন।

এরই পাশাপাশি 'সাংস্কৃতিকী' (২য়) গ্রন্থে সুনীতিকুমার বেদের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'ঋক সংহিতা'র রচনাকাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক বেদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। শ্রদ্ধা ও উচ্ছ্বাসবশত প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন 'ঋক সংহিতা'র রচনাকাল ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও বেদ সংকলন ও বেদ বিভাগের কাল ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সুনীতিবাবু বিষয়টিকে দেখেছেন। অন্ধ শ্রদ্ধার বশে নয়।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সুনীতিকুমার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও করেছেন। 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। বলাবাহুল্য তিনি আধুনিক বঙ্গদেশে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ ছিলেন।

বাংলা ভাষার অভিধান সম্পর্কে সুনীতিবাবুর বক্তব্য খুবই মূল্যবান। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বকে প্রথম বাংলা শব্দ সংগ্রহ বলেছেন। এছাড়া অভিধান হিসেবে 'চলন্তিকা' কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'চলন্তিকা' হল চলিত ও সাধু ভাষার অভিধান। 'চলন্তিকা'র পরিশিষ্ট অংশে যে বাংলার ব্যাকরণের রূপটি রাজশেখর বসু দিয়ে গেছেন সুনীতিবাবুর তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এভাবেই বাংলা ভাষাতত্ত্বের ওপর তিনি কাজ চালিয়েছেন।

সুনীতিকুমার সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের সুবিশাল ঐতিহ্য সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণকে তিনি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সূত্রে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে অন্-আর্য উপাদান আছে। সুনীতিবাবুও অনেকটা সেই রকমই বলেছেন।

তাঁর 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ভাষা ও অন্যান্য উপভাষার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

'ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ' রচনায় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পশ্চাদ্‌পট কিছু অংশে গ্রহণ করেছেন। শুধু পারিভাষিক শব্দ গ্রহণে নয়, তাত্ত্বিক আলোচনাতেও সংস্কৃত ব্যাকরণ সুনীতিকুমারকে সাহায্য করেছে। তিনি সংস্কৃতের মতোই বাক্যে ক্রিয়াপদ সাপেক্ষেই কারক মেনেছেন। যদিও বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনামপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের Syntactic সম্বন্ধ ছাড়া কারকের আর কোনো পরিচয় তিনি দেননি। বাংলায় সম্প্রদান কারক বর্জন, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদির নাম বদলে 'কে'-রে-রে এর ইত্যাদি বিভক্তির উল্লেখ করে সংস্কৃতেরই আদলে সবকিছু আলোচনা করেছেন।

তিনি প্রাচীন ব্যাকরণবিদ্যা সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানে সার্থক হয়েছেন কিনা তা নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করেননি। বরং পাণিনি ও পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণদের দান সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের শ্রদ্ধা ছিল। 'বাংলা ভাষার কুলজী' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "পাণিনি, প্রাচীন শিক্ষাকার আর সংস্কৃত
>
> ও প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরা আমাদের নমস্য;
>
> সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চায় এই গুরুদেব ছাড়লে চলবে না।"

তবে আধুনিক ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সংস্কৃত—প্রাকৃতের মডেল ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি শুধু সংস্কৃত বা প্রাকৃতের দিকে নজর দেননি, অন্-আর্য ভাষাগুলির দিকেও নজর দিয়েছেন।

শুধু সংস্কৃতের ধাঁচ মানা নবীন ভাষার স্বাস্থ্যহানির কারণ বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষা অসহায়, বাংলার কৃত আর তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি পঙ্গু। আবার সংস্কৃতে বহুল অলংকার শোভনীয় হলেও বাংলাতে অলংকার বোঝাস্বরূপ বলে তিনি মনে করতেন। দেশের ভাষা-

সংস্কৃতর Composite চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন বলেই তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উদার দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণ তৎকালীন অভিজাত মানুষের ব্যবহার্য ভাষার ব্যাকরণ। এর ফলে পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাষার অন্তর্নিহিত যাবতীয় বৈচিত্র্য ও ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় অপারগ। সেই কারণে তিনি 'বাংলা ভাষার কুলজী' গ্রন্থে বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশে অন্-আর্য প্রতিবেশি ভাষারদানের সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। বাংলাতেও 'দ্রাবিড়' শব্দ' আছে সংস্কৃতের মতো, একথা তিনি বলেছেন। Kittel-এর কন্নাড়ী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় প্রায় ৪৫০ সাধারণ সংস্কৃত শব্দ যে দ্রাবিড় থেকেই নেওয়া, তা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন বৈদিকের রকমারি 'লকার' সংস্কৃতে বজায় আছে। তা প্রাকৃতে তিনটিতে ঠেকেছে। প্রাচীন দ্রাবিড়ে মোট দুটি কালবাচক রূপ ছিল। দ্রাবিড়েও 'ত', 'তবত্' প্রত্যয় দিয়ে সংস্কৃতের মতোই তিঙন্ত ক্রিয়ার কাজ সারা হত। তবে বৈদিকে তা হয়নি। দ্রাবিড়, কোলে ও ভোট - ব্রহ্ম ভাষায় Prefix এর হাঙ্গামা নেই, সবই Suffix। আমাদের ভাষাতেও তাই কিন্তু বৈদিকে তা ছিল না। বৈদিকে Preposition ছিল। সংস্কৃততে এই Preposition উপসর্গ হয়েছে। বাংলাতেও উপসর্গ আছে।

তবে সুনীতিকুমার মনে করেন অন্-আর্য ভাষীর মুখে না পড়লে আর্যধ্বনিগুলির ভারতে যে গতি দাঁড়িয়েছে, তা থাকত না। তিনি অনার্যের ছুঁতমার্গকে পরিহাস করে বলেছেন—

"বেদের সময় থেকেই আর্যভাষা অনার্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ করে জাতে তোলা যায় না।"

আর্য ও অনার্যের মিলিত সৃষ্ট যে বাক্সম্পদ তা ভারতের বহুমাত্রিক মিশ্র সংস্কৃতির ধাত্রী হয়ে উঠেছে, তাকে সুনীতিকুমার অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'কিরাত জনকৃতি' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "Sanskirt in its origin is an Aryan of Indo-European language, as we all know. But, in its evolution on the soil of India, the non-Aryan peoples had a share in its development in determining its tendenceis and its history helping to change its phonetics and its grammar and to modify and add to its vocabulary. It was thus a joint product of both Aryan and non-Aryan. So that it could become by 500 B.C. the most natural vehicle of a composite India—Aryan-cum non-Aryan culture."

এভাবেই সুনীতিকুমারের দৃষ্টিতে ভাষাতত্ত্বচর্চা সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্বরূপদর্শন হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ভাষা নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সুনীতিকুমার শুধু বাংলা ভাষার যুগবিভাগই করেননি, তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিগত রূপান্তর, শব্দের পরিবর্তন ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আরও নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষাকে

চারটি উপভাষায় তিনি চিহ্নিত করেছেন। যথা—রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। তিনি বলেছেন যে সব উপভাষাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত। এইসব ভাষার মধ্যে এমন কিছু 'বাঙ্‌লাত্ব' আছে, যার ফলে সব উপভাষা একটি ঐক্যবোধের দিকে এগিয়েছে। রাঢ়ী, বরেন্দ্রী প্রভৃতি উপভাষার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব তিনি লক্ষ করেছিলেন। বঙ্গালী উপভাষার পূর্ব সীমান্তের শ্রীহট্টিয়া, কাছাড়ী, ত্রিপুরী, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালির ভাষাতে এমন কিছু ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ করেন, যা বঙ্গালী উপভাষার অন্য সব আঞ্চলিক ভাষায় দেখা যায় না। ময়মনসিংহের ভাষাতেও এমন কিছু ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা মুখ্যত বোড়ো বা তিব্বতী-বর্মী ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানভূমের ভাষাতেও তিনি দ্রাবিড় প্রভাব লক্ষ করেছেন। আসলে তিনি ভাষার গভীরে প্রবেশ করে ভাষার গঠন প্রক্রিয়া, ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি ও শব্দগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির গভীরে তাকিয়ে তাদের স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন। তবে তিনি ঝাড়খণ্ড নামে কোনো উপভাষাকে চিহ্নিত করেননি। তিনি রাঢ়ী সীমান্তের উপভাষাকে রাঢ়ী নামে চিহ্নিত করলেও রাঢ়ী উপভাষার স্থান হিসেবে পশ্চিম সীমান্তের প্রত্যন্ত রাঢ়ভূমির ভাষাগুচ্ছের মধ্যে সাঁওতাল পরগণা। পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, সিংভূম ও উত্তর মেদিনীপুরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর মানভূমের ভাষার উদাহরণরূপে তিনি গ্রীয়ারসনকে অনুসরণ করেছেন। 'বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রকার বাংলার নিদর্শন দিয়েছেন, যার মধ্যে আছে ভাগীরথী তীরের চলিত ভাষা, মানভূমের মৌখিক ভাষা, কোচবিহার, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও বরিশালের কথ্যভাষা। তবে ভাষার নিদর্শন উপস্থাপনে ধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেননি।

একথা স্বীকার্য যে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পুরুলিয়াসহ বর্তমান ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সুনীতিকুমার ঝাড়খণ্ড না বলে রাঢ়ী বলেছেন। তবে তা 'পশ্চিম রাঢ়ী' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সুনীতিকুমারই প্রথম বাংলাদেশের চারটি প্রাচীন জনপদের ভাষাকে রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী নাম দিয়ে বাংলা ভাষাকে তাদের সমষ্টির ফল বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী ও বরেন্দ্রী উপভাষার মধ্যে তিনি এমন কিছু সংযোগ-লক্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে তিনি বলেন প্যান বেঙ্গলী, যা কথ্য ভাষারূপে ওই চারটি ভাষাকে পৃথক করলেও সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষারূপে রাঢ়ী ভাষার ভাগীরথী তীরবর্তী ভাষাকেই বাংলা ভাষা নামে প্রতিষ্ঠিত করে।

আর 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে তিনি তো দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষা সম্পর্কে কথ্য ভাষারূপেই আলোকপাত করেছেন। কোনো নতুন নামকরণ করেননি ওই উপভাষার। মেদিনীপুরের এই উপভাষাকে তিনি মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যবর্তী স্তরের একটি ভাষা বলে মনে করেছেন। আর এ ভাষাকে রাঢ়ীমুক্ত করতে গিয়ে রাঢ়ীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—'যথার্থ রাঢ়ী ভাষা' ও 'সাউথ ওয়েস্টার্ন বেঙ্গলি'। সাউথ ওয়েস্টার্ন বেঙ্গলির পাশাপাশি ওড়িয়া ভাষারও বর্ণনা তিনি করেছেন। গ্রীয়ারসনের মতো তিনি ওড়িয়া ভাষার পৃথক কোনো নাম দেননি। অবশ্য অনেক পরে ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি ওই ভাষাকে সূক্ষ্ম দেশীয়রূপে চিহ্নিত করে 'সূক্ষ্মক' নাম দেন। শুধু তাই নয় বাংলা ভাষার পরিপোষকরূপে সুনীতিকুমার ভারতের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর দ্রাবিড়-কোল-মুণ্ডা-সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের ভাষা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

সুনীতিকুমার শুধুমাত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎস সন্ধান করেননি, বরং তিনি বাঙালি জাতিরও উৎস সন্ধান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন—

বাংলা ভাষার সাথে সংস্কৃত সর্বত্র সাদৃশ্য নেই।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার

(i) উচ্চারণ রীতি পৃথক।

(ii) বানান পৃথক।

(iii) কারক, অনুসর্গ, প্রত্যয়ের রূপ সম্পূর্ণ এক নয়।

(iv) অনেক বাংলা শব্দের উৎস বা ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যায় না।

সুতরাং বাঙালি জাতি ও ভাষাকে একটি বিমিশ্র ভাষা ও জাতি হিসেবেই তিনি প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে চারটি উপাদানের মিশ্রণের কথা বলেছেন।

(i) প্রাচীন সংস্কৃতের উপাদান।

(ii) আরবি, ফারসি, ইসলামিক উপাদান।

(iii) ভারতীয় আর্যপূর্ব উপজাতি, যেমন—দ্রাবিড়, মোঙ্গল উপজাতির ভাষার উপাদান।

(iv) প্রাচ্য ভাষাবংশের উপাদান মিশ্রিত রূপে এই বাংলার বিমিশ্র ভাষার উৎপত্তি।

এই বাংলার বিমিশ্র ভাষা সম্পর্কে প্রথম বলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বাঙ্গালা ভাষা একটি মিশ্র ভাষা' এছাড়াও রামমোহনের ব্যাকরণ চর্চা, রবীন্দ্রনাথের উদারনৈতিক মানবিক সম্প্রীতি। সুনীতিকুমারের ভাষা চর্চায়—

(i) মানবিক উদারতা।

(ii) ভৌগোলিক, সামাজিক রীতির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উন্মেষ ঘটিয়ে ভাষাচর্চা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মনীষার দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। মূলত ভাষাবিজ্ঞানী হলেও নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অনন্ত আগ্রহ। ব্যাপ্তিতে তিনি দেশের সীমা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠায় তিনি ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তাঁর নিজস্ব উদারতা। এই উদারতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ভাষাচার্যের মনে বিশ্বমানবিক জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিল। বিশ্বমানবিকতা ছিল, তাঁর সক্রিয় জীবন সাধনার অঙ্গ। এইজন্য তিনি আমৃত্যু প্রাচীন সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

আধুনিক যুগে নব্যভারতীয় আর্যভাষা ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাচর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানচর্চার এক পথিকৃৎ। তাঁর O.B.D.L ভাষাচর্চার জগতের এক আঁকড় গ্রন্থ। এছাড়া সুনীতিকুমার তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মৌলিকতার পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এক আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

৮.৫.১২ ঃ পরিভাষা ও বানান

'পরিভাষা' শব্দটি ইংরেজি 'terminology' থেকে এসেছে। ইংরেজি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন—শব্দ কথাটির অর্থ sound, ধ্বনি কথার অর্থও sound। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দ ও ধ্বনির জন্য দুটি পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন—শব্দ বলতে word আর ধ্বনি বলতে phone বোঝানো হয়। ফলে ভাষাবিজ্ঞানে শব্দ ও ধ্বনি কথাটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে দুভাবেই ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, ভাষা ও পরিভাষা অনেক দিক থেকেই পৃথক। ভাষা সকলের জন্য ব্যবহার্য, কিন্তু পরিভাষা বিশেষ বিশেষ শাখার জন্যেই। ভাষা একটা অর্থে ব্যবহৃত। সেই অর্থের প্রবর্তন কে করেছিলেন, তা জানা যায় না। কিন্তু পরিভাষায় কোন্ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হবে, তা কেউ না কেউ ঠিক করে দেবেন। সাধারণ ভাষা অর্থ বদলে বদলে যেতে পারে। কিন্তু পরিভাষাতে অর্থ নির্দিষ্ট, তা বদলে যায় না।

বাংলা পরিভাষার উদ্ভাবনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারীরা পরিভাষা প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। এই সময়ে কিছু পারিভাষিক শব্দ তৈরিও হয়। প্রাচীনকালেও আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত, যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কিত প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার উল্লেখ আছে। আর বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলি নতুনভাবে প্রয়োগ করা হয়। মিশনারীরা ইচ্ছেমতো পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিভাষা উদ্বোধনের সুসংগঠিত প্রয়াস দেখিয়েছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এমনকী রবীন্দ্রনাথও পরিভাষা উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে পরিভাষার উদ্বোধন হল। সাধারণ মানুষকেও এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে দেখা যায়। এইভাবে পরিভাষার ব্যবহার বেড়েই চলল।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে পারিভাষিক এই সকল শব্দকে কিন্তু দেশের লোক শ্রদ্ধাভরে মেনে নেয়নি, নিন্দা করেছে। সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে যে সব পরিভাষা, সেগুলি সম্পর্কেও দেশের লোক বিরূপ মনোভাবাপন্ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এমনকী সাধারণ মানুষও পরিভাষা মেনে নেয়নি, নিন্দা করেছে। কেননা খাঁটি ভাষাকে বর্জন করে তার পরিবর্তে পরিভাষা ব্যবহার সকলের কাছেই যেন নিন্দনীয়। এটাকে পরিভাষার দোষ বলা হয়েছে। তবে এ দেশের প্রতিকার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। দেশের সাধারণ লোক পরিভাষা সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখায়নি, সংবাদপত্র বা সভা-সমিতিতেও পরিভাষা জায়গা পায়নি। তাই পরিভাষার দোষত্রুটি দূর করার উপায়ও জানা যায়নি।

পরিভাষা সম্পর্কে নানা সূত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই; অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।"

৮.৩.১২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সমাজভাষা বলতে কী বোঝো? বিস্তারিত আলোচনা করো।

৮.৩.১২.২ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত – মহম্মদ শহীদুল্লাহ
৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৪. ভাষাতত্ত্ব – রফিকুল ইসলাম

পর্যায় গ্রন্থ : ৪
একক ১৩
অন্তর্জালের ভাষা

বিন্যাসক্রম

৮.৪.১৩.১ ভূমিকা

৮.৪.১৩.২ ‘সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে’ বাংলা ভাষা

৮.৪.১৩.৩ ভাষারীতির নাটকীয় বদল

৮.৪.১৩.৪ অন্তর্জালে বাংলা ভাষা চর্চা

৮.৪.১৩.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৪.১৩.৬ সহয়ক গ্রন্থাবলি

৮.৪.১৩.১ ভূমিকা

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযুক্তির জয়গান। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন যাপনের ধরন। ভাষায়ও এর প্রভাব কম নয়। এমনিতেই ভাষা প্রবহমান নদীর মতো, যার হাজারো বাঁক। বাঁকে বাঁকে পরিবর্তনের ছোঁয়া। কিন্তু প্রযুক্তির প্রভাবে ভাষা যেন দিন দিন ভাঙা-গড়ার আরও খরস্রোতা নদী। কিন্তু এই নদী কোন পথে প্রবাহিত হবে, ভাঙবে কোন কূল আর গড়বেই বা কাকে? প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে অগণিত মানুষ ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের সংস্পর্শে আসছেন। এই আন্তর্জালই অদ্ভুত মায়াজালে বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের অসংখ্য মানুষকে। অদ্ভুত এ মায়াজালে আছে নানা বিষয়ের বিপুলসংখ্যক ওয়েবসাইট। আছে নানা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম— ফেসবুক, টুইটার, হাইফাইভ, ইউটিউব, ব্লগস্টার প্রভৃতি। এসব সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো তৈরি করেছে এক ‘ভারচুয়াল’ সামাজিক বাস্তবতা, যার প্রভাবে মানবীয় সম্পর্কগুলোতেও আসছে নতুন মাত্রা। আর এই পরিবর্তনের অন্যতম বড় প্রভাবক হচ্ছে ভাষা।ইন্টারনেটে ভাষার ব্যবহার এমনই বহুমাত্রিক যে পাশ্চাত্যে এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়েছে। ইউরোপের ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষক ডেভিড ক্রিস্টাল ‘ইনটারনেট লিঙ্গুইস্টিক্স’ (আন্তর্জালিক ভাষাবিজ্ঞান) নামে নতুন এক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি মনে করেন, একাডেমিক শৃঙ্খলায় একটি নতুন বিষয়ের সংযোজন করা খুব সহজ নয়, কিন্তু ইন্টারনেটের আবির্ভাব ভাষাকে এতটাই প্রভাবিত

করেছে যে ইন্টারনেটের ভাষা নিয়ে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সদা পরিবর্তনশীল ইন্টারনেটের ভাষা নিয়ে গবেষণা কতটুকু কার্যকর হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'একুশ শতকে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটছে তার জন্য সব ভাষাতেই বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে। একসময় টেলিগ্রামের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এক ধরনের ভাষা ডেভেলপ করেছিল। কিন্তু তা আর এখন টিকে নেই। ইন্টারনেট দ্রুত পরিবর্তনশীল। ইন্টারনেটের প্রভাবে নতুন নতুন শব্দ আসছে। যার কিছু টিকে থাকছে, কিছু থাকছে না। তাই ইন্টারনেট লিঙ্গুইস্টিক কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তা ভবিষ্যত্ই বলে দেবে।'

৮.৪.১৩.২ 'সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে' বাংলা ভাষা

কয়েক বছর আগেও বাংলা লাইক, কমেন্ট, স্ট্যাটাস শব্দগুলোর এত বিপুল ব্যবহার ছিল না। আর এখন এগুলো প্রায়শই উচ্চারিত হচ্ছে। যেন নিজস্ব শব্দ, একেবারে বাংলা ভাষার মতোই ব্যবহার হচ্ছে।
ক) 'একটা ফাটাফাটি মুভি দেখলাম। সেইরাম ব্যাপক feeling বিনুদুন।' সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকে ঠিক এভাবেই স্ট্যাটাস দিয়েছে আবির (ছদ্মনাম)।

খ) 'কাইলকা পরীক্ষা, কিছুই পড়িনাইক্যা। হে আল্লাহ আমাকে তুইল্যা নাও, নয়তো উপ্রে থেইক্যা দড়ি ফেলাও আমি উইঠ্যা যাই।' পরীক্ষার আগের রাতে এই ছিল রনির ছদ্মনাম) স্ট্যাটাস।

এ তো গেল ইংরেজি শব্দ। বাংলা শব্দেরও বিচিত্র ব্যবহার রয়েছে, যা রনি কিংবা আবিরের স্ট্যাটাসেও কিছু আছে।

বাংলায় ফেসবুক ও ব্লগ এখন ব্যাপক জনপ্রিয়। অনেকদিন ধরেই ব্যবহার বাড়ছে ইউটিউবের, ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে টুইটারও। তবে এগুলোর কোনোটিই ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় নয়। ফেসবুকে বাংলা লেখার ধরনও অদ্ভুত। আগে কেবল রোমান হরফে বাংলা লেখা হলেও বাংলা ইউনিকোডের কল্যাণে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখার হার বাড়ছে ক্রমশ। পাশাপাশি রোমান হরফ তো আছেই। লেখার ধরন সম্পর্কে দুয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ক. ইংরেজি বাক্য বা শব্দকে সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার যেমন- OMG (Oh My God), HBD (Happy Birth Day), BTW (By The Way), congratz, (congrats), r8 (right) LOL (Laughing Out Loud বা Laugh Out Loud) ইত্যাদি।

খ. শব্দের বিকৃত বানান ও উচ্চারণ। যেমন- বেসম্ভব (অসম্ভব), নাইচ (নাইস), কিন্যা (কিনে), গেসে (গেছে) দ্যাশ (দেশ)। এ রকম অসংখ্য বিকৃত ব্যবহার চলছে সব সময়ই।

গ. বাক্য বা শব্দগুচ্ছ একত্র ও সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা— ভাল্লাগসে (ভালো লেগেছে), মুঞ্চায় (মন চায়) মাইরালা (মেরে ফেলো) ইত্যাদি।

ঘ. বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি মিলিয়ে বহুভাষিক পরিস্থিতি তৈরি করা— মাগার, টাস্কিভূত, ও I was feeling হতভম্ব, সম্ভাবিলিটি, বিন্দাস। প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শব্দ।

৮.৪.১৩.৩ ভাষারীতির নাটকীয় বদল

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে চর্চিত এই বাংলা ভাষা এবং এই মিশ্র ভাষা পরিস্থিতিকে তুলনা করা যেতে পারে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গে। যখন একের পর এক বেসরকারি টেলিভিশন এবং রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের একচেটিয়া ভাষারীতি আর থাকল না। ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন বেসরকারি টেলিভিশন ও এফএম রেডিওতে মিশ্র ভাষারীতির ব্যবহার এবং বিকৃত উচ্চারণে অনুষ্ঠান প্রচারের হিড়িক ছিল চোখে পড়ার মতো। তখন থেকেই কথ্য বাংলার এমন ব্যবহার বহুল সমালোচিতও হয়েছে।

এরপর বাংলার লিখিত রূপের নাটকীয় বদলের বড় ঢেউটি আসে মূলত গত দশকের শেষভাগে। যখন থেকে বাংলা ভাষায় ব্লগ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এর আগে সাহিত্যচর্চায় ভাষা নিয়ে লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও তা এত ব্যাপক আকারে কখনোই সাধারণ মানুষের এত বড় অংশের কাছে পৌঁছেনি। বিভিন্ন ব্লগে বিপুলসংখ্যক ব্লগার বলা চলে অনেকটা যার যার নিজস্ব রীতিতেই লিখে থাকেন। কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই আসলে কোনো রীতিই মানেন না। একই রচনায়ও থাকে না কোনো রীতিরই সমন্বয়।

এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা মনে করেন যখন কথাগুলো বাংলা, তখন তা বাংলাতেই লেখা ভালো। আর ইংরেজিটা ইংরেজিতেই। ইন্টারনেটে এখন সহজেই বাংলা হরফ লেখা যায়। মুঠোফোনেও এসেছে সে সুবিধা। এই যে এবারের ফেব্রুয়ারি মাস যখন এল, ফেসবুকে তাকিয়ে দেখলাম বাংলা কবিতায় 'স্ট্যাটাস' দেওয়ার ঢল নামল। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!' একুশ শতকে অন্তর্জাল প্রযুক্তির এই যুগে বসে অনলাইনে এমন স্ট্যাটাস, এমন লেখা দেখলে কার না মন ভালো হয়ে যায়। তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে বয়স্ক বাঙালি যাঁরা ডিজিটাল মাধ্যমে কমবেশি সক্রিয়, তাঁদের বেশির ভাগই বাংলা হরফেই লিখছেন বাংলা। মনের ভাবটা ঠিকঠাক প্রকাশিত হচ্ছে ডিজিটাল দুনিয়ায়।

বর্তমানে ফেসবুকের মতো তুমুল জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলা ব্লগের এই ভাষাচর্চার প্রভাব এসে মিলেছে ফেসবুকে ভাষাচর্চার বৈশ্বিক নানান রীতি-নীতির সঙ্গে। এ দুয়ে মিলে তৈরি করেছে ভাষাচর্চার

নাটকীয় ও হুজুগে বদলের এক মারাত্মক পরিস্থিতি। পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের কাজ করেছে কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসহ নানান যন্ত্র থেকে ইন্টারনেটে বাংলা লেখার নানান জটিলতা। মোটের ওপর এটা বলা চলে যে, ইন্টারনেট সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে চর্চা করা ভাষা প্রমিত বাংলা যেমন নয়, তেমনি আঞ্চলিক বাংলাও নয়। আবার এই মিশ্র ভাষারীতি কিন্তু কেবল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়। ইন্টারনেটে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ বা ভাষা আমাদের বাস্তব জীবনের ভাষা ব্যবহারকে বদলে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। হরহামেশাই আমরা নানা শব্দ প্রয়োগ করি কথা বলার ক্ষেত্রে, যা একান্তই ইন্টারনেটের ভাষা। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভাষার এই পরিবর্তনে বদলে যাচ্ছে বাংলা ভাষা। আবির্ভাব ঘটছে এক মিশ্র প্রকৃতির ভাষারীতি।

৮.৪.১৩.৪ অন্তর্জালে বাংলা ভাষা চর্চা

কম্পিউটার যন্ত্রে বা ইন্টারনেটের মতো সর্বজনীন মাধ্যমে বাংলা লেখাটা কিন্তু কাগজ-কলমের মতো সহজ নয়। কম্পিউটার বোঝে যন্ত্রভাষ। সেই ভাষার সঙ্গে মায়ের মুখের ভাষাটির খাপ খাওয়ানো খুব একটা সহজ ছিল না। আজ ব্লগে, ফেসবুকে, ই-মেইলে অনেকটা সহজে যে লিখতে পারছি বাংলা, তার শুরুটা বেশি দিনেরও নয়। কম্পিউটারের বাংলার চর্চা গত শতকের আশির দশকের শেষভাগ থেকে শুরু। প্রয়োজনের তাগিদেই তার অগ্রযাত্রা হয়েছে। বাংলাদেশে অনলাইন ইন্টারনেটের সূচনা ১৯৯৬ সালে। তখন থেকেই ইন্টারনেটে বাংলা ভাষা ছড়িয়ে দেওয়ার নানা চেষ্টা দেখা গেল। পিডিএফ ফাইল করে, লেখাকে ছবি বানিয়ে ভারী ভারী ফাইল বানিয়ে এক-দুই ফর্দ বাংলা লেখা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা অনেকেরই মনে আছে। সময় বেশি লাগত, বাংলায় লেখা ফাইল ই-মেইলে জুড়ে দিয়ে (অ্যাটাচড) পাঠানো হতো। অন্য কম্পিউটারে সেই লেখা খুলবে তো! এ আশঙ্কা থেকে বাংলা ফন্টটাও পাঠিয়ে দিতে হতো। এই যে এত চেষ্টা, তা কেন? উত্তরটা তো বাবুই পাখি দিয়েই রেখেছে কত কাল আগে—'কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়।'

অনলাইনে বাংলা লেখার জোয়ার এসেছে একুশ শতকের গোড়ার দিক থেকে। তত দিনে কম্পিউটার বা ডিজিটাল যন্ত্রে যেকোনো ভাষা লেখার কারিগরি নীতি 'ইউনিকোড' তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের বাংলাও ঢুকে গেল ইউনিকোডে। কয়েকজন মেধাবী তরুণ প্রোগ্রামারের হাত ধরে অভ্র নামের সফটওয়্যারটি এসে অনলাইনে বাংলা লেখার ব্যাপারটাকে করে দিল জলবৎ তরলং। পেশাগত কাজে বাংলা লিখতে হয় যাদের তাদের বাংলা কি-বোর্ড লে-আউট মুখস্থ থাকে। বাদবাকি মানুষের কী হবে? তাঁরাও তো চান বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে। ধ্বনিভিত্তিক (ফোনেটিক) কি-বোর্ড তাদের আশা পূরণ করল। অভ্র দিয়ে amar লিখলে 'আমার' চলে আসে। এ

ব্যবস্থা বেশ সহজ করেছে। এভাবে হয়তো বানানরীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতভাগ মেনে চলা যায় না এখনো, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ যেখানে মুখ্য সেখানে রীতিনীতি কিছুটা গৌণ হলে ক্ষতি কী?

মুঠোফোনেও বাংলা লেখার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন শুরু থেকেই। এই শতকের গোড়ার দিকে দেখা গেছে জাভা সমর্থন করে এমন মুঠোফোনে বাংলা লেখার সফটওয়্যার ঢুকিয়েছেন তরুণ প্রোগ্রামাররা। পরে নকিয়ার ফোনসেটগুলোতে বাংলা কি-বোর্ডও দেখা গেছে। আর হাল সময়ের স্মার্টফোনে মায়াবীসহ বেশ কিছু অ্যাপস আছে, যেগুলো দিয়ে বাংলা লেখা যায়। গুগলে ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সুবিধাও যোগ হয়েছে। গুগল বা পিপীলিকার মতো সার্চ ইঞ্জিনে বাংলা লিখে তথ্য খোঁজা যায়। অনলাইনে বাংলা চর্চায় বড় অবদান রেখেছে বাংলা ব্লগ সাইটগুলো। তাই এ সময়ে এসে বাংলা হরফে ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরা সহজ আর এ ধারা ক্রমেই বাড়ছে।

যত দিন যাচ্ছে, প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলায় নিজেকে প্রকাশের চলটাও বাড়ছে। আর বাড়বে নাই-বা কেন? রামনিধি গুপ্ত তো বলেই গেছেন—

নানান দেশের নানান ভাষা,

বিনে স্বদেশী ভাষা,

পুরে কি আশা?

৮.৪.১৩.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বাংলা ভাষা ও অন্তর্জালের সম্পর্কটি নিজের ভাষায় লেখো।
২. ন্তর্জালে বাংলা ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।
৩. অন্তর্জাল কী? অন্তর্জালে বাংলা ভাষার বিবর্তন বিষয়ক একটি ইতিবৃত্তরচনা করো।
৪. বাংলা ভাষায় অন্তর্জালের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮.৪.১৩.৬. সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২. ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন
৩. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড) - পরেশচন্দ্র মজুমদার

৪. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ
৫. বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান – অলিভা দাক্ষী
৬. ভাষা : প্রয়োগে ব্যবহারে – সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক : ১৪ : শব্দার্থতত্ত্ব

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১৪.১ শব্দার্থতত্ত্বের সংজ্ঞা

৮.৪.১৪.২ শব্দার্থের প্রকার

৮.৪.১৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৪.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৪.১৪.১ : শব্দার্থতত্ত্বের সংজ্ঞা

গ্রিক শব্দ 'Sema-Semanio' থেকে ইংরেজিতে 'Semantics' শব্দটি এসেছে। যার বাংলা অর্থ 'শব্দার্থতত্ত্ব'। ফরাসিতে আবার শব্দার্থ বলতে 'Semeologic' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে যে কোনও শব্দ বা সংকেতের অর্থালোচনা 'Semantics'-এর অন্তর্ভুক্ত। শব্দাবলীর 'অর্থতত্ত্ব'-কে শব্দার্থতত্ত্ব ছাড়াও বাংলাতে অর্থতত্ত্ব, বাগর্থতত্ত্ব ইত্যাদি পরিভাষা নামে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইউরোপের কিছু ভাষায় 'Semantics' বলতে শুধু 'শব্দার্থতত্ত্ব' (অর্থ সংকেত) নামে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থতত্ত্বে সাধারণত শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ, ভাষায় অর্থ পরিবর্তনের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে শব্দার্থতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় —

'ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও ভাষার শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ, প্রকৃতি, ধারা ইত্যাদি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলে শব্দার্থতত্ত্ব।'

৮.৪.১৪.২ : শব্দার্থের প্রকার

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সার্থক শব্দের অর্থ তিন প্রকার হতে পারে, এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে শব্দার্থের শ্রেণিগুলি এইরকম —

ক. মুখ্যার্থ (Words of Direct, Literal or Explicit Meaning)

খ. লক্ষ্যার্থ (Aimed Meaning)

গ. ব্যঙ্গ্যার্থ (Suggested Sense)

মুখ্যার্থ, এই পর্বে কোনও শব্দের অর্থের সরাসরি ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন — মানুষ, গাড়ি, সিনেমা, বই, ঘড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি শব্দ। এইসব শব্দকে সরাসরি অর্থে প্রকাশ করলে সেই শক্তিকে বলা হয় 'অভিধা শক্তি'। কারণ এইরকম শব্দ সবসময়ই স্পষ্ট, সুপরিচিত অর্থকে প্রকাশ করে। এই বিষয়টা বুঝতে পাঠক বা শ্রোতার কোনও কেশ হয় না। এটা আবার তিনভাবে অনুধাবন করা যায়। যথা —

এক. মনুষ্য সমাজে পরস্পরের কথোপকথনে বা ব্যবহারের দ্বারা এর অর্থ বোঝা যায়। ব্যবহারের বিষয়টা আসে — সঙ্কেত, ভূয়োদর্শন, আপ্তবাক্য ও অভিধানের দ্বারা।

দুই. ব্যাকরণের মাধ্যমে এর অর্থ অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ যে মানুষ ভাষার ব্যাকরণ ভালোভাবে জানে সেই মানুষ অনায়াসেই প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির মাধ্যমে যে কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তি জেনে অর্থ নির্ণয় করতে পারে।

তিন. অনেক সময় কোনও একটি বাক্যের কোনও একটি শব্দের অর্থ সবসময় জানা থাকে না। কিন্তু জানা বাকি শব্দের অর্থ থেকে ওই একটি শব্দের অর্থ অনুমান করে মূল বাক্যের অর্থ বোঝা যায়। একে বলা হয় 'বিদিতার্থ-শব্দ-সান্নিধ্য'।

অনেক সময় বাক্য মধ্যে কোনও শব্দকে বসিয়ে বক্তা বা লেখক তার অভিপ্রেতের স্বরূপ প্রকাশ করে। এটাই লক্ষ্যার্থ। অর্থাৎ এখানে মূল শব্দ দিয়ে বক্তার অভিপ্রেত বোঝানো হয়। এই ধরনের শব্দ সেই বাক্যের 'লক্ষণা শক্তি'। যেমন —

গোবিন্দ অঙ্কে বড্ড কাঁচা।

বিনয়বাবু হৃদয়বান ব্যক্তি।

এখানে 'কাঁচা' অর্থে বুদ্ধিতে দুর্বল এবং 'হৃদয়বান' অর্থে 'অনুভূতিসম্পন্ন' মানুষকে বোঝানো হয়েছে।

অনেক সময় দেখা গেছে কোনও শব্দের অর্থ প্রয়োগ অন্য ধরনের অর্থ দ্যোতনা পাওয়া যাচ্ছে, একে বলা হয় বিরূপার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ। অর্থাৎ এখানে বাক্যস্থিত কোনও শব্দের মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ ধরে হয় না। এর ফলে সেই শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তি প্রকাশ পায়। যেমন —

আজ তো চাল বাড়ন্ত।

রামবাবুর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে।

তোমার তো কই মাছের প্রাণ।

প্রথম বাক্যে চাল বাড়ন্ত অর্থে 'চাল নেই', আর দ্বিতীয় বাক্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি অর্থে 'মারা যাওয়া' বোঝানো হয়েছে। আর তৃতীয় বাক্যে 'কই মাছের প্রাণ' বলতে 'কঠিন প্রাণ'-কে বলা হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে 'Semantics'-এর বাংলা পরিভাষা একাধিক। অর্থাৎ শব্দার্থতত্ত্ব, বাগর্থতত্ত্ব ইত্যাদি। ভাষাবিজ্ঞানের আদলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী আবার বলেছেন 'শব্দার্থবিজ্ঞান' বা 'বাগর্থবিজ্ঞান'। Semantics শব্দটি আসলে গ্রিক বিশেষ্য পদ Sema = চিহ্ন বা প্রতীক আর গ্রিক ক্রিয়াপদ Semanto = অর্থ নির্দেশ করার যোগফল। এখানে কোথাও শব্দের অর্থের কথা বলা হয়নি। কিন্তু গতানুগতিক ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থতত্ত্ব বললে তার অর্থ দাঁড়াবে শব্দ-এর অর্থ এবং তা সম্পর্কে বিশ্লেষণ নামক বিজ্ঞান। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার রূপমূল, শব্দ, বাক্য সবকিছুরই অর্থ বিশ্লেষিত হয়। তা ছাড়া আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বে শুধুমাত্র শব্দার্থ বিশ্লেষণ করা হয় না। ভাষার অর্থ সম্পর্কিত সবকিছুই আলোচিত হয়। এইভাবে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির ক্রম করা হয়। যেমন —

১. ধ্বনিগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে বসানো হয়।

২. রূপমূল বসানোরও ক্ষেত্রেও অর্থগত দিক কাজ করে।

৩. অক্ষরগুলি বসানোরও একটা নিয়মনীতি আছে।

৪. বাক্যে শব্দাবলী এলোমেলো ভাবে বসালে সেইসব শব্দের আভিধানিক অর্থ ঠিক থাকে ঠিকই কিন্তু বক্তার অভিপ্রেত মনোভাব সবসময় সঠিক ভাবে প্রকাশিত হয় না।

৫. একটি বাক্যের পর অন্য বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ লেখা বা বলার ব্যাপারটিও অর্থের দিক খতিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়।

বোঝা যাচ্ছে শুধুমাত্র শব্দের অর্থের মধ্যে 'Semantics' সীমাবদ্ধ নেই। ব্যাপকতর অর্থে তা ধ্বনি, রূপমূল, অক্ষর, শব্দ, শব্দাংশ, বাক্য-বাক্যাংশ সবকিছুর মধ্যে Semantics ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিক থেকে এর নাম হওয়া উচিত 'অর্থতত্ত্ব'। কিন্তু স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে 'Economics' বা 'অর্থনীতি' বা 'অর্থবিজ্ঞান' বা 'অর্থতত্ত্ব' ইত্যাদি শব্দ ভাষাতে তো আছেই। সেই জন্যে মনে হয় 'বাগর্থ' (বাক্ বা কথা বলার অর্থ) নামটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মহম্মদ দানীউল হক 'ভাষাবিজ্ঞানের কথা' (২০০২) গ্রন্থে বলেছেন —

> ''আমরা নানা দিক বিবেচনা করে Semantics-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ হিসেবে তাই 'বাগর্থবিজ্ঞান'কে সবচেয়ে উপযোগী মনে করি। বাগ্ধ্বনির সাহায্যে যে-যে ভাষাপ্রকাশ ঘটে, তাতে অর্থসংক্রান্ত আলোচনায় 'বাগর্থবিজ্ঞান' কথাটির ব্যবহার যথার্থ বলে ধরা হয়।''

উল্লেখ্য বিগত কয়েক দশক ধরে শব্দার্থ নামটি ব্যাপকভাবে ভাষাবিজ্ঞানে প্রচলিত হয়েছে। যার ফলে এখনও বাগর্থ শব্দটি সেইরকম ভাবে প্রচলন হয়নি।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি পরিবর্তিত হয় তার ভিতরের অর্থেরও। তার কয়েকটি কারণ আছে। সেগুলি — ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, উপকরণগত, সাদৃশ্য, মানসিক বিশ্বাস, আলঙ্কারিক, শৈথিল্য, আরামপ্রিয়তা, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি।

ভৌগোলিক কারণ, শব্দের অর্থ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। একই শব্দ আদর্শ বাংলায় যে অর্থ দিচ্ছে আঞ্চলিক বাংলায় সেই অর্থ দেয় না। যেমন —

অভিমান — স্নেহমিশ্রিত অনুযোগ	বিল — জলাশয়
অভিমান — অহংকার	বিল — ক্ষেত
আবাদ — চাষবাস	জহর — বিষ (হিন্দিতে)
আবাদ — মফঃস্বল	জহর — মহামূল্য প্রস্তর (বাংলা)

ঐতিহাসিক কারণ, ইতিহাসের ধারায় সমাজবিধি ও সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। যেমন —

অসুর — দেবতা (আগে)	দালাল — মধ্যস্থ ব্যক্তি (আগে)
অসুর — দেবতার শত্রু (এখন)	দালাল — খারাপ বা প্রতারক (এখন)

সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফারসি ভাষায় কথা বলার জন্যে অনেক শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন — ফরাসি বুজুর্গ (পণ্ডিত) > বুজরুক (প্রতারক, শঠ) ইত্যাদি।

উপকরণগত কারণ, যে সব উপকরণের মাধ্যমে কোনও বস্তু তৈরি হয়, সেই উপকরণের ধর্ম বা নাম অনুসারে অনেক বস্তুর নামকরণ করা হয়। যেমন — আগে 'কালি' বোঝাতে 'কালো' (black) উপকরণ দিয়ে গঠিত তরল পদার্থকেই বোঝাত। কিন্তু এখন 'কালি' বলতে লাল, নীল, সবুজ সকল উপকরণের কালিকে বোঝায়।

সাদৃশ্যগত কারণ, সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন — 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী'। আগে 'তিল' বোঝাতে শুধু বিশেষ শস্যকেই বোঝাত, এখন গায়ের বিশেষ কালো দাগকেও বোঝায়। আবার 'হাতি' বা 'ঘোড়া' ব্যবহার 'বড়' অর্থে করা হয়, তার মূলেও রয়েছে সাদৃশ্য। যেমন — 'হাতি পাড়' (খুব চওড়া পাড়) আবার বড় অর্থে 'রাজ' ও 'রাম' নিয়ে সাদৃশ্যে বলা হয় যেমন, রাজপথ (বড় পথ), রামধনু (বড়ধুন)।

মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার (সুভাষণ), সাধারণ লোকের ধারণা অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশে অশুভ বিষয়কে শুভ নাম দেওয়া হয়, একে সুভাষণ বলে। সুভাষণ-এ নিম্নজাতির লোককে হরিজন বলা হয়, পাচক ব্রাহ্মণকে ঠাকুর, ঝাড়ুদারকে জমাদার। আবার সাপ অর্থে 'লতা', মৃত্যু অর্থে 'গঙ্গালাভ করা', চাল নেই অর্থে 'চাল বাড়ন্ত' ইত্যাদি বলা হয়।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা, শৈথিল্যের ফলেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন — 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া' ইত্যাদি।

আলঙ্কারিক প্রয়োগ, এর ফলেও কিঞ্চিৎ শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। যেমন — ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়া অর্থে-গণেশ ওলটানো, মিথ্যা কথা বলা অর্থে — গুলমারা। হাতে ধরা বা পায়ে ধরা অর্থে মিনতি করা।

শব্দার্থ পরিবর্তন প্রধানত পাঁচটি ধারায় বিভক্ত। যেমন — অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচ, অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ। গৌণধারা দুটি : অর্থের উৎকর্ষ ও অর্থের অপকর্ষ।

কোনও শব্দের অর্থ আগে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থেকে কিছুকাল পরে তার অর্থ ব্যাপকতর হলে সেই প্রক্রিয়াকে বলে অর্থপ্রসার বা অর্থবিস্তার।

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
কালি	কালো রং	যে কোনও রং
তেল	তিলের নির্যাস	যে কোনও শস্য বীজ থেকে নিষ্কাসিত রস। এমনকি খনিজনিত।
গাঙ	গঙ্গা নদী	যে কোনও নদী
পরশু	আগামীকালের পরদিন	গতকালের আগের দিন ও আগামী কালের পরদিন।
শ্বশুর	স্বামীর পিতা	স্বামী অথবা স্ত্রীর পিতা
ফলাহার	ফল খাওয়া	যে কোনও জলখাবার
বর্ষ	বর্ষাকাল	বছর
ধন্য	ধনবান	সর্ব অর্থে সৌভাগ্যশালী
গৌরচন্দ্রিকা	গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান	ভূমিকা

কলম	(খাগ) শরের তৈরি লেখনী	যে কোনও ধাতুতে তৈরি লেখনী
বিভীষণ	নাম বিশেষ (ব্যক্তি)	গৃহশত্রু
মীরজাফর	নাম বিশেষ (ব্যক্তি)	বিশ্বাসঘাতক
Pen	Penna (পাখির পালক)	যে কোনও ধাতুতে তৈরি লেখনী
	পালকের তৈরি লেখনী	

অর্থসংকোচ, অর্থপ্রসারের ঠিক উলটো প্রক্রিয়া। প্রথমে কোনও শব্দের অর্থকে ব্যাপক অর্থে বুঝিয়ে কিছুকাল পরে তা সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে তাকে শব্দের অর্থসংকোচ বলে।

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
কৃপণ	কাতর বা দীনতাযুক্ত	অর্থব্যয়ে কাতর
মৃগ	যে কোনও পশু	হরিণ
অন্ন	যে কোনও খাদ্য	ভাত
মন্দির	যে কোনও গৃহ	বিগ্রহ রাখার স্থান
প্রদীপ	যে কোনও আলো	বিশেষ ধরনের তৈলদাহ্য দীপ
মুনিস (মনুষ্য)	যে কোনও মানুষ (সর্বশ্রেণির)	মজুর
মোরগ	যে কোনও পাখি	বিশেষ ধরনের পাখি
রাঙা	রঞ্জিত যে কোনও রঙে	লাল রং
কর্মকার	যে কোনও কাজ করে যে	বিশেষ ধরনের জীবিকা নির্বাহকারী অর্থাৎ কামার
কামানো	কর্ম করা	ক্ষৌরকর্ম নামে বিশেষ অর্থ বহন করে

শব্দের অর্থ পরিবর্তন কয়েকটি ধাপের মধ্যে দিয়ে হয়। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের শেষ ধাপে শব্দটির মূল অর্থের সম্পূর্ণ নতুন অর্থ দাঁড়ালে হয় অর্থ সংক্রম। ক্রমাগত অর্থ সংকোচ ও প্রসারের ফলে শব্দের অর্থটা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
সন্দেশ	খবর, তত্ত্ব বা সংলাপ	একজাতের মিষ্টি বিশেষ
দারুণ	কাঠের তৈরি	ভালো
পাষণ্ড	যে কোনও ধর্মসম্প্রদায়	ধর্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি
ঘাম (ঘর্ম)	গরম	শরীর থেকে যে মধু চুইয়ে পড়ে অর্থাৎ স্বেদ
গবেষণা	গরু খোঁজা	যে কোনও বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করা
ওঝা	শিক্ষিত পণ্ডিত (উপাধ্যায়)	ঝাড়-ফুঁককারী
ধুরন্ধর	দায়িত্ববান ব্যক্তি	অতি চালাক চতুর লোক

খুন	রক্ত	হত্যা (Murder)
তথাপি	সেখানেও	তবুও
দৈব, দএব	দেবতা	অপদেবতা (ইরানিয়)
পাত্র	পানাধার	বর

শব্দার্থ যখন আগের অর্থকে ছাড়িয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ অর্থে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে বলে অর্থের উৎকর্ষ।

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
মন্দির	যে কোনও গৃহ	বিগ্রহ রাখার স্থান
শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ভোগ	যে কোনও খাদ্য	ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত ভোগ
কুশল	এক ধরনের ঘাস	কল্যাণ
পলাশ	মাংসাশী	একটি নির্দিষ্ট ফুল
প্রসাদ	প্রসন্নতা, অনুগ্রহ	দেবতার প্রসাদ

কোনও শব্দের অর্থ পরিবর্তনে তা আগের চেয়ে হেয় বা তুচ্ছার্থে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে অর্থের অবনতি বা অর্থের অপকর্ষ।

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
নাগর	নগরের বিদগ্ধ ব্যক্তি	অবৈধ প্রণয়ী
ঠাকুর	দেবতা অথবা সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি	পাচক
মহাজন	মহৎ যে জন	সুদখোর
ইতর	অন্য, অপর	খারাপ, নীচ
ঝি	মেয়ে, দুহিতা	কাজের মেয়ে
দেবী	স্ত্রী দেবতা	আজকাল মানবীয় নামের সঙ্গেও দেবী শব্দের ব্যবহার হয়
প্রীতি	নিষ্কলুষ প্রেম, ভালোবাসা	পিরীতি

৮.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। শব্দার্থতত্ত্ব বলতে কী বোঝ? শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণগুলি লেখ।

২। শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও। এই প্রসঙ্গে উদাহরণসহ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাগুলি আলোচনা করো।

৮.৪.১৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন

৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ'

৪. প্রসঙ্গ: বাংলাভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) - সুখেন বিশ্বাস

৫. ভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ - সুখেন বিশ্বাস

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক : ১৫ : অভিধানতত্ত্ব

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১৫.১ অভিধানবিজ্ঞান

৮.৪.১৫.২ অভিধানতত্ত্ব

৮.৪.১৫.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৫.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৪.১৫.১ : অভিধানবিজ্ঞান

ইংরেজিতে 'Dictionary' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'অভিধান'। ভাষার সঙ্গে অভিধানের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ এখানে শব্দ তালিকা, শব্দের উৎস, ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ, শব্দার্থ পরিবর্তন ইত্যাদির কথা গুরুত্বসহ লেখা থাকে। তাই অভিধানকে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা গড়ে উঠেছে। সেটি হল 'অভিধানবিজ্ঞান'। এই শব্দটির ভাষাবিজ্ঞানসম্মত ইংরেজি পরিভাষা 'Lexicography'. গ্রিক শব্দ Lexis থেকে ইংরেজিতে Lexicon এসেছে। তা থেকে Lexicography বহুদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিধান চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতের প্রথম অভিধানকার ছিলেন যাস্ক। তাঁর রচনাটির নাম 'নিরুক্ত'। এখানে বিভিন্ন বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ইত্যাদির বিবরণ আছে। এ ছাড়া অন্য অভিধান গ্রন্থ হল অমর সিংহের 'অমরকোষ'। উল্লেখ্য বৈদিক শব্দাবলী নিয়ে যে নির্ঘন্ট লেখা হয়েছিল তাতেও অভিধানচর্চার উৎস পাওয়া যায় বলে অনেকেই মনে করেছেন। প্রাচীন ও মধ্য ভারতে অভিধান চর্চার তিন ধরনের উদ্দেশ্য ছিল। যথা — ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, সমার্থক শব্দ নির্ণয় ও শব্দার্থ সম্পর্কে আলোচনা। উল্লেখ্য এই বিষয়টির মধ্যে শুধু প্রাচীন রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

৮.৪.১৫.২ : অভিধানতত্ত্ব

অভিধানচর্চায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ড. স্যামুয়েল জনসনের রচনায়। তাঁর লেখা অভিধানটির নাম 'Dictionary of the English Language' (১৭৫৫)। এ ছাড়া এমার্সনের নামও 'Dictionary' রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত। তবে ইংরেজিতে Dictionary রচনার পথিকৃৎ হলেন ফাউলার। তিনি নির্ভুলভাবে ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সংকলন করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বড় Dictionary হল 'Oxford English Dictionary'। এটি চার লক্ষেরও বেশি শব্দবিশিষ্ট কোষগ্রন্থ। পৃথিবীর বহু ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে তেরোটি খণ্ডে এটি রচিত। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কয়েকটি বিখ্যাত Dictionary হল, ফরাসি ভাষার 'মহা অভিধান' এবং রুশ ভাষার 'মহা অভিধান' ইত্যাদি। যাই হোক অক্সফোর্ড অভিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ —

১. এখানে প্রতিটি ইংরেজি শব্দের শুদ্ধ বানানসহ উচ্চারণ নির্দিষ্ট।

২. শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে শব্দের অর্থ বিভিন্ন বাক্যে কিভাবে পালটিয়ে যায় তা এই অভিধানে বিশ্লেষিত।

৩. শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা।

৪. শব্দ প্রয়োগের ইতিহাসও বিশ্লেষিত।

৫. কোনও শব্দকে বিভিন্ন পদে প্রয়োগ করার বিষয়টিও এই অভিধানে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলা অভিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য মানোএল দ্য আস্‌সুম্প সাঁও-এর নাম। তাঁর ভিধানটি মূলত বাংলা-পর্তুগিজ শব্দ অভিধান। এ ছাড়া অন্যান্য অভিধান আপনজনের লেখা 'ইংরেজি-বাংলা ভোকেবিলরি', উইলিয়ম কেরির 'A Dictionary of the Bengalee Language' ইত্যাদি। কিন্তু যে সব অভিধান বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি তথা পাঠকের পক্ষে সর্বোত্তম অপরিহার্য, সেগুলি হল — 'বাংলা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', 'বাঙ্গালা শব্দকোষ', 'চলন্তিকা', 'সংসদ বাংলা অভিধান' ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি ভাষার অভিধানই একটা প্রয়োজন সিদ্ধ করে। তাই অভিধানের একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। এবারে সেই উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করা হল —

১. অভিধান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য শব্দ তালিকা প্রস্তুত করা। অর্থাৎ যে ভাষার অভিধান লেখা হবে সেই ভাষায় যত শব্দ আছে তা বর্ণানুক্রমে সাজাতে হবে। যাতে পাঠক খুব সহজেই যে কোনও শব্দকে খুঁজে বার করতে পারে। উল্লেখ্য, এই তালিকা বিষয়ানুক্রমিকও হতে পারে।

২. ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা অভিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কোন শব্দ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানের রূপ পেয়েছে তা যথাস্থানে উপস্থাপন করা।

৩. শব্দের মূল সন্ধান অভিধান রচনাকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অর্থাৎ যে শব্দটি অভিধানে ব্যবহৃত হচ্ছে মূল কোন শব্দ থেকে এসেছে তা জিজ্ঞাসুদের জানিয়ে দেওয়া।

৪. ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ নির্দেশ করা অভিধানকারের আর একটি লক্ষ্য। বাস্তবে দেখা যায় শব্দের অর্থ ক্রমশই মূল অর্থকে প্রচ্ছন্ন রেখে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানে কোনও শব্দের মূল অর্থ খোঁজার পাশাপাশি প্রয়োগগত ও পরিবর্তিত অর্থ দুটোরই বর্ণনা থাকবে।

৫. যে কোনও একটি শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ থাকতে পারে, অভিধানে উদাহরণসহ তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৬. শব্দের উচ্চারণ প্রণালীর দিকেও অভিধানকারের নজর থাকবে। কোনটি যথার্থ উচ্চারণ কোনটি ভুল তা নির্দেশ থাকা আবশ্যক। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যেই এর উপরেই কোনও জাতির শুদ্ধ শব্দ উচ্চারণের ধারাটা গড়ে ওঠে।

৭. বাংলার ক্ষেত্রে এর শব্দভাণ্ডার বিভিন্ন ভাষার শব্দে সমৃদ্ধ। তাই এই শব্দভাণ্ডারে আগন্তুক শব্দের সংখ্যা অনেক। সেই সব শব্দের উচ্চারণ, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া উচিত।

৮. শব্দের আঞ্চলিক উপভাষাগত পার্থক্য নির্ণয় করা অভিধান রচনার আর একটা দিক।

মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিধান রচনার প্রয়াস দেখা গেছে বহুদিন ধরেই। প্রাচীন কালের অভিধান মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের অভিধান রচনা হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। বর্তমানে মূলত দু'ধরনের অভিধান লেখা হচ্ছে। যেমন — সাধারণ ও বিশেষ।

সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে সাধারণ অভিধান লেখার চল সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এখানে এক ভাষী, দ্বিভাষী, বহুভাষী এই তিন পর্বের অভিধান রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই ধরনের অভিধান মূলত সংক্ষিপ্ত, মাঝারি ও সম্পূর্ণ মানের হয়ে থাকে। আর বিশেষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা, প্রশাসন সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত ইত্যাদি। এই অবধি যত অভিধান লেখা হয়েছে তাতে ইংরেজি ভাষার অভিধান ছাড়া কোনও অভিধানই সব লক্ষ পূরণ করতে সক্ষম হয়নি।

অভিধানকে বলা হয় ভাষাবিজ্ঞানের সংযোগমূলক বিভাগ। কারণ এটি ভাষার বিকাশ ও প্রকাশগত দিক উভয়ই আলোচনা করে। অর্থাৎ ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াও বর্তমানে আরও অনেক বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে অভিধান রচনায়। যেমন —

১. ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। কারণ প্রতি মুহূর্তেই ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরবর্তন মূলত ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগত ও শব্দার্থগত। অভিধানকারকে এই পরিবর্তনের দিকে নজর দিয়ে অভিধান লিখতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জনের নীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২. সমাজে প্রতি নিয়তই নিত্য নতুন শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। তা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাধারণ যা বিষয়ই হোক না কেন, আধুনিক অভিধানে তা ক্রমশই স্থান পাচ্ছে।

৩. আধুনিক অভিধানে 'চরিতাবলী' নামে নতুন পর্যায়ের স্থান দেওয়া হয়েছে। এই অংশে দেশ বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও পুরাণকথার দেব-দেবীর নাম ও পরিচয় অন্তর্ভুক্ত।

৪. পৃথিবীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তা ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক যাই হোক না কেন সবই আধুনিক অভিধানের অংশ বিশেষ।

৫. আধুনিক অভিধানে বাংলা ব্যাকরণের নিয়মকানুন, নতুন ওজন, পরিমাণ প্রণালী, সরকারি কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬. আধুনিক অভিধানে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, ব্যাকরণের তত্ত্ব, প্রুফ সংশোধন প্রণালী ইত্যাদি বিষয় সংযোজিত হচ্ছে।

৭. সাধারণ ও বিশেষ' অভিধান ছাড়াও বর্তমানে ঔপভাষিক অভিধান রচনা অভিধানকারদের নতুন সংযোজন। এই পর্বে আঞ্চলিক শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ, ভাষার ইতিহাস সবই আলোচিত হচ্ছে। তা ছাড়াও অঞ্চলভেদে উচ্চারণগত, ধাতুগত, রূপগত ইত্যাদি পার্থক্যও বোঝান হচ্ছে। আক্ষেপের বিষয়, বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান রচনা খুব একটা বেশি এগোয়নি।

পরে আস্তে আস্তে বাঙালিদের মধ্যে অভিধান প্রণয়নের ধারা ছড়িয়ে যায়। প্রথম বাঙালি অভিধানকার ছিলেন

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তিনি ১৮১০ সালে লেখেন 'এ ভোকাবোলারি, বেংগলি অ্যান্ড ইংলিশ, ফর দ্য ইউস অব স্টুডেন্ট'। এরপরের অভিধান রচয়িতা উইলিয়াম কেরি। তাঁর লেখা অভিধানটির নাম 'এ ডিকশনারি অফ দি বেংগলি ল্যাংগুয়েজ ইন হুইচ দ্য ওয়র্ডস অর ট্রেসড টু দেয়ার অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ভেরিয়াস মিনিংস গিভেন'। দু'খণ্ডে সমাপ্ত এই অভিধানটির প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮১৫ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৫। কেরির এই ব্যাকরণটি ছিল খুবই বড়ো মাপের। তাতে ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল অনেক। যাই হোক এরপর জি. সি. হটন লেখেন 'এ ডিকশনারি, বেংগলি অ্যান্ড স্যানস্ক্রিট/এক্সপ্লেইনড ইন ইংলিশ'। হটন ইংরেজ হয়েও কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ওপর অভিধান লিখেছিলেন। সেইসময় এই অভিধানটি বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মতো।

বাংলায় লেখা বাংলা ভাষার বিখ্যাত অভিধানগুলি হল —

১. 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (১৯০৫) : সুবলচন্দ্র মিত্র

২. 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১৯১৩) : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

৩. 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯১৬) : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

৪. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯১৬) : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. 'চলন্তিকা' (১৯৩০) : রাজশেখর বসু

৬. 'শব্দবোধ বাংলা অভিধান' (১৯৩৮) : আশুতোষ দেব

৭. 'সংসদ ইংরেজি বাংলা অভিধান' (১৯৫১) : শৈলেন্দ্রকুমার বিশ্বাস

৮. 'সংসদ বাংলা অভিধান' (১৯৬১) : শৈলেন্দ্রকুমার বিশ্বাস

৯. 'বাংলা-রুশ অভিধান' (১৯৬২) : ইয়েফ্‌গেনিয়া বিকোভার

১০. 'সংসদ বাংলা ইংরেজি অভিধান' (১৯৬৮) : শৈলেন্দ্রকুমার বিশ্বাস

১১. 'রুশ-বাংলা অভিধান' (১৯৭০) : ইয়েফ্‌গেনিয়া বিকোভার

এ কথা স্বীকার্য বাংলা অভিধান রচনায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশিরা।

৮.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অভিধানের শ্রেণিবিভাগ করে তার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করো।

২। অভিধানের স্বরূপ আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও অভিধান রচনায় কোন কোন বিষয়ের উপর অভিধানকারী জোর দিয়ে থাকেন?

৮.৪.১৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন

৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ'

৪. প্রসঙ্গ: বাংলাভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) - সুখেন বিশ্বাস

৫. ভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ - সুখেন বিশ্বাস

বাংলা (এম.এ)

চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক : ১৬ : বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১৬.১ ভূমিকা

৮.৪.১৬.২ বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি

৮.৪.১৬.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৪.১৬.১ ভূমিকা

পৃথিবীর সব ভাষার মত বাংলাও একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা। এই ভাষার বৈচিত্র অনেক। বাক্যগত, রূপগত ও ধ্বনিগত দিক থেকে এই বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। মূলত ধ্বনিগত কারণটি সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। কখনও উচ্চারণের সুবিধা, কখনও আরামপ্রিয়তা, কখনও নতুন শব্দ সৃজনের লক্ষ্যে অহরহ ধ্বনি পরিবর্তন চলছে। এখানে সেই পরিবর্তনের কয়েকটি তুলে ধরা হল।

৮.৪.১৬.২ : বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ :

উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনার রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। 'স্বরভক্তি' কথাটির অর্থ স্বরের দ্বারা বিভক্ত করা। আর 'বিপ্রকর্ষ' কথাটির অর্থ ব্যবধান সৃষ্টি করা। স্বরভক্তির কারণে শব্দের উচ্চারণ সহজ হয়। মূলত স্বরবর্ণের আগম ঘটিয়ে স্বরভক্তি করা হয়। উদাহরণ হল —

'অ' আগম :

ধর্ম > ধরম, জন্ম > জনম

দর্পণ > দরপণ, কর্ম > করম ইত্যাদি

ধরম - ধ্ + অ + র + অ + ম্ এখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'র্ম' কে ভেঙ্গে তার মধ্যে 'অ' স্বরধ্বনিটির প্রবেশ ঘটেছে।

ই-আগম :

স্নান > সিনান

মিত্র > মিত্তির

বর্ষণ > বরিষণ প্রভৃতি।

উপরোক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে স্নান > সিনান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্ + ন্ + আ + ন্ > স্ + ই + ন্ + আ + ন্। অর্থাৎ—এখানে 'স' ও 'ন' ব্যঞ্জনের মধ্যে 'ই' ধ্বনিটির আগম ঘটেছে। 'উ' আগমের উদাহরণ —

মুক্তা > মুকুতা ইত্যাদি।

উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ম্ + উ + ক্ + ত্ + আ > ম্ + উ্ + ক্ + উ + ত্ + আ। অর্থাৎ 'উ' ধ্বনিটি এসেছে 'ক' ও 'ত' ব্যঞ্জনের মাঝে। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি উদাহরণ হল —

ভ্রু > ভুরু

পুত্র > পুত্তুর

শত্রু > শত্তুর ইত্যাদি

'ও' আগম :

চন্দ্র > চন্দোর

শ্লোক > শোলোক প্রভৃতি।

প্রথম উদাহরণটি ভাঙলে দেখা যায় চ্ + অ + ন্ + দ্ + র্ + অ + ও > চ্ + অ + ন্ + দ্ + ও + র্ + অ অর্থাৎ 'ও' স্বরধ্বনিটি 'দ' ও 'র' এই যুক্ত ব্যঞ্জন দুটির মাঝে এসেছে।

'এ' আগম :

গ্রাম > গেরাম ইত্যাদি

গ্ + র্ + আ + ম্ > গ্ + এ + র্ + আ + ম্

এখানে 'র' ও 'ম' এই ব্যঞ্জনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'এ' স্বরধ্বনিটির আগম হয়েছে। এ ছাড়া —

গ্লাস > গেলাস

ধ্যান > ধেয়ান প্রভৃতি।

অপিনিহিতি :

শব্দটি ইংরেজি 'Epenthesis' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'মধ্যবর্তী অবস্থান'। শব্দের মধ্যে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত 'ই' বা 'উ'কার যখন অব্যবহিত আগে উচ্চারিত হয়, তখন সেই রীতিকে বলে 'অপিনিহিতি'। মূলত পূর্ব বাংলার উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন —

'ই' আগম :

করিয়া > কইর‍্যা, কাঁচি > কাইচি

রাখিয়া > রাইখ্যা, কলিকাতা > কইলকাতা

বলিয়া > বইল্যা, কাব্য > কাইব্য

ধরিয়া > ধইর‍্যা ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে প্রথমটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

ক্ + অ + র্ + ই + আ > ক্ + অ + ই + র্ + আ

অর্থাৎ এখানে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত 'ই' কার অব্যবহিত আগে উচ্চারিত হয়েছে।

'উ' আগম :

সাধু > সাউধ ইত্যাদি।

উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

স্ + আ + ধ্ + উ > স্ + আ + উ + ধ্

এখানে 'উ' কারটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অব্যবহিত আগে উচ্চারিত হয়েছে।

এ ছাড়া —

দাদু > দাউদ

জলুয়া > জউলিয়া

আশু > আউশ

চক্ষু > চউখ প্রভৃতি।

অভিশ্রুতি :

অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায় অভিশ্রুতি। অপিনিহিতি প্রক্রিয়ার 'ই' ও 'উ' যখন লোপ পায় এবং একপ্রকার সন্ধিতে মিলিত হয়ে তার প্রভাবে পরবর্তী স্বরের সংগতি বা বিকৃতি ঘটিয়ে সম্পূর্ণ একটি নবরূপ ধারণ করে, তখন সেই রীতিকে অভিশ্রুতি বলে।

উদাহরণ :

রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে প্রভৃতি।

এই উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

র্ + আ + খ্ + ই + আ > র + আ + ই + খ্ + খ + আ > র + এ + খ্ + এ

অর্থাৎ এখানে প্রথমে অপিনিহিতি প্রক্রিয়াটি দেখা গেছে। তারপর অপিনিহিতির 'ই'-কারটি পরবর্তী স্বরটির সঙ্গতি বা বিকৃতি ঘটিয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ 'এ' কারে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া —

বানিয়া > বাইন্যা > বেনে

মাছুয়া > মাউছা > মেছো

চলিয়া > চইলা > চলে ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি :

শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় স্বরের সঙ্গতি। উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি ও

পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, সেই রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। উদাহরণ :

পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন :

দিতাম > দিতেম

মিথ্যা > মিথ্যে

হিসাব > হিসেব

ছিলাম > ছিলেম

উনান > উনুন

বিলাত > বিলেত প্রভৃতি।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে প্রথমটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

দ্ + ই + ত্ + আ + ম্ > দ + ই + ত + এ + ম্

এখানে পূর্ববর্তী স্বর 'ই'-এর প্রভাবে পরবর্তী স্বরটি (আ) প্রভাবিত হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ নতুন স্বর 'এ' তে পরিণত হয়েছে।

পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন :

দেশি > দিশি ইত্যাদি।

এটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

দ্ + এ + শ্ + ই > দ্ + ই + শ্ + ই

এখানে পরবর্তী স্বর 'ই' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর 'এ' কারের পরিবর্তন ঘটেছে।

আবার — বুঝে > বোঝে। এই উদাহরণে দেখা যায় — ব্ + উ + ঝ্ + এ > ব্ + ও + ঝ্ + এ। অর্থাৎ এখানে পরবর্তী স্বর 'এ' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর 'উ' এর পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সম্পূর্ণ নতুন স্বর 'ও' কারের উদ্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি উদাহরণ হল —

তুলা > তুলো

রূপা > রূপো

শিখে > শেখে

লিখে > লেখে ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপ :

উচ্চারণের সুবিধার জন্যে বা উচ্চারণকে সহজ করার জন্যে যখন শব্দের আদি মধ্য ও অন্ত্যে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হয়, তখন সেই রীতিকে ধ্বনিলোপ বলে। এই পরিবর্তন দু'প্রকার। তা হল স্বরলোপ ও ব্যঞ্জনলোপ।

স্বরলোপ : শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনি লোপ হলে, তাকে স্বরলোপ বলে। স্বরলোপ তিন প্রকার। যথা —

ক. আদি স্বরলোপ

খ. মধ্য স্বরলোপ

গ. অন্ত্য স্বরলোপ

আদি স্বরলোপ : যদি আদি স্বর ছাড়া অন্য স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে, তবে আদি স্বরটি ক্রমশ দুর্বল হতে হতে লোপ পেয়ে যায়। এই প্রকার স্বরলোপকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন — অলাবু > লাউ, এখানে পরবর্তী স্বরে শ্বাসাঘাত থাকায় আদি স্বর 'উ' লুপ্ত হয়েছে। এ ছাড়াও —

ওঝা > ঝা

উধার > ধার

অতসী > তিসি প্রভৃতি।

মধ্য স্বরলোপ। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্য স্বর যখন লোপ পায়, তখন তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন— নারিকেল > নারকেল, এখানে শব্দের আদিস্বরে (আ) শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্য স্বর 'ই' লোপ পেয়েছে। এ ছাড়াও —

গামোছা > গামছা

নাতিনী > নাতনি ইত্যাদি।

অন্ত্য স্বরলোপ : শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার ফলে শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর লোপ পেলে তাকে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। যেমন — অতিথি > অতিথ, এখানে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ায় অন্ত্য স্বর 'ই' লোপ পেয়েছে। এ ছাড়া —

আশা > আশ

রাশি > রাশ

আগি > আগ প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনলোপ : শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে ব্যঞ্জনলোপ বলে। ব্যঞ্জনলোপ তিন প্রকার। যথা —

ক. আদি ব্যঞ্জনলোপ

খ. মধ্য ব্যঞ্জনলোপ

গ. অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ

আদি ব্যঞ্জনলোপ : শব্দের প্রথমে অবস্থিত ব্যঞ্জন লোপ পেলে সেই লোপকে আদি ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন —

হৃদয় > রিদয়

শ্মশান > শশান

প্রিয়া > পিয়া ইত্যাদি।

মধ্য ব্যঞ্জনলোপ : শব্দের মধ্যস্থ ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে তাকে মধ্য ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন — চাহিল > চাইল, এখানে শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'হ' ব্যঞ্জন ধ্বনিটি লুপ্ত হয়েছে। এ ছাড়াও —

শৃগাল > শিআল, মহাশয় > মশায়, ফলাহার > ফলার প্রভৃতি।

মনে রাখতে হবে, মধ্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে 'হ' ধ্বনিটিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়।

অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ : শব্দের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে তাকে অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন — বউদিদি > বউদি, এখানে শব্দের অন্ত্যে অবস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনি 'দ' লুপ্ত হয়েছে। এ ছাড়াও —

আল্লাহ > আল্লা, শিয়ালদহ > শিয়ালদা ইত্যাদি

এখানেও 'হ' ব্যঞ্জন ধ্বনিটির লোপ প্রবণতা বেশি।

ধ্বনির আগম :

উচ্চারণের সুবিধা বা উচ্চারণকে সহজ করার জন্যে যখন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটে, তখন সেই রীতিকে ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম বলা হয়। এই রীতি দু'প্রকার। তা হল স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম।

স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের কোনও স্থানে স্বরের আগমকে স্বরধ্বনির আগম বলা হয়। স্বরধ্বনির আগম ঘটতে পারে শব্দের তিনটি স্থানেই। সেই হিসাবে স্বরধ্বনির আগম তিন ভাগে বিভক্ত। যথা —

ক. আদি স্বরাগম

খ. মধ্য স্বরাগম

গ. অন্ত্য স্বরাগম

আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের মধ্যে অবস্থিত ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। উদাহরণ —

স্টেশন > ইস্টেশন, এখানে শব্দের মধ্যে অবস্থিত ব্যঞ্জনের আদিতে 'ই' স্বরধ্বনিটির আগমন ঘটেছে। এ ছাড়াও —

স্টিমার > ইস্টিমার

স্ত্রী > ইস্তিরি

স্পর্ধা > আস্পর্ধা প্রভৃতি।

মধ্য স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনার রীতিকে মধ্য স্বরাগম বলে। মধ্য স্বরাগমই হল 'স্বরভক্তি' বা 'বিপ্রকর্ষ'। যেমন — ভক্তি > ভকতি, এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন 'ক' ও 'ত'-এর মধ্যে 'ই' স্বরধ্বনিটির আগমন ঘটেছে। এ ছাড়াও —

গ্রাম > গেরাম

প্রীতি > পিরিতি ইত্যাদি।

অন্ত্য স্বরাগম : শব্দের অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমনকে অন্ত্য স্বরাগম বলা হয়। যেমন — দুষ্ট > দুষ্টু, এখানে শব্দের অন্ত্যে 'উ' স্বরধ্বনিটির আগম ঘটেছে। এ ছাড়া উদাহরণ হল —

বেঞ্চ > বেঞ্চি

দুধ > দুধু প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। স্বরাগমের মতো ব্যঞ্জনাগমও শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ঘটতে পারে। এই হিসাবে ব্যঞ্জনাগম তিন প্রকার। যথা —

ক. আদি ব্যঞ্জনাগম

খ. মধ্য ব্যঞ্জনাগম

গ. অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম

আদি ব্যঞ্জনাগম : শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনের আগমন ঘটলে তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। যথা — ওঝা > রোজা, এখানে শব্দের আদিতে 'র' ব্যঞ্জনের আগমন ঘটেছে। এ ছাড়াও — উই > রুই, উপকথা > রূপকথা ইত্যাদি।

মধ্য ব্যঞ্জনাগম : শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। যেমন অম্ল > অম্বল ইত্যাদি। উদাহরণটিতে দেখা যায় শব্দের মধ্যে 'ব' ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটেছে।

অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম : শব্দের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন — রাধাকৃষ্ণ > রাধাকৃষ্ণাণ প্রভৃতি। এই উদাহরণটিতে দেখা যায় শব্দের অন্ত্যে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটেছে। এ ছাড়াও —

বাবু > বাবুন

খোকা > খোকন

জমি > জমিন ইত্যাদি।

সমীভবন :

একই শব্দের মধ্যে দুটি ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্যে দুটি ধ্বনিকে একই ধ্বনিতে পরিবর্তিত করা হয় বা ধ্বনি দুটি পরস্পরের প্রভাবে সমধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তখন এই পরিবর্তনের রীতিকে সমীভবন বা ব্যঞ্জন সঙ্গতি বলে। সমীভবন তিন প্রকার। যথা —

ক. প্রগত সমীভবন

খ. পরাগত সমীভবন

গ. অন্যোন্য সমীভবন

প্রগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন — চন্দন > চন্নন। উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

চ্ + অ + ন্ + দ্ + অ + ন্ > চ্ + অ + ন্ + ন্ + অ + ন্ + অ

অর্থাৎ এখানে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনি 'ন'-এর প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনি 'দ' পরিবর্তিত হয়ে সমধ্বনিতে (ন) পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া —

পদ্ম > পদ্দ

লগ্ন > লগ্ন

চক্র > চক্ক প্রভৃতি।

পরাগত সমীভবন : পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে সমধ্বনিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন — গল্প > গপ্প। উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় —

গ্ + অ + ল্ + প্ + অ > গ্ + অ + প্ + প্ + অ

এখানে পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনি 'প' পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ল' কে প্রভাবিত করেছে। এবং 'ল' পরিবর্তিত হয়ে সমধ্বনিতে (প) রূপান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া —

কর্ম > কম্ম, পাঁচশো > পাঁশশো ইত্যাদি।

অন্যোন্য সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা সাম্য লাভ করে, তখন সেই রীতিকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন —

উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস

চার + টি > চারডি প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য সংস্কৃত ও বাংলায় ব্যঞ্জন সন্ধির ক্ষেত্রেই অন্যোন্য সমীভবন প্রক্রিয়াটি ঘটে।

বিষমীভবন :

সমীভবনের ঠিক বিপরীত পরিবর্তনের রীতিকে বিষমীভবন বলে। অর্থাৎ একই শব্দের মধ্যে দুটি সম ব্যঞ্জন পাশাপাশি থাকলে, তাদের মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার রীতিকে বিষমীভবন বলে। উদাহরণ— লাল > নাল, এখানে সমধ্বনি 'ল' পরিবর্তিত হয়ে ব্যঞ্জন 'ন'-এ পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া —

ললাট > নলাট ইত্যাদি।

ঘোষীভবন :

উচ্চারণের সুবিধার জন্যে অঘোষ ধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়ার রীতিকে ঘোষীভবন বলে। যেমন — বক > বগ, এখানে অঘোষ ধ্বনি 'ক' ঘোষধ্বনিতে অর্থাৎ শব্দের তৃতীয় ধ্বনি 'গ'তে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও — শাক > শাগ প্রভৃতি।

অঘোষীভবন :

সঘোষ ধ্বনি যখন অঘোষ হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন তাকে অঘোষীভবন বলে। উদাহরণ — কাজ করা > কাচ করা। এখানে ঘোষধ্বনি 'জ' অঘোষ ধ্বনি 'চ' তে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও বলা যায় —

ছাদ > ছাত

বড়ঠাকর > বটঠাকুর

কতদূর > কদ্দুর ইত্যাদি।

বর্ণবিপর্যয় :

উচ্চারণকালে শব্দ মধ্যস্থ ধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বর্ণবিপর্যয় বা ধ্বনিবিপর্যয় বলে। যেমন —

বাক্স > বাস্ক

রিক্সা > রিস্‌কা

মুকুট > মুটুক প্রভৃতি।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে বাক্স > বাস্ক-কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় —

ব্ + আ + ক্ + স্ + অ > ব্ + আ + স্ + ক্ + অ

অর্থাৎ এখানে 'ক' ও 'স' এই ব্যঞ্জন দুটি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে।

উষ্মীভবন :

স্পর্শ ধ্বনির উচ্চারণ কালে যদি শ্বাসবায়ু আংশিক ভাবে বাধা পেয়ে উষ্ম ধ্বনির সৃষ্টি করে, তখন সেই পরিবর্তনকে উষ্মীভবন বলে। উদাহরণ —

কালীপূজা > খালীপূজা ইত্যাদি।

এখানে স্পর্শধ্বনি 'ক' উষ্মধ্বনি 'খ'-তে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য উদাহরণ —

যেমন — ফুল/phul/ > ফুল/fool/, কাগজ > খাগজ প্রভৃতি।

'স' কারীভবন :

তালব্য ধ্বনি যখন 'স'-এর মতো উচ্চারিত হয়, তখন সেই পরিবর্তনকে সকারীভবন বলে। যেমন —

গেছে > গেসে ইত্যাদি।

এখানে তালব্য ধ্বনি 'ছ', 'স' হয়ে উচ্চারিত হয়েছে। এ ছাড়াও —

খেয়েছে > খাইসে

কিছু > কিস্‌সু প্রভৃতি।

'র' কারীভবন :

'স' ধ্বনিটি প্রথমে 'জ'তে পরিণত হয় এবং পরে 'র' রূপে উচ্চারিত হয়, তখন এইরকম পরিবর্তনকে 'র' কারীভবন বলে। উদাহরণ —

হস > হজ > হেয়ার

পঞ্চদশ > পন্নডহ > পনর প্রভৃতি।

নাসিক্যীভবন :

নাসিক্য ধ্বনি উ, ঞ, ণ, ম, ন ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলার প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন —

অঙ্ক > আঁক

পঞ্চ > পাঁচ — এই উদাহরণটিতে নাসিক্য ধ্বনি 'ঞ' লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'প'কে অনুনাসিক করে তুলেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য উদাহরণ—

দন্ত > দাঁত

সন্ধ্যা > সাঁজ

হংস > হাঁস ইত্যাদি।

স্বতোনাসিক্যীভবন :

অনুনাসিক ধ্বনির লোপ বা নাসিক্য ব্যঞ্জনের উপস্থিতি বা প্রভাব ছাড়াও যদি কোনও ধ্বনি সানুনাসিক হয়ে ওঠে, তবে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। উদাহরণ —

ঘোটক > ঘোঁড়া, পুস্তক > পুঁথি

পেচক > পেঁচা প্রভৃতি।

বিনাসিক্যীভবন :

মূল শব্দের নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হলেও যদি নাসিক্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত স্বরে কোনওরকম অনুনাসিকতা না দেখা যায়, তখন সেই রীতিকে বিন্যাসিক্যীভবন বলে। উদাহরণ—

শৃঙ্খল > শিকল।

উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় —

শ্ + র্ + ঙ + খ্ + অ + ল্ > শ্ + ই + ক্ + অ + ল্

অর্থাৎ এখানে নাসিক্যী ব্যঞ্জন 'ঙ' লুপ্ত হলেও পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন 'শ'-এ কোনওরকম অনুনাসিকতা নেই। এ ছাড়াও— মঞ্চ > মাচা, অভ্যন্তর > ভিতর ইত্যাদি।

বর্ণদ্বিত্ব :

শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোনও ধ্বনি বা বর্ণ দু'বার উচ্চারিত হলে তাকে বর্ণদ্বিত্ব বলে। যেমন — ছোট > ছোট্ট, পাকা > পাক্কা প্রভৃতি।

এখানে যথাক্রমে 'ট' ও 'ক' দুবার উচ্চারিত হয়েছে।

বর্ণবিকার :

শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোনও ধ্বনি বা বর্ণের বিকৃত উচ্চারণ হলে তাকে বর্ণবিকার বলে। উদাহরণ —

আধলা > আদলা

আ + ধ্ + ল্ + আ > আ + দ্ + ল্ + আ

শাক > হাগ ইত্যাদি।

শ্ + আ + ক্ > হ্ + আ + গ্

৮.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি উদাহরণসহ লেখো।

২। টীকা লেখো ঃ

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, ধ্বনিলোপ (স্বরলোপ, ব্যঞ্জনলোপ), ধ্বনির আগম (স্বরাগম, ব্যঞ্জনাগম) সমীভবন, বিষমীভবন, ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, বর্ণবিপর্যয়, উষ্মীভবন, 'স'কারীভবন, 'র'কারীভবন, নাসিক্যীভবন, স্বতোনাসিক্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, বর্ণদ্বিত্ব, বর্ণবিকার।

৮.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন

৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ'

৪. প্রসঙ্গ: বাংলাভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) - সুখেন বিশ্বাস

৫. ভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ - সুখেন বিশ্বাস

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

অষ্টম পত্র

বিশেষ পত্র – নাট্যসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান - সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are-self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

চতুর্থ ষাণ্মাসিক বা চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র : নাট্যসাহিত্য

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

একক ১. নাট্যাভিনয়

একক ২. নাট্যকলা

একক ৩. নাট্য প্রযোজনা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

একক ৪. মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত

একক ৫. মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা

একক ৬. আবহরচনা, অভিনয়কলা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৭. অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : বাংলা মঞ্চ

একক ৮. শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

একক ৯. নাট্য পরিচালনা : শতবর্ষ – অতিক্রান্ত ইতিহাস

একক ১০. বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১১. নাট্যকার মন্মথ রায়

একক ১২. প্লে-রাইট শেক্সপীয়র

একক ১৩. লৌকিক নাটক

একক ১৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক

বিশেষ পত্র : নাট্যসাহিত্য

অষ্টম পত্র

সূচিপত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)	**পাঠপ্রণেতা**	**পৃষ্ঠা**
একক ১. নাট্যাভিনয়	ড. শ্রাবন্তী পান	১- ১২
একক ২. নাট্যকলা	ড. শ্রাবন্তী পান	১৩-২০
একক ৩. নাট্য প্রযোজনা	ড. শ্রাবন্তী পান	২১-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৩ ঘণ্টা)		
একক ৪. মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত	ড. রাজশেখর নন্দী	৩০-৩৯
একক ৫. মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা	ড. রাজশেখর নন্দী	৪০-৪৯
একক ৬. আবহরচনা, অভিনয়কলা	ড. রাজশেখর নন্দী	৫০-৫৬
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
একক ৭. অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : বাংলা মঞ্চ	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭-৬৩
একক ৮. শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪-৭০
একক ৯. নাট্য পরিচালনা : শতবর্ষ – অতিক্রান্ত ইতিহাস	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১-৮০
একক ১০. বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১-৯০
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)		
একক ১১. নাট্যকার মন্মথ রায়	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১-১০০
একক ১২. প্লে-রাইট শেক্সপীয়র	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১-১১০
একক ১৩. লৌকিক নাটক	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১-১২০
একক ১৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক	ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১-১৩০

বিশেষ পত্র: নাটক

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ- ১

একক -১

নাট্যাভিনয়

বিন্যাসক্রম

৮.১.১.১প্রস্তাবনা
৮.১.১.২ যাত্রার উৎস অনুসন্ধান
৮.১.১.৩ বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রাচীন প্রেক্ষিত
৮.১.১.৪ মঞ্চাভিনয়ের সূচনা ও গেরাসিম লেবেডেফ
৮.১.১.৫ লেবেডেফ প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের প্রভাব
৮.১.১.৬ ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব
৮.১.১.৭ বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্থাপনাকাল
৮.১.১.৮ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান
৮.১.১.৮.১ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্ব
৮.১.১.৮.২ ‘নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল’ পাস
৮.১.১.৮.৩ নাট্যমঞ্চে অভিনেত্রীবর্গের আবির্ভাব
৮.১.১.৮.৪ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র
৮.১.১.৮.৫ নাট্যাভিনয়ের সমকালীন পটভূমি
৮.১.১.৯ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব
৮.১.১.১০ নাট্যাভিনয়ের পালাবদল
৮.১.১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৮.১.১.১২ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.১.১.১প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নাট্যাভিনয় প্রচলিত থাকলেও বঙ্গদেশে তার কোনও প্রভাব ছিল না। এখানকার প্রাচীন অভিনয় ঐতিহ্য হল যাত্রা। আর সেই যাত্রা হত খোলা জায়গায়, দর্শকের মধ্যে। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রসেনিয়াম, সেই বাঁধা মঞ্চের কোনও ধারণা আগে এখানে ছিল না। ইউরোপের নাট্যধারার অনুকরণে সাহেবরা সেই বাঁধা মঞ্চ বা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রবর্তন করল এ দেশে। কলকাতা শহরের প্রথম যে মঞ্চটির কথা জানা যায়, সেটি ইংরেজদের তৈরি। নাম The Play House। দশ কি বিশ বৎসর আগে ‘থিয়েটার’ বললেই লোকে বুঝতো প্রসিনিয়ামমঞ্চে প্রদর্শিত কোনো নাট্যাভিনয়। কিন্তু বর্তমানে ‘এরীনা থিয়েটার’ বা ‘থিয়েটার ইন দি রাউন্ড’ বিষয়ে অনেক প’ড়ে-শুনে আমরা অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছি। তাই এখন আমরা থিয়েটার বলতে বুঝি অভিনয়ের জন্য একটি মঞ্চ, যেখানে ঝালর, পর্দা,

পট, সবই থাকতে পাবে, কিন্তু সব অভিনয়ে সবকিছু ব্যবহৃত নাও হ'তে পারে।আর 'যাত্রা' বা ঐধরনের অনেক নাট্যভঙ্গীকে আমাদের সরকারি/ শিক্ষিত পরিভাষায় বলা হয় 'লোকনাট্য।' এতে একটি কৌতুকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যাত্রা, যেটা দর্শকদের মাঝখানে একটি আসরে চিরদিন অভিনীত হোত, সেটা, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাত্রই একটা 'লোকনাট্য' ছিল। অর্থাৎ খুব পুরানো ও অমার্জিত একটা ফর্ম, যেটা আমরা, আধুনিক ও বিদগ্ধজনেরা, অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু হঠাৎ সাহেবরা যখন আবার এটাকেই 'থিয়েটার ইন দি রাউন্ড' নাম দিয়ে গ্রহণ করেন তখন আমরাও হঠাৎ বিগলিত চক্ষে একেই আবার সবচেয়ে আধুনিক ও বৈপ্লবিক রীতি ব'লে স্বাগত জানাই।

৮.১.১.২ যাত্রার উৎস অনুসন্ধান

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন অভিনয়রীতির উল্লেখ আছে। এরই মধ্যে একটি রীতির নাম 'ওড্র মাগধী।' নাট্যশাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা আছে যে এই রীতি বিহার, ওড়িষ্যা, বাংলা ও নেপালে প্রচলিত ছিল।জন্ম বিবাহ বা বিভিন্ন ঋতুর পার্বণ উপলক্ষে এই বাংলায় এখনো কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। এই ব্রত বা আচারগুলির উদ্ভব প্রাক-আর্য সভ্যতায়। এই আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির প্রভাবই হয়তো ভরতমুনি বর্ণিত 'ওড্র মাগধী' রীতির মূল।এ.বি. কীথ তাঁর সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে লেখা গ্রন্থে বলেছেন- ['নাটকের] জনপ্রিয় শাখাটি' যা বাঙলা সাহিত্যে যাত্রা নামে বহুল পরিচিত, সেটি কিন্তু অনেক যুগ পেরিয়েও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; অথচ মার্জিত এবং পুরোহিত-শাসিত বৈদিক নাটক কোনো উত্তরপুরুষ না রেখেই লোপ পেয়ে গেল।' তিনি আরো বলেছেন যে, ফন শ্রয়ডারের মতে 'যাত্রা ও বৈদিক নাটকের মূল এক হলেও পরে ভিন্ন ধারা অবলম্বন করেছে।' এর ফলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রথমে যাত্রার নামকরণ সম্পর্কে। কিছু পণ্ডিত মনে করেন রথযাত্রা স্নানযাত্রা সংযাত্রা ইত্যাদি পার্বণের মধ্যেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি। অন্যদিকের পণ্ডিত বললেন, বাংলার পশ্চিমসীমান্তে কোনো-কোন উপজাতির মধ্যে যাত্রা নামে অনুষ্ঠানের নাকি প্রচলন আছে। অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা এই পার্বণ উপলক্ষে একটি খুঁটিকে ঘিরে নাচগান করে।শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি দাক্ষিণাত্যে 'মারীযাত্রা' নামে এক ধরনের অনুষ্ঠান দেখেছেন। এবং পূর্ব সমুদ্রের তটবর্তী এলাকায় জেলেদের মধ্যে 'যাত্রে' নামে একটি পার্বণ নাকি এখনও প্রচলিত।সুতরাং এসব তথ্য সঠিক হ'লে একথা মনে করা যেতে পারে যে নাট্যাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির উৎস হয়তো সংস্কৃত না হয়ে আঞ্চলিক ভাষা থেকেও এটা গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। কিংবা এমনও কেউ কেউ অনুমান করেন যে নাট্যাভিনয়ের এই রূপটি প্রাক-আর্য যুগের, কিন্তু এর নামের আর্যীকরণ ঘটেছে পরে। এবং এই বিশেষ ধরনের নাট্যরীতিই হয়তো নাট্যশাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছিল।

৮.১.১.৩ বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রাচীন প্রেক্ষিত

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিতে আমরা বুদ্ধ নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ পাই: 'নাচন্তি বাজিল, গান্তি দেবী/ বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।(১৭নং)। এখানে বজ্রচার্য নৃত্য করছেন আর দেবী (অভিনেত্রী) গাইছেন। এর বেশি কোনো বর্ণনা নেই। নাটক সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা নেই, বা আসরে বা মঞ্চে কোথায় যে এ অভিনয় হোত তারও কোনো বিবরণ নেই। শুধু অভিনেতা নাচছে ও অভিনেত্রী গাইছে, এই হলো বুদ্ধনাটক।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর দেশে তিন ধরনের ভাষা প্রচলিত ছিল ব'লে পণ্ডিতেরা বলেন : (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপ, (৩) শৌরসেনী অপভ্রংশ। অল্প যে-কয়েকটি নাটক আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে সেগুলি সংস্কৃতে লেখা। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষায় লেখা সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য অভিনীত কোনো নাটকের কথা আমরা পাইনি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' রচিত হয়। এই কাব্যে, এবং সে-যুগে রচিত অন্যান্য সাহিত্য থেকে, তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের জীবন-বিষয়ক-দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল তা আমরা জানতে পারি। তখন বাংলার প্রায় অর্ধভাগ পাঠান বিজেতাদের অধিকারে অথচ সেনবংশীয়দের

রাজসভা তখনো বৃন্দাবনলীলার তীব্র শৃঙ্গাররসে আবিষ্ট। 'গীত-গোবিন্দ'র মধ্যে তৎকালীন লৌকিক নাট্যরূপের অনেকগুলি লক্ষণ স্পষ্ট। এবং এ-ও জানা যায় যে জয়দেবের পত্নী পদ্মবতী গীতে পারদর্শিনী ও নৃত্যে পটীয়সী ছিলেন।

'গীত-গোবিন্দ' এবং পরবর্তীকালে রচিত 'মনসামঙ্গল', 'চন্ডীমঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ বোধহয় নৃত্য সহযোগে গীত হ'তো। কিন্তু উক্ত কাব্যগুলিতে কোনো গদ্য সংলাপ থাকতো কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই।কিন্তু চৈতন্যযুগে এসে আমরা দেখলাম গানের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু সংলাপও সংযোজিত হয়েছে। এবং এটাও স্মরণযোগ্য যে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভালো অভিনেতা ছিলেন।বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যাভিনয়ও মনে হয় বিরাট প্রেরণা পেয়েছিল। এবং কৃষ্ণের নানা লীলা অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণযাত্রা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। তাছাড়া ছিলো রামযাত্রা, এবং মহামারীর সময়ে শীতলাযাত্রা বা ওলাবিবির যাত্রা।

চৈতন্যপরবর্তী সময়টা আমাদের দেশের এক তমসাচ্ছন্ন যুগ, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ও কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিলো। তারপর এলো ইংরেজরা। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে চার্নক কলকাতা বন্দরের গোড়াপত্তন করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) এই দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আছে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। কলকাতা যখন গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে গ'ড়ে উঠছে, তখন বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোহর এবং নদিয়া অঞ্চলের 'যাত্রা' বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলো। এই প্রসঙ্গে পরমানন্দ অধিকারী, শিশুরাম অধিকারী, লোচন অধিকারীর যাত্রাদলের নাম উল্লেখযোগ্য। অধিকারী মানে মালিক। কিন্তু অধিকারীরা শুধু মালিকই ছিলেন না, তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন নির্দেশক, পালার লেখক, সঙ্গীতনির্দেশক, এবং কখনো কখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনেতা। তাঁরাই যাবতীয় ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন।

এই পালাগুলির বিষয় ছিলো কৃষ্ণযাত্রা বা কালীদয়মন অথবা ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টি 'বিদ্যাসুন্দর'। বিদ্যাসুন্দর-এর রচনারীতি অসাধারণ। সভাকবিসুলভ ভঙ্গিতে লেখা এই কাব্যটির মেজাজ সম্পূর্ণরূপে নাগরিক, ছন্দের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে সিনিকের ব্যঙ্গ-হাসি। ভারতচন্দ্রে বাক্যবিন্যাস অসামান্য। তাঁর অনেক পঙক্তি আজ প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। বহু সাধারণ নর-নারী দৈনন্দিন জীবনে তাঁরই পঙক্তি প্রবচন হিসেবে উদ্ধৃত করেন, যদিও তাঁরা কেউ ভারতচন্দ্রের নামই শোনেননি। ভারতচন্দ্র শৃঙ্গাররসেরও অকপট বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সিনিকভঙ্গীতে। অবশ্য মূলত এটি পালা হিসেবে রচিত হয়নি। কিন্তু পরে এটি পালারূপে গৃহীত হয় এবং বহু স্থানে অভিনীত হতো। সংলাপগুলি পয়ারে রচিত, কিন্তু কয়েকটি দৃশ্যে অভিনেতারা মুখে-মুখে সংলাপ তৈরি করে বলতেন , যেগুলি গদ্যে । বাকি অংশে থাকতো নাচ আর গান । মেয়েরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার যুগ তখন অতীত হয়ে গেছে । যাত্রায় বহু ছেলে ছিলো যারা স্ত্রী- ভুমিকায় অভিনয় করতো , নাচতো গাইতো । তবে নাট্যাভিনয়ের অন্যরূপে, যেমন ঝুমুরে, মেয়েরা থাকতো । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোনো এক উপন্যাসে এইধরনের একটি দলের কথা বর্ণনা করেছেন ।

৮.১.১.৪ মঞ্চাভিনয়ের সূচনা ও গেরাসিম লেবেডেফ

কলকাতা গড়ে ওঠবার সঙ্গে- সঙ্গে এক শ্রেণির বড়ো লোকেরও সৃষ্টি হয়। তাদের বাড়িতে তারা মাঝে- মাঝে এই যাত্রার আসর বসাতেন । তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলি চলতো। কলকাতা ভারতের রাজধানী হবার একুশ বছর পরে রুশ - দেশীয় জনৈক ব্যক্তি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তার প্রযোজনায় একটি বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই ভদ্রলোক হলেন গেরাসিম লেবেডেফ। তিনি দি ডিসগাইজ নামক ইংরেজী নাটকের কাল্পনিক সংবদল নামে এক বাঙলা তরজমা করেন। এই অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েরাই অংশ নিয়েছিলেন এবং টিকিটের হার ছিলো চার টাকা এবং আট টাকা। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রামূল্যের তুলনায়এই হার যে বেশ বেশি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমবারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লেবেডেফ পরবতী মার্চ মাসে পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অভিনয়ের পূর্ব দিনে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেন –'দর্শকদের সুবিধার জন্য বসিবার আসন দুই শত করা হইয়াছে যাহা শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে। দর্শন প্রার্থীদের লেবেডেফ এর নিকট এক স্বর্ণ মোহর দর্শনী সহযোগে আবেদন করিতে হইবে। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত

আবেদনপত্র গৃহীত হইবে।' একটি টিকিটের জন্য এক স্বর্ণ মোহর এই ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দেও চমকিত করবার মতো। অভিনয়ের শেষে তিনি ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় দর্শকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ১৮০১ খ্রীষ্টব্দে অর্থাৎ বাঙলাদেশে তাঁর প্রযোজিত অভিনয়ের ঠিক পাঁচ বছর পরে 'এ গ্রামার অব দি পিওর অ্যান্ড মিক্সড ঈস্ট ইন্ডিয়ান ডায়ালেক্টস' প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকায় তিনি লেখেন, দুটি অভিনয়েই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিলো।কিন্তু বাঙলা থিয়েটারের এই আকস্মিক অভ্যুদয় লেবেডেফ-এর বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হ'য়ে যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পূর্বে বাঙলা থিয়েটারের অস্তিত্ব পাই না। এখানে থিয়েটার বলতে যবনিকা-পট সমেত প্রসিনিয়াম মঞ্চের কথাই তাঁরা ধরছেন।

৮.১.১.৫ লেবেডেফ প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের প্রভাব

এখন দেখা যাক এই অভিনয়ের কী-কী প্রভাব আমরা লক্ষ করি। তখনকার যাত্রার পালায় কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাগ ছিলো না, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এমনিই চ'লে যেতো। দ্বিতীয়ত- অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থানের কোনো রীতি ছিলো না। অভিনেতারা তাদের পার্ট বলা বা গান গাওয়া হ'য়ে গেলে আসরের মধ্যেই ব'সে পড়তেন, আবার পরবর্তী দৃশ্যে প্রয়োজন হ'লে উঠে পড়তেন। লেবেডেফ প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের প্রভাবে এই রীতির পরিবর্তন শুরু হ'লো। এই প্রভাব অবশ্য প্রত্যক্ষ নয়, কেননা টিকিটের চড়া দামের জন্য কলকাতার অধিকাংশ লোকই তখন নিশ্চয় এই অভিনয় দেখার সুযোগ পাননি। এই প্রভাবটা এসেছিলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে।এই পরিবর্তনের প্রথম স্বাক্ষর পেলাম ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিরাজার যাত্রা'য়। প্রকাশের অল্পকাল পরেই এটি অভিনীত হয়। [বইটির নামকরণে] 'যাত্রা' কথাটি প্রচলিত নাট্যাভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে 'যাত্রা' শব্দের অর্থ গমন। নাটকটির বিষয় কলিরাজের চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় গমন। এই ব্যঙ্গনাটকের কুশীলবের মধ্যে আছেন কলিরাজ এবং তাঁর পারিষদবর্গ। যেমন, একজন বৈষ্ণব, একজন সাহেব, আর সপরিচারক তাঁর স্ত্রী। এই নাটকে শুরুতে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করতেন, অভিনয় শেষে প্রস্থান করতেন। নাটকটির অভিনয় বিশেষ সফল হয়েছিলো এবং সেকালের পত্র-পত্রিকাগুলিতে খুব প্রশংসিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে সেযুগে পুরোনো যাত্রাকে নতুন রূপ দেবার আরো অনেক চেষ্টা হয়েছিলো। এরকম অনেক নতুন রীতির যাত্রাভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়-পালাটির নাম নলদময়ন্তী।

৮.১.১.৬ ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব

কিন্তু এর সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির [প্রত্যক্ষ] প্রভাবও শুরু হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপন করেন। এখানে জুলিয়াস সীজার নাটকের অংশবিশেষ এবং উইলসনকৃত উত্তররামচরিত- এর অনুবাদ অভিনীত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সাহেবদের মতো অভিনয় করতে পারার জন্য বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন। বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নামে এরকম একজন যুবক 'সাঁ সুসি' থিয়েটারে ওথেলোর ভূমিকায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'সাঁ সুসি' নামটি ফরাসি। একজন পণ্ডিতের মতে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের ফরাসি নামকরণের মধ্যে এমন একটা হীনমন্যতাই প্রকাশ পায় যে, ফরাসিরা ইংরেজদের চেয়ে বেশি সংস্কৃত একথা যেন স্বীকৃত। ঠিক যেমন অনেক ভারতীয়ের কাছে পশ্চিমের জিনিসের কদর।

৮.১.১.৭ বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্থাপনাকাল

সেসময় 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' কাগজে লেখা হয় যে বাঙলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য বাঙালীদের একটা মঞ্চ থাকা উচিত, যেমন আছে বোম্বাইতে গ্র্যান্ট রোড থিয়েটার। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে উঠতে লাগলো। এই থিয়েটারে প্রসিনিয়াম মঞ্চ ছিলো, অঙ্কিত প্রেক্ষাপট ছিল, আর পোশাক-পরিচ্ছদগুলিও খুব দামী ছিলো। নাটকগুলি হয়

ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ এর নাট্যরূপ কিংবা সংস্কৃত নাটকের বাঙলা তরজমা অথবা সংস্কৃত নাটকের রীতিতে রচিত কোনো পৌরাণিক নাটক।১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সামাজিক নাটক কুলীনকুলসর্বস্ব (পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত) প্রকাশ হবার পর সেটাই প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক ব'লে বিখ্যাত হয়। উনিশ শতকের অধিকাংশ মনীষীই সমাজসংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই চিন্তাধারার প্রভাব থিয়েটারেও লক্ষ করা যায়। সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে আঘাত করার জন্য থিয়েটার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হ'য়ে উঠে।

এই সময় থেকে ‘যাত্রা’ নাটকীয় তীব্রতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রমশ অপেরার ধরন ত্যাগ ক'রে সংলাপপ্রধান হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু নাটকীয় সংলাপের ভাষা তখনো তৈরি হয়নি। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সংলাপ কথ্যভাষা থেকেই নেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু যে-তীক্ষ্ণতা কথ্য ভাষায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, অথবা আবেগের তীব্রতার জন্য দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে শব্দচয়নের যে-গুণ আনা দরকার তা এখানে নেই।সেই অনুসন্ধান শুরু হ'লো ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসুদন কলকাতার উত্তরাঞ্চলে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে আক্ষেপ ক'রে বলেন, ‘রাজারা এই তুচ্ছ নাটকের জন্য কী বিপুল অর্থব্যয় করেছেন’। তাঁর বন্ধুরা তখন তাঁকে একটা নাটক লেখার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি কথা দেন যে তিনি লিখবেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা প্রকাশিত হয়। পরের বছর প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’। এই প্রহসনের একটির বিষয় তৎকালীন নব্যবঙ্গ এবং অন্যটি হ'লো রক্ষণশীল সমাজ প্রসঙ্গে। দুটো নাটকই স্বতঃস্ফূর্ত কথ্যভঙ্গিতে লেখা এবং নাটক দুটি ভাষার গুণে বর্তমানেও সমান উপভোগ্য। শর্মিষ্ঠা যাত্রার ধরনে অভিনীত হয় এবং নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। কিন্তু মাইকেল অনুভব করলেন পদ্যাংশ অভিনয়ের জন্য অমিত্রার ছন্দের দরকার। তাঁর পরবর্তী নাটক পদ্মাবতী-তে এই ছন্দ প্রবর্তিত হ'লো। এতেওভিনয়ের ক্ষত্রে কিছুটা বদল এলো । যেমন কাশীরাম দাসের মহাভারতের ছন্দ :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবা- ন।।

এই পাঠের ধরন অনুসৃত হ'তো। পুরোনো যাত্রার রীতির মধ্যে। সুর ক'রে অনেকটা গানের মতো ক'রে বলা হ'তো। কিন্তু সাধারণ চরিত্রগুলো অভিনয়ে বানিয়ে বলবার সময়ে একবারে গদ্য ব্যবহার করতো।

কিন্তু আঠারো-উনিশ শতক থেকে এই ধারা বিবর্তিত হ'য়ে এমন একটা রীতির উদ্ভব হ'লো যেটা গদ্যের অনেক কাছাকাছি। উনিশ শতক মধ্যভাগে দেখব এই বলার ধরন একটু পৃথক :

কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দয়।
শোভাহীন সর্বোবর অন্ধকারময়।
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

কিন্তু মাইকেল পদ্মাবতী নাটকে যে- প্রবহমাণতা আনলেন, সেটা এই রকম :

একি? ওই না সে পদ্মাবতী
আয় লো কামিনী
এইরূপ কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে।

এই রীতির সূত্রপাত পদ্মাবতী’ তে, পরে মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকে বিকাশ লাভ করে। বিখ্যাত মেঘনাদবধ কাব্য পাঠককে চমকে দিয়েছিলো, তার কারণ এর ধরনটাই সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেমন :

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি
কোন বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকূলনিধি
রাঘবারি?

বাংলা কাব্যের এই শক্তি, এই ঐশ্বর্য আগে কখনো লক্ষ করা যায়নি। প্রখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্রবাবুর মতে মধুসূদনের ওপর থিয়েটারের দাবি তুলনায় বেশি, কেননা নাটককার রূপেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

একই বছরে অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। নীলকর সাহেব এবং রায়তদের নিয়ে লেখা এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য পাদ্রি লঙের জরিমানা হয়েছিলো। এসব কাহিনি বহুপরিচিত, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করা প্রয়োজন। কথাভাষা এখানে নাটকীয় সংলাপের উপযোগী তীক্ষ্ণতা এবং সুক্ষ্মতা পেয়েছে। এবং এখন থেকে আসরে-ঘেরা যাত্রার চেয়ে মঞ্চে অধিষ্ঠিত থিয়েটার অনেক বেশি প্রধান্য পেলো। বাস্তবের যে-প্রতিফলন প্রথম লক্ষ করা গেলো মধুসূদন-দীনবন্ধু প্রমুখ শক্তিশালী নাটককারদের রচনায় সেই সমসাময়িকতা যাত্রার পালায় ছিল না।

৮.১.১.৮ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান

একদল তরুণ অভিনেতা, যাঁদের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোনো রাজা-মহারাজা ছিলেন না, নাটকের টানে মিলিত হলেন। এই তরুণ সম্প্রদায় দীনবন্ধু মিত্রের একটি নাটক বেছে নিলেন, কেননা এতে জমকালো মঞ্চসজ্জা বা পোশাকের জন্য বহু-অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই। নাটকটির নাম সধবার একাদশী(১৮৬৬) - রঙ্গব্যঙ্গের সঙ্গে ট্র্যাজিক গভীরতা এই নাটকে অপূর্বভাবে মিশেছে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে [দুর্গা] পূজার সময়ে এটি অভিনীত হয়। এই নাটকে অভিনয় ক'রে চব্বিশ বছরের যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে ওঠেন। সমসাময়িক তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে অভিনয়ের এরকম মান আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এমন একটি ট্র্যাজিক গভীরতা স্পর্শ করেছিল যে, তাঁর দর্শকদের মনে হয়েছিল যে সে-যেন জীবনের এক পরম অভিজ্ঞতা।

কী-ক'রে এটা হ'লো? বড়োলোকেরা অভিনয়ের জন্য জলের মতো টাকা খরচ করতেন, আর এঁরা সামান্য সংগতি নিয়ে এ নাটক প্রযোজনা করেছিলেন। ইংরেজ শিক্ষকরা হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় শিক্ষিত বাঙালী তরুণদের কতো অভিনয় শেখাতেন,- শেখানো হ'তো বাচনপদ্ধতি, আঙ্গিক অভিনয়, এবং মূক অভিনয়ের কলাকৌশল। এঁদের মধ্যে অনেকেই কয়েকটি ইংরেজি-বাঙলা নাটকে অংশগ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু সধবার একাদশী নাটকের অভিনেতারা পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যিনি সেই গিরিশচন্দ্র ঘোষের কোনো কলেজি শিক্ষা পর্যন্ত ছিলো না। তিনি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ ক'রে দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন বটে, কিন্তু শুধু পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ ক'রেই তিনি বড়ো অভিনেতা হননি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যাত্রা কীর্তন এবং কথকতার অনুরাগী ছিলেন। কথকতায় কথক পুরাণ বা মহাকাব্য থেকে গৃহীত কাহিনী বর্ণনা করেন, তিনি নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় ক'রে দেখান, গান গেয়ে শোনান, এবং আবৃত্তি করেন। গিরিশচন্দ্রের অসামান্য অভিনয় প্রতিভার বিকাশ এই মূল থেকে শক্তি আহরণ ক'রে। তার মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐ আধুনিক বাঙলা থিয়েটার দেশের মূল অভিনয়ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একদিক থেকে বোধহয় তার সম্প্রসারণ। একথা আরো স্পষ্ট হবে পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের কার্যাবলি লক্ষ করলে।

৮.১.১.৮.১ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্ব

সধবার একাদশী'র এবং আরো কয়েকটি নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে এই তরুণ শৌখিন অভিনেতারা একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন, যেখানে লোকেরা ইচ্ছেমতো টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে পারবে। বড়লোকদের রঙ্গশালায় আমন্ত্রণপত্র ছাড়া তো সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলো না। তাছাড়া, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা তঁদের মাথায় এসেছিলো শুধু টাকা রোজগারের জন্য নয়, প্রতিবার অভিনয়ের জন্য চাঁদা তোলা এক বিরাট সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। কেননা চাঁদা যাঁরা দিতেন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি এবং তাঁদের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। প্রতিটি অভিনয়ের জন্য বারবার চাঁদা দেবার সংগতিও সব সময়ে হ'তো না। সুতরাং সানন্দে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হোল এবং যুবকরা এর নাম দিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। এইখানেই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর হ'লো। তিনি মনে করলেন সাধারণ রঙ্গশালার নামকরণ ন্যাশনাল হওয়া অনুচিত, কেননা নামের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। কিন্তু অন্যরা সম্মত হলেন না এবং প্রথম সাধারণ রঙ্গশালার উদ্বোধন হ'লো ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত নীলদর্পণ নাটক নিয়ে।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ করার আছে। বাঙলাদেশে নবনাট্যরীতিতে প্রথম মৌলিক নাটক হ'লো কুলীনকুলসর্বস্ব তৎকালীন সামাজিক কুপ্রথাকে আক্রমণই তার লক্ষ্য। আর প্রথম যে-নাটক নিয়ে সাধারণ রঙ্গশালার উদ্বোধন হ'লো তার নাম নীলদর্পণ। এর বিষয় হোল কী-ক'রে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশ ধ্বংস হচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায়, থিয়েটারের সূত্রপাতই হ'লো এই সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে।

৮.১.১.৮.২ 'নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল' পাস

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতবর্ষে এলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রিন্স অব ওয়েলস, পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন। জগদানন্দ নামে জনৈক ব্যবহারজীবী প্রিন্সকে স্বগৃহে [অন্দরমহলে] আমন্ত্রণ জানান। এই উপলক্ষে গজদানন্দ ব্যঙ্গনামে একটি নকশা রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র এই নকশার জন্য দুটি গান রচনা করেন। মহারাণীর একজন অতি-অনুগত প্রজাকে বিদ্রুপ করার অভিযোগে পুলিস এই অভিনয় বন্ধ ক'রে দেয়। একই বিষয়ে আরো দুটি নাটকের ওপর অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সে-সময়ে পুলিস কমিশনার ছিলেন মিঃ হগ এবং পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্টের নাম ছিল মিঃ ল্যাম। তখন আক্রমণের লক্ষ্য হলেন এঁরা। শুকর ও ভেড়ার পুলিশ নাম দিয়ে একটি নকশা লেখা হ'লো এবং অভিনীতও হ'লো। সাহেবদের পক্ষে এতোটা বরদাস্ত করা স্বভাবতই অসম্ভব ছিলো। ভারত সরকারের গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় ঘোষণা করা হ'লো যে, জনসাধারণের স্বার্থে সরকার যে-কোনো নাট্যাভিনয়কে ব্যক্তিগত কুৎসা বা আক্রমণপূর্ণ, রাষ্ট্রবিরোধী, অশ্লীল, অথবা অন্য কোনো কারণে আপত্তিকর মনে করলেই তার অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে পারেন।এর কিছুদনি পরেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল' পাস করা হয়।

৮.১.১.৮.৩ নাট্যমঞ্চে অভিনেত্রীবর্গের আবির্ভাব

পূর্বেই গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহযোগীদের প্রয়োজন ছিলো তাঁর মতোই একজন বিচক্ষণ নির্দেশকের। তাঁরা তাই তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। গিরিশচন্দ্র সম্মত হলেন। এবং তারপর আমরণ রঙ্গমঞ্চের সেবা ক'রে গেছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গিরিশচন্দ্র নিজস্ব একটি মঞ্চ পেলেন। কিন্তু নাটক কোথায়? মাইকেল-দীনবন্ধুর নাটক হ'য়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চের জন্য চাই নতুন নাটক অথচ নাটককার নেই। তখন গিরিশচন্দ্র মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ দিলেন এবং এটি সাফল্যে সঙ্গে অভিনীতও হ'লো। এই সময়েই বিনোদিনী দাসী নামে এক অতি-অল্প-সয়সী অভিনেত্রী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী যুগে যিনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়ায়, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, বিদ্যাসুন্দর-এর অভিনয়ে মেয়েরা স্ত্রী-ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত রঙ্গশালায় সাধারণত অভিনেত্রীর প্রচলন ছিলো না। এবং যেসব তরুণেরা ন্যাশনাল থিয়েটার শুরু করেন, তাঁরাও মেয়েদের ভূমিকা ছেলেদের দিয়েই

করাতেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গশালা বন্ধ হ'য়ে যাবার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকে অভিনেত্রীদের নেওয়াটা রেওয়াজ হ'য়ে গেছে। স্বভাবতই তখন অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করা হ'তো বিশেষ একটি পল্লি থেকে। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার চার বছরের মধ্যেই পূর্বোক্ত পল্লি থেকে সংগৃহীত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে গণ্য হলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ভালো-ভালো প'ড়ে শোনাতেন, তরজমা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন, দেশ-বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা বলতেন, এবং অভিনয়শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শুধু একা তাঁকে নয়, আরো বহু নটনটীকে গিরিশচন্দ্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার জন্য জীবনকালেই তিনি 'বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জনক' আখ্যা পেয়েছিলেন।

৮.১.১.৮.৪ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

মধুসূদন যখন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন তখন লোকেরা ভেবেছিলো এটা বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিস, আমাদের কাব্যধ্বনির সঙ্গে মেলে না। গিরিশবাবু দেখলেন প্রতিটি পঙক্তিতে চোদ্দো মাত্রার কঠিন অনুশাসনে সংলাপের ধ্বনি অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে। [আমাদের] স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অর্থ অনুযায়ী কেটে কেটে পড়া এবং অভিনেতার আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্বাসযতি দেওয়া। সেজন্য গিরিশবাবু অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অভিনয়ের উপযোগী করার জন্য এর বদল ঘটালেন। যা গৈরিশ ছন্দ নামে পরিচিত। এই গৈরিশ ছন্দকে অভিনেতা এবং দর্শকসমাজ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং এর সম্ভাবনা সত্যি-সত্যি সীমাহীনভাবে বিস্তৃত হ'লো। গিরিশচন্দ্র যখন একে আমাদের বাকস্পন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাঙলেন, তখন আমাদের কানে দেশীয় আদিম পুরোনো অভিনয়রীতির মতো ঐতিহ্যসম্ভূত মনে হ'লো, যদিও তার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরাও এই ছন্দে লেখা সংলাপ অনায়াসে বুঝতে পারে। সেসময় সাধারণ মানুষ যেমন ক'রে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত উপভোগ করে, তেমনভাবে যাত্রায় এই জাতীয় কাব্যের রসাস্বাদন করেছে।

গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হ'তে চাননি। তিনি আসলে ছিলেন অভিনেতা এবং সমসাময়িক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয় মহৎ অভিনেতা। গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হ'য়ে নাটক লিখতে হয় এবং তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেও ছিলেন। অধিকাংশ নাটকই রঙ্গমঞ্চের খিদে মেটানোর জন্য লেখা, কিন্তু অবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে অভিনয়ের গুণে অনেকগুলি নাটকই বিরাট গভীরতা লাভ করেছিল। প্রফুল্ল, বলিদান, চৈতন্যলীলা, শঙ্করাচার্য' অভিনয়ের সময়ে যে-গভীরতা লাভ করতো ব'লে আমরা পড়ি সে-গভীরতা সহজে আসে না, এবং প্রত্যেক যুগেই আসে না।

কিন্তু অধিকাংশ নাটকগুলি এখন পড়লে মনে হয় না যে মাইকেল অথবা দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সঙ্গে তুলনীয়। পণপ্রথা বিষয়ে লেখা বলিদান নিয়ে কী-ক'রে ট্র্যাজিক মহিমায় পৌঁছানো যায় আমি ভেবে পাই না। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই নাটকে তাঁর অভিনয় অসাধারণ হোত। এ থেকে বোঝা যায় নাটকের লিখিত ভাষায় যা প্রকাশ হয় না, অভিনয়ের জাদুতে অভিনেতারা তা তৈরি করতে পারেন। আর নাট্যকার স্বয়ং যেখানে অসাধারণ অভিনেতা সেখানে তিনি খসড়াটা মাত্র নাটকে প্রকাশ করেন, আসল সৃষ্টি উদঘাটিত হয় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। লেখকদের মতো ছাপার হরফ গিরিশচন্দ্রের ভাবনা প্রকাশের বাহন ছিলো না। আর তাই তাঁর শিষ্যদের এমন এক অ-পূর্ব রীতিতে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাঁরাও মঞ্চে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারতেন

৮.১.১.৮.৫ নাট্যাভিনয়ের সমকালীন পটভূমি

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে সমাজের বাস্তবচিত্রণ এবং তার আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলনরূপে নাটকের দায়িত্বশীল ভূমিকার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হ'লো। রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব, মাইকেল মধুসূদন দত্তের একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, দীনবন্ধুর মিত্রের সধবার একাদশী যে-পথের সূচনা করেছিলো, আমরা আশা করতে পারতুম জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে এ ধরনের আরো অনেক নতুন নাটকের। কিন্তু এই আইন রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠরোধ করলো। সুতরাং গিরিশচন্দ্র

মধুসূদনের কাব্যের নাট্যরূপ দিলেন, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ-ও নাট্যীকৃত হ'লো। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও নাটকে রূপান্তরিত ক'রে অভিনীত হয়েছিলো। কিন্তু তারপর? গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখতে শুরু করলেন এবং সেগুলি দারুণ জনপ্রিয় হয়। তিনি শেক্সপীয়ারের নাটকেরও তরজমা করেছিলেন, কিন্তু টিকিট বিক্রির দিক দিয়ে সেগুলি একেবারে মার খেয়েছিলো।তাই গিরিশচন্দ্র বিক্রির দিকেও লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা করতে লাগলেন। এবং সেটুকু তিনি না-করলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি দেউলে হ'য়ে যেতো এবং নিয়মিত অভিনয়ের প্রথাও বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় যে-জিনিসটা লক্ষ করার মতো তা হ'লো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অংশের থিয়েটার সম্পর্কে গোঁড়ামি। অনেকে একে এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের শুচিবাইয়ের কারণ অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করা হ'তো গণিকাপল্লি থেকে। এইসব ভদ্রলোকদের ধারণা ছিলো থিয়েটারের নামে একদল মাতাল এবং বেশ্যারা বেলেল্লাপনা করে। এই ভিক্টোরীয় শুদ্ধতাবোধ হয়তো মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরেজি শেখার অন্যতম ফল। তার মানে এই নয় যে কোনো অভিনেতার মদ্যপান দোষ ছিলো না, বা কারো কোনো চরিত্রস্খলন হ'তো না, কিংবা কোনো সময়ে কেউ জঘন্য আচরণ করতেন না।তবু এই কারণে থিয়েটারকে অচ্ছুৎ করা উচিত হয়নি।সুতরাং একদিকে যখন সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন যাতে কোনো 'বিপজ্জনক চিন্তাধারা' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে না পারে, আর অন্যদিকে শিক্ষিতদের মধ্যে এক অংশ (ভাবতে মজা লাগে যে আমরা শিক্ষিত বলতে সবসময়ে ইংরেজি জানা লোক বুঝি) যখন থিয়েটারকে তাচ্ছিল্য করেছেন, তখন রঙ্গমঞ্চ কার কাছে পৃষ্ঠপোষকতা পাবে? দর্শকদের অধিকাংশই ছিলো অতি সাধারণ, কোনো উচ্চশিক্ষার অহঙ্কার তাদের ছিলো না। থিয়েটারকে মূলত নির্ভর করতে হোত এই ধরনের দর্শকদের ওপর।

তৃতীয় যে-জিনিসটা লক্ষ্যণীয় তা হ'লো শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁর বাণী। সমাজ যখন অসংখ্য মত ও পথে বিচ্ছিন্ন, যখন একে সংহত করার মতো কোনো শক্তি নেই, তখন রামকৃষ্ণদেব এলেন তাঁর গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাঁর এই [উদার] চিন্তাধারা একদিকে কেশব সেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতো বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করলো, অন্যদিকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করলো। থিয়েটারও সঙ্গে সঙ্গে একটা কেন্দ্র পেলো,- তৎকালীন সমাজের ঘুর্ণিঝড়ে সেও ছিলো অস্থির।

অভিনয়শিল্পীদের পক্ষে এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটা বই বছরে পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হ'লে আমরা বলি খুব সার্থক। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে যদি বছরে মাত্র পাঁচ-ছয় বার ভালো হাউস পায় তাহ'লে আমরা বলবো মার খেলো। সুতরাং সকলেই ভাবেন, থিয়েটারকে জনপ্রিয় হ'তে গেলে বুদ্ধির দিক দিয়ে খেলো হ'তে হবে, আর নয়তো মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের মন যোগাতে গিয়ে প্রচন্ডভাবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এই চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায়, যদি সমাজ উৎকেন্দ্রিক না হয়, যদি তার মূলকেন্দ্র হয় দৃঢ়। এই কেন্দ্র বলতে আমি বোঝাতে চাইছি টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের মতো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিসমষ্টির অনুভূতির সাযুজ্য থেকে যায় জন্ম। যার ফলে শিল্পী [দর্শক-পাঠকের সঙ্গে] সামগ্রিকভাবে মানসিক সংযোগ অক্ষুণ্ন রেখেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত গভীর হ'তে পারেন। যেমন পেরেছিলেন সফোক্লেস কিংবা শেক্সপীয়ার।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আমাদের আলোচ্য পর্বে এই সাযুজ্য এনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখা নাটক শুধু জনপ্রিয় হ'লো তাই নয়, দর্শকদের মনের মধ্যে প্রচন্ড আলোড়ন তুললো। মঞ্চশিল্পীরাও এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ব'লে তাঁদের অভিনয়ও উত্তুঙ্গ স্পর্শ পেয়েছিলো। কিন্তু সে-যুগটা ধর্মীয় আন্দোলনের সময় বোধহয় ছিল না। দেশে তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজন ছিলো রাজনৈতিক স্বাধীনতার এবং আর্থিক উন্নয়নের। স্বামী বিবেকানন্দ এটা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর কর্মধারায় এসবের সমন্বয় দেখা দিলো। কিন্তু সেটা আরো পরে। আর গিরিশচন্দ্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত যেকোনো নাটকের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে ছিল ইংরেজের আইন।আটের দশকে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত-শিষ্য ছিলেন। এবং সে-সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণও রাঙলা রঙ্গমঞ্চের অভিভাবক সন্ত রূপে গণ্য হন।এর ফলে বাঙলা থিয়েটার যেমন শক্তি পেয়েছিলো, তেমনি কতকগুলি

দুর্বলতাও দেখা দেয়। শ্রীচৈতন্য বা কবীরের সময়ে ধর্মীয় নাট্য হয়তো বৈপ্লবিক হ'তে পারতো, কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে তার এই প্রভাব আংশিক হ'তে বাধ্য।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বড়োলাট বঙ্গবিভাগ করলেন। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। স্বদেশী আন্দোলন আরো দানা বাঁধলো কয়েকটি গুপ্ত সংগঠন গ'ড়ে ওঠার পর। সারা দেশ জুড়ে দেশপ্রেমের বন্যা এলো। থিয়েটার প্রকাশ্যভাবে কিছু ভূমিকা না-নিতে পারলেও গিরিশচন্দ্রের মীরকশিম, সিরাজদ্দৌল্লা জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করা হ'লো। এগুলি সেদিন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলো। কিন্তু এই সমস্ত নাটকের অভিনয় তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো মহৎ নাট্য প্রতিভার এই ছিলো পটভূমি। এই পরিবেশের মধ্যেই তিনি বাঙলা থিয়েটারকে একটা দৃঢ় ভিত্তি দিয়ে গিয়েছেন।

৮.১.১.৯ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব

গিরিশচন্দ্রের পর বাঙলা রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য নতুন পর্বের সুচনা হ'লো শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে। তিনি কলেজ জীবনে বেশ নামকরা অভিনেতা ছিলেন এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর নাট্যপ্রযোজনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তিনি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি নাট্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটক নিয়ে নিজস্ব নাট্যসম্প্রদায় গ'ড়ে তুললেন। এইভাবে 'নাট্যমন্দির'-এর সূচনা হোলো।

এদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্খা অনেক বেশি তীব্র হয়েছে, বহু তরুণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা চাইত অন্য ধরনের থিয়েটার। বিশেষত গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে নাটক প্রযোজনা এবং অভিনয়ের মান খুব নেমে গিয়েছিলো। অভিনয়ের মান নেমে যাওয়াটা আরো দুঃখের কেননা পূর্ববর্তী বাংলা রঙ্গমঞ্চের যেটুকু কৃতিত্ব তা প্রধানত এই ক্ষেত্রে। শিশিরবাবু নাট্যমন্দির খোলবার আগে স্টার থিয়েটারে একটি সম্প্রদায় মহাসমারোহে কর্ণার্জুন করেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত যোগেশ চৌধুরীর সীতা এবং দিগ্বিজয়ী নাটক, শরৎচন্দ্রের ষোড়শী এবং রমা, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নরনারায়ণ, আলমগীর এবং রঘুবীর আজ কিংবদন্তীর মতো। তাঁর প্রযোজনায় নৃত্য এবং গীত ক্রমশ গৌণ ভূমিকায় চ'লে গেলো। এটা অবশ্য আকস্মিক পরিবর্তন নয়। গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে যদিও গান ছিলো, কিন্তু বহুপ্রধান চরিত্রগুলিরই কোনো গান নেই। গানগুলি ছিলো এই কারণে যে দর্শকেরা নাটকে কিছু ভালো গান শুনতে ভালোবাসতো এবং গিরিশচন্দ্রও খুব ভালো সংগীত রচনা করতে পারতেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রযোজনাতে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয়। তাঁর মঞ্চসজ্জা, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, পূর্বের থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নাটকের প্রধান ঝোঁক সংগীতের চেয়ে সংঘাতে বেশি লক্ষ্য করা গেলো। এর ফলে [নাট্যাভিনয়] গানের চেয়ে অভিনয়ের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হ'য়ে উঠলো। তবে, সেই সময়ে 'নাট্যমন্দিরে' নাচগানের জন্য যে 'সখীর দল' ছিল তার খুবই খ্যাতি ছিল শহরে। স্বাভাবিকভাবেই এর একটি প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো গীতিনাট্যের পুনরুজ্জীবনে। আগেকার দিনের মতো এই গীতিনাট্যের লক্ষ্য ছিলো সাধারণের মনোরঞ্জন।

শিশিরবাবু মহৎ অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয়ে একটি নতুন ধারা এনেছিলেন। অনেক সমালোচকের মতে শিশিরবাবুর অভিনয় 'ন্যাচারালিস্টিক'। আসলে মহৎ শিল্পীও তাঁর সমসাময়িক কালের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। তিনি শুধু শব্দের ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেন তাই নয়, সমসাময়িক যুগের ভাবনা-চিন্তাকেও মূর্ত ক'রে তোলেন তাঁর অঙ্গের চালনায় ও শব্দব্যবহারের ভঙ্গিতে। এর সাহায্যেই তিনি নাটকে বর্ণিত বিষয়কে অতিক্রম ক'রে যান, কেননা তিনি শিল্পী। না-হ'লে অভিনয় তো শিশুপাঠ্য বইয়ের অলংকরণ বা চিত্রণের মতো হ'য়ে পড়ে কিংবা নির্দেশকের হাতে পুতুলের মতো অভিনেতার দশা হয়।

অভিনয় হ'লো একটি মহৎ সৃষ্টি। এখানে জটিল চরিত্রের ভাবনাচিন্তাগুলি এমন একটা রূপে প্রকাশ পায় যা আর কোনো শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। যেমন চিত্রশিল্প দু-একটা রেখার টানে অথবা কয়েকটা রঙের সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি করতে পারে সেটা কোনো শব্দে, নৃত্যে বা সংগীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তেমনি সংগীতে পাশাপাশি দুটি পর্দা যে-অনুভব সৃষ্টি করে, তার হুবহু প্রকাশ

অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে সম্ভব নয়। তেমনি অভিনয়ও যা প্রকাশ করতে পারে, অন্য শিল্পে সেটা আশা করা সম্ভব নয়। তেমনি অভিনয়ও যা প্রকাশ করতে পারে, অন্য শিল্পে সেটা আশা করা যায় না। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের এইটাই ছিল প্রধান শক্তি। সেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিকেও উদ্দীপ্ত ক'রে তাঁদের সময়কে প্রতিফলিত করতে পারতেন।

৮.১.১.১০ নাট্যাভিনয়ের পালাবদল

অভিনয় অন্যান্য শিল্পকর্মের মতোই বাস্তবের প্রতিফলন, এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ে রূপ পায় আমাদের রক্তে অন্তর্নিহিত অতি গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা বাস্তবে পরিণত করার কামনা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে। যা লব্ধ ও যা অলব্ধ, এবং যা লভ্য ও যা অলভ্য, এইসব বিপরীতের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে এক অবর্ণনীয় জটিল প্যাটার্ন তৈরি হয় আমাদের মনে, বাস্তবের ও স্বপ্নের এই নিগূঢ় সংঘাতের ফলে। কিন্তু এই স্বপ্ন তো যুগে-যুগে পরিবর্তিত হয়। যেমন পরিবর্তিত হয় বাস্তব অবস্থাও। বিশেষত এই শতকের ঊর্ধ্বশ্বাস গতির যুগে। ফলে এক পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরবর্তীকালের কাছে অর্থহীন হ'য়ে যায়। তাই আগের যুগের অভিনয়ের ধরনও পরে অতো পুরোনো ও অস্বাভাবিক লাগে।

এই পর্বের অনেক নতুন অভিনেতারা অভিনয়ে যে-নতুন রীতি আনলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যমুহূর্তগুলিতে, বলা যায়, তা কাব্যময় এবং আবেগপ্রবণ। কিন্তু অনেক সময়ে মনে হ'তো প্রদর্শনলোভী এবং কিছুটা মোটা দাগের। কিন্তু ন্যাচারালিস্টিক অর্থে এই অভিনয় কখনোই বাস্তব ছিলো না। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ লোকজনের কথাবার্তার ধরনের অনুকৃতি নয়। শ্রীযোগেশ চৌধুরী এবং শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এই দু-জন অসাধারণ অভিনেতাকে বাদ দিলে আর কারো অভিনয়ে এই স্বাভাবিকতা ছিলো না আর এই দু-জন অভিনেতা কোনোদিন সে-যুগের থিয়েটার-মালিক বা দর্শকসমাজের কাছ থেকে সেরকম বড়ো অভিনেতা ব'লে স্বীকৃতি পাননি। কেননা তাঁদের অভিনয়ে এই উজ্জ্বল বর্ণশোভার কারুকার্য ছিলো না।অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে নাট্যকারেরা এবং নাট্যপ্রযোজনাগুলো ক্রমশ বাস্তবানুকরণের দিকেই ঝুঁকছিলেন। নকল ছাদ লাগানো বাক্স সেট চালু হ'লো, দৃশ্যপরিবর্তনের সুবিধার জন্য ঘূর্ণক্ষম রঙ্গমঞ্চ এলো, নাটকের বিষয়-নির্বাচনেও সামাজিক প্রসঙ্গের চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'লো। তার মানে এই নয় যে সামাজিক বিষয় নিয়ে একেবারেই নাটক লেখা হয়নি। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বেশ কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন।

সাধারণভাবে থিয়েটারের 'রিয়ালিস্টিক' প্রযোজনার ধরনটাই কোনো বিস্তৃত পটভূমিতে নাটক রচনার প্রতিকূল ছিলো। অভিনয়ের রীতি বিষয়েও তাই। বিশেষ যুগে যে-অভিনয়রীতি খুব 'ন্যাচারাল' মনে হ'তো, তিরিশে এসে মনে হ'লো সেটা যেন খুব কৃত্রিম। জীবনের এটা খুবই একটা নিষ্ঠুর নিয়ম। দু-একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম ছাড়া, মনে হয় বড়োজোর একটা দশক পর্যন্তই অভিনয়-শিল্পীর কালসীমা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি সাধারণত এক দশকের মধ্যেই রচিত হয় এবং তারপর শুরু হয় অবরোহণ। অভিনেতার বেলায়, মানে ভালো অভিনেতার ক্ষেত্রে দেখতে পাই তিনি এক যুগ পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের সংলাপের বাকস্পন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্য ধ'রে রাখতে পারেন। কিন্তু তারপর কথ্যভাষার ভঙ্গিও বদলাতে শুরু করে। এমন কি স্বর মডিউলেশনের মানে বদলে যায়। তখন সেই অভিনেতারই স্বরক্ষেপ বা স্বরপরিবর্তনের ধরন এবং অভিনয়ের রীতি সেকেলে লাগে, মনে হয় অতীত যুগ থেকে আমদানি করা, যখন অনুভূতির ধরন যেন আলাদা ছিল, যখন আচরণের মানদণ্ড যেন আলাদা ছিল।

এই বিষয়টি, একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের ছেলেবেলায় রাজনৈতিক মিছিলে স্লোগান দেবার রেওয়াজ ছিলো, এখনও যেমন আছে। কিন্তু ধ্বনির ধরন অনেক বদলেছে, এতোই বদলেছে যে চেনাই যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা শুনতুম, ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্ বা ইন-কি-লা-ব জিন-দা-বাদ। এই স্লোগানগুলি টেনে-টেনে বলা হ'তো। যেন সমস্ত লোকদের আহান করা হচ্ছে। এখন 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান হিসেবে কদাচিৎ দেওয়া হয়। কিন্তু 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেবার ধরনও অনেক বদলেছে। এখন এইভাবে বলা হয় : ইন/কি/ লাব/ জিন/ দা/ বাদ। ঝোঁকটা এখানে একেবারে অন্যরকম। অনেকটা মার্চ করার তালের সঙ্গে মেলানো। আসলে

আজকালকার ছেলেরা হয়তো এই আধুনিক রীতিতে স্লোগান দেওয়ায় ঠিক সেই রকমই মত্ত হ'য়ে ওঠে, যেমন আমরা হতুম আমাদের কালে, আমাদের ধরনে দেওয়া স্লোগানে।

ধ্বনির ধরন পরিবর্তনের আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কয়েকটি কবিতা নেওয়া যাক। যেমন রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি :

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।
অথবা

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে মনে হ'লো যেন চিনি
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা পড়বার সময়ে দেখা যাবে পঙক্তির শেষভাগে স্বরক্ষেপ ওপরে উঠে যায়। এই প্রবণতা রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত। জীবনানন্দ থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :
আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি ...
অথবা বিষ্ণু দে-র:
শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবি গানে ...
অথবা সুধীন্দ্রনাথের:
আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ...
প্রত্যেকটি লাইনের শেষ শব্দের ঝোঁক নীচের দিকে। [উচ্চারণের] এই পরিবর্তনের পেছনে যে-মানসতা কাজ করেছে তা পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আবার এই আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের যতোই বৈপরীত্য থাক সবার মধ্যে কিন্তু কিছু একটা যুগলক্ষণ থাকে, যার সাহায্যে আমরা এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের পার্থক্য বুঝতে পারি।

অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি কোনো একটি শ্রেণীতে ফেলা যায় না। তাঁর পরবর্তী যুগের ‘পৃথিবী’ ইত্যাদি কবিতা পড়লে বোঝা যায় ফীনিক্সের মতো তিনি বারবার নতুন জন্ম লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মতো ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত কয়েক শতকের মধ্যে একটিই পাওয়া যায় এবং সেজন্য আপাতত আমাদের আলোচনার বাইরে। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি কোনো অভিনেতার আবেগপ্রকাশের বাচনভঙ্গি দু-দশক ধ'রেও জীবন্ত লাগে তাহ'লে তিনি অসাধারণ অভিনেতা।

অথচ তিরিশের এবং তার পরবর্তী যুগের অভিনয় ধারায় তৎকালীন সামাজিক স্বরপরিবর্তনের কোনো চিহ্ন ছিল না।সেজন্য নাটকগুলি যদিও লেখা হ'তো রিয়ালিস্টিক ধরনে, অর্থাৎ নাট্যমুহূর্তগুলি তৈরি হ'তো স্থানের ও কালের নির্দিষ্টতার মধ্যে, স্বগতোক্তি থাকতো না, তাহ'লেও সংলাপগুলি খুব বাস্তবানুগ হ'তো না। বিশেষত আবেগময় দৃশ্যগুলিতে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংলাপগুলি বাস্তবানুগ হ'লেও অভিনয়ের ধরনের জন্য কৃত্রিম লাগতো।

চল্লিশের গোড়ার দিকে রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন আন্দোলনের ঢেউ এলো। অবশ্য পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে নয়। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলি তখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নতুন হাওয়া এলো এদের বাইরে। উপলক্ষটা হ'লো পঞ্চাশের মন্বন্তর। আমরা দেখেছি পালে-পালে গাঁয়ের মানুষ কলকাতায় এবং অন্যান্য শহরে এসে ভিড় করেছে [খাবার আশায়] আর কীটের মতো মরেছে রাস্তায়। অধিকাংশ বাঙালীর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হ'তো। তাদের আর্তস্বর, ‘ফ্যান দাও বাবা’। ভাত চাইবার সাহস ছিল না তাদের। চালের তখন বড় দাম। তাই শুধু একটু ফ্যান চাইতো। তাতেও বাঁচেনি। সারা প্রদেশ এক হ'য়ে এই মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ধিক্কার

দিয়ে উঠলো। এই চেতনা থিয়েটারকে দিলো একটি কেন্দ্র, যেখান থেকে সে সবার সঙ্গে শিল্পের ভাষায় কথা বলতে পারে। আমাদের গভীর বেদনা এবং দুঃখই হ'লো এই ঐক্যসূত্র। আর এ থেকে জন্ম নিলো আর এক নতুন থিয়েটার যা কাঁধে তুলে নিলো এই সামাজিক দায়িত্ব।

প্রথম যে-নাটকটি জনসাধারণের মনে সাড়া জাগালো, চেতনা আনলো নবনাট্যের তা হ'লো নবান্ন। সেটা ১৯৪৪ সালের কথা।গণনাট্য সংঘ বহু তরুণ-তরুণীকে আকর্ষণ করেছিলো। তাঁরা অনুভব করেছিলেন থিয়েটারের সামাজিক ভূমিকার কথা। তাঁদের আনুগত্য ও নিষ্ঠার ফলে সম্ভব হ'লো এই ঐতিহাসিক প্রযোজনার, যে-অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের সূচনা হ'লো বলা হয়। মনে রাখতে হবে এই সমাজচেতনার অর্থ প্রচারসর্বস্ব থিয়েটার নয়। দীনবন্ধু-মধুসূদনের নাটক যেমন সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে দায়িত্বশীলভাবে সংলগ্ন, এখানেও তেমনি। হয়তো এই কারণে অনেকে নবান্ন প্রযোজনার সঙ্গে নীলদর্পণ-এর অভিনয়ের তুলনা করেছেন।এই নতুন পর্বের নাট্যধারাকে বোঝাবার জন্য নবান্ন প্রযোজনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে:

প্রথমত নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনে লেখা হয়েছিলো। এখানে ছককাটা কোনো গল্পের কাঠামো ছিলো না যাকে কেন্দ্র ক'রে চরিত্রগুলির সংঘাত হয় এবং ঘটনা চরমে ওঠে। অথচ এটাই ছিলো সে যুগের 'বাস্তববাদী' নাটক লেখার রীতি।

নাটকের গঠন ছিলো পর্বে পর্বে বিবরণ মূলক। দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে চাষীদের দুর্ভোগের ধারাবিবরণের মতো,-কী ক'রে তারা গ্রামছাড়া হ'লো (প্রথম অঙ্ক), কলকাতায় আসবার পর তাদের কী ঘটলো (দ্বিতীয় অঙ্ক) এবং কী-ক'রে তাদের কেউ-কেউ আবার নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে গিয়ে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নতুন ক'রে বাঁচবার চেষ্টা করলো।

নবান্ন'র প্রযোজনায় দ্বিতীয় যা লক্ষ্যণীয় : মঞ্চসজ্জা শুধু যে বাস্তবানুগ ছিলো না তাই নয়, রঙ্গমঞ্চে একই দৃশ্যে দুটি ভিন্ন [ঘটনা উপস্থাপনার জন্য] স্তরের প্রয়োগ হয়। স্তরগুলি স্থানের ভিন্নতা বোঝাবার জন্য, অর্থাৎ দুটো স্তর স্থানগত ভিন্নতা নির্দেশ করতো। কিন্তু স্তর দুটির প্রয়োগে আরো যে-একটি অর্থ ছিলো তা চরিত্রচিত্রণের। মঞ্চের সম্মুখভাগের চরিত্রগুলি ছিলো সম্পূর্ণ ব্যক্তি, আর মঞ্চের পেছনে ওপরের স্তরের চরিত্রগুলি সমষ্টি,-জনতার অংশ,-তারা ব্যক্তি হিসেবে ছিল না।

এছাড়া নাটকটির আগাগোড়া-অভিনয়রীতি তখনকার প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাদের রীতির চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক ছিলো ; এই স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েই নাটকটিতে অনেক গভীর কাব্যমুহূর্তের সৃষ্টি হ'তো। শুধু নীরবতার মাধ্যমে নয়, (সাধারণত বাস্তবধর্মী নাটকে এইভাবেই কাব্যময় অভিঘাতের সৃষ্টি হয়), আবেগময় দৃশ্যে কথা বলার বিশিষ্ট ভঙ্গীতেও এই অনুভূতি জাগাতো। নবান্ন'র অভিনয় প্রমাণ করলো যে অভিনেতার পক্ষে কবিতার কণামাত্র বিসর্জন না-দিয়ে, একটুও কৃত্রিম না-হ'য়ে, সবাক ও আবেগময় হওয়া সম্ভব। এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই যে আমাদের থিয়েটার তখন সমাজমানসের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে যেন মুক্তি পেয়েছে, সেই কেন্দ্রের বোধ তখন যেন অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ এনেছে নাট্যরূপের মধ্যে।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে কোনো-কোনো শক্তি এটাকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতের প্রচার বাহনে পরিণত করতে চাইলেন। এই সংগঠন, যা এতোদিন এতো দক্ষ, কুশলী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করেছিলো,- এর ফলে তার সেই রূপ ভেঙে গেলো। 'বহুরূপী' নামে আরেকটি সংগঠন ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কয়েক বছরের মধ্যে আরো বহু প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য।এই কালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হ'লো নতুন ইহুদি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ছিলো এই নাটকটির বিষয়। এইরকম অনেক প্রযোজনার দ্বারা 'অন্য থিয়েটার' বহুলভাবে প্রমাণ করে যে সে সামাজিকভাবে দায়িত্বসম্পন্ন, যা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তখন মোটেই ছিল না। 'সাধারণ থিয়েটারগুলি'- যারা বাঁধা প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত অভিনয় করতো-তারা ক্রমশই আরো বেশী ক'রে ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন হতে থাকে, আর বাংলা নাট্যের যা কিছু মানমর্যাদা তা প্রতিষ্ঠা করেছে 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চের' বাইরের ঐ 'অন্য থিয়েটার'।

স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবসায়িক কোম্পানীগুলি নতুন ধরনের নাট্যধারাকে রোধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রথমত: নবান্ন'র পর তারা তাদের মঞ্চগুলি নিয়মিতভাবে ভাড়া দিতেই অস্বীকার করে। কিন্তু নতুন নাট্যকর্মীদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার জন্য এই নব-নাট্যের প্রসারকে কোনো মতেই রোধ করা যায়নি।কাজ শুধু চলছিল বললে ভুল হবে, কাজ এগোচ্ছিল। পরবর্তী উন্নতির ধাপ হোল নাটককার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করায় প্রমাণ করা যে তাঁর নাটকগুলি শুধু পাঠ্যবস্তু নয়, সেগুলি ভালো 'থিয়েটার'-ও হতে পারে। তাঁর দু-একটি নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, তাঁর লিখিত সংলাপ অত্যন্ত জীবন্ত ও দ্যুতিসম্পন্ন, এবং বিস্ময়করভাবে সূক্ষ্মতামণ্ডিত,- যে-সূক্ষ্মতা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকমনে নাটকীয় অভিঘাত জাগাতে সক্ষম। বোঝা গেল যে এই বাস্তব জগৎ, এ সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন, এই বাস্তব জগতের বাস্তব সমস্যাগুলিই তাঁর লেখার বিষয়।

আসলে, যতোদিন আমরা পশ্চিমীরীতির মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার চেষ্টা করেছি ততোদিন তাঁকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়েছে। কিন্তু নবান্নকে কেন্দ্র ক'রে যে নতুন নাট্যধারার সূচনা, তার লক্ষ্য ছিল এমন এক নাট্যরূপের যা একদিকে যেমন আধুনিক, অপরদিকে তেমনিই বিশিষ্টভাবে ভারতীয়। এবং এই বুদ্ধিদীপ্ত ভারতীয় থিয়েটার গ'ড়ে তোলার আকাঙ্খাই এই নাট্যকর্মীদের রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করার বিশিষ্ট নাট্যরূপে পৌঁছে দিয়েছে।তাঁর নাটক, মানে তাঁর নাটকের গঠন, কোথায় যেন আমাদের প্রাচীন নাট্যশিল্প যাত্রার সঙ্গে মেলে। কিন্তু তার অনুকরণ নয়। অথচ বুঝতে পারা যায় যে নানা শিল্পকলা প্রকাশের যে পরম্পরা আছে আমাদের, তারই মধ্যে তাঁর শিকড় প্রোথিত, এবং সেই শিকড় থেকেই তিনি আহরণ করেছেন তাঁর প্রাণশক্তি। নিরক্ত নন্দনতাত্ত্বিক নয় তাঁর নাটক, যেমন নয় ধার করা সংস্কৃতির উন্নাসিক মুষ্টিমেয়র লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যধারা (ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের প্রতিতুলনায়) সারা বিশ্বের চিরায়ত নাট্যসাহিত্য থেকেও বাছাই করেছে অভিনেয় নাটক।রাজনৈতিক থিয়েটারও গ'ড়ে উঠেছে এর মধ্যে। খোলাখুলিভাবে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারিত হয় এইসব নাটকে।নতুন অনেক পথঘাট তৈরি হওয়ায় এবং যাতায়াতের সুবিধার ফলে গ্রামাঞ্চলে যাত্রার জনপ্রিয়তাও বেড়ে গেছে অনেকগুণ। এখনকার যাত্রায় একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা কাহিনী, অপরদিকে হিটলার বা লেনিনের কাহিনী- এসব বিষয়বস্তুও দর্শককে প্রচুর আকর্ষণ করছে। বাদল সরকারের গ্রুপ থিয়েটার ও পথ নাটকগুলির অভিনয়ের নাটক নিয়েও বেশ উৎসাহ ও আলোচনা লক্ষ করা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অসংখ্য গোষ্ঠী নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-সমীক্ষা চালাচ্ছেন।ব্রেখট ইয়োনেস্কো টেনেসি উইলিয়ামস এডওয়ার্ড আলবি প্রমুখের নাটক যথেচ্ছ তরজমা ক'রে অভিনীত হচ্ছে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও গত দশকের ধারা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু ঘটেনি। বরং কিছু কিছু নতুন অভিনেতার অভিনয়ের ধরন মধ্য-চল্লিশের ব্যবসায়িক মঞ্চের অভিনয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়।এবং আরো-একটা বিপদ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'অন্য থিয়েটার' ও ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্যে ভেদরেখা যেন লুপ্ত হ'তে বসেছে। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মোহে অনেক অভিনেতা ও নির্দেশক ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন। ফলে, যে সুস্থ বিভেদ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল তার অবলুপ্তি ঘটছে, আবহাওয়া কলুষিত হয়ে উঠছে।

আশা করা যায় এরই মধ্যে, কিংবা এর ভিতর দিয়ে চ'লে উত্তীর্ণ হয়েই নতুন জন্ম নেবে সমাজ। থিয়েটারেরও হয়তো তখনি আসবে এক নতুন রূপ,- আরো অনেক উন্নত বোধ আর প্রখরতর কোনো নতুন চেতনা নিয়ে। যেখানে জাগরিত হবে বাঙালির নবনাট্যের চেতনায় মুখরিত রঙ্গমঞ্চের কলাকুশলীর নাট্যবোধ।

৮.১.১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রাচীন প্রেক্ষিত আলোচনা করো।

২। যাত্রা কী?

৩। যাত্রার সঙ্গে নাটকের সম্বন্ধ কী?

৪। বাংলা নাট্যাভিনয়ে গিরিশ্চন্দ্রের অবদান আলোচনা করো।

৫। নটী বিনোদিনী কে? বাংলা নাট্যজগতে তাঁর ভূমিকা কী?

৬। বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো।

৭। বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কতটা গুরুত্ব পেয়েছিলো বলে তুমি মনে করো।

৮.১.১.১২ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ : অজিতকুমার ঘোষ

২। বাংলা রঙ্গমঞ্চের রূপরেখা: অশোককুমার মিশ্র

৩। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাষ – আলপনা রায় (সম্পাদিত)

৪।বাংলা নাট্যের প্রবাদ পুরুষ : শম্ভু মিত্র

৫। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড): আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬।বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব – জগন্নাথ ঘোষ

৭। আধুনিক ভারতীয় নাটক – দিলীপ কুমার মিত্র

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২. নাট্যকলা

বিন্যাসক্রম

৮.১.২.১ প্রস্তাবনা

৮.১.২.২ সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য

৮.১.২.৩ দেশজ নাট্য

৮.১.২.৪ ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য

৮.১.২.৪ নাট্যকলার বিবিধ প্রকরণ

ক) অঙ্গরচনা

খ) আলোক পরিকল্পনা

গ) পোশাক পরিকল্পনা

ঘ) মঞ্চ পরিকল্পনা

চ) মঞ্চ নকশা

ছ) মঞ্চসঙ্গীত

৮.১.২.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১.২.৬ সহায় গ্রন্থাবলি

৮.১.২.১ প্রস্তাবনা

নাট্যকলা যেকোন ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সামনে কোন ক্রিয়া উপস্থাপনকেই 'নাট্য' বলা যেতে পারে। এটি শিল্পমাধ্যমের (পারফর্মিং আর্ট) একটি শাখা। দর্শক বা শ্রোতার জন্য যেকোনো পরিবেশনাকে (পারফর্মেন্সকে) নাট্যকলা হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও পারফর্মিং আর্ট হিসেবে নাট্যকলা বিশেষভাবে জোর দেয় সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সৃষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকের ওপর। একটি পরিবেশনাকে নাট্যধর্মী বা নাটকীয় বলা যেতে পারে যদি তা একটি বাস্তবানুগ মায়া বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এই দুইটি বিস্তারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায় যে নাট্যকলার অস্তিত্ব ছিল মানবসভ্যতার প্রত্যূষকালেও, কারণ গল্প বলার একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত প্রবণতা প্রতিটি মানুষে বিদ্যমান। সূচনাকাল থেকেই নাট্যকলা অনেকরকম রূপ বা প্রকার ধারণ করেছে; প্রয়োগ করেছে অনেক রকম কথা, দেহভঙ্গি, গান, নাচ, দৃশ্য বা ঘটনা। দৃশ্যগ্রাহ্য কলাসহ (চিত্রাঙ্কণ, ভাস্কর্য ইত্যাদি) অন্যান্য পারফর্মিং আর্টগুলোকে নাট্যকলা একত্রিত করেছে একটিমাত্র সমন্বিত শিল্পের প্রকারে। উল্লিখিত উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্ধারিত এবং লিখিত পাঠভিত্তিক, অথবা হতে পারে তাৎক্ষণিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমনকি এ দুয়ের মধ্যে থাকতে পারে অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। নাটক সৃষ্টিতে গঠন-কৌশল বিচারে দ্বন্দ্ব কোন অপরিহার্য উপাদান নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে বাংলাদেশের নাট্যরীতির ক্রমবিকাশ বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এবং এর সঙ্গে পরবর্তীতে কিছু মাত্রায় ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণ লক্ষণীয়। নাট্যকলার ক্রমবিকাশ তিন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে: সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য, দেশজ নাট্য এবং ইউরোপীয় রীতি প্রভাবিত নাট্য।

৮.১.২.২ সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য

সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্য প্রাচীন যুগ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাংলার বৃহদংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলে উত্তর গাঙ্গেয় আর্যসংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কারণে গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রগুলিতে এ সময় শিল্প-সংস্কৃতি

ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর ফলে উল্লিখিত নগরকেন্দ্রগুলিতে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যচর্চা বিশেষভাবে বিত্তবান শ্রেণির সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুথিগত সাক্ষ্য থেকেও এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী (৬ষ্ঠ শতক) রচিত সংস্কৃত নাটক লোকানন্দ-এর নাম উল্লেখ করা যায়। প্রস্তাবনাসহ এ নাটকটি চার অঙ্কে রচিত। লোকানন্দ সম্পর্কে ই-ৎসিঙ মন্তব্য করেন, ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যের সকল মানুষ গীত ও নৃত্য সহযোগে নাটকটি পরিবেশন করেন। এ থেকে নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমেয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা অথবা তার অংশবিশেষের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ সময় উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা, কনৌজরাজ যশোবর্মা এবং কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বাংলার অঞ্চলবিশেষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার হর্ষবধ©র্নর নাগানন্দ এবং যশোবর্মার সভাকবি ভবভূতির মালতীমাধব নাটক এ সময় রচিত হয়। হয়তো রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই তখন এ সকল নাটক বাংলার প্রশাসনিক নগরকেন্দ্রগুলিতে অভিনীত হয়েছিল। এ ছাড়া কাশ্মীরী কবি কলহন রচিত রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পৌন্ড্রনগরে কার্তিকেয়ের মন্দিরে কমলা নামের সুন্দরী ও দক্ষ নৃত্যশিল্পীর অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ অভিনয় ভরতমুনিকৃত নাট্যশাস্ত্র (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) অনুসৃত ছিল। পালযুগের নাট্যচর্চা সম্পর্কে যে কয়েকটি পুথিগত সাক্ষ্য মেলে, তন্মধ্যে সতেরো শতকের তিববতি ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য: (বিক্রমপুর) নগরে তিনি (আচার্য অনুপম সাগর) একটি উৎসবে নাট্য প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর ফলে তিনি সমাধি লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন ইহজগতে সব কিছুই মায়া।

সেন রাজারা সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত অভিনয়রীতির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা বিজয়সেন (আনু. ১০৯৬-১১৫৯) এবং ভবদেব ভট্ট (রাজা হরিবর্মার মন্ত্রী) বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দেবদাসী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ঐতিহ্যানুসারে ধ্রুপদী নৃত্য ও গীতে পারদর্শী এ সকল দেবদাসী রাজদরবাদের সভাসদবৃন্দের জন্য এবং মন্দির প্রাঙ্গণে জনগণের জন্য অভিনয় করতেন। এ যুগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে 'নট' (অভিনেতা) নামে একটি পৃথক বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হলায়ুধ মিশ্র রচিত ঐতিহাসিক কাব্য সেখশুভোদয়া সেন রাজসভায় নট ও নর্তকীর উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা-য় লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় গন্ধর্ব নামের এক অভিনেতার অভিনয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। গোবর্ধন আচার্য রচিত আর্যাসপ্তশতীর ১৭৪ এবং ৫৩৮ সংখ্যক শ্লোকে 'অভিনয়', 'যবনিকা', 'নর্তকী', 'নায়ক', 'নায়িকা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, সেন রাজদরবারে সংস্কৃত নাট্যচর্চার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

লোচন পন্ডিত রচিত সঙ্গীতবিষয়ক রাগতরঙ্গিণী (১১৬০) গ্রন্থে তম্বরুনাটক-এর উল্লেখ রয়েছে। তম্বরুনাটক সম্ভবত ১১৬০-এর পূর্বে রচিত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ছিল, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু এ যুগের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ (১২শ শতক)। জয়দেব এখানে তৎকালীন জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের বিষয়বস্তুটিকে 'নৃত্তাত্মক প্রবন্ধ' নামক সংস্কৃত নাট্যকাঠামোর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ফলে এমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে বাংলার দেশজ নাট্যে 'নাটগীত' নামক এক জানপদ নাট্যরীতির প্রচলন ঘটায়। গীতগোবিন্দ এবং আর্যাসপ্তশতী লক্ষ্মণসেনের রাজদরবারে দেবদাসী কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অভিনয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। বারো খন্ডে রচিত গীতগোবিন্দে তিনটি চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ ও সখী) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এগুলি তিনজন অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পী দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে (যেমন মণিপুরী রাসনৃত্যে এখনও করা হয়), কিংবা একজন শিল্পী দ্বারাও উপস্থাপিত হতে পারে। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনায়ও অভিনেত্রী/নৃত্যশিল্পিগণ গীতসহযোগে আঙ্গিক অভিনয়যুক্ত নৃত্য পরিবেশন করতেন। দুটি গীতের মাঝে কখনও কখনও সূত্রধারের আবির্ভাব ঘটত বিশেষ কোন অংশ কাব্যে বর্ণনা করার জন্য, যেমন কখনও অভিনীত ক্রিয়ার অংশ বর্ণনার জন্য, কখনও সেই ক্রিয়ার ওপর মন্তব্য করার জন্য, কিংবা চরিত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অথবা তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য। গীতগোবিন্দ উপস্থাপনা

রীতির সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য উপস্থাপন রীতির বৈশিষ্ট্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু নেপালি রাজদরবারে অভিনীত সঙ্গীত-নাটকসমূহের উপস্থাপন রীতির সঙ্গেও গীতগোবিন্দ উপস্থাপন রীতির আশ্চর্য মিল রয়েছে। তেরো শতকের কোন এক সময় সাগরনন্দী সংস্কৃত ভাষায় নাটকলক্ষণরত্নকোষ রচনা করেন। এতে একাধিক নাটকের নাম দেখা যায়, যেগুলির কোন পুথিগত অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু রত্নকোষের অস্তিত্ব এবং এতে নাটকের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রচলন ছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলায় সংস্কৃত নাট্যচর্চার ধারা ব্যাহত হয়। পরবর্তী বিছুকাল কেবলমাত্র হিন্দু রাজ্যে ও হিন্দু সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধারার চর্চা ক্ষীণ অবস্থায় অব্যাহত থাকে। চৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য রূপগোস্বামী তিনটি সংস্কৃত নাটক (বিদগ্ধমাধব- ১৫২৪, ললিতমাধব- ১৫২৯, দানকেলিকৌমুদী- ১৫৪৯) এবং একটি নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ (নাটকচন্দ্রিকা) রচনা করেন। চৈতন্যশিষ্যদের দ্বারা কমপক্ষে আরও তিনটি নাটক রচিত হয়: রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং গোবিন্দদাসের সঙ্গীতমাধব। রূপগোস্বামী এবং রামানন্দ রায় রচিত নাটকসমূহ সবই কৃষ্ণকাহিনীভিত্তিক। এ সকল নাটকের মধ্যে কেবল জগন্নাথবল্লভ অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায়। সতেরো শতকে গোবিন্দদাসের নাটক ছাড়া সবই বাংলায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদগুলির কোনটি অভিনীত হয়েছে বলে জানা যায় না।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩) সংস্কৃত নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রের অসমাপ্ত চন্ডী নাটকে (১৭৬০) সংস্কৃত নাট্যকলার উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটি 'মহিষাসুর বধ' শীর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যানভিত্তিক। কাব্যাকারে রচিত এ নাটকটির সংলাপদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এটি সম্পূর্ণরূপে গীত-আকারে পরিবেশনের জন্য রচিত, যদিও নাটকটি কখনও অভিনীত হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একই বৈশিষ্ট্যের অপর একটি নাটক বিদ্যানাথ বাচস্পতি রচিত চিত্রযজ্ঞ ১৭৭৭/৭৮ সালে অভিনীত হয়েছিল।

আধুনিক যুগ উনিশ শতকে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনূদিত হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল (১৮৪৮) ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (১৮৪৯) উল্লেখযোগ্য। বাংলার সংস্কৃত পন্ডিতগণ আধুনিক যুগে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচনাও করেন। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চানন তর্করত্নের অমরমঙ্গল (প্রকাশিত আনু. ১৯১৩), কালীপদ তর্কাচার্যের নলদময়ন্তীয় ও স্যমন্তকোদ্ধার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর কীর্তিবিলাস-এ নান্দী, সূত্রধার ও নটীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত প্রথম মঞ্চায়িত বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত কুলীনকুলসর্বস্ব (রচনা ১৮৫৪, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৭) নান্দী, সূত্রধার ও নটী ব্যবহারের কারণে সংস্কৃত ঐতিহ্যের নিকট ঋণী।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত নাট্যরীতি সমসাময়িক সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণের ক্ষেত্রে দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য বাংলা নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় এ সময়ের সাহিত্য জগতের পুরোধা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা নাট্যে ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত আধুনিক নাট্য সৃজনের ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা পালন করেন।

৮.১.২.৩ দেশজ নাট্য

দেশজ নাট্য সংস্কৃত প্রভাবজাত নাট্য থেকে ভিন্ন দেশজ নাট্যধারা সবসময় জনগণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি তাদের দ্বারাই সৃজিত ও লালিত। তবে সংস্কৃত নাট্যের সূক্ষ্মতর সৃজনশীলতা দ্বারা এটি সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলায় উদ্ভূত সকল প্রকার নাট্যরীতিকে দেশজ নাট্য আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যা সাধারণত লোকনাট্য হিসেবেও পরিচিত। দেশজ নাট্যের কলাকুশলিবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, যন্ত্রশিল্পী এবং পুতুল নাচিয়ে। এঁদের অভিনয় উপস্থাপনায় কেবল গদ্য সংলাপ নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, বচন (সংলাপাত্মক কাব্য/গীত এবং বর্ণনাত্মক গদ্য/কাব্য/গীত)। বাংলাদেশের দেশজ নাট্য বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছে, যাকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: বর্ণনাত্মক, নাটগীত, অধি-ব্যঞ্জনাত্মক এবং শোভাযাত্রামূলক ও তদুদ্ভূত অভিনয় উপস্থাপনা।

বর্ণনাত্মক রীতি বর্ণনাত্মক নাট্যে কথক (গায়েন) একাই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করেন এবং নাট্যক্রিয়া অভিনয় করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গদ্য, পদ্য ও গীতের মিশ্রণে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর দোহারবৃন্দ, যাঁরা ধুয়া ধরেন এবং বাদ্যযন্ত্র বাজান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথক গানের সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশন করেন। কোন কোন ধর্মীয় অভিনয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি হাতে চামর ব্যবহার করেন। চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনিক অলঙ্কার প্রয়োগ করেন। তাঁর এই রূপদান সার্থক করার জন্য কখনও কখনও তিনি তাঁর মূল পোশাক ইষৎ পরিবর্তন করেন এবং কিছু দ্রব্যসম্ভার (property) ব্যবহার করেন।

চর্যাপদ বাংলায় বর্ণনাত্মক নাট্যের প্রাচীনতম সাক্ষ্য। খ্রিস্টীয় ৯ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত এই পদসমূহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চর্যাপদ উপস্থাপিত হতো। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নাথপন্থীদের মধ্যে বর্ণনাত্মক রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের ইঙ্গিত প্রদান করে। এ সকল অভিনয় উপস্থাপনা মৌখিকভাবে সৃষ্ট নাথগীতিকা অবলম্বনে পরিবেশিত হতো। নাথগীতিকায় বিধৃত কাহিনীসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়: ক. নাথ সিদ্ধাচার্যদের উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর গুরু মীননাথকে জাগতিক বাসনার মায়াজাল থেকে উদ্ধার বিষয়ক এবং খ. রানী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র (কিংবা গোপীচন্দ্র) বিষয়ক। ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনীকেন্দ্রিক বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির জন্ম এগারো শতকের কিছু পরেই, যখন এ কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আর গোরক্ষনাথ-মীননাথ বিষয়ক কাহিনীর অভিনয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন এক সময় প্রচলিত হয় বলে অনুমান করা হয়। সতেরো শতক কিংবা তার পরে অনুলিখিত ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্ম এবং তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনুমান করা হয় যে, বারো শতকে এ সম্প্রদায়ের উৎসব উদ্যাপনকালে মৌখিক কাহিনীভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হতো।

জনগণের মধ্যে এখনও এমন কিছু লোককাহিনী (যেমন: মধুমালার কেচ্ছা, সখীসোনা, মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা, শীত-বসন্ত, কাঞ্চনমালা এবং মালতীকুসুমমালা) ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যেগুলির ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল বারো শতক কিংবা তার পূর্বে। এগুলির কাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছু কিছু কাহিনী এখনও বাংলাদেশে অভিনীত হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কাহিনীর কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন রায়মিত্রকৃত ঠাকুরমার ঝুলি উল্লেখযোগ্য। মূলত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য কাহিনী রচিত হয় তাদের সম্মুখে পরিবেশন ও শ্রবণের জন্য, পাঠের জন্য নয়। আর কোন কাহিনী মুখস্থ রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাকে ছন্দোবদ্ধ করা। সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালে ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনীসমূহ মৌখিকভাবে অন্ত্যমিলযুক্ত কাব্যরূপে রচিত এবং বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো।

দ্বাদশ শতকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এবং তেরো শতকে মুসলমান অভ্যুদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলার জানপদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম, নাথপন্থী ও ধর্মঠাকুর পূজারী সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানসমূহের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কর্তৃক আত্তীকৃত হয়, কিছু

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কিছু রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে একাধিক অভিনয় উপস্থাপনা বাংলার লোকনাট্যে যুক্ত হয়। বিষয়বস্তুর বিচারে এ সকল অভিনয় উপস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ক. রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আর্য দেব-দেবী ও পৌরাণিক বীরদের কাহিনী; খ. মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত অনার্য দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কাহিনী এবং গ. ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর ও সাধু পুরুষদের কাহিনী। এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনীর ঐতিহ্য পূর্বের ন্যায় অব্যাহত ছিল, যা উপর্যুক্ত তিনটি ধারা দ্বারা অধিকতর পুষ্ট হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল গীতনির্ভর। অতএব, আলোচ্য যুগের সাহিত্য রচনা কেবলমাত্র পঠন ও বিশ্লেষণ নিমিত্তে রচিত সাহিত্য কর্ম নয়, বরং মৌলিক কারণেই তা নাটলিপি হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

আমরা জানি শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণে ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হয়। এই রচনা মধ্যযুগের ঊষালগ্ন থেকেই কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানের মৌলিক রচনা অবলম্বনে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনার ইঙ্গিত বহন করে। পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বাল্মীকিকৃত রামায়ণের অনুবাদ থেকেও সঙ্গত কারণেই অনুমেয় যে, তেরো ও চোদ্দ শতকে মৌখিকভাবে রচিত রামচন্দ্রের কীর্তিগাথা বিষয়ক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ঘটেছিল।

ষোলো শতকের শুরুতে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাংলার দেশজ নাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৫৭৬ কিংবা তার কিছু পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ খেতুরের মহোৎসবে লীলাকীর্তন প্রবর্তন করেন। এর স্রষ্টা নরোত্তম দাস রাধা-কৃষ্ণের একেকটি লীলাভিত্তিক বিচ্ছিন্ন পদাবলি সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী তৈরি করেন। বাংলায় প্রচলিত বর্ণনাত্মক রীতির মাধ্যমে এ কাহিনী পরিবেশনার প্রয়াসই লীলাকীর্তন। নরোত্তম দাস বাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সংশ্লেষ ঘটিয়ে লীলাকীর্তনের অদ্বিতীয় সাঙ্গীতিক ধারা প্রবর্তন করেন।

বিজয় গুপ্ত রচিত পদ্মাপুরাণ (১৪৯৪) এবং বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসাবিজয় (১৪৯৫) পনেরো শতকে সর্পদেবী মনসাকে কেন্দ্র করে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে। এ থেকে যথার্থই অনুমিত হয় যে, লিখিত আকারে নাটলিপি রচিত হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ তেরো ও চোদ্দ শতকে বাংলায় মৌখিকভাবে সৃষ্ট কাহিনীসমূহ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো। ষোলো শতক থেকে মনসার কাহিনী অবলম্বনে বেশ কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। তন্মধ্যে নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণ (ষোলো শতকের প্রথম ভাগ) ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (সতেরো ও আঠারো শতকের সন্ধিকাল) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সকল লিখিত রচনা ছাড়াও এ সময়ে মনসামঙ্গল ভিত্তিক বেশ কিছু মৌখিক রচনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে রয়ানি গান নামে অভিনীত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের জানকীনাথকৃত অভিযোজিত রূপ উত্তরবঙ্গে 'পদ্মাপুরাণ গান' নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

ষোলো শতকে বেশ কিছু চন্ডীমঙ্গল রচিত হওয়ায় এ যুগ চন্ডীমঙ্গলের যুগ হিসেবেও পরিচিত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চন্ডীমঙ্গল (আনু. ১৫৫৫-৫৬) সর্বাধিক পরিচিত। কবি এখানে একাধিক ভণিতা ব্যবহার করেছেন যা থেকে স্পষ্টই অনুমেয় যে, তিনি স্বয়ং চন্ডীমঙ্গল পরিবেশন করতেন। তাঁর ব্যবহৃত ভণিতা থেকে অভিনয় উপস্থাপনাকালে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে পারদর্শী যন্ত্রিদল (কলন্ত) এবং অভিনেতা (নাটুয়া)-দের সহযোগিতা সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। অপর একটি অংশেও সুদক্ষ যন্ত্রিদল ও অভিনেতার সাহায্যে গীত, বাদ্য, নাট্য ও নৃত্য সম্বলিত অভিনয় উপস্থাপনার বর্ণনা রয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, ষোলো শতক থেকে চন্ডীমঙ্গল বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত হয়ে আসছে।

চৈতন্যভাগবত (১৫৩৫-৩৬) কাব্যের আদি খন্ডের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কিছু উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ষোলো শতকের প্রথমার্ধে মঙ্গলচন্ডীর স্তুতিমূলক কাহিনীর বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা 'মঙ্গলচন্ডীর গীত' প্রচলিত ছিল।

উল্লিখিত কাব্যটি আরও প্রমাণ করে যে, একই সময়ে বা তার কিছু পূর্বে মৌখিক রচনাভিত্তিক বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা 'শিবের গীত' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গৃহাঙ্গনে একক গায়েন গীত, ডমরুবাদন এবং নৃত্য সহযোগে শিবের গীত পরিবেশন করতেন।

ইউসুফ-জুলেখার (১৩৮৯-১৪১০) আবির্ভাব বাংলা নাট্যে এক নতুন বৈশিষ্ট্য (পারস্য-আরবীয় প্রভাব) আরোপ করে। ১৪৭৪ সালে নবীজী (সঃ)-র জীবনকাহিনী ভিত্তিক চরিতকাব্য রসুলবিজয় রচিত হয়। এখানে হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যের সমান্তরাল কাহিনী নির্মাণের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বকীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত দুটি কাব্যই রচিত হয়েছিল মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এরই মধ্য দিয়ে ইসলামি মৌল উপাদান সম্বলিত বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সূচনা হয়। ষোলো শতক নাগাদ ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব ও উপকথার ওপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক পুথির আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে মকতুল হোসেন, কাশেমের লড়াই, কারবালা, জঙ্গনামা ইত্যাদি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যু এবং তাঁদের কাল্পনিক সৎ ভাই হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অপর কিছু পুথিতে (রসুলবিজয়, নবীবংশ এবং আমীর হামজা) পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবী (সঃ)-র জীবনকাহিনী সম্পর্কিত বিবরণ এবং শেষে নবীজী (সঃ)-র জীবন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। পুথিগুলির রচনাশৈলী থেকে বোঝা যায় যে, এর অধিকাংশই বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হতো।

লোককাহিনী ও রূপকথা ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বর্ণনাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠান মধ্যযুগে অব্যাহত থাকে। চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্যমতে ষোলো শতকের প্রথম ভাগে যোগীপালের গীত, ভোগীপালের গীত এবং মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটে দক্ষিণ-পূর্বের আরাকান রাজ্যে, যেখানে বাহরাম খান (ষোলো শতক) লাইলী-মজনু নামের ফারসি কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন তাঁর লাইলী-মজনু। বাহরাম খানের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অন্তে বিষাদময় বিচ্ছেদ থাকায় এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুর্লভ নিদর্শন। আরাকান রাজদরবার মুসলমান কবিদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল (আনু. ১৬০৭-১৬৮০) রচনা করেন তাঁর কালজয়ী অবদান পদ্মাবতী (১৬৫১) এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯-১৬৬৯)। এ রাজসভায় রচিত সকল কাব্যের বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কল্পনা প্রবণতা। আরাকান রাজসভার রচনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এগুলি সবই হিন্দি এবং ফারসি উৎস থেকে উদ্ভূত। ফলে বাংলা নাট্যে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি যুক্ত হয়। এ সকল রচনা বর্ণনাত্মক রীতিতে অভিনীত হয় এবং ধীরে ধীরে বাংলার সকল অঞ্চলের মুসলমান জনগণের অন্তর জয় করে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ মৈমনসিংহ-গীতিকায় সংকলিত কাহিনীসমূহের মৌখিক রচনাভিত্তিক অভিনয় অনুষ্ঠান পালাগান-এর আবির্ভাব ঘটে ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে।

নাটগীত নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানে কুশীলবগণ উত্তম পুরুষে চরিত্রাভিনয় করেন এবং অভিনয় চলাকালে সকল শারীরিক ক্রিয়া নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। চরিত্রবৃন্দ তাঁদের বাচিক অভিনয় নিজেরাই গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন অথবা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে দোহারবৃন্দের সহযোগিতায় সম্পাদন করেন। চর্যাগীত স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটগীত অতি পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কাহ্নপা রচিত গীত (চর্যাসংখ্যা ১০)-এ 'নাচই' (নাচিতেছে) এবং 'নড়-পেড়া' (নটগিরি) শব্দ দুটির ব্যবহার এবং বীণাপা রচিত গীত (চর্যাসংখ্যা ১৭)-এ 'নাচন্তি' (নাচেন), 'গান্তি' (গান করেন) এবং 'বুদ্ধ নাটক' শব্দগুলির ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিববতি বৌদ্ধ বিহারের দেয়ালচিত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যগণ (বীণাপা ও সরহপা) বাদ্যযন্ত্রহাতে চিত্রিত হয়েছেন। অপর তিন সিদ্ধাচার্য (মীনপা, ডোম্বীপা ও জলন্ধরীপা) অঙ্কিত হয়েছেন নৃত্যের ভঙ্গিমায়। নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকায় যে চর্যানৃত্য আজও পরিবেশিত হয় তার সঙ্গে সম্ভবত প্রাচীন বাংলার চর্যানৃত্যের মিল ছিল। উপর্যুক্ত সূত্র এবং তান্ত্রিক পুথিগত সাক্ষ্য (গুহ্যসমাজতন্ত্র) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পালযুগের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নির্জন স্থানে অথবা মন্দিরে গুহ্য নাটগীত অভিনয় অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে সাধক/যোগী তাঁর সাধিকা/যোগীনীর সঙ্গে একত্রে তান্ত্রিক দেব-দেবীর বেশ ও মুখোশ পরে নৃত্য পরিবেশন করতেন। অপর সাধক/সাধিকা যন্ত্রসঙ্গীত ও চর্যাগীত/দোহা পরিবেশনের মাধ্যমে দোহারবৃন্দের ভূমিকা পালন করতেন। বীণাপা তাঁর বিখ্যাত চর্যাগীতে (চর্যাসংখ্যা ১৭) সম্ভবত এমন একটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনাকেই 'বুদ্ধ নাটক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ নাটগীতের ঐতিহ্য নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে অব্যাহত থাকে। নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনা যোগীর গান এবং যুগী পর্ব আজও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, ভীমসেন রায়ের গোর্খবিজয় ও শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (ষোলো শতক) কাব্য এবং বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় (১৪০৩) নাটলিপিটি প্রাচীনকালে নাথপন্থী নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথের সম্মুখে মাদলসহ নৃত্য পরিবেশন করেন।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের (১৪১৫-১৪৩৩) ভূমিকায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, গৌড়ের মুসলিম রাজসভায় নাটগীত অভিনয় উপস্থাপন সমাদৃত ছিল। মা হুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও (প্রকৃত পক্ষে ইয়েং ইয়াই শেংলান, ১৪০৮-১৪১১) মুসলিম রাজদরবারে নাটগীত পরিবেশনের বর্ণনা আছে। উল্লিখিত চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভোজসভা উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিতা সুদক্ষ গায়িকা ও নৃত্যশিল্পিগণ এ সকল নাটগীত পরিবেশন করতেন। আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রমাণ করে যে, তেরো শতকেই মৌখিক রচনাভিত্তিক নাটগীত জনগণের মধ্যে পরিচিত ছিল। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিন চরিত্রসম্বলিত এ সকল অভিনয় উপস্থাপনায় কুশীলবগণ গীত সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় এ সকল পরিবেশনা একজন কুশীলব কর্তৃক তিনটি চরিত্রে রূপদানের মাধ্যমে অথবা তিনজন কুশীলবের সাহায্যেও উপস্থাপন করা যেত এবং এগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনীত হতো। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখন্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষোলো শতকের নাটগীত উপস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ অভিনীত এ উপস্থাপনায় রুক্মিণী, রাধা, সুপ্রভা, বড়াই, কোটাল, নারদ প্রভৃতি চরিত্র রূপায়িত করা হয়। এক অংশে রুক্মিণীকে এবং অপর অংশে রাধাকে ঘিরে উপস্থাপনার বিষয়বস্তু রচিত। চৈতন্যের অনুসারী ভক্তবৃন্দ ছিলেন এই উপস্থাপনার দর্শক এবং তাঁরা অভিনয়স্থানের চতুর্দিকে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সাজঘর ছিল কিছু দূরে অবস্থিত। আলোর উৎস হিসেবে মশাল ব্যবহার করা হয়েছিল। নাটগীত উপস্থাপনকালে একজন কুশীলব মশালহাতে অভিনেতাদের অনুসরণ করেন। ষোলো শতকে বৈষ্ণবদের মধ্যে আরও দুটি নাটগীত অভিনয় উপস্থাপনার উল্লেখ পাওয়া যায়; একটি শ্রীহট্টে (ষোলো শতকের প্রথমার্ধে), যা থেকে ময়মনসিংহের ঘাটু গানের উদ্ভব এবং অপরটি (ষোলো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) রাধা চরিত্রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট, যা শেখরী যাত্রা নামে পরিচিত হয়।

অধিব্যঞ্জনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা মুখোশ নৃত্য গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোশ নৃত্য দেখা যায়, তার উৎস কোচ নৃগোষ্ঠীর প্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠান। খ্রিস্টীয় নবম শতক নাগাদ পূর্ব ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কোচ মুখোশ নৃত্য আত্তীকরণ করে তাঁদের নিজস্ব মুখোশ নৃত্যের উদ্ভব ঘটান। বাংলায় চৈত্রসংক্রান্তিতে সাংবৎসরিক উৎসবে এই নৃত্য পরিবেশিত হতো। এই মুখোশ নৃত্য অষ্টমাত্রিকা নৃত্য, মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ (কাঠমান্ডু উপত্যকা, নেপাল) এবং তিববতি বৌদ্ধ মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। বারো শতকের শেষ নাগাদ যখন শৈব তন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ তন্ত্রকে প্রায় আত্তীকরণ করে ফেলেছিল, তখন একই সঙ্গে মহাকালী প্যায়াখাঁ, দেবী প্যায়াখাঁ ইত্যাদি শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্যে রূপান্তরিত হয়। বাংলার শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্য মুসলিম শাসনের কারণে ক্ষয় হলেও নেপালে কিন্তু তা অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। বাংলায় শৈবতান্ত্রিক মুখোশ নৃত্যের অবশিষ্টাংশ কালী কাচ, মুখো নাচা সং যাত্রা ও গম্ভীরা উৎসবের মধ্যে আজও পরিদৃষ্ট হয়।

পটুয়া গান দুটি তথ্যসূত্র থেকে প্রাচীন বাংলায় পটুয়া গানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমটি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত (৭ম খ্রিস্টাব্দ) যেখানে যমপট্টিকার এ পরিবেশনা বিবৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সাঁওতাল পটচিত্র উপস্থাপনা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট যে যমপট্টিকার বিবরণ দিয়েছেন সেটি হর্ষবর্ধন তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ

প্রাপ্তির পর রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পথে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন কুশীলব পরিবেশিত এ উপস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছিল যমের চিত্রসম্বলিত একটি পট। বাংলার সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগের কারণে অনুমিত হয় যে, বাণভট্ট উল্লিখিত যমপট্টিকা বাংলায়ও পরিচিত ছিল। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে পট পরিবেশনের দুটি রীতি বিদ্যমান: একটি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক (কো রেয়াক কথা) এবং অপরটি মৃত্যুর পর মৃতের পরকালে যাত্রা বিষয়ক (চক্ষুদান পট)। উল্লিখিত পরিবেশনা রীতিদুটি বাংলায় প্রাচীন পটুয়া গানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মধ্যযুগে রাম, কৃষ্ণ, মনসা ও চন্ডী বিষয়ক পটুয়া গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আঠারো শতক নাগাদ মুসলমানদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে গাজীর পটের মাধ্যমে। পীর গাজীর মাহাত্ম্য বিষয়ক গাজীর পট এখনও বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

পুতুল নাচ দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবে পুতুল নাচ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলায় পুতুল নাচের প্রাচীনতম পুথিগত সাক্ষ্য পাওয়া যায় ইউসুফ-জুলেখা কাব্যে। উল্লিখিত তথ্য থেকে এও অনুমেয় যে, এ সকল পুতুল ছিল সুতার দ্বারা পরিচালিত। সম্ভবত দেব-দেবীর কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে মৌখিক রচনার ওপর ভিত্তি করেই এই পুতুল নাচ পরিবেশিত হতো। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (১৫১৫-৫৬) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত (আনু. ১৫৬০-৮০) সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ষোলো শতকে বাংলায় পুতুল নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তৎকালীন দেব-দেবীর জনপ্রিয়তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ষোলো শতকীয় পুতুল নাচ উপস্থাপনা ছিল কৃষ্ণ, রাম, মনসা, চন্ডী ও চৈতন্য বিষয়ক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সকল পুতুল নাচই লৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত, দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক পুতুলনাচ এখন বিরল। বাংলায় প্রচলিত পুতুলনাচে সম্ভবত ইসলাম ধর্মীয় বিষয় কখনোই অনুপ্রবেশ করে নি।

শোভাযাত্রামূলক অভিনয় নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের দেবতুল্য সম্প্রদায় অধিকর্তার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা প্রচারের নিমিত্তে বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং সচল যানের উপর স্থাপিত 'ট্যাবলো' (নীরব ও নিশ্চল কুশীলব কর্তৃক রূপায়িত দৃশ্য) সহযোগে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে তার এবং তদুদ্ভূত উপস্থাপনাসমূহের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার দেশজ নাট্যের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ এই রীতির উপস্থাপনাসমূহে পূর্বে আলোচিত তিন রীতির উপস্থাপনার সম্মিলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, বাংলার জাতীয় নাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটে। ফা-হিয়েন দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণের সময় (৩৯৯-৪১৪) যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা থেকে জানা যায় যে, তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের আট তারিখে পাটলীপুত্রে এক জনপ্রিয় বৌদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় বৌদ্ধ মূর্তি সম্বলিত রথ ব্যবহৃত হতো। এই রথ পাটলীপুত্রের রাস্তায় গায়ক ও বাদকদের পরিবেশনা সহযোগে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। হিউয়েন সাঙ একই ধরনের উৎসব কনৌজ এবং এলাহাবাদেও দেখেছিলেন। হর্ষবর্ধন দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে এবং তাঁর মিত্র ভাস্করবর্মা ব্রহ্মার বেশে এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন জাঁকজমকপূর্ণভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হতো। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ই-ৎসিঙ বাংলার সমতট রাজ্যে (বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল) একই ধরনের শোভাযাত্রার বিবরণ রেখে গেছেন। এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনার প্রচলন ছিল। সেখানে দেবতার মূর্তিযুক্ত রথ থাকত এবং গীত, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও চরিত্রাভিনয় যুক্ত ছিল। এ সকল শোভাযাত্রার শেষে বৌদ্ধ বিহারে মুখোশ নৃত্য ও বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা পরিবেশিত হতো। নেপালে মৎসেন্দ্রনাথ যাত্রার ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বাংলার নাথপন্থীরা দশ অথবা এগারো শতক নাগাদ তাঁদের নিজস্ব শোভাযাত্রার প্রচলন করেন।

বারো শতকের প্রথম দিকে শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনাসমূহ ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঠাকুর বিষয়ক সাহিত্যকর্ম ও ধর্মঠাকুর পূজারীদের মধ্যে প্রচলিত কৃত্য অনুষ্ঠান থেকে ধারণা হয় যে, বারো শতকে এই সম্প্রদায়

ধর্মীয় উৎসবের (গাজন) আয়োজন করত এবং এর অন্তর্গত ছিল শোভাযাত্রামূলক উপস্থাপনা। এ সকল শোভাযাত্রার শুরুতে থাকত সোনালি পালকিতে স্থাপিত ধর্মঠাকুরের পাদুকা এবং তার পেছনে থাকত বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও গীত পরিবেশনরত ধর্মঠাকুরের অনুগামীরা। এ সকল শোভাযাত্রায় সঙের উপস্থিতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুখোশ পরে (অথবা মুখোশ সদৃশ রঙ মেখে) এবং পৌরাণিক চরিত্রের সাজে পোশাক পড়ে সঙ ধর্মের গাজনে অংশগ্রহণ করত, আজও যেমন করে। প্রাচীনকালের শোভাযাত্রায় সঙ সম্ভবত নৃত্যের মাধ্যমে পৌরাণিক কোন দৃশ্য উপস্থাপন করত। ধর্মঠাকুরের মন্দির থেকে এ সকল শোভাযাত্রা শুরু হতো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে ফিরে আসত মন্দিরে। সেখানে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে বর্ণনাত্মক অভিনয় উপস্থাপনা ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো। বারো শতকের শেষ নাগাদ শৈবতন্ত্রের অনুসারীরা বৌদ্ধতন্ত্র ও ধর্মঠাকুরের অনুসারিবৃন্দের শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা আত্তীকরণ করে নেয়। বৎসরান্তে চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবে শৈবতন্ত্র অনুসারীদের শোভাযাত্রা বের হতো। এই শোভাযাত্রার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেব-দেবী, পৌরাণিক বীর, জীবজন্তু ও ভূত-প্রেতের সাজে আবির্ভূত হয়ে শিবের অনুসারিগণ গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করতেন। এলাকার শিবমন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে এ সকল শোভাযাত্রা পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ করত এবং শেষে আবার ফিরে আসত মন্দিরে। মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় শুরু হতো কৃত্যানুষ্ঠান ও মুখোশ নৃত্য এবং রাতভর তা চলত। প্রাচীন কালের এ সকল অভিনয় উপস্থাপনার অবশিষ্টাংশ আজও শিবের গাজন, নীলের গাজন, সঙযাত্রা, অষ্টক যাত্রা ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় দৃষ্ট হয়।

সম্ভবত চৌদ্দ শতকে শাক্ত ধর্মের অনুসারিগণ শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী শারদীয়া দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে দশম দিনে বিসর্জনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে গীতকুশলী কুমারী ও বারাঙ্গনারা, নট এবং যন্ত্রিদল। অন্যরা রঙ-বেরঙের পতাকা বহন করবে এবং খৈ, ফুল, ধুলা আর কাঁদা ছড়াবে। বলা হয়েছে যে, কামলীলা প্রদর্শনে দেবী প্রীত হন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে অনুমেয় যে, মধ্যযুগের শাক্তশোভাযাত্রা শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে কোন এক ধরনের অভিনয় উপস্থাপনার আয়োজন করা হতো। পনেরো-ষোলো শতকে রচিত বামাকেশ্বরতন্ত্রে দেবী ভগবতীর সম্মানে বছরে ১৬টি শোভাযাত্রার বিধান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ষোলো শতক নাগাদ বৈষ্ণবদের মধ্যেও শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়ের বিখ্যাত স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন বিষ্ণুর সম্মানে বছরে ১২টি শোভাযাত্রা আয়োজনের বিধান চালু করেন। বৈষ্ণব শোভাযাত্রামূলক অভিনয় উপস্থাপনায় ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয় রথের উপর স্থাপিত বৈষ্ণব পুরাণাদির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যসম্বলিত ট্যাবলো। ভক্তগণ এই রথ টেনে বৈষ্ণব অধ্যুষিত এলাকা প্রদক্ষিণ করতেন। ব্যাপক জনসমর্থন অর্জনের জন্য চৈতন্য স্বয়ং শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে এ সকল শোভাযাত্রা সংকীর্তন নামে পরিচিত ছিল। এমন একটি সার্থক নগর সংকীর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যভাগবতে। সেখানে নবদ্বীপের কাজীর আবাস ঘেরাও করে তাঁকে জনগণের দাবি মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশে বৈষ্ণব শোভাযাত্রা এখনও প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল (১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত) এবং টাঙ্গাইল জেলার পাতরাইলে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলের কথা উল্লেখ করা যায়।

শোভাযাত্রা উপস্থাপনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে বৈষ্ণবদের, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে। পুরীতে বসবাসকালে চৈতন্য ও তাঁর অনুসারিগণ এক ধরনের নাট্য জনপ্রিয় করে তোলেন, যাকে ‘পরিবেশ নাট্য’ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদে বিবৃত এ ধরনের এক পরিবেশ নাট্যে চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামিগণ হনুমান ও তাঁর বানরবাহিনীর সাজে উৎসব স্থলে উপস্থিত হন, যেখানে পূর্বেই লঙ্কার দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা রামায়ণের একটি অংশ (লঙ্কার দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস) অভিনয় করেন। এ ধরনের আরও কিছু নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের শৈশব বর্ণনায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিত্যানন্দের বন্ধুগণ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক

পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় করেন বলে জানা যায়। চৈতন্যের মৃত্যুর পরও পরিবেশ নাট্য প্রচলিত ছিল। একটি পুকুরের মধ্যে মাচা তৈরি করে কালীয়দমন লীলা অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত চৈতন্যের জীবদ্দশায় পরিবেশ ও শোভাযাত্রামূলক নাট্য একত্রে পরিবেশনের রীতি চালু হয়, যার অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশের পাতরাইল গ্রামে অনুষ্ঠিত নৌকাবিলাস মিছিলে দেখা যায়। একই ধরনের নাট্যাভিনয় সম্ভবত শাক্তধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। চন্ডীমঙ্গলের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা যে শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য উপস্থাপন করতেন তার নাম ছিল চন্ডীযাত্রা। এসকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো: ভিন্নভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে নাট্যদৃশ্যের প্রয়োজনে সৃষ্ট অভিনয়স্থলে একেকটি দৃশ্যের অভিনয় এবং অভিনেতাদের এক অভিনয়স্থল থেকে অন্য অভিনয়স্থলে গমনের সময় দর্শকবৃন্দের অনুসরণ। সাধারণত ধর্মীয় উৎসব কিম্বা মেলায় এ সকল শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্য অভিনীত হতো। এভাবেই মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ-নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা (যার শেষে মন্দিরে/বিহারে বর্ণনাত্মক নাট্য ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হতো) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যে (শোভাযাত্রাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্যবিশেষের অভিনয়) রূপান্তরিত হয়। বিবর্তনের এই দুই প্রান্তের যোগসূত্র ছিল শৈব তান্ত্রিক ও শাক্ত সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা রীতি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে পেশাদার অভিনয় দল বিভিন্ন ধরনের কৃষ্ণলীলা অভিনয় শুরু করে। এ অভিনয় কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে নয় বরং নাটমন্ডপ, গৃহাঙ্গন কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে কোন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কিংবা আয়োজকদের ইচ্ছানুসারে যে-কোনো দিন অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণত 'কালীয়দমন যাত্রা' নামে পরিচিত এ সকল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যাভিনয় নবদ্বীপের রাজসভার সংস্কৃত নাট্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কালীয়দমন যাত্রা ছিল মুখ্যত গীতাশ্রয়ী। দলের অধিকারী বৃন্দা (রাধার সখী) অথবা মুনি গোঁসাই (নারদ) চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং সূত্রধারের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট গদ্যে অথবা পূর্বে রচিত পদ্যে/গীতে অংশবিশেষ বর্ণনার মাধ্যমে সমগ্র নাট্যক্রিয়া পরিচালনা করতেন। নাট্যের অপর অংশ অভিনীত হতো তাঁর ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে। সম্ভবত শিশুরাম অধিকারী (আনু. ১৮শ শতক) ছিলেন এই অভিনয় উপস্থাপনা রীতির পথিকৃৎ। কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে একই সময়ে বাংলায় অপর কিছু অভিনয় উপস্থাপনা বিদ্যমান ছিল, যার সঙ্গে কালীয়দমনের কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যযাত্রা (চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে), চন্ডীযাত্রা (চন্ডীমঙ্গল অবলম্বনে) এবং রামযাত্রা (রামায়ণ অবলম্বনে)। উনিশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভাব ঘটে ভাসানযাত্রার (মনসামঙ্গল অবলম্বনে)। মধ্যযুগের শোভাযাত্রাযুক্ত পরিবেশ নাট্যের ঐতিহ্য তখনও অব্যাহত ছিল রাসযাত্রায়, যার বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসনৃত্য।

আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে কালীয়দমন যাত্রা জনপ্রিয়তা হারায়। এর পরিবর্তে আবির্ভূত হয় কৃষ্ণযাত্রা, যা এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত। কালীয়দমন যাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা উভয়ই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক হলেও পার্থক্য এই যে, কালীয়দমন যাত্রার অধিকারী-কথিত বর্ণনার পরিবর্তে কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণই সংলাপাত্মক এবং এর অধিকাংশই গদ্যে রচিত। একই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায় চন্ডীযাত্রা এবং ভাসানযাত্রায়। কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা বিশ শতকের প্রথম দিকে লোপ পায়, কিন্তু ভাসানযাত্রার পরিবর্তিত রূপ এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।

শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত কলকাতার মতো শহরাঞ্চলে, গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে অপার্থিবের পরিবর্তে পার্থিব মূল্যবোধ এবং দেশজ ঐতিহ্যের পরিবর্তে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। উল্লিখিত পরিবর্তনের প্রভাবে উনিশ শতকের বিশের দশকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশজ নাট্যে আবির্ভাব ঘটে 'নতুন যাত্রা'র। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে এর কাঠামোগত মিল থাকলেও উদ্দেশ্য ধর্মীয় ভক্তি জাগরণ নয়, কেবল বিনোদন; বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অমিল ব্যাপক। কারণ নতুন যাত্রা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অভিনীত হলেও এর গুরুত্ব ছিল দেবভক্তিতে নয়, বরং মানবিক আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টিতে। বিদ্যাসুন্দরের মতো নতুন যাত্রায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম মুখ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় এবং দেবলীলা উপলক্ষ মাত্র হয়ে যায়। নতুন যাত্রা পেশাদার দল কর্তৃক অভিনীত হতো।

তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল গোপাল উড়ের (১৮১৯-১৮৫৯) দল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে নতুন যাত্রার রমরমা বাজার শেষ হয়ে গেলে 'গীতাভিনয়' কলকাতার দর্শকদের মন জয় করে নেয়। কৃষ্ণযাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ এবং ইউরোপীয় রীতিপ্রভাবিত বাংলা নাটকের করুণ রস এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গীতাভিনয় ধীরে ধীরে নৃত্য ও গীতের বাহুল্য হ্রাস করে এবং তার বদলে গদ্য সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ইউরোপীয় নাট্যের দ্বন্দ্ব-নির্ভর কৌশল অনুপ্রবেশ করে। তবে গীতাভিনয়ের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় হিন্দু পুরাণ থেকে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কারণে ক্ষণিকের জন্য হলেও বাঙালি হিন্দু সমাজে দেশজ ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পুরাণাশ্রয়ী এবং ধর্মীয় প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম অভিনয় উপস্থাপনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় মূলত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গীতাভিনয় প্রভাবিত নতুন যাত্রার সংস্কারকৃত রূপ 'পৌরাণিক যাত্রা' নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পৌরাণিক যাত্রার বিষয়বস্তু মুখ্যত রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশ থেকে আহূত।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে লক্ষ্য করা যায় জাতীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে জাগতিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হতে। দেশজ নাট্যে এর প্রতিফলন ঘটে 'ঐতিহাসিক যাত্রা' ও 'স্বদেশী যাত্রা'র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক যাত্রার বিষয়বস্তু আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে সংগৃহীত। স্বদেশী যাত্রা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় (যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশাত্মবোধ, উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন, জমিদারি শোষণ ইত্যাদি) উত্থাপন করেছে। অভিনেতা-পরিচালক মুকুন্দদাসের (১৮৭৮-১৯৩৪) তত্ত্বাবধানে স্বদেশী যাত্রা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। তাঁর সাফল্যে ভীত ঔপনিবেশিক সরকার তাঁর মাতৃপূজা (১৯০৫) নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল।

বিশ শতকের বিশের দশক থেকে যাত্রা রাজনৈতিক অঙ্গনের ক্রমবর্ধমান সংকট প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এ সময় যাত্রা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নেয়। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যাত্রায় সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের প্রবণতা জন্মে। 'সামাজিক যাত্রা' নামে খ্যাত এ সকল পালায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উত্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিষয়টির সামাজিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগ প্রবণতাই সমধিক লক্ষণীয়।

৮.১.২.৪ ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য

ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য ১৭৫৭ থেকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, যা বাংলার সকল ক্ষেত্রে বিশেষত জ্ঞানচর্চায় গুণগত পরিবর্তন আনে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট শহুরে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি ইউরোপীয় আদলে গড়ে ওঠে। প্রবল জীবনী শক্তির অধিকারী এই শহুরে ইউরো-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং তার ফসল ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যচর্চা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত দেশজ নাট্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশজ নাট্যের অনেক রীতির ভেতর ফসিলীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ইউরো-প্রভাবিত নাট্যচর্চা বেগবান হয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হন মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা দ্বারা পুষ্ট শহুরে বুদ্ধিজীবীরা।

বাংলার সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা দ্য প্লে হাউস (বা দ্য থিয়েটার) ১৭৫৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা নগরী আক্রান্ত হলে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে

দ্য নিউ প্লে হাউস (দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার)। ১৮০৮ সালে বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় শেক্সপীয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক। প্রথম অবস্থায় নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু শীঘ্রই এ রীতির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নারীশিল্পীরা অভিনয় শুরু করেন। একে একে অন্যান্য নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তন্মধ্যে চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯) এবং সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-১৮৪৯) ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব ক্রয় করেন। অবশ্য চৌরঙ্গি থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখানে মঞ্চস্থ হয় শেরিডান, গোল্ডস্মিথ ও শেক্সপীয়রের নাটকসহ তৎকালীন লন্ডনের অন্যান্য জনপ্রিয় ইংরেজি নাটক। এগুলির অভিনেতা, কলাকুশলী সকলেই ছিলেন ইংরেজ। সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বাঙালি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একজন বাঙালি অভিনেতা ওথেলো নাটকে (১৮৪৮) নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এ মঞ্চেও শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইংরেজি থিয়েটারের এই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও স্থানীয় বাংলা নাটক উদ্ভাবনের পর থেকে সেগুলির গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

অনুকরণ, আত্তীকরণ ও গঠন হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাবিদ ও পর্যটক ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর ইউরোপীয় রীতিতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটি ছিল রিচার্ড জড্রেলের প্রহসন দ্য ডিসগাইজ-এর অনুবাদ এবং ২৫ ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) বেঙ্গলী থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। লেবেদেফ নিজেই তা অনুবাদ করেন। এ নাটকের প্রদর্শনীতে প্রবেশমূল্য অনেক বেশি থাকলেও নাট্যশালা দর্শকে পূর্ণ থাকত। এ থেকে নাট্য সম্পর্কে বাঙালি দর্শকদের আগ্রহের কথা জানা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ইউরোপীয় নাট্যচর্চা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল ও কলেজে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেক্সপীয়র অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে গৃহীত হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের ফলে ইউরোপীয় নাট্যরীতি আধুনিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ফলস্বরূপ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রভাবশালী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু ব্যক্তিগত নাট্যশালা। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-৬১) যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চ নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস। পাইকপাড়ার জমিদাররা তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার অর্কেস্ট্রা, মঞ্চ দৃশ্যাবলি, গ্যাস ও লাইম লাইটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় নাট্য নির্মাণ কৌশলের কেবল অনুকরণ নয়, বরং তা আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের প্রাধান্য লক্ষণীয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে শর্মিষ্ঠা (প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে এবং এর মাধ্যমে তিনি নাট্য জগতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন), পদ্মাবতী (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫), ঐতিহাসিক ট্রাজেডি কৃষ্ণকুমারী (প্রকাশিত ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন রচিত প্রহসনগুলি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারাল ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। একেই কি বলে সভ্যতা (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫) প্রহসনে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত অতি আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭)। সমাজের ভাল মানুষের মুখোশ অাঁটা প্রভাবশালী শ্রেণির ভন্ডামি ও অসাধুতার স্বরূপ উন্মোচনই ছিল এর উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত তিনি যে সংস্কৃত নাটক থেকে বাংলা

নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই সংস্কৃত নাটক তাঁর শেষ নাটক মায়াকাননের (১৮৭৪) ওপর পুনরায় প্রভাব বিস্তার করে।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬১) নাটকে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের নির্মম অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। বহুজনের বিবেচনায় নীলদর্পণ প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ নাটক। এটি মেলোড্রামার অন্তর্গত হলেও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার চিত্র এখানে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও দীনবন্ধু আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে পাগলা বুড় (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬) এবং জামাই বারিক (১৮৭১) প্রহসনগুলির জন্য তিনি হাসির জাদুকর হিসেবে পরিচিত।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬০-১৮৭২) সঙ্গে যুক্ত একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের উদ্যোগে কলকাতার একটি বাসভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়িভাবে এটি নির্মিত হয়। উল্লিখিত যুবকদের কয়েকজন পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটার তারকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন ইউরোপীয় নাট্য প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার নামে অপর একটি সাধারণ রঙ্গালয় আত্মপ্রকাশ করে, যা বাংলায় ইউরোপীয় রীতির সর্বপ্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম মঞ্চায়ন মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার ইউরো-প্রভাবিত বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এই নাটকেই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে নারীরাই (জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) অভিনয় করেন। উল্লিখিত সাধারণ রঙ্গালয়সমূহে আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতি ব্যবহার করা হতো। ১৮৮৭ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে সর্বপ্রথম ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। অঙ্কিত উইংস ও ব্যাকড্রপ দ্বারা নাটকের স্থান নির্দিষ্ট করা হতো। নাটক রচনার ক্ষেত্রে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট রোম্যান্টিক ট্রাজেডি, বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক ছিল আদর্শ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয় ছিল উচ্চকিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অতিমাত্রায় আবেগাশ্রিত। এ সময়কার নাট্য প্রযোজনাগুলিতে হালকা বিনোদনমূলক নৃত্য-গীত ও কিছু চটকদার কৌশল ছিল অপরিহার্য উপাদান।

সাধারণ রঙ্গালয় চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই একে ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পড়তে হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি গজানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনটি মঞ্চস্থ করার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর কিছু পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬ পাস হয়। এ আইনের মাধ্যমে সরকারবিরোধী ও প্রজাবিদ্রোহমূলক নাট্য প্রদর্শনী বন্ধ করতে পুলিশকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি আর রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী নাট্য প্রদর্শনীতে সাহস করে নি; এমন কি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যখন গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ, তখনও নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক। অনেক আন্দোলনের পর ২০০১ সালে বাংলাদেশে এই আইনের বিলুপ্তি ঘটে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। নাট্য ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যায় অসাধারণ অভিনেতা ও দক্ষ পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে। তিনি প্রায় সত্তরটি নাটক রচনা করেন, যার অকেগুলিই পৌরাণিক কাহিনী ও সাধুজীবনী আশ্রিত এবং আকণ্ঠ ভক্তিরসে নিমজ্জিত। উদাহরণস্বরূপ চৈতন্যের জীবনভিত্তিক চৈতন্যলীলার নাম করা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র যেখানে ইউরোপীয় নাট্যের শরীর ও আত্মা দুই-ই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, গিরিশ ঘোষ সেখানে কেবল শরীর বেছে নিয়েছিলেন, যার আদর্শ ছিল

শেক্সপীয়রের নাটক। কিন্তু গিরিশ ঘোষের আদর্শগত অবস্থান ও মানসিক প্রবণতা সম্পূর্ণভাবেই ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত আশ্রিত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে (যেমন: প্রফুল্ল ও সিরাজউদ্দৌলা) অবশ্য হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রভাব অনেকটা কম দেখা যায়। গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে চরিত্র বিশ্লেষণ এবং অভিনয় ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ শতকের শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর দেশপ্রেমের বক্তব্য সম্বলিত নাটক অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ সময় তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি.এল রায়) নাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন, যদিও তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডি.এল রায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি উত্তমরূপে আত্তীকরণ করে তা ব্যবহার করেন স্বজাতির কল্যাণে। ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ডি.এল রায় স্বার্থকভাবে তাঁর দর্শকবৃন্দের আগ্রহ পৌরাণিক ভুবন থেকে ইহজাগতিক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে রানা প্রতাপ সিংহ (১৯০৫) নূরজাহান (১৯০৮) এবং সাজাহান (১৯০৯)।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ব্যতিরেকে আলোচিত সময়ে রচিত হয়েছে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক হাস্যরসাত্মক নাটক এবং গীতাভিনয় নাট্য। এ সময়ের অপর দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদেশি ভাষায় রচিত কিছু নাটকের সফল বঙ্গানুবাদ (শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার ও মলিয়েরের লা জেন্টিলহোম) এবং কতগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল বসু ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনেতা। বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর প্রহসনগুলি তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যচর্চার সংমিশ্রণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ আরও অনেকের সমান্তরালে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এমন কিছু নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন যা দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যরীতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। মিশ্রণটি এতই সূক্ষ্ম যে এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীকী সাংকেতিক নাট্যরীতির উদ্ভব করেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশজ নাটগীত-রীতি এবং ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশলের সংমিশ্রণ। তিনি দেশজ নাটগীত থেকে বিপুল সংখ্যক গানের ব্যবহার এবং কার্যকারণের সূত্র ব্যতিরেকে নাট্যক্রিয়া নির্মাণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। অপরদিকে, দ্বন্দ্বভিত্তিক প্লট নির্মাণ-কৌশল এবং চরিত্র নির্মাণের কিছু সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় নাট্যরীতির কাছে ঋণী। রক্তকরবী (১৯২৬), মুক্তধারা (১৯২২) এবং অনেকাংশে অচলায়তনে (১৯২২) নাট্যদ্বন্দ্ব (জড় বস্তুর আধিপত্য ও মানবাত্মার নিরন্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা) নাটকসমূহের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রাজা (১৯১১) নাটকে যুদ্ধের পর চালিকা শক্তি হিসেবে নাট্যদ্বন্দ্ব অস্তিত্বহীন এবং ডাকঘর (১৯১২) নাটকে তা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের ওপর নাটগীত-রীতির প্রভাব তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ দিকে আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শেষ বর্ষণ, বসন্ত (১৯২৩), নটরাজ, ঋতু, রঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩১), শ্রাবণ গাঁথা (১৯৩৪) ইত্যাদি রচনায় নাটকীয় উপাদানের অভাব এত স্পষ্ট যে, অনেকে এ সকল রচনা নাটক হিসেবে স্বীকার করেন না। অবশেষে চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চন্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামায় (১৯৩৯) যখন তিনি সার্থকভাবে নাটগীত-রীতি প্রয়োগ করেন এবং নাট্যদ্বন্দ্বের ব্যবহার হ্রাস করে রস সঞ্চারে মনোযোগী হন, তখন দেশজ নাট্যরীতির প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্চে বাস্তববাদী অনুকরণের প্রয়াসকে পরিহার করতে সংকল্পবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ দর্শক-অভিনেতার মধ্যে নিবিড় বন্ধন সৃজনে সক্ষম উন্মুক্ত যাত্রা আসরের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসেবে মাত্র কয়েকবার মঞ্চায়ন করা হলেও সাফল্যের মুখ দেখে নি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল প্রথমবারের মতো প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে সফলভাবে মঞ্চায়ন করা সম্ভব।

সমাজ সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদমূলক নাট্যধারা এ ধারার নাট্যচর্চার কাল বিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং নাট্য জগতের দুই বলিষ্ঠ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থবিরতা আসে। বিশের দশকে সে স্থবিরতা কেটে গেলে বাংলা নাট্যজগতে দেখা যায় বিপুল পরিবর্তন। সামাজিকভাবে নাটক অভিজাত শ্রেণির নিকট শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই নাট্যকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে-সকল পৌরাণিক নাটক টিকে যায়, সেগুলির কেন্দ্রস্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ। অন্যদিকে টিকে যাওয়া ঐতিহাসিক নাটকে অতিরঞ্জিত বীরগাথার পরিবর্তে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নাট্যকাররা অধিক মনোযোগী হন। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্য কাঠামো অপসৃত হতে থাকে এবং ইবসেন ও বার্নাড শ প্রবর্তিত নাট্য কৌশল সে স্থান অধিকার করে। এ সময়ে প্রযোজনা রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) প্রবর্তিত অভিনয়রীতি গিরিশ ঘোষের তুলনায় অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় (ensemble acting), মঞ্চচিত্রের (stage picture) অর্থপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং অনাড়ম্বর ভাবভঙ্গি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বাস্তব জীবনের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনার প্রতি অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালে বাংলা নাট্যের আলোকসজ্জা এবং সেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন সতু সেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝের সম্মুখে স্থাপিত বাতির (ফুট লাইট) ব্যবহার হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মাথার উপরে স্থাপিত নির্দেশাত্মক (directional) আলোক ব্যবস্থা। অঙ্কিত ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হয় বক্সসেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন ও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কালসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে অর্কেস্ট্রার ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নাটকের গান ও নাচের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তীকালের 'সখীদল' ক্রমশ মঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে, যার ওপর ন্যস্ত হয় অভিনয়, আলো, সেট, পোশাক, সঙ্গীত ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব।

এ কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এবং আরও কয়েকজন। মন্মথ রায় ১৯২৩ সালে মুক্তির ডাক নামের একাঙ্কিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলির প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। ভাগবতপুরাণ থেকে গৃহীত কাহিনী অবলম্বনে তিনি কারাগার (১৯৩০) নাটক রচনা করেন, যেখানে কংসরূপী ঔপনিবেশিক সরকারের অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে কৃষ্ণকে তুলে ধরা হয়েছে। কারাগার এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় এটিকে নিষিদ্ধ করতে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর গৈরিক পতাকার জন্য। যখন দেশব্যাপী চলছিল ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগপ্রবণ ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাংলা নাট্যে শচীন্দ্রনাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সমাজ সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন, যার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো পরিহার করে তিনি নাট্য চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন। সে সময়কার নিরীক্ষাধর্মী নাটক ঝড়ের রাতে (১৯৩১) শচীন্দ্রনাথ নারী মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেন এবং নারীর মুক্তি সমর্থন করেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য জনসমক্ষে অবতীর্ণ হন তাঁর সামাজিক নাটক মেঘমুক্তির (১৯৩৮) মাধ্যমে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পরিবর্তনশীল সমাজে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং এই শ্রেণির পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব চিত্রায়ণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর নাটকের মধ্যে মাটির ঘর (১৯৩৯), বিশ বছর আগে (১৯৩৯), রক্তের ডাক (১৯৪১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্মথ, শচীন্দ্রনাথ এবং বিধায়কের উপর্যুক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে এ সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণী মূল্যায়ন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। রঙ্গালয়সহ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিতেও এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এ সময়কার নেতৃস্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনতায় উদ্বুদ্ধ লেখক-শিল্পিবৃন্দ 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' (১৯৩৬) ও 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর (১৯৪২) মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩) শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর কিছুকাল পরে বাংলা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এ তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা বিজন ভট্টাচার্য রচিত নবান্ন নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ঘটমান বাস্তবতার প্রতিফলন এবং অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নবান্ন নাটক নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এ নাটকটি সমাজে নাট্যকর্মী/শিল্পীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নাট্যকলায় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা যুক্ত করে। এর ফলে কলকাতার নবান্ন-পরবর্তী নাট্যকলায় গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার উন্মেষ ঘটে এবং এতে নাট্যকর্মিগণ তাঁদের কাজে সামাজিক-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ এ দুটি বিষয়কে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় সাধারণ রঙ্গালয়ে এই ধারণা আর্থিকভাবে অলাভজনক হওয়ায় তাঁরা সবাই নাট্যকর্ম থেকে অর্থগ্রহণে বিরত থাকেন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

৮.১.২.৪ নাট্যকলার বিবিধ প্রকরণ

ক) অঙ্গরচনা

অঙ্গরচনা এক ধরনের শিল্পকর্ম, যার মাধ্যমে চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চেহারার পরিবর্তন ঘটানো হয়। অঙ্গরচনাকালে শিল্পীকে চরিত্রের জাতি, বয়স, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হয়। অঙ্গরচনার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: ক. ত্বকের ওপর কৃত্রিম আলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে বিদূরিত করা; খ. মুখমন্ডলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা এবং গ. শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।

থিয়েটারে অঙ্গরচনার গুরুত্ব প্রাচীনকালেই অনুভূত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা যেমন অন্য দেহে স্থান লাভ করে পরভাব প্রাপ্ত হয়, সেরূপ অভিনেতাও বর্ণ ও বেশ দ্বারা সজ্জিত হয়ে অন্যের অর্থাৎ নাট্য-চরিত্রের অনুকরণ করে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গরচনার মাধ্যমে অভিনেতা চরিত্রানুযায়ী ভিন্ন রূপ, গুণ, অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আধুনিক থিয়েটারেও অঙ্গরচনার গুরুত্ব অনেক; এর ফলে শিল্পীর অভিনয়-সাফল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারে উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ (তৈলজাতীয় পদার্থ) ও খনিজ পদার্থ থেকে সংগৃহীত রঙের সাহায্যে অঙ্গরচনা করা হতো। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে Leichner নামক একজন জার্মান অভিনেতা অঙ্গরচনার জন্য নির্দিষ্ট রং আবিষ্কার করেন। তৈলজাতীয় পদার্থের সঙ্গে রঞ্জক দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলে এই রংকে বলা হল 'তৈল রং' (grease paint)। এই রং আবিষ্কারের ফলে অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এর অল্পকাল পরেই মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-প্রযোজনার অন্য অনেক বিষয়ের মতো অঙ্গরচনায়ও পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়; এ ধারা আজও অব্যাহত।

খ) আলোক পরিকল্পনা

আলোক পরিকল্পনা থিয়েটার যখন উন্মুক্ত স্থান থেকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিংবা দিবাকাল থেকে রাত্রিকালে প্রদর্শিত হওয়া শুরু করে, সেদিন থেকেই মঞ্চে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলা থিয়েটার সূচনালগ্ন (১৭৯৫) থেকেই

গৃহাভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। তখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও গ্যাসের আলো কিংবা বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কৃত হয় নি। ইউরোপ ও আমেরিকার থিয়েটারে যে আলো ব্যবহার করা হতো, তার উৎস ছিল মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ। বাংলা থিয়েটারের জনক লেবেদেফ এসেছিলেন রাশিয়া থেকে। সেখানে তখন মঞ্চালোকের উৎস ছিল মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ নাট্য-প্রযোজনায় (কাল্পনিক সংবদল) স্বদেশের অনুকরণে মোমবাতি ও তৈল-প্রদীপ ব্যবহার করেন।

বাংলা থিয়েটারে গতানুগতিক আলোক বিন্যাসরীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ১৮৯৭ সালের পর থেকে। ঐ সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ক্ল্যাসিক' থিয়েটার গঠন করে পেশাদারি থিয়েটার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রথম নাট্যোপযোগী আলো প্রয়োগ করেন। তিনি মঞ্চে রঙিন আলো ব্যবহার করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কলাকৌশলও সৃষ্টি করেন। মঞ্চে গ্যাস-লাইট প্রবর্তনের ফলে এসব করা সম্ভব হয়েছিল এবং গ্যাসের আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অমরেন্দ্রনাথ কিছু যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করেন। তিনি স্পট-বাতিও ব্যবহার করেন, যদিও বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া এ বাতি ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯০০ সালে স্টার থিয়েটারে প্রথম ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুতের আলো ব্যবহৃত হয়। এরপর ক্রমশ মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার ইত্যাদি মঞ্চেও ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চকে আলোকিত করা হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মঞ্চালোকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন করেন। পাদপ্রদীপের আলোয় পশ্চাৎপটে ছায়া সৃষ্টি হয় বলে তিনি পাদপ্রদীপ বিলুপ্ত করেন। এ সময় মঞ্চে যথার্থ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়। শিশিরকুমারের নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে রঙিন আলোর যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রঙিন আলোর সাহায্যে চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক।

১৯৩১ সালে বাংলা থিয়েটারে যোগদান করেন বিশিষ্ট পরিচালক ও মঞ্চ-দৃশ্য-আলোক শিল্পী সতু সেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোর প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আলো যে দৃশ্যের একটি অঙ্গ, মঞ্চচিত্র সৃষ্টিতে সহায়ক এবং নাট্য-উপস্থাপনাকে প্রকাশিত করে তুলতে সক্ষম সতু সেনের আলোক-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বাংলা মঞ্চের জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোকযন্ত্র নির্মাণ করে আলো প্রয়োগের মানকে উন্নত করেন। রঙিন ছায়া, মনস্তত্ত্বসম্মত আলো, মঞ্চচিত্র, মাত্রাবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। এরপর তাপস সেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চালোকের গুণগত মান আরও উন্নত করেন।

মঞ্চে আলোকসম্পাতের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে ফলোস্পট ও ফ্লাডলাইট ছিল প্রধান সূত্র। ১৯৫৬ সালে গ্রুপ থিয়েটার চর্চাভিত্তিক নাট্যদল ড্রামা সার্কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থিয়েটারে আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে 'কামাল ইলেকট্রিক' এবং 'কলরেডী' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকার নাট্যমঞ্চে আলোকযন্ত্র সরবরাহের কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে আলোকসম্পাতের মান ছিল অত্যন্ত সাধারণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রুপ থিয়েটার চর্চা প্রবল ও বিস্তৃত হলে নাট্য-আঙ্গিকের অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি নাট্যমঞ্চে আলোর ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্লাড লাইট, স্ট্রিপ লাইট, বর্ডার লাইট/স্কাই লাইট, বেবি স্পট, মিডল সাইজ স্পট, বেবি মিরার স্পট, ফ্রেসনেল স্পট লাইট, স্টেপলেন্স স্পট, ইলিপ্সোডাইল স্পট, বিম প্রজেক্টর, একটিং এরিয়া ফ্লাড, পেজেন্ট, আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পসহ বিভিন্ন ধরনের লাইট। আর

আলোক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পূর্বের যন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে 'ভেরিয়েবল ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ডিমার', 'ইলেকট্রিক ডিমার' ইত্যাদি।

গ) পোশাক পরিকল্পনা

পোশাক পরিকল্পনা অভিনয়ে পোশাকের প্রধান ভূমিকা হলো চরিত্রের বাহ্যরূপ চিত্রণ। শুধু অঙ্গরচনার দ্বারা চরিত্রের যথার্থ বাহ্যরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না; এজন্য চরিত্রানুযায়ী পোশাকের প্রয়োজন হয়। অঙ্গরচনার সঙ্গে চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করলেই চরিত্রের সার্থক বাহ্যরূপ পাওয়া যায়। চরিত্রের এই বাহ্যরূপ চিত্রণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়; সেগুলি হলো: নাট্যচরিত্রের দেশ, জাতি, স্থান, কাল, ধর্ম, পেশা, ঋতু, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ, বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, লিঙ্গভেদ, রুচি ইত্যাদি। বাস্তব জীবনে ব্যক্তির সঙ্গে তার পোশাকের কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চচরিত্রের সঙ্গে তার পোশাকের অসঙ্গতি মোটেই কাম্য নয়, কারণ এখানে চরিত্র ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। চরিত্রের বাহ্য এবং আন্তর রূপ প্রকাশে পোশাকের রঙেরও একটা ভূমিকা থাকে।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে পোশাককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে শ্বেত, বিচিত্র ও মলিন। বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠান ও মন্দিরে গমনের জন্য শ্বেতবস্ত্র; এছাড়া সেনাপতি, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, পুরোহিত প্রভৃতিরও পোশাক হবে সাদা; রাক্ষস, দানব, নাগ, রাজা ও বিলাসী চরিত্রের পোশাক হবে বিচিত্র এবং শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জরিত চরিত্রসমূহ, পাগল, মাতাল প্রভৃতির পোশাক হবে মলিন। মুনি-ঋষির চরিত্র গাছের ছাল কিংবা পশুর চামড়া দিয়েও দেহকে আচ্ছাদিত করতে পারে।

আধুনিক থিয়েটারের পোশাককে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ক. ঐতিহাসিক এ ধরনের পোশাক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির জন্য পরিকল্পিত হয়; খ. সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পোশাক; গ. সাংকেতিক যেসব বিষয় স্বাভাবিকভাবে বোঝানো যায় না, প্রতীক-সংকেত-রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের পোশাক ব্যবহৃত হয়; ঘ. কাল্পনিক এ ধরনের পোশাক ব্যবহৃত হয় কাল্পনিক চরিত্র, যথা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকেই নাট্যচর্চার যেমন বিকাশ ঘটেছে, তেমনি উন্নয়ন ঘটেছে পোশাক-পরিকল্পনায়ও। কিন্তু বাংলাদেশে নাট্যপ্রদর্শনীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে পোশাক-পরিকল্পনায় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ১৮৬১ সালে ঢাকায় মঞ্চস্থ নীলদর্পণ নাটকে দেশিয় চরিত্রসমূহের জন্য সাধারণ পোশাক এবং ইংরেজ চরিত্রসমূহের জন্য ইংরেজের পোশাক ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে মঞ্চস্থ নাটকসমূহে পোশাকের ব্যবহার পুরোপুরি চরিত্রানুযায়ী ছিল না।

তখনকার পোশাকের অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রসমূহের পোশাক। সামাজিক নাটকের পোশাক সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পোশাকের অনুরূপ। কখনও বা অনুমান ও কল্পনার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশক বা অভিনেতা চরিত্রের পোশাক নির্বাচন করত। তখন পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, ধর্ম, পেশা, বয়স ইত্যাদি তেমন বিচার করা হতো না।

এ সময় একই নাটকের একাধিক প্রদর্শনীর প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন নাট্যদল বিভিন্ন প্রযোজনার জন্য তৈরি করা পোশাক সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে সমস্ত নাট্য-প্রযোজনার পোশাক-পরিকল্পনা চরিত্র-উপযোগী ও প্রশংসিত হয়, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সৎ মানুষের খোঁজে, ম্যাকবেথ, ওথেলো, নূরুল দীনের সারা জীবন, কোরিওলেনাস, ইডিপাস, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল, তুঘলক, জমিদার দর্পণ, মা, মধুমালা, কঞ্জুস, স্পার্টাকাস, রোমিও জুলিয়েট, বিষাদ-সিন্ধু, আন্তিগোনে ইত্যাদি।

ঘ) মঞ্চ-পরিকল্পনা

মঞ্চ-পরিকল্পনা বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের মতো বাংলার রঙ্গমঞ্চও সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত নাট্যমঞ্চ এবং ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (আনু. খ্রিস্টপূর্বাব্দ-খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের জন্য তিন ধরনের রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা ছিল: বিকৃষ্ট (আয়তাকার), চতুরস্র (বর্গাকার) এবং কনীয় বা ত্র্যস্র (ত্রিভুজাকার)। এগুলির প্রত্যেকটিকে আবার আয়তনের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। এ অনুযায়ী আয়তনের ভিত্তিতে রঙ্গালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট নয় প্রকার। নাট্যশাস্ত্রমতে, জ্যেষ্ঠ শ্রেণির রঙ্গালয় কেবল দেবতাদের পক্ষেই উপযোগী; কেননা, তাঁদের মানসসৃষ্ট অভিনয়ের কোন ভাব চেষ্টা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না; তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়েও তাঁদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু জাগতিক মানুষের পক্ষে অভিনয়ের সব কিছুই চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে মানবসৃষ্ট অভিনয় যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হয় না; যে সংলাপ বা আবৃত্তি উচ্চারিত হয় তার নিঃসরণ যথাযথ হয় না। শ্রোতাদের শোনাবার জন্য অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর অত্যধিক বাড়াতে হয়, যে কারণে তা শ্রবণসুখকর হয় না; অভিনেতাদের মুখমন্ডলের ভাব ও রসাশ্রিত অভিব্যক্তি দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে; গীত ও আবৃত্তি শোনাতেও অসুবিধা হয়। এসব কারণে জাগতিক মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী মধ্য ও অবর আয়তনের রঙ্গালয়; আবার মধ্য রঙ্গালয় নৃপতিদের এবং অবর রঙ্গালয় সাধারণের পক্ষে উপযোগী। শিল্পী ও দর্শক উভয়ের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ধরনের পরিমাপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে মধ্য (প্রধানত বিকৃষ্ট মধ্য) শ্রেণির রঙ্গালয়ের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। এরূপ রঙ্গালয়ের মঞ্চ সমান দুটি অংশে বিভক্ত; সম্মুখভাগের অংশকে বলা হয় 'রঙ্গ' বা 'রঙ্গমন্ডল'। পশ্চাদ্ভাগের অংশটি পুনরায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত, যার পশ্চাদ্ভাগ 'নেপথ্যগৃহ' এবং সম্মুখভাগ 'রঙ্গভূমি' বা 'রঙ্গমঞ্চ' নামে অভিহিত। নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমির মধ্যবর্তী অংশে একটি প্যানেলযুক্ত কাষ্ঠনির্মিত দেওয়াল ব্যবহার করা হতো, যা নানা শিল্পকর্ম দ্বারা সুশোভিত করা হতো। এই অংশকে বলা হয় 'ষড়দারুক'। ষড়দারুকের দুদিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গভূমিতে গমনাগমনের জন্য দুটি দরজা থাকত এবং তাতে পর্দা ব্যবহার করা হতো।

রঙ্গভূমি দুটি অংশে বিভক্ত রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ; সম্মুখ অংশকে বলা হয় রঙ্গপীঠ এবং পশ্চাদংশ রঙ্গশীর্ষ। চরিত্রসমূহ মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে এবং মঞ্চ থেকে প্রস্থানের পরে রঙ্গশীর্ষে অপেক্ষা বা বিশ্রাম করত; এটি রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত অংশ; এখানে বাদ্যযন্ত্রসমূহও সংস্থাপিত হতো। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে থাকত দুটি 'মত্তবারণী'। মওবারণী রঙ্গপীঠ থেকে দেড় হাত উঁচু এবং এর চার কোণে থাকত চারটি স্তম্ভ; নাট্যক্রিয়ায় এগুলির ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক।

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যবনিকা বা পর্দার ব্যবহার ছিল, তবে তা মঞ্চের সম্মুখে নয়, রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী অংশে। নাট্যবহির্ভূত গীতসমূহ এর অন্তরালে গীত হতো এবং অভিনয়ের সময় এটি অপসারিত হতো। রঙ্গভূমির মেঝে হতো আয়নার মতো সমতল ও চকচকে।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বলতে এখন প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে বোঝায়। এর একদিকে থাকে মঞ্চ, যার তিনদিক ঘেরা ও সামনের দিক খোলা। মঞ্চের দুপাশে থাকে ৮-১০টি উইংস, পেছনের পর্দায় থাকে দৃশ্যপট এবং সামনে মঞ্চমুখী দর্শকদের সারি। রিয়েলিস্টিক বা সাজেস্টিভ সেট, প্ল্যাটফরম, সিঁড়ি ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা রঙ্গমঞ্চের ভেতরে ও বাইরে পরিবর্তন আনা হয়।

ঙ) মঞ্চ নকশা

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে ধরনের রঙ্গমঞ্চ চালু ছিল, ইংরেজরা সেই রঙ্গমঞ্চই বাংলায় নিয়ে আসেন। তাঁরা কলকাতায় যে নাট্যশালা গড়ে তোলেন, এদেশের রাজা-জমিদাররা তারই হুবহু অনুকরণ করেন। কলকাতার প্রথম বিদেশি রঙ্গালয় 'ওল্ড প্লে

হাউস' এবং পরে 'দ্য ন্যু প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫) স্থাপনের পরিকল্পনা ও স্থাপত্যকর্মে সাহায্য করেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিফ। এরপর বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে লেবেদেফের আবির্ভাব ঘটে; তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫) ক্যালকাটা থিয়েটারের মঞ্চকাঠামো দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাদি নাট্য পরিবেশনায় বিশেষ এক ধরনের মঞ্চ ব্যবহৃত হয়। চারদিক বাঁশ দিয়ে ঘিরে ওপরে কাপড়ের শামিয়ানা খাটিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। প্যান্ডেলের ভেতরে মাঝামাঝি জাগায় চারকোণা বিশিষ্ট উঁচু কাঠের পাটাতন মঞ্চের কাজ করে; দর্শকরা এর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসন গ্রহণ করে। দর্শকদের পেছনে এক কোণে থাকে সাজঘর, যা অঞ্চলভেদে গ্রিনরুম নামেও পরিচিত; মঞ্চ ও সাজঘরে অভিনেতাদের যাতায়াতের জন্য একটি সরু পথ থাকে। মঞ্চের দুপাশে যন্ত্রিদল অবস্থান নেয়।বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত উভয় বঙ্গে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আদর্শে তৈরি রঙ্গমঞ্চ ও অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে নাট্যচর্চা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বড় রকমের কোন পরিবর্তন হয় নি।

চ) মঞ্চসঙ্গীত

মঞ্চসঙ্গীত মঞ্চে অভিনয়কালে নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের পরিস্ফুটন এবং নাট্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সঙ্গীত। অভিনয়ের সঙ্গে এই সঙ্গীতের সম্পর্ক ওতপ্রোত। নাটকের প্রকৃতি, চরিত্র, নাট্যরস ইত্যাদি অনুযায়ী এই সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে নাট্যঘটনা এবং চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের মনে আবেগ সঞ্চারিত হয়।

নাটকে এই সঙ্গীতের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাটকে ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়েও মঞ্চসঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। তখন নাটকে সঙ্গীতের গুরুত্ব বিচারে নাট্যশালাকে 'সঙ্গীতশালা' হিসেবেও অভিহিত করা হতো। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে এই সঙ্গীতের নাম ছিল 'ধ্রুবা'। ধ্রুবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত: ১. প্রাবেশিকী চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশকালে গেয়; ২. আক্ষেপিকী বন্দিদশা, রোগাক্রমণ, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থায় গেয়; ৩. নৈষ্ক্রমিকী মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রমণকালে গেয়; ৪. প্রাসাদিকী উত্তেজিত দর্শকচিত্তকে শান্ত করার জন্য গেয়; এবং ৫. অন্তরা প্রধান চরিত্রগুলির বিপদ, উদাসীনতা ও ক্রোধের অবস্থায় গেয়। নাট্যবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সঙ্গীতের এই প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পায় এবং তার প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে।

বাংলা নাটক জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গীতসমৃদ্ধ, যেহেতু পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে দেশিয় যাত্রার সম্মিলনেই বাংলা নাটকের জন্ম। যাত্রার প্রাণই হলো সঙ্গীত। কথানাট্য (৯ম-১২শ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলায় জনপ্রিয় ছিল), গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও কৃষ্ণযাত্রায় সঙ্গীতের প্রয়োগ ও প্রচলন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যশিল্পকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করেছে। ষোড়শ শতকে বাংলায় প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রায় বাদ্যযন্ত্র ও কোরাস সমন্বয়ে সঙ্গীতের যে ব্যবহার হতো, তার সূত্র ধরেই উত্তরকালের যাত্রার আবির্ভাব। প্রথম দিকের যাত্রানুষ্ঠানে অভিনয়ের মাঝে মাঝে কণ্ঠসঙ্গীতের যে প্রয়োগ ছিল, পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়। তবে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে যাত্রানুষ্ঠান শুরুর পূর্বে বেশ কিছুটা সময় সমবেত বাদ্য বাজানোর প্রথা পরবর্তীতে চালু হয়, যার নাম কনসার্ট। যাত্রার এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলা মঞ্চনাটকে গান ও আবহসঙ্গীতের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা নাটকে একক, দ্বৈত ও সমবেত এই তিন ধরনের সঙ্গীত ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। অভিনয়কালে বিশেষ কোন নাটকীয় মুহূর্তকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্যও নেপথ্য-সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে থাকে।

১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক কাল্পনিক সংবদলে মঞ্চসঙ্গীত সংযোজিত হয়। এরপর সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায় অভিজ্ঞানশকুন্তলে (বঙ্গানুবাদ)। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকে বারোটি গান গাওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময় থেকেই নাটকে গান সন্নিবেশের বাহুল্য দেখা যায়। তাঁর ১৩৭০টি গানের প্রায় সব কটিই নাটকের জন্যই লেখা এবং নাটকেই

ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের শুরুতে এবং দৃশ্যশেষে একক বা দ্বৈত সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্যরসকে ঘনীভূত করার চেষ্টা করেছেন মাইকেল মধূসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। নাটকে দেশাত্মবোধক গানের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটকে অসামান্য সব গানের প্রয়োগ করেন এবং নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে গানের ব্যবহারকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলির (শারদোৎসব, মুক্তধারা ইত্যাদি) অপরিহার্য অঙ্গ গান; গানের মধ্য দিয়েই তাঁর অধিকাংশ নাটকের মূল ভাব ব্যক্ত হয়েছে। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং সাধারণ নাটকেও প্রচুর গান ব্যবহার করে তিনি বাংলা নাট্যরীতিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকগুলি প্রধানত কলকাতার আদর্শই অনুসরণ করে।

স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের মঞ্চনাটকেও সঙ্গীতের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। তবে শিল্পীদের মধ্যে কেউ কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী না হলে সেক্ষেত্রে যন্ত্রের মাধ্যমে এই সঙ্গীত প্রক্ষেপিত হয়ে থাকে। কোন কোন নাটকে গায়ক এবং যন্ত্রিদল মঞ্চের পাশে উইংস-এর ভেতরে, কখনও মঞ্চের পেছনে বা সামনে যে-কোনো স্থানে বসে অভিনয় চলাকালীন সময়ে পাত্র-পাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী গান, সুর ও শব্দ প্রক্ষেপণ করে। মঞ্চনাটকে সরাসরি ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি, ঢোল, খোল, নাল, করতাল, মন্দিরা, তবলা, হারমোনিয়াম, ড্রাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বহু নাট্যদল নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী রেকর্ডকৃত নানারকম সুর (আনন্দ, করুণ ইত্যাদি), গানের কলি, নানা রকম সাউন্ড এফেক্ট (পাখির ডাক, আযান, ঝড়, বজ্রপাত, ট্রেন, মোটরগাড়ি, ঘোড়ার দৌড়, বোমা, প্লেন, সমুদ্রগর্জন ইত্যাদির শব্দ) প্রক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহার করছে।

৮.১.২.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাট্যকলা বলতে কী বোঝো?
২। বাংলা নাট্যকলার বিকাশ আলোচনা করো।
৩। বাংলা নাটকে দেশজ রীতির গুরুত্ব আলোচনা করো।
৪। বাংলা নাটকে ইউরোপীয় রীতির প্রবর্তন কীভাবে ঘটে?
৫। নাট্যকলার বিবিধ উপকরণ বিষয়ে আলোকপাত করো।

৮.১.২.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। নাট্যশালার ইতিহাস – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা – সাধনকুমার ভট্টাচার্য
৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিতকুমার ঘোষ
৪। রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব – ড. জগন্নাথ ঘোষ

একক ৩
নাট্য প্রযোজনা

বিন্যাসক্রম

৮.১.৩.১উপস্থাপনা

৮.১.৩.২ বাংলা নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস

৮.১.৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১.৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.১.৩.১উপস্থাপনা

প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন রুশ মনীষী লেবেদেফ। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করে ২৭ নভেম্বর কাল্পনিক সংবদল নামক একটি বাংলা অনুবাদ-নাটক মঞ্চস্থ করেন। এর আগে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত দুটি নাট্যমঞ্চ ছিল, যেখানে কেবল ইংরেজি নাটকই অভিনীত হতো।

লেবেদেফের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উনিশ শতকে বাঙালিরা কলকাতায় বেশ কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন, যেমন: হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১), ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (১৮৫৩), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪), বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ (১৮৫৭) ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষভাগে ঢাকায়ও কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন: পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (১৮৬৫), ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ (১৮৯০-৯২ এর মধ্যে), ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার (১৮৯৭) ইত্যাদি। এ সময় মুন্সিগঞ্জ শহরে 'জগদ্ধাত্রী নাট্যমঞ্চ' নামে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যা এখনও বর্তমান। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন: খুলনা থিয়েটার (১৯০৫), করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (টাঙ্গাইল, ১৯১১) ইত্যাদি। এ সময় টাঙ্গাইলের সন্তোষ, এলেংগা, শিবপুর, আলোয়া ও করটিয়ার জমিদাররা বেশ কয়েকটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকায় নির্মিত হয় মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট (১৯৫০)। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকায় স্বতন্ত্র কোন নাট্যমঞ্চ নির্মিত না হলেও বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চ বিশেষভাবে নাট্যাভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, যেমন: মহিলা সমিতি মিলনায়তন, গাইড হাউস মিলনায়তন ইত্যাদি। সম্প্রতি ঢাকার গুলিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬০০ আসনবিশিষ্ট 'ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ'। এখানে প্রধানত নাট্যাভিনয় হয়। এগুলি ছাড়া ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নাটকের অভিনয় হয়, যেমন: ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন, গণগ্রন্থাগার মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন ইত্যাদি।

৮.১.৩.২ বাংলা নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস

বাংলা নাট্য প্রযোজনার পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসাবে আমরা পাই তৎকালীন সখ ও শৌখিন নাট্যশালাগুলি। আধুনিক বাংলা নাটকের ভিত গঠনে এই নাট্যশালাগুলি ছিল সেই সময়ের নাট্যব্যক্তিত্বদের অন্যতম হাতিয়ার। নাটক রচনা, উপস্থাপন, মঞ্চায়ন এমনকি অভিনয়ও একাহাতে করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ববৃন্দ। তাই আলাদা করে প্রডিউসার কিংবা পরিচালকের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না, যা ছিল তা হলো নাট্যগোষ্ঠী। আর এই নাট্যগোষ্ঠীগুলি প্রদর্শনীমঞ্চে নিজেদের

বিবিধ মঞ্চ উপযোগি পোশাকি নামে অভ্যস্ত করে। যা সেই সময়ের বঁচে থাকার এবং টিকে থাকার অন্যতম কৌশল বললে ভুল হয় না। আমরা বাংলা নাটকের সেই সূচনা পর্বের নির্দেশনামূলক মঞ্চায়নের ইতিহাস জানব, যা ইনা লিপিবদ্ধ আছে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিবৃত্তে।

এমারেল্ড থিয়েটার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলুটোলা নিবাসী গোপাললাল শীল এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে থিয়েটারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করান এবং গ্যাসের আলোর পরিবর্তে ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠা বছরেরই ৮ অক্টোবর থিয়েটারের উদ্বোধন দিবসে কেদারলাল চৌধুরীর একখানি পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ হয়; কিন্তু দক্ষ পরিচালনার অভাবে থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এমতাবস্থায় গোপাল শীলের আমন্ত্রণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েকখানি পুরাতন ও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেগুলির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিছুদিন পরে প্রখ্যাত মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর এর মঞ্চসজ্জায় নিযুক্ত হন। কিন্তু খেয়ালি মানুষ গোপাল শীল দুবছরের মাথায় থিয়েটার বিক্রি করে দেন। তার পরেও বিভিন্ন মালিকানায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। কেদারলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৪০খানা নাটক এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। এর প্রধান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, মহেন্দ্র বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, বনবিহারিণী, ক্ষেত্রমণি, সুকুমারী, কুসুম, গুল্ফন হরি প্রমুখ।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ১৮৫৩ সালে কলকাতার ২৬৮ নং গরানহাটা, চিৎপুরে গৌরমোহন আড্ডির ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয়ের জন্য মি. ক্লিঞ্জার ও মিসেস এলিস ছাত্রদের শিক্ষা দেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় এবং এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ৫ অক্টোবর।

১৮৫৪ সালের ২ ও ১৭ মার্চ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মিসেস গ্রেইর্গ নামে জনৈকা মহিলা ‘পোর্সিয়া’র ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরের বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি শেক্সপীয়রের হেনরি ফোর্থ ও হেনরি পার্কার মেরিডিথের এ্যামেচার নাটকদুটি অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালের মে মাসে শেক্সপীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকরে।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ব্যয় নির্বাহ হতো টিকেট বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে, যেহেতু এটি কোন বিত্তবানের প্রাসাদের থিয়েটার ছিল না। এর নাট্যাভিনয়ের বিজ্ঞাপন এবং বিবরণসমূহ সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল হরকরা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, দি মর্নিং ক্রনিকল, দি সিটিজেন ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হত

ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে কোনও এক সময় পুরান ঢাকার নবাব বাড়ির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রথমে ছিল ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’ নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চ; কিন্তু এই গোষ্ঠীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে ক্রাউন থিয়েটার সেটি ভেঙ্গে নতুন করে মঞ্চ নির্মাণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে মঞ্চটি এক সময় ইসলামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে ‘ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রাউন থিয়েটারের কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সেখানে যোগ দেন এবং এর ফলে ক্রাউনের কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছুকাল পরে ক্রাউন থিয়েটার চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করলে নাট্যমঞ্চ হিসেবে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গাইড হাউস মিলনায়তন ঢাকার নিউ বেইলী রোডে বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত। আশির দশক থেকে এই মঞ্চটি নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনীর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নাট্য প্রদর্শনীর

সংখ্যাবৃদ্ধি, নতুন নতুন নাট্যদলের উদ্ভব, নাটকের দর্শক সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গাইড হাউস মিলনায়তনের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা শহরে এখানেই প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনী শুরু হয়।

গাইড হাউস মিলনায়তনে বিভিন্ন নাট্যদল কর্তৃক মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো: বহুবচনের প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২), ইডিপাস (১৯৮২); থিয়েটারের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), ঘরে-বাইরে (১৯৮৫), কোকিলারা (১৯৮৯), আন্তিগোনে (১৯৯২); ঢাকা থিয়েটারের শকুন্তলা (১৯৭৮); নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের দেওয়ান গাজীর কিস্সা, বিসর্জন (১৯৮৫); সুবচন নাট্য সংসদের জীবন ঘষে আগুন (১৯৮৬); লোক নাট্যদলের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯১), মহাপ্রয়াণ (১৯৯৪), একাত্তরের দিনগুলো (১৯৯৫); সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর আসমান তারা শাড়ী (১৯৯১), বাজিমাৎ (১৯৯৪); কুশিলব নাট্য সম্প্রদায়ের নো ভেকেনসি (১৯৯১); নাট্যকেন্দ্রের বিচ্ছু (১৯৯১), লালসালু (১৯৯১), তুঘলোক (১৯৯২); সড়কের হ্যালুসিনেশন (১৯৯২); ঢাকা লিটল থিয়েটারের মার্চেন্ট অব ভেনিস (১৯৯৩); থিয়েটার আর্টের কোর্ট মার্শাল (১৯৯৩), কালান্তর (১৯৯৪), গোলাপজান (১৯৯৫); কণ্ঠশীলনের পুতুল খেলা (১৯৯৩), ভৃত্য রাজকতন্ত্র (১৯৯৫); ঢাকা সুবচন নাট্যদলের বিবিসাব (১৯৯৪); ঢাকা পদাতিকের ফেরা (১৯৯৪); জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের পাবলিক (১৯৯৫) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দলীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) গাইড হাউস মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে ১৯৯১-৯৩ সালের মধ্যে মঞ্চস্থ করে মানব ও প্রকৃতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ভাষা আন্দোলন, নদী পাড়ের জীবন, মাদকাশক্তি এবং স্বাধীনতা শীর্ষক মূকাভিনয়। নাটক ও মূকাভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে ভুবনমোহন নিয়োগী কর্তৃক কলকাতার বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের স্থলে) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চটি লিজ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচালনা করেন; কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই কৃষ্ণধন ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং ভূবনমোহন পুনরায় থিয়েটারটি নিজের হাতে নিয়ে পূর্বনামেই চালাতে থাকেন। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ ও উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক এখানে অভিনীত হয়। হীরকচূর্ণ নাটকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ি দেখানো হয়। পরবর্তীকালে এ মঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো: প্রকৃত বন্ধু, সরোজিনী, বিদ্যাসুন্দর, গজদানন্দ ও যুবরাজ, কর্ণাটকুমার ইত্যাদি।

গজদানন্দ ও যুবরাজ একটি কৌতুক নাটক; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) ১৮৭৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়। এতে সরকারি মহলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পুলিশ এর প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ পুলিশকে বিদ্রূপ করে *The Police of Pig and Sheep* নামে আরও একটি কৌতুক নাটক রচনা করেন এবং ১৮৭৬ সালের ১ মার্চ নাটকটি এখানে মঞ্চস্থ হয়। এর পরিণতি হিসেবে নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ঐ বছরই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। এভাবে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কারণে ভুবনমোহন সর্বস্বান্ত হয়ে থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং অন্যরাও থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। ১৮৮০ সালে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এটি ক্রয় করে গিরিশ ঘোষকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন। [জিল্লুর রহমান জন]

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা১ প্যারীমোহন বসু কর্তৃক ১৮৫৪ সালে তাঁর কলকাতাস্থ জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে এই মঞ্চে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকটি অভিনীত হয়। মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণধন দত্ত, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ প্রভাকর (৫ মে ১৮৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য

থেকে জানা যায় যে, প্রায় চারশত ভারতীয় ও ইংরেজ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা (১১ মে ১৮৫৪) নাট্যশালার নিকট বাঙালি দর্শকদের জন্য বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব দেয়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা২ ১৮৬৫ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের বিখ্যাত গোপাল উড়িয়ার যাত্রাগান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মঞ্চাভিনয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলীর সহায়তায় এ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা এবং গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবুবিলাস নাটক অভিনীত হয়। এরপর উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমাজের সমস্যা নিয়ে রচিত নাটক আহবান করে পুরস্কারসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। বিচারকদের বিচারে রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটক শ্রেষ্ঠরূপে নির্বাচিত হয় এবং নাট্যকারকে একটি রূপার থালায় ২০০ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি নাটকটি অভিনীত হয়। অক্ষয় মজুমদার, সারদা গাঙ্গুলী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এতে অভিনয় করেন। ৯ জানুয়ারি ন্যাশনাল ও ২৮ জানুয়ারি সোমপ্রকাশ পত্রিকায় উক্ত প্রযোজনার উচ্চ প্রশংসা করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালার শেষ অভিনয়। [গণেশ মুখোপাধ্যায়]

ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার জমিদার কিশোরীলাল রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৮৯৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোরীলাল প্রথমে ক্রাউন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু এক সময় এর শিল্পী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাব দেখা দিলে তিনি ক্রাউনেরই কতিপয় শিল্পী নিয়ে 'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বর্তমান লায়ন সিনেমা হলের জায়গায় এ মঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল।

ডায়মন্ড কলকাতা থেকে অভিনেত্রী এনে, প্রয়োজনে স্থানীয় বাইজিদের দিয়ে অভিনয় করাত। এ মঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো: দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরানী, বিজয় বসন্ত, আলীবাবা, নবীন তপস্বিনী, বিল্বমঙ্গল, নন্দদুলাল, তরুবালা ইত্যাদি। এর টিকেটের হার ছিল দুই টাকা, এক টাকা, আট আনা ও চার আনা। ঢাকায় পেশাদার থিয়েটার প্রচলনের পেছনে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। [জিল্লুর রহমান জন]

ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের সভ্যগণ সর্বশ্রেণীর দর্শকদের সুবিধার্থে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী এটি নির্মিত হয়। এ কারণে মঞ্চটি প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসেবে খ্যাত।

রঙ্গালয়ের টিকেট বিক্রয়ের অর্থে শুধু নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার ব্যয়টুকু নির্বাহ করাই ছিল ন্যাশনালের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে ৩৩ নং চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের মন্দির ভবনে একটি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হয় এবং মঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। কিন্তু এরূপ একটি অস্থায়ী ও যৎকিঞ্চিৎ সজ্জিত মঞ্চের 'ন্যাশনাল' নাম নিয়ে দলপতি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ সভ্যদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি দলত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব পালন করেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। প্রতিষ্ঠা বছরেরই ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম দিকে প্রতি শনিবার এখানে অভিনয় হতো; পরের দিকে সপ্তাহে দুদিনও হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র ছাড়াও শিশিরকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামনারায়ণ তর্করত্নেরও কয়েকটি নাটক ন্যাশনালে অভিনীত হয়েছে। মাঝে মাঝে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি হাস্যরসাত্মক প্যান্টোমাইম পরিবেশন করতেন। উল্লেখযোগ্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দু মুস্তফি, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হিন্দুমেলা নাটকে অভিনয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র পুনরায় এতে যোগ দেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে শেষ অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ। এর অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় এবং নতুন দলের নাম হয় 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'। সমকালীন সুলভ সমাচার, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান মিরর, ইংলিশম্যান ইত্যাদি পত্রিকায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। [গণেশ মুখোপাধ্যায়]

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ১৮৬৫ সালে (মতান্তরে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে) পুরান ঢাকায় বর্তমান জগন্নাথ কলেজের স্থানে জমিদার মোহিনীমোহন দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে কেন্দ্র করে একটি নাট্যসমাজও গড়ে উঠেছিল। ১৮৭২ সালে রামাভিষেক নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই রঙ্গমঞ্চই ঢাকায় প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যাভিনয় শুরু করে। টিকেটের হার ছিল চার, দুই ও এক টাকা, যা সময়ের বিবেচনায় ছিল অনেক বেশি। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত রামাভিষেক নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' (১৮৬১) নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে অভিনয় করত। তবে এ মঞ্চে শুধু নাটকই প্রদর্শিত হতো না, ঢাকার অধিকাংশ সভাও এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। এদিক থেকে এটি তখন টাউন হলের প্রয়োজন মিটিয়েছে। ১৮৭৩ সালে মোহিনীমোহন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, যেমন কর্ম তেমন ফল, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, ভারত মাতা ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৮৭৬ সালে নবাব আবদুল গনির আমন্ত্রণে মুম্বাই থেকে একটি দল ঢাকায় এসে হিন্দি নাটক ইন্দ্রসভা মঞ্চস্থ করে। গন্নুবাঈ, আন্নুবাঈ ও নবায়ন এই তিনবোন ইন্দ্রসভায় অভিনয় করেন। ঢাকায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম। তাঁরা যাদুনগর নামে অপর একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন। ১৮৮৪ সালে এখানে অভিনীত হয় উত্তররামচরিত। [জিল্লুর রহমান জন]

বঙ্গ নাট্যালয়১ ১৮৫৯ সালে জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টায় তাঁদের কলকাতাস্থ পাথুরিয়া ঘাটা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা বছর জুলাই মাসে কালিদাসের সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর অভিনয়ের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। পরের বছর ৭ জুলাই অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত উক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ। এরপর পাঁচ বছর এই নাট্যশালার কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন নতুন দল গঠন করে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। এরপরেই অভিনীত হয় বুঝলে কিনা ব্যঙ্গ্যনাট্য। পরবর্তীকালে অভিনীত নাটকগুলি সবই রামনারায়ণকৃত: যেমন কর্ম তেমন ফল, চক্ষুদান, মালতীমাধব, উভয়সঙ্কট ও রুক্মিণীহরণ।

বঙ্গ নাট্যালয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মদনমোহন বর্মণ, মহেন্দ্র মুখার্জী, রাধাপ্রসাদ বসাক, কৃষ্ণধন ব্যানার্জী প্রমুখ। ১৮৭২ সালে এর কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গ নাট্যালয়২ বলদেব ধর ও চুনিলাল ধরের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৬৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই মার্চ মাসে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে কলকাতার ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের (বহুবাজার) গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে এর যাত্রা শুরু হয়। উমাচারণ ঘোষ, অম্বিকা ব্যানার্জী, বিহারীলাল ধর, বলদেব ধর, আশুতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী পাঁচ বছর বঙ্গ নাট্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ১৮৭৪ সালে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রসহ কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পুনরায় এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৭ জানুয়ারি তাঁরা মনোমোহন বসুর সতী নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একই নাট্যকারের হরিশ্চন্দ্র নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এটিই ছিল বঙ্গ নাট্যালয়ের শেষ প্রযোজনা। বঙ্গ নাট্যালয়ই প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রবেশপত্র ব্যবহার করে।

বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ ১৮৫৭ সালে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো সিংহ বাড়িতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। প্রতিষ্ঠা বছর ১১ এপ্রিল ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার-এর রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বঙ্গানুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং 'ভানুমতী' নামে একটি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন। সংবাদ প্রভাকর (১৫ এপ্রিল) পত্রিকায় এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসাসহ সংবাদ পরিবেশিত হয়।

এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক কালীপ্রসন্ন অনূদিত কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় (২৪ নভেম্বর)। কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহেন্দ্রনাথ মুখার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি বিদোৎসাহিনী মঞ্চে অভিনয় করেন।

বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কলকাতার ৯ নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস লুইস-এর চৌরঙ্গীর 'লাইসিয়াম' থিয়েটারের অনুকরণে শরৎচন্দ্র থিয়েটার বাড়িটি নির্মাণ করেন। নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এটিই প্রথম।

শরৎচন্দ্র এই নাট্যশালাটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে এখানে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকটি অভিনীত হয়। তারপর সুদীর্ঘ ২৮ বছরের পথপরিক্রমায় বেঙ্গল থিয়েটার ১১০টিরও বেশি নাটক মঞ্চস্থ করে। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এই থিয়েটারেই প্রথম জগত্তারিণী, এলোকেশী, গোলাপ (সুকুমারী) এবং শ্যামা নামে চারজন মহিলা অভিনেত্রীকে নিযুক্ত করা হয়।

বেঙ্গল থিয়েটার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদসহ বহু প্রখ্যাত নাট্যকারের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক এবং ব্যঙ্গনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে। শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অমৃতলাল বসু, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মহেন্দ্রলাল বসু, এলোকেশী, গোলাপ, শ্যামা, জগত্তারিণী, কুসুম কুমারী এবং আরও অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত অভিনেত্রী বিনোদিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু করেন। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রমোদরঞ্জনী নাকটখানির অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গলী থিয়েটার প্রথম বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ মনীষী হেরাসিম লেবেদেফ কর্তৃক কলকাতার ২৫ নং ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) প্রতিষ্ঠিত হয়। লেবেদেফ তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহাতায় এটি নির্মাণ করেন। তিনি দি ডিসগাইজ ও লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামক দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। গোলকনাথের প্রস্তাবে দি ডিসগাইজ-এর বাংলা অনুবাদ কাল্পনিক সংবদল মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে ক্যালকাটা গেজেট-এর ২৬ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, টিকিট বিক্রির হার ছিল এরূপ: বক্স ও পিট- ৮ টাকা এবং গ্যালারি- ৪ টাকা। পরের দিন ২৭ নভেম্বর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বেঙ্গলী থিয়েটারে শেষ নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। এদিন বিশেষ আসনের মূল্য ছিল এক স্বর্ণমুদ্রা। বেঙ্গলী থিয়েটারে সপ্তাহে মাত্র দুটি প্রদর্শনী হতো। উল্লেখ্য যে, লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারই প্রথম এশীয় ভাষায় প্রসেনিয়াম থিয়েটার-রীতি প্রয়োগ করে।

বেলগাছিয়া থিয়েটার ১৮৫৮ সালে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁদের বেলগাছিয়া ভিলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রমোহ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরদাস বসাক ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই

থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছর ৩১ জুলাই রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত সংস্কৃত নাটক রত্নাবলী-র বঙ্গানুবাদ মঞ্চায়নের মাধ্যমে বেলগাছিয়া থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার্থে মধুসূদন ইংরেজিতে নাটকের সারাংশ লিখে দেন।

পরের বছর ৩ সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয় মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক। প্রিয়নাথ দত্ত, হেমচন্দ্র মুখার্জী, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অভিনেতা মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম ভারতীয় ঐকতান বাদন ব্যবহৃত হয়; এতে নেতৃত্ব দেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল। তৎকালীন সংবাদ প্রভাকর ও হিন্দু পত্রিকায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। [গণেশ মুখোপাধ্যায়]

মহিলা সমিতি মিলনায়তন ঢাকার বেইলী রোডে অবস্থিত। এর মঞ্চটি সাধারণভাবে 'মহিলা সমিতি মঞ্চ' নামে পরিচিত এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে এটি ঢাকার নাট্যচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রুপ থিয়েটার-চর্চাভিত্তিক নাট্যমঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন নাট্যদল নিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে। ঢাকায় নাটকের দর্শক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মঞ্চে প্রদর্শিত নাট্যসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, যদিও নাট্যমঞ্চায়নের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। এ মঞ্চে নাট্যপ্রদর্শনী ব্যতীত অন্য কোন সভা-সমাবেশ কিংবা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয় না বললেই চলে।

১৯৭৩ সালে এ মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় বার্নাড শ' রচিত এবং ড্রামা সার্কল প্রযোজিত দান্তের মৃত্যু নাটকটি। এই দলের পরবর্তী দুটি প্রযোজনা হলো মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান (১৯৮০) এবং বিজয় তেন্ডুলকারের চুপ আদালত চলছে (১৯৮৪)। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ১৯৭৩ সালে মঞ্চস্থ করে বিদগ্ধ রমণীকুল, তৈল সংকট, ক্রস পারপাস ও নিষিদ্ধ পল্লীতে। এভাবে আরণ্যক নাট্যদল, ঢাকা থিয়েটার, নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা পদাতিক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (নাটক বিভাগ), বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, লোকনাট্যদল, ঢাকা লিটল থিয়েটার, সড়ক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, লায়ন থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম মূকাভিনয় দল ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) মহিলা সমিতি মঞ্চে ১৯৯০ সালে প্রদর্শন করে বখাটে ছেলের পরিণতি, বালক ও পাখি, জেলে, প্রেম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক মূকাভিনয়। ঢাকাভিত্তিক নাট্যদল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি নাট্যদল, একাধিক ভারতীয় নাট্যদল এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আই.টি.আই), বাংলাদেশ কেন্দ্র আয়োজিত উৎসবে আগত বিদেশি কয়েকটি নাট্য সংগঠনের নাটকও এই মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট ১৯৫০ সালে পুরনো ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ বিজয়া-র প্রদর্শনী দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক জবানবন্দি মঞ্চস্থ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ। ১৯৫২ সালে মঞ্চস্থ হয় সিকান্দার আবু জাফরের ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দৌলা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডক্টরস ক্লাব ও কলেজ ছাত্র-সংসদ যথাক্রমে মানময়ী গার্লস স্কুল ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর এবং অগ্রদূত নাট্যসংঘ বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর মঞ্চস্থ করে। নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি এ মঞ্চে অন্যান্য সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।

মিনার্ভা থিয়েটার ১৮৯৩ সালে কলকাতার ৬ নং বিডন স্ট্রিটস্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই ২৮ জানুয়ারি নগেন্দ্রভূষণ মুখার্জীর অর্থানুকূল্যে গিরিশচন্দ্র অনূদিত শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর

যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য নাট্যকার রচিত প্রায় ৬০খানা নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনায় ১৯২২ সাল পর্যন্ত এটি পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে মিনার্ভায় বিভিন্ন ধরনের পঞ্চাশোর্ধ্ব নাটক অভিনীত হয়। ১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে মিনার্ভা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

১৯২৫ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে মিনার্ভা পুনর্নির্মিত হয় এবং ৮ আগস্ট মহাতাপচন্দ্র ঘোষের আত্মদর্শন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা পরিচালনা করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর হেমেন্দ্র মজুমদার, দিলোয়ার হোসেন, চন্ডীচরণ ব্যানার্জী, এল.সি গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার প্রমুখ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে মিনার্ভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন।

১৯৫৯ সালে শম্ভু মিত্র মিনার্ভায় নাট্য প্রযোজনা করেন। ঐ বছর জুন মাসে উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে নিয়মিতভাবে পেশাদারি ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা শুরু করলে মিনার্ভা থিয়েটারের আমূল পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ এক দশক উৎপল দত্ত অনূদিত ও পরিচালিত শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকসহ ছায়ানট, নীচের মহল, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, ভি-আই-পি, তিতাস একটি নদীর নাম, কল্লোল, মানুষের অধিকার প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৮ সালে লিটল থিয়েটারের প্রস্থানের পর মিনার্ভায় এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়; তবে অদ্যাবধি থিয়েটারের ভগ্নপ্রায় বাড়িটি উনিশ শতকের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

মেট্রোপলিটন থিয়েটার হিন্দু 'বিধবা বিবাহ' প্রথা প্রচলনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার মানসে ১৮৫৯ সালে মুরলীধর সেন কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত বক্তা ও সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন, ধর্মীয় নেতা রেভারেন্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৩ এপ্রিল কলকাতার চিৎপুর সিঁদুরিয়া পট্টির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে উমেশচন্দ্র সেনের নাটক বিধবা বিবাহ মঞ্চায়নের মাধ্যমে এটি উদ্বোধিত হয়। বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অক্ষয় মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কুঞ্জবিহারী সেন প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। অভিনয় পরিচালনা করেন কেশবচন্দ্র সেন এবং দৃশ্যপট অঙ্কন করেন ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী মি.হল বাইন। সংবাদ প্রভাকর (১৪ মে) পত্রিকায় এ অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

রঙমহল থিয়েটার ১৯৩১ সালে কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) রবীন্দ্রনাথ রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ও রবি রায় পরিচালকের এবং অমর ঘোষ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ষষ্ঠী গাঙ্গুলী, নির্মলচন্দ্র, এস আহমেদ, ডি.এন ধর, হরচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দে প্রমুখ মিলে রঙমহল থিয়েটারকে একটি যৌথ কোম্পানির চরিত্র দান করেন।

প্রতিষ্ঠা বছরের ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে রঙমহল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী এর পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯৩২ সালের ১৭ জানুয়ারি রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় বিজয়িনী নাটক; ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের বনের পাখি এবং ২৫ জুন উৎপলেন্দু সেনের সিন্ধুগৌরব। বনের পাখি নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাটকে অভিনয় করেন রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, চারুবালা, শশীবালা, শেফালিকা, সরযূবালা দেবী প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই সেকালের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল অভিনীত হয় অনুরূপা দেবীর

উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক মহানিশা। এ নাটকটিও জনপ্রিয় হয় এবং এতেই সতু সেনের প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতায় প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

এরপর বহু ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে রঙমহল থিয়েটার অগ্রসর হয়। থিয়েটারের মালিকানাও পরিবর্তিত হয় এবং অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিবর্তন ঘটে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষয়ক নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। কোন কোন নাটক (যেমন উল্কা) একাদিক্রমে ৫০০ রজনী অভিনীত হয়ে বাংলা থিয়েটারে সাড়া জাগিয়েছে। পরবর্তীকালে এই মঞ্চে যাঁরা নাট্য পরিচালনা করেন কিংবা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) প্রমুখ। মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো: শতবর্ষ আগে, কবি, দুই পুরুষ, মায়ামৃগ, একমুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফি, সাহেব বিবি গোলাম, অনর্থ, চক্র ইত্যাদি। ১৯৭৫ সাল থেকে ক্যাবারে নৃত্য চালু হলে রঙমহলের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়; রুচিবান অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রঙমহল ত্যাগ করেন এবং এর ব্যবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রঙমহল থিয়েটার এখনও টিকে আছে।

লায়ন থিয়েটার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ শতকের প্রথম দিকে মীর্জা আবদুল কাদের ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার ক্রয় করে এর নতুন নামকরণ করেন লায়ন থিয়েটার। এখানে বাংলা নাটকের পাশাপাশি উর্দু নাটকও মঞ্চস্থ হতো। উর্দু নাটকগুলির মধ্যে ছিল জালমা ও পারাস্তা, বুলবুল এ বিমার ইত্যাদি। ঢাকার নাট্যকার যোগেন গুপ্তের চিড়িয়াখানা এবং বিপিন বিহারী চামের লাঞ্ছনা নামক দুটি প্রহসনও এখানে মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে ঢাকায় ফিল্মের আবির্ভাব হলে লায়ন থিয়েটারে নাটক প্রদর্শন বন্ধ করে 'লায়ন সিনেমা' নামে এটিকে প্রেক্ষাগৃহে পরিণত করা হয় এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়।

স্টার থিয়েটার১ ১৮৮৩ সালে কলকাতার ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান বিডন স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর সংযোগস্থল) প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। গুর্মুখ রায় নামে জনৈক অবাঙালি যুবক থিয়েটারে অর্থলগ্নী করেন। তিনি সুন্দরী নটী বিনোদিনীর নামানুসারে 'বি' থিয়েটার নামকরণের শর্ত আরোপ করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত 'স্টার' থিয়েটার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা বছর ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে গুর্মুখ রায় থিয়েটার বিক্রি করে দিলে অমৃতলাল বসু, দাসু নিয়োগী ও হরি বোস এটি ক্রয় করেন এবং ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে পরিচালনা করেন। এরপর স্টার থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

স্টার থিয়েটারে মোট ২০খানি নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং সেসবের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমৃত মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পি। একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধর্মীয় নাটক চৈতন্যলীলা দেখতে এসে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ১৮৮৭ সালের ৩১ জুলাই স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

স্টার থিয়েটার২ ১৮৮৮ সালে কলকাতার হাতিবাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ভেঙ্গে যাওয়ার পর মূলত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মীদের উদ্যোগেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মদাস সুর এবং ইঞ্জিনিয়ার যোগেন গুপ্তের নকশা অনুযায়ী থিয়েটার হাউস ও তার মঞ্চ নির্মিত হয়। এক সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষও এর সঙ্গে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৫ মে 'সেবক' ছদ্মনামে গিরিশ ঘোষ রচিত নসীরাম নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে নবনির্মিত হাতিবাগান স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

১৯৮৮ সালে স্টার থিয়েটার তার গৌরবের একশ বছর পূর্ণ করে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বহুবার স্টারের মালিকানা পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার ও আধুনিকীকরণও হয়েছে। শেষদিকে এর মঞ্চটি ছিল ঘূর্ণায়মান। গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্তসহ ৮০ জনেরও বেশি

নাট্যকারের প্রায় ২৫০টি বাংলা নাটক এ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। হিন্দি নাটক অভিনীত হয়েছে ১২টিরও বেশি। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, গঙ্গামণি, কাদম্বিনী, অমর দত্ত, দানীবাবু, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, অপরেশচন্দ্র, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা, সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী স্টারে অভিনয় করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯১ সালের ১৬ অক্টোবর এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ঐতিহ্যমন্ডিত এ থিয়েটার হাউসটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হিন্দু থিয়েটার ১৮৩১ সালে কলকাতার প্রান্তে শুঁড়ো-নারিকেলভাঙ্গায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও এ মঞ্চে কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয় নি। প্রতিষ্ঠা বছর ২৮ ডিসেম্বর শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং ভবভূতির সংস্কৃত নাটক উত্তররামচরিতম্-এর প্রথম অঙ্কের ইংরেজি অনুবাদ অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। গঙ্গাচরণ সেন, রামচন্দ্র মিত্র, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩২ সালের ২৯ মার্চ নাথিং সুপারফ্লুয়াস নামে একখানি ইংরেজি প্রহসন অভিনীত হওয়ার পর হিন্দু থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এটি বাঙালি দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে নি।

৮.১.৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ কে নির্মাণ করেন?

২। নটী বিনোদিনী কোন নাট্যশালার উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত ছিল?

৩। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত দুটি নাটকের নাম লেখো।

৪। 'বাংলাত গ্যারিক' কাকে বলা হয়?

৫। বাংলা নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৮.১.৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ : অজিতকুমার ঘোষ
২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস(১৭৯৫-১৮৭৬) – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাষ – আলপনা রায় (সম্পাদিত)
৪।বাংলা নাট্যের প্রবাদ পুরুষ : শম্ভু মিত্র
৫। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড): আশুতোষ ভট্টাচার্য
৬।বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব – জগন্নাথ ঘোষ
৭। বাংলা রঙ্গমঞ্চের রূপরেখা: অশোককুমার মিশ্র

বাংলা (এম.এ), চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২

একক ঃ ৪ - মঞ্চস্থাপত্য, আলোকসম্পাত

বিন্যাসক্রমঃ

৮.২.৪.১ ঃ ভূমিকা

৮.২.৪.২ ঃ মঞ্চস্থাপত্য

৮.২.৪.৩ ঃ আলোক সম্পাত

৮.২.৪.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৪.১ ঃ ভূমিকা

নাটক হল একটি মিশ্র শিল্প, যাকে 'অনুকরণ' শিল্পও বলা হয়। 'অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি।' নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে, দেখা যাবে অনেকদিন আগে থেকেই নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছে। আচার্য ভরত 'নাট্যশাস্ত্রের' প্রথম অধ্যায়ে নাটককে 'পঞ্চমবেদ' রূপে স্বীকার করেছেন। নাটকের বই শুধু পাঠ্য হিসেবেই নির্বাচিত হয়নি, এর সাফল্য নির্ভর করে অভিনয়ের মাধ্যমে। আর নাটকের অভিনয় সাফল্য লাভ করে নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক ও দর্শকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বাংলা নাটকের উদ্ভবের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথমে সংস্কৃত নাটক পরে ইংরেজি নাটক অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ''১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে মধুসূদন বাংলা নাটক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং নিজেই নাটক রচনার সিদ্ধান্ত করলেন।'' পৃ. ৩০২ (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

অপরদিকে মৌলিক নাটক লেখার প্রস্তুতিপর্বে বাঙালি নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিলেন পাশ্চাত্যের নাট্যকারেরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - শেক্সপীয়র, মোলিয়ার, ইবসেন প্রমুখ প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব। এদের পরবর্তীকালে বাঙালি নাট্যকাররা ব্রেখ্‌ট্‌ এর রীতি-নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ব্রেখটীয় রীতির প্রভাবই বর্তমানে

সর্বাপেক্ষা প্রধান। সেজন্য মূকাভিনয়, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার, কোরাস, ছড়া ও গানের প্রয়োগ নাটকের অভিনয়ের সময় দেখানো হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাশালী নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) প্রমুখ।

৮.২.৪.২ ঃ মঞ্চস্থাপত্য

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চস্থাপত্যের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে মঞ্চসজ্জাকে বাদ দিয়ে মঞ্চস্থাপত্য করতে গেলে নাটকের অভিনয়ের রসহানি ঘটে। মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দৃশ্য সাজানো হয়ে থাকে। নাটকের অভিনয়ের জন্য নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক ও দর্শক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন আলোকসম্পাত, আবহরচনা, মঞ্চসজ্জার মতো মঞ্চস্থাপত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে আচার্য ভরত বলেছেন -" এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প, কলা, যোগ, বিদ্যা ও কর্ম নেই - যা নাটকে মেলে না।" 'নাট্যতত্ত্ব বিচার' গ্রন্থে, ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় বলেছেন - "রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে তার অভিনয়ের প্রয়োজন। মঞ্চে প্রযোজকের সুষ্ঠু পরিচালনায় নটনটীদের উপযুক্ত সাজসজ্জায়, অভিনয় দক্ষতায়, যথোচিত আলোকসম্পাতে এবং দর্শকদের উন্নতরুচি ও ভাবগ্রহিতার সামর্থে নাটক মঞ্চ সফলতা লাভ করে ।" (পৃ. ১৯)

নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে মঞ্চস্থাপত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাট্য নির্দেশক একটি ভালো নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করলে, সেই নাটকের অভিনয় দেখে দর্শক সমাজ উজ্জীবিত হয়েছে। আচার্য ভরতের কথায় "নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য, সেইজন্য তার সাহিত্যিক মূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ।" উপন্যাস লেখার সময় লেখক কতকগুলি চরিত্রকে নির্বাচন করে নেন। তারপর সেই চরিত্রগুলি ঘটনার সম্মুখীন হয়ে, নিজের কাজটুকু করে যায়। কিন্তু উপন্যাসের মতো নাটকের চরিত্রের বিস্তারের কোন সুযোগ নেই। যত কম কথা বলা যায়, নাটকে ততই মঙ্গল। তাই নাট্যকারকে সুচিন্তিতভাবে, সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকে চরিত্রের উপযোগী সংলাপ ব্যবহার করতে হয়। নাট্যকার মঞ্চের চিত্র কল্পনা করেই চরিত্র চিত্রণ করেন, সে অনুযায়ী সংলাপ দেন। 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - "নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথম জীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ে বেশ আদৃত হয়েছিলেন তাঁর 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) এবং 'রাজা বসন্ত রায়' (বউ ঠাকুরানীর হাট, উপন্যাসের) নাট্যরূপ এর জন্য। তখন তিনি এই মঞ্চের উপযোগী নাটক রচনায় ব্রতী ছিলেন। পরে শান্তিনিকেতন পর্ব থেকে তাঁর যে নতুন নাট্যভাবনা ও নাটক রচনার শুরু সেখানেও তাঁর নিজস্ব থিয়েটারভাবনা ও মঞ্চভাবনা কার্যকরী হয়েছে।" (পৃ. ২১) সর্বোপরি মঞ্চের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর অনেক নাটকের সংশোধন ও পরিবর্তন করেছেন। দৃশ্যপট, গান, চরিত্রসৃষ্টি কেটে-ছেঁটে নতুন করে মঞ্চের উপযোগী করে রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রথম

দিকের লেখা 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯ খ্রি) নাটকের পরিবর্তন চেয়ে ১৯২৯ খ্রি রূপান্তর করলেন 'তপতী' নাটকের। মঞ্চোপযোগী ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পরিবর্তন করেছেন। দৃশ্যপট, সাজসজ্জার, আড়ম্বরপূর্ণ 'রাজা ও রানী' সব বৈভব হারিয়ে এখানে 'তপতী'তে রূপান্তরিত। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে নাট্যসম্প্রদায় দ্বারা অভিনয়ের জন্যই লিখিত।

নাটকের মঞ্চস্থাপত্যের যাতে কোন ত্রুটি না থাকে সেদিকটিও নাট্যনির্দেশক খেয়াল রাখেন। তবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্য নির্দেশক মঞ্চস্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্টের পরিবর্তন করেন। আর তা তিনি করে থাকেন শুধুমাত্র অভিনয় উপযোগী করে তোলার জন্য। আবার একথাও গ্রহণযোগ্য যে, কোন দুর্বল নাটক নাট্য নির্দেশক ও নাটকের কলা-কুশীলবের কৃতিত্বে মঞ্চ সফল হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মঞ্চস্থাপত্যের দুর্বলতার কারণে উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ও দর্শকদের সামনে ভালো নাও লাগতে পারে। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ বিশিষ্ট নাটকগুলির অভিনয় কলা-কুশীলবদের কাছে দুরূহ বিষয় ছিল। তেমনি সেই অভিনয় দেখার দর্শকসংখ্যাও ছিল সীমিত। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মঞ্চস্থাপত্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে শান্তিনিকেতনে নাটকগুলির অভিনয় করতে গিয়ে, সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী সাদামাটা মঞ্চ, এমনকী খোলামঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইজন্য নাট্য নির্দেশক উপকরণের অভাবে মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণে অনেককিছুই পরিবর্তন করতে পারেন। 'নাট্যতত্ত্ব বিচার' গ্রন্থে, ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় বলেছেন - ''নাট্যকার যে রূপে নাটককে বাইরে প্রকাশিত করেন, পরিচালক বা প্রযোজক অভিনয়ের সুবিধের জন্য তার অনেকখানি অদল-বদল করেন। নাট্যকার কল্পনায় নাটকের দৃশ্যগুলির যে রূপ মনের মধ্যে দেখেন, তারই বাস্তবরূপ মঞ্চে দিতে গিয়ে, তথা মঞ্চের মধ্যে অভিনয়ের নৈপুণ্যে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রযোজককে কিছু কাটছাঁট করতেই হয়েছে। আর অভিনয় চলাকালে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন নাট্যকার নয়, নাট্যপ্রযোজকই।'' (পৃ. ২০)

বাংলা নাটকের নাট্যমঞ্চকে নানাভাবে আধুনিক করার চেষ্টা করেছেন - শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরী, সতু সেন প্রমুখ নাট্য নির্দেশকগন। তাঁদের সৃজনশীল মনোভাবের ঐকান্তিকতায় মঞ্চস্থাপত্য নতুন আলোয় আলোকিত হয়েছে। মঞ্চপরিকল্পনা বা মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে তাঁদের উদ্ভাবনী কৌশল এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর পেছনে অবশ্য তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম দর্শক সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। সারাজীবন ধরে নতুন কিছু করার মানসিকতা নিয়ে চিত্রকলা, রেখাচিত্র ও লোকসংগীতের গভীরে এরা মনোনিবেশ করেছেন। নাটকের মঞ্চস্থাপত্যের নির্মাণে তাঁদের সবুজ মানসিকতা নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে নাটকের যে বৈচিত্র ও বহুত্ব আছে; তাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

আজকে একবিংশ শতাব্দীতে হোয়াটস্‌অ্যাপ, ফেসবুকের যুগে নতুন মঞ্চস্থাপত্যের লক্ষ্যে নাট্যনির্দেশকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকের নাটকে শান্ত ও আনন্দময় পল্লীজীবনের রূপ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সংঘাত মুখর নাগরিক জীবনপথে, বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত বস্তিতে এখন নাটকের ঘটনা চলিতে আরম্ভ করেছে। ভারতবর্ষের দেশজ উপাদানের দিকে যেমন নজর দিতে হবে, তেমন পাশ্চাত্য নাট্যচর্চাকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে মঞ্চস্থাপত্যের ভাবনায় নতুন দৃষ্টিকোন, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ খুবই জরুরি। পৃথিবীতে কেবল বহু সমস্যা আছে, সংকটপূর্ণ জীবন আছে তাহা নহে, সেইসঙ্গে জীবনের সুন্দর ও কোমল দিকের প্রয়োজনীয়তা আছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, সেগুলিকে থিয়েটারের আলোয় নিয়ে আসতে পারলে একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের মঞ্চস্থাপত্য নতুনমাত্রা পাবে বলে আমি মনে করি। লোকনাট্য বা ট্রাইবাল থিয়েটার মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণে এখনও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে সেইদিকটিকে নাট্যনির্দেশককে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ রোমান্টিক স্বপ্নই মানুষকে আদর্শলাভের পথে সংগ্রামের পথে, আত্মত্যাগের পথে নিয়ে গেছে। জীবনে বাঁচার জন্য সত্যপথই যে আসল পথ তা সাধারণ মানুষকে মেনে নিতে হবে। সর্বপ্রথমে ট্রাইবাল থিয়েটার, ক্লাসিক্যাল থিয়েটার, ট্রাডিশনাল থিয়েটার, ফোক থিয়েটার হয়ে বিবর্তিত হয়ে আজকের আলট্রা-মর্ডান থিয়েটার। নাট্য মঞ্চস্থাপত্যের বিবর্তনে নতুন করে মঞ্চস্থাপত্য গড়ার দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে তা জোর দিয়েই বলা যায়। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের উপর গুরুত্ব না দিয়ে আঙ্গিকের নূতনত্ব ও মঞ্চ - প্রয়োগ শিল্পের উপর নির্ভরতা দেখাইতেছেন। নাট্যকারদের নাটকে কাহিনী ও চরিত্রের এমন প্রবল শক্তি থাকে না যাতে দর্শক তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিবে। সেজন্য দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মঞ্চস্থাপত্যের বহু প্রকার ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া শুরু হয়েছে।

৮.২.৪.৩ ঃ আলোকসম্পাত

নাটক সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। এই শিল্প মাধ্যমকে মিশ্র শিল্প বা Mixed Art বলা হয়। নাট্যকার, নাটকের, পাত্র-পাত্রী, নাট্যমঞ্চ ও মঞ্চকর্মী, দর্শক, আলোকসম্পাত, পোশাক, রূপসজ্জা, আবহ- সব উপাদানের যৌথ প্রচেষ্টায় নাট্য প্রযোজনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে কোনো একটি উপাদান দর্শকদের কাছে প্রাধান্য পেলে নাটকের সামগ্রিক প্রযোজনার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। নাটকের অভিনয়ের সময় নাট্যনির্দেশককে তা খেয়াল রাখতে হয়। নাটকের অভিনয় সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফসল বলে কোন একটি উপাদানের গুরুত্ব এখানে অর্থহীন। সেইজন্য মঞ্চ পরিকল্পনা এককভাবে কখনই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। উপন্যাস একাকী আমরা পড়তে পারি, কবিতাও নিজে পড়া যায়; সহৃদয় সামাজিক হয়ে কাব্যরস উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু নাটক ও পাঠ করা যায় তবে যৌথ শিল্প বলে অভিনয় না হলে নাটকের গুরুত্ব থাকে না। মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নাটকে আলো যে

কথা বলে, নাটকের গতির সঙ্গে এগিয়ে যায়, সেটি উপলব্ধি করার বিষয়। আলোক সম্পাত অন্যান্য উপাদানের মতো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে মধ্যে নাটকের কুশীলবেরা সংলাপ বলেছে। নাট্য অভিনেতাদের সুমধুর কণ্ঠস্বর দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - ''সে যুগে যেমন আলোর ব্যবস্থা সেইরকম উপকরণ দিয়ে মঞ্চকে আলোকিত করা হয়। প্রথমে হত খোলা আকাশে প্রকাশ্য সূর্যের আলোতে দিনের বেলায়। পরে আলোক প্রাপ্তির বিভিন্ন টেকনোলজির আবিস্কার ও বিবর্তনের ফলে ঘেরা মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা করা হতে থাকল এবং রাতের বেলায়ও অভিনয় চালু হলো। মশাল, তেল বা গ্যাসের আলো থেকে বিদ্যুতের আলো মঞ্চে এসে গেল। '' (পৃ. ৪৬)

বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চস্থাপত্য ও আলোকসম্পাত এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্যব্যক্তিত্ব সতু সেন (১৯০২-১৯৭১) বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে মঞ্চরীতি ও আলোর যে প্রচলন ছিল, সতু সেন বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে এসে তার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন পদ্ধতির বিলোপ করে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির (১৮৮৯-১৯৫৯) সঙ্গে বাংলার রঙ্গালয়ে শিল্প নির্দেশনা ও আলোক সম্পাতের কাজ শুরু করেছিলেন। '' তিনি কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসন ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-ধূপের গন্ধ, পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোক সম্পাত এবং সীনের পরিবর্তে বক্স সেট প্রয়োগ করেন।'' সেইজন্য শিশির কুমার ভাদুড়িকে, অমৃতলাল বসু বলেছিলেন - থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক। ১৯৩০ খ্রিঃ শিশির কুমার নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। অপর নাট্যব্যক্তিত্ব সতু সেন ১৯৩৩ খ্রিঃ 'রঙমহল' থিয়েটারে ভারতের প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে, ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন - ''আলোকসম্পাতের যে নূতন বিস্ময়কর লীলা বর্তমানে দেখা যাইতেছে তাহার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ প্রথমত অপেশাদার অভিনয়েই দেখা গিয়াছে। বর্তমান কালের যুগান্তকারী আলোক নিয়ন্ত্রণ শিল্পী তাপস সেনের উদ্ভব হইয়াছে এই অপেশাদার নাট্যজগৎ হইতেই - ইহা মনে রাখিতে হইবে। চলচ্চিত্রের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চে সাদা পর্দা স্থাপন করিয়া তাহার উপর বিচিত্র আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করা বর্তমানে তো একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'' (পৃ. ৪৮৭) থিয়েটারে নতুন আলো প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তাপস সেন বলেছেন - ''শিশির কুমার পেশাদারি মঞ্চে তুলসী লাহিড়ির 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চায়িত করে প্রকারান্তরে 'নবান্ন'র গুরুত্বকেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু 'নবান্ন'-র প্রথম সাড়ার পর একটা সাময়িক বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তার কাল এসে পড়ে।'' আমরা সকলেই জানি ১৯৪৮খ্রিঃ শ্রী শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। শম্ভু মিত্র নতুন পথে, নতুন উদ্যোগ নাট্যদল তৈরি করেছেন। তবে '' নবান্ন'র পর আলোর পরিমিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়োগ এবং মঞ্চসজ্জার সুচিন্তিত, স্বল্প উপকরণে রচিত, অর্থব্যঞ্জক

ব্যবহার প্রথম দেখা গেল নাট্যচক্র প্রযোজিত এই 'নীলদর্পণ' নাটকে। তারপরই 'বহুরূপী'র নতুন নাট্য প্রয়াসের পর্ব।'' (পৃ. ১২৫) 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'ছেঁড়াতার', 'পথিক', 'উলুখাগড়া' নাটকের অভিনয়ের সময় সাদা আলোর মাত্রাভেদ বিভিন্ন কোন থেকে প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছিল। ''আলোর বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুযোগ তখন সীমিত ছিল। অথচ 'ছেঁড়াতার' নাটকে স্পট্‌লাইটের নির্বাচনী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় - রহিমুদ্দিন ও ফুলজানের বলিষ্ঠ অভিনয়কে আরো তীব্র করে তোলার কাজে 'স্পট ' ও 'ডিমার' এর সুপ্রযুক্ত ব্যবহার দেখা যায়।'' পৃ. ১২৬ (জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপ ও রেখা' - সুনীল দত্ত রচিত গ্রন্থে থিয়েটারের নতুন আলো - তাপস সেন)। ১৯৪৯ খ্রিঃ রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটক এর অভিনয় হয়েছে। 'পথিক' নাটকের অভিনয় সফল প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ নাটকের আলোক সম্পাত ছিল তাপস সেন মহাশয়ের। সামান্য উপকরণে কী করে অসামান্য আলোক সম্পাত নাট্যমঞ্চে ভালোলাগা হতে পারে, যা শ্রদ্ধেয় তাপস সেন দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় বিশ শতকের চারের দশকে ভারতবর্ষের জনজীবনে তখন সর্বত্রই সংকট লক্ষ্য করা গেছে। কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ১৯৪২ খ্রিঃ আগষ্ট আন্দোলরে পর ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের তথা বাংলার সমাজ অর্থনীতি-সংস্কৃতি একেবারে বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় শ্রী শম্ভু মিত্রের নির্দেশে 'বহুরূপী' নাট্যদলের 'চারঅধ্যায়' নাটকে আলোর এই ডাইনামিক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শম্ভু মিত্র ও তাঁর অভিজ্ঞতায় এবং উপলব্ধিতে এই সংকটের কথা স্বীকার করেছেন। সেই পরিস্থিতিতে ১৯৫১ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে 'চারঅধ্যায়' এর মঞ্চায়নে ডাইনামিক আলোর পরিবেশ ও শব্দের প্রয়োগ এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। সেইজন্য 'চারঅধ্যায়' এর মঞ্চায়নে আলোক পরিকল্পনা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর 'রক্তকরবী' মঞ্চায়ন প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠেছে। শম্ভু মিত্র নিজের প্রচেষ্টায় সমস্ত অভিনেতাদের যেমন তৈরি করে নিয়েছেন, তেমনি রীন্দ্র নাটকের ভাষা অন্য সমস্ত নাটকের ভাষার চেয়ে আলাদা। তবু সে কঠিন কাজকে অভিনেতারা রপ্ত করেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন খালেদ চৌধুরি মহাশয়। তাঁর নিপুণ দক্ষতায়, একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় মঞ্চে এতগুলো ঢোকবার - বেরোবার পথ রেখেছিলেন, যা পূর্বে কেউ কল্পনা করেননি। আর সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল 'রক্তকরবীর' মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত। 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণ প্রশংসা করেছিলেন। 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত সহ প্রতিটি উপাদানের যৌথ প্রচেষ্টায় তা সার্থকতা লাভ করেছে। আর 'রক্তকরবী' নাটকের আলোর পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় তাপস সেন মহাশয়। তাঁরই ভাষায় বলা যায়, 'খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জায় লাল রঙ, মার্বেল পাথর ও মকর দাঁতের ব্যবহার এবং আলোর নিত্যপরিবর্তনশীল

প্রয়োগকলায় বিভিন্ন রঙের আলো নানা কোন থেকে প্রক্ষেপন, 'ডিমার' এর সাহায্যে আলোর এক প্যাটার্ন থেকে অন্য প্যাটার্নে যথাসম্ভব সুকৌশলে ও ধীরে দর্শকদের চোখের অলক্ষ্যে মিশে যাওয়া, কখনও 'গ্লাইড্' করে, কখনও আচমকা নাটকের দৃশ্যান্তরে যাওয়া, নেপথ্যে রাজার অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে জালের দরজার উপরে দুটি লাল আলো জ্বলে ওঠা'' নাটকের অভিনয়কে অসাধ্যসাধন করেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের আলোক-পরিকল্পনার দৃশ্য দেখে সেই সময়ের দর্শক মুগ্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে 'পুতুলখেলা' 'ক্ষুধা', ও 'সেতু' নাটকের মঞ্চায়নে তাপস সেনের আলোকসম্পাত দর্শকদের মনোরঞ্জনের গতিশীলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দৃশ্যসজ্জা ও ভাবপরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি আলোক সম্পাত করা হয়, তাহলে নাটকের আবেদন যে কী গভীর হয় তা লিটল্ থিয়েটারের 'ফেরারী ফৌজে' মিতালী সম্মিলনীর 'নীলদর্পণ' স্টীল কন্ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতির অভিনয় দেখলে বোঝা যায়।

নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন - '' থিয়েটারে যে কাব্য তৈরি হয়, তার ভাষা আর কাব্যের ভাষা এক নয়। নাট্যপ্রযোজনায় কাব্য তৈরি হয় তার ছন্দ- বন্ধনে। তার চরিত্রের চলাফেরায়, তাদের পোশাকের রঙে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণে তৈরি হয়ে ওঠা Orchestration এ আবার নৈঃশব্দের ব্যবহারে । তার সঙ্গে মঞ্চসজ্জার ব্যবহৃত আকার, তার রঙ, তার ভারসাম্য। আর একই সঙ্গে তার আলোর ব্যবহারে। সেই আলোর কমা-বাড়ায়,তার রঙে। '' পৃ. ৫৭ (গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র- শাঁওলী মিত্র). সবশেষে বলা যায় নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে আলোকসম্পাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাটকের মঞ্চায়নে আলোকসম্পাত এক অনন্য মাত্রা যোগ করে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

৮.২.৪.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চস্থাপত্যের স্থান নির্নয় করো।

২। থিয়েটারের আলোক সম্পাত বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

৮.২.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। নাট্যতত্ত্ব বিচার - ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - ড. দর্শন চৌধুরী

৩। জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপ ও রেখা - সুনীল দত্ত

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড. অজিত কুমার ঘোষ

৫। নাটক লেখার মূল সূত্র - ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৬। গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র - শাঁওলী মিত্র

বাংলা (এম.এ), চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২

একক ঃ ৫ - মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা

বিন্যাসক্রমঃ

৮.২.৫.১ ঃ ভূমিকা

৮.২.৫.২ ঃ মঞ্চসজ্জা

৮.২.৫.৩ ঃ রূপসজ্জা

৮.২.৫.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৫.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৫.১ ঃ ভূমিকা

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। নাটকের অভিনয়ের জন্য মঞ্চ যে কতখানি স্থান দখল করে আছে, তা মনে রাখা প্রয়োজন। মঞ্চসজ্জায় নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দৃশ্য সাজানো হয়। ''খোলা যাত্রার বা পুরানো সংস্কৃত নাটকের অভিনয়কলার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে পাশ্চাত্য মঞ্চব্যবস্থা ও তদনুযায়ী বিদেশি নাট্যকলা সম্পর্কে প্রথমাবধি বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'' (পৃ.২৭২, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস-ক্ষেত্রগুপ্ত) ইংরেজরা কলকাতায় ১৭৫৩ খ্রিঃ 'ওল্ড প্লে হাউস' নামে প্রথম রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তারপর ইংরেজদের পরিচালনায় অনেকগুলি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলি হল - ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৫ খ্রিঃ), মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (১৭৮৯ খ্রিঃ), হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (১৭৭৯ খ্রি), এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮০৮খ্রিঃ) চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩ খ্রিঃ) দমদম থিয়েটার (১৮১৭ খ্রিঃ), বৈঠকখানা থিয়েটার (১৮২৪ খ্রিঃ), সাঁসুসি থিয়েটার (১৮৩৯ খ্রিঃ) প্রভৃতি প্রবাসী ইংরেজদের এবং ইংরেজি জানা বাঙালিদের মনোরঞ্জন করে এসেছে। তবে এই সব রঙ্গালয়ে সাধারণ বাঙালি দর্শকদের যাতায়াত ছিল না।

এপ্রসঙ্গে বলা যায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা হয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রিঃ গেরাসিম লেবেডেফ 'বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার গড়ে তোলেন। ২৫নং ডোমটোলাতে একটি বাড়িতে গড়ে উঠে এই থিয়েটার। রুশদেশীয় ভাষাবিদ অনুবাদক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষা- শিক্ষক

গোলোকনাথ দাসের দ্বারা 'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুখানি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনূদিত করে মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'কাল্পনিক সংবদল' এবং 'প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' বাঙালি নট-নটীর সাহায্যে অভিনীত হয়েছে। এই নাটকের অভিনয় দেখার জন্য সেইসময় প্রচুর দেশীয় ও ইংরেজ দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এর পরে কলকাতার নানা অঞ্চলে ইংরেজি নাট্যমঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল। আবার কলকাতার বাইরে 'চন্দননগর থিয়েটার' (১৮০৮ খ্রিঃ) চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩ খ্রিঃ) দমদম থিয়েটার (১৮১৫ খ্রিঃ), সাঁসুসি থিয়েটার (১৮৩৯ খ্রিঃ) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চগুলি সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

সর্বোপরি বলা যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই বাঙালি-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১খ্রিঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে শেক্সপিয়র এর ইংরেজি নাটক এবং কালিদাস-ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়েছে। তারপর ১৮৩৫ খ্রিঃ নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার রঙ্গালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শখের থিয়েটারগুলি নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৩ খ্রিঃ), 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৯খ্রিঃ), মেট্রোপলিটন থিয়েটার (১৮৫৯খ্রিঃ), 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়' (১৮৬৮ খ্রিঃ) প্রভৃতির নাম করা চলে। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে উপরোক্ত নাট্যশালাগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

৮.২.৫.২ ঃ মঞ্চসজ্জা

একটি নাটকের অভিনয়ের সময় মঞ্চস্থাপত্য, অভিনয়কলা, আলোর পরিকল্পনা, রূপসজ্জা, আবহরচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল মঞ্চসজ্জা। নাট্যনির্দেশক নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দৃশ্য সাজিয়ে থাকেন। নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়েছে। নাটকের পরিবেশ ঠিকমতো গ্রহণযোগ্য যদি না হয়, তাহলে নাটকের শিল্পগুন ক্ষুন্ন হয়। সেইজন্য পরিবেশ নির্মাণের সময় নাট্যকারকে সচেতন ও সাবধান থাকতে হয়। নাট্যকারের মঞ্চ সচেতনতা, মঞ্চসজ্জার নির্দেশ, আদর্শ প্রবণতা ও সচেতন উদ্দেশ্যমূলকতা নাটকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। নাট্যকার এমন কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি নাটকে তুলে ধরেন না, যা নাট্যনির্দেশক মঞ্চে উপস্থাপন করতে পারবেন না। মঞ্চসজ্জাঃ প্রাথমিক দায়িত্ব প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরী বলেছেন - " থিয়েটারের মঞ্চে পাত্র অভিনেতা বা অভিনয়ে চরিত্র। এই পাত্রও বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারে পরিবেশের পটভূমিকায়। মঞ্চসজ্জার পরিবেশ স্থাপন মাত্রেই ঐ চরিত্রের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরিবেশের অভিন্ন অঙ্গরূপেই চরিত্রের কালও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থান-কাল-পাত্রের এই সংস্থাপন থিয়েটারের মঞ্চে অপরিহার্য।" (পৃ. ১৩৪, জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপ ও রেখা- সুনীল দত্ত) আমরাজানি শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

নাট্যচিন্তা ও মঞ্চসজ্জায় মৌলিকতা লক্ষ্য করা গেছে। তখন তিনি নাটকের বাঁধাধরা আঙ্গিকের পরিবর্তন করেছেন। নাটকের মঞ্চ প্রয়োগের ব্যাপারে মঞ্চমায়া সৃষ্টিকারী আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটিয়ে নতুনত্ব এনেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাতে শেক্সপীয়রের প্রভাব খুব কম। সমাজের নানা সমস্যা, জীবনের দ্বন্দ্বময়তা, গণতান্ত্রিক জীবনরূপ নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। সেইসঙ্গে বলা যায় মঞ্চসজ্জার রূপ ও রীতির পরিবর্তন, সাধারণ দর্শকদের রুচির পরিবর্তনের ফলে শেক্সপীয়রের নাটক বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে নাটক। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য নাটক শব্দের সমার্থক অর্থ করলে দাঁড়ায়। নাটকের মধ্যে যে লক্ষণগুলি থাকবে, তা হল-

(১) নাট্যকাহিনী হবে সুবিখ্যাত এবং পঞ্চসন্ধিযুক্ত। একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটকে পঞ্চসন্ধি বর্তমান, তা হলো -

(ক) সূচনা বা প্রারম্ভ (Exposition) (খ) জটিলতা ও গতিময়তা (Complication and Development) (গ) শীর্ষবিন্দু (Climax) (ঘ) অবরোহ (Falling Action) (ঙ) উপসংহার (Resolution or Conclution) তাছাড়াও নাটকের মধ্যে চরিত্রের বিলাস এসেছে, চরিত্রের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরা হয়েছে। শৃঙ্গার বা বীর রস রয়েছে। অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গে বলা যায়, পেশাদার রঙ্গ মঞ্চে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রতিযোগিতা এসে পড়েছে। পার্শী থিয়েটারে স্টেজের উপর ট্রামগাড়ি দেখাতো। বাংলা থিয়েটারও তখনকার দিনে মঞ্চের উপর সিংহ দেখাতো, মহাদেবের কপালে তৃতীয় নেত্ররূপী বালব জ্বালানো হতো ইত্যাদি। সর্বোপরি নাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন দেখা দিল নতুন জীবনাবেগ, তেমন প্রাচুর্য এল নাট্যসৃষ্টিতে। বাংলা কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্যের মতো নাট্যসাহিত্য দর্শকদের কাছে একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য হলেও নাটকের বই পড়ে আমরা সাহিত্য রস আস্বাদন করতে পেরেছি। নাট্য নির্দেশক নাটকের কলা-কুশীলবদের সাহায্যে রক্তমাংসের মানবজীবনে বহুবিধ সমস্যা-সংকট, আনন্দ-বেদনা, সংলাপের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে হাজির করান হয়েছে। সেই জন্যে মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথিতযশা নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেছেন। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য একাকী গৃহে পাঠ করে সেইসব সাহিত্যের রস, আস্বাদন করা সম্ভব কিন্তু মঞ্চে অভিনীত হয়েই নাটকের সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যব্যক্তিত্ব সতু সেন ১৯৩৩ খ্রিঃ রঙমহল থিয়েটারে ভারতে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তবে ১৯৩৩ খ্রিঃ 'ঝড়ের রাতে' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল শ্রদ্ধেয় সতু সেন মহাশয়ের। আধুনিক যুগে মঞ্চকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তারসঙ্গে আবহ সঙ্গীত ও আলোক সজ্জা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। ''কোনো ক্ষেত্রে পরিচালক হয়তো মঞ্চ শিল্পীকে নির্দেশ দিলেন, দাও একটি মধ্যবিত্তের

বাড়ি করে দাও। মধ্যবিত্তের বাড়ি হলো, কিন্তু একই মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে এত বিভিন্নতা, এত স্বাতন্ত্র্য তার কোনো চিহ্ন থাকল না এই মঞ্চসজ্জায়। এইভাবেই দীর্ঘকাল মধ্যবিত্তের ফর্মূলা অনুসারে মঞ্চসজ্জা রচিত হয়েছে।''

বিশশতকে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় নতুন আদর্শে দীক্ষিত নাট্যদল বহুরূপীর সূচনা হয়েছে ১৯৪৮ খ্রিঃ। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে তখন অনেকের মন খারাপ, স্নান খাওয়া নেই। সেই পরিস্থিতিতে নাট্যব্যক্তিত্ব কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ি, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ অভিজ্ঞ অভিনেতারা বহুরূপী নাট্যদলে যুক্ত হলেন। তাঁরা নতুন উদ্যমে, নতুন মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে; নতুন ভাবনায় ভাবিত হয়ে নাট্যমঞ্চে অভিনয় করতে শুরু করেছেন। তাঁদের লেখা নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ও অভিনয়ের নতুনত্বে এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। বহুরূপী নাট্যদলটি ১৯৪৮খ্রিঃ 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় শুরু করেছিল। মঞ্চসজ্জা প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরী বলেছেন - ''নবান্ন'-র দৃশ্যপরিকল্পনায় চটের ব্যবহার হয়েছিল নাটকের একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনেই। পরে দেখা গেল, ঐ চটের ব্যবহারই একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল; দৈন্যটাই ফ্যাশন হয়ে গেল। আরেকটা নতুন ফর্মুলা এসে গেল- মানুষের দুর্দশার ছবি দেখিয়ে করুণাভিক্ষার ফর্মুলাঃ ঐ ফর্মূলার ছাঁচে ঢালা সাজানো চাষী আর সাজানো কথা এসে গেল। কিন্তু ' নবান্ন'র চাষী সেভাবে আসেনি; সে বাংলাদেশের দুর্দিনের এক পর্বের প্রতিনিধি।'' (পৃ. ১৩৫)

আমরাজানি, নাটকের গতি নট-নটীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঁ আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন - '' অভিনেতা একভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে তা প্রায়ই একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে আসতে হয়, যেতে হয়, মঞ্চের মধ্যে নড়াচড়া করতে হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে হাত, মুখ, চোখ ও ভ্রুযুগল সঞ্চালন করতে হয়। শুধু কেবল আঙ্গিক গতি নয়, বাচিক গতিও নাটকের পক্ষে প্রয়োজন।''

উৎকৃষ্ট নাটক রচনার পটভূমি হিসেবে মঞ্চসজ্জার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা 'ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের' 'গ্রীক রঙ্গ মঞ্চ', 'এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চ', 'বস্তুবাদী রঙ্গমঞ্চ' ও 'শিল্পধর্মী রঙ্গমঞ্চের' প্রসঙ্গ জানি। যা উপরে তাই মঞ্চ, আর যা নিচে তাই আসন। 'ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ' সূক্ষ্ম কলাধর্মী, শিল্প নৈপুণ্যে ভরপুর। 'নাট্যতত্ত্বে বিচার' গ্রন্থে ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় বলেছেন - ''ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে থাকত তিনটি ভাগ - দর্শকদের বসবার জন্য অংশটিকে বলত 'প্রেক্ষকগৃহ' আর ছিল রঙ্গমঞ্চ ও নেপথ্যগৃহ। দর্শকদের বসার স্থানগুলি শ্বেত, রক্ত ও পীত বর্ণের স্তম্ভের দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণদের জন্য শ্বেত স্তম্ভ, ক্ষত্রিয়দের জন্য রক্তস্তম্ভ এবং উত্তর-পশ্চিমে পীতস্তম্ভের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের আসন বোঝানো হত। আর উত্তর পূর্বদিকে বসত শূদ্রেরা। দর্শকদের সামনে থাকত 'রঙ্গ'। দর্শকদের

বসার আসনগুলি কাঠ ও ইটের দ্বারা তৈরি হত।'' রাত্রিবেলাতেও মঞ্চগৃহের মাধ্যমে নানা দর্শক নাটকের অভিনয় দেখেছে। গ্রীসের রঙ্গালয়গুলি পাথরের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। ডায়োনিসাসের মন্দিরের প্রাঙ্গনেই গ্রীকমঞ্চ থাকতো। সূর্যের আলো, আকাশ, দূরের পাহাড় সবই থাকতো। তবে, অভিনয় হতো দিনের বেলায়, খোলা জায়গায়। হাজার হাজার দর্শক সেই নাটকের অভিনয় দেখতো।

দৃশ্যরূপে নাটকের আবির্ভাব, পাঠ্যরূপে নাটকের স্থায়িত্ব। একজনের জন্য নাটক পাঠ্য, বহুলোকের জন্য নাটক দৃশ্য। নাটকের অভিনয় জনচিত্ত আলোড়নকারী। মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখার সময় আমরা বাস্তব জগৎ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। তাই প্রেক্ষাগৃহ, অভিনেতা, মঞ্চ, দর্শক, সাজসজ্জার ঘর বিশেষকরে দর্শকদের হৃদয় মিলিয়েই তো নাটকের সার্থকতা। পরিচালক, মঞ্চনির্দেশক ও আলোকশিল্পী এই তিনজনের সমবেত প্রচেষ্টায় মঞ্চসজ্জাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে নাট্য শিল্প মাধ্যমটির সঙ্গে জড়ানো যায়। ''অভিনেয় চরিত্র যেন ফুল, থিয়েটারের আর সব অঙ্গ ই জল, হাওয়া, আলো, সার; ফুল যাতে ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারে, সেদিকেই তাদের সবার নজর। মঞ্চসজ্জার মনোহারিতা প্রয়োজনের উপরই নির্ভরশীল। মঞ্চসজ্জা নয়নাভিরাম হলেই চলবে না, তার নাটকীয় তাৎপর্যেরই যা কিছু দাম।'' (পৃ. ১৩৬) সর্বোপরি নাটক কয়েকটি শৈল্পিক বস্তুর মিশ্রণ। নৃত্য, মঞ্চ, সংগীত (বাদ্য ও কণ্ঠ), সংলাপ ও অভিনয়ের মিশ্রিত প্রচেষ্টা। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাট্যসাহিত্যেও জোয়ার এসে হাজির হয়েছে। ''মঞ্চসজ্জার যাবতীয় উপাদানই স্থিতীয়; অথচ নাটকের আর সবই গতীয় । ফলে চেষ্টা করতে হয়, যাতে উপকরণগুলিকে এমন আকার অবয়ব দেওয়া যায় যে, তারা অভিনেতাদের চলাফেরার ধরনের সঙ্গে মিলে গতিয়তার আভাস রচনা করতে পারে।'' সর্বোপরি বলা যায় , অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চসজ্জাকেও গতিময়তার রূপ দেওয়া হয়েছে।

৮.২.৫.৩ ঃ রূপসজ্জা

নাটক লেখা হয় অভিনয়ের জন্য। নাট্যকার এই শিল্প মাধ্যমটির চিরন্তন কামনা করেন সাহিত্যরূপে বেঁচে থাকা। চিরন্তন কিছু সাহিত্য গুণ থাকা দরকার, তবেই নাটক সাহিত্য হতে পারে। মনে রাখতে হবে মঞ্চে অভিনীত নাটক ও সাহিত্য বিচারক নাটককে একভাবে দেখলে চলবে না। মঞ্চে অভিনীত নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির প্রসাধন কলা, দৃশ্যসজ্জা, আলো, নেপথ্য সংগীত প্রভৃতি উপাদানগুলিকে মায়াচরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। তখন নাটকের চরিত্রগুলিকে সাময়িকভাবে বাস্তব জগৎ ভুলে যেতে হবে। মঞ্চে যে জীবনের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। তখন সেটিই সত্য। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কোন ব্যক্তি রামের চরিত্রে অভিনয় করলে, সেই ব্যক্তিটি যে সত্য রাম নয়, মিথ্যা রাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তির অভিনয়ের গুণে মঞ্চে তা সত্য হয়ে উঠে। এই সত্যতা রূপসজ্জা মিশ্রিত চরিত্রটিকে সার্থক করে তুলেছে।

নাট্য সমালোচক, নাটকের সেটের বাংলা করেন মঞ্চসজ্জা। কেউ কেউ আবার বলেন মঞ্চস্থাপত্য। তবে বলা যায়, নিছকই রূপসজ্জার মতো একটি কাজ, যা নিতান্তই সাধারণ মিস্ত্রিরীর কাজ। মঞ্চচিত্রণ বা মঞ্চবিন্যাসের বাইরে যেটুকু কাজ বাকি থাকল, রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে তা সার্থকতায় পরিগণিত হলো। রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। একই কাঠামোর মধ্যে রূপসজ্জার আঙ্গিককে ঘোরা ফেরা করতে হয়নি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের রূপসজ্জারও পরিবর্তন হয়েছে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য যখন যে রূপ চরিত্রগুলিকে মানিয়েছে, তখন সেই রূপেই সে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। নানা রঙে-নানা বর্ণে নাট্য নির্দেশকের পরিকল্পনা মেনে মঞ্চে উপস্থিত। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে গণনাট্য- আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত মঞ্চরীতির বিশেষ কোন তারতম্য দেখা যায়নি। 'গণনাট্য' কথাটি Peoples theatre এর বাংলা প্রতিশব্দ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৩৪ খ্রিঃ যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হল তখন নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় গঠিত হয় এই গণনাট্য। 'গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র' গ্রন্থে শাঁওলী মিত্র বলেছেন - ''সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেই বোধ জাগ্রত হতে শুরু করল। তাতে নাট্যাভিনয় একটি মাত্রা পেল। তাতে শিক্ষিত, তৈরি অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করেননি। করেছিলেন সেইসব মানুষ যাঁরা বিজন বা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র মতো ঐ একই প্রতিবাদে মনের মধ্যে গর্জে উঠেছিলেন। তাঁদের সে আবেগ প্রকাশের পথ পেয়েছিল মঞ্চ।'' (পৃ. ১৮) স্থান, কাল, পাত্রের পরিমাপের মধ্যে, চরিত্রগুলি ঠিকমতো অভিনয় করছে কিনা, মঞ্চসজ্জা ঠিক আছে কিনা, রূপসজ্জা, চিন্তাভাবনা-মতবাদ সব দিকেই নাট্য নির্দেশককে খেয়াল রাখতে হয়। 'নবান্ন' নাটকের প্রয়োগে যে সব অভিনয় রীতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন - '' বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যপট, মায়াজাল সৃষ্টিকারী অঙ্গসজ্জা ও সাজপোষাক এতদিন থিয়েটারে শোভা পাইত, সেখানে এই প্রথম আসিল বুভুক্ষু মানুষের মিছিল, ছিন্নবাস, নগ্নগাত্র ভিক্ষুকের কুৎসিত কদর্য চেহারা, খাদ্যের জন্য মানুষের পশুবৃত্তি।'' 'নবান্ন' নাটকের সুদৃশ্য রূপসজ্জার পরিবর্তে সাধারণ ও সস্তা ধরনের বস্তু দিয়ে পশ্চাৎপট তৈরি করা হয়েছে। রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে দর্শকের চিত্তকে চমৎকৃত করা হয়েছে। এমনকী দর্শকের দৃষ্টিকে নন্দনময় করে তোলা হয়েছে তা জোর দিয়েই বলা যায়। কিন্তু পাঠ্য নাটকগুলিতে কাহিনির ভিতরে মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়, সেখানে ভাষার ব্যবহার, সংলাপ সব কিছুর সঙ্গে পাঠককে সহৃদয় সামাজিক হয়ে নাট্যরস আস্বাদন করতে হয়।

খালেদ চৌধুরী যে মঞ্চনাটকগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন সেগুলি হল - 'পুতুলখেলা', 'গুড়িয়াঘর', 'শুতুরমুর্গ' 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'ডাকঘর', 'কালেরযাত্রা', 'পাগলা ঘোড়া', 'চিলে কোঠার সেপাই' প্রভৃতি। খালেদ চৌধুরী নাট্যজগতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে রূপসজ্জার চিত্রাঙ্কনে এবং পঠন-পাঠন অভিজ্ঞতায় মঞ্চস্থাপত্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করেছেন। শম্ভু মিত্রের আগ্রহে রঙ্গমঞ্চের

রূপসজ্জার প্রতি তিনি নিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৯৫৩ খ্রিঃ খালেদ চৌধুরী বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের ভাষায় বলা যায় - ''আমাদের রক্তকরবী ভালো লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে। অনেকবারই আমাদের মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে যে আমরা পারবো না। আমাদের পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন। এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোনও বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।'' কারণ তাঁর হাতের গুণে নাটকের মঞ্চাভিনয় প্রশংসা কুঁড়োতে লাগলো। আর তিনি এত বড়ো মাপের নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকর্মী ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে পরিকল্পনা করেছেন।

সবশেষে বলা যায় নাট্যসাহিত্য ও সমাজ দর্পণ। যে নাটক আমরা পাঠ করি তা সাহিত্য নির্ভর। আর যে নাটকের অভিনয় মঞ্চে দেখি তা হল অলীক ও মিথ্যা। আমরা শুধু নাটকের অভিনয় দেখেই তৃপ্তি পাই, তখন আমাদের বাস্তব জগৎ ভুলে যাই। মঞ্চে নাটক অভিনয়ের সময় প্রেক্ষাগৃহ, আলোক, অভিনেতা, মঞ্চস্থাপত্য, রূপসজ্জা, দর্শকের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফসল। সব উপাদানগুলি মিলিয়ে নাটকের অভিনয়ের সার্থকতা। রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়যোগ্যতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সৌমিত্র বসু বলেছেন - ''অভিনেতাকে মনে রাখতে হয় এমন ঘটনার এমন একজন মানুষের পক্ষে কেমন আচরণ করা সম্ভব, মঞ্চরূপকারকে মনে রাখতে হবে স্থানগত পটভূমির একটা আকার দিতে হবে তাঁকে, রূপসজ্জাকার মাথায় রাখেন এই বিশেষ মানুষটিকে দেখতে কেমন হওয়া চাই, কেমন পোশাক সে পরবে।'' (পৃ.৩৩৮)

৮.২.৫.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মঞ্চসজ্জা বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

২। রূপসজ্জা সম্পর্কে যা জান, তোমার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৮.২.৫.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড. অজিতকুমার ঘোষ

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - ড. দর্শন চৌধুরী

৩। নাট্যতত্ত্ব বিচার -ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়

৪। জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রুপ ও রেখা - সুনীল দত্ত

৫। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস - ক্ষেত্র গুপ্ত

৬। গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র - শাঁওলী মিত্র

বাংলা (এম.এ), চতুর্থ সেমেস্টার

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

অষ্টম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২

একক ঃ ৬ - আবহরচনা, অভিনয়কলা

বিন্যাসক্রমঃ

৮.২.৬.১ ঃ ভূমিকা

৮.২.৬.২ ঃ আবহরচনা

৮.২.৬.৩ ঃ অভিনয়কলা

৮.২.৬.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৬.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৬.১ ঃ ভূমিকা

চলচ্চিত্রে আবহরচনাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল অপটিক্যাল প্রভাব এবং যান্ত্রিক প্রভাব। অপটিক্যাল প্রভাবকে ফটোগ্রাফিক প্রভাব বলা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে চিত্র বা ফ্লিম ফ্রেমগুলো ফটোগ্রাফিকভাবে তৈরি করা হয়। অপট্যিকাল প্রভাব ব্যবহার করে একটি ভিন্ন ব্যাক গ্রাউন্ডে অভিনেতাকে উপস্থাপন বা সেট স্থাপন করা যায় চলচ্চিত্র মাধ্যমে। আর যান্ত্রিক প্রভাব শুটিংয়ের সময় দেখা যায় - লাইভ-অ্যাকশন। যান্ত্রিক প্রভাবে আবহরচনায় যান্ত্রিক প্রপোজ, সিনারি, স্কেল মডেল, অ্যানিমেট্রনিকস্, পাইরোটেকনিক্স ছাড়াও বায়ুমন্ডলীয় প্রভাব, বাতাস, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার, মেঘ প্রভৃতি যান্ত্রিক প্রভাবের মধ্যে তুলে ধরা হয়। যেমন- একটি গাড়ি নিজেকে নিজে চালিত করছে এমন রূপ দেওয়া বা একটি বিল্ডিংকে উড়িয়ে দেওয়া। ১৯৯০ খ্রিঃ থেকে কম্পিউটার উদ্ভূত চিত্রাবলী (কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি - জি সি আই) সম্পূর্ণভাবে বিশেষ আবহরচনা প্রযুক্তির অধীনে চলে এসেছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে খুব কম খরচে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এখন আমরা আবহরচনা বা আবহসংগীত নাটকের মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

৮.২.৬.২ ঃ আবহসংগীত

সঙ্গীতের আবেদন মানুষের কানের কাছে। তাই পরিবেশন করা ও হৃদয়ঙ্গম করা এই দুইটি সংগীতের ক্ষেত্রে

জরুরি। যদিও নাটকের গুণধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভরত সংগীতের বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই মতে উপনীত হয়েছেন। নাটকের চেয়ে বড় আর কিছুই ছিল না তাঁর কাছে। নাটকের উপস্থাপনায় সংগীত তার দায়িত্ব কতদূর সুচারুরূপে পালন করতে পারে সেই সূত্রেই সংগীতের মূল্যায়ন। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থ হল- অভিনয়ের বিশেষ বিশেষ ভাব- পরিবেশের নির্মাণের জন্য রঙ্গমঞ্চে বা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত অনুষঙ্গী নেপথ্য বাজনা, নেপথ্য সংগীত। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় background music । 'নাটক লেখার মূলসূত্র' গ্রন্থে ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন - ''সংলাপের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশুদ্ধ সংগীতের উচ্ছ্বাস, উক্তি - প্রত্যুক্তির বাঁধুনিতে অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপে ধরা না দেওয়া পর্যন্ত নাট্যের উদ্ভব হয়নি এবং যিনি গানকে ব্যক্তির উক্তি- প্রত্যুক্তির কাজে ব্যবহার করে লোকবৃত্ত অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনিই প্রথম গীতিনাট্যকার। বলাবাহুল্য, গীতিনাট্যকারের হাতে ভাবসঞ্চারের প্রধান মাধ্যম। গান, অর্থাৎ 'সুরময়ী বাণী'।'' (পৃ. ১১৩) এবার দেখা যাক মানুষ যা কিছু করে তাই শিল্প কিনা! নিশ্চয়ই তা নয়! মানুষ সাংসারিক আর পারিবারিক কাজে অনেক কিছু তৈরি করে। সব কিছু শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। তার কারণ মানুষ এগুলো ব্যবহারিক কাজে লাগবে বলে, তার ইচ্ছেতেই করে। এর মধ্যে সংসারের কাজে ব্যবহার্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় - ''সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইঁটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী।'' (সাহিত্যের উদ্দেশ্য/সাহিত্য)। সর্বোপরি বলা যায় শিল্পমাধ্যমের পার্থক্যের কারণেই চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য, সাহিত্যের সৌন্দর্য এক একজনের কাছে এক এক রকম ধরা দেয়। আর তা ঘটে রসিক ব্যক্তির মনোনিবেশের ফলে। তিনি যদি সবুজ মন নিয়ে সৃজনশীলতার রূপ দিতে চান তাহলে তার কাছে ব্যবহার্য বস্তুর থেকে আনন্দটিই বড়। শিল্পী যেমন রং ও তুলির সাহায্যে চিত্র রচনা করেন তেমনি নাটকে বা যাত্রায় ঐ শিল্পীর কণ্ঠস্বরকে আমরা বলতে পারি সংগীত। আর সেই সংগীত যখন নাট্যকাহিনিকে একটা আলাদা মাত্রা দেয় তখন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নাট্যদর্শক তখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দুঃখ-সংকট ভুলে সঙ্গীতের মূর্ছনায় আনন্দলোকে পৌঁছে যায়। নাটকে আবহসংগীত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কেবল দর্শক মনোরঞ্জনের জন্যই নয়। নাট্য বিষয়ের উদঘাটনই নাট্যসংগীতের উদ্দেশ্য বলে ধরা হয়। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত বলেছেন - 'তত্র বিভাবানুভাবব্যাভিচারি সংযোগাৎ রসনিস্পত্তিঃ' অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব যুক্ত হয়ে যে রস সঞ্চারিত হয় পাঠকের মনে তাই ভাবরস এবং সেটাই স্থায়ী হয় আর দর্শকের অলৌকিক আনন্দ উপভোগের কারণ হয়'।

নাটকে আবহ রচনার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নাট্য সংলাপ যখন নাটকের কলা-কুশীলবদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, তখন আবহরচনার মাধ্যমে যে সংলাপ বলে

দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নাট্যনির্দেশক আবহসংগীত প্রয়োগ করে নাটকের অভিনয়কে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ আবহরচনা অধিকাংশ সময় 'না বলা বাণীকে' প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালন করে। চলচ্চিত্রে বা নাটকে আবহসংগীত দর্শকদের হৃদয়ে নাড়া দেয়। দর্শকের মনোরঞ্জনে তখন সেই প্রশংসা পান সঙ্গীত পরিচালক। আবার থিয়েটারের আবহরচনা সম্পর্কে নাট্য প্রযোজকের একটা দুশ্চিন্তা সবসময় কাজে করে, সেটি হল আবহরচনার প্রয়োগে পাঠকের সংলাপ বাদ পড়ে যাবে না তো! কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, সংলাপ যখন থেমে গেছে তখনই আবহের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। বাংলা নাটকে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়োর্ধ থেকেই সংগীতের ব্যবহার প্রাধান্য পেতে থাকল। সেইসময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) তাঁর অধিকাংশ নাটকেই আবহসংগীত ব্যবহার করেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। সেই সঙ্গে পাঠকের সংগীত ব্যবহারের ফলে সমকালীন দর্শকদের কাছেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। 'নাট্যতত্ত্ব বিচার গ্রন্থে' ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় বলেছেন - ''বেরটোল্ড ব্রেখটের এপিক থিয়েটারে বা রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে এবং আমাদের বাঙলা নাটকে ও যাত্রায় গান অবশ্য মূল্য পেয়েছে; কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক নাট্যকারগণ নাটকে সঙ্গীত যোজনায় তেমন আগ্রহী নন। তাই উদ্ভবকালে ও তৎপরবর্তীতে কিছুকাল পর্যন্ত সঙ্গীতধর্মীতা নাটকের লক্ষণরূপে গণ্য হলেও এখন আর একে নাট্যলক্ষণরূপে নির্দেশ করা যায় না।'' (পৃ.৩৬) এই প্রসঙ্গে বলা যায়, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে নির্বাক সিনেমা। নির্বাক সিনেমা পেরিয়ে পরবর্তীকাল দেখা যেত সিনেমা হলে বা মঞ্চের সামনে পিয়ানো, অর্গান বা কখনো কখনো অর্কেস্ট্রার সংগীত বাজানো হতো। পরবর্তী সময়ে প্রজেক্টর ব্যবহারের ফলে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বৈচিত্র্য ছাড়াও প্রজেক্টর যন্ত্রের ঘড়ঘড় শব্দ আড়াল করা হয়েছে। তাছাড়াও বিশেষ দৃশ্যের সম্পূরক হিসেবেও সংগীত বাজানোর রেওয়াজ ছিল। আবহরচনা হিসেবে ঘোড়ার খুরের শব্দ ঝড়ের তর্জন-গর্জন, সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস এই সব শব্দের প্রভাব সৃষ্টির জন্য প্রযোজকরা বা নাট্যনির্দেশকরা শব্দ তৈরি করতেন। আমরা জানি আবহ সংগীত চলচ্চিত্র-নাটক প্রভৃতি বিনোদন জগতে দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে অভিনেয় ঘটনার অনুষঙ্গ হিসেবে কৃত সংগীত; যাকে নেপথ্য সংগীত ও বলা হয়।

আবহ রচনা প্রসঙ্গে দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেছেন - ''বাংলা নাটকে আবহের শুধু ভূমিকাটুকুই আছে, আর কিছু নেই। অথবা এমনও বলা যেতে পারে আবহের কোন ভূমিকা নেই। দুটি আপাত-বিরোধী কথার একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। নাটকের শুরুতে তৃতীয় বেল পড়বার পর কিছু সময় গোলমাল চলে, সেই গোলমাল থামাতে যাত্রার দীর্ঘস্থায়ী কনসার্ট এর (সঙ্গীতানুষ্ঠান) বদলে দেড় থেকে দুই মিনিটের একটি টাইটেল এবং দৃশ্যান্তরের সময় আলো নিভলে কালক্ষেপ বোঝানোর জন্যই হোক একটি মিউজিক বাজে। সুতরাং গোলমাল ঠেকানোর জন্য আবহের প্রয়োজন। যদিও সময় বিশেষে টেপ রেকর্ডারের অসহযোগিতা গোলমাল আরও বাড়িয়ে দেয়।''

(পৃ. ১৪৯, জীবনধর্মী নাট্যপ্রযোজনার রূপ ও রেখা- সুনীল দত্ত) নাটকে আবহসংগীতের জন্য তখনকার দিনে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা প্রচলন ছিল। নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনার 'অঙ্গ াঁর', 'কল্লোল' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' মঞ্চে উপস্থাপন করার সময় টেপ রেকর্ড করেছিলেন টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। লিটল থিয়েটার গ্রুপে (LTG) রবিশঙ্কর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরীর মতো গুণী শিল্পীরা আবহসংগীত রচনা করে বাঙালি দর্শক সমাজের মন জয় করে ফেলেছেন। আবহ সংগীতকার হিসেবে তাঁদের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পের অনুসরণে তপন সিংহ কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭) চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। ছবিটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে রৌপ্যপদক পেয়েছে। আর এই ছবির আবহসংগীতের জন্য বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে রবিশঙ্কর পেলেন 'রৌপ্যভাল্লুক' পুরস্কার। ''বহুরূপীর রক্তকরবী' বা 'রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আবহের ব্যবহার খুব কম অথবা নেই বললেই চলে।'' নাটকে প্রাণ থাকে দ্বন্দ্বে, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সেই দ্বন্দ্বটা আছে। 'রক্তকরবী' নাটকের অনেক স্তর, সেই বহুস্তর সম্বলিত নাটকের নাট্যায়নে তাই বহুরকম স্তরের আনাগোনা। কেবল রূপকের আবরণে এ নাটক নয়। এর মধ্যে অনেক দৈনন্দিন কঠিন বাস্তবের চিহ্ন ততোটাই কঠিন করে আঁকা আছে, যতোটা রূঢ় হয়ে তা দেখা যায় জীবনে। সেই জীবনকে তুলে ধরার জন্য সংলাপের পরিবর্তে আবহসংগীতের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। 'চাকভাঙা' মধুতে দেখা যায় আবহসংগীতের ব্যবহার প্রথম ও শেষে। ইদানীংকালে 'তিনপয়সার পালা' 'মারীচ সংবাদ' এবং আরো অনেক নাটকে আবহরচনা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আবহসৃষ্টির ব্যাপারে 'ছুটির খেলা' নাটকটির কথাও গুরুত্বপূর্ণ। ঐ নাটকে দেখা যায়, কয়েকজন কলকাতা শহর থেকে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। অভিনয়ের শুরুতে একটি ট্যাক্সি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। পরে হাওড়া স্টেশনের মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি, স্টেশন মাষ্টারের অফিস থেকে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা। ট্রেনের ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া থেকে ট্রেনের গতি বাড়ানোর শব্দ। তারপর কয়েকটি পাখির ডাকের শব্দে নাটকের পর্দা উঠে যাচ্ছে। মঞ্চে তখন সকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ। সর্বোপরি নাটকের মঞ্চায়নে আবহযন্ত্রশিল্পীদেরও গুরুত্ব বেড়েছে। নাটকের কলা-কুশীলবদের মতো পর্দার আড়ালে আবহরচনার যে সমস্ত শিল্পী নিয়োজিত, তাদেরও দায়িত্ব অনেক। সেইজন্য নাটকের মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে আবহসংগীত শিল্পীদেরও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সর্বোপরি মঞ্চস্থাপত্য, মঞ্চসজ্জার মতো আবহরচনায় ব্যস্ত শিল্পীদের সমান মর্যাদা ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

৮.২.৬.৩ ঃ অভিনয়কলা

সংস্কৃত আলংকারিক আচার্য ভরত নাটককে অন্যান্য প্রকরণ থেকে পৃথক করবার জন্য একে আখ্যা দিয়েছেন 'দৃশ্যকাব্য'। সংস্কৃত সাহিত্যের 'দৃশ্যকাব্য' মূলত দেখার এবং শোনার উপযোগী। অভিনয়ের মধ্যদিয়ে কথায় ও

আচরণে যা অপরের কাছে ব্যক্ত হতে পারে। অর্থাৎ যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে দর্শক শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করাই হল অভিনয়। অভিনয় একটি শিল্প মাধ্যম। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল অভিনেয়ত্বকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আসলে কবিতা একাকী পাঠ করা যায়, উপন্যাস ও ছোটগল্পও তাই। কিন্তু কোন নাটক পড়তে ভালো লাগলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে অভিনয়ের সাফল্যের ওপরই নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এইজন্য নাটককে বলা হয় Performing art । 'নাটক লেখার মূলসূত্র' গ্রন্থে, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন - ''অভিনেয়ত্ব' এক কথায় বলতে, নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করে রাখার ক্ষমতা। অভিনেয়ত্ব হচ্ছে পরিস্থিতি ও চরিত্রের আচরণের (কায়িক, সাত্ত্বিক এবং বাচনিক) সমবায়ে উৎপন্ন সেই ভাবোদ্দীপনা বা কৌতূহল সার্মথ্য তথা দীপ্তত্ব যা নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান বেগ নিয়ে বিরাজ করে।'' (পৃ.২৫)

বাংলার অভিনয় বলতে পরস্পর সংলগ্ন দুটি অর্থ বোঝায়। একটিকে বলা হয় Acting অপরটি হল প্রযোজনা। সাধারণ দর্শক যখন বিভিন্ন নাট্য নির্দেশকের বা কলাকুশীলবের অভিনয় দেখতে যান, তখন বোঝা যায়, সেই বিশেষ অভিনেতার ব্যক্তিগত উপস্থাপন। নাট্যঅভিনেতা, নাট্যচরিত্রকে কেমন করে মঞ্চের বিভিন্ন উপাদান সহযোগে উপস্থাপন করেছেন তার রূপ প্রাধান্য পায়। যেমন - শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, দেবশঙ্কর হালদার, ব্রাত্য বসুর অভিনয়। আবার একটি নাট্যদলের সামগ্রিক প্রযোজনাও কিন্তু অভিনয়যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যেমন- আজ আকাদেমিতে আছে বহুরূপীর অভিনয়। সেক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে বহুরূপী নাট্যদলের সামগ্রিক প্রযোজনা।

অনেক সময় অভিনয়ের দিক থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটক সাফল্য অর্জন করে না। আবার কম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটক সাফল্য লাভ করে অভিনয়ের গুণে। '' অভিনয়ের ব্যর্থতা যদি অভিনেতাদের ব্যর্থতা না হয় তবে কিন্তু তাকে নাটকেরই ব্যর্থতা বলতে হবে, তার প্রাথমিক কারণ, নাটক অভিনীত হবার জন্যই লেখা হয় - পাঠ করবার জন্য নয়, হলে তাতে মঞ্চ নির্দেশ থাকতো না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, অভিনয়ে ব্যর্থ হওয়া মানেই চরিত্রগুলি দর্শকের কাছে তাদের আচরণে ও সংলাপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেতে পারেনি। কাহিনী তাঁদের আকর্ষণ করেনি এমনও হতে পারে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকার যথেষ্ট যত্নবান হননি। চরিত্রের সংলাপ যাতে চরিত্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক হয় সে কথা ভাবেননি, অথবা নাটকের বস্তুধর্মিতা বজায় রাখবার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাননি। - ইত্যাকার বহুবিধ কারণেই এ ব্যাপার ঘটতে পারে; কিন্তু অভিনয় আকর্ষণীয় না হলে সে ত্রুটি নাট্যকারেরই - এ কথা নাট্যকার যতো বেশি মনে রাখবেন ততোই তাঁর এবং নাটকের মঙ্গল। '' (পৃ. ৮৩, সাহিত্য প্রকরণ- হীরেণ চট্টোপাধ্যায়)। সেইজন্য নির্দেশ মঞ্চে অভিনয়ের সময় সাহিত্যিকের মূল লিখিত পাঠকে পরিবর্তন করে নিয়েছেন। অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাট্য নির্দেশক এই

কাজটি করেছেন। মূল পাঠকে বেশ কিছুটা বদলে নেবার স্বাধীনতা ভোগ করেন বলে দোষের কিছুই নেই।

অভিনয়যোগ্যতার কারণে নাট্যাচার্য ভরত নাট্যসৃষ্টিকে 'রূপক' আখ্যা দিয়েছেন। অভিনেতা এখানে অন্যের রূপ গ্রহণ করে অভিনয় করেন বলেই নাট্য শিল্পকে বলা হয় রূপক। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুয়ায়ী চার রকম অভিনয় যোগ্যতার কথা জানা যায়। সেগুলি হল - 'আঙ্গিক' (আচার-আচরণ ও অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা অভিনয়, 'বাচিক' (বাক্য দ্বারা অর্থাৎ সঠিক সংলাপের উচ্চারণের দ্বারা অভিনয়, 'আচার্য' (সাজসজ্জার দ্বারা মায়া সৃষ্টি করা) এবং 'সাত্বিক' (অভিনয়ের দ্বারা অনুভুতি সৃষ্টির প্রতি সজাগ থাকা) রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সৌমিত্র বসু বলেছেন - ''একথাও নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়, তাঁর এলাকায় তিনি এমন কোনো অংশ রাখবেন না, যা নাকি পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ করা অথবা উপভোগ করা যাবে না। যেমন ধরা যাক, সে মন খারাপ করে বসে আছে, এই বাক্যটি বর্ণনামূলক সাহিত্যের অংশ হতে পারে, হতে পারে কোনো চরিত্রের মুখের বিবরণ, কিন্তু মঞ্চবর্ণনায় এর ব্যবহার অস্বস্তিকর।'' সর্বোপরি বলা যায় অভিনয় লিখিত পাঠের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হলেও অভিনয় যোগ্যতার কারণে স্বতন্ত্র একটি পাঠ তৈরি করে। নাটকের পরিচালক সর্ব পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন, তারপর নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নির্দেশ দেন এবং সে অনুযায়ী তাদের অভিনয় করতে সাহায্য করেন।

নাটকের অভিনয়কলা এই এককের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদানের ব্যবস্থা করলে, শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। এবং একে অপরের সঙ্গে অভিনয়কলা বিষয়ে ধারণা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারবে। সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থী অভিনয় যোগ্যতার পাঠে যুক্ত হবে। একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট, মোবাইলের যুগে অভিনয়যোগ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই জন্য অনেক মানুষ এখন পেশা হিসেবে অভিনয় যোগ্যতাকে পছন্দ করে থাকে।

৮.২.৬.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আবহরচনা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

২। অভিনয়কলা সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

৮.২.৬.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপ ও রেখা - সুনীল দত্ত

২। নাট্যতত্ত্ব বিচার -ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্র বীক্ষা - সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী

৪। সাহিত্য প্রকরণ - হীরেণ চট্টোপাধ্যায়

৫। নাটক লেখার মূলসূত্র - ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৬। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - ড. দর্শন চৌধুরী

৭। নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা - তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক ৭

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : বাংলা মঞ্চ

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.৭.১ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার মঞ্চ ও নাট্যজগতে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

৮.৩.৭.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.৭.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮. ৩.৭.১ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ বাংলার মঞ্চও নাট্যজগতে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

যে কজন মুষ্টিমেয় বাঙালী ব [illegible] ৃবন্ধন করার জন্য একদিকে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন এবং অভি [illegible] ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বাগবাজারের বোসপাড়ায় এক প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু যদিও প্লে-রাইট ছিলেন ; কিন্তু কি জীবনচর্যায়, কি মঞ্চস্থাপত্য সম্পর্কিত ভাবনায়, কি যে কোনো কাজে ঝুঁকি গ্রহণের প্রশ্নে তিনি গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল প্রমুখদের পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন। এই বোহেমিয়ান আচরণ তাঁকে হয়ত সর্বনাশের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ, কিন্তু তিনি সব

পদক্ষেপই নিতেন জেনেশুনে, এমন কি সমূহ ক্ষতির কথা বুঝতে পেরেও। অমরেন্দ্রনাথের এ জগতের বিরল জীবনযাত্রাই, শতবর্ষ পরেও, আমাদের কাছে তাঁর আকর্ষণীয় হয়ে থাকার প্রধান কারণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শৌখিন থিয়েটার ও পেশাদারি থিয়েটারের কেন্দ্রস্থল উত্তর কলকাতার বাগবাজার ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। সেই অঞ্চলের কিশোর অমরেন্দ্র মাত্র বারো বছর বয়সে, ১৮৮৮-র ২৫ মে, স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটকের একজন দর্শক। সেই বয়সেই তিনি ঠিক করে ফেললেন, অভিনেতা হবেন। পরের বছরই পিতা দ্বারকানাথ দত্তের দেহাবসান ঘটল, ফলে লেখাপড়ার পাঠ চুকে গেল তাঁর। অর্থাৎ পৃথিবীর পাঠশালাতেই তাঁর প্রকৃত শিক্ষা। তা যদি না হত তাহলে চোদ্দ বছর বয়সে 'উষা' নাটকটি (গ্রন্থাকারে তিন বছর পরে, ১৮৯৩-এ ছাপা হয়) লিখলেন কি করে ? এরপর টানা চার বছরের সাধনা। আঠারো বছর বয়সে জুন মাসে তিনি লিখলেন চারটি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ 'মানকুঞ্জ' গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রমুখের গীতিনাট্যের জয়জয়কার দেখেই সম্ভবত। যাইহোক, তাঁর অভিনেতা হওয়ার বাসনা অসম্পূর্ণ এখনও। তবে পাঁচ মাসের বেশি অপেক্ষার দরকার হল না। নভেম্বর মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' অপেরায় তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হল। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র আগে নাট্যাভিনেতা, পরে নাট্যকার ; অমরেন্দ্রনাথ আগে নাট্যকার পরে অভিনেতা। দ্বিতীয়তঃ অভিনেতা হওয়ার জন্য প্রায় অর্ধযুগ তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিরাও তাঁদের পুরাতন সৃষ্টিগুলিকে অস্বীকার করেন না। অমরেন্দ্রনাথও ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা থিয়েটার নামক বিদেশী রঙ্গালয়ের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট ইত্যাদির অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলির যে সব বিজ্ঞাপন তাতেও সেই সব কলাকৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া হত। একটি উদাহরণ —

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য

VISAP

VISAP অভিলাপ

VISAP

নৃত্যগীতের ফুল্লহার !! রসিক-রসিকার সুষমাধার !!

WONDERFUL DISPLAY FAIRY FOUNTAIN

ON THE STAGE

রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব ফোয়ারা শতধারে লাল-নীল-সবুজ জল ঝরিতেছে

চমৎকার মনোমুগ্ধকর

রমণীর প্রেম-ফাঁদে পড়িয়া, দেবতারাও যে দুর্দ্দশা

হয়েন, — তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ !

নারী প্রেমাকাঙক্ষীগণ ! এস দেখিয়া যাও !!

বুঝি সব কিন্তু করি কি ?

ক্যালকাটা থিয়েটারের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিদেশী রঙ্গালয়টি একাধিকবার চরম আর্থিক সংকটে পড়েছিল। এক সময় কর্তৃপক্ষ চাইছিল অভিনয় বন্ধ করে দিতে। তাই হলও। রঙ্গমঞ্চটি শেষে নীলাম ঘরে পরিণত হয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের ক্লাসিক থিয়েটারও চরম অর্থকষ্টে পড়ে। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রচয়িতা লিখেছেন —

> এই সময় 'বসুমতি'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সস্তায় অনেক মূল্যবান বই ছাপিয়ে গ্রাহকদের উপহার দিতেন। এক সময় বস্তাবন্দী অনেক বই থেকে গেল, রাখবার জায়গা নেই। মনোমোহন মিনার্ভা নিয়েছেন, চুনীবালা দেব সেখানে এসেছেন, এঁরা উপেনবাবুর বন্ধু। উপেনবাবু এঁদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করলেন। এখন আর লটারী নয়, প্রত্যেক টিকিটের ক্রেতা বই পাবে, টিকিটের মূল্য অনুসারে বই-এর সংখ্যা। মিনার্ভায় অসম্ভব ভিড় ! এ দেখে অমরেন্দ্রনাথ চুপ করে থাকতে পারেন ! তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে চার-পাঁচ দিনে মাইকেলের গ্রন্থাবলী ছাপিয়ে তা বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর 'হিতবাদী'র সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করলেন। দুই থিয়েটারেই উপহারবৃষ্টি। প্রতি অভিনয়-রাত্রে হেদুয়ার মোড় থেকে বিডন উদ্যান অবধি এক জনসমুদ্র। রাত তিনটায় অভিনয় দেখে দর্শকগণ যেন স্কুল থেকে ফিরছে, প্রত্যেকের হাতে বই। দু মাস এইরকম চলল। শেষ ফল দাঁড়াল এই, মিনার্ভা লাভবান হল, অমরেন্দ্রনাথ ডুবলেন ..... যত বিক্রী তত লোকসান।

অমরেন্দ্রনাথ *isolvency* নিলেন, ক্লাসিক থিয়েটার উঠল। দশ বছর ধরে বাংলার নাট্যশালাকে পর্যন্ত নাড়া দিল, ঝঞ্ঝার মত চলে গেল।

আর একটি বিদেশী রঙ্গালয়ের নাম এই সূত্রে স্মরণীয় — সাঁ সুসী। এই থিয়েটারের নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে ডাইনিং ও ডিকল চলে যাওয়ার পর সাঁ সুসীর দুরবস্থা চরমে পৌঁছায়। মাদাম ব্যাক্সটার টিকিটের দামও কমালেন। অভিনয়ের ধারারও উন্নতি ঘটালেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, শেষে নটনটীদের মাইনে দেওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। ব্যাক্সটারকেও শেষ পর্যন্ত সাঁ সুসী নামক অভিজাত রঙ্গালয়টাকে বিক্রী করতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

৬. গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর দুজনই প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রশিক্ষক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রধান প্রধান নট-নটীদেরই নির্দেশ দিতেন। অর্ধেন্দুশেখর অবশ্য ছোট ছোট ভূমিকাভিনেতাদের প্রতিও নজর দিতেন। এদিক থেকে অমরেন্দ্র টিমওয়ার্কের সাফল্যের কথা ভেবে সব অভিনেতা অভিনেত্রীকেই শিক্ষিত করতেন। কুসুমকুমারী, সুশীলবালা, তিনকড়ি (ছোট), চারুবালা প্রমুখ অভিনেত্রীদের কি আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি নির্দেশ দিতেন তার পরিচয় আছে তাঁর আত্মীয় হরীন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণনায়। অভিনেতাদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র বসু প্রমুখ তাঁর নির্দেশনায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশিক্ষাদান পদ্ধতিকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর নিজস্বতার পরিচয় দেখা যায় গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের প্রথম তিন অঙ্কে গিরিশচন্দ্র এবং শেষ দুই অঙ্কে অমরেন্দ্রনাথের নির্দেশনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নানা জনের মন্তব্যে। কাজেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী অমরেন্দ্রনাথের নাট্যশিক্ষাদান পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতেই পারেন।

৭. অমরেন্দ্রনাথের পূর্বে নাট্যপত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা কোনো বাঙালী অনুভব করেননি। পূর্ণাঙ্গ নাট্যপত্রিকাই যে নাট্যাঙ্গিক, নট-নটীদের গুরুত্ব, তাদের সংকট ইত্যাদি যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারে তা একালে 'গন্ধর্ব', 'এপিক থিয়েটার', 'নাট্যপত্র', 'গণনাট্য', 'অভিনয়', 'গ্রুপ থিয়েটার' ইত্যাদি পত্রিকার পাঠকরা জানেন। অমরেন্দ্রনাথ 'সৌরভ' নামক যে পত্রিকায় হাত পাকিয়েছিলেন সেটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যপত্রিকা ছিল না, তবে সেটিতে গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী প্রমুখরা নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এরপর অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' নামে একটি পাঁচমিশালি পত্রিকা বার করেন যাতে রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত আলোচনা ও খবরাখবর বাড়িয়ে দিলেন। নাট্যসমালোচনা-বিষয়ক যেসব লেখা পরবর্তীকালে আমাদের নানা তথ্য যুগিয়েছে সেগুলি হল ক্লাসিকে - কপালকুণ্ডলা; স্টারে - বিষবৃক্ষ; মিনার্ভায় - নবীন তপস্বিনী ও আলিবাবা; ইউনিকে - রত্নমালা।

'রঙ্গালয়' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি আত্মকথা বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে কাজ করতে পারে, একটি ধর্মদাস সুরের 'আত্মজীবনী', দ্বিতীয়টি অভিনেত্রী বিনোদিনীর 'আত্মকথা' (গ্রন্থাকারে 'আমার কথা' নামে প্রকাশিত)।

'নাট্যমন্দির' নামে আর একটি পত্রিকার সম্পাদনাও অমরেন্দ্রনাথ শুরু করেন, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে নানা অভিনয়ের ছবি এটিতে ছাপা হত। পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের সংবাদও থাকত। তা সত্ত্বেও ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় আরও একটি পত্রিকা ছাপা হতে শুরু করে — 'থিয়েটার'। অমরেন্দ্রনাথের প্রচারমুখিতার পরিচয় এই পত্রিকাতেই বেশী পাওয়া যায়।

গিরিশের থিয়েটার জীবন আলোচনায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তর কথা মনে আসবেই। তাঁর ক্লাসিক থিয়েটার শুরুই হয়েছিল রঙ্গভূমি সজ্জাকর ধর্মদাস সুর, বিজনেস ম্যানেজার আশুতোষ বড়াল, বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার প্রমথনাথ দাস, সংগীত শিক্ষক অঘোরনাথ পাঠক, লেসি ও ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্তর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

তাঁর থিয়েটারে সব ধরনের নাটক প্রযোজিত হত বটে, তবে মজার নাটকই বেশি। ক্লাসিকে পা দেওয়া মানেই আনন্দের রসে ভেসে যাওয়া। নাট্যাঙ্গিকের নানা ব্যবহার মঞ্চের ওপর এলো - খাট, সোফা, আয়না, টেবিল-চেয়ার। শুরু হল কীর্তন, উইংস, প্রসেনিয়মের ঢালাও ব্যবহার। দর্শক আকর্ষণের জন্য নানা উপহারেরও ব্যবস্থা হল।

সবচেয়ে বড় কথা, অমরেন্দ্রনাথ নাট্যব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি মালিক হলেও ছিলেন সহৃদয়। এর প্রমাণ, অভিনেতা, নৃত্যগীত শিক্ষক থেকে শিফটার — সকলের বেতন বৃদ্ধি তিনি করেছিলেন। তিনি বোনাসেরও বন্দোবস্ত করেন। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য তিনিই প্রথম 'বেনিফিট নাইট' চালু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য হয়েও গিরিশচন্দ্র কিন্তু মঞ্চসহযোগীদের জন্য এসব ব্যবস্থার কথা ভাবেননি। তাই ক্লাসিকে বিভিন্ন সময়ে প্রযোজিত নির্মলা, জনা, রাজা ও রানী, প্রফুল্ল, দেলদার, শ্রীকৃষ্ণ, আলিবাবা, সরলা, সীতারাম ইত্যাদি নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখার জন্য দর্শক উপচে পড়ত।

অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে 'গিমিক' পছন্দ করতেন, আর রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার হল প্রকৃতি-অনুগ — বাংলা থিয়েটারের ধারায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর 'রাজা বসন্তরায়' পরে হাজির হল এমারেল্ড ও মিনার্ভাতেও। এমারেল্ড, বেঙ্গল, কোহিনুর, স্টার এবং থেসপিয়ান টেম্পলে 'রাজা ও রানী' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আর্ট থিয়েটারেও তার কদর দেখি। ক্লাসিকে 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ, মিনার্ভায় 'নতুন অবতার' কৌতুক নক্সার নাট্যরূপ 'ভগীরথ', কোহিনুরে 'গোড়ায় গলদ', স্টারে 'মুক্তির উপায়' গল্পের নাট্যরূপ 'দশচক্র' এবং 'বিনি পয়সার ভোজ', মিনার্ভায় 'বিদায় সভা' ইত্যাদির এক বা একাধিকবার অভিনয় প্রমাণ করে প্রযোজনার ইচ্ছা থাকলে এবং সঠিক নির্দেশকের হাতে পড়লে পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাটক আদৃত হতে পারে।

এখানে একটি ঘটনা স্মরণীয় ঃ 'আর্ট থিয়েটারে' অহীন্দ্র চৌধুরী 'চন্দ্র'র ভূমিকায় নামতেন।

৮.৩.৭.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাট্যজগতে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান আলোচনা করো।

৮.৩.৭.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ৮

. শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.৮.১ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

৮.৩.৮.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.৮.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৩.৮.১ঃ শিশির কুমার ভাদুড়ী ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী পারিবারিক প্রভাবেই নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। সতের বছর বয়সে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন মঞ্চে শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ব্রুটাস-এর ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর মঞ্চজগতে (১৯০৬) আত্মপ্রকাশ। তখন তাঁর ছাত্রজীবন। ইতোমধ্যেই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। বি. এ. পাশ করার আগেই তিনি 'হ্যামলেট' নাট্যাভিনয়ে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে একটি পরিণত বয়সের চরিত্রে রূপদানের দুঃসাহস দেখেই বুঝে নেওয়া যায় যে অমৃতলাল-গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে যে শূন্যতা বাংলার রঙ্গমঞ্চে দেখা গিয়েছিল তাকে পূর্ণ করতেই শিশিরকুমারের উপস্থিতি। ১৯৫৯ -এ 'আলমগীর' ও 'রীতিমত নাটকে' জীবনে শেষ অভিনয়ে অংশগ্রহণের আগে পর্যন্ত তিনি 'বুদ্ধদেব চরিত', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'জনা', 'রঘুবীর', 'সীতা', 'বসন্তলীলা', 'পাষাণী', 'পুণ্ডরীক', 'পুনর্জন্ম', 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে', 'বিসর্জন', 'প্রফুল্ল', 'ষোড়শী', 'গোড়ায় গলদ', 'ভ্রমর', 'বলিদান', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'রাণা-প্রতাপাদিত্য', 'মন্ত্রশক্তি', 'কর্ণার্জুন', 'তপতী', 'গৈরিক পতাকা', 'শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সরমা', 'বিজয়া', 'দশের দাবী', 'অচলা', 'জীবনতরঙ্গ', 'বিন্দুর ছেলে', 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মাইকেল মধুসূদন', ইত্যাদি আরও কত না নাটকে অভিনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ। এই তালিকাটি আরও দীর্ঘ করলে বিশদভাবে বোঝা যেত, যে-কোনো শ্রেণীর নাটকে যে-কোনো ধরনের চরিত্রে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কত সহজ ও সাবলীল ছিলেন। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁর অভিনয় দেখেছিলেন তাঁরা একবাক্যে বলে গিয়েছেন মানুষটি ছিলেন সরল, সোজা, খাঁটি এবং অবশ্যই ঋজু। তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভা যেমন তাঁকে দু-হাত ভরে দিয়েছিল দর্শকের শুভেচ্ছা, তেমনি একদল ব্যর্থকাম ব্যবসায়িক বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষ তাঁকে বারবার করেছিল আঘাত। কিন্তু শেষপর্যন্ত জিতেছিলেন শিশিরকুমারই।

উনিশ শতকে অনেক প্লে-রাইট ছিলেন, খ্যাতনামা অভিনেতাও ছিলেন। তবু শিশিরকুমারের মধ্যে তাঁদের ছাপিয়ে আর এক নতুনত্ব এল। এ সম্পর্কে গণনাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট শিল্পী গঙ্গাপদ বসুর মন্তব্যই আমাকে সর্বাধিক নাড়া দেয়। তিনি লিখেছেন ঃ

সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সুপণ্ডিত, সদ্বংশজাত একজন অধ্যাপকের অপাংক্তেয় নটের বৃত্তি গ্রহণ করার সংবাদটাই ছাত্র ও তরুণ মহলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল সারা দেশে। সকলের মুখে মুখে তাঁর নাম। তাঁকে দেখবার জন্যেই লোকের প্রচণ্ড উৎসাহ।

তাই শিশিরকুমার অবশ্যই একটি যুগ। শিশির যুগ। 'গৈরিশযুগের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের পার্থক্য, তাঁর নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গিতে তাঁর নাট্যায়নবোধের দীপ্তিতে ..... মৌলবাধে নয়।' অধ্যাপনা ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে মঞ্চের মধ্যে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্তই তাঁকে সেই বিশেষ প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশে শক্তি যুগিয়েছিল। তবে এর জন্য তাঁকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। ঘুণে ধরা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জগতে তিনি ছিলেন আমৃত্যু আপোষহীন সৈনিক।

শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় যে তাঁকে বিপ্লবী মনের অধিকারী বলে গিয়েছেন তা অত্যুক্তি নয়। পেশাদারী মঞ্চের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন, নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত তৈরী করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের জগতে এমন সংগ্রামী মানুষ আমরা ক'জনকে পেয়েছি ?

শিশিরকুমারের সান্নিধ্যমুগ্ধ প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্রের কথাতেই প্রথম আসি। তিনি লিখেছেন ঃ

'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠত, বিস্ফোরণের শব্দ হত মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চিৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেত। পিছনের চট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেত, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত সেই লালের মধ্যে।

যতক্ষণ দিল্লী ধ্বংসের এই তাণ্ডব চলত নেপথ্যে, ততক্ষণ মঞ্চের সামনের দিকের আলো নিভে থাকত, আর একেবারে পিছনে, ছাতের পাঁচিলের সামনে নাদির শাহ দাঁড়িয়ে থাকতেন ছায়ার মত, দর্শকদের দিকে পিঠ করে। এইখানে নাদিরের কিন্তু বক্তৃতা আছে নাটকে। সেটা হয়ত আগে বলা হত, কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন হত না। তার চেয়ে এই ছবিটা ঢের বেশি বিচলিত করত।

তারপর ক্রমশ যুদ্ধের আওয়াজ মরে যেত। সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়ার drum বাজত, আর দিল্লীর সাধারণ লোকের হাহাকার ও গোঙানী শোনা যেত। এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতাম তাহলে 'নবান্ন'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হত না একথা অনস্বীকার্য।'

বাংলা গণনাট্যের প্রথম যুগে শিশিরকুমারের সঙ্গে গণনাট্য শিল্পীদের যে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়েছিল তার প্রমাণ রেখেছেন গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র প্রমুখরা। শিশিরকুমার ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সঙ্ঘকে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল' নাটকের অভিনয়ের জন্য শ্রীরঙ্গম মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৬-এ তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন শিশিরকুমার। সঙ্ঘের প্রতি তাঁর ভালবাসা কতখানি ছিল তা বুঝবার জন্য এই তথ্যগুলিই যথেষ্ট।

শিশিরকুমারের সংগ্রামী চেতনার বিকাশ সেই ১৯২২ সালে 'রঘুবীর' নাটকের অভিনয়ের কাল থেকেই। অন্যায় অত্যাচার দেখে ভীল দস্যু রঘুবীর প্রতিকার করতে নেমেছিল। 'নাটকে অত্যাচার সম্বন্ধে আভাসে বিদেশী শাসকের অত্যাচার পীড়নের ইঙ্গিত ছিল — ছোরা লুফতে লুফতে যেভাবে শিশিরকুমার এ দৃশ্যে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেন, সে দৃশ্যে দর্শকরা উপলব্ধি করতেন এ শুধু রঘুয়ার জাগরণ নয় — আমাদেরও এমনিভাবে জাগতে হবে।

প্রযোজনার ব্যাপারে শিশিরকুমার কারও হস্তক্ষেপ সহ্য করেননি। ম্যাডান থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে এজন্যই তাঁর মনান্তর শুরু হয়। এক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব আধুনিককালের পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন — "অবাঙালী মালিক। 'আলমগীর' নাটকে রূপনগরের ভুঁইয়া রাজার বাড়ির দৃশ্য গরীব রাজা ..... চাষবাস করেন ..... তাঁর প্রাসাদ হবে ভাঙাচোরা পাথরের বাড়ি ..... তেমনি দৃশ্য তৈরী করিয়েছিলাম — কোম্পানীর মালিক বললেন — না, তা হবে না। পেন্টার হুসেন বেগমকে হুকুম দিলেন — 'সব সোনে লাগাও।' ব্যস.... জমকালো প্রাসাদ তৈরী হল। একি সহ্য হয় ? .....আমার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার করা নয়..... আমি চাই নতুন করে বাঙলা থিয়েটারকে গড়ে তুলতে। কাজেই নিজের থিয়েটার চাই।' (সূত্র ঃ 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' — শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য)। এক মাসের মধ্যে তিনি ম্যাডান ছেড়ে চলে আসলেন এবং ১৯২৪ সালে নিজস্ব মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। সে সময় তিনি যাতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' মঞ্চস্থ করতে না পারেন সেজন্য আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমারকে কিভাবে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের পক্ষে চুক্তি করিয়ে নিয়েছিলেন তা অনেকেরই জানা। কিন্তু শিশিরকুমার কোনোদিনও পিছনে হাঁটার মানুষ ছিলেন না। তাই তিনি যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে অনুরোধ করে 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নিয়েছিলেন এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। আর্ট থিয়েটারের প্রভূত অর্থের বিরুদ্ধে তাঁর চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়িত হয়েছিল 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' মঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সেই মঞ্চের প্রথম প্রযোজনা যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

তবু অর্থের বিরুদ্ধে শিল্প এবং মানবজীবনের জন্য তাঁর সংগ্রাম কখনও থেমে থাকেনি। সুস্থ সুন্দর নাট্যপ্রযোজনার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে ঋণগ্রহণের জন্য তিনি পিছুপা হননি, কিন্তু বিত্তবান মঞ্চ মালিকদের কাছে মাথা নীচু করেননি কোনোদিন।

স্বাধীনতার পর বাংলা রঙ্গমঞ্চের উন্নতি ঘটবে, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন আকাঙ্ক্ষা শিশিরকুমারের ছিল। দিল্লীতে নাটক আকাদেমী স্থাপনের পর তাঁকে প্রদান করা হল একটি ফেলোশিপ। কিন্তু তা ত' তিনি চাননি। স্বাধীন দেশের সরকারের সম্মানের আগেই ত' লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করেছে। অথচ জাতীয় নাট্যশালার বিষয়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন ফেলোশিপ। তাই বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার যখন বাংলায় নাটকের আকাদেমীর 'ডীনে'র পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায় তখনও তাঁর একই প্রতিক্রিয়া ঃ — "সরকারী পদ নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি! ওই কাজের অনেক ফ্যাসাদ — সরকারের উদ্যোগে কোনো নাটক নামালেই থাকবে ওদের হস্তক্ষেপ। আমার কোনো হাত থাকবে না, ওদের ফরমাসমত কাজ করতে হবে। নাটক প্রযোজনা করতে

হবে। ওসব আমার পোষায় না।" শিশিরকুমার ঠিকই বলেছিলেন। প্রায় সে সময় নাট্যকার মন্মথ রায় এজন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ চাকরি ছেড়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ; বামফ্রন্ট সরকার যে নাট্য আকাদেমী স্থাপন করেছে তা শিশিরকুমার দেখে যেতে পারেননি। তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পেতেন, যেমন পেয়েছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। এর প্রধান কারণ বামফ্রন্ট সরকার নাটকের উপর যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপেরই বিরোধী।

তাই বলে একথা মনে করলে ভুল হবে যে নাট্যজগতের ক্ষেত্রে অবিচারের ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী, বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন নিঃস্পৃহ। এই প্রসঙ্গে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। ১৯৫৬ সাল। নেহেরু - বিধানচন্দ্রের আমল। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি নেমে এলেন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে, সংযুক্তি-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি রইলেন সামনের সারিতে। জয় হল জনগণের, প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল।

তিনি যখন প্রচণ্ড অর্থাভাবে চোখের ছানি পর্যন্ত কাটাতে পারছেন না সেই সময় অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তাঁকে ছ-হাজার টাকা পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। তখন তিনি বৃহত্তর নাট্যজগতের কথা, আন্দোলনের কথাই ভাবছিলেন। তাই তার পরের বছর মৃত্যুর মাত্র ছ-মাস আগে যখন তিনি জানলেন যে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন তখন সে সম্মানও হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করতে তাঁর মুহূর্তমাত্র সময় লাগল না। এই সূত্রে তিনি যে ঐতিহাসিক পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন তা উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি স্বাধীন ভারতের সরকারের ঔদাসীন্যের জন্য তিনি কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর চিঠিটির অংশবিশেষঃ

From :
Sri Sisir Kumar Bhaduri
278, B. T. Road
Calcutta - 36

To
Sri B. N. Jha
Home Secretary, Govt. of India
New Delhi.

Sir,

I gather from the newspapers that a decoration of 'Padma Bhusan' has been awarded to me.

It is unfortunate that I was not sounded it before this, for though the appreciation for whatever merits I have is no doubt gratifying. I found it impossible to accept it on principle. Had I been consulted, it would have been saved much embarrassment....

I received a congratulatory telegram from the Home Secretary addressed to 'Srirangam', my theatre, which has been taken away from me by an order of the Court over three years ago for failure of pay rents. There are men in the Government and in the Academy, who are aware of the fact that the theatre has been my life's work, and they know that I have today no stage of my own

to act on. They also know that there is no public-owned non commercial stage, even in Calcutta, devoted to the cause of the advancement of the theatre as an integral part of our life as a nation, and the Government have no plans to build one.

If the Government really wish to honour me and through myself, the cause I have served for nearly forty years, a more befiting tribute would have been the gift of a public stage to the city of Calcutta. For it is too late to retrieve the theatre I have lost.

I cannot accept the honour, and would request you to find out the means to relieve me of the burden of receiving it.

Yours etc.

Sd/ Sisir Kumar Bhaduri

Calcutta,
Dated 2nd February, 1959.

কি তীব্র স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। অথচ প্রত্যাখ্যানের কারণগুলি কত যুক্তিপূর্ণ। বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রতি কি গভীর মমতা! তবে অভিমানী শিশিরকুমার বেঁচে থাকলে সুখী হতেন এই দেখে যে অহীন্দ্র মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ইত্যাদি স্থাপনার মধ্য দিয়ে, নাট্য আকাদেমী প্রবর্তনার সাহায্যে, বামফ্রন্ট সরকার অপেশাদারী নাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজককে অন্তত স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগের মধ্যে টেনে এনেছে। আর বেঁচে থাকলে অবশ্যই ধিক্কার জানাতেন অধ্যাপক সফদার হাসমির মত সৃষ্টিশীল বিপ্লবী নাট্যকার ও অভিনেতাকে কাপুরুষোচিত হত্যার বিরুদ্ধে।

৮.৩.৭.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাট্যমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অবদান আলোচনা করো।

৮.৩.৭.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ৯

নাট্য পরিচালনা : শতবর্ষ – অতিক্রান্ত ইতিহাস

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.৯.১ নাট্য পরিচালনা : শতবর্ষ – অতিক্রান্ত ইতিহাস

৮.৩.৯.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.৯.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৩.৯.১: নাট্য পরিচালনা ঃ শতবর্ষ - অতিক্রান্ত ইতিহাস

নাটক এমন এক শিল্পকর্ম বা 'আর্ট ফর্ম' যার পূর্ণাঙ্গ সাফল্য আসে, মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে যত বাংলা নাটক রচিত হয়েছে তার কথাই ধরা যাক। শৌখিন থিয়েটার, পেশাদারি থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চে একবারের জন্যও মঞ্চস্থ হয়নি, এমন হাজার হাজার নাটকের কথা আমরা জানি। এর কারণ সংলাপধর্মী রচনা মাত্রেই নাটকের গৌরব পেতে পারে না। সেই সাফল্যের পিছনে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশক্তি যেমন ক্রিয়াশীল হতে হয় তেমনই নাটকটিকে পড়ে-বুঝে অতঃপর তার উপস্থাপনার জন্য নাট্যাভিজ্ঞ পরিচালক চাই। সুপরিচালক হতে হলে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান থাকা চাই নাটকের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর —

(ক) **নাট্যকাহিনী** — সেই কাহিনীর ভিত কতখানি মজবুত? নাটকের গল্পটি দর্শকচিত্তে আদৌ আকর্ষণ করতে পারবে কি না।

(খ) **নাট্য সংলাপ** — সংলাপ আদৌ গতিশীল কি না। কোথায় কোথায় সংলাপ দীর্ঘ হয়েছে, তা বুঝে, প্রয়োজনে সম্পাদনা।

(গ) **নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলির আন্তর-ধর্ম অনুধাবন** — নাটকের ক্ষেত্রে কোনোও চরিত্র অপ্রয়োজনীয় কিনা তা খুঁজে বের করা। যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী উপস্থিত তাঁদের জন্য সঠিক চরিত্র নির্বাচন।

(ঘ) **চরিত্রের রূপসজ্জা** — নাট্যকাররা এক্ষেত্রে অতীতে পরিচালকদের সাহায্য করেছেন। তবে আধুনিক নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে পরিচালকদের ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। এখন বিভিন্ন নাট্যকার চরিত্রদের হাবভাব, চালচলন প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার ফলে পরিচালকদের পক্ষে তা সহায়ক হয়।

(ঙ) নাট্যচরিত্রের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা এবং চরিত্রদের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রিহার্সালের পূর্বে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে নাটকটি এক বা একাধিকবার পড়বেন, প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করবেন, এবং তাঁদের কাছ থেকে কেমন অভিনয় আশা করেন, তা বুঝিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ চরিত্রাভিনেতাদের মতামত গ্রহণও করতে পারেন। এজন্য পরিচালকদের কিছুটা ঔদার্যের প্রয়োজন।

(চ) যে কোনোও নাটক প্রযোজনার সময় প্রধান দায়িত্ব পরিচালকের। যে কোনোও ব্যর্থতা বা সাফল্যের জন্য সর্বপ্রথম তিনিই নিন্দিত না নন্দিত হন। এজন্য, এমন কি, চরিত্রদের রূপসজ্জার প্রতিও তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়। আপাতভাবে মনে হতে পারে চরিত্রের মেক্‌আপ দেওয়ার জন্য তো রূপসজ্জাকরই আছেন। ঠিক কথা। রূপসজ্জাকর একজন মুসলমান বা হিন্দু সম্রাটের ব্যাপারটি ভালই বোঝেন ; কিন্তু নাটকের কাহিনীর বিভিন্নতা এবং চরিত্র-র বিভিন্নতার ফলে তার রূপসজ্জাও পৃথক হবে। যেমন দারা এবং আওরঙ্গজেবের মেক-আপ একই রকম হবে না। হয়ত কোনোও রূপসজ্জাকর একজন শ্রমিকের মুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত রুজ লাগিয়ে দিলেন। কিংবা বৃদ্ধের মুখে বলিরেখা দেখানর জন্য যেখানে রঙ ব্যবহার করা উচিত ছিল, সেখানে তা না করায় পিতাপুত্রের বয়সে বিশেষ পার্থক্যই দেখা গেল না। এসব দিকে অভিনয়ের আগেই পরিচালককে দৃষ্টি দিতে হয়। পেশাদারি মঞ্চে পরিচালক নিয়মিত হাজির থাকতে বাধ্য নন। কাজেই চরিত্রদের রূপসজ্জায় অনেক ঘাটতি থাকে। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চায়নে পরিচালক-চরিত্রাভিনেতার অনিবার্য ঘনিষ্ঠতা এক্ষেত্রে প্রায় নির্ভুল রূপসজ্জার পরিচয় বহন করে।

(ছ) এক্ষেত্রে যে সব পরিচালক রূপসজ্জায় ব্যবহৃত রঙের সঙ্গে আলোর সামঞ্জস্য সঠিক অনুধাবন করে আলোক-সম্পাতকারীকে সঠিকভাবে চালিত করেন তিনিই যোগ্য পরিচালক। আগেকার নাটকে সময় নির্দেশ করেই নাট্যকারগণ দায়িত্বসম্পন্ন করতেন। যেমন — কাল-সন্ধ্যা ; কাল - রাত্রি। আধুনিক নাটকে এই পরিচিতিদানও আরও নির্দিষ্ট। যেমন বিদ্যুতের আলো, ঝড়, বস্তির অপরিসর রাস্তায় আলোর অবস্থান ইত্যাদি। এর ফলে একালের নাট্যপরিচালকদের অনেক সুবিধা হয়ে যায়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা নানাযুগে পরিচালকদের মঞ্চায়নের পূর্বপ্রস্তুতির কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

পরিচালক গিরিশচন্দ্র

'অনেক সময় হয়ত তিনি যা ভেবেছেন, তাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে অসমর্থ হয়েছেন তৎকালীন মঞ্চের দৈন্যের জন্য, মালিকদের উপর্যুপরি নূতন নাটক দাবির জন্যে, এবং তজ্জনিত তাড়াহুড়োর জন্যে। তথাপি গিরিশ যা চিন্তা করে গেছেন, আমাদের ধারণায় এখনও পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালার কোনোও পরিচালক তার পরিধি অতিক্রম করতে পারেননি।' (গিরিশ মানস। উৎপল দত্ত)

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একথা বুঝতে হবে সেকালে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি রঙ্গমঞ্চ থেকে কেন গিরিশকে পরিচালক হিসেবে পাবার জন্য নানা 'চক্রান্ত' করতে হত। ৫.২.১৮৯৩ -তে তাঁর পাঁচ অঙ্কের মিলনান্ত প্রেমের নাটক মঞ্চস্থ হয় 'মিনার্ভায়'। পরিচালকও তিনি। বিজ্ঞাপনে তিনি নিজেই জানালেন — 'যথাযোগ্য দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছি। যথাসাধ্য সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছি। ভরসা করি, দর্শকবৃন্দ নিজগুণে আমার এ নব-উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিবেন। এ হল একশ বছর আগেকার কথা। তখন আজকের মত সার্বিক সুবিধা, যন্ত্রের সুবিধা, আলো-রূপসজ্জা-ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সুবিধা গিরিশচন্দ্র পাননি। কিন্তু অভিনেতাদের নিষ্ঠা ছিল, দর্শকদের মঞ্চানুগত্য ছিল। সেই প্রেরণাতেই তিনি কালজয়ী পরিচালক হতে পেরেছিলেন।

আবার সেই পরিচালকও কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে দর্শকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেন। 'কালাপাহাড়' জমেনি, 'মায়াবসান'ও ব্যর্থ। কিন্তু সেজন্য পরিচালক গিরিশ দায়ী নন, অতিভাবালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন নাট্যকার গিরিশ দায়ী।

পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নাট্যপ্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বেশ ক-বছর ধরে। তারই দু-তিনটিতে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস আলোচনাসূত্রে আমি বিশেষভাবে অতীতের অতি পরিচিত নাট্যকার-পরিচালকদের কথা বলেছি এ কারণেই যে উত্তরাধিকারই আমাদের কৈশোর ও প্রথম যৌবনে মিনার্ভা, বিশ্বরূপা প্রভৃতি মঞ্চে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার', তাপস সেনের আলোকসম্পাতে আর একটি নাটক 'সেতু' তুমুল হৈ-চৈ তুলেছিল। এসবই অমরেন্দ্রনাথের অনুসরণ বলে আমি মনে করি। আসলে গত একশ বছর বাংলা নাটকের পরিচালকরা একটি সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই চলেছেন। তাই একালের বাস্তবধর্মী দৃশ্যসজ্জার পাশাপাশি মধ্যযুগীয় দৃশ্যসজ্জা ঠিকই চলছে। একালের পরিচালকরা ব্রেশ্‌ট-গর্ডন ক্রেগ প্রমুখের পাশ্চাত্য রীতি যেমন গ্রহণ করছেন, তেমনই বাংলার লোকনাট্য থেকেও নৃত্যগীত-চরিত্র গ্রহণ করছেন। অমরেন্দ্রনাথকেও ভুলতে পারছেন না।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস প্রমাণ করে যে কোনোও প্রযোজনার ক্ষেত্রে পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে দৃশ্যপট নির্মাণ, রূপসজ্জা ইত্যাদি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়ের সংবাদ রাখতেন। 'ক্লাসিক' থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনার বিজ্ঞাপনেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। —

নল দময়ন্তী — Splendid Lotus Scene ! একটি ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।

সে সময়ই অভিনয়ের পাশাপাশি কাট-আউটের ব্যবহার, সেট-সিন, নকল আসবাবের বদলে প্রকৃত খাট, আয়না, টেবিল চেয়ার, রঙিন আলো, স্পট লাইট ইত্যাদির প্রবেশ দেখা গেল। নাট্যশালায় দর্শক আকর্ষণ সর্বযুগের প্রধান লক্ষ্য। সেকালে ও একালেও। তাঁর সার্বিক পরিচালনার গুণে 'ম্যাটিনি শো' চালু হল। গঙ্গার জলে শৈবলিনী-প্রতাপের সাঁতার কাটার দৃশ্য। আকাশে ওড়া, ঝর্ণার দৃশ্যে মঞ্চের উপর ঝর্ণাধারা, সূর্যধারা, সূর্য ওঠা ও অস্ত যাওয়া, ঝড় বৃষ্টি — কী ছিল না ?

শিশিরকুমার পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথকে সরাসরি অনুসরণ করলেন। ১৯২৪ সালে 'নাট্যমন্দিরে' 'সীতা'র অভিনয় চলছে। পরিচালক শিশিরকুমার। তিনি খুঁজে আনলেন শিল্পী চারু রায়কে। দুই প্রতিভার মিলনে প্রাচীন ভারতের প্রামাণিক স্থাপত্য ব্যবহৃত হল রঙ্গমঞ্চে। ১৯৩৩-এ রঙমহলে 'মহানিশা' নাটক প্রযোজিত হলে এর পূর্ণতা দেখা গেল ; ভিন্ন রূপে।

আর আজকের দিনের পরিচালকদের কথা পৃথকভাবে বলছি না। এখন পেশাদারি মঞ্চে পরিচালকদের ভূমিকা কতটুকু ? এক কালে স্টারে মহেন্দ্র গুপ্ত ও অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যপরিচালনা করেছেন দাপটের সঙ্গে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'রঙমহলে' তাঁর স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। তাঁরা পরিচালক মানে, তাঁদের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। এর ভাল-মন্দ — দুই-ই ছিল, তবে ভালটাই বেশি।

পেশাদারি মঞ্চে পরিচালকের গুরুত্ব কমতে শুরু করল ১৯৫৩ সাল থেকে। স্টারে 'শ্যামলী' নাটক মঞ্চস্থ হতে লাগল। চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার নায়ক, চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী নায়িকা। মঞ্চের ভিতর চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটল। পরিচালকের আধিপত্য আর রইল না সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী যেহেতু দর্শকদের কাঙ্ক্ষিত — তাই অভিনয়ের মানবৃদ্ধির জন্য রিহার্সালের ভূমিকাই রইল না। সম্প্রতি কলকাতার পেশাদারি মঞ্চে যে সব নাটক চলছে তাতে চলচ্চিত্রাভিনেতার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাঁদের সময় মাপা। পরিচালক সম্ভবত তাঁদের দূর থেকেই দেখেন। ফলে অধিকাংশ প্রযোজনাই 'ভাল নাটক' হয়ে উঠতে পারে না, যতই জনপ্রিয় হোক না কেন।

নাট্যপরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঃ অনুকরণযোগ্য

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা কমবেশি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের। নিজের মঞ্চ, নিজের তৈরী অভিনেতা-অভিনেত্রী। তিনি নিজেও অভিনয় করতেন, গান গাইতেন। স্টেজ সাজানোর পাঠ দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে, বিলিতি ধরনের মঞ্চসজ্জার জন্য উৎসাহিত করতেন হরিশচন্দ্র হালদারকে। অভিনয়ভূমি হিসেবে ঘেরা মঞ্চের চেয়ে পছন্দ করতেন খোলা গাছ-মাঠ-পথের বিন্যাস। নাট্যাভিনয়ের মধ্যে লোকাভিনয়ের ধারা তিনিই প্রথম নিয়ে আসেন। তাঁর নাট্যমঞ্চ বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত, অন্য কোনোও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে মিলবেই না।

তবে দৃশ্যপট ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের প্রভাব কি রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল ? হতে পারে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

(ক) বেথুন কলেজের মাঠে 'মায়ার খেলা'র যে অভিনয় হয়েছিল, তাতে মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মাথায় বিলিতি পরীর অনুকরণে ইলেকট্রিক আলো জ্বলেছিল।

(খ) দীনেন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা' অভিনয়ের সময় স্টেজে ঘোড়া নিয়ে ঢুকতেন।

(গ) 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য তারাখচিত গভীর নীলাকাশের পটভূমি তৈরি করা হত।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অভিনয়ের বিবরণে কিংবা তাঁর চিঠিপত্রে বা তাঁর নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক, গগনেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখছেন — 'গগন, 'ফাল্গুনী'র সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate — ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পর প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবে না, কেননা একবারও যবনিকা পড়বে না। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা কিছু যদি করা যায় তা হলেও চলে — তাহলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার ওপর দিয়ে কেটে যায়। আর একটা কথা, অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তাহলে সেটাতে বিজ্ঞাপনও হবে, শ্রোতাদের বোঝবার সুবিধা হতে পারবে। প্রোগ্রামের নাম দিও নাট্যবিষয়সার। .....রাস্তা দিয়ে পথিক চলাচলের by play টা তোমরা করে নিতে পারবে, সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছনে দিয়ে কেবল এই রকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।'

দুই, রবীন্দ্রনাথের নাট্যপরিচালনা সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন — 'নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় তিনি একা শিখিয়েছেন পাখি পড়ানোর মত। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে ঝোঁক দিতে হবে, কি ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আনতে হবে, সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়ে দিয়েছেন। একসময় এমন ব্যক্তিকেও তৈরি করেছেন যাকে দেখে অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে করতে পারেনি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনেতার চালচলনে, হাবভাব অভিনয়কালে পাছে কোনোও প্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে ওঠাবসার, হাতের ও দেহের ভঙ্গি কি রকম হলে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে সেদিকেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না।'

এই আন্তরিকতা আমরা গণনাট্যের যুগে এসে অনুসৃত হতে দেখলাম। গণনাট্যের নাট্যপরিচালক একজন করে রইলেন ঠিকই, কিন্তু অনুশীলনের সময় সকলের অভিমত পরিচালক শুনতেন এবং এখনও শোনেন। চল্লিশের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের জন্মই হয়নি — 'জবানবন্দী', 'সংকেত', 'নবান্ন' ইত্যাদি প্রযোজনার ক্ষেত্রে গণনাট্য সমষ্টির অভিমতকে গুরুত্ব দিলেন। গণনাট্যের প্রথম পর্যায়ের রূপকার বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার প্রমুখরা। এঁরা সকলেই হয়ত নাট্যপরিচালনা করেননি, কিন্তু সকলেরই সে যোগ্যতা ছিল। গণনাট্যের ক্ষেত্রে কোনোও একক ব্যক্তিত্বের পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না একারণেই যে সংঘের দলিল মেনে ছোট বড় সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রামী নাটকে অংশ নিতেন। সাজসজ্জা, ম্যানারিজম, ভাঁড়ামি, আলোকসম্পাত

ইত্যাদি গণনাট্যের পরিচালক ও শিল্পীদের বিভ্রান্ত করত না। তাই প্রতিটি প্রযোজনা নাড়া দিত। ১৩৫১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পরিচয়ে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'নবান্ন' অভিনয়কে যে 'ভারতের মর্মবাণী' লিখেছেন তা কেবলই পরিচালকের সাফল্য-চিহ্নিত করতে নয়। তাঁর মন্তব্যই তুলে ধরছি —

'এদের এই অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য কোথা থেকে এল ? কি এদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা ? এর একটিমাত্র জবাব জানি — এঁরা শুধু শিল্পপ্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্যসংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতের যে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারও তা অজানা নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোনোও ইচ্ছাই গণনাট্য সংঘের নেই।'

এই বক্তব্যটির প্রতি দৃষ্টি দিলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। গণনাট্যের প্রতিটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে সাফল্যের পিছনে শিল্পীদের আন্তরিকতাই প্রধান। পরিচালক তাই বলে উপেক্ষিত নন। তাঁরও সমাজ-রাষ্ট্র, নাট্যবিষয় এবং নাট্যাঙ্গিকের উপর যথেষ্ট দখল থাকে। তবেই তো তিনি পরিচালনার দায়িত্ব পান। কিন্তু তিনি নিজেকে জাহির করেন না। জনগণের শিল্পকে সফলরূপ দিয়ে তিনি নেপথ্যেই থাকেন, কেননা জানেন, শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই নাট্য-অভিনয়ের প্রধান শক্তি।

গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার ঃ নেতৃত্বের প্রশ্ন ?

এই বিষয়টি নিয়ে পঞ্চাশের দশক থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে, চলছে এবং চলবে। প্রশ্ন ওঠে বহুরূপী কেন হল এবং তাতে শম্ভু মিত্র-র ভূমিকা কতখানি। প্রতিষ্ঠিত হল নান্দীকার। আবার তা থেকে সরে এসে সৃষ্টি হল থিয়েটার ওয়ার্কশপের। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ভেঙে হল অন্য থিয়েটার।

ওদিকে নান্দীকার থেকে সরে এল গড়া দল নান্দীমুখ। লিটল থিয়েটার গ্রুপ নাম বদল করে হল পিপল্‌স লিটল থিয়েটার। নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই তো পেলাম ক্যালকাটা থিয়েটার, থিয়েটার কমিউন প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটার। এঁরাই তো 'ব্যারিকেড', 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার', 'মারীচ সংবাদ', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'দানসাগর', 'তিন পয়সার পালা' ইত্যাদি সফল প্রযোজনা করলেন। তবে কেন গণনাট্য সংঘ ভেঙে যায় না ; গ্রুপ থিয়েটার বারবার ভাঙচুর হয় ? এক্ষেত্রে মোটামুটি সত্য হল এই — অন্তর্দ্বন্দ্ব জয় করে কেবল শিল্প ভাবনার কথাই চিন্তা করতে পারেন।

এখনকার নাট্যপরিচালকদের অনেক সুযোগ। প্রচারের সুযোগ, আধুনিক টেকনোলজির সুযোগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রঙ্গমঞ্চে নাটক উপস্থাপনের সুযোগ। এইসব সুযোগ কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে ক্ষতিও করে। আবার এমন গ্রুপ থিয়েটারের এমন পরিচালকও আছেন যাঁরা শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ের প্রশ্নে গণনাট্যের মতই পথে নেমে পথ নাটক করেন। তাদের নাম আলাদা করে করলাম না। তবে গণনাট্য ও অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালক ও নাট্যশিল্পীদের এই নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

৮. ৩.৯.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. একশ বছরের বাংলা থিয়েটার — ডঃ শিশির বসু

২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও একশ বছরের বাংলা নাটক — ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — ডঃ দর্শন চৌধুরী

৫. World Drama — A. Nicoll

৬. বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৮. বাংলা নাটকে চরিত্র — ডঃ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৮. ৩.৯.২ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

প্রবন্ধ রচনা করো — ৫০

১. বাংলা নাট্যশালায় লেবেডেফের অবদান

২. যাত্রা ও গীতাভিনয় — শৌখিন রঙ্গালয়

৩. উনিশ শতকের বাংলা পেশাদারী থিয়েটার

৪. বাংলা মঞ্চের অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্রনাথ — গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক

৫. বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী

৬. নাট্যপরিচালকের গুরুত্ব বিচার; রবীন্দ্রনাথের নাট্যপরিচালনার কৃতিত্ব

৮.৩.৯.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাট্যমঞ্চে নাট্য পরিচালনা ও তার শতবর্ষ – অতিক্রান্ত ইতিহাস বর্ণনা করো।

৮.৩.৯.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ১০
বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ

বিন্যাসক্রম :

৮.৩.১০.১ বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ

৮.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮. ৩.১০.১ঃ বঙ্কিম - উপন্যাসের নাট্যরূপ

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা উপন্যাস রচনার রাজপথ নির্মাণের কাজে হাত দেন তখন বাঙালী ধনীদের উদ্যোগে কলকাতা শহরের বুকে রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্যরচনা চলছে দ্রুতগতিতে। শৌখিন নাট্যশালা থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পৌঁছবার জন্যে তোড়জোড়ও দেখা যাচ্ছে। মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর সঙ্গে নাড়ীর টান অনুভব করতেন তিনি। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সাহিত্য সৃষ্টি পর্বে তিনি একটিও নাটক লিখলেন না, কোনো পাশ্চাত্ত্য বা সংস্কৃত গদ্যরচনার নাট্যরূপও দিলেন না। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে বার হতে শুরু করে এবং ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। পাঠকসমাজে উপন্যাসটির কি বিপুল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তা পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থের পাতাতেই পাই। একথা পরে লেখা চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী উপন্যাস সম্পর্কেও সমভাবে সত্য।

তাহলে কি বুঝতে হবে নাটক রচনার কলাকৌশল সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা ততখানি ছিল না, যতখানি উপন্যাস সম্পর্কে ছিল ? 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি পড়লে সে সংশয় দূর হবে। সেখানে নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এই সূত্রেই 'দীনবন্ধু মিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি মনে আসে যেখানে নাট্যরস এবং নাট্যসংলাপ সম্পর্কে অভ্রান্ত বিশ্লেষণ রয়েছে। গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল যতখানি মন দিয়ে শেক্সপীয়র পড়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। অথচ পূর্বোক্ত দু-জন গেলেন নাট্যআঙিনায়, বঙ্কিম - উপন্যাসের প্রাঙ্গণে। তাহলে ধরে নিতেই হয়, নাট্যসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থাকলেও নাট্যরচনার তাগিদ তাঁর অন্তরে জাগেনি। আমাদের হাতে এমন কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য নেই যা থেকে বোঝা যাবে তাঁর জীবদ্দশায় ন্যাশানাল, গ্রেট ন্যাশানাল, বীণা, স্টার, কোহিনুর, এমারেল্ড কিংবা বেঙ্গল থিয়েটারের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাটক রচনার আবেদন পৌঁছেছিল। প্রকৃতপক্ষে নাটক রচনার প্রতি তাঁর অনীহার কথা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষরা জানতেন এবং তাই তাঁরা সে পথে পা বাড়াননি।

অথচ বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠকমাত্রই জানেন তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই নাটকের মালমসলা কি বিপুল পরিমাণে ছিল। চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ, সংগীত — নাটকের এইসব প্রধান উপাদানগুলি বঙ্কিমের সব উপন্যাসেই প্রভূত পরিমাণে রয়েছে। সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যানুগ। লেখকের বিশ্লেষণ অংশগুলি বাদ দিয়ে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেই যে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার প্রথম শ্রেণীর নাট্যরূপ দিতে পারতেন। দিয়েছিলেনও। গিরিশচন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও সেকালের যাঁরা বঙ্কিম - উপন্যাসের নাট্যরূপ

দিয়েছিলেন তাঁরা কেউই উচ্চাঙ্গের নাট্যকার ছিলেন না ; অথচ একই উপন্যাসের একাধিক নাট্যরূপদাতার নাম পাওয়া যায়, তাঁদের একটিও নাট্যরূপ সেকালের পাঠক-দর্শকের বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়েছিল এমন তথ্য আমাদের হাতে নেই। উনিশ শতক জুড়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ কেমন আদৃত হয়েছিল তার সামান্য পরিচয় তুলে ধরছি —

কপালকুণ্ডলা	ন্যাশানাল থিয়েটার	১৮৭৩
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	১৮৭৩
মৃণালিনী	গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার	১৮৭৪
বিষবৃক্ষ	গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার	১৮৭৫
চন্দ্রশেখর	বেঙ্গল থিয়েটার	১৮৭৮
আনন্দমঠ	ন্যাশানাল থিয়েটার	১৮৮৩
দেবী চৌধুরাণী	বীণা থিয়েটার	১৮৯১
কৃষ্ণকান্তের উইল	এমারেল্ড থিয়েটার	১৮৯২
রজনী	বেঙ্গল থিয়েটার	১৮৯৫
রাজসিংহ	স্টার থিয়েটার	১৮৯৬
ইন্দিরা	ক্লাসিক থিয়েটার	১৮৯৮

বলাবাহুল্য উপরের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কেবল প্রথম মঞ্চায়নের তারিখ ধরেই। বিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপের কদর যে খুব একটা কমেনি তা নাট্যদর্শকমাত্রেরই জানা আছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় এবং গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়ে সীতারামের ভূমিকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। ১৯০৬-এ গিরিশচন্দ্র নতুন করে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দেন এবং মিনার্ভায় সেটি অভিনীত হয়। তার অর্থ বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত আধুনিক চিন্তারাজ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র স্থানচ্যুত হননি। ১৯২৬ সালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার নাট্যপ্রিয় জনতার তাগিদে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত নাট্যরূপ 'ভ্রমর'-এর প্রযোজনা করে ব্যাপক লোকআকর্ষণ করেছিলেন। তার মানে বাংলা সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে বিশ শতকেও বঙ্কিমের আকর্ষণ ছিল অম্লান।

অমৃতলাল বসু গত শতকে ব্যঙ্গনাটক রচনায় রক্ষণশীল ভূমিকা সত্ত্বেও জনসমর্থন পেয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর ব্যর্থতার ছাপ রঙ্গমঞ্চেও পড়েছিল। 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যরূপ অমৃতলালও দিয়েছিলেন এবং সেটি হাতিবাগানে অভিনীতও হয়েছিল। কিন্তু নাটক হিসেবে সেটি ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রযোজিত নাট্যরূপের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। 'চন্দ্রশেখর' এবং 'রাজসিংহ' উপন্যাসের অমৃতলাল-কৃত নাট্যরূপ সম্পর্কেও এই কথা খাটে। তার কারণ দুটি। প্রথমত হিন্দুসমাজ ও ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র অমৃতলালের মত গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন না। তাই কুন্দ, রোহিণী, শৈবলিনী

প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল — সমাজের দাবীতে চরিত্রগুলিতে পরিণতি যাই হোক না কেন মানবিক মমতা এবং ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে টানাপোড়েন ছিলই। তাই সর্বশ্রেণীর বাঙালী তাঁর উপন্যাসে অবগাহন করত। কিন্তু 'বৌমা', 'খাসদখল' ইত্যাদি নাটকের রচয়িতা অমৃতলাল যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রকে নাট্যমধ্যে স্থাপন করেন তখন সেগুলি হয়ে দাঁড়ায় রক্তমাংসহীন, কৃত্রিম। তখনকার প্রগতিশীল নাট্যদর্শক সেজন্যই অমৃতলাল থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন, উপন্যাস রচয়িতা যদিও বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয়ত প্রহসন এবং সামাজিক নাটকের আঙ্গিক এক নয়। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্র প্লটের মধ্যে যে যৌগিক রীতি প্রয়োগ করেছিলেন, নাট্যরূপে অমৃতলাল তাকে বজায় রাখতে পারেননি।

অথচ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কেদারনাথ চৌধুরী প্রমুখ দ্বিতীয় সারির নাট্যকারগণ বঙ্কিম-উপন্যাসকে যথাযথ অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁর মানসিকতা বুঝে নিয়েছিলেন বলেই তাঁদের কৃত নাট্যরূপগুলি পেশাদার মঞ্চগুলিকে মোটা রকমের অর্থ এনে দিয়েছিল। অর্থ অবশ্য সৃষ্টিসাফল্যের মাপকাঠি নয়। আসল কারণ জনপ্রিয়তা। সেকালে যেহেতু শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র পড়তেন, তাঁদের দৃষ্টিতে তাই উপন্যাসের কোনো বিকৃতি সহ্য হয়নি। তাঁরা নাট্যকারেরা নামডাক শুনে রঙ্গমঞ্চে যেতেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি নাট্যমধ্যে বঙ্কিমানুগ কিনা তাই দেখতে যেতেন। সেজন্যই অমৃতলাল নন, গিরিশচন্দ্র এবং অমরেন্দ্রর বঙ্কিম - নাট্যায়ন তাঁদের কাছে আদরণীয় ছিল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে প্লটের যে বিন্যাস তা নাটকীয়তায় ভরপুর ছিল। তাই-ই তাঁর উপন্যাসের ত্রুটিগুলিকে ঢেকে দিত। নাটকের *Three unities* ছাড়াও *Unities of impression* সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা কতখানি ছিল তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 'দুর্গেশনন্দিনী'। গড়মান্দারণের পথে রৌদ্রতপ্ত দিনে যে রাজপুত্র চলেছিলেন তিনি তিলোত্তমার ভীরু হৃদয়ের কম্পিত বিনম্র প্রেম ও আয়েষার সদর্প প্রকাশিত প্রেম লাভ করেছিলেন নিজ ধৈর্য, বীর্য ও চরিত্রগুণে। গিরিশচন্দ্র উপন্যাসটির প্রথম নাট্যরূপ (১৮৭৪) এবং দ্বিতীয় নাট্যরূপ দেওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহকে একই ছাঁদে ঢেলেছিলেন। প্রথম নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপিটি খোয়া গেলেও মূল পরিকল্পনাটি তাঁর মনে গেঁথে ছিল। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে *sub plot* দেবেন্দ্র-হীরা থাকলেও, কাহিনীর একাগ্রতা কোথাও হারায়নি। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দ বৃত্তে বাস্তবসম্মত নাটকীয়তা বহুকাল বাঙালীচিত্তকে অনির্বচনীয় আস্বাদ দিয়েছে। *Villian* দেবেন্দ্রকে কোনো পাঠক ভুলতে পারেন ? কিন্তু শক্তিশালী নাট্যকারদের কেউই যে কেন তার নাট্যরূপ দিলেন না সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সে কী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে তুষ্ট করবার জন্য ? অমৃতলাল যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমমনস্তত্ত্ব অনুসৃত হয়নি। অথচ প্রায় একই সমস্যা নিয়ে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ভ্রমর' নামে সেটির নাট্যরূপ দেন। তিনি ছিলেন উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার, প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আঁকা গোবিন্দলাল, প্রতাপ, নবকুমার ইত্যাদি চরিত্রে তিনি স্বয়ং অভিনয় করতেন। ১৮৯৮ সালে 'ইন্দিরা' উপন্যাসটিকে নাট্যায়িত করে মঞ্চস্থ করার সময় তিনি বুঝলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের চাহিদা দর্শকদের কি অপরিমেয়। তাই পরের বছরই (১৮৯৯) 'ভ্রমর' রচনা ও মঞ্চায়ন। এই নাটকের জন্য প্রচারবিদ্ অমরেন্দ্রনাথ যত হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন তার একটি মাত্র উদ্ধৃত করছি :

> "ক্লাসিক থিয়েটার : ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা : শনিবার ২৪শে চৈত্র, রাত্রি ৯টা।। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন্ত ছবি।। ভ্রমর।। ভ্রমরের অভিনয় পুরাতন হইবার নয়!।। বারুণী পুষ্করিণীর

দৃশ্য যতবার দেখিবেন ততবার দেখিবার সাধ হইবে।। অধিক কি বলিব, ভ্রমরের পরিচয় ভ্রমর।।"

এমন অনেক হ্যাণ্ডবিল পাওয়া গিয়েছে যার কোনোটিতে আছে ..... 'অনুরোধে এক রাত্রি মাত্র।। ভ্রমর'; কোনোটিতে পাই ..... "বহুদিন পরে আপনাদের আদরের ভ্রমর।। অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল।" আবার একটি হ্যাণ্ডবিল লেখা .... 'গুড ফ্রাইডে ছুটি উপলক্ষে!! শেষ রজনী।। এ বৎসর আর হইবে না। এই ছুটির দিনে সহৃদয় সাধারণের বিশেষ অনুরোধে একরাত্রি মাত্র।। ভ্রমর।।'

আর ছিল সংলাপ। ছিল বঙ্কিম উপন্যাসেই। হাস্য-করুণ, কঠোর-মধুর, ভয়ঙ্কর, কমনীয় সব ধরনের সংলাপ বঙ্কিমচন্দ্র অবলীলায় লিখে যান। তাঁর নাট্যরূপকারদের তাই সংলাপ নিয়ে ভাবতে হয়নি। বিপরীতে বলা যায় বর্ণনার পথ ছেড়ে যেই তিনি সংলাপের পথ হেঁটেছেন সেখানে তাঁকে অনুসরণ করবেন না এমন সাধ্য কার? এমনকি গিরিশচন্দ্রও সেই ভুল করেননি। অমরেন্দ্রনাথও নন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস : তিনটি উদ্ধৃতি :

এক,

গোবিন্দলাল । সিয়াকুল কাঁটা। রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্রমর । কেন রোহিণীকে ভাবছিলে ?

গোবিন্দলাল । তা কি জানি ?

ভ্রমর । জান — বল না।

গোবিন্দলাল । মানুষ কি মানুষকে ভাবে না ?

ভ্রমর । না। যে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি তুমি আমাকে ভাব।

গোবিন্দলাল । তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্রমর । মিছে কথা — তুমি আমাকে ভালবাস। আর কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই — কেন রোহিণীকে ভাবছিলে বল না ?

গোবিন্দলাল । বিধবাকে মাছ খাইতে আছে ?

ভ্রমর । না।

গোবিন্দলাল । বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন ?

ভ্রমর । তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করে।

গোবিন্দলাল । আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

দুই,

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, 'ওহে বাপু তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি — কিছু দিয়া যাইব — এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি' —

তখন পোষ্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন 'কি কন ?'

মাধবীনাথ । কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোনো চিঠিপত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পোষ্টবাবু । আসে।

মাধবীনাথ । কতদিন অন্তর ?

পোষ্টবাবু । যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন ; তবে নতুন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

তিন,

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশাকর । এত রাত্রি হল কেন ?

রোহিণী । একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারিনে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশাকর । কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে!

রোহিণী । আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে আমার দশা এমন হইবে কেন ? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি ; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময় কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে রে ?'

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, 'তোমার যম'।

রোহিণী চিনিল সে গোবিন্দলাল।

এমন অজস্র নাটকীয় সংলাপ বঙ্কিমের উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। সেগুলিকে সাজিয়ে অঙ্ক-দৃশ্যে বিন্যস্ত করার পরিশ্রম যেটুকু। এটাই রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপের ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূল কারণ।

৮.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ আলোচনা করো।

৮.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১১

নাট্যকার মন্মথ রায়

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১১.১ নাট্যকার মন্মথ রায়

৮.৪.১১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৪.১১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮৪.১১.১:নাট্যকার মন্মথ রায়

বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রয়াত নাট্যকার মন্মথ রায়ের যোগ ছিল বেশি সময়ের। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নাট্যচিন্তা ও নাট্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর নাট্যজীবনের প্রস্তুতিপর্বে রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রমুখ পরিণত নাট্যরচনার পরিচয় রাখছিলেন। বিদেশের মাটিতেও আন্তন চেকভ, স্তানিস্লাভস্কি, টি. এস. এলিয়টের নাট্যপ্রতিভা স্ব স্ব দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে এ দেশেও পৌঁছে যাচ্ছিল। সারা ভারতবর্ষে তখন মহান রুশ বিপ্লবের ছন্দস্পন্দন, সাম্যবাদী আন্দোলনের অঙ্কুরোদগম, অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে কত না আলোচনা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সেই ঝোড়ো যুগে বসে মন্মথ রায় উভয় পাঠই আয়ত্ত করেছিলেন এবং একই সঙ্গে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাই তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম দশকে লেখা পৌরাণিক নাটকগুলি, প্রচলিত পুরাণ-কাহিনীর নাট্যরূপ মাত্র নয়, নয় দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদের সমজাতীয় নাটকগুলির মত কেবলই যুক্তিমুখী — তাঁর নাটকেই প্রথম পুরাণের মোড়কে সমকালীন দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছিল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে রচিত তাঁর ঐতিহাসিক-সামাজিক পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকে সেই আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লক্ষ করা যায়।

> ‘এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু-চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায় — এ বললে আপনি কি মনে করবেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভাল করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।’

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মন্মথ রায়ের নাটক অভিনয় দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে যখন এই চিঠি লেখেন তখন নাট্যকারের বয়স মাত্র আটাশ। ১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তার বাল্য কাটে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে। যৌবনের গোড়ায় ১৯২১ সালেই, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে হাতেখড়ি, অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (১৯২২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর (১৯২৪) শিক্ষার্জন। পরের বছরই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরই মাঝে বসে বাংলা সাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাট্যকর্ম ‘মুক্তির ডাক’ (১৯২৩)। সেই শুরু, তারপর আমৃত্যু অবিরাম নাট্যরচনার গতিশক্তি। মন্মথ রায়ের সঙ্গে যাঁদেরই পরিচয় ছিল, তাঁরাই জানেন যে, কেবল সৃষ্টিতেই তাঁর সুখ সীমাবদ্ধ ছিল না — প্রয়োগের মধ্যেই ছিল উল্লাস। তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ব্যক্তিজীবনে অর্থের উচ্চাশা তাঁর কোনোকালেই ছিল না। সাদামাটা জীবনাচরণেই ছিলেন অভ্যস্ত। পারিবারিক বিপর্যয় জীবনে বারবার এসেছে। গতিশীল জীবনে নীরব-প্রেরণাদাত্রী স্ত্রী দুরারোগ্য অসুখে পড়েন। এতে নাট্যকারের মর্মব্যথা কম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীরা যে সব প্রতিকূলতা ধৈর্যের পরীক্ষায় অতিক্রম করতে পারেন তা রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-শরৎচন্দ্রের জীবন থেকে আমরা জেনেছি। মন্মথ রায় ছিলেন সেই একই মানসিকতার মানুষ। সর্বোপরি, আত্মীয়-পরিজনের প্রেরণা এবং বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ তাঁর শিল্পী জীবনের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তির যোগান দেয়।

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল প্লে-রাইট ছিলেন। সেই অর্থে মন্মথ রায়েরও নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চের কেবল নবীন নাট্যাঙ্গিকই নয়, বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে নাটক রচনার কৃতিত্বও বাংলায় সম্ভবত একমাত্র তিনিই দাবি করতে পারেন। পুরাণের নবজন্ম তাঁর নাটকে ত আছেই, ইতিহাসকেও তিনি নতুন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। নিছক historical facts নয়, historical imagination -ই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 'অশোক' (১৯৩৩), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮) ইত্যাদি নাটকে মন্মথ রায়ের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে নাট্যিক সত্যবোধ অপরূপ ভঙ্গিতে একত্র হতে পেরেছে। মানসিক দিক থেকে তাঁর যে দুঃসাহস ছিল তারই প্রতিফলন ঐতিহাসিক নাটকে, বিশেষত সংলাপে। পরাধীনতার জ্বালার শোণিতপ্রবাহ, সংগ্রামী প্রত্যয় এই নাটকগুলির অভিনয় সাফল্যের কারণ। এরই পাশাপাশি মন্মথ রায় আমাদের নিয়ে যান ফ্যান্টাসির রাজ্যে। মনে পড়ে 'মন্মথ', 'রূপকথা', 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' নাটকের কথা। অথচ সমাজ-সচেতন নাট্যকার নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রাখেননি। আর সামাজিক নাটকে তাঁর সাফল্যের ব্যাপারে ত কোনো প্রশ্নই নেই। 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'জীবনটাই নাটক' ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে হৈ হৈ করে চলেছে। চলেছে কেননা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের হাসি-কান্নাকে তিনি অনায়াসে নাটকে তুলে আনতে পারেন।

জীবনী নাটক রচনায় মন্মথ রায়ের পূর্বসুরী প্রধানত গিরিশচন্দ্র। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভক্তিআপ্লুত, তথ্যের প্রতি নজর তাঁর তেমন ছিল না। মন্মথ রায় এ ক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনীনাট্য রচনা করায় তাঁর নাটকে কোনো ফাঁকই ছিল না।

'আজব দেশ' (১৯৫৩), 'মরা হাতি লাখ টাকা' (১৯৫৭), 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ' (১৯৫৯) — মন্মথ রায়ের তিনটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রহসন। ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপ সর্বত্র আছে, কেননা প্রহসনগুলিতে শ্রেণীসংঘাত — ধনবৈষম্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি জানতেন, অমৃতলাল বসু নন, মলিয়ের এবং বার্নার্ড শ-ই প্রহসন রচয়িতার আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত।

মনে প্রশ্ন হওয়া উচিত মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে অলিখিতপূর্ব একাঙ্ক নাটক রচনা দিয়ে কেন যাত্রা শুরু করলেন ? এ বিষয়ে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, পরীক্ষামূলকভাবে ছোট নাটক লেখার পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টা প্রথম যৌবনেই তাঁকে ভাবিয়েছিল। অষ্টাদশ শতক থেকে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ একাঙ্ক নাটককে পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করে। আঠারশ সাতাশি-তে প্যারির Theatre Libre, দু-বছর পরের বার্লিনে Freie Bunne বা লন্ডনের Independent Theatre, অন্যদিকে নিউইয়র্কের Hall House Theatre- এর প্রচেষ্টায় একাঙ্ক নাটকের চাহিদা দেশে দেশে দেখা যায়। বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'হাস্যকৌতুকে'র লেখাগুলি একাঙ্ক নাটকের পূর্বচ্ছায়া। মন্মথ রায়ই প্রথম সংক্ষিপ্ত পরিসরে, ঘটনা-ভাব-চরিত্রের প্রস্তর কঠিন ঋজু একাঙ্ক নাট্যের জন্ম দিলেন। আর কাহিনীতে মূলত মিলিয়ে দিলেন এ যুগের দ্বন্দ্ব-সংশয়, শোষণ-সংগ্রামের ছবিগুলি। তাঁর পরিকাঠামো এবং ভাব নিয়েই অতঃপর বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রসার।

বাংলা সাহিত্যের সমালোচক, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, অভিনেতা — যাঁরাই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁরা জানতেন বিশ্ব ইতিহাস, জন্মভূমির রাষ্ট্র-সমাজ প্রেক্ষিত, নরনারীর চেতন-অবচেতন মনের

রহস্যভূমি, সামাজিক সংস্কার ও নীতিবোধের সংঘর্ষ, অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্যা, শোষণ-শাসনের বিকট রূপ ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম — ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর শিক্ষা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। নজরুলের ঘনিষ্ঠ এই নাট্যকার কবির প্রত্যয়টি মর্মে গ্রহণ করেছিলেন — 'মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।' আমরা এখন পর্যন্ত তাঁর নাটক সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে যে আলোচনা করলাম এখন সেগুলির গভীরে দৃষ্টি মেলে তাঁর সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মানবতাবাদী পরিচয়টি খুঁজে দেখব।

প্রথম পর্বে লেখা নাট্যকারের চারটি পৌরাণিক নাটক — 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০) এবং 'সাবিত্রী' (১৯৩১) — আলোচনা করলে দেখা যায় আচারসিদ্ধ দেবদেবীর পোশাক পরে আধুনিক কালের নরনারীরাই যেন মঞ্চে চলাফেরা করছে। মানুষ চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে প্রস্তর-কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পরাধীন দেশবাসীর চরিত্রে সেই তেজের অভাব লক্ষ করেই এমন বিষয় নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে মহাভারতের বনপর্বের সাবিত্রী চরিত্র আশ্রয় করে পুরাণের ঢঙে অনেকেই নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নারীসমাজের প্রতীক। 'দেবাসুর' নাটকের উৎস বেদের বলাসুর-দধীচি কাহিনী সন্দেহ নেই — কিন্তু তার গভীরে নাট্যকার সমকালকে প্রতিফলিত করলেন। পরাধীন ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দেশজননীর স্বপ্নমূর্তি। দধীচির সংলাপে আনন্দমঠের প্রতিধ্বনি শোনা গেল —

> দধীচি। .... (সূর্যের প্রতি) ..... আজ দেশের এই দুর্দিনে মা চাই — যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহকাতর করে না ..... ভালোবেসে শুধু ভালবাসা শেখায় না, চাই সেই মা। ..... যে মা দেশের অপমানকে নিজের অপমান মনে করে .... এবং সে অপমানের গ্লানি দূর করবার ভার তার সন্তানের হাতে দেয়।
>
> (দ্বিতীয় অঙ্ক)

মন্মথ রায়ের বহু অভিনীত 'কারাগার' নাটকটি স্বাধীনতা আন্দোলনের জ্বলন্ত পটভূমিকায় রচিত। তখনও তিনি পুরোপুরি নাট্যকার নন। এই নাটকে কৃষ্ণকাহিনীর বাতাবরণে ব্রিটিশ শাসনের দমন-পীড়নের চিত্র আঁকা হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের মত দেবচরিত্র, ভক্তিরস, সংগীত সবই আছে কিন্তু আগেকার এই শ্রেণীর নাটকে যেমন ধর্মপ্রচারই মূল আদর্শ ছিল, এ নাটকে তা নয়। ইতোপূর্বে বেশ কটি বাংলা নাটকে কারাগারের দৃশ্য ছিল, কংসবধের কাহিনীও ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ত সেগুলি নিষিদ্ধ করেননি। আসলে 'কারাগার' নাটকের অভিনয় দেখে সেকালের দর্শকরা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকাতর হওয়ার তেমন সুযোগই পায় নি — বরং কংসের প্রচণ্ড হিংসা, সীমাহীন নৃশংসতা এবং নারীধর্ষণ প্রবৃত্তির জন্য ঘৃণায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কংস আর কেউ নয়, ইংরাজ শাসকদের প্রতীক মাত্র। তখনকার বহরমপুর, হিজলি, সেলুলার প্রভৃতি কারাগারের প্রসঙ্গই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য। সরকার এটা বুঝেছিল।

'কারাগারে'র অভিনয় শুরু হয় ১৯৩০-এর ২৪ ডিসেম্বর। আঠারো বার অভিনয়ের পর সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তার বয়ান নিম্নরূপ ঃ

The Government of Bengal
Political Department
Political Branch
No. 1695 P
Order
Calcutta the 4th February 1931

Whereas it appears to the Governor-in-Council that the play entitled 'Karagar' by Manmatha Roy, M.A.. Printed by him at the Sree Gauranga Press at No, 71/1, Mirzapur Street, Calcutta and Published at Barada Bhaban, Balurghat (Dinajpur), which was been performed at the Monomohan Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performance Act. 1876, (XII of 1876). The Governor-in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council
Sd./R.N. Raid
Offg. Chief Secretary to the
Government of Bengal.

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'কে যে আইনে বাঁধা হয়েছিল 'কারাগার'-ও সেই আইনেই বাঁধা পড়ল। কিন্তু একটু তফাত আছে। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র ক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল অশ্লীলতার (!) কিন্তু 'কারাগারে'র ক্ষেত্রে অভিযোগ রাজনীতি প্রচারের। নাটকটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সেটির পুনরাভিনয়ের জন্য যখন বঙ্গীয় আইন সভায় দাবি তোলেন তখন (৩ মার্চ ১৯৩১) সরকার পক্ষ আপত্তি জানায় ঃ

The Home members added that ostansildy the play did not relate to present day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.

সরকার যে কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল এটি তার প্রমাণ।

এরই মধ্যে জনজীবনে 'কারাগার' নাটকের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেন্সরশিপ থাকা সত্ত্বেও 'অমৃতবাজার' তীব্র প্রতিবাদ জানায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লেখে ঃ

> 'এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। 'কারাগার' একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন ? অথবা দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিযুগের কারাগারের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।' (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১)

অথচ আশ্চর্য, ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র অতিরিক্ত একটি সংখ্যায় তদানীন্তন সরকার যখন নাট্যনিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন করে একটি বিলের খসড়া প্রকাশ করে তখন পশ্চিমবাংলার

বুদ্ধিজীবী মহল এবং সংবাদপত্রগুলি তাঁর ভাষায় প্রতিবাদ জানালেও সেই আনন্দবাজার পত্রিকাই জ্যোতির্ময় বসুরায়ের একটি প্রবন্ধ ছেপে খসড়া বিলের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায় না কি ? এই নির্লজ্জ ওকালতির জবাব 'কারাগারে'র নাট্যকার মন্মথ রায় দিয়েছিলেন একটি পত্রে ঃ

'কি করিয়া তাঁহার (প্রবন্ধকারের) এই ধারণা হইল যে, বাংলার নাট্যকারগণ একজোট হইয়া সমাজবিরোধী অবাঞ্ছিত নাটক রচনার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন — যাহার জন্য প্রতি অভিনেয় নাটকের বিষয়বস্তু বিবেচনা করিয়া না দেখিয়া ছাড়পত্র দেওয়া চলিবে না। তবে কি আজ নাটক, আগামীকাল কথা সাহিত্য ও কবিতা আগামী পরশু সংবাদপত্রও ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হইবে ?'

একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায় তাঁর 'বিচিত্র একাঙ্ক' (১৯৬৮) সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন—

> 'আজকের একাঙ্ক নাটকই ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সে যুগ আসন্ন। নাটকের মান তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং বাড়বে।'

প্রায় সত্তরটির বেশি একাঙ্ক নাটক লিখে তিনি বিষয়, ফর্ম ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নূতনত্বের স্বাদ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম প্রমুখের প্রশংসা তিনি প্রথম জীবনেই পেয়ে যান। তাঁর লেখা একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'মুক্তির ডাক', 'রাজপুরী', 'লক্ষহীরা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'কলঙ্কী চাঁদ', 'ভূ-ভার হরণ কর্পোরেশন', 'আমরা কোথায়', 'যমালয়ে একবেলা', 'মরা হাতি লাখ টাকা', 'ফকিরের পাথর', 'শয়তানের কসম', 'স্বাধীনতার ইতিহাস' ইত্যাদিতে অভিনব কাহিনীর সঙ্গে নাট্যগতির সার্থক মেলবন্ধন দেখা যায়। সমালোচকরা ঠিকই বলেছেন —

> 'বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। শুধু প্রবর্তয়িতাই নন, তিনি একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।'

আগেই বলা হয়েছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক দুপ্রকারের নাটকেই মন্মথ রায় সফল, তবে সামাজিক নাটকে তিনি মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের বদলে নিপীড়িত জনগণের উপর রাষ্ট্রের ও সমাজের শোষণই জোর দিয়ে দেখিয়েছেন। 'মমতাময়ী হাসপাতালে'র প্রেক্ষাপট গ্রামীণ সমাজ, মূল উদ্দেশ্য ত্যাগ স্বীকারের চিত্র ফোটানো। মঞ্চশিল্পীদের জীবনযাত্রা, হর্ষ-বেদনা ধরা পড়েছে 'জীবনটাই নাটক'-এ। শ্রমজীবী মানুষের জীবনবেদ 'ধর্মঘট' নাটকটি। কারখানার মালিক দীনবন্ধু চৌধুরী, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, শ্রমিকদের ছাঁটাই করার যে পরিকল্পনা করে তা নানা ঘটনার টানাপোড়েনে কীভাবে ব্যর্থ হয় সেটাই নাট্যবস্তু। কৃষক সমাজকে নিয়ে লেখা তাঁর নাটক 'চাষীর প্রেম'। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র চাষী অর্জুনের স্ত্রী দুর্গা এবং পুত্র লক্ষণ বিধ্বস্ত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে অর্জুনকে একটি খুনের দায়িত্ব নিতে হয়। কৃষকদের দুঃখ কষ্ট তাঁর অন্য নাটকেও অঙ্কিত।

আমরা জানি, সবদেশেই প্রধানত পরাধীন যুগে ঐতিহাসিক নাটকের প্রাচুর্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের উত্তরাধিকার নিয়ে মন্মথ

রায় 'মীরকাশিম' নাটকটি যখন লিখেছেন তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ তোড়জোড় চলছে। এ নাটকটি ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সরাসরি বিদ্রোহী সংলাপের জন্য —

মীরকাশিম । কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর, বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়, মুঙ্গেরে, বাংলায়, বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠী অবরোধ কর, সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের অনুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

সেনসরের ছুরিতে নাটকের অনেক অংশ বাদ গেলেও নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণকে সংঘবদ্ধ করা — সম্ভব হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র রোষের আর একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে সাঁওতাল পরগণায় তিন পাহাড় অঞ্চলে দশ হাজার সাঁওতাল যখন হিন্দু-মহাজনদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তখন শাসকদের বন্দুকের গুলি তাদের বুকে লাগে, কিন্তু তাদের আত্মদান যে ব্যর্থ হয়নি সেটা দেখানোই নাট্যকারের বাসনা ছিল। অষ্টম শতকে গোপালদেবের নেতৃত্বে জনগণের আন্দোলন কিভাবে সফল হল তার রেখাচিত্র 'অমৃত অতীত'। নাটকটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও চরিত্রগুলির জটিলতা শেষ পর্যন্ত উপস্থিত।

মন্মথ রায়ের নাটকের দুটি বাহু — জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ। মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে লেখক-শিল্পী সংঘের 'শনিবারের আসরে' ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি নাটক পড়েন নিজ কণ্ঠে। তাঁর লেখা 'তারাস শেভচেঙ্কো' নাটকের প্রযোজনা করে গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় টিম। প্রয়াত হবার তিন মাস আগে লেখক-শিল্পী সংঘের কলকাতা জেলা কমিটির সম্মেলনের 'স্মরণিকা'-য় তিনি লিখে গেছেন ঃ

'হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। অপসংস্কৃতিমূলক নাটকের ও অন্যান্য রচনার মোকাবিলা করতে চাই নাট্য ও মৌলিক রচনা গুণসমৃদ্ধ সুলিখিত সত্যিকারের নাটক ও শিল্পকলা। .....আমি বিশ্বাস করি অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশি। দেশের বর্তমান এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে নাট্যকার ও লেখকরা মস্যাধার নিয়ে বসবেন এবং আমাদের স্বাধীনতার সংবিধানটিকে নির্ভেজাল গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংবিধানে পরিবর্তিত করতে নাট্যাভিযান ও শিল্পকলা অভিযানে ব্রতী থাকবেন। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে।'

সব প্রগতিশীল নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয়।

৮.৪.১১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাট্যকার মন্মথ রায়ের অবদান আলোচনা করো।

৮.৪.১১.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ১২
প্লে-রাইট শেক্সপীয়র

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১২.১ প্লে-রাইট শেক্সপীয়র

৮.৪.১২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৪.১২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৪.১২.১ঃ প্লে-রাইট শেক্সপীয়র

কালজয়ী লেখকের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তাঁর সৃষ্টির সব দিকগুলি সমকালের চাহিদা পূরণ করে চিরকালীন সমাজ সত্য হয়ে ওঠে। ইংরাজী সাহিত্যে চসারের ‘ক্যান্টারবারি টেলস’, সুইফ্‌টের ‘গালিভার

ট্রাভেলস', ফরাসী সাহিত্যে এমিল জোলার 'জারমিনাল', স্তাঁদালের 'মাদাম বোভারি', রুশ সাহিত্যে টলস্টয়ের 'রেজারেকশন', গোর্কির 'মাদার', চেকভের 'চেরী আর্চার্ড'। এগুলি অনেক সফল সৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'রক্তকরবী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' আবার কালজয়ী শিল্পস্রষ্টাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে কালিদাস-শূদ্রক-শেকস্পীয়র-রবীন্দ্রনাথের মত নাম খুব কম, আঙুলে গোনা যায়।

শেকস্পীয়রের মত ব্যক্তিত্বের শত শত বছর ধরে পাঠক-দর্শকের হৃদয় জয় করার চাবিকাঠির অনুসন্ধান কম হয়নি। সারা বিশ্বের সব প্রধান ভাষায় শেকস্পীয়র-চর্চা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। তাঁর উপর লেখা সমালোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও প্রভূত — বিশ্বের আর কোনোও নাট্যকার নিয়ে এত আলোচনা হয়নি। তাঁর সব নাটকই যে সর্বাঙ্গসুন্দর এমন দাবি কোনোও সমালোচকই করেন নি।

শেকস্পীয়রের নাট্যভাষা আসলে মধ্যযুগীয় ইংরাজি শব্দসম্বলিত, একালে যার অনেকটাই অচল। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে যে আদব-কায়দা, দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদ — আজকের যুগে তা পুরাতন। তাঁর বিশ্ববন্দিত নাটকগুলির পাশাপাশি বিশ্ব-উপেক্ষিত নাটকও রয়েছে, যেমন, Timon of Athens, Pericles, Cymbeline, The two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew। শেকস্পীয়রের অনেক অন্ধভক্তও এমন নাটকের ব্যাপারে যে বিশেষ কিছু জানেন না, তার কারণ এ নয় যে, তাঁরা পাঠক বা দর্শক সাধারণ স্তরের — আসলে এগুলিতে নাট্যকারের শিল্পমনন বিশেষ দানা বাঁধতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতাগুলি অবশ্য তাঁর স্বকৃত নয় — যখনই একটানা লিখেছেন, বিশেষত ১৫৯৮, ১৬০৪, ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে — তখনই তিনি কিছুটা বিভ্রান্ত; ফলত তাঁর সৃষ্টি সেক্ষেত্রে অপরিণত। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। শেকস্পীয়রের চিরায়ত সৃষ্টিগুলি সম্পর্কে একটাই বক্তব্য, তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে মাটির যোগ রয়েছে, তা সে চরিত্র অভিজাতই হোক বা অনভিজাতই হোক।

মার্লো বনাম শেকস্পীয়র ঃ

শেকস্পীয়ার ষোড়শ শতাব্দীর নাট্যজগতে একক নাট্যকার নন ; টমাস কিড, জর্জ পিল, রবার্ট গ্রীন, টমাস ন্যাশ নামক তাঁর সমকালীন চার নাট্যকার একই বছর জন্মেছিলেন ১৫৫৮ সালে।

ব্রাডলে শেকস্পীয়রের ট্রাজেডি-সম্পর্কিত আলোচনায় নায়কের পতনের জন্য কোনোও না কোনোও 'flaw'-এর কথা বলেছিলেন। এ কথা মার্লোর নায়কদের সম্পর্কে আরও বেশি করে বলা যায়। আর তাই মার্লোর নায়ক তাতার টেমারলেন, ড. ফস্টাস, বারাবাস প্রমুখরা পরবর্তীকালে বিশেষ পরিচিত রইল না, শেকস্পীয়রের নাট্যচরিত্রগুলির ভ্রান্তিই তাদের ট্র্যাজেডির মূল — কিন্তু সেই ত্রুটিগুলি মৃদু উচ্চারিত। দর্শকদের ভাবনার উপর মার্লো আস্থা রাখতে পারেননি, শেকস্পীয়ার পেরেছিলেন।

শেকস্পীয়র মার্লোর সমকালীন — কেউ কেউ বলেন, তিনি নাকি মার্লোর সাকরেদিও করেছিলেন। কিন্তু মার্লো তো মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে একটি সরাইখানায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। তাহলে শেকস্পীয়র সে সুযোগ পাবেন কি করে ?

আসলে মার্লো ও শেকস্‌পীয়রের জীবন এত বৈচিত্র্যময়, যে তাঁদের নিয়ে অনেক গালগল্প ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শেকস্‌পীয়রের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে সব প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলিই তাঁর নাট্যকার জীবনকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। মার্লো জন্মেছিলেন মুচির ঘরে, অস্বাভাবিক জীবনযাপন করেছিলেন। শেকস্‌পীয়র ঠিক তার বিপরীত। তিনি জন্মেছিলেন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে ; কিন্তু তাঁর জীবনচর্যা ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মত। তাই অনন্তকাল ধরে সাধারণ মানুষ তাঁর নাটক পড়ছেন-দেখছেন। তেমনি পড়বেন ও দেখবেন আরও বহু শতাব্দী।

সব দেশের সব লেখকের জীবনযাপন ও জীবনাদর্শ তাঁদের সাহিত্যের উপর ছাপ ফেলে যায়। ভাববাদী বা বস্তুবাদী উভয় গোত্রের লেখকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। তবু সকলেই যে কালজয়ী হন না, কেউ কেউ হতে পারেন, তার কারণ প্রকৃত স্রষ্টার রচনাকর্মে প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষা, হিংসা, মহত্ত্ব, দীনতা, কুশ্রীতা, সৌন্দর্য প্রভৃতির চিরায়ত রূপ ধরা পড়ে। শেকস্‌পীয়রের ক্ষেত্রে এ কথা নিশ্চিত সত্য। তাঁর নাটকাবলী পড়লে সর্বস্তরের মানুষের বহু বিচিত্র মানসিকতার সর্বাঙ্গীণ ছবি আমরা পেয়ে যাই। সম্রাট, সেনাপতি, ভাঁড়, প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে মুচি পর্যন্ত — তাঁর অঙ্কিত সর্বশ্রেণীর চরিত্রই জীবন্ত, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রকম আছে, কখনোই পুরানো হবে না।

কিন্তু শেকস্‌পীয়র যদি শুধুই হেনরী বা রিচার্ড রাজপরিবারের নাটকগুলিই লিখতেন তাহলে তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে যেত। তাঁর সমকালীন চার্চ, রাজপুরুষ ও পার্লামেন্টের সংঘাতের কথা তাঁর নাটকে আছে। তবুও সে নাটকগুলি ইতিহাসের জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য নয় — তা জানার জন্য তো স্টুয়ার্ট, মিল, ওয়েলস, মার্কস প্রমুখের গ্রন্থগুলিই যথেষ্ট। তবে কেন সেই শেকস্‌পীয়র আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ?

সাদামাটা জীবন ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মাত্র আঠারো বছর বয়সে এক ছাব্বিশ বছরের রমণীকে বিবাহ করা ছাড়া শেকস্‌পীয়রের জীবন খুব কিছু বৈচিত্র্যময় নয়। গ্রীক সামান্য পড়েছিলেন তার চেয়ে একটু বেশি ল্যাটিন। মার্লোর মত দুঃসাহসী মোটেই ছিলেন না। তিন পুত্র-কন্যার পিতা। মাত্র ২৮ বছর বয়সে (১৫৯২) তিনি কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি আগে উদ্ধার করছি ঃ

এক. ১৫৯১ সালে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলি লেখা হয়ে যায়।

দুই. ১৫৯২ সালে তরুণ অভিনেতা রূপে তাঁর পরিচিতি --- ১৫৯৪ সালে Lord Chamberlain's Company নামক নাট্যদলের তিনি একজন অংশীদার হন।

তিন. বেন জনসনেব 'Every man in his humour' নাটকের অভিনয় (১৫৯৮)-এর ক্ষেত্রে তালিকায় অভিনেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রথম। এ সময় তিনি নাটক লিখে ও অভিনয় করে প্রভূত সম্পত্তি করেছেন।

চার. ১৫৯৭ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি এবং সনেটগুলি লেখা হয়। ১৬০১ থেকে ১৬০৮ সালের ব্যবধানে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ট্রাজেডি নাটকগুলি

তিনি লিখে ফেললেন। ১৬১৬ সালে, মৃত্যুর ক'বছর আগে থেকেই, তাঁর নাট্যরচনা বন্ধ হয়ে যায় এবং কর্তব্যপরায়ণ পিতা ও স্বামীর ভূমিকামাত্র পালন করেন।

লক্ষণীয়, এর চেয়ে অনেক চমকপ্রদ ও বৈচিত্র্যময় জীবন বাংলা নাট্যকার মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের। তুলনা করে দেখলে আরও অনেকেরই। তবু এঁরা কেউই তাঁর মত অতলান্ত জীবনাবেগ ও চিরস্মরণীয় নাট্যচরিত্র সৃষ্টিতে অপারগ কেন বুঝে দেখতে হয়।

আর একটি কথা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শেকস্‌পীয়রের অপার ঈশ্বরবিশ্বাসও অচল। ১৬১৬ সালের মার্চ মাসে তিনি যে উইল করে যান এবং এখনও যে কেউ সামারসেট হাউস-এ রক্ষিত সে তিন-পৃষ্ঠার উইলটি দেখতে পারেন, তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন --

First, I Commend my soul into the hands of God, my creator, hoping and assuredly believing. Though the only merit of Jesus Christ my saviour, to be made partaker of life everlasting.

এমন ঈশ্বরবিশ্বাসীর তো Mythological Drama লেখার কথা ছিল? কিন্তু তা না লিখে তিনি ডুব দিলেন চিরন্তন মানব-অন্তরের গভীরে। যাঁর জীবন ছিল ছা-পোষা সংসারীর, যিনি ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীল, নাটকের অঙ্কদৃশ্যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তাঁর সাফল্যের চাবিটির সন্ধান পেয়েছিলেন কবি কীটস্‌। বন্ধু রেনল্ডসকে একটি চিঠিতে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরও সেখান থেকেই বুঝে নেওয়া যায়। কীটস্‌ের কথায় ঃ

Which is the best of Shakespeare's plays? I mean in what mood and with What accompaniment do you like the sea best?

শেকস্‌পীয়রের নাট্যসাহিত্যের সমুদ্র মন্থনের শেষ নেই। কীটস্‌ ঠিকই বুঝেছিলেন।

প্রেম যুগে যুগে

শেকস্‌পীয়রের কমেডি-ট্রাজেডির চিরপরিচিতির পিছনে রয়েছে মানবপ্রেমের বহুধা-বিভক্ত রূপের নাট্যচিত্রণ। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বড় প্রেম কেবল কাছেই টানে না, তা দূরেও সরিয়ে দেয়। 'অ্যান্টনি এ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' দিয়েই শুরু করা যাক। নাটকের প্রথম অঙ্কে, প্রথম দৃশ্যে স্বয়ং নাট্যকার নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে বলেছেন 'Such a mutual pair'। এদের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই প্লুটার্কের কাছে ঋণী। রহস্যময়ী অপার সৌন্দর্যময়ী তো চিরকালের পাঠক-দর্শকের আদর্শ। ক্লিওপেট্রা যে লন্ডনের বিভিন্ন নাট্যশালার বহু অভিনেত্রী দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অভিনীত তার কারণ তো একটাই, এই নারী, চির আকর্ষণীয়া। তার ও অ্যান্টনির ট্র্যাজিক মৃত্যুতে কোনো terror বা horror নেই, আছে কাব্যিক ব্যঞ্জনা।

কেন এই নাটকের মতই, দর্শকরা আজও বারবার ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো পড়তে ও দেখতে চান, তারও উত্তর একই — প্রেমের নানা বর্ণচ্ছটার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, ১৬০৪ সালে 'ওথেলো' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তারপর চারশ' বছর পেরিয়ে গেছে। প্রেমের অন্তহীন আবেগ অনেক মানুষকে ওথেলোর মত, তার আগে পরে, ক্রোধান্ধ করে তুলেছে --- ডেসডিমোনার মত কত নারী প্রিয়জনের হাতে প্রাণ দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। ওথেলোর আগে ও পরেও অনেক ট্রাজেডি লেখা হয়েছে, কিন্তু ডেসডিমোনার মত মর্মন্তুদ উক্তি, হত্যায় উদ্যত স্বামীর প্রতি, ক'জন নারী করতে পেরেছে? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওথেলোর কাছে তার করুণ প্রার্থনা ঃ

O, benish me, my lord, but kill me not ... kill me tommorrow; let me live to-night!...But half an hour.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা মিরান্দা ও ডেসডিমোনা' প্রবন্ধে ডেসডিমোনাকে শকুন্তলার চেয়ে অনেক উন্নত চরিত্র বলে দাবি করেছেন। উনিশ শতকে কলকাতার বুকে বিদেশী রঙ্গালয়ে যখন ওথেলো অভিনীত হত তখন দর্শকদের মধ্যে কি তীব্র সাড়া! হতে পারে নাটকটির তীব্র dramatic action, সুতীব্র climax ইত্যাদি সেই সাফল্যের ক্ষেত্রে সহায়ক, কিন্তু প্রধানত প্রেমের নেশায় পারিবারিক বিপর্যয়ই এর মূলবিন্দু।

'হ্যামলেট'ও কয়েক শতাব্দী ধরে দর্শকদের ভাবাচ্ছে। চরিত্রটি একটু বেশিমাত্রায় অস্থির হলেও ক্লডিয়াসকে হত্যা করতে সে দীর্ঘ সময় নিল। কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে, ডোভার উইলসনের মতই, নাট্যকার শেকস্‌পীয়ার 'creates this supreme illusion of a great and mysterious character!' গণনাট্যের নেতৃস্থানীয় যখন হ্যামলেটের নাট্যরূপ দেন তখন বুঝে নিতে হয় কালের কষ্টিপাথরে হ্যামলেটের উক্তি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হ্যামলেটের স্বগতোক্তি ঃ

How weary, Stale, flat and unprofitable

Seem to me all the uses of this world! [Act I, Scene II]

আর দর্শক মনে রাখে ওফেলিয়াকে। নায়ক-নায়িকার রজনীগন্ধাসম প্রেমসৌরভ দম্‌কা হাওয়ায় ভেসে গেল। সে দুঃখ তো চিরকালের দর্শকের।

শেকস্‌পীয়রের মজা

অর্থাৎ শেকস্‌পীয়রের কমেডিগুলি। সংখ্যায় তাও কম নয়। ট্র্যাজেডি অবশ্যই উন্নততর সৃষ্টি, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের হতে পড়লে সে কমেডিও শাশ্বত মঞ্চসাফল্য পেতে পারে তার প্রমাণ উৎপল দত্তের 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' ['Mid Summer Nights' dream'] প্রযোজনায়। এলিজাবেথ শেকস্‌পীয়রের নানা নাট্যাভিনয় দেখতেন। 'মেরী ওয়াইভস্ অব উইন্ডসর' নাটকের ফরস্টাফ চরিত্র তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে তাঁর কাছে সে 'Hero' হিসেবে অভিনন্দিত। একালে 'ভিলেন' আঁকতে গিয়ে নাট্যকাররা তার শঠতার দিকই আঁকেন, অনেকেই হাস্যরসাত্মক চরিত্রকে ভাঁড়ের চেয়ে বিশেষ কিছু গড়তে পারেন না। এঁরা যদি শেকস্‌পীয়র চর্চা করতেন, তাহলে বাংলার মঞ্চপ্রেমিকরা কিছু নির্মল হাসির উপাদান পেত।

শেকস্‌পীয়রকে অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই, কেননা কমেডি রচনার ক্ষেত্রে তিনিও নানা উৎস বেছে নিয়েছেন ঃ

শেকস্‌পীয়রের হাসির নাটক	উৎস
ক. কমেডি অব এররস্‌	প্লুটাসের 'মনাচিনি'
খ. অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল	বোকাচ্চিও ও পেইন্টর-এর রচনা
গ. এ মিডসামার নাইটস্‌ ড্রিম	ওবিদ ও চসারের কাব্য
ঘ. মাচ এডো অ্যাবউট নাথিং	অ্যারিয়োস্টো ও বান্দেল্লোর রচনা
ঙ. মেজার ফর মেজার	সিনথিও ও হোয়েটস্টোন-এর রচনা
চ. মিডল টেম্পল	বারনাবে রিক-অনূদিত বান্দেল্লোর কাহিনী

শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি নাট্যকাহিনীগুলিরও নানা উৎস আছে। কিন্তু তাঁর নিজস্বতার ছোঁয়ার সে কাহিনীগুলি নতুন। শেকস্‌পীয়রের নাট্যাঙ্গিক অনুসরণের চেষ্টাই সেখানে বাঙালী নাট্যকাররা প্রায় দেড়শ বছর চালিয়ে গেলেন, কিন্তু মধুসূদন-দীনবন্ধু-দ্বিজেন্দ্রলালের মত কজন তাঁর হাস্যরসকে অনুধাবন ও অনুসরণ করেছেন ?

শেকস্‌পীয়রের ভাষা

মধ্যযুগীয় ইংরাজী শেকস্‌পীয়রের নাট্যসংলাপ ও নাট্যসংগীতের আদর্শ। কিন্তু বড় শিল্পী সমকালের ভাষাকে চিরকালের ভাষারূপ দান করেন। ভারতচন্দ্রের প্রবাদ-প্রবচনগুলি, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ', দীনবন্ধুর আদুরী কিংবা নিমচাঁদের সংলাপ, বিজন ভট্টাচার্যের 'জোর লড়াই' আজও জীবন্ত। শেকস্‌পীয়রের ক্ষেত্রে তা আরও সত্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই —

এক, 'ওথেলো' নাটক শেষ প্রান্তে পৌঁছল। ওথেলো স্ত্রী ডেসডিমোনাকে 'গণিকা' বলে ব্যঙ্গ করে। ডেসডিমোনা উত্তর দেয় —

No, As I am a christian, If to
preserve this vellel for my lord
from any other foul unlawful touch
be not to be a trumpet
I am none..... [Act IV, Scene II]

এই একটি উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা নায়িকার বংশ পরিচয়ের প্রায় সমগ্র দিক জানতে পারলাম।

দুই, 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' বা 'হ্যামলেট' নাটকে প্রণয়-প্রণয়ীর সংলাপ উত্তরকালে বিভিন্ন দেশের নাট্যকারদের লিরিক সংলাপের আদর্শ হয়ে ওঠে। ভালবাসার অত্যাশ্চর্য রূপ রোমিও ও জুলিয়েটের সংলাপে যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ —

Juliet — Wilt thou be gone ? It is not yet near day ; It was the Nightingale, and not the lark, that piered the fearful hollow of thine ear ; Nightly she sings on you pome-grante tree. Believe me, love, it was the Nightingale.

Romeo — It was the lark, the herald of the morn, No nightingale, Low, love what envious streaks. [Act III, Scene-V]

হরচন্দ্র ঘোষের মত একাধিক নাট্যকার তাঁর ভাষার ভাবানুবাদ না করে আক্ষরিক অনুবাদ করলে শেকস্‌পীয়রের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাতে পারতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রণয় নাটক তো কম হয়নি ! কিন্তু দ্বিতীয় 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' যে পাওয়া যায়নি তা শেকস্‌পীয়রের নাট্যসংলাপ আয়ত্তের অভাবেই।

তিন, 'ম্যাকবেথ' নাটকের নায়ক স্ত্রীর প্ররোচনায় হত্যালীলায় মেতে ওঠে। এখন সে ক্লান্ত। তার মানস-চাঞ্চল্য লক্ষ করে লেডি ম্যাকবেথ। উভয়ের কথাবার্তায় দুই চরিত্রের ভিন্নমনের নিখুঁত উপস্থাপনা—

Lady Macbeth — My husband !

Macbeth — I have done the deed, — Didst thou not hear a noise ?

Lady Macbeth — I heard he owl scream, and crickets the cry.

Did not you speak ?

Macbeth — This is a story sight [Looking on his hands]

এই দম্পতির দুই ধরনের আচরণ ও উপলব্ধি! নাট্যকার অপক্ষপাত দৃষ্টি দিয়ে বিপরীতধর্মী সংলাপ সৃষ্টি করলেন। সর্বকালের নাট্যকারের কাছে সংলাপ রচনার আদর্শ শেকস্‌পীয়র। শেকস্‌পীয়রের কোনো কোনো নাট্য-উক্তি বহুযুগের ওপার থেকে আজকের কালে এসে পৌঁছোয়। লোক-প্রবাদের মত সেগুলিও প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে — মদ্যপানের প্রয়োজন বিষয়ে ফলস্টাফের উক্তির সঙ্গে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের সুরাপানের উপকারিতা-সম্পর্কিত উক্তির কি আশ্চর্য মিল ! অনেকেই জানেন, ১৫৯২ সাল থেকে শেকস্‌পীয়র নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে লন্ডন শহরে বহুল পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নানা সংলাপে নাটক, মঞ্চ, অভিনেতা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে, যা আজকের প্রেক্ষিতেও সত্য। সেইসব উক্তির মধ্যে এক জায়গায় দেখি, নানা রকমের নাটক তাঁর ভাবনায় এসেছে — যেমনটি আমাদের ভাবনাতেও আসে। —

Hamlet — Then came each actor.....

Polonious — The best actors in the world, either for tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral ; tragical-historical, tragical-comical, pastoral, scene individable or poem unlimited.

নাটকের এই জগাখিচুড়ি উনিশ শতকে বাংলাদেশেই চলেছিল। শেকস্‌পীয়র তৎকালীন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি করেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'তিলতর্পণ' নাটকে।

দেবেন্দ্র ।। ওখানা Tragedy না Comedy মহাশয় ?

গ্রন্থকার ।। আজ্ঞে Tragedy-ও না Comedy-ও না। আমি মহাশয় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের Original Thoughts নিয়ে কাজ করি। এতে সব আছে। এখানি হচ্ছে Farcial Tragi Comedy de Pantomimic operetta।

৩য় অভিনেতা ।। এ যে নূতন নাম, এর plot কি মহাশয় ?

গ্রন্থকার ।। plot যদি বল্লেন, তবে plot-এর বড় একটা নাই। Plot নিয়ে তো সকলেই লেখে কিন্তু এর ভাব বড় গম্ভীর। এতে wit আছে, Humour আছে, Blank Verse আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা, কালিওড়ান, চেতনাবান, চিতোর, সাহেবমারা, সব আছে, অশ্লীল নাই।

দেবেন্দ্র ।। চিতোরের সঙ্গে সাহেব, সে কি ?

শেকস্‌পীয়র ও অমৃতলাল যদি একালের মানুষ হতেন তা হলে কলকাতার পেশাদারি মঞ্চে এখনও যে সব জগাখিচুড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একইভাবে অভিনীত হচ্ছে, তা দেখে অবাক হতেন।

শেকস্‌পীয়রের As you like it নাটকে Jaques-এর উক্তি —

All the worlds' a stage,

And all the men and women merely players

আমরা কৈশোর থেকে শুনেছি, সত্য বলেই মনে করেছি।

শেকস্‌পীয়রের নাটকে সাধারণ মানুষ

রাজপরিবারের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের নৈকট্য যথেষ্ট থাকলেও বাল্যকাল থেকে লন্ডন শহরের পথঘাট ও মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তাঁর নাটকে গণজীবনের চিত্র ও চরিত্রের বহুল ব্যবহার। যুবক শেকস্‌পীয়র লন্ডন শহরের হৈ চৈ, পথেঘাটে হাতাহাতি, হোটেলে রাত্রিবাস, নানা দেশের জাহাজের বাণিজ্যসূত্রে আনাগোনা ইত্যাদি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ট্যাভার্নের পানশালায় মাঝে মধ্যে নিজে গিয়ে 'বেসামাল মাতালদের'ও চিনেছিলেন। ইংল্যান্ডের চোর-ডাকাত-পাহারাদারদের মানসিকতা তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর নাটকে রাজা হেনরির বংশপরম্পরা যেমন আছে তেমনি আছে অবজ্ঞাত এক গয়লানী ['দি উইনটার্স টেল']। লণ্ডন শহরের ধনী যেমন আছে, তেমনি আছে রোম নগরীর মুচি ['জুলিয়াস সিজার']। তিনি যেমন Country Life-এর স্বরূপ দেখেন নিবিষ্ট মনে, তেমনি খুঁটিয়ে দেখে নাটকে ফুটিয়ে তোলেন মেষপালকের চরিত্র ['অ্যাজ ইউ লাইক ইট']। বাংলা নাটকে 'জনতা' চরিত্রের অনুপ্রেরণা নাট্যকারগণ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন বলে আমার স্পষ্ট অভিমত। ইংরাজি সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন :

'সৎ-অসৎ, সংকীর্ণ-উদার, উচ্চ-নীচ সকলের প্রতি তাঁহার একই প্রকারের ক্ষমাসুন্দর স্নেহদৃষ্টি — কেহই তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়। সকলেরই মনের কথা তিনি বুঝিয়াছেন, সকলেরই

অন্তরে তিনি মানবিকতার সন্ধান পান। তিনি সকলের সঙ্গে এক সমতলভূমিতে বিচরণ করেন ; নীতিবিদদের উচ্চ মঞ্চ হইতে তিনি কাহাকেও সমালোচনা করেন নাই, বিচারাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপপুণ্য অনুসারে দণ্ড পুরস্কার বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাবও শেকস্‌পীয়ারে নাই।'

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে এনোবারবাস মেসেনাসকে বিচিত্রময়ী ক্লিওপেট্রার অপার রহস্য সম্পর্কে বলেছিলেন :

Age cannot withers her, nor
custom state
Her infinite variety.....

শেকস্‌পীয়রের নাটকাবলী সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। মৃত্যুর আগে ক্লিওপেট্রাও বলেছিল 'I have immortal longings in me.' শেকস্‌পীয়রের নাট্যবিষয় ও নাট্যচরিত্রও immortal longing ! যিনি Play right, যুগপৎ নাট্যকার ও অভিনেতা, তাঁর নাটক দর্শকদের হৃদ্‌স্পন্দন শুনেই সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগ শেকস্‌পীয়রের ছিল। তাই তিনি চির আধুনিক, চির রহস্যময় স্রষ্টা।

৮.৪.১২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘প্লে-রাইট শেক্সপীয়র’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৮.৪.১২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ১৩
লৌকিক নাটক

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১৩.১ লৌকিক নাটক

৮.৪.১৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৪.১৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৮.৪১৩.১ঃ লৌকিক নাটক ঃ বাংলা নাটক

বহু রঙ্গমঞ্চের দুশো' এবং বাংলা মৌলিক নাটকের দেড়শো বছরের বেশি বয়স হলেও নাটক রচনার পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য বাঙালী যে কয়েক শতাব্দী ধরে একনিষ্ঠ চর্চা চালিয়েছিল তা আমরা জানি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের উপর পাশ্চাত্ত্য নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হলেও পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর বাঙালীর নাট্যস্বভাবের কোনো আদর্শই বাংলা নাটক পায়নি এ-কথা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যধারার জন্মের আগে অনভিজাত, নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকদের কাছে নাট্যরস পরিবেষণের দায়িত্ব নিয়েছিল যাত্রা, কথকতা, ধামালী, পাঁচালী, জাগ-গান, গম্ভীরা ইত্যাদি লোকনাট্যসমূহ। এগুলি বাংলার মাঠ-ঘাট-বন ইত্যাদির সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত হয়ে গিয়েছিল যে বাংলা নাটকের মধ্যে ইতস্তত ছায়াসঞ্চার করেই তা ফুরিয়ে যায়নি; আজও, এই অত্যাধুনিক যুগেও, গ্রামবাংলায় লৌকিক নাটকগুলি জীবন্ত। আর বাংলা নাটকের উপর যে ধ্রুপদী নাট্যকলার চেয়ে যাত্রার প্রভাব কোনো অংশে কম নয় প্রখ্যাত সমালোচক তা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন : 'At the sametime it must be said that some of the particular features of yatra, such as its overflow of song and dance, its long drawn-out theme, its predilection for declamation, Rhetoric and irrelevant farcial episode, continued to manifest themselves throughout the history of the Bengali Theatre down to the days of Girish Chandra and KshirodProsad, and even upto the present time:' : Dr. S. K. De. Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1962, pp. 643-44.

তবে ড. দে আর একটু স্পষ্ট করে বলতে পারতেন যে, যেহেতু প্রায় সব যাত্রারই কাহিনী ছিল পুরাণনির্ভর তাই পৌরাণিক নাটকগুলির উপরই তার প্রভাব বেশি। অবশ্য আঙ্গিকের দিক থেকে সমগ্র বাংলা নাটকের উপরই যাত্রার প্রভাব আছে। এই প্রবন্ধে যাত্রার ইতিহাস আলোচনা অনাবশ্যক, তাই যে যে দিক থেকে বাংলা নাটক যাত্রার কাছে ঋণী সেই দিকগুলিই তুলে ধরা হচ্ছে। তবে মনে রাখা দরকার, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে কৃষ্ণযাত্রায় মধ্যে লোকশিক্ষা দানের যে উদ্দেশ্য ছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি অবসিত হয়। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোবিন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উৎসাহে যাত্রার লুপ্ত গৌরব ফিরে এল। বাঙালি গীতাভিনয় রচয়িতারা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের খবর রাখতেন। শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নতুন যাত্রাওয়ালারা কামরূপ যাত্রা থেকে কাহিনী আনলেন, আনলেন বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। পূর্ববর্তী কৃষ্ণযাত্রা 'প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যে যাত্রার স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজাইত, এক্ষণে সেইস্থলে মেতর-মেতরানী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়'। [বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮৯] সখের যাত্রাদলের এই কালাপাহাড়ী ভূমিকাকে সেকালে বৃহত্তর লোকসমাজ মেনে নেননি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-তে স্বতন্ত্র নাট্যরীতির বাসনা জানালেন [মাঘ, ১২৮০ শকাব্দ]। জন্ম নিল গীতাভিনয় এবং এই গীতাভিনয় ও নাটক পরস্পর রস-রুচি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল। অর্থাৎ লৌকিক যাত্রা এবং মৌলিক নাটকের মধ্যে গীতাভিনয় সংযোজকের ভূমিকা নিল।

বাংলা গীতাভিনয় এবং নাটকের সঙ্গে যাত্রার নৈকট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছে পৌরাণিক নাটক। তারাচরণ শিকদার থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ - মন্মথ রায় প্রমুখ বেশ কয়েকজন নাট্যকার পুরাণের বহুপ্রচলিত এবং স্বল্পপ্রচারিত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে যে পৌরাণিক নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলির উপর একদিকে যেমন প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় ভাবের জরি-মখমলের কারুকাজ উপস্থিত, তেমনি সেগুলির মর্মকোষে রোপিত হয়েছিল উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির উপর যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল তা দেহের, আত্মার নয়। আসলে পৌরাণিক নাটকগুলি তাদের প্রাণসম্পদ আহরণ করেছিল দেশীয় উৎস থেকে, সেদিক থেকে যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটকের কাহিনী-উৎস একই। উনবিংশ শতাব্দীর নতুন যাত্রাওয়ালাদের পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যায় পৌরাণিক নাট্যকারদের মত যাত্রা রচয়িতাদেরও অন্তর ছিল ভক্তিরসার্দ্র। পুরাতন যাত্রার বিকশিত ধর্মভাব যে বাংলা নাটকের মূলে শক্তিসঞ্চার করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

হরচন্দ্র ঘোষ এবং মধুসূদন দত্ত যাত্রার প্রভাব মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য অনুসারী নাট্যরচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। হরচন্দ্র ইংলন্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে 'কৌরব বিয়োগ' নাটক লিখতে গিয়ে 'historical tragedy'-র পথচ্যুত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কাশীদাসী মহাভারতের অংশ বিশেষের গদ্যরূপ দিয়েছেন মাত্র। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'ও সার্থক পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। লোকশিক্ষা লাভে ব্যাকুল বাঙালি লৌকিক ধর্মকথাই শুনতে চেয়েছে। গিরিশ-পূর্ব নাট্যকারগণ যাত্রারচয়িতাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করলেও একথা

অস্বীকার করা যায় না যে মধ্যযুগের নাট্যগীত এবং লোকনাট্যগুলির মধ্যে ভক্তিবাদের প্রবাহ ছিল দুর্মর। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের নাট্য-লক্ষণের সঙ্গে বাংলার যাত্রাধারার ভক্তিরসের মিশ্রণে যে পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম ঘটেছে সেগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে এই স্রোত প্রবল হওয়ায় তাঁর নাটক ব্যাপক জনপ্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর পূর্বে এবং পরে আর কোনো নাট্যকার যাত্রাদর্শককে এমনভাবে সর্বস্ব দিয়ে গ্রহণ করেননি।

বাংলা নাটকে যাত্রার মত গীতাধিক্য না ঘটলেও যাত্রার গীতরীতি বাংলা নাটকে, প্রধানত পৌরাণিক নাটকে প্রবেশ করেছিল। যাত্রা আসলে যাত্রাগান। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কৃষ্ণযাত্রা একাকার হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কৃষ্ণযাত্রায় নৃত্যগীত অত্যন্ত তরল হয়ে গিয়েছিল। শিশুরাম, পরমানন্দ, প্রেমচাঁদ প্রমুখরা যাত্রায় সংগীত ব্যবহারে সতর্ক হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোপাল উড়ের যাত্রায় মালিনী নৃত্য, খেমটা নাচ ইত্যাদি রুচিহীন নৃত্যগীতকে সেকালে শিক্ষিত দর্শক-সমাজ গ্রহণ করতে পারেন নি। কৃষ্ণকমল গোবিন্দ অধিকারীর মত অতি গভীর ভাবকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। আগে কীর্তনে পাত্রপাত্রীর সংলাপ প্রায় ছিলই না, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রার সংলাপের প্রাধান্যে গান অনেক কমে গেল। মতিলাল তাঁর যাত্রাপালায় জুড়িগানকে জনপ্রিয় করে তুললেন। জুড়ি গান গাইত আট-দশ জন, বালকদলের গায়ক সংখ্যা ছিল পঁচিশ-ত্রিশ জন। প্রস্তাবনার পূর্বে জুড়ি গান থাকত। গানের কথা আর যন্ত্রের সুর একাকার হয়ে দর্শকের মনে ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিত। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের যাত্রায় জুড়িগানের প্রচলন না থাকলেও লেখকদলের গান, গণের গান ইত্যাদি জুড়িগানের বিকল্প রূপে কাজ করেছিল।

বাংলা নাটকে সংগীতের প্রভাব যাত্রা থেকেই সবচেয়ে বেশি আসে। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কোনো নাট্যকার নেই, যাঁদের উপর যাত্রা-সঙ্গীতের প্রেরণা নেই। এতে নাটকের ত্রুটি যে ঘটেনি তা নয়, বিশেষত সামাজিক নাটক এবং ঐতিহাসিক নাটকে যাত্রানুসারী গান Dramatic action-কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য, রূপক ও সাংকেতিক নাটকে গান ভাবের অন্যতম দ্যোতক।

নাটকে একশ্রেণীর চরিত্র থাকে যারা সংসার অনাসক্ত, বৈরাগী। এই চরিত্রগুলি গান গেয়ে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের জড়তা ও বিহ্বলতা ঘুচিয়ে দেয়। যাত্রার বিবেক ও মহান্ত সেই চরিত্র। মনোমোহনের শান্তি পাগলা, দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতনের চারণী, রবীন্দ্রনাট্যের ঠাকুর্দা, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রমুখ সেই ধরনের চরিত্র। এই সূত্রে বলা ভাল তারাচরণ শীকদারের মত একাধিক নাট্যকার যাত্রা-সংগীতকে বিদ্রূপ করলেও তাঁরা তাঁদের নাটকেই যাত্রানুসারী সংগীত ব্যবহার করে লোকপ্রিয়তার পথ খুঁজেছেন।

বাংলার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে তথা প্রহসনে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হলেও পৌরাণিক নাটকগুলির অধিকাংশই পদ্য সংলাপ অথবা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংলাপে রচিত। এ ক্ষেত্রে যাত্রার প্রভাব আংশিক হলেও বাংলা নাটকে পড়েছে। কৃষ্ণকমলের রচনায় পদ্য সংলাপ প্রায় নেই-ই, গোবিন্দ অধিকারী সংলাপে গদ্যভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর চরিত্রের অতিদীর্ঘ সংলাপ দর্শকের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। তবে যাত্রার মধ্যে পদ্য থেকে গদ্য সংলাপে পৌঁছানোর যে ক্রমবিকাশটি দেখা যায় বাংলা নাটকে সেই ক্রমবিকাশটি নেই।

কৃষ্ণযাত্রা ছাড়া মধ্যযুগে আর এক শ্রেণীর নাট্যগীতধারা দেখা দিয়েছিল যেগুলিকে লোকনাট্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না। নিরক্ষর এবং স্বল্পশিক্ষিত রচয়িতারা সহজ ভাষায় এবং জনরুচির দিকে লক্ষ রেখেই এই লৌকিক নাটকগুলি রচনা করেন। ঝুমুর, ধামালি, কথকতা, পাঁচালী, জাগ-গান, গম্ভীরা ইত্যাদির ভিতর বাংলা লোকনাট্যের বিকাশ হয়েছে এবং কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তার পূর্বে এগুলি সাধারণ বাঙালির নাট্য-পিপাসাকে চরিতার্থ করেছে।

ধামালি বা ঢামালি মধ্যযুগের বাঙালীর রসতৃষ্ণাকে অনেকটা তৃপ্ত করেছিল। পূর্ববর্তী দেবচরিত্রে রঙ্গরসিকতা আরোপিত হয়নি, ধামালিতে এর সূচনা। পৌরাণিক কৃষ্ণ এই লৌকিক নাটকগুলিতে প্রায়শ নায়ক ছিলেন বলেই ধামালির সাধারণ্যে পরিচিত কৃষ্ণধামালি রূপে। কিন্তু কৃষ্ণধামালির কৃষ্ণচরিত্রে যে রুচিহীনতার প্রয়োগ ঘটেছে তা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ব্যতীত অন্য নাট্যগীতে দুর্লভ। তবে মতিলাল রায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখের যাত্রাপালায় এবং মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ প্রমুখের গীতাভিনয়ে কৃষ্ণধামালির ভাল দিকটি গৃহীত হয়েছে।

কথকতা এবং ঢপ কীর্তনের ঢঙে বাক্যের অন্ত্যানুপ্রাস ও মিল ব্যবহারের রীতি গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকাররা কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন। 'জনা' নাটকের বিদূষকের সংলাপ এই জাতীয় — 'আর কি মন্ত্রণা ?/যদি ভালই চাও,/ ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও/.....একে সকাল থেকে হরি হরি,/ তাতে রাজকার্যে নারী/তার উপর বেজায় বাঁকেয়াড়া সুত/কিছু না কিছু জুত/আসছে নিশ্চয়।/মন্ত্রণা করে কি হবে বল ?/ যা হয় একটা করে ফেল/হরি হে !/ তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেকো/অন্তিমকালে দেখ/ আর রাজবাড়ীতে দুটো মণ্ডার পথ রেখো'। [১/৪]।

বাংলা নাটকে লৌকিক প্রভাব বলতে যেমন লোকনাট্যগুলির সঙ্গে তার যোগ বোঝায়, সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবনে প্রচলিত বহু ছড়া-পাঁচালী প্রবাদ, গান ইত্যাদিরও আরোপ বোঝায়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে দেওয়ান গোপীনাথের মুখের ছড়াগুলি ভোলা যায় না। 'জামাই বারিক' নাটকে জায়েরা মিলে পীরের গান গেয়েছে ঃ

ষষ্ঠ জা । [চামর মন্দিরা লইয়া চারজন জামাইয়ের সহিত গীত]
মাণিক পির্, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে
ফেনি খালে না।

চারজন জা । মাণিক পির্ — [ইত্যাদি]।

ষষ্ঠ জা । আল্লা আল্লা বল রে ভাই
নবি কর সার,
মাজা দুল্য়ে চলে যাবা
ভবনদীর পার।

চারজন জা । মাণিক পির্ — [ইত্যাদি]।.....

গান শেষ হল। তৃতীয় জা বলল, 'এবারে পাঁচালী হক্।'

এভাবেই বাংলা নাটকে লৌকিক প্রভাব এসেছে সহজ স্বভাবে, স্বচ্ছন্দ প্রয়াসে।

৮.৪.১৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘লৌকিক নাটক’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৮.৪.১৩.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

একক ১৪
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক

বিন্যাসক্রম :

৮.৪.১৪.১ স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক

৮.৪.১৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.৪.১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

আত্মহত্যা করতে চলেছে। অংশটি পাশ্চাত্ত্য নাটকের স্বগতোক্তি রীতি না মেনে যাত্রার মত আবেগমুখী, মেলোড্রামা সর্বস্ব —

গোবিন্দ ।। ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সাধের ভ্রমর! আমার বড় ভালোবাসার ভ্রমর! আমার কালো ভ্রমর! আমার সুন্দর ভ্রমর! কোথা যাচ্ছে ? স্বর্গের জিনিস স্বর্গে চল্লে ? আমি নরকের কীট জ্বলে পুড়ে মরবার জন্যে বেঁচে রইলুম ? নরক আর কোথা ? এই সংসারই নরক।

[বাকি অংশ পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৪ একক -১ দ্রষ্টব্য]

৮.৪.২.৭ ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক

স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তিকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপান্তর নিয়ে যেমন লেখাপত্তর ছাপা হচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের অঙ্গনে নিত্য যে সব পরিবর্তন ঘটছে তা নিয়েও বিভিন্ন স্তরে আলোচনা লেখা চলছে। যেমন নাটক ও থিয়েটার নিয়ে। নাটকের সঙ্গে অভিনয়ের এবং অভিনয়ের সঙ্গে রঙ্গশালার একাত্মতা স্বাধীনতার আগে প্রায় অনিবার্য ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা নাটকের যে সম্ভার বিভিন্ন নাট্যকারের কলম থেকে বেরিয়েছে, আঙ্গিকগত দিক থেকে তা স্বাধীনতা-পূর্ব ধারা থেকে ভিন্ন হলেও দেশ সমাজচেতনার বিষয়েই তা কেন্দ্রীভূত থেকেছে। তাই বলে কি পুরোনো ভাল নাটকগুলির মূল্য কমে গেছে ? মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের ভাল নাটকগুলিই বা কজন পড়েন ? কজন দর্শকের কাছেই বা এসব নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দেবার তাগিদ আছে ? অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে চল্লিশের দশকে লেখা দু-তিনটি নাটক ছাড়া অন্য পুরনো নাটকগুলি পড়ান হয়। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এই সব নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আজও কম নয়। ভাবুন তো, প্রায় দেড়শো বছর আগে মধুসূদন যে দুটি প্রহসন লিখেছিলেন, ১৯৯২ সালে, মৃত্যুর আগের বছরও উৎপল দত্ত তা অভিনয় করে দেখিয়েছেন যে আগামী পাঁচশ বছরেও এ নাটকের গুরুত্ব থাকবে। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর 'থিয়েটার কমিউন' দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র সফল প্রযোজনা করে দেখিয়েছেন ১৮৬৬ সালে লেখা প্রহসনটি একশ তিরিশ বছর পরেও সমান সমকালীন। স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত বাংলায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মদ্যপান সম্প্রসারিত হয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি এখনকার অনেক অটলচন্দ্র একই ভাবে দুর্ব্যবহার করে, সমাজ থেকে পতিতাবৃত্তি দূর হয়নি। এখনকার যৌনকর্মীরা যেমন সাক্ষর হচ্ছে, সন্তানদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করছে, ভদ্র ব্যবহার শিখছে, দীনবন্ধু-সৃষ্ট চরিত্র কাঞ্চনও সে সুযোগ পেলে গ্রহণ করতো। কাঞ্চন হয়ত পতিতা ছিল, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বও ছিল। দীনবন্ধু তা দেখিয়েছিলেন। যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন। আবার গিরিশচন্দ্রেরও নবমূল্যায়ন করেছেন উৎপল দত্ত। যে গিরিশচন্দ্র নিজেই সামাজিক নাটক লিখতে বীতরাগ ছিলেন এবং এ জাতীয় নাটক লেখাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে মনে করতেন, উৎপল দত্ত তাঁর গভীর অধ্যবসায় নিয়ে দেখিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের সমাজ-মনস্কতা কি দুর্দান্ত ছিল। পণপ্রথা, বিধবা-প্রেম, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর সমস্যাপ্রধান সামাজিক নাটকগুলি এখন আর তেমন অভিনীত হয় না। দূরদর্শন-এ 'প্রফুল্ল' সিরিয়ালে গিরিশচন্দ্র কতটা

হাজির এমন প্রশ্নও তোলা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রযোজিত 'বলিদান' নাটকটি তো সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলও। 'বলিদানে'র সমস্যা — পণপ্রথা। এই প্রথা এখনও বাঙালি সমাজ থেকে হটে তো যায়ইনি, বরং তার নানা রং দেখা দিয়েছে। গিরিশচন্দ্রের আঁকা নারীদের ট্র্যাজেডি আজও কি নেই ? কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে তা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প কিংবা গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের মত আরও অজস্র পণপ্রথা বিরোধী নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের কজন নাট্যকার বুঝতে পারলেন ? 'বলিদান' নাটকের ট্র্যাজেডি রসের ব্যর্থতা, সংলাপের আড়ষ্টতা, চরিত্রসৃষ্টিতে দুর্বলতা — এসব নিয়ে বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর সামাজিক গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি। বি. এ., এম. এ. পাশ করা অনেক মেয়ের, স্রেফ অর্থাভাবে বিয়ে হয়নি — এ কি আমরা জানি না ? যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিরাট পণের দাবি একালের অনেক শিক্ষিতা যুবতী প্রত্যাখ্যান করছেন। মহিলা কমিশনে খোঁজ করলেই কতজন বিবাহিতা কেবল পণ সমস্যার জন্য খুন হয়েছেন, কতজন ডিভোর্সের শিকার হয়েছেন তার মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যাবে, আশা করা যায়। বাংলায় পণপ্রথা-বিরোধী নাটকের এখন যথেষ্ট অভাব রয়েছে, এ বিষয়টি নাট্যকারদের ভাবা দরকার। মহিলারাও তো এ নিয়ে নাটক লিখতে এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু কেন?

ঠিক স্বাধীনতার ষাট বছরের সীমা মানতে হলে, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'র প্রসঙ্গ বাদ দিতে হয়। কিন্তু 'নবান্ন' কোনোও নির্দিষ্ট বছরে লেখা নাটক (১৯৪৩) তো নয় -- সমগ্র বাংলা নাট্যান্দোলনের ইতিহাস যতদূর পর্যন্ত চলবে, ততদূর পর্যন্ত 'নবান্ন'-র নাম থাকবে। আমার তো মনে হয় 'নবান্ন' নাটক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের উত্তরাধিকার, বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজের দ্বিতীয় জীবন্ত দলিল। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে বিজনবাবু প্রথম এসেছিলেন। তারপর গণনাট্য সংঘের সূচনা থেকেই লিখেছেন 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'। পরে গণনাট্য ছেড়েছেন। নবনাট্য অভিহিত নাট্যচর্চায় থেকেছেন, কিন্তু তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কৃষকদের দুঃখকষ্ট ও প্রতিবাদের যে ছবি এঁকেছিলেন, ১৯৭০-এ লেখা তাঁর শেষ নাটক 'চলো সাগরে'-তে বিভূতির দোলাচল চিত্ততার মধ্যেও লক্ষ করা যায় তাঁর বিশ্বাস একেবারে পাল্টে যায়নি। বিভূতি দেশকালের প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের যুগোপযোগী মূল্যায়ন চেয়েছিল। তাকে নিয়ে, অবশ্যই নাট্যদৃশ্যে, কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা হয়েছিল। সে নিজেও সাময়িকভাবে আত্মহননের কথা ভেবেছিল, পরে বলেছিল---

'ভেবেছিলাম পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই পথ কেটে কেটে এগিয়ে যেতে হবে। ... শ্রেণীসংগ্রামের বিচিত্র রূপ শেষ হবে না। ভিন্ন জনের ভিন্ন মন --- তবু সবাই আমরা এক। এক সাথেই আমরা চলব। আমাদের নিশানা এক। ... কিন্তু স্বপ্নের মাঝখানে দুঃস্বপ্ন-- আজ বড় একা লাগছে, নিঃসঙ্গ লাগছে আমার, আমার ভয় করছে।'

সংশোধনবাদ- হঠকারী আন্দোলন-- শেষ নাটকে এ সবই বিজনবাবু এনেছেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে কোনোও পরিষ্কার অবস্থান নেননি। অবশ্য নাটকের শেষ অংশে বিভ্রান্ত জনতার আর্তি ও পরে সুশৃঙ্খল জনতার সংঘবদ্ধ মিছিলের উপর তাঁর বিশ্বাস অপরিস্ফুট থাকেনি। নাটকের 'নান্দীপাঠ' অংশে তিনি যে কথা লিখেছেন, ধরে নিচ্ছি, শেষ নাটকে এবং শেষ জীবনে এই বিশ্বাসই তিনি করতেন--

'তোমার আমার বিভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু মিছিলের কোনো বিভ্রান্তি থাকতে পারে না। কেননা অনন্ত চৈতন্যের সাগ্নিক সহস্র নায়ক এই মহামিছিলের পথ নির্দেশ করে চলেছে। আমারই মিছিল, ঠিকই কিন্তু মিছিলেরই একান্ত আমি, বা আমিই মিছিল, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ক্ষুরধার যুক্তিবাদ, এই আপাত বৈপরীত্য সমাধান করবেই করবে।'

উৎপল দত্তও মার্কসবাদ সম্পর্কে নিষ্ঠাবান ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁরও বাঁক ফেরা ও প্রত্যাবর্তনের ঘটনা আমরা জানি। গণনাট্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এক ঝলকের মতই ক্ষণিকের, কিন্তু আমৃত্যু তিনি গণমুখী নাটকই লিখে গেছেন। তবে কিছু নাটকে গণআন্দোলনের যে চেহারা তিনি এঁকেছিলেন, কিংবা বামপন্থা সম্পর্কে যেভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন তার কিছু আমাদের ভাল লাগে, কিছু নিয়ে প্রশ্ন থাকে। 'অঙ্গার' বা 'কল্লোল'কে আমরা প্রাণভরে গ্রহণ করি, 'তীর'কে প্রত্যাখ্যান করি। সত্তরের দশকের আগে থেকেই হঠকারী আন্দোলনের প্রভাবে বিজনবাবু ও উৎপলবাবু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সে বিষয়ে উৎপলবাবু অতি দ্রুত পুর্নমূল্যায়ন করে, সঠিক পথে ফিরে এসেছিলেন। হয়ত বিজনবাবু অপেক্ষা উৎপলবাবুর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-মাও সে তুং-এর রচনাদি বেশি পড়া ছিল বলেই এই তফাৎ। তাছাড়া ব্রেখট-এর জীবনাদর্শে অনুরাগী উৎপল, যিনি 'ব্রেখট ও মাকর্সবাদ' নামে একটি সুন্দর পুস্তিকা লিখেছিলেন, তিনি দ্রুত নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে পারেন এবং লিখতে পারেন কংগ্রেসী সন্ত্রাসের প্রতীকে 'ব্যারিকেড' এবং 'দুঃস্বপ্নের নগরী'র মত নাটক। সত্তরের দশকের সন্ত্রাসকে বৃহত্তর পটভূমিতে নিয়ে যেতে পারেন 'লেনিন কোথায়' লিখে। তিনি যে সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ এবং ব্রিটিশ সরকারের নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন মনে রেখে 'টিনের তলোয়ার' লিখলেন তার নেপথ্যে সত্তরের দশকে সংস্কৃতির উপর কংগ্রেসী কালচারের হামলাও হয়ত তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। এঁরা কেউই বামপন্থী বলে নিজেদের দাবি করেননি। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে গণনাট্যের নাট্যকারদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন আছে এবং উৎকৃষ্ট নাটকগুলির উপর বিস্তৃত প্রশংসাসূচক মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু তাঁদের বই বড়ে, যাঁরা নাটক বুঝতে শিখেছেন, তাঁদেরই কেউ কেউ গণনাটকগুলিকে প্রচার-নাটক হিসেবে অপপ্রচার করেছেন ও করছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' 'ছেঁড়াতার' 'পথিক', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল' 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', সলিস সেনের 'নতুন ইহুদী' ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন', বীরু মুখোপাধ্যায়ের, 'সংক্রান্তি', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা', উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ', জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না', সুনীল দত্তর 'হরিপদ মাস্টার', জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', মনোজ মিত্র-র 'চাক ভাঙা মধু', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' প্রভৃতি গণনাট্য ধারার নাটকসমূহ কি প্রচার নাটক নাকি? এগুলিতে তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, জমিদারতন্ত্র, আর্থিক সমস্যাক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত জীবন, কন্যাদায়ের যন্ত্রণা ইত্যাদি আরও নানা প্রসঙ্গ এসেছে। এসব বিষয় কি অনৈতিহাসিক, না মিথ্যা প্রচার? আমরা জানি যে, শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত-সর্বহারাদের বেদনার কথা চোরাবালিতে মুখগোঁজা উটপাখি। সমালোচকরা ছাড়া স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার

জানা ছিল এবং আছে। খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যাযের 'মিছিল', খাদ্যের দাবি নিয়ে বারীন রায়ের 'আর কতদিন', রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড-আশ্রয়ে সলিল বিকাশ নাথের 'বেসরকারী সূত্রে', পুলিশী সন্ত্রাস নিয়ে চিররঞ্জন দাসের 'পথে নামার সময়', কৃষি-আন্দোলন-ভিত্তিক পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে তোল ধান', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান', শ্রীজীব গোস্বামীর 'মেঘ কাটার পালা' অবশ্যই কোনোও না কোনোও ঘটনার প্রচার, কিন্তু সেই ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। প্রতিটি নাটকের পটভূমিই বাস্তব।

এই রকম বাস্তবতা স্বাধীনতা-পূর্বকালের ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকগুলিতে ছিল, অথচ সেগুলি দেশাত্মবোধের প্রচারমাত্র বলে আমরা উড়িয়ে দিইনি। ঠিক তেমনি ভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কংগ্রেস-সৃষ্ট নানাবিধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সঙ্কট যে সব নাটকে উঠে এসেছে সেগুলিকে 'প্রচার-নাটক' তক্‌মা দেওয়ার আমরা বিরোধী। এই প্রসঙ্গে, বিভিন্ন সময়কালে, নির্বাচনকে সামনে রেখে সেসব পোস্টার নাটক বিগত তিনদশক ধরে চলে আসছে, সেগুলির কথাও বলতে হয়। এ ধরনের নাটক বিগত বিশ-পঁচিশ বছরে যত লেখা হয়েছে, তার সামান্যই ছেপে বার হয়েছে। তবে এর সূচনা বহু কাল আগে বলা যায়। লর্ড রিপনের উদ্যোগে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্বশাসন উপলক্ষে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা নিয়ে পাঁচমিশালি রঙতামাশা 'ভোটমঙ্গল' লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর বন্ধু অমৃতলালও লিখেছিলেন 'সাবাস আটাশ'। আর স্বাধীনতার পর নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সূচনাপর্বে পানু পালের 'ভোটের ভেট', 'ভাঙা বন্দর', বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন', 'দিন বদলের পালা' কিংবা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'জন্মোৎসব' নির্বাচনী নাটিকা হয়েও নাট্যশিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ। সমকালীন ঘটনা, ব্যক্তি, রাজনীতি ইত্যাদি এই সব 'নির্বাচনী নাটিকা'র বিষয়বস্তু হয়, এই অভিযোগে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিকে এখনও জায়গা দেওয়া হচ্ছে না।

আগে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্যকমিটির উদ্যোগে 'পথনাটিকা' বিষয়ক পর পর দুটি সেমিনার হয়েছে। সেখানে নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা নাটক লিখে থাকেন তাঁরা পোস্টার নাটককে উন্নত নাট্যশিল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নাট্যকারদের সচেতন হতে বলেছেন। এই ধরনের শিল্পোত্তীর্ণ নির্বাচনী নাটকও যে একেবারে লেখা হয়নি তা নয়, যেমন এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে উৎপল দত্তের 'দিন বদলের পালা', হীরেন ভট্টাচার্যের 'বাস্তব শাস্ত্র', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুদ্রামুক্তি' কিংবা উৎপল দত্তের আর একটি নাটক 'জনতার কল্লোল'।

নির্বাচন এসে গেলেই প্রবীণ ও নবীন নাট্যকাররা নাটক লিখতে বসেন। সাতাত্তরের আগে ও পরে লেখা এই ধরনের নাটকের চরিত্রগত পার্থক্য আছে অবশ্যই। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্যে 'অপারেশন বর্গা'র যে স্থির লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, তা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উদ্যোগ। আটাত্তরের বন্যায় বামপন্থী নেতা-কর্মীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জনসাধারণের স্বার্থে, তা এখনও মনে ভাসে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে পাহাড় থেকে

সমতলের সব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। জাঠা করেছিল। আবার বোফর্স কেলেঙ্কারি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, শেয়ার কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেছিল। আই. এম. এফ. লোন থেকে ডাঙ্কেল প্রস্তাব এসবও আশির নব্বই-এর দশকের প্রতিরোধের বিষয়। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর ইন্দিরা-হত্যার পর শিখ নিধন। দূরদর্শনে লাগাতার অপসংস্কৃতির প্রচার। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে অশ্লীল নাট্যাভিনয়। এসবও বিগত বিশ বছরের নানা নির্বাচনের পোস্টার নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে স্মৃতি থেকে উল্লেখ করছি তেমনই কয়েকটি নাটকের কথা। নীলিমা দাসের 'কাটা হাত ভাজা কই', বাসুদেব বসুর 'হিসাব নেবার পালা', সুপ্রিয় সর্বধিকারীর 'নয়া রোশনী -- (হিন্দি), হীরেন ভট্টাচার্যের, 'পাগলা ঘন্টি', শ্যামল ভট্টাচার্যের 'এ নির্বাচন জিততে হবে', কিংশুক দত্তর 'এই চিহ্নে ছাপ দিন'। শ্যামাকান্ত দাস, অসীম দাস, ললিত রক্ষিত প্রমুখ আরও অনেকেই নির্বাচনী নাটক লিখেছেন। শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'মড়া' নাটিকাটি আমার দুর্দান্ত মনে হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে আগামী দিনে আরও নানা নির্বাচন আসবে। অজস্র নির্বাচনী নাটক লেখা হবে। গ্রামে গঞ্জে অভিনীত হবে। নির্বাচনের শেষে অনেক অমুদ্রিত নাটক স্মৃতি থেকে মুছেও যাবে। কিন্তু তার মধ্য থেকেই, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়েও কোনোও কোনোও নাটক চিরায়ত হয়ে উঠবে। এজন্য নাট্যকারদের সতর্ক থাকতে হবে। দেখতে হবে তার সংক্ষিপ্ত নাট্য-পরিসরেও চরিত্রগুলির সংলাপ যেন দর্শককে শুধুই হাসায় বা কাঁদায় না, যেন গভীরভাবে ভাবায়।

বিগত ষাট বছরের নাট্যচর্চায় উদ্ভট নাটক বা অ্যাবসার্ড নাটকের কথা এড়িয়ে যেতে পারছি না। ব্রেখট চেয়েছিলেন, নাটক এবং থিয়েটার থেকে ভাবাবেগ বর্জন করতে। একারণেই বাঙালি দর্শকদের মধ্যে যাঁরা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত তাঁদের কাছে ব্রেখটের কিছু নাটককে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, ফলে তাকে উদ্ভটও বলা হয়েছে। কিছু নাটকের নায়কদের মনে করা হয় তারা উদ্ভট নাটকের নায়কদের মতই নেতিবাদী। যদিও 'মা' কিংবা 'প্যারি কম্যুনের' চরিত্রদের ইতিবাচক আখ্যা দিতে বিভ্রান্তি দেখা যায় না। মনে করা হয়, এ হল ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমই ব্রেখটকে উদ্ভট নাট্যকার পিরানদেল্লোর থেকে আলাদা রেখেছে, যদিও তাঁর উপর পিরানদেল্লোর প্রভাবের কথা কেউ কেউ দাবি করেন। বরং বলা যায় তাঁর 'ডী টাগে ডের কম্যুনে' অনুবাদের সময় উৎপল দত্ত, 'ডি গুড পারসন অব সেন্টজুয়ান' অনুবাদের সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'দি ককেসিয়ান চক সার্কেল' অনুবাদের সময় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের দেশীয় পরিবেশকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে ব্রেখটিয় সংকেত রীতি কাটিয়ে উঠে 'নয়া জমানা' ভালো মানুয়ের পালা এবং 'খড়ির গণ্ডী' সর্বস্তরের দর্শককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু উদ্ভট নাট্যকারদের কোনোও বিবর্তন নেই, না ইউরোপে, না পশ্চিমবঙ্গে। বাস্তব-বিরোধী অ্যাবসার্ড নাটক যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপের নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যশালায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল তার মৌল কারণ এর চরিত্র, নাট্যভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য।

তবে যারা এককথায় উদ্ভট নাটককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন আমি তাদের দলে নই। তার কারণ, উদ্ভট-নাটক ভাবাঙ্গিকে উদ্ভট ঠিকই, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার একদম যোগ নেই তা নয়। আমি চাই, নাট্যপ্লট কার্যকারণযুক্ত সম্ভাব্য হবে এবং বাংলায় গত পঞ্চাশ বছরে এমন নাটকও সর্বাধিক লেখা হয়েছে। আমি এও চাই, নাটকের বিস্তার ও পরিণতি হবে ইতিবাচক। উদ্ভট-নাটক এই প্রথম দবিটি পূরণ করে না বলেই তো তা উদ্ভট নাটক। তবে দ্বিতীয়টি তার মধ্যেও খুঁজে পেতে চাইলে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ইতিবাচকতা, যেমন আয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরাস' নাটকে ফ্যাসিজমের কাছে মানবশক্তির অসহায় পরাজয় আপাতভাবে

আমাকে পীড়া দিলেও এমনটা ভাবতেও পারি যে, নাট্যকার মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রকারান্তরে একটু আশাবাদী। এই নাটকেরই বাংলা রূপান্তর হয় ১৯৬৪ সালে, যার এক বছর পরেই এল বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। এ নাটক নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি, বিশেষত এর কাহিনীর বিবর্তনহীনতার জন্য। অমল, বিমল, কমল, মানসী এবং ইন্দ্রজিৎরা জন্মায়, লেখাপড়া শেখে, প্রথানুযায়ী চাকরি করে, শেষ পর্যন্ত শূন্যগর্ভ পরিণামের দিকে পৌঁছায়। বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটকটিও উদ্ভট নাট্যরীতি অনুযায়ী ক্লান্তি, অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে লেখা, মানতেই হবে। বাদলবাবুর এই দুটো উদ্ভট নাটকই কিন্তু এই বাংলায় বহু পরিচিত, বহু অভিনীত। প্রশ্ন হল, যে নাট্যকার জীবনসংকটের কথা বলেন, কিন্তু তার সমাধানের পথ বাতলান না, তার এত জনসমাদর কেন? এর উত্তর একাধিক। প্রথমত, বাঙালি মধ্যবিত্তরা এই নাটকগুলির মধ্যে তাদের সমস্যার ছবি দেখতে পায়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভট নাটকে এমন কিছু সংলাপ থাকে যা আমাদের ভাবনাকেও নাড়া দেয়। যেমন মানুষের ঘৃণ্য নির্ভরশীলতার প্রতি বিদ্রূপের একটা দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে—

'সব ক্রীতদাস -- আমি, আপনি, মানে আপনারা, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারাও ক্রীতদাস। নিয়মের ক্রীতদাস -- কারণের ক্রীতদাস। নিয়ম আর কারণের খোসাগুলি ছাড়িয়ে ফেলুন, দেখতে পাবেন আপনাদের বুকেও খোসা-ছাড়ানো পেঁয়াজের অনন্ত শূন্যতা।'

(আমি ক্রীতদাস --- বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী)

কিংবা মানুষের স্থিতিশূন্যতার বেদনার একটি চেহারা --

'সত্যিই বড় অদ্ভুত বলেছ তোমরা, এক সাথে চলেছ অথচ কেউ কাউকে চেন না।'

(রক্তাক্ত নখর --- তপনকুমার ঘোষাল)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় কিংবা রতনকুমার ঘোষের মত নাট্যকাররা যখন যথাক্রমে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' এবং 'অমৃতস্য পুত্রা'-র মত উদ্ভট নাটক লেখেন তখন বুঝে নিতে হয় তাঁরা গতানুগতিক ধারায় বিশ্বাসী দর্শকদের আধুনিক রসোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতেই এই টেকনিক গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় প্রগতিশীল নাট্যকার হয়েও উদ্ভট নাটক লেখার কথা তাঁদের নয়। মোহিতবাবু উদ্ভট নাটকের প্রচলিত রীতি ভেঙে তার মধ্যে গীতিনাটকের বা যাত্রার আঙ্গিক এনেছেন, অপ্রয়োজনীয় বুঝেও গান এনেছেন, এমন কি সূত্রধারের আবির্ভাবও ঘটিয়েছেন। কাজেই উদ্ভট নাটকের নেতিবাচক মনোভাবের শর্ত ত্যাগ করে তার মধ্যে প্রথাসিদ্ধ রুচির প্রয়োগ ঘটিয়ে আর একটি নতুন নাট্যধারার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তাতে আপত্তি করলেও একশ্রেণীর দর্শক তা শুনবেন না, মনে হচ্ছে।

সবশেষে একাঙ্ক নাটকের কথায় আসি। বিশের দশকে মন্মথ রায় প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটক লিখলেও তার প্রসার ঘটতে শুরু করে পরের দশক থেকে। যতই দিন যাচ্ছে, মানুষের অবসর সময় কমছে। পথে-ঘাটে-দোকানে-বাজারে-ট্রেনে-বাসে এমনকি নিজের বাড়িতেও সকলেই এখন ব্যস্ত; প্রয়োজনের তুলনায় সময়ের বড় অভাব। দৃঢ়পিনদ্ধ নাট্যশরীর আছে বলে একাঙ্ক নাটকের প্রতি পাঠক-দর্শকের ক্রমবর্ধমান টান-- একথা যেমন ঠিক, তেমনি সদাব্যস্ত মানুষ স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকই এখন দেখতে চাইছে। সারা বাংলায় এখন যে কত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেলে থ হয়ে যেতে হবে।

যত দিন যাচ্ছে ততই একাঙ্ক নাটকের শিল্পরূপে বৈচিত্র্য আসছে। প্রাক-স্বাধীনতা কালে, চারের দশকে বিনয় ঘোষ 'ল্যাবরেটরি', সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'কেরাণী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'হোমিওপ্যাথি', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভিযান', সলিল চৌধুরি 'অরুণোদয়ের পথে', তুলসী লাহিড়ী 'দেবী' নামে যে সব একাঙ্ক নাটক লেখেন, তার মধ্যে 'দেবী'র আবেদন কালোত্তীর্ণ বলা যায়। নতুন নাট্যাঙ্গিক তৈরির জন্য এই প্রচেষ্টাগুলি যদিও স্মরণীয় হয়ে আছে।

তারপর থেকে একাঙ্ক নাটকের স্বর্ণকাল। উৎপল দত্তের 'ঘুম নেই' কিংবা 'কঙ্গোর কারাগারে' একাঙ্ক নাট্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দুরূহ পরীক্ষা পাই। গিরিশংকরের 'শেষ সংলাপে' কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের একাঙ্ক ধৃত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের স্মরণীয় একাঙ্ক 'জ্বালা'। বনফুলের 'শিককাবাব', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শুভকে ফিরিয়ে দাও', আধুনিক পরিণত নাটকের রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর একাঙ্ক নাটিকা। আগামী দিনে ভালো একাঙ্ক নাটকের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি হবে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলা নাটক রচনায় কত না নাট্যকার এসেছেন। কেউ আবার নাটক লিখছেন, তাতেই অভিনয় করছেন। কেউবা এ দুটি সহ প্রয়োগকর্তার ভূমিকাতেও থাকছেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলালের নাটকে যেমন এইসব অভিজ্ঞতা অধিক সাফল্যের কারণ হত, একালে বাড়তি আরও সুযোগ থাকলেও নাট্যকাররা তাদের মত প্রতিষ্ঠা বা জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন না।

৮.৪.২.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. একশো বছরের বাংলা থিয়েটার — ডঃ শিশির বসু
২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও একশো বছরের বাংলা নাটক — ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — ডঃ দর্শন চৌধুরী
৫. World Drama — A. Nicoll
৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস — ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
৮. বাংলা নাটকে চরিত্র — ডঃ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৮.৪.২.৯ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

প্রবন্ধ রচনা করো — ৫০

১. বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ ও তার মঞ্চসাফল্য
২. নাট্যকার মন্মথ রায়ের অবদান
৩. নাট্যকার শেকস্‌পীয়ারের কালজয়ী সাফল্যের কারণ ও বাংলা নাট্যকারদের উপর প্রভাব
৪. বাংলা নাটকের উপর লোকনাট্যের প্রভাব
৫. নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
৬. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক

———

৮.৪.১৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৮.৪.১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী